রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি
একটি সমীক্ষা

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত
গবেষণাপত্র

গবেষক

অমিত কুমার দাস

বাংলা বিভাগ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। পিন: ৭২১১০২

২০১৬

রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়

(NAAC মূল্যায়িত ‘A’ গ্রেড প্রাপ্ত মহাবিদ্যালয়)

বাংলা বিভাগ

গোপ প্রাঙ্গণ মেদিনীপুর সূচক সংখ্যা : ৭২১ ১০২

....

সারণী সংকেত: .... তারিখ: ....

গবেষক অমিত কুমার দাস দীর্ঘ ৪ বছরেরও অধিককাল ধরে ‘রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি : একটি সমীক্ষা’ বিষয়ে আমার অধীনে গবেষণা করেছেন।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য তাঁর গবেষণাকর্ম জমা দেবার সুপারিশ করছি।

তাঁর এই কাজ মৌলিক। এই গবেষণা পত্র বা এই পত্রের কোনো অংশ অন্য কোথাও অন্য কোনো ডিগ্রির জন্য ব্যবহৃত হয়নি।

(ড. অনিতা সাহা)

ঘোষণাপত্র

আমি অমিত কুমার দাস। আমার গবেষণার বিষয় "রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি : একটি সমীক্ষা"। এই গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়িকা শ্রদ্ধেয়া ড. অনিতা সাহা। আমার এই গবেষণা একান্তভাবেই মৌলিক। আমার এই গবেষণাকর্ম বা তার অংশবিশেষ অন্য কোনো ডিগ্রির জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আমি জমা দিই নি।

(অমিত কুমার দাস)

রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি
একটি সমীক্ষা

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা :	১৩
প্রথম অধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা ও গৃহীত কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা	১৭
দ্বিতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র-কবিতা ও গানে পল্লীভাবনা	১০০
তৃতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র-চিঠিপত্র ও ভ্রমণসাহিত্যে পল্লীভাবনা	২৫৩
চতুর্থ অধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে পল্লীপ্রসঙ্গ	৩২৫
পঞ্চম অধ্যায় : রবীন্দ্র-প্রবন্ধে পল্লীউন্নয়ন ভাবনা	৫০৩
ষষ্ঠ অধ্যায় : রবীন্দ্রনাটক ও পল্লী-জনকল্যাণ	৫৮৫
সপ্তম অধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনা : সাফল্য-ব্যর্থতা-প্রাসঙ্গিকতা	৬৫৭
উপসংহার:	৭২৮

ভূমিকা

বাঙালির জীবন ও মননের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ নিবিড়। আমাদের শৈশব ও যৌবনের পুরোভাগই জুড়ে আছেন তিনি ঋষিপ্রতিম এক মানুষ হিসেবে। তাঁর বিপুল বিচিত্র সৃষ্টির দিকে আজো অবাক হয়ে তাকাতে হয়। এই বিস্ময়ের জন্ম হয়েছিল যে শুভলগ্নে তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে চর্চা ও বিনোদনের আশ্রয়। এভাবেই ধীরে ধীরে আবিষ্কার করি রবীন্দ্রনাথ কেবল সাহিত্য স্রষ্টা নন, একজন বড় সংগঠক, একজন বড় কর্মীও বটে।

সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের সমান্তরালে বয়ে গেছে কর্মী রবীন্দ্রনাথের আর এক প্রসারিত জীবন। দেবেন্দ্রনাথের জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের উপরেই ঠাকুরবাড়ির জমিদারি দেখাশোনার ভার অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন দেবেন্দ্রনাথ। কয়েকবছরের শিক্ষানবিশী পর্বের পর রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯-এর ডিসেম্বর থেকেই পল্লীর মধ্যে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। কিন্তু উনিশ শতকের রেনেসাঁ-সঞ্জাত বাংলায় রবীন্দ্রনাথের যে চিত্তলোকের পরিবর্ধন ও লালন ঘটে তা রবীন্দ্রনাথকে নিছক জমিদারি দেখভালের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেনি। বৃহত্তর পল্লীবাংলাকে নিয়ে আমাদের যে দেশ ভারতবর্ষ তার ক্লিষ্ট দরিদ্র অসহায় রূপ রবীন্দ্রনাথকে পীড়া দিতে থাকে ভীষণভাবে। পল্লীকে সংগঠিত করে বৃহত্তর দেশ গঠনের একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ তখন থেকে আত্মনিয়োগ করেন।

আশ্চর্যভাবে লক্ষ করি, কর্মী রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের এই সময়কার উদ্যোগ ও পরিকল্পনাসমূহ, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিগুলোই কীভাবে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সাহিত্যধারার মধ্যে প্রকাশরূপ লাভ করছে। সেভাবে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন সংক্রান্ত নানা কর্মোদ্যোগ ও পরিকল্পনা তাঁর বিচিত্র সাহিত্যসৃজনের কারণ হয়ে উঠেছে। বিষয়টির অনুধাবন নিবিড় গবেষণার দাবি রাখে। একারণেই আমি আমার গবেষণার জন্য এই বিষয়টিকেই নির্বাচন করি। আমার গবেষণার বিষয় ছিল " রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি : একটি সমীক্ষা"। দীর্ঘ চার বছরেরও অধিককাল ধরে চলছিল আমার এই গবেষণা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর চার খণ্ডের ‘রবীন্দ্রজীবনী’তে পল্লীজীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগের ছবিটিকে ধরেছেন। গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্কল্প ও অসাধারণ কর্মযজ্ঞের পরিচয় দিয়েছেন তিনি এ গ্রন্থে I ঠাকুর-জমিদারির একজন কর্মী হিসেবে শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ‘কবিতীর্থের পাঁচালি’ (১৯৪৬), ‘পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ’ (১৩৬৮), ‘সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ’ (১৩৬৮), ‘শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৭৪) ইত্যাদি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা অজানা দিকের উপর আলোকপাত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লী উন্নয়ন বা গ্রামীণ অর্থনীতির উপর নিবিড় সমীক্ষা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। প্রমথনাথ বিশীর ‘শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৬৭) গ্রন্থ শিলাইদহে বাসকালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার বিবরণ তুলে ধরে মাত্র, কবির মৃত্তিকা সংলগ্ন জীবন সম্বন্ধে তথ্যনিষ্ঠ কোন আলোচনা এতে নেই। অশোক কুণ্ডুর ‘শিলাইদহ কুঠিবাড়ি ও রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৭৫) এবং নরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর ‘শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ’ও (১৯৮০) এই ধারারই গতানুগতিক সংযোজন। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ‘বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৩১), ‘রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৩৬) ‘রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীচিত্র’ (১৯৩৮) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রূঢ় কর্মনিষ্ঠ জীবনের ছবিকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। পল্লী-অর্থনীতি বা পল্লীউন্নয়ন সংক্রান্ত কোন নিবিড় সমীক্ষা তাঁর উপজীব্য ছিল না। তারাশঙ্করের ‘রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী’ (১৯৭১) গ্রন্থটিতে গবেষণালব্ধ কোন নতুন তথ্য নেই। সজনীকান্ত দাস ‘রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য’ গ্রন্থে কর্মী রবীন্দ্রনাথের যে বস্তুনিষ্ঠ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তার সঙ্গে কবিতার ভাবরাজ্যের বৈপরীত্যের ছবিটিই প্রধান হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সুধীর সেন তাঁর ‘Rabindranath Tagore on Rural Reconstruction’ (১৯৬৩) গ্রন্থে, শশধর সিংহ ‘Tagore’s approach to social problems’ (১৯৪৭) গ্রন্থে এবং ভারতপ্রেমী কৃষীবিজ্ঞানী লিওনার্দ এলম্হার্স্ট তাঁর ‘ Rabindranath Tagore and Sriniketan’ (১৯৫৮) ও ‘ Poet and Plowman’ (১৯৭৫) গ্রন্থে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াস-সংস্কারের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। অমিতাভ চৌধুরীর ‘জমিদার রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৭৬) গ্রন্থে, শশধর সিংহের ‘Social thinking of Rabindranath Tagore’ (১৯৬২) , সুগত দাশগুপ্তের ‘A Poet and a plan’ (১৯৬২) গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথের কর্মময় জীবনের ছবিটি তথ্যনিষ্ঠ রূপ লাভ করেছে। ড. ক্ষুদিরাম দাসের ‘সমাজ : প্রগতি : রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থ, সুকুমার মল্লিকের ‘রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা’ এবং প্রশান্তকুমার পালের নয় খণ্ডের অসম্পূর্ণ ‘রবিজীবনী’ পূর্বোক্ত ধারারই বিপুল তথ্যচয়নে সমৃদ্ধ গবেষণালব্ধ রচনা।

পূর্বোক্ত গ্রন্থধারার বিশদ বিবরণ বা তালিকা দেবার একটিই কারণ, গ্রন্থগুলিতে যে রবীন্দ্রনাথের কর্মময় জীবনকেই তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছেন গবেষক-

গ্রন্থকারগণ, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এই কর্মময় জীবনের নানা আলোড়ন, চিত্তসংঘাত, নানা অভিজ্ঞতা, নানা পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টির একটি বড় নিয়ন্তা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতির উজ্জীবন সংক্রান্ত চিন্তাধারাটি কীভাবে বয়ে চলেছে নিবিড় বিশ্লেষণে পূর্বোক্ত কোন গবেষকের রচনায় তা স্থান পায়নি। আমি সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের সমীকরণ রচনায় প্রয়াসী হয়েছি। পাশাপাশি আমি দেখিয়েছি রবীন্দ্রনাথের পল্লী তথা দেশোন্নয়ন ভাবনার একটি ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ কীভাবে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে বহমান থেকেছে।

আমি আমার গবেষণার ক্ষেত্রকে এখানেই সীমাবদ্ধ রাখিনি। পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের যে বিপুল কর্মপ্রয়াস একসময় রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন তার ব্যর্থতার কারণগুলিকে অনুসন্ধান করার প্রয়াস নিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন উদ্যোগে একদা প্রায় সমস্ত শ্রেণীর মানুষ সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু তার ব্যর্থতার পিছনে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা বা ভাবনার ত্রুটিই প্রধান ছিল নাকি পরাধীন দেশের নানা আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতাই রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক মডেলটির কার্যকারিতাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল, সেদিকটিকেও তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছি।

বর্তমান বিশ্ব এক বিরাট আর্থ-সামাজিক সঙ্কটের মাঝে দাঁড়িয়ে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি মানবিক মূল্যবোধের পরিসরকে ছোট করে আনছে দিনে দিনে। মানুষের মধ্যেকার অসভ্য বর্বরতা বুক ফুলিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে সামাজিক বন্ধনের সূক্ষ্ম স্বর্ণতন্তুগুলিকে। বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব, বিষণ্ণতা আজ আমাদের জীবনের চারপাশকে ঘিরে ধরছে। গণতন্ত্রের চরম সঙ্কটে আজ মানুষের স্বাধীনতা বিপন্ন, অর্থনৈতিক বিপন্নতাও অনতিক্রমনীয়। ক্ষমতাতন্ত্রের নানা নাগপাশ আজ আমাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বিশ্বপরিবেশ আজ চরম সঙ্কটের মুখে, বিশ্বপৃথিবীও। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে নতুন করে সমাজবিজ্ঞানীরা নেমে পড়েছেন উন্নয়নের বিকল্প কোন মানবিক মডেলের অনুসন্ধানে। রবীন্দ্রনাথের উন্নয়নের অর্থনৈতিক মডেল আজ তাই তাঁদের কাছে নবীন প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে ফিরে ফিরে আসছে। এ বিষয়টি পূর্বোক্ত গবেষণার ধারায় আদৌ স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথের উন্নয়ন পরিকল্পনার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতার দিককে বিস্তৃত পরিসরে আমি আমার গবেষণায় স্থান দিয়ে আমার গবেষণা কর্মটিকে স্বতন্ত্র করে তোলার প্রয়াস নিয়েছি।

আমার গবেষণাপত্রের প্রস্তাবিত যে রূপরেখা জমা দিই, তাতে সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম নির্দিষ্ট ছিল না। বর্তমান গবেষণায় ঐ অধ্যায়টি " রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনা : সাফল্য-ব্যর্থতা-প্রাসঙ্গিতা" শিরোনামে চিহ্নিত হোলো।

এরপর সেইসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করছি যাঁদের সহায়তায় এই গবেষণা কর্ম সম্পাদনা করতে পেরেছি। অধ্যাপক ড. নির্মল দাশের পরামর্শ ও পথনির্দেশ আমার গবেষণা কর্মের পথ প্রস্তুত করেছিল। তিনি আমাকে এই কাজে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ জুগিয়েছেন নিরন্তর। তাঁর সদ্য প্রয়াণের স্মৃতি এই গবেষণা সমাপ্তির আনন্দকে ম্লান করে তোলে। আমার গবেষণা কর্মে পরামর্শ দিয়ে শুধু নয়, সকল প্রকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিতৃপ্রতিম অধ্যাপক ড. লায়েক আলি খান। আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়িকা হিসেবে অধ্যাপিকা ড. অনিতা সাহার সহৃদয় সহানুভূতি ও বিদগ্ধ পরামর্শ আমার আলোচনাকে পথ দেখিয়েছে ও পূর্ণতা দিয়েছে। এঁদের সাহায্য সহযোগিতা ভিন্ন আমার গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না। এঁদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় যাবতীয় বই সরবরাহ করে আমাকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে পায়েল মণ্ডল, আলপনা সিংহ, তাপস শর্মা, পাপিয়া মণ্ডল, গুঞ্জন চক্রবর্তী, অর্চিতা সরকার, ঋষা ভট্টাচার্য্য। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বরাহনগর। অমিত কুমার দাস

কলকাতা-৯০।

০৩/০৫/২০১৬।

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা ও গৃহীত কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

জীবনের উপান্তে পৌঁছে ১৩৪৩-এর ৩০শে ফাল্গুন শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি 'সম্ভাষণ' শীর্ষক রচনায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—" আমার জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি। যখন আমি পদ্মানদীর তীরে বাস করছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব অভিযোগ, এবং কতবড়ো অভাগা যে তারা, তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। এই-সব গ্রামবাসীরা যে কত অসহায় তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। ....আমাদের দেশের মা, দেশের ধাত্রী, পল্লী জননীর স্তন্যরস শুকিয়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকেদের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায় ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন আমি আমার গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখ দুঃখ ও বেদনার কথা এঁকে এঁকে প্রকাশ করছিলাম। আমি এ কথা নিশ্চয় করেই বলতে পারি, তার আগে সাহিত্যে কেউ ঐ পল্লীর নিঃসহায় অধিবাসীদের বেদনার কথা, গ্রাম্য জীবনের কথা প্রকাশ করেন নি।"[১]

কলকাতার সুউচ্চ প্রাসাদশিখর ছেড়ে পদ্মাবিধৌত পল্লীপ্রকৃতির কোলেই তাই কবি ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি কর্মী রবীন্দ্রনাথের আর এক নবজন্ম ঘটে। 'অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব' এসে কবির চিত্ততন্ত্রীতে যে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল তারই ফলশ্রুতি ছিল গ্রামীণ মানুষগুলির জন্য 'কর্তব্যের নানা সঙ্কল্প'কে গেঁথে তোলা। এর পর থেকে কবির 'সাহিত্যের পথ' আর 'কর্মের পথ' পাশাপাশি প্রবাহিত হতে শুরু করে— যা পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে কবির জীবনের উপান্ত অবধি প্রসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে একারণেই 'শুরু' থেকে 'সারা' অনিবার্য ভাবে পল্লীভাবনার নানা ছাপ তার স্পষ্ট স্বাক্ষরকে চিহ্নিত করে দিয়েছে।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের চলাফেরার ভৌগোলিক পরিধি ছিল খুবই সীমায়িত; কলিকাতার মধ্যে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি ছাড়া শহরের বাহিরে কখনো যান নাই। তাই জোড়াসাঁকোর অবরুদ্ধ গতানুগতিক জীবনের অভ্যস্ত ধারা হইতে মুক্তি পাইয়া যেদিন পেনেটিতে ছাতুবাবুর বাগানটিতে ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় তাঁহাদিগকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল, সেটি তাঁহার জীবনের স্মরণীয় দিন; তখন বালকের বয়স দশ বৎসর হইবে। কলিকাতার বাহিরে ইহাই তাঁহার প্রথম যাত্রা।"[২] কিন্তু পেনেটিতে এসেও যে রবীন্দ্রজীবনের সঙ্গে পল্লীজীবনের কোন সংস্রব ঘটেছিল এমনটা নয়। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন—"পেনেটির বাগানে আসিয়াও চলাফেরার নিষেধ শিথিল হইল না। নিকটে বাংলার পল্লীগ্রাম, সেখানেও প্রবেশের অনুমতি নাই।"[৩] 'ছেলেবেলা' থেকে জানা যায়, এরপর প্রায় চার বছর বাদে পনের বছর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহে কিছুদিন অতিবাহিত করেন রবীন্দ্রনাথ। সেও ছিল নিতান্ত নিরালায় জ্যোতিদাদা এবং নতুন বৌঠানের সঙ্গে একান্তে সময় অতিবাহনের এক অবসর মুহূর্ত। অমিতাভ চৌধুরী এর বর্ণনা দিয়ে জানিয়েছেন—

"জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে এসেছেন পরগনায় বেড়াতে। বিরাহিমপুর তাঁদেরই জমিদারি। কুঠিবাড়ির কাছেই সদর কাছারি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জমিদারির কাজ দেখতে এসেছেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ঐ ছোট ভাইকে।.........পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে ছোট ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সেই প্রথম।......বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের খোলা মাঠ নদীর ঘাট সবুজ বন বালির চর এবং পরবর্তী জীবনের বহু সুখদুঃখের সহচরী পদ্মানদীর সঙ্গে তাঁর সখ্য সেই প্রথম শুরু। কোথায় সেই কলকাতার ধূলিমলিন আকাশ, চিৎপুরের চিৎকার— এখানে এই পদ্মাচুম্বিত জনপদে শুধু আরাম, শুধু আনন্দ, শুধু শান্তি।"[৪]

কিন্তু পদ্মা চুম্বিত জনপদে পরবর্তী সময়ে যখন রবীন্দ্রনাথ স্থায়ী বাসা বেঁধেছেন, যখন পল্লীর প্রাণস্পন্দনকে নিতান্ত কাছ থেকে অনুভব করেছেন, তখন থেকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু আরাম, শুধু শান্তির মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। পল্লী জীবনের অভাব, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, অসহায়তার যন্ত্রণাকাতর ক্রন্দন তাঁকে নিত্য পীড়িত করেছে। তাই তখন থেকেই পল্লীর উন্নয়নের জন্য তাঁর বিবিধ কর্মপরিকল্পনাকে গেঁথে তুলেছেন। 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে অমিতাভ বাবু পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা বলেছেন সে আসলে নাগরিক ধূলিমলিন জীবনের বাইরে উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতার পরিচয়। পল্লীজীবনকে নিতান্ত কাছ থেকে দেখা বা জানার অবকাশ তখনো সেভাবে আসেনি।

সেই অবকাশ যথার্থ অর্থে সূচিত হয় আরো বেশ কয়েক বছর পরে। এর পূর্বে ঠাকুর পরিবারের জমিদারির দেখভালের দায়িত্ব ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বড় জামাতা

সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর। রবীন্দ্রনাথের বিবাহের দিনই (৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩) তাঁর মৃত্যু ঘটে। রবিজীবনীকার প্রশান্ত পাল জানিয়েছেন সারদাপ্রসাদের মৃত্যুর পর জমিদারির হিসাবপত্র দেখার দায়িত্বে বেশ কিছুকাল ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—"মহর্ষির জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদের মৃত্যুর পর জমিদারি তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের হস্তে সমর্পিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশে রাজকার্যোপলক্ষে ব্যাপৃত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রীবিয়োগের পর সাংসারিক কাজকর্মে বীতস্পৃহ; হেমেন্দ্রনাথ মৃত; বীরেন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ বায়ুরোগগ্রস্ত। সুতরাং জমিদারির কাজকর্ম হয় জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ , না হয় কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের উপর বর্তাইতে বাধ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক ও কবি; তাঁহার পক্ষে বৈষয়িক কাজকর্ম দেখাশুনা করা অসম্ভব। সুতরাং পরিচালনাভার তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর গিয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহার হাতে এস্টেটের কাজকর্ম অত্যন্ত শিথিল হইয়া যায়।জমিদারির তদারক ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার অবশেষে রবীন্দ্রনাথের উপর আসিয়া পড়িল;"[৫] অমিতাভ চৌধুরীও জানিয়েছেন—"সামগ্রিক দায়িত্ব দিয়ে কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথকে কেন দেবেন্দ্রনাথ নির্বাচন করেছিলেন তা স্পষ্ট জানা যায় না। তবে বরাবরই এই সন্তানটির প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা। এমন কথাও শোনা যায় যে, ঠাকুর-এস্টেটের আমলাদের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ, নানারকম অসন্তোষ জমা হচ্ছিল প্রজাদের পক্ষ থেকে এবং জমিদারিসংলগ্ন কুমারখালির মনীষী হরিনাথ মজুমদারের (কাঙাল হরিনাথ) কাগজ 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় সেই-সব অসন্তোষের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল। হয়তো দেবেন্দ্রনাথ এই অসন্তোষের প্রতিবিধান করতেই প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্রকে জমিদারি পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যে হরিনাথ মজুমদারের কাগজের গ্রাহক ছিলেন, তার প্রমাণ আছে রবীন্দ্রসদনে রাখা দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব হিসাব-বহিতে।"[৬]

দ্বিতীয়বার বিলাতে গিয়ে সফল হবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন একরকম দিশাহীন ছিলেন বলতে গেলে—"রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন (১৮৮৩) বাইশ বৎসর—কোনো নির্দিষ্ট স্থান নাই থাকিবার, কোনো নির্দিষ্ট কাজ নাই করিবার।"[৭] এমতাবস্থায় একটি চিঠিতে মহর্ষি রবীন্দ্রনাথকে জানান—"এইক্ষণে তুমি জমিদার কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিত রূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমা ওয়াশীল বাকি ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি পত্রসকল দেখিয়া তার সারমর্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতি সপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্ত মতে তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্যে তৎপরতা ও বিচক্ষনতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য করিবার ভার অর্পণ করিব।"[৮]

রবীন্দ্রনাথের কাছে এই চিঠি অগোছালো জীবনকে নিয়ে গুছিয়ে বসার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পিতার নির্দেশ কতটুকু পালন করেছিলেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রবিজীবনীকার জানিয়েছেন—"রবীন্দ্রনাথ যে-ধরণের বেপরোয়া যাযাবর জীবন যাপন করছিলেন, এই প্রতিভাবান পুত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বৎসল পিতার পক্ষে তাঁর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই আর বেশিদিন তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে সোলাপুর থেকে ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপরে জোড়াসাঁকোর হিসাবপত্র পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব পড়ল। ক্যাশবহিতে দেখা যায়, ১ আষাঢ় ১২৯৬ পর্যন্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ স্বাক্ষরাদি করেছেন—পরের দিন ২ আষাঢ় [শনি 15 jun] থেকে রবীন্দ্রনাথ হিসাবপত্রে R.T. স্বাক্ষর দেওয়া শুরু করেন।"[৯] এর অব্যবহিত পর থেকেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জমিদারির কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য ১৮৮৯-এর নভেম্বর থেকেই সপরিবারে শিলাইদহে স্থায়ী বসবাসের জন্য যাত্রা করেন। রবিজীবনীকার বলেছেন—" ১১ অগ্র° [সোম 25 NOV] রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনী দেবী, তাঁর একজন সহচরী, বেলা ও রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে শিলাইদহ যাত্রা করেন। বলেন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গী হন ...বলেন্দ্রনাথ নিজেও পারিবারিক খাতায় লেখা তাঁর 'Adventure' শীর্ষক প্রস্তাবে লেখেন, 'আমাদের সিলাইদহ যাওয়া হয় ১১ই'।"[১০]

যাইহোক, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য সন্তানদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপর জমিদারির দায়িত্ব অর্পণ করেন ঠিকই, কিন্তু সে কতকটা পরীক্ষামূলক ভাবেই। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা বিলাসী মন সাংসারিক প্রয়োজনের বাস্তবতায় কতটা মানিয়ে নিতে পারবে এটা দেখে নিতে চেয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। মহর্ষির অন্তর্ভেদী মানব চরিত্রাভিজ্ঞতা কিন্তু পরবর্তী কালে সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৬—প্রায় সাতবছরের শিক্ষানবিশী পর্বের পরীক্ষায় জীবনের 'আসমানদারি' আর 'জমিনদারি'র সমীকরণ রচনায় প্রশ্নাতীত সফলতা লাভ করলেন। তাঁর সেই আশাতীত কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮-ই আগস্ট এটর্নির মাধ্যমে পাকাপাকি ভাবে জমিদারির সমস্ত দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করলেন।

ঠাকুরবাড়ির জমিদারির পরিধি ছিল অনেক বড়। পরবর্তীকালে সে জমিদারির পরিধি অনেকটা কমে আসে। দেবেন্দ্রনাথের আমলে নদীয়া (বর্তমানে কুষ্টিয়া) জেলার বিরহামপুর পরগণা (সদর শিলাইদহ), উড়িষ্যার কটক জেলার কিয়দংশ, রাজশাহী জেলার কালিগ্রাম পরগণা (সদর পতিসর), পাবনা জেলার অন্তর্গত শাহাজাদপুর পরগনা (সদর সাহাজাদপুর) নিয়ে ঠাকুরবাড়ির বিশাল জমিদারি ছিল। তবে রবীন্দ্রনাথকে উড়িষ্যা ও শাহাজাদপুরের জমিদারি পরিচালনার কাজ খুব বেশি দিন করতে হয়নি। জমিদারির এই অংশের নাবালক সত্ত্বাধিকারীরা সাবালকত্ব লাভের পর দেবেন্দ্রনাথ উদ্দিষ্ট মালিকদের মধ্যে

তা বন্টন করে দেন। শিলাইদহ-পতিসর এবং বীরভূমের শান্তনিকেতন-শ্রীনিকেতনকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী জীবনের প্রধান কর্মস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসেবে আর পাঁচজন জমিদারের মত কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সফলতা বা বিত্তসম্পদের বিকাশের উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হতে পারেননি। শতাব্দীব্যাপ্ত অবহেলিত শাশ্বত মানবমূল্য এবং মানবসম্পর্কের পুনরুজ্জীবনও তাঁর কর্মপরিকল্পনার আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর পিছনে ঠাকুর বাড়ির পরিবেশ, সময়, সমকালীন বাংলার সমাজপটভূমি বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে নিঃসন্দেহে—

“But unlike many zamindar familiesof the period chose to be a leading figures of the cultural renaissance of the period. The family was a foroward-looking family yet culturally steeped in the tradition of Bengal.It made them fiercely patroitic.The patriotic feelings,the cultural independence, cultivation of a rational outlook, involvement of science,arts,literature,music,an awareness of the unique historical background of India,a deeep sense of feelings for the travails of fellow human beings,all played its part in shaping young Rabindranath’s mind.The altruistic feeling and attempt to infuse important parameteres of modernisation of the society by various associations including Hindu Mela (1867) aroused new enthusiasm but it remained to urban life only.It did not translate into direct participation or intervention in the total development and welfare of the society barring some exceptions.They were driven mainly by a paternalistic feeling.The three factors of parmanent settlement,english educatin and development of an incipient urban buseness class gave rise to a middle class steeped in many contradictorinesses that wreaked havoc to the economy and social organisation of the urban and rural areas of Bengal.The abject poverty and social decay that set in all around were thought to be the handiwork of the colonial administration and therefore achieving independence was the only solution to the burgeoning social and economic problems.This was the atmosphere in which Rabindranath found himself.”[১১]

এই সময় ও সমাজ-পটভূমির মাঝে বড় হয়ে ওঠা জমিদার রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র ক্ষুদ্র জমিদারি স্বার্থের দ্বারা চালিত হতে পারেনি। " The long history of conscious effort made by many people right from Rammohon Roy and Vidyasagar from the early part of nineteenth century , the deepening economic crisis due to a series of famines that affected the society,the apathy of the British administrators about the human misery, the social and moral decay of his countrymen, made him realize that it was necessary to reconstruct the unbroken stream of life that once ran through the country's populace."[১২]

একারণেই রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নসংক্রান্ত চিন্তাভাবনা ও কর্মপরিকল্পনা দুটি জিনিসের দ্বারা ভীষণ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। একদিকে উপনিষদের শিক্ষা অন্যদিকে 'western idea of Right of man and equality'। আসলে বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রসারের ফলে সমকালের ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানীরা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজের উদ্ভব ঘটছে বলে প্রমাণ করার কাজে নেমে পড়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতাকে মূলতঃ সমষ্টিগত সমাজ ভিত্তিক সভ্যতা বলেই মনে করতেন। এই সমাজ ও সভ্যতা বৃহত্তর এক নৈতিক আধারের (moral order) দ্বারা চালিত। ইউরোপীয় সমাজের অনুকরণীয় দিকসমূহ জীবনের প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করলেও পরবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক স্বৈরাচারিতা, রাষ্ট্রতান্ত্রিক শোষণ তাঁকে তাঁর পূর্বোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সরিয়ে আনে। আর একারণেই তিনি যে মানব-পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন ,যার আদলে পল্লীগ্রামকে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন, সেখানে 'western idea'র পাশাপাশি মূলতঃ তাঁর প্রেরণা হয়ে উঠেছিল উপনিষদ—"The influence of ancient texts of Upanishad gave direction to his philosophy and created his world-view,especially his concept of unity and universalism,a sense of infinity as well as an ever evolving effort on the part of the nature including human being to reach and merge with the infinity and thereby attain ultimate level of its fulfilment.It was this sense of progress and sense of developmental process unfolding in the universe constantly that led him to his vision of reshaping theliving world of human being."[১৩]

তাই নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, দেশের মানুষের আত্মশক্তির জাগরণের দ্বারা নৈতিক চারিত্রিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ এক আদর্শ মানববিশ্ব তথা দেশ গড়ে তোলাই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই আশা নিয়েই তিনি সমকালীন রাজনৈতিক

আন্দোলন তথা স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। পারিবারিক যে আদর্শ ও সংস্কারের প্রেরণা তাঁর রক্তের অন্তর্গত হয়েছিল তা তাঁকে অনুরূপ কাজে প্রণোদিত করেছিল অবশ্যই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইচ্ছা ও আশা পূরণের কোন আয়োজন দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মপন্থার মধ্যে দেখতে পেলেন না। দেশীয় নেতাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও আদর্শকে ক্রমে রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। নিছক রাজনৈতিক উত্তেজনা যে দেশকে কোন মঙ্গল ক্ষেত্রে উপনীত করতে পারে না—এই বেদনা তখন রবীন্দ্রনাথকে যথার্থই পীড়া দিতে থাকে। 'নেতারা আদর্শ ও পন্থা লইয়া বিবাদে মত্ত, দেশ যে কোনদিকে চলিতেছে এবং কোথায় স্পর্শ করিলে জনশক্তি সংহত ও জাগ্রত হয়, সে দিকে নেতাদের দৃষ্টি ক্ষীণ।"[১৪] দেশকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ না করে যন্ত্রশক্তিতে বলীয়ান প্রবল ইংরেজের সামনে কতিপয় মানুষের বেঘোরে প্রাণ দানের মধ্যে আন্দোলনের কোন গঠনমুখী দিককে খুঁজে পাননি তিনি। পরবর্তী কালের বয়কট বা সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক কর্মপন্থাকে কবির সমর্থন না করার পিছনে অনুরূপ যুক্তিই ক্রিয়াশীল থেকেছে।

১৯০৮-এ অনুষ্ঠিত পাবনার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ দেশের ভবিষ্যৎ কার্যবিধি সম্পর্কে নিজের মতামতের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তাই দেশের মানুষকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার উপর জোর দেন। তার জন্য দেশনেতাদের দেশের প্রাণকেন্দ্র পল্লীর ভিতর দৃষ্টিদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। দেশীয় নেতারা যাতে এক একটি পল্লীর দায়িত্ব নিয়ে সেখানে 'স্বরাজ' স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকেন তার স্বপক্ষে সওয়াল করেন। এই 'স্বরাজ'-এর নিহিতার্থ ছিল গ্রামগুলিকে তাদের নিজস্ব শক্তির উপর দাঁড় করানো। পল্লীর মানুষ দারিদ্র্য, অনাহার, অশিক্ষা, জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার আঁধারে তখন নিজেদের শক্তিকে তিলে তিলে ক্ষয় করে চলেছিল। এই জনশক্তির জাগরণ ও সংরক্ষণ ব্যতীত দেশের প্রকৃত মঙ্গল সম্ভব নয়। যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসেও, তা যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং তা যে মনুষ্যত্বের মুক্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে—এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। গ্রাম-নগরকে এক সূত্রে বেঁধে ফেলে দেশীয় সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের পথে ঔপনিষদিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ নবীন দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি পনেরো দফা কর্মসূচীও ঘোষণা করেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই সকল ধারণা তখনকার দেশীয় নেতাদের মনঃপুতঃ হয়নি। সেগুলিকে তাঁরা কবির আইডিয়া বলে সেদিন উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। এর জন্য রবীন্দ্রনাথ আশাহত হননি। কেননা এর বহু পূর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রামজীবনকে নিতান্ত কাছ থেকে দেখে তার উন্নয়নের জন্য নিজস্ব পরিকল্পনাকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলছিলেন।

এখন রাজনৈতিক নেতাদের উদাসীনতা প্রত্যক্ষ করে নিজেকে তাঁদের থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে আনেন। তাঁদের সমালোচনায় কর্ণপাত না করে পল্লীর উন্নয়নের জন্য নিজস্ব পরিকল্পনাকে সাকার করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠন ভাবনা তাঁর স্বাদেশিকতাবোধের সঙ্গে জড়িত হলেও তা রাজনীতিসঞ্জাত ছিল না। এ প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

"১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে তখনকার দেশনেতারা কলকাতা এবং বড়ো বড়ো শহরেই এই আন্দোলন নিয়ে মেতে রইলেন—কিন্তু তখন বাংলাদেশের গ্রামবাসীদের কথাই বাবার বেশী করে মনে হতে লাগল। তিনি অনুভব করলেন, কেবল আন্দোলন করলেই হবে না, ভিত থেকে কাজ শুরু করার সময় হয়েছে। এই সময় পাবনা কনফারেন্সে তাঁকে যখন ডাকা হল, এই কথাই তিনি দেশবাসীকে জানালেন তাঁর ভাষণে। কেউ যখন কিছু করলেন না তখন তিনি নিজে তাঁর ক্ষমতার মধ্যে যেটুকু করতে পারেন সেই কাজে নেমে গেলেন। বিরাহিমপুর ও কালিগ্রাম—এই দুই পরগনা তাঁর হাতে ছিল—তিনি সেখানকার গ্রামবাসীদের দুরবস্থা ঘোঁচাবার জন্য একটা প্ল্যান করলেন।"[১৫]

ভারতবর্ষের মত দেশে সমগ্রভাবে এই পরিকল্পনাকে একক সামর্থ্যে যে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়—সেকথা রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবে জানতেন। তাই তিনি তাঁর জমিদারির অন্তর্গত একটি বা দুটি গ্রামে তার সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে দেশবাসীর কাছে আদর্শ বা মডেল গ্রামের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। শিলাইদহ-পতিসর কিংবা শান্তিনিকেতন- শ্রীনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনার যাবতীয় কর্মপ্রয়াস ও পরীক্ষা- নিরীক্ষা অনুরূপ লক্ষ্যেই নিয়োজিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে সংবাদ মাধ্যম পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ প্রগতিভাবনার স্বরূপ সেদিন বুঝতে পারেননি। কুৎসিত সমালোচনা ও কলঙ্কলেপনেই কেবল তাদের সক্ষমতাকে জাহির করার প্রয়াস চালিয়ে গেছে। এরই পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রসহযোগী এল্‌মহার্স্ট পরবর্তী সময়ে জানিয়েছেন—

"Politics and political discussions were every where in the air.Tagore was being accused, not by Gandhi, but in the Press and by the politicians-in-a-hurry, of being out of touch with the basic mood of India, of being too much of a poet and of a detached educator, of having his head in the international clouds and of not beinga thorough-going non-co-operator."[১৬]

পল্লীর উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শিলাইদহ-পতিসরে প্রাথমিক ভাবে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কাজকর্ম শুরু করেন। বলা চলে এই পর্বটি পল্লীসংগঠক রবীন্দ্রনাথের জীবনের শিক্ষানবিশী পর্ব। নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাকে ততটা সফল করে তুলতে না পারলেও পতিসরে তা অনেকটাই সফলতা লাভ করে। তবে রবীন্দ্রনাথের পল্লী পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রভূত সফলতা লাভ করে পরবর্তী ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে। রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠন কর্মধারার তাই দুটি স্পষ্ট স্তর বা পর্ব বিভাজন লক্ষ্য করা যায়—

ক. শিলাইদহ-পতিসর পর্ব।

খ. শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্ব।

রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীউন্নয়ন ভাবনা ও গ্রামীণ অর্থনীতির স্বরূপ সন্ধান করার পূর্বে দুটি পর্বে বিন্যস্ত রাবীন্দ্রিক পল্লীউন্নয়ন ভাবনার মূল সুত্রগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়কে তুলে ধরা হল।

ক. শিলাইদহ-পতিসর পর্ব :

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৯ সাল থেকে প্রায় স্থায়ীভাবে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে থাকতে শুরু করেন। ড. ক্ষুদিরাম দাশ জানিয়েছেন— '১৮৯০ এর পর থেকে ব্যক্তি ও কবি রবীন্দ্রনাথের নতুন জীবন,......গ্রামীণ কৃষক জীবনের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের প্রারম্ভ।"[১৭] নগর-জীবনের বাইরে এসে এই প্রথম পল্লীবাংলার যথার্থ ছবিটি কাছের পরিচয়ে ধরা পড়ল। ইংরেজের ব্যবসায়ী মন পল্লীর ন্যূনতম চাহিদার প্রতি নিতান্ত অবহেলা প্রদর্শন করায় তখন সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যে পল্লীগ্রাম এক গভীর অমানিশায় আচ্ছন্ন। জমিদার-মহাজনের শোষণের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় শোষণে বাংলার লক্ষ গ্রামের কৃষক সম্প্রদায় মৃতপ্রায়। গ্রামের পর গ্রাম দিগন্ত বিস্তৃত ঊষর ভূমি, অসহায় নিরুদ্যম নিঃস্ব মানুষগুলি কোন মতে জঠরাগ্নির নিরাময়ের চেষ্টায় কাতর, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসফল। ম্যালেরিয়া-কলেরায় গ্রামে গ্রামে মড়ক, কুসংস্কারের নিগড়ে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। পানীয়জল, চিকিৎসা, যোগাযোগা ব্যবস্থার চূড়ান্ত অভাব গ্রামগুলিকে যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছিল—

“....all enterprise has now faded from village life. Tanks and other sources of water supply are now silted up, common pastures are not properly looked after; temples are not repaired. The unlettered of those pundits who once used to create spiritual ties among the village people, now give false evidence in law courts; the wealthy families, whose social functions were the chief source of education and entertainment in villages, have now been attracted to towns; those who once protected the weak and punished the wicked, have now been replaced by the police inspector,with results that are known to all.

There is no longer any high ideal in villages,nor any social living example of social service. No force of healthy tradition can now work from within. All that we now find are the artificial trammels of law. Through constant litigation the village is now tearing itself to pieces, like a mad man plunging his nails into his own body. Jungles are spreading, malaria is becoming increasingly severe, famine recur more frequently than before. People have no resources to fall back in lean years enabling them to wait till the following harvest.They lack the courage born of unity and mutual assistance,to stop theft and robbery in their own village or to prevent the losses and the humiliation which may be inflicted on them at the time of police investigations into such crimes.

And, last of all, what tragic conditions now prevail with regard to the supply of those food-stuffs which alone can give health and strength and thus keep disease at an arm’s length! Ghee is adulterated, milk is dear, fish is has become scare, and oil is poisoned. The “swadesi diseases” now lord it over our liver and spleen.On top of this, exotic new disease discend on us uninvited and in no time settle permanently among us. Diptheria,tuberculosis, typhoid—all have adopted a policy of exploitation towards an anaemic people. There is no food,no health, no joy, no hope. We quietly accept every misfortune,

die without effort, attribute every injustice to destiny and, when danger befalls our near and dear ones, inertly abandon them to their fate."[১৮]

অনুরূপ অবস্থায় জঙ্গল আর আগাছায় পরিপূর্ণ পল্লীগ্রামকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন। নগর-জীবনের আড়ম্বর আর ঔজ্জ্বল্যের থেকে এই পল্লীবাংলার বুকেই এসে বাসা বাঁধলেন পল্লীমায়ের দুঃখযন্ত্রণার উপশম করবেন বলে। গ্রামোন্নয়নের নানা নিরীক্ষা ও পরিকল্পনাকে গেঁথে তুললেন। শিলাইদহ-পতিসর পর্বে গৃহীত রবীন্দ্রনাথের সেই পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনার মূল সূত্র ও উপসূত্রগুলি নিম্নরূপ:

১. কৃষি :

ক. আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার :

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেন যে শিলাইদহ-পতিসরের ঊষর ভূমিতে কৃষকেরা যে মান্ধাতার আমলের লাঙল-বলদ দিয়ে চাষ করে চলেছে তাতে কৃষিব্যবস্থায় কোন উন্নতি করা অসম্ভব। বর্ষার পর এই এলাকার মাটি এতটাই কঠিন হয়ে পড়ে যে তাতে লাঙল দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। একারণেই রবীন্দ্রনাথ এখানে পরবর্তী সময়ে বিদেশী যন্ত্রপাতির ব্যবহারের দ্বারা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। ট্রাক্টরের মাধ্যমে কৃষিকাজ করার ফলে এই অঞ্চলের মানুষ দারুন আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে চাষের ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ সমবায় কৃষিভাবনা বা যৌথচাষের নানাবিধ দিক নিয়ে প্রয়োগমূলক কিছু পরীক্ষাও চালান। আমেরিকা থেকে নানা ধরণের নতুন যন্ত্রপাতি যেমন শস্য পেষাই করার কল, জলের পাম্প, নিড়ানি যন্ত্র ইত্যাদি আনয়ন করে রবীন্দ্রনাথ কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলার ব্যবস্থা করেন।

খ. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ :

কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে প্রয়াস নেন রবীন্দ্রনাথ। একারণে তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু সন্তোষ চন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও গোপালনবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করেন। তার একবছর পরে জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও আমেরিকায় পাঠান কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করার জন্য। এদের মধ্যে রথীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ফিরে আসেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে শিলাইদহের কুঠি বাড়ি লাগোয়া প্রায় আশি বিঘা জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের পত্তন করেন। রথীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে জানিয়েছেন— " শিলাইদহে আমার নতুন জীবন শুরু হল—আমি যেন ইংলণ্ড-আমেরিকার পল্লী-অঞ্চলের একজন সম্পন্ন কৃষাণ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে খেত তৈরি হল, আমেরিকা থেকে

আমদানি হয়ে এল ভুট্টার বীজ ও গৃহপালিত পশুর জাব খাবার মতো নানাবিধ ঘাসের বীজ। এ দেশের উপযোগী করে নানারকম লাঙল, ফলা ও কৃষির অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরি করা হল—এমন-কি মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য ছোটখাটো একটি গবেষণাগারের পত্তন হল। এইসময় আমেরিকা থেকে এসেছিলেন মাইরন ফেল্‌প্— ইনি ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে এঁর লেখা অনেক প্রবন্ধাদি তখনকার কাগজে প্রকাশিত হত। তাঁর একটি লেখায় তিনি আমাদের মস্ত সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, বলেছিলেন শিলাইদহে আমি নাকি একটি সত্যিকারের ভালো আমেরিকান ফার্ম গড়ে তুলতে পেরেছি।”[১৯]

গ. কৃষি গবেষণাগার স্থাপন :

শুধু বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ নয়, কৃষি- উন্নয়নের জন্য তিনি নতুন নতুন নিরীক্ষার স্বার্থে কৃষি গবেষণাগারেরও প্রতিষ্ঠা করেন। মাটি পরীক্ষা ও সার তৈরির জন্য স্বতন্ত্র গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা রথীন্দ্রনাথ তথা রবীন্দ্রনাথের কৃষি নিরীক্ষাকে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছিল। রথীন্দ্রনাথ ‘পিতৃস্মৃতি’তেই বলেছেন—“ শিলাইদহের দো-আঁশলা মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় কি কি খাদ্যসামগ্রীর অভাব তা জানবার জন্য ছোটোখাটো একটা রাসায়ণিক ল্যাবরেটরি গড়ে তুললুম। চাষীদের মধ্যে ক্রমে উৎসাহ দেখা গেল, আলু আখ টমেটো প্রভৃতির চাষ ক্রমশ বাড়তে লাগল।”[২০]

ঘ. কৃষিসচেতনতা বৃদ্ধি :

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা আনয়নেরও বন্দোবস্ত করা হয়। এর জন্য কৃষকদের মধ্যে কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে কতকগুলি মুদ্রিত নির্দেশনামা বিলি করেন রবীন্দ্রনাথ। কোন ঋতুতে কোন কোন ফসলের চাষ যথোপযোগী সে সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা এতে স্থান পেত। রথীন্দ্রনাথ নিজেই হাতেকলমে কৃষকদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আলু ও টমেটোর চাষ শেখান।

ঙ. উন্নত বীজের ব্যবহার :

কৃষিকাজে ফলন বৃদ্ধির জন্য রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে উন্নত প্রজাতির বীজ এনে চাষ করার বন্দোবস্ত করেন। আমেরিকা থেকে ভুট্টা ও মাদ্রাজ থেকে সরু ধানের বীজ, নৈনিতাল থেকে আলুর বীজ সংগ্রহ করে এনে নানান প্রকার কৃষি নিরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। সরকারী কৃষি বিভাগ থেকেও আলুর বীজ কিনে এনে রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেন। এই আলুচাষের বিবরণ উল্লেখ করে ১৮৯৯ সালের ‘Lands Records of Agriculture’-এর বার্ষিক রিপোর্ট জানিয়েছিল—

“Experiment with Nainital potatoes were made by Mr. Rabindranath Tagore in the Tagore Estate at Shelidah in the Kusthia Sub-Division.The crop was not satisfactory owing to the defective cultivation.one of Mr.Tagore’s continents,however,working under more favourable circumstances obtained a bumper crop from a portion of the same seed and success of the experiment is said to have induced several neighbouring Rayots to take the potato cultivation.Their experiments together with others introduced by Mr. Tagore on his firm will be continued.”[২১]

চ. ফলের চাষ :

পতিসরের কঠিন মাটি কৃষিকাজের প্রতিকূল ছিল। বর্ষার সময় জমিগুলি জলমগ্ন থাকতো, আর গ্রীষ্মের সময় মাটি শুকিয়ে এতটাই কঠিন হয়ে যেত যে চাষাবাদ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। এমতাবস্থায় প্রজাদের জমির উঁচু আলপথে আনারস, কলা, খেজুর ইত্যাদি ফলের চাষের দ্বারা এই প্রতিবন্ধকতাকে এড়ানোর স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন রবীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথকে এই মর্মে চিঠি লিখে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। ফলের চাষ এবং আনারসের পাতা থেকে সুতো তৈরি তখন একপ্রকার লাভজনক ব্যবসা ছিল। রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ পরিকল্পনার পিছনে তাই সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক ভাবনাই ক্রিয়াশীল থেকেছে।

ছ. রাসায়নিক সারের পাশাপাশি জৈব সারের ব্যবহার :

বিদেশ থেকে আমদানীকৃত রাসায়নিক সারের ব্যবহারের পাশাপাশি নানাপ্রকার জৈব সারের ব্যবহার বিধি গড়ে তোলেন রবীন্দ্রনাথ। গোবর, খইল, পাতা এমনকি মাছ পচিয়ে সার তৈরি করে কৃষিক্ষেত্রে তার প্রয়োগের বন্দোবস্ত করা হয়। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ সহায়তা করেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন যজ্ঞের শরিক শচীন্দ্রনাথ অধিকারী একটি চিঠিতে লিখেছেন—“ গোবর, খইল আর পাতা পচিয়ে সার তৈরি করতে আমাদের প্রতিযোগিতা চলতো। শুকনো গোবর কুড়িয়ে কে কত বেশি গুঁড়ো করছে তাই নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলতো এবং প্রাইজও পেতাম।”[২২] রথীন্দ্রনাথও জানিয়েছেন—“ সারের অভাব কী করে ঘোচানো যায় ভাবছি এমন সময় আকস্মিক ভাবে একটি উপায় আবিষ্কার করলুম। শিলাইদহের ধারে পদ্মানদী থেকে বিস্তর ইলিশ মাছ কলকাতায় রপ্তানি হয়। বেড়াজালে এক-একসময় এত মাছ ওঠে যে অত মাছ নিকারিরা নিতে চায় না। একদিন দেখলুম ডিম বের করে নিয়ে নুন দিয়ে

রাখছে আর মাছগুলি নদীর জলে ফেলে দিচ্ছে। নামমাত্র মূল্যে কয়েক নৌকা বোঝাই মাছ কিনে নিয়ে এসে চুন দিয়ে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখলুম। এক বছর পরে মাটি খুঁড়ে দেখি চমৎকার সার হয়েছে। তখন মাছের সার প্রচলনের চেষ্টা করলুম।"[২৩]

জ. কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন :

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন গ্রামের দরিদ্র প্রজারা একবার মহাজনের ঋণের জালে জড়ালে তার পক্ষে সেই জাল ছিন্ন করে পুনর্বার বাইরে আসা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াত। তাদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের একটি বড় কারণ ছিল এই মহাজন সম্প্রদায়। রবীন্দ্রনাথ একারণে তাঁর কাছের পরিচিত ব্যক্তিবর্গের থেকে বেশ কিছু টাকা ঋণ নিয়ে শিলাইদহ এবং পতিসরে 'কৃষিব্যাঙ্ক' স্থাপন করেন। এই ব্যাঙ্কের দ্বারা তিনি কৃষকদের সুলভে ঋণদানের বন্দোবস্ত করেন। পরবর্তীকালে নোবেল প্রাইজের এক লক্ষ আশি হাজার টাকা এই কৃষি ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন প্রজাদের স্বার্থে। প্রজার অবস্থা বিবেচনা করে কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ প্রজার ঋণও মুকুব করতেন। রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনার ফলেই ব্যবসায়ী ও মহাজনেরা তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়।

২. শিক্ষা :

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন গ্রামের অশিক্ষিত মানুষদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে তাঁর সামগ্রিক প্রয়াস ব্যর্থ হবে। গ্রাম উন্নয়ন তাঁর কাছে স্বরাজ সাধনার স্বতন্ত্র নামান্তর ছিল। শিলাইদহ থেকে ২৯ পৌষ, ১৩১৪ সালের একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অজিত কুমার চক্রবর্তীকে জানিয়েছেন—"আমি গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজ সাধনা করতে চাই—সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত ঠিক তারই ছোট প্রতিকৃতি।"[২৪] রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বরাজ অর্থে রাজনৈতিক স্বাধীনতা মাত্র নয়, দেশকে আত্মশক্তিতে স্বনির্ভর করে তোলাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রথীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—"বাইরে থেকে অজস্র টাকা ঢেলে কোনো কাজই করা যাবে না, গ্রামবাসী নিজেদের চেষ্টাতেই নিজেদের অবস্থার উন্নতি করবে, এইটেই ছিল বাবার উদ্দেশ্য।"[২৫] সেই আত্মশক্তিকে জাগ্রত করার প্রধান উপায় হিসেবে পল্লীর মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। শিক্ষা ছাড়া যে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে সাধারণকে ধারণা দান অসম্ভব, আত্মসম্মানবোধে উদ্বুদ্ধ করা অসম্ভব, সেকথা নবজাগরণের আলোকপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন, আমাদের "Individual courage was not enough. The cowardly attitude of the victims of injustice presented an almost insuperable obstacle."[২৬] অথচ আমাদের সমাজবিন্যাসের মধ্যেই এর মূল যে লুকিয়ে ছিল তা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি—

"Our society is split up into layers,and in every layer there are masters and servants. These masters at every step demand total subservience from their subordinates. Fear and slavery have thus been ingrained in us. Here lies the Ultimate cause of our personal and national humiliation."[২৭]

তাই তিনি দেশোন্নয়নের কর্মপন্থা নির্দেশ করে জানিয়েছিলেন—"The first task is to restore a sense of self-respect in individuals or instil it into them. Only when, in family surroundings as wel as in social life, we have regained our lost manhood, will an official really respect us and no longer dare treat us discourteously.We must respect our own people before we can expect others to respect them."[২৮] শিলাইদহ-পতিসরে এ বিষয়ে তাঁর প্রাথমিক প্রয়াস শুরু করেন—যার পূর্ণতর বিকশিত রূপটিকে আমরা পাই পরবর্তী সময়ে শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনের কর্মসূচিতে। এই পর্বে শিক্ষাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রপ্রয়াস সূত্রাকারে নিম্নরূপ:

ক. বিদ্যালয় স্থাপন :

শিলাইদহ-পতিসর পর্বে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে প্রথমে সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস নেন। তার জন্য গ্রামের মানুষের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রায় দু'শো নিম্ন ও অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নিজস্ব ব্যয়ে তিনি চারখানি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন যাতে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিমরাও শিক্ষিত হতে পারেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন-"একে একে প্রত্যেক গ্রামে অবৈতনিক পাঠশালা খোলা হল আর পতিসরে স্থাপিত হল একটি মাইনর ইস্কুল—পরে সেটা হাইস্কুলে পরিণত হয়।"[২৯] সুধীর সেন বলেছেন—

"Special attention was paid to the spread of education.Three school were established in addition to a girl's school.Besides,two or three *Tols* for the study of Sanskrit and many *pathasalas* or lower primary schools within the area were practically run with grants from the estate.Stress was also laid onphysical cuture and gymnasiums are opened for the purpose."[৩০]

খ. সংস্কৃতি চেতনার বিকাশ :

পূর্বোক্ত বিদ্যালয় সমূহে বিদ্যালয়ে পুঁথিগত শিক্ষাদানের পাশাপাশি গ্রামীণ মানুষের মনে ক্রমে দেশীয়সংস্কৃতি চেতনাকে গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়গুলিতে নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করার কথা বলেন।শিক্ষাব্যবস্থাকে আনন্দময় করে তোলাও তাঁর শিক্ষাচিন্তার অন্যতম পরিকল্পনা ছিল।তাই কবিতা,গান, অভিনয় শিক্ষারও বন্দোবস্ত করা হয় বিদ্যালয় গুলোতে।শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর বর্ণনায় পাই—"আমরা আমাদের ইস্কুলে আমাদের সেকেন্ড মাস্টার শ্রী রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও অনেক জিনিস শিখতাম, তার মধ্যে কবিতা আবৃত্তি ও অভিনয় প্রধান।"[৩১] রবীন্দ্রনাথ অবশ্য শিক্ষাকে দেশীয় সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও শিক্ষাক্ষেত্রে চেতনারবিশ্বমুখীন সমৃদ্ধি চেয়েছিলেন— "Thus here again we find what Tagore urged on so many occasions,namely , that in a rational system of education of the motto should be : from the concrete to the abstract and from one's own country to the world, and not the other way round."[৩২] পরবর্তী সময়ে এই পথেই তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে বিকশিত করে তোলেন,যার পরিণত রূপ ছিল বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা।

গ. কৃষিশিক্ষা :

কৃষিব্যবস্থাকে উন্নততর করে তোলার প্রয়াসে কৃষিসংক্রান্ত শিক্ষাদানও করা হত। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথের সহায়তায় যে কৃষিগবেষণার বন্দোবস্ত করেন, সেই কৃষিগবেষণাজাত নতুন নতুন চিন্তাচেতনাকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়। 'learning by doing' বা হাতে-কলমে শিক্ষার উপর রবীন্দ্রনাথ বেশি জোর দিয়েছিলেন। শিলাইদহের কৃষিখামারে পরীক্ষিত নতুন নতুন চাষাবাদ পদ্ধতি, জৈব ও রাসায়ণিক সারের ব্যবহার, জৈব সার উৎপাদন প্রণালী, কীটনাশকের ব্যবহার, জমি তৈরির বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত ধারণাকে মৌখিক ভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। কখনো বা লণ্ঠন লেকচারের দ্বারা সর্বস্তরের জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা করা হয়।

ঘ. নিরক্ষরতা দূরীকরণ :

রবীন্দ্রনাথ আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলার জন্য বালকদের নিয়েই 'ব্রতী বালক দল' গঠন করেন। এই বালক দল গ্রামের মানুষদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের দায়িত্বপালন করে। এই ব্রতী বালকদের এক একজনকে পল্লীর পাঁচখানা করে গৃহস্থের বাড়ির শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। 'ঐ বাড়িগুলোর বুড়োগুঁড়ো সবাইকে অ আ ক খ শেখানো আর কুঠিবাড়িতে

স্থাপিত প্রাইমারি ইস্কুলে ঐসব বাড়ির ছেলেদের পাঠানো'ই ছিল এক একজন ব্রতী বালকের দায়িত্ব। ফলে শিলাইদহ পর্বে বালকদের পাশপাশি বয়স্কদেরও পাঠদানের উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়। এই কারণে দিবাবিভাগের পাশাপাশি নাইটস্কুলের ব্যবস্থা করা হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞান অর্জনের নামান্তর মাত্র ছিল না। কারণ—

"To abolish illiteracy was recognized to be the first task. Then came the R's.Once sufficient progress had been made in reading, writing and arithmetic,it was considered time to begin lesions in history, geography etc. In teaching these subjects the main emphasis was laid on India though, incidentally, the history and geography of the world were covered."[৩৩]

এই পর্বে তাই অবসর সময়ে বিশ্বের খবরাখবর পাঠ করা হত এবং সে সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার বন্দোবস্ত ছিল। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী জানিয়েছেন—"মাঝে মাঝে সভা হত আমাদের। গ্রামের ও পাড়ার মানচিত্র, নদীনালার নক্সা—এই সবের সাহায্যে অধ্যক্ষেরা আমাদের দেশের অনেক তথ্য শেখাতেন।"[৩৪] পল্লীর ভিতর অগ্নিসংযোগ ঘটলে কীভাবে তার প্রতিকার করা যায়, বন্যার সময় প্রতিটি মানুষের সামাজিক দায়িত্ব কী—এই সকল বিষয়েও শিক্ষাদান করা হত।

ঙ. স্বাস্থ্য শিক্ষা :

এই পর্বের পল্লীশিক্ষার অন্তর্গত ছিল স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শরীর চর্চা করতে হত। পল্লীর নারী-পুরুষকে সুস্থ জীবনযাপনের দিশা নির্দেশের প্রয়োজনে প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে মুখে মুখে 'oral lesson' দেওয়া হত। এর জন্য বক্তৃতার আয়োজন করা হত। এ বিষয়ে পরবর্তী স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উপ-অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

৩. স্বাস্থ্য :

নগরজীবনের বাইরে রবীন্দ্রনাথ রোগ-শোক পীড়িত পল্লীর যে জীবনকে দেখেছিলেন তার ছবি ছিল বীভৎস ও ভয়ঙ্কর। গ্রীষ্মে পানীয় জলের অভাব একটা প্রকট সমস্যা ছিল। বর্ষায় গ্রামের চতুর্দিকের জঙ্গল জলে ডুবে পাতা-লতা পচে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়াত। গোয়ালঘর ও লোকালয়ের আবর্জনা বর্ষার জলে চারদিকে ভেসে বেড়াত। পাট পচানির গন্ধে চারদিক ভারাক্রান্ত ছিল। উলঙ্গ পেট-মোটা পা-সরু রুগণ ছেলে মেয়েরা

জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে প্রায়শই অসুস্থ হত। মশার ঝাঁক জলের স্তরের উপর যেন বাষ্পের মতন এক আস্তরণ বিছিয়ে দিত। ভিজে পোষাকে গ্রামের মেয়েদের এই পরিবেশের মধ্যেই কাজকর্ম করতে হত, সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সামলাতে হত। অথচ এই নারী সমাজের প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এক নিষ্ঠুর বর্বর ঔদাসীন্যকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে তাদের অনেকের প্রাণকে তিনি অকালে ঝরে যেতে দেখেছিলেন। সে সময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা আজকের মতো আধুনিক ছিল না। গ্রামীণ হাসপাতালের সংখ্যাও ছিল অপ্রতুল। তদুপরি গ্রামীণ মানুষদের ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, জলপড়া, তাবিজ-কবজে অন্ধ বিশ্বাস। নানা কুসংস্কার মানুষের মৃত্যুর হারকে বহুগুণিত করে তুলেছিল। ব্যাধি ও চিকিৎসা বিষয়ে গ্রাম্য মানুষগুলির নির্বিকার উদাসীন মনোভাবও জীবন-বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ ছিল। ফলে অসুখ-বিসুখে গ্রামের মানুষের নাজেহাল দশার অন্ত ছিল না। পল্লীজীবনের এমন বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের একাধিক চিঠিতেই ছড়িয়ে আছে। এমতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা সূত্রাকারে নিম্নরূপ :

ক. স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি :

রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ মানুষদের মনের পরবর্তন আনার জন্য সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রচারের বন্দোবস্ত করলেন। হেল্‌থ টক্ (Health talk) বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরামর্শ দানের ব্যবস্থা করেন। এ কাজে ব্রতী বালকদলের উপর দায়িত্ব বর্তেছিল। এই ব্রতী বালকদলের একজন হয়ে কাজ শুরু করা শচীন্দ্রনাথ অধিকারী জানিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের ভাগে পাঁচটি করে বাড়ির দায়িত্ব দেওয়া হত, যে সকল বাড়িতে গিয়ে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিষয়ে তাদের পরামর্শ দিতে হত। তাদের পরামর্শ যে সব সময় পল্লীর মানুষ শুনতো তা নয়, তবে অনেকেই সেই পরামর্শে উপকৃত হয়েছিল। তবে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের নিজেদের ভিতর থেকেই এর জন্য একটা তাগিদকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাদেরকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নেন।

খ. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঘোষণা :

তিনি সব বাধা বিপত্তিকে সরিয়ে শিলাইদহে ঘোষণার দ্বারা জানান যে, ঝাড়ফুঁক তুকতাক দৈব ওষুধ ইত্যাদির প্রয়োগ চলবে না। সামান্য অসুখ বিসুখ করলে কুঠিবাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। অসুখ বাড়াবাড়ি হলে রুগীকে সরকারী ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হবে। লিফলেট বিলি করে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা উপদেশ বা ঘোষণাকে রবীন্দ্রনাথ গৃহস্থের বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন।

গ. তথ্য সংগ্রহ :

গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ব্রতী বালকদল বা কর্মীদের দ্বারা গ্রামের পরিবার সংখ্যা, শিশু সংখ্যা, রোগের খতিয়ান, জন্ম-মৃত্যুর হার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট কার্ড তৈরির পরিকল্পনাও করেন রবীন্দ্রনাথ। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী জানিয়েছেন—"......প্রত্যেক বাড়ির মালিকের নাম,পরিবার সংখ্যা, জাতি, বয়স স্ত্রীপুরুষ, বালক বালিকাদের সংখ্যা, চাষের জমি, আয়ের উপায় ও পরিমাণ,গরু বাছুর মহিষের সংখ্যা, রোগের বিবরণ, জন্মমৃত্যু ইত্যাদি বিবরণ আমরা সংগ্রহ করতাম; অধ্যক্ষেরা তাই লিখে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখাতেন। পরবর্তীকালে পল্লীসংগঠনের কাজে শ্রীনিকেতনে যে বিধিবদ্ধ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করতেন তার সঙ্গে আমাদের এই পল্লী তথ্য সংগ্রহের আয়োজনের অনেকখানি মিল আছে।"[৩৫]

ঘ. হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা :

কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ প্রজাদরদী জমিদার হিসেবে মানুষের হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করতেন। বিশেষ করে চিকিৎসা সংক্রান্ত হোমিওপ্যাথির বই পড়ে, ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনার সূত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ প্রাথমিক চিকিৎসার দ্বারা গ্রামের বহু মানুষ, নিজের সন্তান, আত্মীয়-পরিজনের অনেককেই সুস্থ করে তোলেন। ম্যালেরিয়ার বা কলেরার মত মড়কে যখন গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেত তখন সাধারণের কাছে এই ঔষধই একমাত্র ভরসা হয়ে উঠত। এই লোকসেবার মধ্য দিয়েই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়ির জমিদারির বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ বা প্রজা অসন্তোষকে কাটিয়ে অনেকটা সাধারণ মানুষের আপনজন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। মীরা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন—

" বোটে থাকতে বাবার কাছে অনেক প্রজা হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিতে আসত। হোমিওপ্যাথিতে বাবার বেশ হাত ছিল, যাকে যাকে ওষুধ দিতেন বেশ সেরে যেত। পদ্মার চরে মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো ছোটো গ্রাম দেখা যেত, এরা সেখান থেকে আসত। ওখানে বেশিরভাগ প্রজা মুসলমান। মুসলমান মেয়েরা বড়ো একটা পুরুষের সামনে বেরোয় না কিন্তু ওখানে দেখতুম অনেক মুসলমান মেয়ে বাবার কাছে ওষুধ নিতে আসত। আমাদের প্রজারা বাবাকে বাপের মতো ভক্তি করত, কেননা জানত যে তাঁর কাছে সুবিচার পাবে।"[৩৬]

পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচী যখন সুরুলে স্থানান্তরিত হয়, সেখানেও চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথকে একই ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। একথা ঠিক , রবীন্দ্রনাথ পাশ করা ডাক্তার ছিলেন না । ফলে কখনো কখনো হোমিওপ্যাথির উপর প্রগাঢ় ভক্তির মূল্য দিতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে—" বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি দৃঢ়

বিশ্বাসও তাঁর ছিল। যথা, হোমিয়োপ্যাথি এবং বায়োকেমিক। নিজে অনেককে ওষুধ দিতেন এবং তাতে উপকার হয়েছে শুনলে খুব খুশি হতেন। কাকিমার শেষ অসুখে এক হোমিয়োপ্যাথি ধরে রইলেন ও কোনো চিকিৎসা বদল করলেন না বলে কোনো কোনো বিশিষ্ট বন্ধুকে আক্ষেপ করতে শুনেছি।"[৩৭]

ঙ. দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা :

রবীন্দ্রনাথ পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য মেনে পল্লীর মানুষের চিকিৎসা করার জন্য বহু টাকা ব্যয় করে গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়ো প্রতিষ্ঠা করেন। সেই চিকিৎসালয়ে সুযোগ্য ডাক্তারও নিয়োগ করেন। এইভাবে পতিসর, কামতা ও রাতোয়ালে তিনটি হাসপাতাল ও তিনটি দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর জন্য কিঞ্চিৎ খাজনা বৃদ্ধি করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে এবং তা প্রজাদের বিক্ষোভের কারণও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত প্রজাদের বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন এই বলে যে, বর্ধিত খাজনা তাদেরই কল্যানে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয়িত হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথা রেখেছিলেন বলে প্রজারা তা শেষ পর্যন্ত সানন্দে স্বীকার করে নিয়েছিল। দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারা গ্রামের মানুষদের বিপুল উপকার সাধিত হয়। বিরহামপুরে রবীন্দ্রনাথ যে 'মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়' স্থাপন করেন সে সম্পর্কে কবির পল্লী উন্নয়ন কর্মের অন্যতম প্রধান শরিক শচীন্দ্রনাথ অধিকারী জানিয়েছেন – "চিকিৎসাভবনের একটা অংশ ইনডোর হাসপাতালে রূপান্তরিত করার প্রবল ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের ছিল, কিন্তু আউটডোর চিকিৎসার ব্যয়বাহুল্য হেতু সেটা সম্ভবপর ছিল না। তবু আমরা দেখেছি, পদ্মানদীর কোলে কুমিরে ধরা চাষীর জীবনরক্ষার জন্য দুই মাসের জন্য হাসপাতালে ইন্ডোর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় এবং রোগী আরোগ্য লাভ করে।"[৩৮]

চ. অর্থ সংগ্রহে অভিনব পদ্ধতি :

চিকিৎসা বিষয়ে অর্থ সংগ্রহের এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেন রবীন্দ্রনাথ। বিভিন্ন গুরুতর অপরাধে অপরাধীর বিচার করে অনেক্ষেত্রে তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। সেই অর্থ রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের চিকিৎসার্থে ব্যয় করতেন। সুধীর সেন জানিয়েছেন—"In addition another source of income soon began to be tapped. In many parts of Bengal it was, as it is still is, the custom that anybody guilt of some violation of social rules or traditional should pay a penalty which often took the form of an expensive feast. Tagore arranged that a guilty person could from now on get off by paying a modest some to The Welfare Fund and would no longer be required to

incur the heavy expences of a social feast. Money collected in the Fund was, of course, utilized for public services. Thus, the amended system of social punishment lessoned the strain of individuals and at the same time produced funds for general welfare.”[৩৯]

ছ. অন্যান্য ব্যবস্থা :

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ-পতিসর পর্বে শিশুমৃত্যু রোধেও ব্যাপক প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রতিটি বাড়িতে কার কি রোগ, কোন রোগে কতজন শিশু মারা গেছে তার পরিসংখ্যান তৈরির ব্যবস্থা করেছেন ও সেই অনুপাতে শিশু মৃত্যুরোধের জন্য প্রয়াস নিয়েছেন, যা তাঁর শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে আরো ব্যপক আকার নিয়েছে। ব্রতীদল এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি এই পর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। সীমিত অর্থনৈতিক সক্ষমতায় বহুসন্তান প্রসব যে তাদের সার্বিক সুষম বিকাশের অন্তরায় সেই সময়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। রোগ জীবানুর সংক্রমণ পল্লীজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। তাকে এড়ানোর জন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ নানা প্রকার সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সংক্রামক ব্যাধি যাতে পল্লীর মধ্যে ছড়াতে না পারে তার জন্যও যথাযথ উদ্যোগ নেন।

৪. বিচারব্যবস্থা :

রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ আগমনের পূর্বে গ্রামে সালিশী সভা বিচার কার্য পরিচালনা করতো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ-শাহজাদপুরে সেই বিচার ব্যবস্থাকে পরিমার্জিত নতুন রূপ দান করেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর বর্ণনা দিয়ে জানিয়েছেন—

“তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যখন জমিদারির কাজ দেখতে আরম্ভ করেন প্রথমেই প্রজাদের মধ্যে সালিশি বিচারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বিরাহিমপুর ও কালিগ্রাম—এই দুই পরগনায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি করে বিচারসভা স্থাপন করেন। প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ ঘটলেই উভয়পক্ষকে এই বিচারসভায় উপস্থিত হতে হবে এই নিয়ম হল। প্রজারা ফৌজদারি ছাড়া অন্য কোনোরকম মামলা নিয়ে আদালতে যাবে না। কেউ এই নিয়ম অমান্য করলে গ্রামবাসীরা তাকে একঘরে করবে, তার সঙ্গে কোনো সামাজিকতা রাখবে না। এই বিচারসভার বিচারে অসন্তুষ্ট হলে আপিলের সুযোগ দেওয়ারও ব্যবস্থা করা

হল। প্রজাদের সম্মতিক্রমে সমস্ত পরগনার জন্য পাঁচজন সভ্য নিয়ে একটি আপিল-সভা নির্বাচিত হল। এই পাঁচজনকে পঞ্চপ্রধান বলা হত। পঞ্চপ্রধানের বিচারে সন্তুষ্ট না হলে শেষ আপিল ছিল স্বয়ং জমিদারের কাছে। বিচারের জন্য বাদী বা বিবাদীর কোনো ব্যয় বহন করতে হত না, কেবল দরখাস্ত করার কাগজ কেনার জন্য সামান্য মূল্য দিতে হত।এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল প্রজারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে ফেলবে—আদালতে যাবে না। বিচারের নথিপত্র রীতিমতো রাখা হত, সেগুলি সযত্নে ফাইল করে রাখার সাহায্য করত জমিদারির সেরেস্তা।

আদালতের সাহায্য ছাড়া বিনা ব্যয়ে বিনা বিলম্বে মামলার বিচারের এই ব্যবস্থা আরম্ভ হবার শুরু থেকেই প্রজারা এর উপকারিতা অনুভব করেছিল। তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছিল বলেই দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই ব্যবস্থা এত অনায়াসে চলেছিল। ছোটো বড়ো কোনোরকম বিবাদ নিয়ে আদালতে নালিশ করতে যাওয়া তারা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিল। দেওয়ানি বিচারের ভার প্রজারা নিজেরাই নিয়েছে বলে গবর্ণমেন্ট কখনো আপত্তি তোলে নি বরং উৎসাহ দিয়েছে।”[৪০]

৫. সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন :

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবতাবাদী কবি, অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী। কিন্তু শিলাইদহ-সাহজাদপুরের পল্লী জীবনে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিস্তর বিভেদের প্রাচীর। পারস্পরিক বিদ্বেষ ও কলহ রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন তথা দেশোন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই তিনি চেয়েছিলেন এই বিভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে। নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক উৎসবে হিন্দু-মুসলিমকে এক করে পল্লীর ঐক্য ও শক্তিকে বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন, পল্লীর ভিতর প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। তাই গ্রামীণ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রাথমিক ভাবে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন মেলার আয়োজন করেন যা তাঁর পল্লী উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে বহুব্যাপ্তিতে ধরা দেয়। মেলাগুলি শুধু যে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের মাধ্যম ছিল তা নয়, এগুলি গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশেও সহায়ক হয়ে উঠেছিল। শিলাইদহের ‘কাত্যায়নীর মেলা’ (১৯০৫) এবং ‘রাজরাজেশ্বরীর মেলা’র (১৯০৭) নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ‘কাত্যায়নীর মেলা’র যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে এর স্পষ্ট পরিচয় মেলে—

“কবি-জমিদার মাথা ঘামাচ্ছেন শিলাইদহে খুব প্রকাণ্ড একটা মেলা করতে হবে। পল্লীর আমোদ-প্রমো, কুটিরশিল্প, শরীর চর্চা, আনন্দ আর শিক্ষা হবে তার অঙ্গ। আমার বাবা (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী) কুঠিবাড়িতে কিছুকাল শমীন্দ্রনাথকে পড়িয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ

এই প্রসঙ্গে কারো কাছে বিশেষ সাড়া পান নি। তিনি বাবাকে বললেন, "গাঁ গুলো মরে গেছে, জাগাতে হলে বেশ বড় একটা মেলা করা দরকার'। বাবা অপ্রত্যাশিতভাবে একথা শুনে লাফিয়ে উঠলেন। তিনিও তরুণ। রবীন্দ্রনাথ সব প্ল্যান বুঝিয়ে দিলেন; বাবা একেবারে উৎসাহে মেতে উঠলেন। তখন তিনি গ্রামের ইস্কুলের হেডমাস্টার, গ্রামের পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট ও অধিকারী পরিবারের কর্তা রবীন্দ্রনাথ ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন।

পাঁজিপুঁথি শাস্ত্রপুরাণ ঘেঁটে কিছু হল না। দারুণ উৎসাহ, দেরি হলে হয়ত জুড়িয়ে যাবে। ভেবে চিনতে ঠিক হল 'কাত্যায়নীর' মেলা হবে। মা দুর্গাই কাত্যায়নী। শীত পড়েছে, কিন্তু মা দুর্গার মতই প্রতিমা তৈরি হল কাত্যায়নীর। সে যে কী বিরাট বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা, কি বলব! গোপীনাথ মন্দিরের সামনে 'খোলাটে' প্রকাণ্ড মণ্ডপ তৈরি হল, প্রতিমা তৈরি হল। সময়ের অভাব, তাই রাত্রে গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে গাঁয়ের মুরুব্বি, ছেলেবুড়ো সবাই খাটছেন। আহার নিদ্রা ভুলে গেছেন। যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালি, কবি, তরজা, কীর্তন, বাউল ইত্যাদির বিরাট আয়োজন সাতদিন ধরে। মেলা দীর্ঘদিন চালাবার জন্যে কেউ বললেন মেলার নাম হোক 'করোনেশন মেলা'। রবীন্দ্রনাথের ঘোর আপত্তিতে নাম হল 'কাত্যায়নীর মেলা' কামার, কুমোর, ছুতোর মিস্ত্রি, জোলা সবাইকে ডাকা হল তাদের শিল্প সম্ভারে মেলা সাজাতে। লেঠেল, কুস্তিগিরদের আনা হল তাদের কসরৎ দেখাবার জন্য।"[৪১]

ঠিক একই ভাবে শিলাইদহে অনুষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরীর মেলার আয়োজনেও অনুরূপ ছবিকেই খুঁজে পাওয়া যায়। এই মেলার বর্ণনা দিয়ে শচীন্দ্রনাথ মহাশয় জানিয়েছেন—" দশমহাবিদ্যার 'ষোড়শী' মূর্তি তৈরি হল। নূতন করে প্রকাণ্ড পাকা মণ্ডপ তৈরি হল। জমিদারির মধ্যে যত প্রকার পল্লীসুলভ আমোদ-প্রমোদের দল ছিল তাদের সকলকে আনা হল, পল্লী-শিল্পীদের আনা হল, তারা ভারে ভারে তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে মেলা সাজাল, এবারে কলকাতা থেকে ত্রৈলোক্যতারিণী আর প্রসন্ন নিয়োগীর যাত্রার দল আনা হল। লেঠেল, কুস্তিগিরদের আনা হল।"[৪২]

৬. গ্রাম সংগঠন :

পূর্বোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও গ্রামের শাসন কার্যের সামগ্রিক দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে যে বাংলার পল্লীগুলোকে যথাযথ ভাবে সংগঠিত করার কাজে দেশপ্রেমী সকল মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পাবনায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনীর অনুষ্ঠানে দেশের ভবিষ্যৎ কর্মবিধি কোন পথে পরিচালিত হবে তার জন্য পনের দফা নির্দেশিকা রচনা করে জানিয়েছেন, যা তাঁর 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। যাইহোক,

এই পর্বে গ্রামসংগঠনের স্বার্থে গৃহীত রবীন্দ্রনাথের অপরাপর কার্যসূত্রগুলিকে নিম্নোক্ত বিন্যাস দেওয়া যেতে পারে :

ক. 'মণ্ডলী প্রথা'র প্রবর্তন :

রবীন্দ্রনাথ পল্লীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার জন্য ১৯০৭-১৯০৮ সাল নাগাদ পুরাতন জমিদারি ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে 'মণ্ডলী প্রথা'র প্রবর্তন করেন। এই প্রথার প্রবর্তনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ পল্লী উন্নয়নের কর্মসূচিকে একটি সুবিন্যস্ত রূপ দানের প্রয়াস নেন। রথীন্দ্রনাথ এই 'মণ্ডলী প্রথা'র স্বরূপ সম্পর্কে জানিয়েছেন—

"বাবা প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ মেটাবার একটা পদ্ধতি প্রচলন করেছিলেন। প্রত্যেক গ্রামে বাসিন্দারা তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন প্রধান মনোনীত করত। ঐ গ্রামের প্রধানরা আবার পরগনার পঞ্চপ্রধানকে মনোনীত করত। অল্পস্বল্প ঝগড়াঝাটি গ্রাম-প্রধানরাই মিটিয়ে দিত। মারামারি বা জমিজমা নিয়ে মোকদ্দমা যেত পঞ্চপ্রধানের কাছে বিচারের জন্য। শেষ আপিল ছিল স্বয়ং জমিদারের কাছে। কর্মচারীদের বিচারের কোনো অধিকার ছিল না। বাবা এই ব্যবস্থা প্রচলন করার পরে তা বহুকাল ধরে চলেছিল—প্রজারাও খুশি হয়ে মেনে নিয়েছিল, সরকারি আদালতে এর চেয়ে সুবিচার পাবে তারা বিশ্বাস করত না। বিচারে অসন্তুষ্ট হয়ে কোনো পক্ষ আদালতে গিয়ে নালিশ করলে গ্রামবাসীরা তাকে সমজচ্যুত করে শাস্তি দিত। এই বিচার পদ্ধতিতে প্রজারা সন্তুষ্ট ছিল তার আরো একটি কারণ—অযথা মামলা-মোকদ্দমার খরচ থেকে তাঁরা বেঁচে যেত।"[৪৩]

খ. সভা-সমিতি স্থাপন :

'মণ্ডলীপ্রথা'কে সার্থক করে তোলার প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ-শাহজাদপুরে একাধিক সভাসমিতি গঠন করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কালীগ্রাম হিতৈষী সভা'। কালীগ্রামের তিন পরগণার সকল প্রজারা মিলে এই সভা গঠন করে। এছাড়া প্রত্যেক বিভাগের প্রজারা একটি করে 'বিভাগীয় হিতৈষী সভা'ও প্রতিষ্ঠা করে। এই সভাগুলির সংগঠন ও কার্যধারার বর্ণনা দিয়ে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

" প্রজারা হিতৈষী সভার কাজ চালাবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজেরা চাঁদা দিচ্ছে। চাঁদা আদায়ের জন্য তাদের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি, তার জন্য ব্যয়ও কিছু হয় না। খাজনা আদায়ের সময় তারা খাজনার প্রতি টাকার সঙ্গে তিন পয়সা অতিরিক্ত দেয়। অতিরিক্ত এই আয় হিতৈষী সভার নামে পৃথক তহবিলে রাখা হয়। হিতৈষী সভার সমস্ত কিছু কাজ বিভাগ

থেকে করা হয় বলে আদায়ী টাকা তিন অংশে ভাগ করে তিনটি বিভাগীয় হিতৈষী সভার হাতে দেওয়া হয়। সভার পক্ষ থেকে সেখানে বেতনভোগী একজন করে কর্মচারী রাখা হয়েছে।

কালীগ্রামে গ্রামসংস্কার-প্রতিষ্ঠানের গঠন এইভাবে করা হয়—প্রত্যেক গ্রামের বাসিন্দারা সেই গ্রামেরই একজন প্রবীণকে প্রধান বলে নির্বাচিত করে। প্রতি বিভাগে যতগুলি প্রধান নির্বাচিত হয় তাদের সকলকে নিয়েই বিভাগীয় হিতৈষী সভা গঠিত।

তিন বিভাগের প্রধানরা মিলে পাঁচজনকে কেন্দ্রিয় হিতৈষী সভার সভ্য নির্বাচন করে। তাদের বলা হয় পরগনার পঞ্চপ্রধান। এই পাঁচজন ছাড়াও কেন্দ্রিয় সভায় জমিদারের একজন প্রতিনিধি থাকে। হিতৈষী সভার সভ্যের সংখ্যা পরে বাড়ানো হয়।

সাধারণত বছরে একবার কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার মিটিং হয়। এত কাজ থাকে যে সমস্ত দিন সভা করেও অনেক কাজ শেষ হয় না। প্রথমত গত বছরের হিসাব পরীক্ষা করা হয়, যে টাকা ব্যয় হয়েছে তাতে কী কাজ কতখানি হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়। তারপর আগামী বছরের জন্য কাজের প্রোগ্রাম স্থির করা ও সেই অনুযায়ী খরচের বাজেট প্রস্তুত করা। বার্ষিক সভার এই দুটি হল প্রধান কাজ—আর-একটি কাজ ছিল জমিদারি পরিচালনায় কর্মচারীদের কোন ত্রুটি বা প্রজাদের প্রতি অত্যাচার ঘটলে জমিদার মহাশয়কে সে বিষয়ে জানানো।

টাকায় তিন পয়সা চাঁদা থেকে হিতৈষী সভার পাঁচ-ছ হাজার টাকা বার্ষিক আয় ছিল। প্রজাদের উৎসাহ দেবার জন্য, বাবা বললেন, এস্টেট থেকে তিনি আরো দু হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হিতৈষী সভার জন্য যে টাকা উঠত প্রজারা তাকে 'সাধারণ ফণ্ড' বলত। আমার যতটা মনে পড়ে চাঁদার হার পরে বাড়ানো হয়েছিল ইস্কুল ডিস্‌পেনসারি প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।”[৪৪]

৩. রাস্তাঘাট নির্মাণ :

শিলাইদহ পর্বে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর অপর উল্লেখযোগ্য দিক ছিল যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন। গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য পল্লীর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন যে নিতান্ত জরুরী সেকথা ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি দেখেছিলেন বর্ষার সময় শিলাইদহ-পতিসরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের তলায় ডুবে থাকে। ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যার অন্ত ছিল না। এ কারণে তিনি একাধিক বাঁধ নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রয়াস নেন। তখন কুষ্ঠিয়া স্টেশন থেকে শিলাইদহ পৌঁছতে হত নৌকা বা স্টীমারের সাহায্যে গরাই নদী অতিক্রম করে। তাই

শিলাইদহ-কুষ্ঠিয়া রাস্তাটি রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেন। কালিগ্রাম পরগনার ছবিটিও প্রায় অনুরূপ। তাই রবীন্দ্রনাথ গ্রামে যে হিতৈষী সভা গড়ে তোলেন তাদের মাধ্যমে রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রয়াস নেন। রথীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে লিখেছেন-

“কালীগ্রাম পরগনা চলনবিলের সংলগ্ন। বর্ষাকালে শস্যখেত সমস্তই জলমগ্ন হয়ে যায়, গ্রামগুলি উঁচু জমির উপর, দেখতে এক একটা দ্বীপের মতো। বাবা বললেন, তুই তো দেখেছিস রাস্তা কোথাও নেই—গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে গেলে ধান খেতের আল ধরে হেঁটে যাতায়াত করতে হয়, বর্ষার দিনে নৌকা বেয়ে ধানের উপর দিয়ে সর্বত্র যাওয়া-আসা চলে। সাধারণ ফন্ড থেকে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি রাস্তা তৈরি করা আরম্ভ হয়ে গেছে। পতিসর থেকে আত্রাই স্টেশন পর্যন্ত সাত মাইল সদর রাস্তা এস্টেট থেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা হচ্ছে।এই রাস্তা প্রস্তুত করতে বহু টাকা খরচ—সাধারণ ফণ্ড থেকে এই ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়।”[৪৫]

৪. জলসংস্কার :

চাষের জলের পাশাপাশি পানীয় জলের সঙ্কট পল্লীর মানুষদের নিত্য দিনের সমস্যা ছিল। সুধীর সেন জানিয়েছেন—“Scarcity of drinking water had caused great hardship in certain parts of Bengal and the public had looked up to the Government for help. The disappointing official response impelled him (Tagore) to examine why unlike in the past, people had come to depend exclusively on the state for such welfare work as the supply of water.”[৪৬] রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন অতীতে আমাদের দেশে জলকষ্ট ছিল না। সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল জনগণ। কিন্তু বর্তমানে মানুষের মধ্যে সেই সক্ষমতাটুকুও যেন নেই। তাই জমিদারির বিভিন্ন স্থানে তিনি একাধিক কূপ খননের বন্দোবস্ত করেন । নানা সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যেও শিলাইদহের জোয়ারপুর, কালোয়া, কাঁদাবাড়ি, জাহেদপুরে সামান্য সরকারি সাহায্যের দ্বারা চারখানি কূপ খনন করেন। এর জন্য কৃষকদের কাছ থেকে ‘কল্যাণবৃত্তি’ নামে একটি কর গ্রহণ করা হত—যার মধ্যে অপরাপর কতকগুলি করের অংশও মিশে ছিল। শুধু কূপ খনন নয়, পল্লীর ডোবাপুকুরগুলির সংস্কারের পাশাপাশি নতুন পুকুর খননেরও বন্দোবস্ত করেন। গ্রামের বুজে যাওয়া ড্রেনগুলির সংস্কার সাধন করে সেগুলির সঙ্গে পদ্মার সংযোগ নির্মাণেরও ব্যবস্থা করা হয়। প্রখর গ্রীষ্মে দেড় ক্রোশ পথ অতিক্রম করে এক কলসি জল সংগ্রহের কষ্টকর যাতনা থেকে, জলসঙ্কট থেকে রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাসীকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত হিতৈষী সভা এ বিষয়ে কবিকে যথেষ্ট সহায়তা করে। রথীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—“যেখানে পানীয় জলের অভাব

সেখানে কূপ খনন করে দেওয়া প্রভৃতি সাধারণের উপকারার্থে নানান কাজে হিতৈষী সভা ক্রমশ হাত দিচ্ছে।”[৪৭]

৫. জঙ্গল পরিষ্কার :

পল্লীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল নানাপ্রকার আগাছায় পরিপূর্ণ ছিল। এই আগাছার জঙ্গল ছিল মশা-ম্যালেরিয়ার পীঠস্থান। বিশেষতঃ বর্ষার দিনে এই আগাছা গুলো যখন জলে ডুবে যেত তখন তার পচন পল্লীর জল-বাতাসকে দূষিত করে তুলে নানারকমের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটাত। তাই রবীন্দ্রনাথ যে ব্রতী বালকদল গঠন করেন তাদের মাধ্যমে পল্লীর জঙ্গল-আগাছা সাফ করে, রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে নির্মল গ্রাম গড়ে তোলার প্রয়াস নেন।

৬. ধর্মগোলা স্থাপন :

শিলাইদহ-পতিসরের বিস্তৃত অঞ্চল নদ-নদী খাল-বিলে পরিপূর্ণ ছিল। তাই এই অঞ্চলে বর্ষাকালে অনেক সময়েই বন্যার কবলে পড়তে হত সাধারণ মানুষদের। এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কতৃক দুঃস্থদের জন্য সাহায্যার্থে টাকা তোলার প্রসঙ্গ মনে আসে। যাইহোক, বন্যা কিংবা খরার সময় পল্লীর কৃষকেরা চরম অন্নকষ্টে ভুগতেন। তাই রবীন্দ্রনাথ ধর্মগোলা স্থাপন করে সেই অন্নকষ্ট নিবারণের প্রয়াস নেন। সুসময়ের সঞ্চিত ফসলকে অসময়ে কাজে লাগাবার এই পরিকল্পনাটি পল্লীর জীবনে খুবই কার্যকরী হয়েছিল।

খ. শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্ব :

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ-পতিসরে পল্লিউন্নয়ন কর্মে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাকে উপজীব্য করে পল্লীপুনর্গঠন পরিকল্পনাকে পূর্ণ পরিণত রূপ দানে প্রয়াস নেন শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে। ১৯১৫-১৬ সাল নাগাদ ঠাকুরবাড়ির জমিদারি শরিকদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হবার পর কবির প্রিয় শিলাইদহের জমিদারি হাতছাড়া হয়ে যায়। পারিবারিক সমস্যা, ক্রমবর্ধমান ঋণের চাপ, পাটের ব্যবসায় নেমে বিশ্বাসঘাত জনিত কারণে অকৃতকার্যতা কবিকে বাধ্য করেছিল শিলাইদহ ছেড়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করতে। ইতিপূর্বে ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ রায়পুরের কর্ণেল নরেন্দ্রপ্রসন্নের কাছ থেকে সুরুলের কুঠিবাড়িটি ক্রয় করেন। এর মূলেই কিন্তু ছিল রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণ পল্লীসংগঠন

প্রকল্পকে সফল ও পূর্ণতর রূপ দেওয়া। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় জারি ছিল। মঞ্জুলা বসু এ প্রসঙ্গে তাই জানিয়েছেন—

" Later, even when Tagore moved to Santiniketan and devoted most of his energy to building up the school there, the thought of rural development never left him. In 1912 a twenty-bigha plot of land had been purchased in the village of Surul near Santiniketan. Since 1914 several experiments had been made to promote an institute for rural development there, but all such efforts had floundered due to some reason or other."[৪৮]

কিন্তু শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে পল্লীউন্নয়ন কর্মে স্বতন্ত্র সফলতা আসে কৃষিবিজ্ঞানী লিওনার্ড এলম্‌হার্স্টের যোগদানের পর। শ্রীনিকেতনে এলম্‌হার্স্টের কাজে সহায়তা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন কয়েকজন পরিশ্রমী যুবক। এদেরকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এলমহার্স্টের সহায়তায় একটি কমিটি গঠন করে তাঁর শিলাইদহ পর্বের অসম্পূর্ণ পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীকে সফল রূপ দেবার প্রয়াস নেন। মঞ্জুলা বসু জানিয়েছেন—

"Elmhirst arrived at Santiniketan on 28th November, 1921. He started for Surul on 5th February 1922 with a batch of ten students. From the beginning he had able associates from among the Indians in Rathindranath Tagore, Kalimohon Ghosh, Gourgopal Ghosh , Suren Kar and Santosh Mazumdar.

In his Dairy (Dtd. Nov. 30, 1921, Poet and Plowman p.60) Elmhirst informs us that he name "School of Agriculture" was first suggested for the Institute of Srul. The Chancellor was Rabindranath Tagore. The Executive committee consisted of Santosh Chandra Mazumdar, Rathindranath Tagore, Gourgopal Ghosh and L.K. Elmhirst. Elmhirst was also entitled Director. "After some months", writes Elmhirst," We called ourselves an 'Institute of Rural reconstruction' but we were later named by Tagore Sriniketan which is Sanskrit for "The Abode of Plenty.""[৪৯]

শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মধ্যেই পল্লী-উন্নয়ন কর্মসূচীকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। তিনি

চেয়েছিলেন '.....complete development of the rural human being, self-esteem and self reliance being the props of physical, mental and socio-economic fulfillment and the regenerated people, conscious of their past heritage and tradition would, at the same time, be able to make full use of modern science and technology.'[৫০] একারণে এই পর্বের রবীন্দ্রকৃত পল্লী-উন্নয়নের কর্মসূচীকে দুটি সতন্ত্র বর্গে বিন্যস্ত করা যেতে পারে—

ক. আত্মিক উন্নয়ন।

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

ক. আত্মিক উন্নয়ন :

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন পল্লীর মানুষকে তাদের 'আত্মশক্তি'তে প্রতিষ্ঠিত করতে। মানুষের মধ্যেকার শক্তির সুষম বিকাশ ঘটুক— রবীন্দ্রনাথের এটি প্রধান অভিপ্রায় ছিল। আপন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গ্রামগুলি স্বনির্ভর হয়ে উঠুক— এটাই রবীন্দ্রনাথের কাছে 'স্বরাজ' সাধনার নামান্তর ছিল। কিন্তু এ কাজে অগ্রসর হয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন গ্রামীণ মানুষেরা কীভাবে পরস্পর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন, জাত-পাত-কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। ধনী-নির্ধনের পারস্পরিক অশ্রদ্ধা-ভয়-সন্দেহ ঐক্যবদ্ধ স্বনির্ভর গ্রামসংগঠনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় ছিল। মানুষের অশিক্ষা-অজ্ঞানতায় কীভাবে শক্তির অপচয় ঘটে, কীভাবে অলঙ্ঘ্য ভবিতব্যতার যূপকাষ্ঠে মানুষ নিজেকে সঁপে দিয়ে ধীর অথচ অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় তার ছবিকেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পল্লীর মানুষের এই দুরবস্থা দূরীকরণে তাই রবীন্দ্রনাথ সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলিকে নিম্নোক্ত সূত্রাকারে তুলে ধরা যেতে পারে—

১. শিক্ষা :

শিলাইদহ-পতিসরে গ্রামীণ মানুষদের জীবনে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায় যে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তাকে পাথেয় করে শান্তিনিকেতন- শ্রীনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষা পরিকল্পনা করেছিলেন। শিক্ষার প্রসারের জন্য এবং তাকে সর্বাঙ্গীন করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে যে চারটি শিক্ষাবিভাগ গড়ে তোলেন চূড়ান্তভাবে সেগুলিকেই শিক্ষাপ্রসারের মূল চতুর্কাঠামো হিসেবে স্বীকার করা হয়। এই চারটি বিভাগ এবং তাদের কার্যধারা নিম্নরূপ :

i. শিক্ষাসত্র :

শান্তিনিকেতনে ১৯২৪ সালে সন্তোষচন্দ্রের নিজের বাড়িতে ৬ জন ছাত্রকে নিয়ে যে শিক্ষাসত্রের সূত্রপাত ঘটে ১৯২৬-এ তাঁর অকালমৃত্যুতে তা শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়। ইন্দুসুধা ঘোষ, বিনায়ক মাসোজি, প্রেমচাঁদ লাল, মারজোরি সাইকস, ধীরানন্দ রায় ও সমীরণ চট্টোপাধ্যায় ক্রমে শিক্ষাসত্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসত্রের মধ্যস্থতায় গ্রামের দুঃস্থ ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। কেবলমাত্র গ্রামের দুঃস্থ শিক্ষার্থীরাই এখানে প্রবেশাধিকার লাভ করতেন। মহিলারা, যারা বাড়ির বাইরে বেরোতে পারতেন না, তাদের জন্য রবীন্দ্রনাথ ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করেন। এ বিষয়টি বিস্তৃত ভাবে পরে আলোচিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের এখানে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হত যাতে তাঁরা নিজেদের জীবিকার সংস্থান গ্রামে বসে নিজেরাই করে নিতে পারেন। প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি এখানে বাসস্থান ও শৌচাগার নির্মাণ, রান্না, স্বাস্থ্যশিক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সেলাইয়ের কাজ, আগুন নেবানো, তাঁতের কাজ, বই বাঁধাই, চামড়ার কাজ, পশুপালন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। তাছাড়া—

"কৃষিবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয় ভূবিদ্যা, পতঙ্গবিদ্যা, জীবাণুনাশক, সার বা চুন প্রয়োগ থেকে রসায়ন, পাম্প ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহারের থেকে পদার্থবিদ্যা, প্রকৃতিপর্যবেক্ষণ থেকে পক্ষীতত্ত্ব, শস্য-উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত উদ্ভিদবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, স্থানীয় লোকাচার শিক্ষা থেকে ইতিহাস, পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়গুলিতে ছাত্রদের ক্রমপ্রবেশ ঘটানো হত।"[৫১] পরে এখানে ইংরেজী শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়।

আসলে শিক্ষাসত্রের শিক্ষার্থীদের কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ছিল না। কোন বিষয়ে পাঠদান করা হবে তা শিক্ষকমশায় নিজে ঠিক করতে পারতেন না। শিক্ষার্থীদের শিক্ষনীয় যে দিকে উৎসাহ থাকতো বেশি, সেই দিকগুলিকে বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া হত। তাই পরের দিকে কলাভবনে গিয়ে শিক্ষার্থীরা আঁকা ও মাটির কাজও শিখতেন। ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, সামাজিক সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর ব্যবস্থা করা হত। পল্লীউন্নয়নের দায়িত্ব ও

কর্তব্য সম্পর্কে সকল শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তোলা হত যাতে ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন কর্মসূচীর শরিক হতে পারে। পরবর্তীকালে শিক্ষাসত্রের কাজের ধারা প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিতও হয়েছে। এইভাবে শিক্ষাসত্রের দ্বারা জীবনের শিক্ষার সঙ্গে জীবিকার শিক্ষার সংমিশ্রণের বন্দোবস্ত করা হয়।

ii. শিক্ষাচর্চা :

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষকদেরও শিক্ষাদান প্রণালী সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তুলতে। একারণেই ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাচর্চা বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। পল্লীর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এখানে প্রথম দিকে দু'বছরের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। পরে এই প্রশিক্ষণের সময়সীমা কমিয়ে এক বছর করা হয়। এই বিভাগটি স্বতন্ত্র গোছের হলেও মূলতঃ শিক্ষাসত্র বিভাগেরই পরিপূরক করে একে গড়ে তোলা হয়। শিক্ষাসত্রে পাঠদান করা হত এমন বিষয়গুলি এবং পল্লীর উন্নয়ন সংক্রান্ত সমাজশিক্ষার গঠনমূলক নানা দিক কীভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ গ্রামে ফিরে গিয়ে যাতে নিজেদের এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের জীবনকে কীভাবে সমগ্র করে গড়ে তোলা যায়, কীভাবে শিক্ষার্থীদের পল্লীসংগঠনের কাজে নিয়োজিত করা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হতেন।

iii. লোকশিক্ষা সংসদ :

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর প্রথম পর্বে শিলাইদহ-শাহাজাদপুরের গ্রামীণ জীবনের সম্পর্শে এসে দেখেছিলেন মানুষের অশিক্ষা-অজ্ঞানতা কীভাবে তাদের জীবনের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বেও পল্লীজীবনে অনুরূপ ছবিকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই লোকসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে পল্লীর জীবনে সুস্থ খোলা হাওয়ার স্রোত নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। সমালোচক জানিয়েছেন—

"The genesis of the present education system through schools, colleges and universities can be traced back to the British education system in India. The objectives of the British system of education were two-fold, namely (1) the British were in need of educated people to run their administration at different levels and (2) it was required to have a group of people loyal to the British rule in India. So , the concept of mass education had no place in these objectives. The British did not mind keeping the majority of the people literate. As a result education

was confined to a few urban elites and the upper class rural affluent who could afford to have English education in India."[৫২]

বস্তুতঃ একারণেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য তৎপর থেকেছেন নানাভাবে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লোকশিক্ষাসংসদের প্রতিষ্ঠা ঘটে। গ্রাম ও শহরের পিছিয়ে পড়া নারী-পুরুষ, শিশু-বয়স্ক, কুলীন-অস্পৃশ্য সকলেই যাতে ঘরে বসে যে কোন বয়সে শিক্ষার আলোক লাভ করতে পারেন তার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থার বন্দোবস্ত করে লোকশিক্ষা সংসদ। সমাজের সমগ্র অংশের বিকাশ ছাড়া যে সমাজ-প্রগতি আসতে পারে না একথা রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবে জানতেন। সমাজের প্রান্তবাসী মানুষকে পশ্চাতে রাখলে যে তারাই দেশের উন্নয়নকে পশাৎমুখী টান লাগাবে এবং সে উন্নয়ন কেবল এক ক্ষনস্থায়ী বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন হয়ে দাঁড়াবে— একথা রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবে বুঝেছিলেন। তাই লোকশিক্ষাসংসদ গঠন করে আক্ষরিক, প্রাথমিক, প্রবেশিকা, আদ্য, মধ্য ও অন্ত—এই ছয়টি স্তরের মধ্যস্থতায় ঘরে বসে স্নাতক স্তর পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। সাহিত্যের পাশাপাশি কৃষি, স্বাস্থ্য, ধর্ম, দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস, ব্রতকথা, বিশ্বপরিচয়, সংখ্যাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক রচনা করে সেগুলির পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে ১৩৩টি বিভিন্ন শিক্ষনীয় বিষয়ে বই প্রকাশ করে জ্ঞানের প্রসারে মূল্যবান ভূমিকা নেয় লোকশিক্ষাসংসদ। সাধরণ মানুষ যাতে বইগুলি সহজে সংগ্রহ করতে পারেন তার জন্য ভ্রাম্যমান পাঠাগারের পাশাপাশি পাড়ার কোন ক্লাব বা পল্লীমঙ্গল সংস্থায় বইগুলি রেখে আসা হত। শুধু তাই নয় লোকশিক্ষা সংসদ পরীক্ষাব্যবস্থায়ও সংস্কার ঘটায়। শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের মৌলিক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটাতে পারেন তার জন্য স্বতন্ত্র মানের প্রশ্নপত্র তৈরি করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই প্রশ্নপত্র তৈরির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তারই কিছু দৃষ্টান্ত সজনীকান্ত দাসের ' কর্মী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে মুদ্রিত আছে। স্থানীয় স্কুল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরী ভাড়া নিয়ে সংসদ দূর দূরান্তের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার বন্দোবস্ত করতো। অন্ত্য পর্যায়ের পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতেন তাদেরকে বিষয় অনুসারে ইতিহাস ভারতী বা সাহিত্যভারতী ইত্যাদি উপাধি প্রদান করা হত। এই বিভাগটি তাই গ্রাম ও শহরের সাধারণের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ব্যপক বিস্তৃতি পায়।

iv. শিল্পভবন :

১৯২২-এ শান্তিনিকেতনে এর প্রথম প্রতিষ্ঠা ঘটলেও পরে এটি শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৩৭ পর্যন্ত এটি শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবা বিভাগের অন্তর্গত ছিল। ১৯৩৭ থেকেই রথীন্দ্রনাথের উদ্যোগে এটি একটি স্বতন্ত্র বিভাগের মর্যাদা লাভ করে। পল্লীর মৃতপ্রায় শিল্পকে নতুন প্রাণচেতনায় জাগিয়ে তুলে ঐ পথে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ শিল্পভবন স্থাপনের মধ্যস্থতায়। তাই মূলতঃ প্রধান দুটি

উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—“.....(1) to revive the many moribund crafts and industries which were once the pride of the villages ; and by so doing (2) to ensure the well being and happiness of the masses.”[৫৩] শিল্পভবনে তাই একই সঙ্গে প্রশিক্ষণ দানের পাশাপাশি শিল্পোৎপাদনেরও বন্দোবস্ত করা হয়। কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, বস্ত্র ও কার্পেট তৈরির পাশাপাশি মৃৎশিল্পের নানা বৈচিত্র্যময় সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। বাঁশ ও বেতের তৈরি নানা সামগ্রীর পাশাপাশি গালা ও পশম উৎপাদনের জন্য শিল্পভবনের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাছাড়া বই বাঁধাই, ক্যালিকো প্রিন্টিং বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেলাই ও টালি তৈরির কাজও একদা শিল্পভবন শুরু করে।

শিল্পভবনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেকার শিক্ষার্থীদের অনেকেই শিল্পভবনেই কাজ করার সুযোগ লাভ করতো। ফলে প্রশিক্ষণ-উৎপাদনের পাশাপাশি কর্ম বিনিয়োগের একটি ধারাও গড়ে ওঠে এখানে। রবীন্দ্রনাথ শিল্পভবনে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর যথার্থ বিপননের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়কেন্দ্রও গড়ে তোলার প্রয়াস নেন—

“ ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীনিকেতন শিল্পভবনের শিল্প দ্রব্যের চাহিদা মেটাতে কলকাতায় ২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে ‘শ্রীনিকেতন শিল্পভান্ডার’ বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হল। সুভাষচন্দ্র বসু তখন জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি। তিনিই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে ভান্ডারটির আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে রথীন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণটি পাঠ করেন:

“আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করিনি, কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘতাকেও স্বীকার করছি। ....অর্থ না হলে একে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় বলেই আমরা আশা করি এই সকল শিল্পকাজ আপন উৎকর্ষের দ্বারাই কেবল যে সম্মান পাবে তা নয়, আত্মরক্ষার সম্বল লাভ করবে|

তখন শিল্পদ্রব্যের বিক্রির পরিমাণ ছিল প্রায় তিরিশ হাজার টাকার মতন। রথীন্দ্রনাথের উদ্যোগে, আসবাব শিল্পেরও বিক্রির পরিমাণ অনেক বেড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় কারুশিল্প প্রসারণ এবং গ্রামীণ শিল্পের সম্প্রসারণে আশা জেগেছিল। রথীন্দ্রনাথ সেই আদর্শকে মর্যাদা দিয়েছেন। ১৯৪৪-এ মোট বিক্রির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় দু-লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকায়। শক্তপোক্ত আধুনিক গ্রামীণ শিল্প প্রযুক্তির সূচনা হল।”[৫৪]

রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে ইটালি পাঠিয়ে চর্মশিল্পে অভিজ্ঞ করে তোলা, মণীন্দ্রলালকে জাপান পাঠিয়ে তাঁতশিল্পে বিশেষজ্ঞ করে তোলার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকেও দক্ষ শিল্পীদের সংগ্রহ করে আনেন শিল্পভবনের দ্রব্যসামগ্রীর মানকে উন্নত ও আন্তর্জাতিক করে তোলার জন্য—

"He brought the skills of craftsmanship of Italian leather workers, Manipuri weavers and the artists of Java to bear upon his planning for rural industrial development. The plan was thus well conceived and almost perfect to the minutest details."[৫৫]

শিল্পভবনকে বানিজ্যক সফলতা দানের জন্য যে আটটি উদ্দেশ্যকে পাধান্য দেওয়া হয় তার বর্ণনা দিয়েছেন রথীন্দ্রনাথ স্বয়ং—

"1) Carring on experiment in such Cottage industry as may be of economic values.

2) To establish workshop on a small scale with such industries as have been demonstrated to be successful under local condition and run them on business lines.

3) To take young men from rural areas of Birbhum as apprentices in the workshop and give them such vocational training that they can earn independently decent living from their handicrafts.

4) To follow up these trained articians when they live the institution and help them to set up their buseness at home by advancing sufficient capitals to purchase necessary equipments, provide raw materials and help them in disposing of their finished products by organizing a central depot and sales dept.

5) To make arrangements for training of the students Siksha-Satra and Siksha-Charcha Bhavana.

6) To make arrangements for training in Cottage industries to a few students from outside the district and award diplomas and certificate to such students after they have qualified for them.

7) To encourage the development of Cottage industries by awarding scholarship and stipends to deserving students.

8) To organize selling for the marketing of goods produced in the workshops at Sriniketan as well as those produced in the villages

under the supervision and also to organize and maintain a wholesale and retail shop at Calcutta for the purpose, if necessary."[৫৬]

v. নারীশিক্ষা :

রবীন্দ্রনাথ নিজ পারিবারিক পরিবেশের ভিতর থেকেই নারীশিক্ষার মাহাত্ম্য ও প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির বিদূষী মহিলারাই বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নিজেদের মূল্যবান অবদান রেখে গিয়েছিলেন। স্বভাবতই শ্রীনিকেতনে পল্লী উন্নয়ন ভাবনায় শিক্ষাক্ষেত্রে নারীশিক্ষা যে প্রাধান্য পাবে সেটাই স্বাভাবিক। গ্রামের অবরুদ্ধ পরিবেশে নারীদের তিলে তিলে মৃত্যু মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের কাছে বেদনাদায়ক এক অভিজ্ঞতা ছিল। তাই এর থেকে নারীদের মুক্তির লক্ষ্যে কবি শ্রীনিকেতনে নারীশিক্ষার স্বতন্ত্র প্রকল্প গড়ে তোলেন। নানাবিধ কাপড় বোনা, তার উপর সুতোর নক্সা করা, বাটিকের কাপড় তৈরি, চামড়ার কাজ শেখানোর ব্যবস্থা হয় শ্রীনিকেতনে। অসহায় ও বিধবা নারীদের কাজ শিখিয়ে এভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাদের স্বনির্ভর করে তুলতে চান। গ্রামীণ মানুষকে এভাবেই তাদের আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

vi. পাঠাগার নির্মাণ :

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষদের শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তুলতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন তাদের চেতনার সর্বাঙ্গীন বিকাশ। সেই বিকাশ যে শুধুমাত্র বিদ্যালয়শিক্ষার মধ্য দিয়ে সকলের কাছে সবসময় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না একথা তিনি ভালোভাবে জানতেন। তাছাড়া বিশ্বের নবোদ্ভূত চিন্তা চেতনার সঙ্গে পল্লীবাসীদের পরিচয় থাকাটা জরুরি বলে মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। অথচ গ্রামের দুস্থ ছাত্র-ছাত্রী তথাসাধারণ দরিদ্র মানুষদের পক্ষে বই কেনা কষ্টকল্পনা ছিল প্রায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে গ্রামে কয়েকটি পাঠাগারের ব্যবস্থা করেন। সেই সকল পাঠাগারে শ্রীনিকেতন থেকে পুস্তক প্রেরণের বন্দোবস্ত করেন রবীন্দ্রনাথ। সাধারণের মধ্যে পুস্তক পাঠের আগ্রহ বৃদ্ধি ঘটায় শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের একাধিক গ্রামে এরই নানা উপশাখা গড়ে তুলে পাঠাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটান। মানুষের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাসচেতনতা আনার জন্য রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে গ্রামগুলিতে ভ্রাম্যমান পাঠাগারের ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এতে প্রচার এবং পুস্তক পাঠে উদ্দীপনা দুয়েরই সঞ্চার ঘটানো সম্ভব হত। ভ্রাম্যমান পাঠাগার পল্লীর মানুষের জীবনে জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থতার একটি বড় উপায় হয়ে ওঠে।

vii. বক্তৃতার আয়োজন :

পল্লীর লোকসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য যে লোকশিক্ষা একটা বড় হাতিয়ার হতে পারে শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ একথা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। একারণেই পল্লীর নানা স্থানে বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করেন। এই সকল বক্তৃতায় পল্লীর মানুষদের ব্যবহারিক জীবনযাপন প্রণালী সম্বন্ধে নানা উপদেশ প্রদান করা হত। কৃষিশিক্ষা কিংবা স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রসঙ্গেও নানা উপদেশ দেওয়া হত। কখনো বা গ্রন্থপাঠ কিংবা অতীত ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করে পল্লীর মানুষদের ঐতিহ্য সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কর্মব্যস্ত মানুষদের জন্য অনেক স্থানে লণ্ঠন লেকচারেরও ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ১৯২৯ সালে এইভাবে ২৬ টি বক্তৃতার আয়োজন করা হয় যাতে প্রায় ৬০০০ মানুষ উপস্থিত হয়।

viii. বিদ্যালয় স্থাপন :

শিলাইদহ-শাহজাদপুরে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ পল্লীর জন্য যে একাধিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে একাধিক বিদ্যায়তন নির্মাণ তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। কিন্তু শিক্ষাকে পল্লীর নিভৃত প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ একাধিক নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করে তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার আয়োজন করেন। নৈশ বিদ্যালয় অন্ধকারের ঘোমটায় মুখ ঢেকে থাকা গ্রামের মানুষগুলির কাছে আনন্দময় এক আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছিল। যারা সাধারণ বিদ্যালয়ে কোনদিন প্রবেশাধিকার পায়নি তাদের প্রবেশ অত্যন্ত সহজ ছিল নৈশ বিদ্যালয়ে। একদা শ্রীনিকেতনের শিক্ষাবিভাগের দায়িত্বে থাকা প্রেমচাঁদ লাল তাঁর 'Reconstruction and Education in Rural India' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, সেই সময় আশেপাশের প্রায় বারোটি গ্রামে বহু নৈশবিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল যার মাধ্যমে গ্রামীণ লোকশিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে।

২. স্বাস্থ্য :

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন পল্লীর আত্মিক উন্নয়নের বড় চাবিকাঠি হল তাদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন। সুস্থ শরীরই সুস্থ ও সবল মনের আধার হয়ে ওঠে। তাই রবীন্দ্রনাথ অস্বাস্থ্যে পীড়িত পল্লীর মানুষকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলার প্রয়াস নেন। শিলাইদহ পর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা অনুরূপ প্রবণতার প্রতিস্থাপন লক্ষ্য করেছি। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে কবির সেই কর্মপ্রয়াস আরো ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পদক্ষেপ গুলিকে নিম্নোক্ত বর্গে বিন্যস্ত করে দেখানো হল—

ক. ম্যালেরিয়া নিবারণ :

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ-শাহজাদপুরে তাঁর অসম্পূর্ণ পল্লীপুনর্গঠন কর্মসূচীকে পূর্ণতাদানের লক্ষ্যে ১৯১২ সালে যখন সুরুলের কুঠিবাড়ি ক্রয় করেন তখন স্থানটির অত্যন্ত হতশ্রী চেহারা ছিল।চারদিকে পোড়ো জমি আর আগাছায় পরিপূর্ণ। স্থানটিএকারণেই হয়ে উঠেছিল ম্যালেরিয়ার ডিপো। এখানকার শতকরা আশিভাগ মানুষই ছিলেন ম্যালেরিয়া পীড়িত, যকৃতের রোগে আক্রান্ত। তাই ১৯১৬ থেকে রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেন্দ্রনাথের মাধ্যমে এখানে পল্লীউন্নয়নের প্রয়াস গৃহীত হলেও তেমনভাবে সফলতার মুখ দেখেনি। পরবর্তী সময়ে শান্তিনিকেতনে পদার্পন ঘটে কৃষিবিদ এলমহার্স্টের। ১৯২২-এ শ্রীনিকেতনের কর্মযজ্ঞে যোগদান করার পর গ্রাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ কালিমোহনের সহায়তায় শ্রীনিকেতনের চারপাশের গ্রামগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ম্যালেরিয়ার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ম্যালেরিয়া নিবারণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

পল্লীর মানুষের জীবনে একজন ডাক্তারের তখন নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। তারই অনুসন্ধানে তাঁরা পাশে পেয়ে যান আমেরিকাবাসী মিস গ্রীচেন গ্রীণকে। গ্রামীন মানুষের রোগের কারণ নির্ণয় করে তার প্রতিকারের লক্ষ্যে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। মিস গ্রীণ প্রকৃত অর্থে ডাক্তার না হলেও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মানুষের সেবা সুশ্রুষা করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। গ্রীণের সেবাপরায়ণতাকে কাজে লাগিয়ে, এল্‌মহার্স্টের বিজ্ঞানমনস্কতাকে হাতিয়ার করে, আধুনিক ঔষধপত্রের সহযোগে ম্যালেরিয়া নিবারণে নেমে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। এ কাজে তিনি পাশে পেয়েছিলেন আমেরিকান হ্যারি টিম্বার্সকে। বিশ্বভারতী নিউজ বুলেটিন থেকে জানা যায়—'Mrs. Rebeca Timbers also attends to the patients from 7 to 11 on all week days."[৫৭] ডা: টিম্বার্স শ্রীনিকেতনে ম্যালেরিয়ার জন্ম ও বংশবিস্তারের গতি প্রকৃতি নির্নয় করে মশার বিনাশের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে টিম্বার্সের গবেষণা কী মূল্যমানতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার পরিচয় পাই ক্লারেন্স পিকেটকে পাঠানো হ্যারির চিঠি থেকেই—

" আমরা যে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকল্পনার খসড়া করে কাজ শুরু করে দিয়েছি তা ইতিমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন এলাকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশেষ করে মিশনারীদের এবং 'স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন্', 'অল ইন্ডিয়া স্কুল অব্ পাবলিক হেল্‌থ্' (কলকাতা) 'সেন্ট্রাল ম্যালেরিয়া ব্যুরো' (কসৌলি) এবং 'লীগ অব নেশন্‌স্' এর 'হেলথ ডিপার্টমেন্ট' বা স্বাস্থ্যবিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের। এইসব প্রতিটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ এই

পরিকল্পনাকে উৎসাহের সঙ্গে অনুমোদন করেছেন, এই আশা প্রকাশ করেছেন যে , আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল খুবই সম্ভাবনাময় হবে।”[৫৮]

পল্লীসংস্কারের এই বৃহৎ কর্মসূচী যে কেবল দু-চারজন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয় সেকথা রবীন্দ্রনাথ ভালো করে জানতেন। তাই গ্রামে গ্রামে তিনি এই কাজে সহায়তাকারী ব্রতী বালকদল গঠন করেন। গড়ে তোলেন সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি। এদের প্রচেষ্টায় পল্লীর নানা স্থানের আগাছা নির্মূল করে, ডোবা কিংবা জমে থাকা জল পরিষ্কার করে, মশা-মাছি নিধন ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে নির্মল গ্রাম গঠনে আত্মনিয়োগ করে। গ্রামের মানুষদের চাঁদায় প্রত্যেক সমিতি গ্রামে একটি করে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে একজন করে দক্ষ চিকিৎসক ও কম্পাউন্ডার থাকতো।এই চিকিৎসালয়ে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করাতে পারতো গ্রামের মানুষজন। সমিতির সদস্যদের ক্রয়মূল্যে এবং ও অন্যান্য রুগীদের বাজারদরে ঔষধ সরবরাহ করা হত এই সকল চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে। রবীন্দ্রনাথের এই ব্যবস্থা পল্লীর মানুষদের মনে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল।

খ. কলেরা নিবারণ :

পতিসরে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন গ্রামের মধ্যে কলেরা কীভাবে মহামারীর আকার নিয়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। মুঙ্গেরে গিয়ে নিজের সন্তান শমীর কলেরায় মৃত্যুর মর্মান্তিক স্মৃতির কথা রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন ভুলতে পারেননি। পতিসরের তুলনায় শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের পল্লীতে কলেরার মড়কের ছবি তার থেকে স্বতন্ত্র কিছু ছিল না। তাই পল্লীর মানুষের জীবনের সুরক্ষার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নির্দিষ্ট চাঁদার বিনিময়ে অসুস্থ রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ কলেরার নিরাময়ের ব্যবস্থা করেন। গ্রামে গ্রামে নির্মিত স্বাস্থ্য সমবায় সমিতির দ্বারা কলেরা রোগগ্রস্ত রোগীদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে নানা উপদেশ দেওয়া হত।

গ. শারীরিক বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ :

বলিষ্ঠ শরীর বলিষ্ঠ মনের ধারক ও বাহক—একথা রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই জানতেন।তিনি তাই দেখাছিলেন তাঁর পিতা ছোট থেকে বাড়ির শিশুদের সুষম শারীরিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য কীভাবে সচেতন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। শীতের দিনে ভোরবেলা উঠে ঠাকুরবাড়ির সন্তানদের পালোয়ানের সঙ্গে লড়াই করতে হত। পল্লীর

মানুষদের শারীরিক বিকাশের ক্ষেত্রে তাই তিনি একই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তাই চারদেওয়ালের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চাননি। প্রকৃতির উন্মুক্ত সাহচর্যে থেকে প্রাণের আনন্দে পাঠের ব্যবস্থা করেন তিনি। যাইহোক আশ্রমের ছাত্রদের সুষম খাদ্যের আহার, শারীরিক কসরতের দ্বারা দৈহিক চর্চা ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। রবীন্দ্রনাথ জানতেন এরাই দশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। এদের মধ্য দিয়েই সুস্থ জীবনের আদর্শকে পল্লীর মধ্যে প্রচার করতে হবে। তাই বিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যেই সেই আদর্শকে সংস্থিত করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষাসত্রে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বিকাশের যাবতীয় বন্দোবস্ত করা হয়। শান্তিনিকেতনে জাপান থেকে তাগাগাকি নামক একজন যুযুৎসু শিক্ষককে নিয়ে এসে যুযুৎসু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন।

ঘ. জন্ম নিয়ন্ত্রণ :

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের গ্রামে গ্রামে যে সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি গড়ে তোলেন তার অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে এর কার্যপরিধির সম্প্রসারণ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন পল্লীর মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সত্ত্বেও পরিবার বেড়ে চলে। জনসংখ্যার বিপুল বোঝা গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক ছিল। এই অনাকাঙ্খিত মাতৃত্ব থেকে মুক্তি পাবার উপায় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য স্বতন্ত্র মাতৃমঙ্গল বিভাগ গড়ে তোলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 'বার্থ কন্ট্রোল রিভিউ' তে প্রকাশিত মাদাম সাঙ্গারকে লিখিত একটি পত্রের উল্লেখ করে এ বিষয়ে কবি-মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন—

"I am of opinion that Birth Control movement is a great movement not only because it will save women from enforced and undesirable maternity, but because it will help the cause of peace by lessening the number of surplus population of a country scrambling for food and space outside its own rightful limits."[৫৯]

ঙ. শিশুমৃত্যু নিবারণ :

পল্লীর মানুষের জীবনে দারিদ্র্যের আনুষঙ্গিক ছিল অনাহার ও অপুষ্টি। সুষম আহারের অভাবের কারণে পল্লীর মায়েরা প্রায়শই ভগ্নস্বাস্থ্যের শিকার হতেন। এমতাবস্থায় তাঁরা রোগাক্রান্ত শরীরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরিণত,অসুস্থ কিংবা অপুষ্ট সন্তানের জন্ম দিতেন। ফলশ্রুতি স্বরূপ জন্মের অব্যবহিত পরে অগণিত শিশুসন্তানের মৃত্যু ঘটতো। মাতৃত্ব নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকায় এই নিয়মের অনুবর্তন ঘটে চলত

দিনের পর দিন। এই নির্মম জীবনবৃত্ত থেকে পল্লীর মানুষকে রক্ষা করার জন্য, নির্মম শিশু মৃত্যুর প্রতিকার করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সমবায় স্বাস্থ্য সমিতির সহায়তায় শিশু কল্যান বিভাগের প্রতিষ্ঠা ঘটান। এই বিভাগ মাতৃমঙ্গল বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতো। গ্রামে গ্রামে পরিবার পিছু শিশুর পরিসংখ্যান সংগ্রহ,তাদের ওজন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে উপযুক্ত ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়াই ছিল এই বিভাগের কাজ।

চ. যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিবারণ :

গ্রামীণ মানুষেরা যে সুষম খাদ্যের অভাবে অধিকাংশ সময় ক্ষয়রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ত। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে রোগভোগ এবং চিকিৎসার অভাবও এর একটি বড় কারণ। রবীন্দ্রনাথ তাই পল্লীর মানুষদের যাতে ক্ষয়রোগের হাত থেকে বাঁচানো যায় তার পরিকল্পনাও করেন। সুষম আহার, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক চিকিৎসা প্রণালীর মাধ্যমে যাতে পল্লীর যক্ষ্মারোগগ্রস্ত মানুষকে সারিয়ে তোলা যায় তার ব্যবস্থা করেন। বাঁকুড়ায় কবি কুষ্ঠ রোগীর যন্ত্রনা ও দুঃখ দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তাই তাঁর জমিদারিতে শ্রীনিকেতন পর্বে এই মারণ রোগটিকে যাতে সারিয়ে তোলা যায় তার জন্য নিজের বিদ্যালয় থেকেই এ বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। এই রোগটিকে সারিয়ে তোলার জন্য স্বতন্ত্র একটি হাসপাতাল নির্মানের কথাও ভেবেছিলেন। ১৩২৬ সালের ২৯ আষাঢ় তারিখে সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে কবি একটি পত্রে জানিয়েছিলেন—

“সংক্রামক রোগগ্রস্ত ছাত্রের জন্য একটি পৃথকতর হাসপাতাল নিতান্তই আবশ্যক।এ ঘর আগাগোড়া পাকা না করলে রীতিমত ইহা ধোয়া মাজা সম্ভব নহে—ইহার ব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র কূপ,রান্নাঘর ও শুশ্রুষাকারীদের ঘর দরকার।এই হাসপাতাল মাঝারি রকমের করিতে হইলে পাঁচ হাজার টাকা ও ছোট রকম করিতে হইলে তিন হাজার টাকা প্রয়োজন হইবে।এই টাকা সংগ্রহ করিবার ভার যদি তুমি গ্রহণ কর তবে আমাদের উপকার হইবে সন্দেহ নাই।”

আমরা সকলেই জানি রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছা পূর্ণতর রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৫২ তে। এখানকার গ্রামের ‘কুষ্ঠ নিবারণী সঙ্ঘে’র সহায়তায় শ্রীনিকেতনে কুষ্ঠ নিরাময় হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয় এই বছরের জুলাই মাসে।

ছ. আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সহযোগে চিকিৎসা ও তদনুরূপ ঔষধপত্রের ব্যবস্থা :

শিলাইদহ পর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দ্বারা পল্লীর মানুষকে সেবা করতেন। শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন পর্বে দেখি রবীন্দ্রনাথের সে চিকিৎসার

পসার আরো বেড়ে গেছে। কিন্তু এর মধ্যেই বুঝেছিলেন গ্রামীণ মানুষদের যাবতীয় চিকিৎসার জন্য আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি শ্রীনিকেতনে সমবায় সমিতির সাহায্যে পল্লীর মানুষদের জন্য যে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন—সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মিস গ্রীচেন গ্রীণ কিংবা হ্যারি টিম্বারের চিকিৎসা ও অভিজ্ঞতার কথা আমাদের জানা। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি আধুনিক ঔষধপত্র দ্বারা যাতে সংক্রামক এবং ক্রনিক অসুখ সমূহের চিকিৎসা করা যায় তারও বন্দোবস্ত করেন। বিদেশ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র ব্যক্তির সঙ্গে আলাপের সূত্রে নবাবিষ্কৃত ঔষধপত্র কিংবা চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজ নিতেন। বাংলার পল্লীসংগঠন কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের এ প্রচেষ্ঠা নিরলস ছিল।

৩. ব্রতীদল গঠন :

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মের প্রথম পর্বে শিলাইদহ-পতিসরে গ্রামোনয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্রতী বালকদলকে কাজে লাগিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বেও পল্লী উন্নয়নের সহায়ক দল হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ব্রতীদল গড়ে তোলেন। কিন্তু এই পর্বে ব্রতী বালকদলের সংগঠন ও কার্যপ্রণালী পূর্বের তুলনায় অধিক দৃঢ়বদ্ধ ও সম্প্রসারিত করেন—

" ব্রতীদল গঠনের প্রথম দিকে দল পরিচালনা করার জন্য কোনো বাঁধাধরা নিয়ম কানুন ছিল না। পরে স্কাউট ও ব্রতচারী দলের আদলে নিয়মকানুন তৈরি হয়। প্রথমদিকে ব্রতী দলে তিন ধরণের বয়সী ছেলেদের সদস্যভুক্ত করা হত—১১ বছর বালকের দল, ১২ থেকে ১৪ বছর ছেলেদের দল ও ১৪ বছরের উর্ধ্বের যুবকদের নিয়ে যুবকদল। পরে শেষোক্তদের নিয়ে যুব সংগঠন করা হয়। গ্রামের ব্রতীদল কোনো না কোনো স্কুলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত। পরে ব্রতীদলকে স্কুলের আওতা থেকে বার করে নিয়ে আসা হয়। খুব সম্ভবত এই পরিবর্তন স্বাধীনতার পরে ঘটে। তবে এ বিষয়ে সঠিক তথ্য নেই। গ্রামে ব্রতীদল গঠন করার জন্য প্রথমে ছেলেদের নিয়ে খেলাধূলা ও নানারকম ব্যায়াম শেখানো হত। তার পর যখন ছেলেরা দল হিসেবে একটা জায়গায় পৌঁছোত তখন তাদের নিয়ে গ্রামের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করতে শুরু করা হত। গ্রামের যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিজেদের মধ্যে তৈরি হয়ে আছে তার সম্বন্ধে ব্রতীদলকে অবহিত করা হত ও তার পর গ্রামের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংস্কার করার কাজ শুরু করা হত।

অংশত স্কাউট দলের ও অংশত আমেরিকার 4H ক্লাবের আদলে ব্রতীদল গড়ে তোলা হয়। ব্রতীদল যেমন গ্রামের নানা সমস্যার সম্মুক্ষীণ হয়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিত তেমনই তারা নিজেদের সার্বিক উন্নয়নের জন্যও প্রয়াসী হতেন। ব্রতীদলের সদস্যদের যাতে শারীরিক ও মানসিক গঠন ঠিকভাবে হয় তার ওপর জোর দেওয়া হত। ৪

টি বিষয়ে (4H) সদস্যদের শিক্ষার আয়োজন ছিল। এগুলি হল স্বাস্থ্যের উন্নতির (health) জন্য নানারকম ড্রিল ও ব্যায়াম, সদস্যদের মানসিক উন্নয়নের জন্য প্রকৃতিপাঠ, জমির মাটির রূপ ও চরিত্র চেনা, পারিপার্শ্বিক সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ, সমাজসেবা (head) দুর্গতদের সেবা, ত্রাণ (heart), জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও শিক্ষা (hand) যেমন তাঁতের কাজ, মৃৎশিল্প, বাগান পরিচর্যা, কাঠের কাজ, কামার শালের কাজ ইত্যাদি।"[৬০]

রমা চক্রবর্তীও এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

"মঝে মাঝে ছুটির দিনে, একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আমরা বেড়িয়ে পড়তাম গ্রামের পথে। সাঁওতালরা তাদের গ্রাম পরিষ্কার করেই রাখত, তবু অন্য নানা কাজ থাকত, তারই মধ্যে যতটা সম্ভব সাহায্য করতাম আমরা। রাস্তাঘাট মেরামত করা, ভেঙে পড়া পুল মেরামত করা এমন কত কাজেই তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা কাজে লেগে যেতাম। এমনিতে তারা তো আমাদের সমীহই করতো, কিন্তু সেই সমীহ-জানানো ছেলেমেয়েরা যখন কোদাল, শাবল হাতে কাজে নামছে, মেয়েরা মাটি কেটে ডালায় ভরে এনে দিচ্ছে, তখন তারা সব অবাক হয়ে দেখত।"[৬১]

৪. ধনী নির্ধনের ব্যবধান হ্রাস :

রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর অপর এক বড় দিক ছিল ধনী-নির্ধনের ব্যবধান দূরীকরণ। তিনি দেখেছিলেন পল্লীর মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে, তেমনি শহরে বা নগরে অর্থ ও সম্পদের প্রাচুর্য পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। গ্রামে যাদের শক্তির উপর ভর করে অন্নের উৎপাদন ঘটে তারা অবহেলিত থাকে, আর শহরে কিছু সংখ্যক মানুষের হাতে সম্পদের অনধিকার প্রাচুর্য বেড়ে ওঠে। নগরেই যাবতীয় বিলাস, ঐশ্বর্য ও আমোদ স্তূপীকৃত হলেও নিরন্নপ্রায় গ্রামগুলি প্রায় অন্ধকারে মসীলিপ্ত অবস্থায় থাকে। ধনের এই উৎপত্তি ও ব্যাপ্তির মধ্যে ফাটল হ্রাস করার লক্ষ্যেই রবীন্দ্রনাথ গ্রাম ও শহরকে একসূত্রে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিলেন। এর দ্বারা আমাদের সমাজে ধনী দরিদ্রের মাঝে যে বিস্তর ব্যবধান রচিত হয়েছিল তাকে দূর করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ এ-ও দেখেছিলেন যে পূর্বে গ্রামের সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিদের উপর অধঃস্তন শ্রেণির লোকেরা নানা সামাজিক বিষয়ে নির্ভরশীল থাকতেন। গ্রামের পুকুরসংস্কার কি মন্দিরসংস্কার কিংবা অনুরূপ যে কোন কাজের দায়িত্ব স্বীকার করতেন তারা। তাদের আধিপত্যকেও অনায়াসে স্বীকার করে নিত গ্রামের অন্যান্য দরিদ্র মানুষেরা। ফলে ধনী নির্ধনের সম্পর্কটি ছিল আন্তরিক ও সহজ। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই

সম্পর্কে ফাটল ধরায় ধনী ও নির্ধনের মাঝের ব্যবধান অনেক বেড়ে যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ পল্লীর উন্নয়নে তার স্বাস্থ্য রক্ষায় ধনী নির্ধনের ব্যবধান হ্রাসে সচেষ্ট হন।

৫. আনন্দের পথে সাংস্কৃতিক উজ্জীবন :

রবীন্দ্রনাথ কলকাতার নাগরিক জীবনের বাইরে পল্লীর বুকে প্রথম পা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন গ্রামগুলি জীবনের আলোহীনতায় ডুবে কীভাবে নিস্তব্ধ নিস্তেল হয়ে আছে। সে জীবনের মাঝে অভাব, রোগ-শোক, শোষণ-পীড়নের অসম্ভব দাপাদাপি জীবনকে প্রায় পঙ্গু করে তুলেছিল। সে পল্লীজীবনের মাঝে নিরাশার অলঙ্ঘ্য অন্ধকারকেই মানুষ আপন ভবিতব্যতা হিসেবে মেনে নিয়েছিল।পল্লীর যে আনন্দময় প্রাণস্ফূর্তির সাংস্কৃতিক রূপ একদা বাংলার লক্ষ গ্রামের প্রধান বৈষিষ্ট্য ছিল তা প্রায় বিলীন হতে বসেছে। লোকায়ত সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে যে জাতির ঐতিহ্যকে সাফল্যের সঙ্গে পুনরুদ্ধার বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে না সে কথা সেদিন দেশের মুষ্টিমেয় পরিবারের কয়েকজন মাত্র মানুষই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।বলা বাহুল্য ঠাকুর পরিবারের রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাই পল্লী উন্নয়নে অগ্রসর হয়ে রবীন্দ্রনাথ গ্রামের প্রাণশক্তির আধার আনন্দময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিকে নবীন প্রাণ সঞ্চারে জাগিয়ে তুলতে চাইলেন। কারণ প্রাণের আনন্দই মনের স্বাস্থ্য রক্ষা করে।আর সুস্থ মন বা প্রাণই সুস্থ সংস্কৃতি ও বলিষ্ঠ কর্মপ্রয়াসের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। পল্লীকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে, গ্রামে গ্রামে স্বরাজ আনতে হলে যে কর্মদ্যোগের প্রয়োজন তার জন্য যে বলিষ্ঠ প্রাণশক্তির প্রয়োজন ছিল পল্লীর মধ্যে তা ছিল না। তাই পল্লীর প্রাণকে নবীন উদ্দীপনায় জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি আনন্দের পথে সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের প্রয়াস নেন। তাঁর সেই প্রয়াস গুলি নিম্নরূপ।

ক. যাত্রা :

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের আত্মউজ্জীবনের একটি বিকল্প সংস্কৃতি হিসেবে যাত্রাকে বেছে নিয়েছিলেন। যাত্রা এমন এক অভিনয়ের আঙ্গিক ছিল যেখানে দর্শক-অভিনেতার মধ্যে এক নিবিড় যোগ গড়ে তোলা সম্ভব হত। ফলে যাত্রার মধ্যস্থতায় সরাসরিভাবে পল্লীর মানুষকে সহজেই লোকশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যেত, নীতিকথা, নতুন মূল্যবোধের সঞ্চার বা সদুপদেশ দানের ব্যবস্থা করা যেত। তাছাড়া গ্রামের মানুষ পরস্পরের থেকে জাতপাতের দ্বারা বিচ্ছিন্ন নিরানন্দ এক জীবন অতিবাহিত করছিল। এই বিচ্ছিন্নতা, জীবনের এই প্রাণহীনতার হাত থেকে মুক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ যাত্রানুষ্ঠানের মতো অনুষ্ঠান গুলোতে গ্রামীণ মানুষকে এক করে পাস্পরিক ব্যবধানের সীমাকে ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কেননা গ্রামীন মানুষ ঐক্যবদ্ধ না হলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে পল্লীউন্নয়নের

ক্ষেত্রে নানা বাধা আসার সম্ভাবনা ছিল। গ্রামের স্তিমিত মৃতপ্রায় সংস্কৃতির ধারাটিকে তিনি এভাবেই জাগিয়ে তুলতেও চেয়েছিলেন তাছাড়া এর পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়নের স্বতন্ত্র এক ভাবনাও কাজ করেছিল। যাত্রানুষ্ঠানগুলো মূলতঃ গ্রামীণ মেলা গুলোকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হত। এই অবসরে গ্রামীণ মানুষ তাদের তৈরি নানা ধরণের জিনিসপত্র বিক্রয়ের দ্বারা অর্থনৈতিক ভাবেও লাভবান হতে পারতো। গ্রামীণ মানুষের প্রতিভা বিকাশেরও একটি অবসর গড়ে উঠেছিল এই যাত্রানুষ্ঠানের মধ্যস্থতায়।

খ. গান :

ঠাকুরবাড়ির সাঙ্গীতিক পরিবেশ ছোটবেলা থেকেই লোকগানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর আসক্তি তৈরি করেছিল। এই লোকগানের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ বাংলার মাটির নিজস্ব প্রাণের সুরকে অনুভব করেছিলেন। তাই পল্লীর মেলাগুলোতে লোকায়ত সঙ্গীতের নানা ধারাকে বইয়ে দিয়ে পল্লীর নিজস্ব সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস নেন। আউল, বাউল, দরবেশী, ফকিরি, সূফি, কীর্তন, কবিগান ইত্যাদির পাশাপাশি ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, সারি-জারি, ভাদু-টুসুর যে বিপুল সম্পদ লোকজীবনে বহমান তার ধারাটিকে রবীন্দ্রনাথ উজ্জীবিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য— বাংলার লোকগান গুলির মধ্যে অসাম্প্রদায়িক যে চেতনা আছে তার দ্বারা পল্লীর মানুষের সম্প্রীতির পথকে প্রশস্ত করা,পল্লীকে সংঘটিত করা। শিলাইদহে এবং শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বাউলদের সহজ সাধন প্রণালীর গভীর আধ্যাত্মিকতার দ্বারা তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার অন্তর্লীন উদার মানবিক চেতনার মূল্যবান সম্পদ দেখে। বাউলদের সেই ধর্মের ব্যখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন—
“ These people have no special incarnations in their simple theology, because they know that God is special to each individual. They say that to be boron a man is the greatest privilege that can fall to a creature in all the world. They assert that Gods in paradise envy human beings. Why? Because Gods will, in giving his love, finds its completeness in man’s Will returning that love. Therefore Humanity is a necessary factor in the perfecting of the divine truth. The infinite, for its self-expression, comes down in the manifoldness of the Finite for its self-realization,must rise into the unity of the Infinite.Then only the cycle of Truth complete.”[৬২]

বাংলার এই সঙ্গীত সম্পদকে একারণেই রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ মানুষের মনোলোকের পুনর্গঠনে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। বিশেষতঃ বাংলার মেলাগুলিতে এই সঙ্গীতের বিশেষ

আয়োজনের দ্বারা পল্লীর উৎসব মুখর পূর্বের বাতাবরণটিকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

গ. অভিনয়:

রবীন্দ্রনাথ কেবল যাত্রাভিনয় নয় পল্লীর সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ণৃত্যাভিনয় বা লোকনাট্যাভিনয়ের বিশেষ ধারাটিকে প্রয়োগ করার প্রয়াস নিয়েছেন। শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের যাত্রাপালার বিষয়বস্তু, অভিনয় বা উপস্থাপন রীতির সঙ্গে পরিচিত হবার অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ পেয়েছিলেন। হিন্দুমেলার অভিজ্ঞতাও এক্ষেত্রে বিশেষ কাজ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের মত আধুনিক মানুষের পক্ষে ধর্মীয় ঐতিহ্যানুসারী লোকনাট্যের ভাবানুসরণ সম্ভব না হলেও নতুন মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য সৃষ্টিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। লোকনাট্যের গীতিপ্রাধান্য, সরল কাহিনীবিন্যাস রীতি, নৃত্যের বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনাকে প্রাধান্য দান, বিশেষতঃ উপস্থাপন রীতিতে লোকায়ত জীবনচর্যার সজীব অনুষঙ্গ (লৌকিক বিশ্বাস সংস্কার ইত্যাদি) ও নিরাভরণ নাট্যকলার সজীব গণআঙ্গিক—আমাদের গ্রামীণ অভিনয়কলার এই দিকগুলির প্রতিই রবীন্দ্রনাথ বেশি করে ঝুঁকেছিলেন। নিজের এবং এই রীতিতে রচিত নাটকগুলির অভিনয়ের দ্বারা পল্লীর মানুষের মনের কাছাকাছি পৌঁছতে চেয়েছিলেন চেতনাসংস্কারের নানা উদ্দেশ্য নিয়ে। পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ করে নানা স্থানের নৃত্যকলার বিশেষ প্রবণতা বা ভঙ্গিটুকুকে রবীন্দ্রনাথ আত্তীকরণ করেছিলেন। সেই নৃত্যশৈলীর বহুল প্রয়োগ রবীন্দ্রনাটকে স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ আঙ্গিকে রচিত নাটকগুলি কিন্তু শান্তিনিকেতন আশ্রমে পল্লীর মানুষদের জন্য নতুন আনন্দ ও চেতনার উদ্গম ঘটিয়েছিল।

ঘ. পল্লীসাহিত্যচর্চা ও সংরক্ষণ :

নাগরিক সংস্কৃতির বাইরে পল্লীর ভিতরে পালিশহীন যে লোকসাহিত্যের ধারা প্রবাহিত ছিল তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অন্তরের প্রগাঢ় আকুতি ছিল। যুগ যুগ ধরে পল্লীর লোকায়ত এই সাহিত্যের ধারা গ্রামীণ পরিশীলিত জনমানসের আনন্দের একটি বড় উৎস হয়ে থেকেছে। এই সাহিত্যকেই পল্লীর মানুষ আপন অন্তরের সামগ্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে। বস্তুতঃ একারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী সংগঠন কার্যে পল্লীসাহিত্যকে হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। উদ্দেশ্য গুলি সূত্রাকারে নিম্নরূপ—

i. রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন পল্লীর অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ পরিশীলিত নাগরিক সাহিত্যের রস আস্বাদনে অক্ষম। পল্লীর মানুষদের তাই পরিশীলিত সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষাদান, তাঁর ধর্মচেতনা বা মূল্যবোধের পুনর্গঠন প্রায় অসম্ভব। কিন্তু লোকসাহিত্যের মাধ্যমে পল্লীর এ সকল মানুষকে লোকশিক্ষায় অনায়াসে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব ছিল।

আমাদের পল্লীগ্রামে রূপকথা, ব্রতকথা, পুরাকথা, ইতিকথা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কিন্তু অনায়াসে পল্লীর মানুষকে সামাজিক-নৈতিক-ধর্মীয় মূল্যবোধে, কল্পনাশক্তিতে কিংবা সাহসিকতা ও নান্দনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায়। আমাদের বাংলার প্রবাদ-প্রবচন-ছড়াগুলির মধ্যেই নিহিত রয়েছে আবহমান কালের চিন্তা-চেতনার কেলাসিত (Crystalised) রূপ।

ii. লোকসাহিত্যের মধ্যেই কিন্তু সমাজের নানা আচার-ব্যবহার-প্রথার রূপায়ণ আছে,তাদের মান্যতা বিষয়েও ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিকনির্দেশ অথবা ব্যাক্ষ্যা আছে।তাই এই সাহিত্য মানুষকে অনায়াসে সামাজিক কর্তৃত্বের পরিধি বা সীমানা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে সক্ষম। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন পরাধীন দেশের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীকে রূপায়িত করে তুলতে গেলে সমাজের যে সকল ভ্রান্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবার প্রয়োজন আছে সেই সকল শিক্ষা লাভের লক্ষ্যে পল্লীসাহিত্য চর্চার নিতান্ত প্রয়োজন আছে।

iii. জমির উপর প্রজার কর্তৃত্ব, রাষ্ট্র-প্রজার সম্পর্ক ও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দিকনির্দেশ আছে নানা পুরাকথা বা লোককথায়। সেদিক সম্পর্কে পল্লীর মানুষকে সচেতন করে তুলতে পারে পল্লীসাহিত্য।

iv. রবীন্দ্রনাথ পধীনতার পেষণে অবসন্ন, আশাহীনতার অন্ধকারে নিমজ্জমান পল্লীর মানুষকে লোকসাহিত্যের সংস্পর্শে আনতে চেয়েছিলেন। কারণ পল্লীসাহিত্য বা লোকসাহিত্য—

"......reveals man's attempt to escape in fantasy from the restrictions of his geographic environment, from his own biological limitations as a member of the human species, and from the repressions imposed upon him by society, whether these result from social and economic inequalities, from sexual sexual Taboos or from the Ashanti taboo against laughing at a person afflicted with laws."[৬৩]

v. রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত ছিলেন। পল্লীসাহিত্যের প্রবহমান ধারার মাধ্যমে যাতে সামাজে সাংস্কৃতিক প্রয়াসের নিরবচ্ছিন্নতা ও স্থায়িত্ব বজায় থাকে তার বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলেন। এ কারণেই বিলীয়মান পল্লীসাহিত্যের সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছিলেন তিনি।

vi. রবীন্দ্রনাথের কাছে পল্লীসংগঠন ছিল স্বরাজ সাধনার নামান্তর। তিনি বাংলার গ্রামে গ্রামে স্বরাজ সাধনার ব্রত গ্রহণ করেছেন—একথা একাধিক পত্রে এবং সভা সমিতির

ভাষণে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পল্লীসাহিত্যকে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক ভাবনার অনুকূলে দেশাত্ববোধ সঞ্চারের কাজে, সমাজ-পরবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের প্রয়াস নিয়েছিলেন। মানুষের সংগ্রামকে পরিচালিত ও প্রসারিত করার জন্য চীন, রাশিয়া, কিউবা কিংবা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও লোকসংগীত, লোককথা ইত্যাদির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এর সামাজিক প্রাণনার দিকটিকে মানুষের মধ্যে সঞ্চারের প্রয়াস নিয়েছিলেন।

৬. উৎসবের আয়োজন :

ঠাকুর বাড়ির বিশাল পরিসরে নিয়ত উৎসব অনুষ্ঠানের ঘটা লেগেই থাকতো। এই উৎসব অনুষ্ঠান গুলি কীভাবে এক একটি মূল্যবোধের সংরক্ষক হয়ে উঠেছিল তা রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঐতিহ্যসচেতন ছিলেন বলেই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মপরিকল্পনায় এই সকল উৎসব অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও তাৎপর্যকে সাঙ্গীকৃত করে নিয়ে স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল পুরনো ঐতিহ্যের নবীকরণ চাননি, চেয়েছিলেন আবর্জনা পাঁক থেকে টেনে তুলে, সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় গণ্ডীর থেকে মুক্ত করে নতুন যুগের প্রগতিচেতনা ও রুচিবোধের অনুযায়ী করে তুলতে। তাই বাংলার নানা উৎসব অনুষ্ঠান গুলিকে নবনির্মাণ দান করে তাদের তাৎপর্য ও গুরুত্বকে পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর অনুকূলে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষ্যে যে সকল উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেছিলেন তা সূত্রাকারে নিম্নরূপ।

ক. অরণ্য উৎসব :

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে পল্লীর মানুষদের লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কার পরবকে অবলম্বন করে যে কয়েকটি উৎসবের প্রচলন করেন তাদের মধ্যে অরণ্য উৎসব অন্যতম। একে রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষরোপন উৎসবেরই এক সমান্তরাল ধারা হিসেবে ধরা যেতে পারে। সৃষ্টির আদি মুহূর্ত থেকে অরণ্যই মানুষকে প্রথম তার আশ্রয় ও খাদ্য যুগিয়েছে। তাই অরণ্যের সঙ্গে, নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রাণের এক নিবিড় যোগ গড়ে উঠেছিল প্রাচীন কাল থেকে। তাই মানুষের লোকায়ত বিশ্বাসে অরণ্যদেবতার ধারণাটিকে গড়ে উঠতে দেখি। অরণ্যের বিপুল দানের কথা স্মরণে রেখে তার সংরক্ষণের জন্য, তার প্রতি পল্লীর মানুষের মনে শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ অরণ্য উৎসবের প্রচলন করেন। এই দিনটিতে পল্লীর মানুষদের একত্রিত করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অরণ্যদেবতার পূজার পাশাপাশি বনভোজনের আয়োজন করে থাকেন। এতে পল্লীর মানুষদের জীবনে যেমন আনন্দের বাতাবরণ গড়ে ওঠে তেমনি পাস্পরিক ভেদ জ্ঞান দূরীভূত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়।

খ. বৃক্ষরোপণ উৎসব :

বৃক্ষরোপণ উৎসব অরণ্য উৎসবেরই যে পরিপূরক ছিল সেকথা পূর্বেই বলেছি। প্রাচীন কাল থেকে যে অরণ্য ছিল মানুষের আশ্রয় তা আজ বিনষ্টির মুখে। মানুষের ক্রমবর্ধমান লোভরিপু অরণ্য কেটে আপন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছে। নগর সভ্যতার সমৃদ্ধি ও অগ্রগমনে অরণ্যের ধ্বংসযজ্ঞ ক্রমে বেড়ে গেছে। যন্ত্র সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রসার অরণ্যের অস্তিত্বকে প্রায় বিপন্ন করে তুলেছে। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ মানুষ অরণ্যের স্নিগ্ধ সরস সাহচর্য হারিয়েছে। হয়ে উঠেছে যন্ত্র জীবনের পীড়িত কাতর ব্যক্তিসত্তার প্রতিরূপ। আমাদের চতুর্পার্শ্বের মাটি হয়ে উঠেছে উত্তপ্ত, পরিবেশ দূষিত। মাটির উর্বরতা শক্তিও বিনষ্টির মুখে।

তাই রবীন্দ্রনাথ পল্লীপ্রকৃতিকে রক্ষা করার স্বার্থে বৃক্ষরোপণ উৎসবের সূচনা করেন ১৯২৮ সালের ২১ শে জুলাই। এ উৎসব রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অপব্যয়ী সন্তান কর্তৃক লুণ্ঠিত মাতৃভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ উৎসব।' এই উৎসবের দ্বারা পল্লীর মানুষের নিরানন্দ জীবনে আনন্দের সঞ্চার ঘটাতে চেয়েছিলেন,মানুষের মধ্যে বিভেদ অস্পৃশ্যতা দূর করে সম্প্রীতির বাতাবরণকে গড়ে দিতে চেয়েছিলেন। ১৩১৬-এর ১৮ ই কার্তিক ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজে জানিয়েছিলেন—

" ......আশ্রমে পশুপক্ষী তরুলতার সহিত ছাত্রদের চিত্তের যোগ সাধনের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। গ্রীষ্মে সহকার বনের উৎসব, বর্ষায় সপ্তপর্ণ কুসুমোদ্‌গমের উৎসব, শরতে শেফালি তলের উৎসব, বসন্তে শাল মঞ্জরীর উৎসব উপযুক্ত বেশ, সংগীত ও ভোজ্যের দ্বারা সমাধা করিতে হইবে।............প্রত্যেক বালক একটি করিয়া বৃক্ষরোপণ করিবে এবং প্রত্যহ দুইবেলা তাহার তলা খুঁড়িয়া তাহাতে জলসেচ করিবে—গাছের গোড়ায় শুষ্ক পত্রের সার দিয়া ,যাহাতে গাছগুলি বাড়িয়া উঠে তাহার চেষ্টা করিবে। অধ্যাপকদের কেহ কেহ যদি যোগ দেন তবে ছাত্রেরা উৎসাহ বোধ করিবে।"

আশ্রমের এই বৃক্ষরোপণ উৎসবই পরবর্তীকালে আরো প্রসারিত রূপ নেয়। পল্লীর মানুষ এবং শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের ছাত্র-শিক্ষক সকলে মিলে এই উৎসবকে একটি বিরাট মহতি অনুষ্ঠানের রূপ দান করেন।

গ. হলকর্ষণ উৎসব :

শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের মতই হলকর্ষণ বা 'সীতাযজ্ঞ' অনুষ্ঠানটিও অন্যতম বিশিষ্ট উৎসব হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-অনুচর কৃষ্ণ কৃপালনী জানিয়েছেন—

"It was during the rainy season of this year 1928, that Tagore introduced two new Seasonal festivals, Vriksha Ropana (Tree planting) and Hala-Karshana (ploughing) at Santiniketan and Sriniketan respectively. These picturesque festivals with their simple and artistic ceremonials accompanied by music dancing and vedic chanting,invoking nature's fertility and symbolizing its ever recurring youth, are still celebrated annually and attract crowds of visitors from the neighbouring countryside and from Calcutta." [৬৪]

এই উৎসবের পিছনে পল্লীসংগঠক রবীন্দ্রনাথের অন্য উদ্দেশ্যও কাজ করেছিল। এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত চাষি সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভদ্রজনের সেতুবন্ধন রচনা করতে চেয়েছিলেন। পল্লীর চাষিদের প্রতি শহরের কিংবা গ্রামের ভদ্র সম্প্রদায়ের ঘৃণা ও উপেক্ষা নিদারুণ হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবের মাধ্যমে গ্রাম শহরকে এক সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিলেন। কলকাতার অনেক ভদ্রমহোদয় যে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আসতেন সেকথা কৃষ্ণ কৃপালনীর পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য থেকেই জানা যায়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পল্লীর মানুষের মধ্যেকার পারস্পরিক যে ভেদ চেতনা, যে বিচ্ছিন্নতা তাকে দূর করার অভিপ্রায়ও এই উৎসব পরিকল্পনার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। কেননা রবীন্দ্রনাথ পল্লীগ্রামে দেখেছিলেন— "......নমঃশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না—অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহার অযোগ্য বলিয়াছে।"[৬৫] এই সামাজিক অপহ্নবকে দূর করার অভিপ্রায়েই রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িক হলকর্ষণ উৎসবের পরিকল্পনা।

ঘ. নবান্ন উৎসব :

হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন কর্মসূচীর বিশেষ অঙ্গ ছিল 'নবান্ন' উৎসব। পল্লীর নিরানন্দ নিষ্প্রাণ জীবনকে আনন্দমুখর করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ পল্লীর প্রতিটি ক্রিয়া আচারকে একটি পরিব্যাপ্ত উৎসবের রূপ দিতে চেয়েছিলেন। এই উপলক্ষ্যে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিকেতনে পল্লীর মানুষজনের উপস্থিতিতে ছাত্র-শিক্ষক সকলেই নবান্ন উৎসব পালন করেন। তখন থেকে শুরু করে শ্রীনিকেতনে নবান্ন উৎসব প্রতিবছর পালিত হয়ে থাকে। মাঠের থেকে নতুন ফসল ওঠার সময় ঘরে ঘরে নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে শ্রীনিকেতনের শিক্ষক-ছাত্র-শিক্ষাকর্মী থেকে শুরু করে গ্রামের বিপুল সংখ্যক মানুষ বিভেদ ও বিরোধ ভুলে একতাবদ্ধ হয়। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

"এবার 'নবান্ন'। বহু বৎসর পূর্বে কবি এ বিষয়ে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহাকে নূতন রূপ দান করা হইল শ্রীনিকেতনে।"[৬৬]

এইদিন শ্রীনিকেতনে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পর ছাত্র-ছাত্রীরা 'নতুন ধান্যে হবে নবান্ন তোমার ভবনে ভবনে' গানটি গেয়ে উৎসবের সূচনা করে। পল্লীর জীবনে রবীন্দ্রনাথ এভাবেই আনন্দের সঞ্চার ঘটিয়ে মুমূর্ষু কৃষকের প্রাণকে পুনর্জীবিত করে তোলার প্রয়াস নেন।

ঙ. শিল্পমেলা : (বিশ্বকর্মা পূজার দিন)

মেলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের টান ছোট থেকেই। শৈশবে ঠাকুরবাড়ির ভৃত্যদের সঙ্গে হিন্দুমেলায় যাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জানিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি'তে। এই মেলাতে অংশগ্রহণ করে চৌদ্দ বছর বয়সে (১৮৭৫) উদ্দীপনাপূর্ণ দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ করেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দের শিবাজী উৎসবের অনুকরণে সরলাদেবী চৌধুরানী যে প্রতাপাদিত্য উৎসব (এপ্রিল, ১৯০৩) এবং উদয়াদিত্য উৎসব (জুলাই, ১৯০৩)-এর আয়োজন করেন তার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ পরিচিত ছিলেন। এই সকল মেলার তাৎপর্য ও গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে উপলব্ধি করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের শিল্পমেলার বিকাশ বিবর্ধনের পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ মানসিকতাই ক্রিয়াশীল ছিল।

১৯০১-এ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন ,তার উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলা। ভালো মানুষ তৈরির কারখানা হলেও শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম শিক্ষার বাস্তব উপযোগিতা সৃষ্টিতে অক্ষম, শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করতে অসমর্থ—এমন এক অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই উত্থিত হচ্ছিল। এরই নিরসন কল্পে পল্লীসংগঠনের পরিপূরক করে রবীন্দ্রনাথ ১৯২২-এ শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনিকেতনের চারটি উপবিভাগের অন্যতম বিভাগ ছিল শিল্পভবন। রবীন্দ্রনাথ বৃত্তিমুখী পল্লীশিক্ষার যে আয়োজন করেন, শিল্পভবনকে ঘিরেই তার রূপ বিকশিত হয়ে ওঠে। পল্লীর সাধারণ ছেলেমেয়েরা এখানে হাতে কলমে কাজ শেখার সুযোগ পায়। সূচীশিল্প, মাটির নানা শিল্পসামগ্রী, চামড়ার দ্রব্যাদি, কাঠের কাজ, বৃক্ষজাত দ্রব্যসামগ্রী নির্মাণের কাজ এখানে শেখানো হত। সারাবছরই এখানকার ছেলেরা নানা রকমের যন্ত্রপাতি নিয়েকাজ করতেন। তাই এখানকার শিক্ষার্থীরা একদিন নিজেদের স্বল্প সামর্থে বিশ্বকর্মা পূজা শুরু করেন। পার্শ্ববর্তী গ্রাম সুরুল থেকে ব্রাহ্মন পুরোহিত এনে পুজো হত। ছাত্র-শিক্ষক, শ্রীনিকেতনের কর্মী এবং আবাসিকরা সকলেই এই উৎসবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মিলিত হতেন। চাঁদা তুলে শ্রীনিকেতনের সুখসায়রের বটতলায় খিচুড়ি রান্না করে সকলে খেতেন। এই উৎসবই পরবর্তীকালে শিল্পমেলা নাম নিয়ে নবীন মূর্তি পরিগ্রহ

করেছিল। শ্রীনিকেতনে নির্মিত দ্রব্যসামগ্রীর বিপননের এটিও একটি বড় মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।

ঙ. পৌষমেলা :

১৮৪৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে (৭ ই পৌষ, ১২৫০) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র ২২ বৎসর বয়সে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিলাস ত্যাগ করে সেদিন থেকেই দেবেন্দ্রনাথ সত্যের আদর্শ রক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনিই বোলপুরে প্রতিষ্ঠিত করেন শান্তিনিকেতন। এখানেইই তিনি উপলব্ধি করলেন সেই পরম এককে যিনি প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি। এখানে পস্পরের বিচ্ছেদ নয়, সকলের সঙ্গে সকলের যোগ। শান্তিনিকেতন সেই ভাবেরই অভিব্যক্ত রূপ মাত্র—'যথা বিশ্ব ভবেত্যেক্য নীড়ম্'।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতন আশ্রমের এবং উৎসবাদির ব্যয়ভার চালানোর জন্য জমিদারীর অংশ থেকে ১৮০০ টাকা বার্ষিক আয়ের একটি স্থাবর সম্পত্তির দান সংক্রান্ত যে ট্রাস্টি ডিড সম্পাদনা করেন তাতে বলা হয়—

"......ধর্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রাস্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল সম্প্রদায়ের সাধু পুরুষেরা আসিয়া ধর্মপ্রচার ও ধর্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোনোপ্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কোনো কালে এই মেলার দ্বারা কোনোরূপ আয় হয় তবে ট্রাস্টীগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন।"[৬৭] ডিড সম্পাদিত হবার পর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯১-তে এবং ১৮৯৪ সালের ৭ই পৌষ থেকে এই মেলার সূচনা হয়। এই মেলা বসে পূর্বপল্লীর মাঠে। বাউল, ফকির, দরবেশ প্রমুখের উপস্থিতি মেলাপ্রাঙ্গণকে গানের সুরে মুখরিত করে তোলে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে পল্লীর মানুষেরা হাতের নানা কাজ, দ্রব্যসামগ্রী, লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানকে তুলে ধরার সুযোগ পায়। নানান জিনিসপত্রের কেনাবেচা চলে মেলায়। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা দোকানপত্র ও মানুষজনে মেলাপ্রাঙ্গন জমজমাট হয়ে ওঠে। পল্লীর মানুষ সব বিভেদ ভুলে এই মেলার আনন্দ ও উপযোগিতাকে গ্রহণ ও আস্বাদন করে।

চ. শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব :

শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠার দিনটিকে (১৯২২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী) স্মরণীয় করে রাখার জন্য শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু এর তাৎপর্য

ছিল আরো গভীর। যাইহোক, এই উৎসবের সূচনা অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় শ্রীনিকেতনের ফ্রেস্‌কো মঞ্চে। নন্দলাল বসুর আঁকা হলকর্ষণের ছবি মঞ্চের পিছনে দেওয়াল জুড়ে টাঙানো হয়। বৈদিক মন্ত্র পাঠ, রবীন্দ্ররচনা থেকে পাঠ ছাড়াও ছিল সভাপতি ও প্রধান অতিথির ভাষণ। এই উৎসবে প্রথম দিকে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক কার্যবিবরণীর উপস্থাপন করা হয়। শ্রীনিকেতনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ 'শিল্পসদন' ও 'শিক্ষাচর্চা' প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিদর্শপত্র ও অভিজ্ঞান পত্র দান করা হয়ে থাকে। তারপর কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনীর উদবোধন করা হয়। এতে কৃষিকাজ ও পশুপালন সংক্রান্ত নানা উপদেশ দান করা হত। পোলট্রি, গাভীর পাশাপাশি নানা কৃষিজাত দ্রব্য পাশাপাশি গ্রামগুলি থেকে কৃষকেরা এই উৎসবে নিয়ে আসেন এবং তাদের গুণগত মান যাচাই করে চাষিদের পুরস্কৃত করা হয়। এতে চাষিরা নতুন কর্মোদ্যম লাভ করে এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার বাতাবরণ গড়ে তোলে। পল্লীর মানুষকে আত্মনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলার এটি একটি মহৎ প্রয়াস অবশ্যই। বিভেদকে সরিয়ে সকল চাষিকে এই গ্রামীণ উৎসবে ঐক্যবদ্ধ করে তোলাও এ অনুষ্ঠানের বিশেষ অভিপ্রায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

৭. আত্মশক্তির উজ্জীবন প্রয়াস :

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর মূল লক্ষ্যই ছিল গ্রামে গ্রামে 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠা—একথা পূর্বেই বলেছি। এই স্বরাজের অর্থ ছিল স্বনির্ভর পল্লীপুনর্গঠন। রবীন্দ্রনাথের মতে পল্লীর মানুষ নিজের অন্তর্গত শক্তির যথাযথ বিকাশ ঘটাতে পারলে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। আর এই আত্মশক্তিতে উদবুদ্ধ পল্লীর মানুষই স্বনির্ভর পল্লী গঠনে সক্ষম হবে। রবীন্দ্রনাথ তাই পল্লীর মানুষের অন্তর্গত শক্তিকে উজ্জীবিত করে তোলার জন্য নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করেন:

ক. ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা :

সত্তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের মধ্যেকার শক্তির বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় গড়ে ওঠে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই থাকে একপ্রকার সৃজনশীল শক্তি। সেই সৃজনীপ্রতিভা অনেক সময়ই অন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বশবর্তী হয়ে বিকাশের পথ খুঁজে পায় না। কিন্তু ব্যক্তিসত্তা নিজেই জানে তার প্রকৃত শক্তির ক্ষেত্রকে। আপন সেই শক্তি ক্ষেত্রে বিকশিত হয়ে ওঠার জন্য সর্বপ্রকার দাসত্বকে ছাড়িয়ে ওঠার নিতান্ত প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা তাই এক্ষেত্রে নিতান্ত কাম্য হয়ে থাকে।

খ. চেতনার স্বাধীনতা :

মানুষের মধ্যেকার শক্তির সর্বাপেক্ষা বড় উৎস হল মানুষের মন। সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত মনই চেতনার প্রগতিকে বয়ে আনে। মানুষের মন যখন নানা সামাজিক কুসংস্কার ও অভ্যাসের জালে নিজেকে আটকে রাখে, তখন সেখানে চলে ব্যক্তিসত্তার 'দন্ডে দন্ডে ক্ষয়'। মনের মধ্যে সঙ্কীর্ণতার মলিন বাতাস চেতনাকে করে কলুষিত, অসুস্থ। বৃহৎ পৃথিবীর বাতাস সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। পৃথিবীর নব নব চিন্তা-চেতনাও সেখানে প্রবেশাধিকার হারায়। মানুষ বৃহৎ পৃথিবীর মাঝে স্বতন্ত্র করে বাঁচার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না। চেতনার বিশালতা বা ব্যাপ্তি মানুষকে এ সকল প্রতিবন্ধকতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে। তার জন্যই চাই চিন্তন ও মননের স্বাধীনতা, উদার বিচার বুদ্ধির ক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ-শাহজাদপুরে দেখেছিলেন পল্লীর মানুষের অশিক্ষা কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস তাদেরকে কীভাবে জীবনের সঙ্কীর্ণ ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে রেখেছে। পল্লীর মানুষের স্বার্থে প্রগতিশীল কাজ করতে গেলেও জমিদার রবীন্দ্রনাথের সে প্রগতিচেতনাকে অনেক পল্লীবাসীই সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেনি। তাঁরা এর পিছনে নানা অভিসন্ধিকেই দেখেছেন। এর পিছনে স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণীর মানুষের প্ররোচনা অবশ্যই কাজ করেছিল। কিন্তু তাদের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে স্বাধীন চেতনায় তারা রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাজকে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তাই শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের মুক্ত চেতনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য চেতনার স্বাধীন বিকাশের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

গ. রাজনৈতিক স্বাধীনতা :

রবীন্দ্রনাথ পল্লী উন্নয়ন কর্মে অগ্রসর হয়ে কৃষকের প্রধান সমস্যাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বলেই জেনেছিলেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া পল্লীর মানুষের আত্ম-উন্নয়ন আসম্ভব। আমাদের দেশ তখনো পরাধীন। ইংরেজের শোষণ পীড়ন তখনো অব্যাহত। জমির উপর তখনো প্রজার স্বত্ব স্বীকৃত হয়নি। পল্লীর এ হেন মানুষের কল্যাণের দায়িত্ব বেনিয়া ইংরেজ বা স্থানীয় সুবিধাবাদী শ্রেণী যে গ্রহণ করবে না তাই-ই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের সহযোগী কৃষিবিজ্ঞানী এল্‌মহার্স্ট এ বিষয়ের দিকনির্দেশ করে জানিয়েছেন—

" The Poet, who regularly discussed our local problems with Kalimohon ghosh, our contact man with the local villagers, advised us to approach the District Board for help. But at Santiniketan there were those who stood firmly behind the political programme. They looked

with skepticism, and even with distaste, at at the Poet's new venture at Surul."[৬৮]

রবীন্দ্রনাথ একারণেই রাজনৈতিক নেতাদের দেশোদ্ধারের কার্যাবলীর উপর আদৌ বিশ্বাস রাখতে পারেননি। তিনি স্পষ্ট ও সোজা সাপটা ভাষায় জানিয়েছিলেন— " একটা বড় আশ্চর্য জিনিস দেখছি এই বাংলা দেশে, যে সব পুরুষ এখানে দেশনেতার সম্মান লাভ করেন, নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মত ঘর-ভাঙাভাঙির খেলাকেই তাঁরা উচ্চ রাজনীতি ব'লে ঘোষণা করেন। তাঁদের পুরুষত্বে এতটুকু বাধে না। এখানকার লোকে তাই তিলে তিলে কিছু গড়ে তোলবার জন্যে দল বাঁধে না, দল বাঁধে গড়া জিনিসকে ভাঙবার পৈশাচিক আনন্দে। এ জিনিসকেও ক্ষমা করা যেত, যদি না দেখতাম, পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি তার দংস্ট্রা বের করে আছে।"[৬৯]

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, রাজশক্তির মুখাপেক্ষী না থেকে দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মীর উচিত, পল্লীর এক একটি গ্রামকে বেছে নিয়ে তার উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করা, পল্লীর 'স্বরাজ' আনয়নে সাধনা করা। তবেই পল্লীর মানুষ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে আপন প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজে পাবে, আত্মশক্তিতে সমুন্নত হবে।কৃষকের আত্ম-উজ্জীবন প্রয়াসকে রাজশক্তি সর্বদা সহজ ভাবে নেয়নি। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের উন্নয়নমুখী কর্মপরিকল্পনার মাঝে শাসকদল তাই নানা ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পেয়েছে। স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে প্রজাশক্তির উত্থানের প্রয়াসকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কর্মের সত্যনিষ্ঠা তাঁকে রক্ষা করেছে বার বার।পল্লীর মানুষের আত্ম-উজ্জীবনের প্রয়াস থেকে তিনি সরে আসেননি।

ঘ. নারীর স্বাধিকার :

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন পল্লীর পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে নারীরা সম্পূর্ণ অবহেলিত।তারা আসাধারণ সহিষ্ণুতা নিয়ে পল্লীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অজস্র প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সংসার প্রতিপালনে নিয়োজিত থাকলেও পুরুষ তাকে তার যোগ্য সম্মান ও অধিকার প্রদান করেনি। তারা সমাজে অবহেলিত ও নির্যাতিত হয়ে চলেছে।শিলাইদহে বাসকালে এমনি এক নারীর কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথের কর্মসহযোগী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী শুনিয়েছেন যাকে পদ্মার জল থেকে তুলে বাঁচিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ:

"...বহু কষ্টে প্রায় আধঘন্টা পরে সেই ভাসমান নারীদেহ বোটের উপর আনা হল......রবীন্দ্রনাথ একখানা কাপড় দিয়ে তৎক্ষনাৎ ঐ অচৈতন্য নারীদেহ মুড়ে দিয়ে বোটের কামরার ভিতরে নিয়ে গেলেন। মহা উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার মধ্যেও খুব ধীর ভাবে তার

প্রাথমিক শুশ্রূষা করলেন নিজেই ক্ষীপ্রহস্তে.....রবীন্দ্রনাথ দুধ আনালেন| দুধ গরম করে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে মেয়েটাকে খেতে দিল...........মেয়েটি তেইশ-চব্বিশ বছরের, শিলাইদহ (কশবা) গ্রামের কোন অধিবাসীর বউ সে, জাতিতে কায়স্থ। সাংসারিক অশান্তি, পারিবারিক কলহ, বিশেষতঃ স্বামীর দুর্ব্যবহারে সে পদ্মায় ঝাঁপ দিয়েছিল।”[৭০]

স্বামী এবং শ্বশুর কুলের দ্বারা অত্যাচারিত এমন বহু নারীর খবর রবীন্দ্রনাথ জানতেন। ‘দেনাপাওনা’, ‘শাস্তি’, ‘সমাপ্তি’, ‘স্ত্রীর পত্রে’র মত গল্পগুলিতে অনুরূপ নারীর ছবিই প্রাধান্য পেয়েছে। মৃণাল, অনিলা, মহামায়ার মত নারীরা তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে আপন স্বাধিকার প্রার্থনা করেছে। আসলে ঠাকুর বাড়ির প্রগতিশীলা যে সকল নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাদের স্বাধীনতা, স্বাধিকার, প্রগতিচেতনা ও বৃহত্তর সমাজক্ষেত্রে ভূমিকাকে প্রত্যক্ষ করেই নারীর প্রগতিশীলা ও স্বাধিকার সম্পন্না হয়ে ওঠার স্বপক্ষে মত পোষণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে পল্লীর নারীসমাজকে তারই অনুযায়ী করে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন। দেশের অর্ধেক শক্তি যে এই নারী সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে, সেকথা স্মরণ করেই দেশ তথা পল্লীর উন্নয়ন কর্মে নারীশক্তির সম্মেলন চেয়েছিলেন। তাই তাদের মধ্যেকার নিহিত নারীশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাদের স্বাধিকার সংরক্ষনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে ‘ঘরের মেয়ে’দের ‘বিশ্বের মেয়ে’ করে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ|

৮. অস্পৃশ্যতা ও জাতপাতের ভেদাভেদ দূরীকরণ :

রবীন্দ্রনাথ ঐক্যবদ্ধ পল্লী গড়ে তোলার জন্য সমস্ত রকম জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার মূল পল্লী থেকে দূর করার প্রয়াস নিয়েছিলেন|পল্লীর মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার,মেলার আয়োজন,উৎসবের প্রচলনের দ্বারা এই বিভেদ ও অস্পৃশ্যতার প্রাচীরকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলেন।

৯. পত্র-পত্রিকার প্রকাশের দ্বারা বিশ্বচেতনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন :

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের মনে তথা কর্মীদের মধ্যে প্রগতিচেতনাকে সঞ্চার করার অভিলাষে একাধিক পত্র-পত্রিকাও প্রকাশ করেন। বিশ্বের নানা প্রান্তে কীভাবে প্রগতিচেতনার বিকাশ ঘটছে, তার দ্বারা আলোড়িত হয়ে বিশ্বের নানা দেশে কোন পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে সেই সংবাদ পল্লীর মানুষের মানসগোচর করে তোলার জন্য একাধিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভূমিলক্ষ্মী, ভাণ্ডার, শান্তিনিকেতন মাসিক পত্রিকা এরই অনিবার্য ফলশ্রুতি।

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন :

১. যৌথচাষ বা সমবায় কৃষিভাবনা :

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার রবীন্দ্রনাথের পল্লোপুনর্গঠন কর্মসূচীর একটি প্রধান ও বড় অঙ্গ ছিল যৌথ কৃষি বা সমবায় পরিকল্পনা। ১৯০৬-০৭ সাল থেকেই কুষ্ঠিয়া, শিলাইদহ ও পতিসরে রবীন্দ্রনাথ সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকাজের বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। সেই সময়ের তেমন কোন তথ্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে স্মৃতিচারণ সূত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

"কুঠিবাড়িতে বসে দেখতুম, চাষীরা হালবলদ নিয়ে চাষ করতে আসত; তাদের ছোট ছোট টুকরো টুকরো টুকরো জমি। তারা নিজের নিজের জমি চাষ করে চলে যেত, আমি দেখে ভাবতেম—অনেকটা শক্তি তাদের অপব্যায় হচ্ছে। আমি তাদের ডেকে বললুম 'তোমরা সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ করো; সকলের যা সম্বল আছে সামর্থ্য আছে তা একত্র করো; তা হলে অনায়াসে ট্রাকটর দিয়ে তোমাদের জমি চাষ করা চলবে। সকলে একত্র কাজ করলে জমির সামান্য তারতম্যে কিছু যায় আসে না, যা লাভ হবে তা তোমরা ভাগ করে নিতে পারবে। তোমাদের সমস্ত ফসল গ্রামে একজায়গায় রাখবে, সেখান থেকে মহাজনেরা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে।"[৭১]

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন চাষের ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যয় বলে অর্থনীতিকেন্দ্রিক যে ধারণা আছে, কৃষি-উপাদানগুলির সদ্ব্যবহারের দ্বারা সেই ব্যয় কমিয়ে লভ্যাংশকে সুদৃঢ় করা। এতে উৎপাদন ও ভোগের কাজের সম্পদ গুলির সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা (efficient use of resource) সবচেয়ে বেশি লাভ পাওয়া সম্ভব হয়।

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, পল্লীর চাষীদের জমির আলপথগুলি আঁকাবাঁকা। তাদের জমিগুলি খণ্ডখুদ্র। সেগুলির চাষের পক্ষে লাঙল কখনো বা যথোপযোগী, কখনো বা অতিরিক্ত, কখনো বা অনুপযোগী। এতে প্রত্যেক কৃষক আলাদা আলাদা ভাবে কৃষিকাজ করতে গেলে তাদের যা শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়, তা লভ্যাংশের প্রায় কাছাকাছি। এতে কৃষকের তেমন লাভ থাকে না। তাছাড়া আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং ট্রাক্টর ইত্যাদি সহযোগে চাষাবাদ করলে উৎপাদন ও লভ্যাংশ অনেক বেশি হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন কৃষকদের জমির সীমানা মুছে দিয়ে সমবায়ের দ্বারা একত্র চাষাবাদ প্রচলন করতে। এতে সর্বাধিক কম খরচে উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পায়,তেমনি শ্রমের সাশ্রয়ও সম্ভবহয়। সমবায় প্রথায় উৎপাদিত ফসল একত্রে জড়ো করে বিক্রির সুবিধা থাকায়

কৃষকদের পক্ষে অধিক মূল্য লাভ করা সম্ভব হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ যদিও জমির উপর প্রজার স্থায়ী স্বত্ত্বের স্বপক্ষে সওয়াল করেছেন, তবুও নিজের জমিদারিতে কিন্তু তিনি সেই কাজ করে দেখাতে পারেননি। আসলে রবীন্দ্রনাথের ভয় ছিল অন্যত্র। প্রজাকে জমির স্বত্ত্ব দান করলে ঘুরপথে তা মহাজনের হাতে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই ভূমি সংস্কারের জন্য স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শকে বাস্তব রূপদানে অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল। তবু সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে থেকে পল্লীর যতটুকু উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব, তার যথোচিত প্রয়াস নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সমবায় ভাবনা কিন্তু নিছক যৌথ চাষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়নি। কবি তাঁর সমবায় সমবায় ভাবনাকে পল্লীর জীবনের প্রায় সমস্ত স্তরেই পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। এভাবেই ক্রমে গড়ে ওঠে পল্লীর আপৎকালীন ধর্মগোলা (১৯২৪), সেচ সমবায় (১৯২৪), রায়পুরের লেবার ব্যাঙ্ক (১৯২৭), ঋণদান সমবায় সমিতি (মহিদাপুর, ১৯২৯), ক্রেতা সমবায় সমিতি, ধান বিক্রয় সমবায় সমিতি (১৯২৯), স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি (১৯৩২)। শিক্ষা, সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কেননা তৎকালীন পল্লীগ্রাম জাতপাত অস্পৃশ্যতার বেড়াজালে বিচ্ছিন্ন ছিল। দলাদলি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব পল্লীর মানুষদের মধ্যে লেগেই থাকতো। অথচ এদের সকলের সহায়তা ভিন্ন সমবায় পরিকল্পনাকে সফল করে তোলাও ছিল প্রায় অসম্ভব। কারণ রবীন্দ্রনাথের পল্লীসমবায় ছিল এক অর্থে মানব সমবায়েরই নামান্তর। পল্লীর মানবিক মানোন্নয়নের পরিপূরকতায় গড়ে তুলেছিলেন তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল। রবীন্দ্রনাথ যে মানব বিশ্বের পরিকল্পনার কথা ভেবেছিলেন, তাতে একটিকে অপরটির থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবেননি। তাই রাশেলের মতোই রবীন্দ্রনাথ প্রজার অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের অনুপূরক হিসেবে প্রজার সার্বিক মানসমুক্তি তথা আত্মশক্তির বিকাশ চেয়েছিলেন। ড. শশধর সিন্‌হা একারণেই রবীন্দ্রনাথের সমবায় পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—“ Like the Irish poet George Russel (A.E.) Tagore firmly believed that the poverty, disease, depopulation, joylessness and backwardness of the rural areas could and should be removed by co-operative efforts”[৭২]

২. গ্রাম ও নগরের পার্থক্য দূরীকরণ :

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন বাংলার শহরাঞ্চল গুলিতে সম্পদের সঞ্চয় পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে যতটা পল্লীগুলি ঠিক ততটাই নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। ফলে গ্রামের একটি বড় সংখ্যক মানুষ সেকালে কিংবা আজো শহরমুখী। সমবায়ের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাই চেয়েছিলেন সম্পদের সুষম বন্টন। এতে ধনী দরিদ্রের ক্রমবর্ধমান পার্থক্যকে যেমন দূরীভূত করা করা যায় তেমনি গ্রাম ও শহরের মধ্যে অর্থনৈতিক যে অসাম্য গড়ে উঠেছে, স্বয়ম্ভরতা অর্জনের

প্রশ্নে যে দ্বৈততার সৃষ্টি হয়েছে, তারও নিরসন সম্ভব বলে তিনি মনে করেছেন। পল্লীর সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যেমন শহুরে নিঃসঙ্গ জীবনের পথপ্রদর্শক হতে পারে তেমনি শহরের ব্যক্তিস্বাধীনতা, মনীষা পল্লীরও কর্মসহায়ক হতে পারে। একজন যদি অন্যকে খাদ্য, স্বাস্থ্য, সৌভ্রাতৃত্বের চেতনা দ্বারা সমৃদ্ধ করতে পারে তাহলে অন্যজন সম্পদ, জ্ঞান এবং শক্তি যোগান দিতে পারে।

নগরজীবনে যন্ত্রের যে সমূহ বিকাশ, তার শক্তিকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেননি। তাকে মানবকল্যাণের কাজেই ব্যবহার করতে চেয়েছেন। সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পল্লীর উন্নয়ন চেয়েছেন। স্বদেশী যুগে বয়কট আন্দোলন বিরোধিতার মূলেও অনুরূপ মানসিকতা কাজ করেছে। যন্ত্রকে খারাপ কাজে লাগিয়েছে মানুষেরই এক বিশেষ সম্প্রদায়। সেটা যন্ত্রের দোষ নয়, দোষ যন্ত্র-মানসিকতার। তার জন্য তিনি নিছক যন্ত্র বা নাগরিক সভ্যতাকে দোষারোপ করেননি। তিনি যন্ত্রের দ্বারা পল্লীর উকে উন্নয়নের জোয়ার আনতে চেয়েছেন। আজকের কৃষি-শিল্পকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজ্যে যে বিরাট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট তারও সমাধান আছে রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-শহরের বিভেদ দূরীকরণের বিশেষ চেষ্টার মধ্যে। সুতরাং গ্রাম-শহরের বিভেদ দূর করে তাদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা কোনো 'mutual exploitation' নয়; ব্যক্তিক, মানসিক, সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক সুষম বিকাশের জন্যই রবীন্দ্রনাথ গ্রাম ও নগরের বিভেদকে দূরীভূত করতে চেয়েছিলেন, সুষম সমাজ-প্রগতির রূপরেখা নির্মাণ করেছিলেন।

৩. মানব কল্যানের অনুকূলে যন্ত্রের ব্যবহার :

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ-পতিসর পর্ব থেকেই যে পল্লীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে আধুনিক যন্ত্রসামগ্রী ব্যবহারে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেকথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। শ্রীনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে সমবায় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাকে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রের উপরই তিনি অধিক নির্ভর করতে চেয়েছেন। এতে শ্রম ও খরচ যেমন বাঁচে তেমনি উৎপাদনের পরিমাণ অনেক গুণ বেড়ে যায় বলে কৃষক অধিক পরিমানে লাভবানও হতে পারে। ট্রাক্টর, গম ও শস্য পেষাই করার কল, আখ মাড়াই করার কল, পাট বাঁধাই করার কল, সেচের পোর্টেবল পাম্প মেশিন ইত্যাদি ব্যবহারের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট। শ্রীনিকেতনের কারুশিল্পে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ আধুনিক যন্ত্রসামগ্রীর ব্যবহারে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন—

" কারুশিল্পের উৎপাদনে সঠিক আধুনিক প্রয়োগ-প্রযুক্তির ব্যবহার করলে উৎপাদনের মান বেড়ে যায়। শিল্প উৎপাদনও অনেক বৃদ্ধি পায়। দরকার পড়ে উন্নত মানের মেশিন—সঙ্গে মেশিন-শপ ও পাওয়ার হাউস। রথীন্দ্রনাথের শিল্প সাধনায় প্রযুক্তির আমন্ত্রণ স্বাভাবিক ছন্দে

এসে মিলত। শ্রীনিকেতনে মেশিন-শপ ছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ছোটো পাওয়ার প্ল্যান্ট ও কাঠের আসবাব তৈরির জন্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র বসানো হয়েছিল। মেশিন-শপে গ্রামের মানুষের উপযোগী গোরুর গাড়ীর চাকা , লোহার উনুন, ও গেরস্থালীর বাসনপত্র তৈরি হত। কৃষি যন্ত্রপাতি, চরকা ও নানান মডেলের উনুন পাওয়া যেত। পাওয়ার হাউসের অয়েল ইঞ্জিন ও জেনারেটার দিয়ে খামারের সেচের পাম্প চলত। ওদিকে ডেয়ারির খড়-কাটাই মেশিন-শপ চলত। কামারশালার কাজে স্থানীয় ছেলেদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হত যাতে তারা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে।”[৭৩]

আশ্রমিক শিক্ষার প্রাথমিক পর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের ছাত্রদের যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষাদানের প্রতিও যে মনোযোগী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় সুধীর রঞ্জন দাশের ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’ বইটিতে। বোলপুরে কবি একটি টেকনিক্যাল বিভাগ গড়ে তোলারও পকল্পনা করেছিলেন। বন্ধুবর জগদীশ চন্দ্র বসুকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বলেছেন—

“ আমি যেমন করিয়া পারি বোলপুর টেকনিক্যাল বিভাগ খুলিব|ধর্মপাল আমাকে গোটাকতক কল দিতে স্বীকার করিয়াছে।তাহার কতকগুলি কৃষি ব্যাপারের যন্ত্র আছে, একটা কাপড় কাচিবার আমেরিকান কল আছে। সে বলে আমি যদি আমি যদি টেকনিক্যাল বিভাগ খুলি তাহা হইলে আমাকে সাহায্য যোগাড় করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার condition এই যে টেকনিক্যাল বিভাগের নাম রাখিতে হইবে Indo-American Industrial School. আমি তাহাকে লিখিয়াছি সাহায্যের পরিমাণ যদি যথেষ্ট এবং যথার্থ কাজের হয় তাহা হইলে আমেরিকার ঋণ স্বীকার করিতে আপত্তি করিব না।”[৭৪]

৪. স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম পরিকল্পনা :

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের অভাব দারিদ্র্য দূরীকরণের দ্বারা পল্লীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই স্বনির্ভরতা অর্জনের নামান্তর ছিল স্বায়ত্ত্বশাসিত গ্রাম পরিকল্পনা। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজের মুখাপেক্ষি হয়ে বসে থাকলে যে পল্লীর উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই পল্লীর নিজের দায়িত্ব যে পল্লীর মানুষকেই গ্রহণ করতে হবে—একথা শিলাইদহ-পতিসর পর্বেই রবীন্দ্রনাথ বুঝে গিয়েছিলেন। তাই সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকাজের দ্বারা পল্লীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ম্ভর করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। একাধিক সংগঠন গড়ে তুলে রবীন্দ্রনাথ স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীনিকেতনের আশেপাশের গ্রামেই তেরোটি পল্লীসমিতি গড়ে তোলেন। এছাড়াও গড়ে তোলেন ‘ব্রতীসংঘ’—এলমহার্স্টের নেতৃত্বে পল্লীর উন্নয়নে যা ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ধীরানন্দ রায়ের নেতৃত্বে কাজ করে যায়| এই সংঘ ও সমিতি গুলির

মধ্যস্থতায় রবীন্দ্রনাথ পল্লীর স্বাবলম্বন শক্তির বিকাশের যাবতীয় পরিকল্পনা করেন। পল্লীকে এইভাবে সকল দিক থেকে স্বনির্ভর করে তোলাই রবীন্দ্রনাথের কাছে 'স্বরাজ' সাধনার নামান্তর ছিল।

৫. গ্রামমণ্ডলী-গ্রামসমাজ গঠন :

বিরোধিতার কারণে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলীপ্রথাকে তেমনভাবে সফল করে তুলতে না পারলেও পতিসরে কিন্তু এই প্রথার সফল প্রয়োগ ঘটান। এই মণ্ডলী প্রথাকেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর আবশ্যকীয় অঙ্গ করে তোলেন এবং তাকে বহুমাত্রিক বিন্যাস দান করেন। রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে যে সকল সংগঠন ও নানা পল্লীসমিতি গড়ে তোলেন তা গ্রাম-সমাজ বা গ্রামমণ্ডলীরই কর্মসহায়ক শাখাবিশেষ। রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে যে সমবায় আন্দোলনের দ্বারা কৃষি-সমবায়, শিক্ষা-সমবায়, স্বাস্থ্য-সমবায় ও শিল্প সমবায়ের আন্দোলনকে ব্যাপক ও পরিব্যাপ্ত রূপ দিতে চান তারও প্রধান অবলম্বন ছিল গ্রাম-মণ্ডলী বা গ্রাম-সমাজ। সুতরাং পল্লীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই দুটি প্রশাসনিক কাঠামোর একটি বড় ভূমিকা ছিল।

৬. কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন :

গ্রামীণ কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠার দ্বারা পল্লীর অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের যে পরিকল্পনা করেন তারই অনিবার্য ফসল ছিল শ্রীনিকেতনে শিল্পভবনের প্রতিষ্ঠা (১৯২২)। এলম্‌হার্স্টের সহায়তা ও কর্মোদ্যমে রবীন্দ্রনাথ কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবনের দ্বারা পল্লীর মানুষের দারিদ্র্য দূর করার প্রয়াস নেন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শিল্পসমূহের বিকাশ সাধনে প্রয়াসী হন রবীন্দ্রনাথ—

ক. হস্তশিল্প :

শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীতে গ্রামীণ মানুষের হাতের তৈরি নানাপ্রকার শিল্পসামগ্রীর বিপননের দ্বারা পল্লীর অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের প্রয়াস গৃহীত হয়েছিল। এ বিষয়ে শিল্পভবন ও রথীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল উলেখযোগ্য। হস্তশিল্পের উপর তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। পল্লীর মানুষ গাছের বাকল পাতা ইত্যাদি সহযোগে মাদুর, চাটাই, দেওয়ালে ঝোলানো জিনিষপত্র রাখার আধারবিশেষ, ফুলদানি, ব্যাগ ইত্যাদি নির্মাণে পারদর্শী ছিলেন।"গ্রামের আশপাশ থেকে শিল্পভবনের দেওয়া ডিজাইনে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তালপাতার পাখা, টুপি, বাঁশ ওবেতের ঝুড়ি, মোড়া, চাটাই মাদুর, বাঁশ ও বেতের আসবাব তৈরি হতে থাকল। প্রত্যেকটি কাজেই

কিন্তু শান্তিনিকেতন শিল্পশৈলী নানান মাত্রায় ও মানে রূপ পেতে থাকলো।"[৭৫] বর্তমান দিনেও শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় এ জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী বহুল পরিমাণে স্থানীয় লোকজন বিক্রি করে থাকেন। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত শিল্পী সুরেন কর। জাভার বাটিক শিল্প তাঁকে ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট করে। সেখানকার বাটিকশিল্পের কলাকৌশল রপ্ত করে তাঁর যে শান্তিনিকেতনী দেশজ সংস্করণ গড়ে তোলেন তাই-ই অদ্যাবধি শান্তিনিকেতনে প্রচলিত আছে। শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন জীবনে, ব্যবহৃত গৃহসজ্জা, পোশাক-আশাকে, মঞ্চসজ্জায় বাটিক শিল্পের প্রয়োগ তখনকার দিনের মতো আজো হয়ে থাকে। এটি পল্লীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক প্রধান চাবিকাঠি হয়ে উঠেছিল। এই বাটিক শিল্প তাই পরে চর্মশিল্পেও ব্যবহার করা হয়। মেয়েরা বাড়িতে বসে এ জাতীয় হস্তশিল্পে পারদর্শিতা লাভ করে অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনে সফল হন।

খ. চর্মশিল্প :

শিল্পভবন সম্পর্কে আলোচনায় এ বিষয়ে আগে আলোকপাত করেছি। ১৯২৮ সাল থেকে শ্রীনিকেতনে চর্মশিল্পের কাজ শুরু হয়। রথীন্দ্রনাথই এ ক্ষেত্রে প্রধান সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কাঁচা চামড়া ট্যানিং ও প্রসেসিং করে উপযুক্ত কাঁচামাল প্রস্তুত করার প্রাথমিক উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই কাজে শ্রীনিকেতন প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করে। তখনকার দিনে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ এসে এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসাভিত্তিক এই কাজ নিজ এলাকায় শুরু করেন। তামিল নাড়ু থেকে যারা শ্রীনিকেতনে এসে প্রশিক্ষণ নিয়ে গিয়েছিলেন, তদেরই কোম্পানি আজ সারা দেশে ই আই (ইস্ট ইন্ডিয়ান) ট্যান লেদার নামে ভুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নানা কারণে ১৯৩১ সালে এই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হলেও রথীন্দ্রনাথ পুনরায় শৌখিন চর্মশিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের কাজ শুরু করেন। রথীন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দেবী লন্ডন থেকে চর্মশিল্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে নতুন ভাবে এই কাজে মনোনিবেশ করেন। ইতালি থেকে নতুন যন্ত্রপাতি আনিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে ১৯৩২ থেকে শিল্পভবনে শৌখিন চর্মশিল্পের উৎপাদন শুরু করেন যা পরে সারা ভারতবর্ষে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বেদেশ থেকে এই রীতির শিল্পভাবনার আমদানি করলেও রথীন্দ্রনাথ কিন্তু তাকে দেশীয় চিন্তাধারা ও ডিজাইন পদ্ধতি অনুসারে নতুন রূপ দান করেন। সারা ভারতবর্ষে রথীন্দ্রনাথই শান্তিনিকেতনী রীতির সৌখিন চর্মশিল্পের প্রবর্তক যা সেদিন দেশীয় এবং বিদেশের বাজারে প্রভূত বানিজ্যিক মুদ্রা অর্জনে সফল হয়। বর্তমান দিনেও এই জাতীয় চর্মশিল্পের কদর দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। শ্রীনিকেতনের চর্মশিল্পকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ সেদিন কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছিল।

গ. মৃৎশিল্প :

শান্তিনিকেতনে প্রতিমা দেবীর উদ্যোগে যে মৃৎশিল্পের কাজ শুরু হয় তাই-ই পরে শ্রীনিকেতনে জোরকদমে শুরু হয়। ১৯২৯ সালে সফল না হলেও পরে প্রতিমাদেবীর সহায়তায় শ্রীনিকেতনে ঘরের টালি তৈরির কাজ শুরু হয় (১৯৩৬)। " টালি তৈরির মেশিন এল জার্মানি থেকে। পটারির কাজ ও সেরামিক কাজ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতিমা দেবীর উদ্যোগে শুরু হল। ১৯৩৫ খিস্টাব্দে পটারি শেড ও ফার্নেস বসালেন রথীন্দ্রনাথ। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে আরও বড়ো ও নতুন চুল্লি বসানো হল। রথীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, প্রতিমা দেবী নতুন নতুন ডিজাইন দিলেন।.........রবীন্দ্রনাথ দৌহিত্রী নন্দিতার বিয়েতে নিজে হাতে শিল্পভবনের তৈরি সুন্দর চায়ের সেট উপহার দিলেন। অনেকেই সেদিন বিশ্বাস করতে পারেননি , কালেকটারস আইটেমের মতন পটারি-শিল্প এত কম আয়োজনে কীভাবে গড়ে উঠল শ্রীনিকেতনে। কারণ অর্থসংগতি ছিল অল্প। এদিকে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে প্রায় ১৫০/১৬০ জন গ্রামবাসীকে প্রতি মাসে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হত। শিল্প শিক্ষাদানের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থাও বজায় রইল। কাঁচামালের সংস্থান করা, ডিজাইন উদ্ভাবন এবং উৎপাদন ব্যবস্থা প্রায় একই ছন্দে এগিয়ে চলল।"[৭৬] রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৯৪৬ হতে জার্মানি থেকে বিশেষজ্ঞ শিল্পী এনে গ্লেজিং পদ্ধতিতে মৃৎশিল্পকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করা হয়, যা পরবর্তী সময়ে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের মৃৎশিল্পের যে বিকাশ দেখা যায় তা শ্রীনিকেতনেরই উত্তরাধিকার। এই শিল্পকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের রোজগারের পথ অনেকটাই সুগম হয়ে ওঠে।

ঘ. তাঁতশিল্প :

রবীন্দ্রনাথ বাংলার আবহমান কালের তাঁত শিল্পকে জাগিয়ে তুলে পল্লীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রয়াস নিয়েছিলেন। নন্দলাল বসু, সুরেন কর, প্রতিমা দেবী, কাসাহারা,সন্তোষ কুমার, রথীন্দ্রনাথের মত কৃতি বহু ব্যক্তিকে এই কাজে নিয়োগ করে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের প্রয়াস নিয়েছিলেন। মণি সেনের তত্ত্বাবধানে শ্রীনিকেতনে পল্লীতে তাঁতের নানা রকম কাজ শুরু হয়। শাড়ি, কাপড়, গামছা, আসন, কম্বল, গালিচা, শতরঞ্চি, নেয়ার ও ফিতের উৎপাদন গড়ে ওঠে। পরবর্তী কালে বহু মানুষ শান্তিনিকেতনে এসে এই তাঁত শিল্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে গিয়ে নিজ নিজ এলাকায় জীবিকা নির্বাহ করেছেন। ভারতীয় শিল্পের মাধুর্য ও প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামীণ শিল্পীদের সম্মিলিত প্রয়াসে শ্রীনিকেতনে বিপুল কর্মযজ্ঞ গড়ে ওঠে। এখানকার তাঁতের কাজের ডিজাইন প্রস্তুত হত প্রথম দিকে কলাভবনের উদ্যোগে। কিন্তু পরে এখানকার তাঁতশিল্পের জনপ্রিয়তা ও উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন ডিজাইনারও নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৫ সালে মণীন্দ্র চন্দ্র সেন জাপান থেকে উন্নত মানের তাঁতশিল্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে ফেরেন এবং নতুন

ধরণের যন্ত্রপাতি সহযোগে শ্রীনিকেতনে পাওয়ারলুম কাপড়ের উৎপাদন শুরু করেন। দক্ষিণ ভারতীয় বস্ত্রশিল্পীদের নিয়ে এসেও রবীন্দ্রনাথ তাঁতশিল্পকে সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করেন। এই শিল্প শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের আশেপাশের অনেক গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করে।

ঙ. গালা ও পশম শিল্পের পুনরুজ্জীবন :

শ্রীনিকেতনে গালা ও পশম শিল্প একদা জনপ্রিয় শিল্প বলে পরিগণিত হয়েছিল। ইলামবাজারের বিখ্যাত গালাশিল্পের নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবী ইলামবাজারের শিল্পকে চাঙ্গা করে তুলতে প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন। কাঠ ও মাটির উপর গালার কাজ করা নানা পুতুল এখান থেকে প্রথম দিকে প্রস্তুত করা হত। কিন্তু পরে বাজারে প্লাষ্টিকের তৈরি পুতুলের আমদানি ঘটায় ক্রমে গালা শিল্পে তেমন আর্থিক সুবিধা করে উঠতে পারা যায়নি। পল্লীর পশম শিল্পকেও সঞ্জীবিত করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ যাবতীয় প্রয়াস নেন। পশুপালন এ-কারণেই তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ ছিল।

চ. গোপালন ও দুগ্ধশিল্প :

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি কল্পেই গোপালন ও দুগ্ধ শিল্পকে মজবুত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বোলপুরের বিস্তীর্ণ রুক্ষ কৃষিভূমিকে চাষাবাদের জন্য গড়ে তুলতে গেলে যে বলদেরও প্রয়োজন সে কথা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। কেননা সর্বত্র সমবায় প্রণালীতে ট্রাক্টরের সাহায্যে জমি চাষ সম্ভব ছিল না। তাছাড়া অস্বাস্থ্য আর অপুষ্টিতে পীড়িত পল্লীগ্রামের শিশুরা দুগ্ধের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যে সমর্থ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে না, একথা রবীন্দ্রনাথের ভাবনাতেই ছিল—"...দেশে গরুর উন্নতি করার বিশেষ প্রয়োজন। নইলে আর কিছুদিন পরে চাষের ভয়ানক দুর্গতি হবার আশংকা আছে। বাংলাদেশের সকল পাড়াগাঁয়েই দুধ ঘি দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে, শুধু কতকগুলো মশলা গোলা জল দিয়ে ভাত বাঙালি কখনও মানুষ হতে পারবে?"[৭৭]

একারণেই সন্তোষচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় শন্তিনিকেতনে গড়ে তোলা গোশালাটিকে শ্রীনিকেতনে নিয়ে এসে তার ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধির প্রয়াস নেন। "সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের উপর কৃষিখামার এলাকার গোশালার প্রধান দায়িত্ব ছিল। প্রকৃতপক্ষে সন্তোষচন্দ্র শান্তিনিকেতন আশ্রমেই ৫ টি গোরু নিয়ে একটি গোশালা করেছিলেন। সেই গোশালাই শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনের কৃষিখামারে একাংশে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এই গোশালার চারিদিকে জোয়ার ও বিভিন্ন ঘাস লাগিয়ে গো-খাদ্যের চাষ করা হয়। এখন যে শ্রীনিকেতন পল্লীশিক্ষাভবন বা কৃষিকলেজে ডেয়ারি ও পোলট্রি ফার্ম

আছে, সেটি আজ থেকে আশি বছর আগে সন্তোষচন্দ্র ও রথীন্দ্রনাথের তৈরি Dairy-এর মতোই বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরি হয়েছিল।"[৭৮] বোলপুরের পতিত জমিতে নেপিয়ার ঘাস এবং জোয়ারের চাষ করে গোরুর খাদ্যের যেমন বন্দোবস্ত হয় তেমনি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রজননের দ্বারা উন্নত শংকর প্রজাতির গোরু উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। কালীমোহন ঘোষ জানিয়েছেন, এভাবেই রবীন্দ্রনাথের গড়ে তোলা সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে পল্লীর অভ্যন্তরে উন্নত প্রজাতির গাভী সৃষ্টির জন্য শ্রীনিকেতনের গোশালায় পালিত সিন্ধিজাতীয় দুটি করে উন্নত মানের ষাঁড় দান করেন ।

ছ. বাঁশ-বেত ও কাষ্ঠশিল্পের বিকাশ :

পল্লীর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে রবীন্দ্রনাথ বাঁশ ও বেতের দ্বারা তৈরি নানা প্রকার দ্রব্যসামগ্রী নির্মাণের উপর জোর দেন। বাঁশ ও বেত থেকে তৈরি চেয়ার, ফুলদানি, সোফা, কলমদানি, ট্রে, ঝুড়ি, নানান আকৃতির দেয়াল চিত্র আজো শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের মেলাগুলির প্রধান আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠে। এগুলি পল্লীর মানুষ বিশেষতঃ মেয়েরা বাড়িতে বসেই তৈরি করতে পারতো—যা তাদের আর্থিক উপার্জনের একটি প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। শ্রীনিকেতন থেকে এই জাতীয় কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। এছাড়া কাষ্ঠশিল্পের বিকাশেও রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই শিল্পভবনে জাপানি শিল্পী কাসাহারার তত্ত্বাবধানে নানাপ্রকার কাষ্ঠজাত দ্রব্য ও শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত করার উদ্যোগ গৃহীত হয়। স্বয়ং রথীন্দ্রনাথ নিজের হাতে পরিবেশ-আসবাবের নানা মডেল তৈরি করে কাষ্ঠশিল্পকে স্বতন্ত্র মাত্রায় উন্নীত করার চেষ্টা করেন—

"রথীন্দ্রনাথ Art- utility মিলিয়ে ব্যবহারিক শিল্পের আধুনিক ভাষা গড়ে তুলেছেন। আবলুশ কাঠ থেকে গাম্ভার—নানা ধরনের কাঠ তিনি সমান স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারতেন। বিভিন্ন জ্যামিতিক তল ও স্থাপত্য-আভিজাত্য মিলিয়ে অনবদ্য কাঠের শিল্প গড়ে তুলেছিলেন। জীবনযাত্রার শিল্প রচনায় তিনি প্রথম সারির প্রয়োগশিল্প ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন বিশ শতকের তিরিশ/ চল্লিশ দশকেই । পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও আগামী দিনের কারুশিল্পের নানা মডেল এবং তাঁর নিজের হাতে করা দারুশিল্প রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় আজও রয়েছে। নিজের কাজের ছোটো মেশিন ও বিভিন্ন মাপের যন্ত্র ছিল গুহাঘরের কর্মকেন্দ্রে। গামার, মেহগনি, আবলুস, কাঁঠাল, পাকুড়, কুকী, পেয়ারা, ব্ল্যাক সিমু, বনকাঁঠাল, আখরোট, হলুদ প্রভৃতি কাঠের ব্যবহার করেছেন। প্রায় সমস্ত গাছের চাষও নিজের হাতে করেছেন উত্তরায়ণ বাগানে। কাঠের কাজের অভিনবত্বে ছিল বড়ো স্থাপত্য ভাবনারই রূপ। ছোট মডেলের মতন বাড়ি অথচ হয়তো পেনসিল রাখার স্ট্যান্ড। এই ধরনের বিচিত্র আকার ওপ্রকারের নতুন প্রয়োগ রূপ ঘরের অন্দরে, পড়ালেখার টেবিলে,

খাওয়ার ঘরের আসবাবে—নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রে এনে দিলেন। যেন ছোট ছোট নিত্যব্যবহার্য 'work of art' সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এসে গেল। ভারতীয় স্বাধীন ডিজাইন আন্দোলনও নতুন চেহারা পেল। যার বড়ো উদ্যোগী রথীন্দ্রনাথ, আধুনিক ভারতের উজ্জ্বল ডিজাইন ব্যক্তিত্ব। বিচিত্রা, শ্রীনিকেতন, উদয়ন, চিত্রভানু-রা তো সেই সাক্ষ্যই দেয়।

প্রয়োগশিল্প ভাবনা, ত্রিমাত্রিক স্থাপত্য নিদর্শন আরও যেন সচলায়িত হল, কাজে এল সাধারণ মানুষেরও নিত্য ব্যবহারে। সঙ্গে বিভিন্ন কাঠের স্বাভাবিক রঙ মিলিয়ে, ছোট ছোট টুকরোয় আশ্চর্য সব ইন্‌লে ডিজাইনও ছিল। ইন্‌লের কাজে নতুন দিক তিনি খুলে দিয়ে গেছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পের (painting) রূপ দিয়েছেন কাঠের ইন্‌লে কাজে। যা প্রায় আশ্চর্য হওয়ার মতন, কঠিন কাজ। একদিকে যেমন দেশলাই রাখার বাক্স গড়েছেন আবার প্যাগোডার অনুকরণে কৌটো তৈরি করেছেন। উদয়ন বাড়ির মডেলও গড়েছেন, কোনোসানের সহযোগিতায় (উদয়ন বাড়ি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই) এখন তো আবশ্যিক ভাবে Building Model প্রস্তুত করা হয়ে থাকে আগাম নির্মাণের আভাস পেতে। বাস্তবিক চেহারা দেখে নিতে।”[৭৯]

কাসাহারার সুযোগ্য ছাত্র লক্ষ্মীশ্বর সিংহ পরে স্ক্যান্ডিনেভিয়া গিয়ে সেখানকার বিশ্ববিখ্যাত কাঠের কাজ ও নানাপ্রকার ডিজাইন শিখে এসে শ্রীনিকেতনে তার প্রয়োগ ঘটান। রথীন্দ্রনাথ ও লক্ষ্মীশ্বর সিং -এর প্রচেষ্টায় কাষ্ঠশিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধিত হয়। রাজকুমার কোনার জানিয়েছেন—

“ আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞানে অধ্যয়নকালীন সময়ে ও পরবর্তীকালে রথীন্দ্রনাথ পশ্চিম দেশের জনপ্রিয় “ Art Deco” রীতির ঘর-বাড়ি-আসবাপত্র-অন্দরসজ্জা ও আনুষঙ্গিকশিল্পসম্ভারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। রথীন্দ্রনাথ কৃত ডিজাইন কাজগুলিও পদ্ধতিতে প্রধানত আধুনিক “ Art Deco” রীতির এবং ভারতীয় ও প্রাচ্য বৌদ্ধ শৈলীর সংমিশ্রণে নির্মিত। এগুলি উচ্চতায় অপেক্ষাকৃত নিচু। সৌন্দর্যগত ও ব্যবহারিক বিচারে এগুলির প্রত্যেকটির গুণগত মান ছিল অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর এবং প্রতিটি তাঁর মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। এই সমস্ত সৃজনশীল পরিকল্পনার কাজে বন্ধুবর শিল্পী সুরেন কর ছিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্ত ও সহযোগী।

ভারতবর্ষের আসবাবপত্রের ইতিহাসে রথীন্দ্রনাথের করা আসবাবপত্রই প্রথম আধুনিক্তার মূলমন্ত্রের স্পর্শ পায়। মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্বন্ধ-যুক্ত একাধিক বস্তু বা আসবাব পত্র যা পূর্বনির্ধারিত আয়তনে বাড়ানো বা কমানো সম্ভব হলে সেইরূপ বস্তুনির্মাণ পদ্ধতিকে Modular বলে। এটি একটি অতি সাম্প্রতিক ধারা। অথচ আশ্চর্য হতে হয় এই দেখে যে এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করে ভারতবর্ষের মাটিতে বিংশ শতাব্দীর চারের

দশকে বই রাখার আলমারি উত্তরায়ণে গ্রন্থাগারে জন্য তিনি করিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে সহজ বহনযোগ্য (portable) ও খোলা-পরা করা সম্ভব (Knocked Down) এইরূপ নীতির আসবাবপত্র নির্মাণ পদ্ধতিও একটি অতি সাম্প্রতিক রীতি। তিনি সেইসময় অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে পড়ার ডেস্ক, খাওয়ার টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি আসবাবপত্র উত্তরায়ণের গৃহগুলির জন্য তৈরী করিয়েছিলেন। এই সমস্ত কাজে তিনি প্রায়ই উক্ত বস্তুগুলির বিভিন্ন তলের উপর আধুনিক রুচি ও সৌন্দর্যের ইন্‌লে কাজ করতেন। Streamline রীতিতে করা উক্ত আসবাব পত্রগুলির মূল আকার ও কাঠামোকে জোরালোভাবে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি ইন্‌লে ডিজাইন ব্যবহার করতেন।”[৮০]

পল্লীর মানুষ এই শিল্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নে সক্ষম হন। অনেক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা শ্রীনিকেতনেই কর্মী হিসেবে নিজুক্ত হয়ে কর্মসংস্থান লাভ করেন।

জ. পক্ষীপালন :

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পশুপাখির প্রতি গভীর মমতা ছিল।শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ একারণেই নিজ জমিদারিতে পক্ষী হত্যা নিষেধ করেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে জানিয়েছেন—“ বাবার কাছে বাধা পেয়েছিলুম একবার মাত্র। একটি গুলতি তৈরি করে প্রথম দিনই একটা শালিক পাখি মেরে ফেলেছিলুম। বাবা খুব রাগ করেছিলেন। জমিদারির মধ্যে পাখি মারা নিষেধ বলে তিনি একবার আদেশ দিয়েছিলেন। এর পিছনে একটি ঘটনা আছে। বাবা তখন পদ্মার চরে বোট বেঁধে আছেন। একজোড়া চকাচকি রোজ রাত্রে বোটের কাছে এসে বসত। দুর্বুদ্ধিবশত বোটের মাঝি তার একটিকে একদিন মেরে বসল।তারপর জোড়াটা রোজ রাত্রে ঘটনাস্থলে এসে সঙ্গীর জন্য বিলাপ করত। কান্না সহ্য করতে না পেরে বাবা বোট অন্যত্র সরিয়ে নেবার আদেশ দিলেন ও নায়েব মশায়কে ডেকে বলে দিলেন তদ্দণ্ডে প্রচার করে দেওয়া হয় যে ঠাকুরবাবুদের এলাকার মধ্যে কেউ চকাচকি হাঁস প্রভৃতি শিকার করতে পারবে না। ইংরেজ রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত এই নিষেধ মেনে চলতেন।”[৮১]

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি পল্লীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ পক্ষীপালনের উপর জোর দিয়েছিলেন। এক একটি পাখি বেশ ভালো দামে বিক্রি হত। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে জীববিদ্যার নানা বই পাঠ করতেন। ফলে পল্লীর পরিবেশে সুলভ, অপরিচিত কত বিচিত্র রকমের পক্ষীসম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল গড়ে ওঠে। গৃহপালিত পাখিসমূহ কি দেশে কি বিদেশে যথেষ্ট মূল্যেই বিক্রি হত৷ এতে পল্লীর মানুষের আর্থিক সংস্থান ঘটতো৷ আজকের দিনে এক

একটি বিশেষ প্রজাতির পায়রা যেখানে ৩০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের সমকালে সেই মূল্য নিতান্ত গৌণ ছিল না। তাই পক্ষীপালনকেও গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের একটি প্রধান উপায় হিসেবে ভাবতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

ঝ. ছাগল চাষ :

পল্লীর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ণের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ছাগল চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। উন্নত প্রজাতির ছাগল থেকে যেমন দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈরি করা যেত তেমনি ছাগলের লোম থেকে পশম জাত নানা দ্রব্যাদি তৈরি করা হত। তাই দেশী ছাগলের সঙ্গে যমুনাপুরী ছাগলের মিলন ঘটিয়ে উন্নত মানের ছাগল চাষের প্রতি নজর দিতে চেয়েছিলেন। ছাগলের চামড়া ট্যান করে তার থেকে চর্মজাত দ্রব্য তৈরির দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।পল্লীর মানুষ এই ছাগল বিক্রয় করে তাদের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারতেন। বেশ কিছু প্রজাতির ছাগল স্বল্প সময় ব্যবধানে সন্তান প্রসবে সক্ষম হওয়ায় এই জাতীয় ছাগল চাষ পল্লীর মানুষের পক্ষে লাভদায়ক ছিল। স্বল্প খরচে ছাগল চাষ পল্লীর মানুষের আয়ত্ত্বেরও অধীন ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ ছাগল চাষের প্রতি মনোযোগী হন।

ঞ. মৌমাছি, হাঁস, মুরগী পালন :

পল্লীর দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি সহজ উপায় হিসেবে রবীন্দ্রনাথ হাঁস মুরগি চাষের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। প্রাথমিক কিছু প্রতিবন্ধকতার পর শ্রীনিকেতনে পোলট্রি ফার্ম গড়ে তোলা হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে পোলট্রি চাষের শিক্ষা দেওয়া হত স্থানীয় শিক্ষার্থীদের।তাঁরা পল্লীর অভ্যন্তরে পোলট্রি চাষকে আরো প্রসারিত করেন। ডিম ও মুরগি বিক্রি করে স্থানীয় মানুষ আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে পায়।পোলট্রির ন্যায় উন্নত প্রজাতির হাঁস চাষ করার উপরও রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন পর্বের প্রথম থেকেই মৌমাছির চাষ থেকে মধু সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলে আসছিল।কিন্তু বোলপুরের রুক্ষ পরিবেশ মধু তৈরি বা মৌমাছি চাষের পক্ষে ছিল প্রধান অন্তরায়।মৌমাছিদের অনুরূপ পরিবেশে ধরে রাখা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ।তাই এই পরিকল্পনা খুব বেশিদূর এগোয়নি।

ট. মহিলাদের সেলাই ও স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরির প্রশিক্ষণ :

পল্লীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য রবীন্দ্রনাথ যে নারীশক্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন সেকথা পূর্বেই বলেছি। পল্লীর নিরানন্দ জীবনে বিধবা নারীরা যাতে নানা প্রকার হাতের কাজ শিখে স্বনির্ভর করে নিজেদের গড়ে তুলতে পারেন তার জন্য রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনিকেতনে মেয়েদের সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ দানের বন্দোবস্ত করেন। পল্লীর মধ্যে কলেরা, ম্যালেরিয়ার মত রোগ মহামারীর আকার ধারণ করতো প্রায়শই। এর মূলে ছিল গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন জীবন। এর পিছনে গ্রামীণ মানুষের অর্থনাশের অন্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাই পল্লীর নারীদের স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরির প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেন। এই জাতীয় খাবার তৈরী করে মেয়েরাও কিছু আর্থিক উপার্জন করতে সক্ষম হত।

৭. জলসেচ প্রকল্প :

পল্লীর অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের একটি প্রধান হাতিয়ার হল কৃষি। কিন্তু বোলপুরের রুক্ষ প্রান্তর কৃষিকাজের পক্ষে ছিল নিতান্ত প্রতিকূল। সেই রুক্ষ প্রান্তরকে জলসিঞ্চিত করে চাষের অনুকূল ভূমি হিসেবে গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। এমতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন জলসেচ ব্যবস্থার যথাযথ উন্নতি ছাড়া কৃষি তথা আর্থিক মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই নিম্নোক্ত পাঁচটি উপায়ে জলসেচ ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রয়াস নেন—

ক. কুঁয়ো খনন :

রবীন্দ্রনাথ পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজনে প্রাথমিক ভাবে একাধিক কূপ খননের প্রয়াস নেন। কিন্তু বোলপুরের রুক্ষ পাথুরে মাটিতে কুঁয়ো খনন করে তৃষ্ণার জল যদি বা পাওয়া যায় চাষের নিমিত্ত পর্যাপ্ত জলসরবরাহ করা সম্ভব ছিল না। তবু গ্রীষ্মকালসহ সারাবছর না হলেও আংশিক ভাবে বছরের অন্যান্য সময়ে যাতে এই ব্যবস্থা থেকে সুবিধা পাওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

খ. নলকূপ স্থাপন :

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথই গভীর নলকূপ স্থাপনের প্রথম পথিকৃৎ। শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থসংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকায় একের পর এক বক্তৃতা করে চলেছেন তখনো তিনি তাঁর পল্লীমায়ের কথা ভোলেননি। আমেরিকা থেকে বিরাট আয়তনের নলকূপ খননের যন্ত্রপাতি কিনে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তখন আমাদের দেশে এ জাতীয় যন্ত্রের চল ছিল না বলে কোন ইঞ্জিনিয়ার একে কার্যে রূপায়িত করে তুলতে পারেননি। এরপর একাধিক বার প্রয়াস চালিয়ে অবশেষে ১৯৩৩ শালে কবি চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন—" কয়েক বৎসর পূর্বে টেক্সস টিউবওয়েল নামে একটি আমেরিকান কোম্পানী নলকূপ-খননে কৃতকার্য হইতে পারে নাই; এইবার অমূল্যচন্দ্র বিশ্বাস নামে কলিকাতার এক ইঞ্জিনীয়ার সফল হইয়াছেন। বিরাট এক

ট্যাঙ্ক বা জলাধারে পাম্প করিয়া জল উঠানো হয়; প্রধান অতিথি সভাক্ষেত্রে জলকলের একটি বোতাম টিপিলে জলের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ প্রীত হইয়া এই জলাধারের নাম দেন 'অমূল্য উৎস'।"[৮২]

গ. পুরনো পুকুর সংস্কার :

রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে যখন প্রথম পল্লীবাংলায় পা রেখেছিলেন সেদিন থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন পল্লীর মানুষের নিরানন্দ নিরুৎসুক স্বভাবকে। পল্লীর মানুষদের মধ্যে এই নিতান্ত নিরুৎসুক মানসিকতার কারণে পুকুরগুলি ডোবা পুকুরে পরিণত হয়েছিল। পুকুরগুলি আগাছা-জঞ্জালে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এঁদো পুকুরের পচা গন্ধ ও দূষিত জল পল্লীর মানুষের রোগ-শোকেরও কারণ হয়ে উঠেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ পল্লীর পুকুরগুলির সংস্কারের পরিকল্পনা করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে পুকুর সংস্কার করে বাহবা কুড়িয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার কাজে পল্লীর মানুষেরাও হাত লাগিয়েছিল। ফলে পল্লীর মানুষ যেমন রোগ-শোকের হাত থেকে মুক্ত হয়ে অনেকটা আর্থিক সাশ্রয়ে সক্ষম হয়েছিল তেমনি পুকুরের জলকে ব্যবহার করে নানাপ্রকার রবিশস্য চাষেও সমর্থ হয়েছিল। এতে পল্লীর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয় এবং জীবনযাত্রার মানেও পরিবর্তন আসে।

ঘ. নতুন পুকুর খনন :

পল্লীর জলকষ্ট ও কৃষির উন্নতির স্বার্থে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মধ্যে নতুন পুকুর খননেরও বন্দোবস্ত করেন। জমিদারির জমাখরচের হিসেব থেকে দেখা যায় যে পুকুর খননের জন্য জমিদারের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হত। পল্লীর মানুষকেই যে একাজে বেশি উৎসাহী হয়ে এগিয়ে আসার প্রয়োজন আছে –এই কথাটাই সেদিন রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন।

ঙ. খালের দ্বারা জলসেচ :

বীরভূমের রুক্ষ মাটিকে কৃষিকাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য খাল কেটে নদীর জলকে পল্লীর মধ্যে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। দেউকি-দাদপুর গ্রামে এভাবেই ময়ূরেশ্বরীর উপচে পড়া বর্ষার জলকে খালের দ্বারা পল্লীর মধ্যে এনে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। "১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে এই ব্যবস্থাকে স্থায়ী করার জন্য গ্রামের লোকদের ও সরকারের আর্থিক সহায়তায় দেউকি-দাদপুর সেচ সমবায় সমিতি গঠিত হয়। এই

সেচব্যবস্থার মাধ্যমে ২৫ টি গ্রামে কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।”[৮৩]

৮. মাছচাষ :

পল্লীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অপর প্রক্রিয়া হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মৎসচাষ শিল্পকেও গুরুত্বের সঙ্গে সমৃদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন। পল্লীর যে সকল পুকুরকে সংস্কার করে তোলা হয়েছিল কিংবা নতুন পুকুর খনন করা হয়েছিল, সেগুলির যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা আর্থিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছ চাষের যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। শ্রীনিকেতনের শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে ট্রেনিং দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছচাষ কীভাবে করা যায় পল্লীর মানুষদের মধ্যে সে বিষয়ে সচেতনতা তৈরির চেষ্টা করেন। সভা-সমিতি, লেকচার কিংবা ম্যাজিক লণ্ঠনের ব্যবস্থায় এই জাতীয় শিক্ষাকে পল্লীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রীনিকেতন থেকে পল্লীর মাছ চাষিদের সুলভ মূল্যে মাছের চারা ও ডিম বিতরণ করা হত। উন্নত প্রণালীতে যাতে মাছের চাষ করা যায় সেজন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণারও ব্যবস্থা করা হয়।

৯. রাস্তা বা বাঁধ নির্মাণ :

রবীন্দ্রনাথের সমকালে পল্লীর যোগাযোগ ব্যবস্থা যে অত্যন্ত অনুন্নত ছিল সে কথা শিলাইদহ-পতিসর পর্বের আলোচনাতেই বলা হয়েছে। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বেও এই ব্যবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। বৃটিশ শাসিত ভারতের পল্লীর উন্নয়নের দিকে সরকারের কোন খেয়ালই ছিল না। ফলে গ্রাম ও নগরের মাঝে সড়কপথে বা স্থলপথে যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। তাছাড়া বাংলাদেশের পল্লীগুলির অনেকাংশই নদীতীরবর্তী স্থানে গড়ে উঠেছিল। বাঁধের নিতান্ত অভাবের কারণে বাংলার সবুজ করুণ ডাঙা প্রতিবছরই বর্ষার সময় প্লাবিত হত। ফলে পল্লীর পুকুরগুলি যেমন মজে যেত তেমনি মানুষের সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক দুরবস্থার অন্ত থাকতো না। রবীন্দ্রনাথ তাই পল্লীর বাঁধ সংস্কারের নিতান্ত প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। অশিক্ষা-কুসংস্কারে ঢাকা সেদিনের পল্লীর মানুষ জমিদারের এ জাতীয় মহৎ কর্মপ্রয়াসের গভীরেও স্বার্থের অনুসন্ধান করেছে, নিজেদের মধ্যে কলহ করেছে, কিন্তু শ্রমটুকু পর্যন্ত দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এসকল প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়েও পল্লীর স্বার্থে বাঁধ নির্মাণের প্রয়াস নেন। ভুবনডাঙা গ্রামের একুশ বিঘে আয়তনের বাঁধ সংস্কারের দৃষ্টান্ত সেদিন সারা বাংলাদেশ তথা দেশের কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছিল। সাধারণের থেকে ভিক্ষালব্ধ অর্থ, জেলাবোর্ডের কিঞ্চিৎ সহায়তা, আর রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত সমবায় ব্যাঙ্কের ঋণের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ সেদিন তার এই কর্মসূচীকে অনেকটাই সফল করে তুলতে পেরেছিলেন। নতুন বাঁধের পাশে গাছ

লাগিয়ে যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর প্রচলন করেন তা বর্তমান দিনে পল্লী অঞ্চলে নতুন বাঁধ নির্মাণের পর তার পাশে যে বৃক্ষরোপণের পঞ্চায়েতকৃত কর্মসূচীর মধ্যেই পরিবাহিত হয়ে চলেছে।

১০. অগ্নি নির্বাপণ কর্মসূচী :

পল্লীর অধিকাংশ বাড়িঘর সেকালে ছিল কাঁচা মাটির বাড়ি—খড়ের ছাউনি দেওয়া। ফলে এই জাতীয় খড়ের কুটিরে আগুন লাগলে সেগুলি পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যেত। কেননা জলের নিতান্ত অভাব লাল মাটির দেশের একটি বড় সমস্যা। গ্রামীণ মানুষের মধ্যেকার হীন দলাদলি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব , নিজেদের অসাবধানতা যে এই জাতীয় অগ্নিদাহের অন্যতম প্রধান কারণ সে কথা শিলাইদহ পর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতাসূত্রে জেনেছিলেন। হিতকারী জমিদারের আদর্শ গ্রাম পরিকল্পনা সফল হলে এক বিশেষ শ্রেণীর জমিদার বা সুদখোর মহাজনের স্বার্থ বিঘ্নিত হবার সমূহ আশঙ্কা ছিল। তাই তারা নানা প্ররোচনা দিয়ে হাটের চালাঘর কিংবা কৃষকের কুটিরে অগ্নিসংযোগ করতে দ্বিধা করতো না।

পল্লীর ঘরগুলি পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকায় অগ্নিসংযোগ ঘটলে তা গ্রামের একাধিক বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। দরিদ্র কৃষককে এর জন্য আর্থিক ক্ষতির সামনে পড়তে হত, মহাজনের ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ার সম্ভানা তৈরি হত অধিক। তবে পল্লীর মধ্যে অগ্নি সংযোগ ঘটলে ব্রতী বালকদলের ভূমিকাই প্রধান হয়ে উঠতো। ব্রতী বালকদলের প্রধান হিসেবে সন্তোষচন্দ্রের এ বিষয়ে ভূমিকা ছিল প্রধান—
" তখন গ্রামে প্রায় আগুন লাগত গ্রামবাসীদের অসাবধানতায়। সন্তোষদা তখনি ছেলের দল নিয়ে ছুটতেন আগুন নেবাতে। দূরের গ্রামে লাগলেও আগুনের হিল্‌কা দেখে সেখানে চলে যেতেন এবং এবং যাতে সমগ্র গ্রাম না পুড়ে যায় আশেপাশের খোড়ো চাল টেনে ফেলে দিতেন। কিন্তু গ্রামের লোকেদের অজ্ঞতার জন্য আগুন নেবানোর কাজে তাদের কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে বাধাই পেয়েছেন বেশি। তারা শুধু এক জায়গায় জমা হয়ে 'হায় হায়' করতেই ব্যস্ত। ....বিদ্যালয়ের সামনে এক সার লাল রঙের বালতি সর্বদা টাঙানো থাকত। আগুন নেবাতে যাবার সময় তারই এক-একটা হাতে নিয়ে ছেলেরা ছুটত। এ-সব ব্যবস্থা সন্তোষদা করেছিলেন।"[৮৪]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল পল্লীর মানুষকে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। তাদের নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিজেদের করতে হবে—এই বিশেষ দিকের প্রতি জোর দিতে চেয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ দ্রুত অগ্নি নির্বাপণের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে অগ্নি নির্বাপণের ট্রেনিং দিয়ে

ব্রতীবালকদলকে পল্লীতে প্রেরণ করেন। তাঁরা অগ্নি নির্বাপণের মহলা দেখিয়ে বিপদের মুখে কীভাবে সাহস অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে হয় তার বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করে তোলেন। এ বিষয়ে শ্রীনিকেতনের মহিদাপুর গ্রামের অগ্নিনির্বাপন সংক্রান্ত ব্রতীদলের মহলা প্রদর্শনের কথা স্মরণযোগ্য।

১১. সুলভ বিচারব্যবস্থা এবং গ্রামসভা পরিকল্পনা :

শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বেও রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ-পতিসর পর্বের ‘মণ্ডলী’প্রথার প্রচলন করেছিলেন—যা বর্তমান কালের পঞ্চায়েত ব্যবস্থারই নবীন রূপ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। এই ‘মণ্ডলী’ প্রথা, তার গঠন কাঠামো এবং কার্যবিধি সম্বন্ধে শিলাইদহ পর্বেই আলোকপাত করেছি। এই মণ্ডলী প্রথায় এক একটি মণ্ডলীর অধীনেই গ্রামসভা। মণ্ডলীপ্রথায় গ্রামসভার মধ্যস্থতায় পল্লীর বিচারকার্য পরিচালিত হবার ফলে স্বল্প সময়ে বিচারকার্য সমাধান করা যেত। এর জন্য আদালতে দৌড়নো কিংবা বহুল অর্থ ব্যয় করে উকিল নিয়োগের প্রয়োজন হত না। ফলে পল্লীর মানুষ যেমন তাদের শ্রমদিবস বাঁচাতে সক্ষম হয় তেমনি আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবারও সুযোগ পায়। তাছাড়া মামলার অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে মহাজনদের ঋণের জালে বাঁধা পড়ার সম্ভাবনাও দূরীভূত হয়।

১২. কৃষি গবেষণা ও নয়া কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ :

কৃষকের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের অন্যতম শর্তই ছিল নিত্য নতুন গবেষণার দ্বারা কৃষিকাজকে সমৃদ্ধ করে তোলা ও উৎপাদন বাড়িয়ে লাভের অঙ্ককে বাড়িয়ে তোলা। শিলাইদহ-পতিসর পর্বেই রথীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় রবীন্দ্রনাথ কৃষি সংক্রান্ত নানা গবেষণা শুরু করেছিলেন এবং কৃষিপ্রযুক্তির উন্নততর সংস্করণ গড়ে তোলার বহুমাত্রিক প্রয়াস নিয়েছিলেন। সেই গবেষণা ও প্রযুক্তির নব নব উদ্ভাবনের ধারাটি পূর্ণ বিকশিত রূপ লাভ করেছিল শান্তিনিকেতনে কৃষিবিজ্ঞানী লিওনার্দ এলম্‌হার্স্টের আগমনের পরে। এলম্‌হার্স্ট শ্রীনিকেতনে যখন যোগদান করেন, তখন শ্রীনিকেতনের নামই ছিল ‘ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার—শান্তিনিকেতন’। এখানে কৃষি সংক্রান্ত নানা গবেষণা কর্মে এলম্‌হার্স্ট নিজেকে সঁপে দেন এবং গবেষণালব্ধ সেই জ্ঞান বা প্রযুক্তিকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী বা শিক্ষার্থীদের মধ্যস্থতায় পল্লীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। পল্লীর কৃষি-শিল্প সংক্রান্ত সমীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহের জন্য এলম্‌হার্স্ট ৫০০ পাউণ্ড আর্থিক সহায়তা দান দান করতেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের অভিমত অনুসারে শ্রীনিকেতনের গবেষণায় পাঁচটি প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়—

“1. Thirty years of Rice yields in lower Birbhum.

2. Varieties and yields of Rice in Binuria Village.

3. Fluctuation in the prices of Agriculture commodities in Bolpur.

4. Astatistical approach to the solution of problems of a typical village.

5. Cost of production of corps in Birbhum Districts.

১৯৩৩ সালে শ্রীনিকেতন গবেষণা প্রকল্পের Scheme for the development of methodology in Rural Research—তৎকালীন Imperial Council of Agricultural Research-এর অনুমোদন লাভ করে। এল্‌ম্‌হার্স্ট, কালীমোহন ঘোষ ও শ্রীনিকেতনের অন্য কর্মীবৃন্দ ছাড়াও ড. হাসিম আলী, সুধীন্দ্রচন্দ্র রায় প্রমুখ Research fellow-দের তত্ত্বাবধানে একের পর এক এই ধরণের কাজ ও সমীক্ষাপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩৯ সালে ড. সুধীরচন্দ্র সেন 'ডার্টিংটন রিসার্চ ফেলো' হিসেবে শ্রীনিকেতনে 'রিসার্চ অফিসার'-এর পদে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ যে কাজ শুরু করেছিলেন—তাঁর পরবর্তী সময়ে বহুকাল পর্যন্ত শ্রীনিকেতনে সে কাজ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।"[৮৫]

সমীক্ষা-গবেষণার দ্বারা নতুন নতুন ফসল চাষ, সবুজ সারের ব্যবহার, গোপালনের জন্য নেপিয়ার ঘাস বা জোয়ারের চাষ, পতিত বা উঁচু জমিতে চাষের স্বতন্ত্র প্রণালী সম্পর্কে গবেষণা দ্বারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস নেয় শ্রীনিকেতন। এইভাবে— "...১৯৩০ সালে ধানচাষে সবুজ সারের সঙ্গে বিঘা প্রতি আড়াই সের 'এমোফস' ব্যবহার করে ধানের ছড়া, বৃন্ত, শিষ ও পরিপুষ্ট ধানের বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছিল। ধানের সাথে সাথে আখ, গম, আলু, তামাক, কার্পাস, সয়াবীন, ভুট্টা, কলাই ইত্যাদি নানা ফসলের পরীক্ষামূলক চাষ করা হত। এছাড়া টমাটো, বিট, গাজর, জলদি জাতের ফুলকপি, পেঁপে কলা। পেয়ারা ও আনারস প্রভৃতি নানা ফল ও সবজির পরীক্ষামূলক চাষবাস করা হত। গো-খাদ্যের মধ্যে কলাই, জোয়ার, নেপিয়ার ও গিনি ঘাসের চাষ হত। সাইলো প্রথায় গো-খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হত। ১৯৩১ সালে পরীক্ষামূলকভাবে শ্রীনিকেতন কৃষিখামারে কর্পূর। খয়ের, এলাচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি গাছের বেশ কয়েকটি চারা লাগানো হয়েছিল। ভূমিক্ষয় রোধ, জমির আর্দ্রতা রক্ষা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কৃষিকেন্দ্রে নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত। এছাড়া দেশীয় প্রথায় তাপ নিয়ন্ত্রণের সাহায্যেআলুর সংরক্ষণ, উন্নত ধরণের গুড় ও দেশি চিনি প্রস্তুত করার চেষ্টাও করা হয়েছিল। চাষের যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন কাজের জন্য শ্রীনিকেতনে প্রায় গোড়া থেকে একটি যন্ত্রবিজ্ঞান কেন্দ্র ছিল। এই কেন্দ্রে গোরুর গাড়ির চাকা, লোহার উনুন ইত্যাদি তৈরি হত। সে সময় তৈরি কয়েকটি নূতন ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষভাবে প্রশংসা আদায় করেছিল। এই বিভাগে ইঞ্জিন ও জেনারেটর দিয়ে

শ্রীনিকেতন খামারে সেচের পাম্প ও গো-শালার খড় কাটার মেশিন চলত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪১ সালে টিনে ভর্তি ফল সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়েছিল।”[৮৬]

১৩. কৃষকের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতিদান :

কলকাতার নাগরিক জীবনের উচ্চ মিনার থেকে পল্লীর সমতলে নেমে এলেও কৃষক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর কিছু কম ছিল। তাই কৃষকের অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে কম মূল্য দিতে হয়নি। শিলাইদহ-পতিসর পর্বেই রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরামর্শ অনুসারে উন্নত আলুর বীজ এনে চাষ করতে গিয়ে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েন। নৈনিতাল থেকে আলুর বীজ এনে সরকারী কৃষিবিদের পরামর্শ অনুসারেই জমি তৈরি করে আলুর চাষ করতে গিয়ে লোকসানের শিকার হন। বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পুঁথিগত বিদ্যার নিরর্থকতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। সরকারী কৃষি বিশেষজ্ঞের নির্দিষ্ট সহায়ক উপাদানের তালিকা দেখে কৃষকেরা সেদিন হেসেছিল। চামরু নামে এক হাতকাটা কৃষক বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কৃষিতত্ত্ববিদের সকল উপদেশকে অগ্রাহ্য করে সামান্য পাঁচকাঠা জমিতে আলু চাষে কীভাবে কবিকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সেকথা রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে পল্লীর কৃষকদের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কৃষকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সর্বাধিক লাভ আদায়ে তৎপর হয়েছিলেন।

১৪. পানীয় জলের ব্যবস্থা :

পল্লীর অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের একটি বড় কারণ ছিল কৃষকদের অসুস্থতা ও রোগভোগ। এর জন্য তাদের আর্থিক অপচয়ের অন্ত ছিল না। এই অসুস্থতার একটি বড় কারণ বোলপুরের রুক্ষ পরিবেশে পানীয় জলের নিতান্ত অভাব। দূষিত আয়রণযুক্ত জল পান করে শতকরা আশি শতাংশ মানুষ তখন লিভার বা যকৃতের রোগে ভুগছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাই পানীয় জলের যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্য কুয়ো খননের পাশাপাশি গভীর নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৩-এর পর থেকে এই কাজে রবীন্দ্রনাথ অনেকটাই সফল হন , সে কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা দ্বারা রোগমুক্ত শরীর গড়ে তুলে পল্লীর অর্থনৈতিক সাশ্রয়ের পথে হাঁটতে চেয়েছিলেন তিনি।

১৫. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কৃষকদের সাহায্য গ্রহণ :

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় বাংলা দেশকে ‘সবুজ করুণ ডাঙা’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ শস্যশ্যামলা নদীমাতৃক সবুজ বাংলাদেশ প্রায়ই নদীর জলে প্লাবিত হত। তাতে এদেশের মানুষের ক্ষতির অন্ত থাকতো না। গৃহপালিত পশুর পাশাপাশি শস্য-

সম্পদের প্রভূত ক্ষতি সাধন ঘটতো। বস্তুত অনুরূপ কারণেই একদা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"অজয় নদে এল বান

জলে ভাসে সোনার ধান।"

এই বন্যা কিংবা অপরাপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দরিদ্র কৃষকদের দুরবস্থার অন্ত থাকতো না। কৃষকদের এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে পল্লীর মহাজন সম্প্রদায় ঋণের জালে কৃষকদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলতো। অশিক্ষিত ও অজ্ঞ কৃষকেরা এইভাবে প্রজন্ম-পরম্পরায় শোষণ পীড়নের শিকার হত।তাদের আর্থিক পুনরুজ্জীবনের অন্য কোন গত্যন্তর থাকতো না। এমতাবস্থায় কৃষকদের সুরক্ষিত করার অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথ তাদের ঋণ দানের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। কবির প্রতিষ্ঠিত সমবায় কৃষিব্যাঙ্ক থেকেও পরবর্তী সময়ে কৃষকদের স্বল্প হারে কৃষকদের ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়। ঋণদান প্রথার পাশাপাশি পরিস্থিতি বিচার করে কখনো কখনো ঋণ মুকুবেরও বন্দোবস্ত করেন রবীন্দ্রনাথ। কখনো বা জমিদারের প্রাপ্য কর থেকে কৃষকদের মুক্ত করে প্রজাহিতৈষী মানসিকতার স্বাক্ষর রাখেন রবীন্দ্রনাথ।

১৬. কো-অপারেটিভ লোন সোসাইটি স্থাপন :

বিপর্যয় কিংবা প্রয়োজনের নিরিখে কৃষি ব্যাঙ্ক থেকে কৃষকদের লোন প্রদানের পাশাপাশি পল্লীর প্রজাদের আর্হিক মানোন্নয়নের জন্য কো-অপারেটিভ লোন সোসাইটি স্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ। এই সোসাইটি প্রজাদের কাছ থেকে সংগৃহীত মুনাফার ভিত্তিতে সোসাইটির সদস্যদের লোন প্রদান করতো। কো-অপারেটিভ সোসাইটির জন্য ক্রমে একটি বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী প্রস্তুত করে তোলেন সোসাইটির পরিচালন সমিতি। প্রত্যেক সদস্যকে সোসাইটির নিয়মকানুন মেনে চলতে হত। ১৯৩১ সালের হিসাব অনুযায়ী শ্রীনিকেতনের পার্শ্ববর্তী তালপুকুর, মহিদাপুর, বল্লভপুর, সুরুল-সাঁওতালপাড়া, ভুবনডাঙা, বাহাদুরপুর, লোহাগড়, ইসলামপুর, বাঁধগোড়া—এই ক'টি গ্রামে কৃষি ঋণদান সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯৮ জন।

১৭. সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন :

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের আশেপাশের পল্লীর মানুষদের নানা অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের অভিপ্রায়ে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়াস গৃহীত হয়। এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ পতিসরে প্রজাদের 'মিতব্যায়িতা,সংঘকর্ম ও সঞ্চয়-অভ্যাস' শিক্ষা দেবার জন্য যে কৃষিব্যাঙ্ক গড়ে তোলেন (আনুমানিক ১৯০৫ খ্রীঃ), তার উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ কৃষকদেরকে মহাজনের

হাত থেকে বাঁচানো। কিন্তু ১৯২৭-এ যে বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠা করেন তার উদ্দেশ্য ছিল আরো ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। ১৯২৮-এর প্রথম এই ব্যাঙ্কের বার্ষিক প্রতিবেদনের চতুর্থ পৃষ্ঠায় ব্যাঙ্কের বহুমাত্রিক এই কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায়—

"এই ব্যাঙ্কের এলাকায় গত ৩০শে জুন তারিখে সর্বপ্রকারের মোট ২৯৯ টি সমবায় সমিতি ছিল। তাহাদের মধ্যে ২৩৪টি সমিতি এই ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। সমিতিগুলির বিভাগ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১। কেন্দ্রীয় কোষ.. ১

২। সমবায় ভাণ্ডার.. ২

৩। সীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট সমিতি.............................. ৩

৪। ম্যালেরিয়া ন বারণী সমবায় সমিতি........................১১

৫। জলসরবরাহ সমবায় সমিতি............................ ৬৯

৬। অসীম দায়িত্ববিশিষ্ট (পল্লি) সমবায় সমিতি..............২১২

৭। অসীম দায়িত্ববিশিষ্ট বিশেষ প্রকারের সমবায় সমিতি... ২

মোট ২৩৯"[৮৭]

১৮. কৃষিখামার পরিকল্পনা :

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথ একাধিক কৃষিখামার নির্মাণ করেন। এই কৃষিখামারগুলিতে কৃষিসংক্রান্ত নানা ধরণের পরীক্ষানিরীক্ষা যেমন চলতো তেমনি সেই পরীক্ষার ফল প্রদর্শন করে পল্লীর কৃষকদের ঐ পদ্ধতির প্রয়োগ বিষয়ে প্রেরণা সৃষ্টি করা হত। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিভিন্নপ্রকার চাষবাসের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে খামারেই কৃষকদের শিক্ষা দেওয়া হত। এই বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষাবাদ কৃষকদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নে সহায়ক হয়.খামারের এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য বা পল্লীর মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পরবর্তী সময়ে শিক্ষানবীশও নিয়োগ করা হয়।

১৯. ধর্মগোলা স্থাপন :

পল্লীর অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের অপর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল ধর্মগোলার প্রতিস্থাপন। দুর্ভিক্ষ, বন্যা বা মড়কের মত সঙ্কটময় সময়ে অসহায় কৃষকেরা যাতে সামান্য

পরিমাণ ধান বা শস্য যাতে কর্য হিসেবে পেতে পারে তার জন্যেই ধর্মগোলার প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনিকেতন পর্বের এই ধর্মগোলা আসলে শিলাইদহ-পতিসর পর্বের কৃষিব্যাঙ্কেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করে যেমন পল্লীর প্রজাদের মহাজনের ঋণের জালে আবদ্ধ হওয়া থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন তেমনি শ্রীনিকতন পর্বে ধর্মগোলা স্থাপনেরও একই উদ্দেশ্য ছিল। প্রাথমিক ভাবে ধর্মগোলার বিস্তার কয়েকটি মাত্র পল্লীতে ঘটলেও ধীরে ধীরে তা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।

২০. জমির উপর প্রজার স্থায়ী স্বত্ব স্বীকার :

রবীন্দ্রনাথ জমির উপর প্রজার স্থায়ী অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে অনুরূপ অধিকার প্রদানের জায়গা থেকে সরে এসেছেন তার কারণ কিন্তু সেই মহাজনরা। রবীন্দ্রনাথের ভয় ছিল এক্ষেত্রে ঘুরপথে দরিদ্র প্রজার জমিখানি না মহাজনের হাতে গিয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। শুধু জমির উপর প্রজার স্থায়ী স্বত্ব নয়, ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত গঠনমূলক নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে এ বিষয়ে তিনি তাঁর প্রগতিশীল মনের পরিচয় দান করেছেন।

তথ্যপঞ্জী:

১. সম্ভাষণ । পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১।
পৃ : ৪০২।

২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪০১। পৃ : ৩১

৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২।

৪. অমিতাভ চৌধুরী । জমিদার রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী। ১৪০২। পৃ : ১।

৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত। পৃ : ৩০৪।

৬. অমিতাভ চৌধুরী । পূর্বোক্ত। পৃ : ১৩।

৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৬৯।

৮. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯১।

৯. প্রশান্তকুমার পাল। রবিজীবনী, ৩য় খণ্ড। আনন্দ। ২০০৯। পৃ: ১২০।

১০. পূর্বোক্ত। পৃ: ১২৭।

১১. Dikshit Sinha, Poet as A Plowman : Rabindranath Tagore and His Rural Reconstruction Work, On the Seashore of Humanity, Edited by Suranjan Das & others, University of Calcutta, 2012, p : 71-72.

১২. Ibid, p: 76.

১৩. Ibid, p: 73.

১৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৮৭।

১৫. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিলাইদহের স্মৃতি। পিতৃস্মৃতি। জিজ্ঞাসা। ১৩৮৭। পৃ: ৪২।

১৬. Leonard K. Elmhirst, PERSONAL REMINISCENCES, POET AND PLOWMAN, VISVA-BHARATI, 2008, P: 5.

১৭. ড: ক্ষুদিরাম দাস। সমাজ : প্রগতি : রবীন্দ্রনাথ। করুণা। ১৯৯০ পৃ: ১৫৬।

১৮. Sudhir Sen, During the Swadeshi Movement of Bengal, Rabindranath Tagore On Rural Reconstruction, Visva-Bharati, 1999, p: 87.

১৯. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবার শিলাইদহ। পিতৃস্মৃতি। পূর্বোক্ত। পৃ: ১২১।

২০. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পল্লীর উন্নতি। পিতৃস্মৃতি। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৪৪।

২১ উদ্ধৃতিসংগ্রহ। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ। জিজ্ঞাসা। ১৯৭৪। পৃ: ৪২৪- ৪২৫।

২২. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে। জিজ্ঞাসা । ১৯৭৪। পৃ: ৩৩।

২৩. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পল্লীর উন্নতি। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৪৪-২৪৫।

২৪. প্রবাসী। ১৩৩৫ ভাদ্র। পৃ: ৬৮৫।

২৫. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিলাইদহের স্মৃতি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪২-৪৩।

২৬. Sudhir Sen, Make Them Strong, Ibid, p: 100.

২৭. Ibid, p: 101.

২৮. Ibid, p: 101-102.

২৯. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিলাইদহের স্মৃতি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩।

৩০. Sudhir Sen, Experiments at Silaidah and Patisar, Ibid, p : 143.

৩১. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৩।

৩২. Sudhir Sen, Give Them Education, Ibid, p: 107.

৩৩. Sudhir Sen, Experiments at Silaidah and Patisar, Ibid, p : 147.

৩৪. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৩।

৩৫. তদেব।

৩৬. মীরা দেবী। স্মৃতিকথা । বিশ্বভারতী। ১৮১৮। পৃ: ২৩।

৩৭. ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী। পারিবারিক স্মৃতি। রবীন্দ্রস্মৃতি। বিশ্বভারতী। পৃ: ৬২।

৩৮. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ।পূর্বোক্ত। পৃ: ৪২৯।

৩৯. Sudhir Sen, Experiments at Silaidah and Patisar, Ibid, p : 144.

৪০. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পল্লীর উন্নতি। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৪০-২৪১।

৪১. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৮৩-৮৪।

৪২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৮৪

৪৩. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিলাইদহের স্মৃতি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪২।

৪৪. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পল্লীর উন্নতি। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৪২-২৪৩।

৪৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৪৩-২৪৪।

৪৬.Sudhir Sen, My Days at Santiniketan, Ibid, p : 9.

৪৭. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পল্লীর উন্নতি। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৪৪।

৪৮. Manjula Bose, Leonard K. Elmhirst: From Sriniketan to Dartington Hall, L. K. ELMHIRST 1893-1993, CENTENARY VOLUME, Edited by Manjula Bose, TAGORE RESEARCH INSTITUTE, p:40.

৪৯. Ibid, p: 41.

৫০. Ibid, p: 45.

৫১. দীক্ষিত সিংহ । আত্মশক্তির উদ্‌বোধন: ব্রতী, শিক্ষা ও কুটিরশিল্প। রবীন্দ্রনাথের পল্লিপুনর্গঠন প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ২০১১ । পৃ: ২৩৭-২৩৯।

৫২. Arun Mukhopadhyay, Tagore’s Concept of Population Education and Rural Reconstruction, L.K. ELMHIRST 1893-1993, CENTENARY VOLUME, Ibid, p: 13.

৫৩. Sugata Dasgupta, A Poet and a Plan, Visva-Bharati, 1998, p: 13.

৫৪. অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশ-প্রযুক্তি শিল্পী : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। Rathindranath Tagore : The Unsung Hero, Visva-Bharati, June 2013, Edited by Tapati Mukhopadhyay& Amrit Sen, p: 31.

৫৫. Visva-Bharati, Bulletin no 32, january, 1951, p: 1.

৫৬. Rathindranath Tagore, Shilpa-Bhabana, Viswa-Bharati News, March, Vol-9 (9), p: 67.

৫৭. Visva-Bharati News, August 1932, p : 10.

৫৮. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। সুকুমার মল্লিক। রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা।জিজ্ঞাসা। ১৯৯৮। পৃ: ১৯৭।

৫৯. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪০১। পৃ: ২৪২।

৬০. দীক্ষিত সিংহ। আত্মশক্তির উদ্‌বোধন : ব্রতী, শিক্ষা ও কুটিরশিল্প। পূর্বোক্ত। পৃ: ২২৪।

৬১. রমা চক্রবর্তী। ভরা থাক স্মৃতিসুধায়। বিশ্বভারতী। ২০০৮। পৃ: ৪।

৬২. Rabindranath Tagore, An Indian Folk Religion, Creative Unity, Visva-Bharati, 1922, p: 69-90.

৬৩. William Bascom, Folklore, International Encyclopeadia of the Social Sciences, Edited by David I. Sills, Vol. 5, U.S.A., 1968, p: 499.

৬৪. Krishna Kripalini, Rabindranath Tagore—A Biography, UBS Publishers Distributors Ltd, 2012, p-224.

৬৫. ধর্মের অধিকার। রবীন্দ্ররচনাবলী ১২শ খণ্ড। পশ্চিম বঙ্গ সরকার। ১৯৯৮। পৃ: ৫৫৩।

৬৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৫৩।

৬৭. সুশীল মণ্ডল। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন—উৎসব-অনুষ্ঠান, সূচনা ও বিকাশ। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন। সম্পাদনা : তপন কুমার সোম। দীপ প্রকাশন। ২০১০। পৃ : ১৭২।

৬৮. Leonard K. Elmhirst, Personal Reminiscences, POET AND PLOWMAN, Visva-Bharati, 2008, p: 9.

৬৯. সজনীকান্ত দাস। কর্মী রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। শতাব্দী গ্রন্থভবন। ১৩৬৭। পৃ: ৩০।

৭০. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮৯-২৯০।

৭১. শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শখণ্ড।বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৩৭৯-৩৮০।

৭২. Sasadhar Sinha, Social Thinking of Rabindranath Tagore, Visva-Bharati, 1997, p: 15.

৭৩. অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশ-প্রযুক্তি শিল্পী : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। Ibid, p: 31-32.

৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিঠিপত্র , ষষ্ঠ খণ্ড। ২৪ সংখ্যক পত্র । বিশ্বভারতী। ১৯৯৩। পৃ: ৫৬-৫৭।

৭৫. অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশ-প্রযুক্তি শিল্পী : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। Ibid, p: 32.

৭৬. Ibid, p: 32-33.

৭৭. পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী। ১৪খণ্ড । বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ২৩২।

৭৮. শিশির কুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের খামারবাড়ি । শ্রীনিকেতন ও অন্যান্য প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী। ২০০৮। পৃ: ২৯।

৭৯. অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশ-প্রযুক্তি শিল্পী : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। Ibid, p: 32-33.

৮০. রাজকুমার কোনার। শান্তিনিকেতনী শিল্পবোধ ও শিল্পী-ডিজাইনার রথীন্দ্রনাথ। Ibid, p: 50.

৮১. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিলাইদহের স্মৃতি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩১।

৮২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৩৬।

৮৩. দীক্ষিত সিংহ। গ্রামে কৃষিকাজের সম্প্রসারণ: কৃষি-উন্নয়ন ও কৃষি সমবায়। রবীন্দ্রনাথের পল্লিপুনর্গঠন প্রয়াস। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩০৬।

৮৪. মীরা দেবী। স্মৃতিকথা। বিশ্বভারতী। ১৪১৮। পৃ: ৫৫।

৮৫. দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীপুনর্গঠন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও

শ্রীনিকেতন। সম্পাদনা : তপন কুমার সোম। দীপ প্রকাশন। ২০১০। পৃ: ৫২৭।

৮৬. দেবাশিস সরকার। শ্রীনিকেতন ও কৃষিভাবনায় রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৭১-৪৭২।

৮৭. দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীপুনর্গঠন। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫২৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র-কবিতা ও গানে পল্লীউন্নয়ন ভাবনা

'বিচিত্রের দূত' রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন সংক্রান্ত যে চিন্তাভাবনা তার স্পষ্ট প্রতিকৃতি আছে তাঁর সাহিত্যের বিচিত্র ধারায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং গানেও এর স্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। এই অধ্যায়টিকে তাই স্বতন্ত্র দুটি উপ-বর্গে বিন্যস্ত করে রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীউন্নয়ন ভাবনার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে—

(ক) রবীন্দ্র-কাব্যে পল্লীউন্নয়ন ভাবনা।

(খ) রবীন্দ্র-গানে পল্লীউন্নয়ন ভাবনা।

ক. রবীন্দ্র-কাব্যে পল্লীউন্নয়ন ভাবনা :

শিলাইদহ-পতিসর শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার প্রতিফলন রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে অন্তঃসলিলা এক স্রোত হয়ে বয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যেও এর ছবি ধরা পড়েছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, ১৮৭৫ থেকেই রবীন্দ্রনাথের পল্লীগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ নিবিড় হতে শুরু করে। আর জমিদারির দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৮৯৯ সাল থেকে পল্লীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। ফলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রে রবীন্দ্রকাব্যে গাঁথা পড়তে শুরু করে পল্লীর নানা ছবি। অবশ্য এর পূর্বে স্বদেশী আবহাওয়ায় ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে শৈশব থেকেই কবির মনের গভীরে দেশাত্মবোধ বা স্বদেশ চেতনার বীজ রোপিত হয়।

একথা ঠিক যে, একজন শিল্পী ও কর্মী ব্যক্তি হিসেবে এক হলেও যখন তিনি কবিতায় কথা বলেন, তখন তিনি ব্যক্তিজীবন ও হৃদয়ের অনুভূতির কথা বলেন। কিন্তু

কর্মময় জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনিই আবার মাধ্যম বদল করেন। একজন সচেতন শিল্পী এই মাধ্যম নির্বাচনে অত্যন্ত সতর্ক থাকেন। রবীন্দ্রনাথ এই মাধ্যম নির্বাচনে সতর্ক ছিলেন বলেই কবিতার ক্ষেত্রে তিনি যতটা সফল তুলনামূলকভাবে নজরুল সেক্ষেত্রে ব্যর্থ। একারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় পল্লী উন্নয়নের প্রসঙ্গ খুব বেশী আনেননি। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার চাপে বেশ কিছু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রকাব্যে এরকম কবিতা এসেছে। সেক্ষেত্রে কবি মৃত্তিকা সমতলে নেমে এসে স্বল্প পরিসরে হলেও কর্মময় জীবনের কথাকে কবিতায় তুলে ধরেছেন।

ক. স্বাদেশিকতাবোধ ও আত্মশক্তির উজ্জীবন প্রয়াস :

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা যে তাঁর স্বদেশ চেতনারই নামান্তর পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে । স্বদেশী আবহাওয়ায় ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে শৈশব থেকেই কবির মনের গভীরে দেশাত্মবোধ বা স্বদেশ চেতনার বীজারোপিত হয়। ১৮৬৫-তে রাজনারায়ণ বসু দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, নবগোপাল মিত্র প্রমুখকে নিয়ে যে ‘স্বাদেশিকদের সভা’ প্রতিষ্ঠিত করেন তারই ক্রমপরিণতি হিসেবে গড়ে ওঠে হিন্দুমেলা।এই মেলার বিবরণ দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

“স্বজাতীয়দের মধ্যে সভা স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করার উদ্দেশ্যে ১২৭৩ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (১২ই এপ্রিল, ১৮৬৭) কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়া ভিলায় চৈত্রমেলার প্রথম অনুষ্ঠান হয়।প্রথম তিন বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা চৈত্রমেলা নামে পরিচিত ছিল।প্রধানত কলিকাতার উপকণ্ঠে কোনো এক উদ্যানে প্রতি বৎসর এই মেলার আয়োজন হইত; জনচিত্তে দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিবার মানসে মেলায় জাতীয়-শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইত, দেশীয় ক্রিড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম প্রদর্শিত হইত;ইহা ছাড়া জাতীয় সংগীত কবিতা পাঠ ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হইত। এই মেলার পরিকল্পনাটি রাজনারায়ণ বসুর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে (৭ ই আগস্ট, ১৮৬৫ তারিখে) প্রথম প্রকাশিত ‘ন্যাশনাল পেপার’ পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে ও উৎসাহে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের নিকট এই স্বদেশী মেলা অশেষ প্রকার ঋণী।”[১]

পার্শীবাগানে আয়োজিত এই হিন্দুমেলারই উদ্দীপনায় রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৫-এ লেখেন তাঁর ‘হিন্দুমেলার উপহার’ কবিতাটি। এ কবিতাতেই কবি দেশজননীর দুর্দশার পরিচয় দিয়ে দেশবাসীর আত্মউজ্জীবনের প্রয়াস নিয়েছিলেন—

“হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।...

৪

ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
কেনরে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।...

১৮

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন
পাইবে হায় রে নূতন জীবন,
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া
আর কি কখন দিবে রে জ্যোতি।”

দেশ জননীর বিপন্নতা দেখে কৈশোরের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমী মন ব্যথিত হয়েছে। ‘প্রতিবিম্ব’ এবং ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় প্রকাশিত যথাক্রমে ‘প্রকৃতির খেদ’ প্রথম পাঠ, (১৮৭৫) এবং ‘প্রকৃতির খেদ’ দ্বিতীয় পাঠ (১৮৭৫) কবিতা দুটিতে কবির বিমর্ষ হৃদয়ের ছাপ পড়েছে দেশমাতৃকার মুখচ্ছবি অঙ্কন করতে গিয়ে। ১৮৭৭-এ রচিত ‘দিল্লী দরবার’ কবিতায় কবি পরাধীন ভারত মাতার জয়গান শুনে ব্যথিত হয়েছেন। ১৮৭৭-এ তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন বিপুল ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর সহকারে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ডিস্‌রেলী প্রদত্ত উপাধি ‘কাইজার-ই-হিন্দ্’ (ভারতের রাজ-রাজেশ্বরী)-এর প্রদান উপলক্ষে দিল্লিতে বিরাট দরবারের আহ্বান করেন। ভারতের

সামন্ত ও দেশীয় রাজারা এই দরবারে আনুষ্ঠানিক ভাবে মহারানী তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। এই ঘটনা রবীন্দ্রনাথের আত্মচেতনায় প্রবল অভিঘাত এনেছিল। পরাধীনতার গ্লানিহীন, আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাহীন, দাসানুদাস ভারতবাসীর আত্মচেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধকে জাগিয়ে তোলার জন্য, নিজেদের আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলার অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথ সেদিন লিখেছিলেন—

"তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন ?

তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে ব্রিটিশের জয়,

বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি—কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—

সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,

তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন

তবে এই-সব দাস দাসেরা,কিসের হরষে গাহিছে গান ?

পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান ?

কিসের তরে গো ভারতের আজি , সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি ?

যতদিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগে নি এ মহাশ্মশান,

বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি?"[২]

১২৮৪-এর 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতায়ও কবি দেশমাতার দুর্দশায় গভীর বেদনা প্রকাশ করেছেন। ভারতবাসীর চৈতন্যকে, তার নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে দেবার জন্য আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন—

" দেখো তবে মাতা দেখো গো চাহিয়া

তোমার ভারত শ্মশান- পারা,

ঘুমায়ে দেখিছে সুখের স্বপন

নরনারী সব চেতনহারা।

যাহা-কিছু ছিল সকলি গিয়াছে,

সে-দিনের আর কিছুই নাই,

বিশাল ভারত গভীর নীরব,

গভীর আঁধার যে-দিকে চাই।"[৩]

কবি তাই ভারতী অর্থাৎ দেবী সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা করেছেন তাঁর বীণায় নতুন সুরকে জাগিয়ে তোলার জন্য—

"বিলাপের ধ্বনি উঠাও জননি,

দেখিব ভারত জাগিবে কি না।

অযুত অযুত ভারত নিবাসী

কাঁদিয়া উঠিবে দারুণ শোকে,

সে রোদন ধ্বনি পৃথিবী ভরিয়া

উঠিবে, জননি,দেবতালোকে।"[৪]

উনিশ শতকের শেষভাগে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ সমস্ত পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। ঔপনিবেশিক অধিকার বিস্তারের প্রয়োজনে বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলি একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তার রেশ এসে পড়েছে উপনিবেশ গুলির উপর। ইংরেজের উপনিবেশ হিসেবে ভারতবাসীকে তার নির্মম মূল্য চোকাতে হচ্ছিল। শোষণ পীড়ন অত্যাচারে ভারতের পল্লী-শহর তখন তটস্থ। এই রাজনৈতিক পরাধীনতা, এই উন্মত্ত দানবিকতা ও পাশবিকতার বিরুদ্ধে এদেশে প্রথম প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে—

"কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে –

রক্তপাত,অত্যাচার,পাপ কোলাহল

দিতেছে মানবমনে বিষ মিশাইয়া!......

কতদেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য,

কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা

রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙিয়া,

তবুও মানুষ বলি গর্ব করে তারা

তবু তারা সভ্য বলি করে অহঙ্কার!

কত রক্তমাখা ছুরি হাসিছে হরষে,

কত জিহ্বা হৃদয়েরে ছিঁড়িছে বিঁধিছে!”[৫]

কিন্তু তরুণ কবি এই রাজনৈতিক পরাধীনতাকে কাটিয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখেছেন, শোষণ-পীড়নহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় থেকেছেন—

“নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা

নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার!

সকলেই আপনার আপনার লয়ে

পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল অন্তরে।

কেহ কারো সুখে নাহি দেয় গো কন্টক,

কেহ কারো দুখে নাহি করে উপহাস!

দ্বেষ নিন্দা ক্রূরতার জঘন্য আসন

ধর্ম-আবরণে নাহি করে গো সজ্জিত!”[৬]

নেপাল মজুমদার একারণেই জানিয়েছেন—“নানা দিক দিয়াই ‘কবিকাহিনী’ শুধু কবি-মানসেই নয়,--বাংলা কাব্যসাহিত্যেও এক নবযুগের সূচনা করে। বস্তুত কবিকাহিনী-র মধ্যেই রবীন্দ্রমানসে আমরা এক অখণ্ড বিশ্বমানব-চেতনা ও সামাজ-চেতনার প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাই। বিশ্বজোড়া উৎপীড়িত ও শোষিত মানুষের ক্রন্দনরোলের অভিঘাতে তাঁহার হৃদয়-মন দলিত-মথিত করিয়া এমন এক অপূর্ব মানবপ্রেম-সংগীত উৎসারিত হয়, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ইতিপূর্বে যা কোনোদিন শোনা যায় নাই।”[৭]

বঙ্কিম তাঁর ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ গ্রন্থের ‘দেশের শ্রীবৃদ্ধি’ প্রবন্ধে হাসিম শেখ কিংবা রামা কৈবর্ত্তদের দেশের আমজনতার মুখছবি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও পল্লীগ্রামে বসবাসকারী বৃহৎসংখ্যক জনতাকেই প্রকৃত দেশের মুখচ্ছবি হিসেবে জেনেছেন। সেই বৃহত্তর পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নকে বাইরে রেখে রবীন্দ্রনাথ দেশের কল্যাণের

কথা ভাবতে পারেননি। শতকরা নব্বই শতাংশ পল্লীবাসীর উন্নয়নকে বাইরে রেখে কেবল শহরের কয়েকটি সভা-সমিতিতে রাজনৈতিক নেতাদের আস্ফালনের দ্বারা যে প্রকৃতপক্ষে দেশের কল্যাণ সম্ভব নয়,সেকথা রবীন্দ্রনাথ বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। একারণেই কবি দেশীয় নেতাদের ফাঁকা প্রতিশ্রুতি আর গালবাদ্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে দেশের সেই বৃহত্তর পল্লীবাসী মানুষের উন্নয়নেই সঁপে দিতে চাইলেন। তাই 'কবিকাহিনী', 'বনফুল', 'সন্ধ্যাসংগীত' হয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রাণের যে যাত্রা শুরু , 'প্রভাতসংগীতে' পৌঁছে তা সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিপ্রেমের সীমাকে ছাড়িয়ে বৃহৎ জগতের অভিমুখীন হতে চেয়েছে—

"জগৎ দেখিতে হইব বাহির

আজিকে করেছি মনে,

দেখিব না আর নিজেরি স্বপন

বসিয়া গুহার কোণে।" [৮]

'প্রভাত-উৎসব' কবিতায় দেখি কবির প্রাণ এতটাই প্রসারিত হয়ে গেছে যে 'জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'। নেপাল মজুমদার জানিয়েছেন—"প্রভাতসংগীতের মধ্যে রবীন্দ্রমানসের এমন একটি চেতনার উন্মেষ দেখিলাম যাহা বিশ্বপ্রকৃতি, সর্বোপরি মানুষের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও প্রেম এবং একাত্মবোধ আনিয়া দিয়াছে। সেই বয়সেই কবি আপনার মধ্যে 'মহামানবের মহাসমুদ্রে'র মিলনের আহ্বান শুনিলেন।" [৯]

'ছবি ও গান' থেকে শুরু করে এই সময়ের রবীন্দ্র-কবিতায় পল্লীচিত্র বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে—

"নবীন প্রভাত-কনক-কিরণে

নীরবে দাঁড়ায়ে গাছপালা—

কাঁপে মৃদু মৃদু কী যেন আরামে,

বায়ু বহে যায় সুধা-ঢালা। ......

বিরামে কাটায়, আরামে ঘুমায়

গাছপালা বন কুঁড়েগুলি।

কাহিনীতে ঘেরা ছোটো গ্রামখানি,

মায়াদেবীদের মায়া-রাজধানী,

পৃথিবী-বাহিরে কল্পনা-তীরে

করিছে যেন রে খেলা- ধূলি।"[১০]

কিন্তু এ কেবল ছবি আঁকার পালা। কবি প্রাথমিক ভাবে পল্লীর জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হলেও তার ভিতরে তখনো সে ভাবে প্রবেশ করে উঠতে পারেননি। বাইরে থেকে 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' বলে প্রতিপন্ন হওয়া পল্লীকে এক রোম্যান্টিক রূপকথার রহস্যময় জগৎ বলে মনে হয়েছে মাত্র। পল্লীকে নিতান্ত কাছ থেকে জেনে বুঝে তার জন্য কিছু করার পরিকল্পনা তখনো গেঁথে তোলা হয়নি।

পল্লীজীবনের দুঃখ-দারিদ্র্যকে দেখে ব্যক্তিজীবনের সীমায়িত গণ্ডীকে এড়িয়ে বৃহত্তর জীবনের অভিমুখীন হবার প্রথম সুর ধ্বনিত হয় 'কড়ি ও কোমল'-এর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থের ভূমিকা অংশেই সে কথা জানিয়ে লিখেছেন –"এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টি-প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বরাবর প্রবাহিত হয়েছে।

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,

মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই-"[১১]

মানবের মাঝে বাঁচার আকাঙ্খার মধ্যেই নিহিত আছে কবি কর্তৃক মানুষের জন্যে আত্মোৎসর্গের অন্তর্গত আকাঙ্খার প্রতিরূপ। কবির নিজেরো অভীপ্সা- 'জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই'।

দেশের প্রকৃত কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ বা ত্যাগ স্বীকারের আবশ্যকতার কথা রবীন্দ্রনাথ বারে বারে বলেছেন। মানবের জীবন্ত হৃদয়মাঝে স্থান লাভের জন্য যে 'জগতের কাজে' বৃহৎ আত্মত্যাগের প্রয়োজন, অহংবোধের বিসর্জন দিয়ে পল্লীর 'ছোট'দের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো প্রয়োজন, সেই আকাঙ্খার কথা নানা প্রসঙ্গ সূত্রে ঘুরে ফিরে এসেছে এই সময়ের কবিতায়—

"যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হতে

যাত্রা করি ছাড়ি হিংসাদ্বেষ,

যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে,

শিরে ধরি সত্যের আদেশ।

যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে

প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,

আয়, মা গো, যাত্রা করি জগতের কাজে

তুচ্ছ করি নিজ দুঃখশোক।”[১২]

‘ছোটোফুল’ ‘স্বপ্নরুদ্ধ’ ‘বাসনার ফাঁদ’ কবিতাগুলিতে কবির মন এভাবেই সঙ্কীর্ণতার সীমামুক্তির জন্য আকুল হয়েছে। বেশকিছু কবিতায় কবির প্রাণ পরাধীন দেশমাতার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে।তাঁর চোখে ধরা পড়েছে সমকালীন দেশনেতাদের দেশসেবার অন্তর্লীন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও অবলম্বিত পন্থার নিরর্থকতার দিকটি। দেশসেবার জন্য যে ত্যাগব্রত ও দেশমাতৃকার প্রতি যে ঐকান্তিক ভালোবাসার প্রয়োজন তা এঁদের মধ্যে ছিল না। পরানুকরণপ্রিয় এই দেশনেতাদের বিরুদ্ধে স্বদেশমাতার কাছে অনুযোগ করে তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

“কেন চেয়ে আছ গো মা, মুখপানে!

এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে

আপন মায়েরে নাহি জানে!

এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না—

মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভানে!

তুমি তো দিতেছ, মা, যা আছে তোমারি—

স্বর্ণশস্য তব, জাহ্নবী বারি,

জ্ঞানধর্ম কত পুণ্যকাহিনী।

এরা কী দেবে তোরে? কিছু না, কিছু না—

মিথ্যা কবে শুধু হীন পরানে।”[১৩]

এই শ্রেণীর দেশসেবকদের তাই রবীন্দ্রনাথ দেশমাতার ‘হীন সন্তান’ রূপে চিহ্নিত করেছেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘পিতৃস্মৃতি’ গ্রন্থে এই গান বা কবিতাটি সম্পর্কে জানিয়েছেন—

“ যে সময়কার কথা বলছি তখনকার একটি গল্প উল্লেখযোগ্য। আমার মনে থাকার কথা নয়—বড়ো হয়ে বাবার কাছে শুনেছি। কলকাতায় সেবার কংগ্রেস হচ্ছে। নানান প্রদেশ থেকে বড়ো বড়ো নেতারা এসেছেন। দেশোদ্ধার কী করে করা যায় তাই নিয়ে কদিন ধরে ওজস্বী বক্তৃতা অনেক হয়ে গেছে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে। হাট ভাঙার আগে তারকনাথ পালিত ঠিক করলেন তাঁর বাড়িতে নেতাদের ডিনারপার্টি দেবেন। উদ্দেশ্য, পরস্পরকে সাধুবাদ দেওয়া।আমার পিতাকে পালিত সাহেব কেবল সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, বিশেষ করে অনুরোধ করলেন নেতাদের বিনোদনের জন্য গান গাইতে হবে। গগনদাদাদের তিন ভাইয়েরও নিমন্ত্রণ ছিল।তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হল জোড়াসাঁকো-বাড়ি থেকে যে চারজন যাবেন একেবারে বাঙালি দস্তুরে ধুতিচাদর পরে ডিনারে হাজির হবেন। ধুতি-পরা বাঙালি বাবুদের ডিনারে যোগ দেওয়া বিদেশী ভাবাপন্ন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে কী রকম উপহাসের বিষয় হয়েছিল অনুমান করতে পারা যায়। ইংরেজি কায়দায় ডিনার পার্টি কী ধরণের হবে বাবা সহজেই অনুমান করেছিলেন—সেই বিদেশী আবহাওয়ার মধ্যে স্বদেশী গান গাইতে তাঁর একটুও ইচ্ছা করছিল না। উতলা মন নিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

আহারান্তে বক্তৃতা যখন চলছে,তার মধ্যে এক সময়ে বাবাকে গান গাইতে বলা হল। বাবা গাইলেন—

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না। ...

একি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা?

গান শুনে সকলে স্তব্ধ।ডিনার পার্টি মাটি হয়ে গেল। মুখ বিষন্ন করে একে একে সবাই চলে গেলেন।”[১৪]

‘বঙ্গবাসীর প্রতি’প্রতি’ কবিতায় তাই রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন—

“কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,

কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ—

কাতরে কাঁদিবে,মা’র পায়ে দিবে

সকল প্রাণের কামনা।

একি শুধু হাসিখেলা,প্রমোদের মেলা,

শুধু মিছে কথা ছলনা!”

কিন্তু বাঙালি তখন নিজেদের মধ্যে জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, স্বার্থ, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, কলহ নিয়ে ব্যাপৃত। সারা পৃথিবীর বিপ্লব-বিদ্রোহ-গণজাগরণ তাদের পরাধীন চিত্তলোকে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া জাগায় না আর। সারা বঙ্গদেশ সেদিন যেন সব কর্মপ্রয়াস হারিয়ে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল। এই সামগ্রিক অবক্ষয়কে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি পঙক্তিতে সুন্দরভাবে ধরেছেন—

“ঘরে ঘরে কেন দুয়ার ভেজানো,

পথে কেন নাই লোক,

সারা দেশ ব্যাপি মরেছে কে যেন’

বেঁচে আছে শুধু শোক।......

কত-না সঙ্কট, কত-না সন্তাপ

মানব শিশুর ঘরে,

কত-না বিবাদ কত-না বিলাপ

মানব শিশুর তরে,

কত ভায়ে ভায়ে নাহি যে বিশ্বাস,

কেহ কারে নাহি মানে,

ঈর্ষা নিশাচরী ফেলিছে নিশ্বাস

হৃদয়ের মাঝখানে।

হৃদয়ে লুকানো হৃদয় বেদনা,

সংশয় আঁধারে

কে কাহারে আজি দিবে গো সান্ত্বনা

কে দিবে আলয় খুঁজে!”

এই অবক্ষয়, এই আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা থেকে দেশকে বৃহৎ কর্মের ক্ষেত্রে আহ্বান জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চেয়েছিলেন মানুষের মধ্যেকার লুপ্ত আত্মসম্মান ও আত্মশক্তির জাগরণ ঘটাতে। সেই আত্মজাগরণের মন্ত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে অতীত গৌরব বা ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই সচেতনতা বোধ আনয়নের জন্যই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"ওরে চেয়ে দেখ্ মুখ আপনার

ভেবে দেখ তোরা কারা,

মানবের মতো ধরিয়া আকার,

কেন রে কীটের পারা?

আছে ইতিহাস, আছে কুলমান,

আছে মহত্বের খনি—

পিতৃপিতামহ গেয়েছে যে গান

শোন তার প্রতিধ্বনি।

খুঁজেছেন তারা চাহিয়া আকাশে

গ্রহতারকার পথ,

জগৎ ছাড়ায়ে অসীমের আশে

উড়াতেন মনোরথ।

চাতকের মতো সত্যের লাগিয়া

তৃষিত-আকুল-প্রাণে

দিবস রজনী ছিলেন জাগিয়া

চাহিয়া বিশ্বের পানে।"[১৬]

'মানসী'কাব্যে মিথ্যা গর্বে স্ফীত বাঙালির ইংরেজের প্রতি আনুগত্য, আত্মসম্মানহীন দাসসুলভ নির্বিকার জীবনযাপনকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করে সচেতনতা আনয়নের প্রয়াস নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—

"কিসের এত অহঙ্কার ! দম্ভ নাহি সাজে—
বরং থাকো মৌন হয়ে সসংকোচ লাজে।
অত্যাচারে মত্ত-পারা
কভু কি হও আত্মহারা ?
তপ্ত হয়ে রক্তধারা
ফুটে কি দেহমাঝে ?
অহর্নিশি হেলার হাঁসি তীব্র অপমান
মর্মতল বিদ্ধ করি বজ্রসম বাজে ?

দাস্যসুখে হাস্যমুখে,বিনীত জোড়-কর
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবর!
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি
ঘৃণায়-মাখা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি
যেতেছ ফিরি ঘর।
ঘরেতে ব'সে গর্ব কর পূর্বপুরুষের,
আর্যতেজ-দর্প-ভরে পৃথ্বী থরথর।"[১৭]

'মানবের কাজে মানবের মাঝে' ঠাঁই পাবার অন্যতম পন্থা হিসেবে বঙ্গের কবিকে সেদিন রবীন্দ্রনাথ আহ্বান জানিয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে মায়ের ভাষায় গান গেয়ে স্থান কিনে দেওয়ার জন্য। মাতৃভূমির অপমান দূর করার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের এই প্রয়াসের মধ্যেই

নিহিত ছিল দেশের প্রতি কবির ক্রমবর্ধমান মমত্ববোধের পরিচয়, মাতৃভাষার প্রতি,—বলা যেতে পারে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয়।

বৃহৎ জীবনের প্রতি—কর্মময় এই পৃথিবীর প্রতি শ্রেষ্ঠ মানবপ্রাণের আত্মদানের কথা কবি বলেছেন 'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায়—

"সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,

বিপদে সম্পদে,

জীবনে মরণে,

শত ঋতু আবর্তনে

বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে

শতদল উঠিতেছে ফুটি-"

'বিশ্বজগতের তরে' যে হৃদয়-শতদলের উন্মেষ ঘটে—যার প্রকাশ ঘটে নানা কল্যাণকর্মে—তা আসলে আমাদের আত্মসত্তারই উজ্জীবন মন্ত্র, মানুষের আত্মশক্তি অর্জনের নিরবচ্ছিন প্রয়াস। মানুষের অন্তর্গত পূর্ণতাই যে সামাজিক অখণ্ডতা বা পূর্ণতার নামান্তর মাত্র, সে কথা রবীন্দ্রনাথ বহুস্থলেই বলেছেন। ঔপনিষদিক কবি তাঁর স্বদেশ ভাবনায়তাই ব্যক্তি কিংবা সমাজের পূর্ণতা আনয়নের পথে এক আদর্শ মানব বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ব্যক্তির প্রেমের ছায়া নিজেকে ছাড়িয়ে বৃহৎ সংসারের পথে ছড়িয়ে পড়ুক—এমন আকাঙ্খারও উদ্ভাসন আছে 'মানসী'র 'বিচ্ছেদের শান্তি'র মতো এই পর্বের একাধিক কবিতায়।

কিন্তু বণিক ইংরেজের মনে বৈশ্যবৃত্তি চরিতার্থতার অতিরিক্ত অনুরূপ কোন মহৎ ভাবনার অবশেষ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সমকালে দেখেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আমাদের দেশের অমূল্য মানবশক্তিকে নিজেদের শাসন আর শোষণের কাজে কীভাবে জুতে দিয়ে মানব-পৃথিবীকে কলুষিত করতে উদ্যত হয়েছে—

"কেবল জগৎটাকে জড়ায়ে সহস্র পাকে

গবর্মেন্ট পড়ে থাকে বিরাট বিপুল।

বিষম রাক্ষস ওটা, মেলিয়া আপিস-কোটা

গ্রাস করে গোটা গোটা বন্ধুবান্ধবেরে—

বৃহৎ বিদেশে দেশে কে কোথা তলায় শেষে

কোথাকার সর্বনেশে সার্বিসের ফেরে।......

এদিকে যে গোরা মিলে কালা বন্ধু লুটে নিলে,

তার বেলা কী করিলে নাই কোন খোঁজ।”[১৮]

শিক্ষিত বাঙালি সেদিন দেশের প্রতি বৃহৎ দায়িত্ব কর্তব্য ভুলে ব্যক্তিগত উদর পরিপূর্তির কাজেই নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিল। বাঙালির সেই নিস্তরঙ্গ সঙ্কীর্ণ সীমায়িত জীবনযাপনকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করে 'মানসী'র 'দুরন্ত আশা' কবিতায় সেদিন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

“মর্মে যবে মত্ত আশা সর্পসম ফোঁসে

অদৃষ্টের বন্ধনেতে দাপিয়া বৃথা রোষে

তখনো ভালো মানুষ সেজে

বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে

মলিন তাস সজোরে ভেঁজে

খেলিতে হবে কষে!

অন্যপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব

জন-দশেকে জটলা করে তক্তপোষে বসে।”

দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তথা শিক্ষিতরা সেদিন আসল সমস্যার সমাধান অপেক্ষা পত্র-পত্রিকাগুলিতে কিংবা সভা সমিতিতে নিজেদের অক্ষম আস্ফালন প্রদর্শনে ব্যস্ত রেখেছেন। কিংবা রোম্যান্টিক ভাবাবেশের ব্যক্তিগত পরিধির মধ্যে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করে দিয়ে প্রকৃত সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই নিরর্থকতার দিক নির্দেশ করে লিখেছেন—

“বেহালাখানা বাঁকায়ে ধরি বাজাও ওকি সুর

তবলা-বাঁয়া কোলেতে টেনে বাদ্যে ভরপুর!

কাগজ নেড়ে উচ্চ স্বরে

পোলিটিকাল তর্ক করে,

জানলা দিয়ে পশিছে ঘরে

বাতাস ঝুরুঝুর্।

পানের বাটা, ফুলের মালা, তবলা-বাঁয়া দুটো,

দম্ভ-ভরা কাগজগুলো করিয়া দাও দূর।”[১৯]

দেশের মানুষকে তাঁর নিজস্ব শক্তির উপর প্রতিষ্ঠার প্রয়াস না নিয়ে দলাদলি, রাজনৈতিক উত্তেজনা বা জিহ্বা আস্ফালনই যে দেশনেতাদের উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এ কথা পূর্বেই বলেছি। দুর্বল বিচ্ছিন্ন বাঙালির পক্ষে অস্ত্রশক্তিতে বলীয়ান ইংরেজের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই করা যে অদূরদর্শিতা মাত্র, এ কথা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। তার দ্বারা যে দেশের উন্নতি বা পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন সম্ভব নয়, তাও জানিয়েছিলেন। কিন্তু সমকালীন রাজনৈতিক নেতারা সেদিকে কর্ণপাত করেননি। তাই নিজেকে এই অন্তঃসারশূন্য উত্তেজনা থেকে দূরে সরিয়ে এনেছিলেন। জানিয়েছিলেন—

“রক্ষা করো ! উৎসাহের যোগ্য আমি কই!

সভা-কাঁপানো করতালিতে কাতর হয়ে রই!

দশ জনাতে যুক্তি করে

দেশের যারা মুক্তি করে ,

কাঁপায় ধরা বসিয়া ঘরে, তাদের আমি নই।

‘জাতীয়’ শোকে সবাই জুটে

মরিছে যবে মাথাটা কুটে,

দশ দিকেতে উঠিছে ফুটে বক্তৃতার খই—

হয়তো আমি শয্যা পেতে

মুগ্ধ হিয়া আলস্যেতে

ছন্দ গেঁথে নেশায় মেতে প্রেমের কথা কই।”[২০]

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা তথা পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনার স্বরূপ কাব্যের আধারে আরো স্পষ্ট রূপ নিতে শুরু করে 'সোনারতরী'র সময় থেকে। এই সময় থকেই জমিদারির কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পল্লীর নিবিড় যোগসূত্র গড়ে ওঠে। অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্যে ভরা পল্লীবাংলা—যা আমাদের কৃষিপ্রধান দেশের বৃহত্তর অংশ—তার উন্নয়নের জন্য নানা পরিকল্পনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আত্মনিয়োগ করেন তা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জানিয়েছি। 'সোনারতরী' কাব্যের সূচনায় অংশে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাই জানিয়েছেন—

"বাংলাদেশে নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। ....এইখানে নির্জন-স্বজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সঙ্কল্প বেঁধে তুলেছি—সেই সঙ্কল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ আর কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে।"

'সোনারতরী'র প্রথম কবিতা থেকেই দেখি 'সাহিত্যের পথ' আর 'কর্মের পথ'কে পাশাপাশি প্রবাহিত হতে। এ কবিতায় কবি কর্মেরই জয় ঘোষণা করেছেন। আমাদের জীবনবিধাতা আমাদের কর্মটুকুকেই গ্রহণ করেন, ব্যক্তিমানুষটিকে নয়। কর্মের মাঝেই মানুষ কালের বহমানতায় আপন প্রাণের স্বাক্ষরটুকু রেখে যান। তাই এ কবিতায় জীবনদেবতারূপী মাঝি কৃষকরূপী কবির কর্মের ফসল সোনার ধানের আঁটিটুকুকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কৃষকরূপী রবীন্দ্রনাথের তাতে স্থান হয়নি –

" ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই –ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।"[২১]

আর তাই—

"শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।"[২২]

এই বিষাদ থেকে, জীবনের এই সীমায়িত পরিসর থেকে মুক্ত হয়ে কবি বিশ্বজীবনস্রোতের সঙ্গে নিজের জীবনধারাকে মেশাতে চেয়েছেন। একদিকে মর্ত্যপৃথিবীর প্রতি গভীর মমত্ববোধ অন্যদিকে সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্খা কবির মধ্যে সুতীব্র টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এরই মধ্যে কবি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—

"হৃদয় আমার ক্রন্দন করে

মানব-হৃদয়ে মিশিতে—

নিখিলের সাথে মহা রাজপথে

চলিতে দিবস-নিশীথে।"[২৩]

'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবি সংসারের সাধারণ মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য-অভাব-অস্বাস্থ্য-শোষণ-পীড়নকে নিতান্ত কাছ থেকে দেখে তার ভার অপনোদনের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে চেয়েছেন। এ কাজে বহু বিলম্ব ঘটে গেছে। তার জন্য রোম্যান্টিক কবি কিছুটা ক্ষেদের সঙ্গে জানিয়েছেন—

"সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,

তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো

মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষন্ন তরুচ্ছায়ে

দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে

সারাদিন বাজায়িলি বাঁশি।"

কিন্তু আজ বিপ্লব-বিদ্রোহের আগুন দিকে দিকে জ্বলে উঠছে। মানুষের মনকে জাগিয়ে তোলার নিরন্তর প্রয়াস চলেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেশজননীর আকুল কান্না প্রতিধ্বনিত।সেই জাগরণ বা বিপ্লব-বিদ্রোহের আঁচ পল্লীর নিথর জীবনে গিয়ে পৌঁছয়নি। শোষকের অত্যাচারে, শোষণে বিধ্বস্ত অসহায় মানবপ্রাণ আজ নিরুপায় হয়ে আত্মগোপন করছে। পল্লীর মানুষদের অনুরূপ অসহায় অবস্থা দেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"...........ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির

মূক সবে—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর

বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষন থাকে প্রাণ তার—
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ,নাহি জানে অভিমান
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।”[২৪]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীতে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধার পর বুঝেছিলেন পল্লীর মানুষ কত অজস্র লৌকিক কুসংস্কারের বেড়াজালে বাঁধা। তার উপর শোষক জমিদার-মহাজনদের ঋণের পাহাড়প্রমাণ বোঝা বইতে বাধ্য হয় তারা। নিরক্ষর অশিক্ষিত এই সকল পল্লীর মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জমিদার-মহাজন সম্প্রদায় ঋণের ফাঁদে তাদের এমনভাবে বেঁধে ফেলে যে, তার থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় মুক্তি এক অর্থে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সকল পল্লীপ্রাণ মানুষেরা এই অন্যায় শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে জানে না। সঙ্ঘশক্তি সম্পর্কে কোন ধারণাই তাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। বিপ্লব প্রতিরোধের কথা তাদের কল্পনার অতীত; কাউকে দোষারোপ তো দূরের কথা। এই শোষণ-পীড়ন-অসহায়তাকে ভবিতব্যতা হিসেবে স্বীকার করে, জীবনের সব আশাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ম্লান মূক মুখে পশুর মত কোন মতে বেঁচে থাকে মাত্র। অবশেষে পশুপ্রায় মৃত্যুবরণ করে জীবনের ইহলীলা সাঙ্গ করে।

এই সকল মানুষের জন্য রবীন্দ্রনাথের মানবদরদী মন ব্যাকুল হয়েছে। তিনি যে পরিপূর্ণ মানববিশ্বের কল্পনা করেছিলেন, দেখলেন তার সঙ্গে পল্লীজীবনের বিস্তর প্রভেদ। বুঝলেন, এ কেবলমাত্র ‘ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়’ মাত্র নয়। সেখানে ঘটে চলেছে মানুষের জীবনের ‘দন্ডে দন্ডে ক্ষয়’। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অসহায়তা, শোষণ মানুষের প্রাণকে ওষ্ঠাগত করে তুলেছে। এই সকল মানুষের মনের মধ্যে নিজেদের প্রতি আত্মসম্মান বোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন কবি। তাদের মধ্যেকার নিহিত শক্তি সম্পর্কে সচেতন করে তুলে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন । এর জন্য প্রধান অবলম্বন হিসেবে শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তার কথাকে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীতে নিয়মিত শিক্ষার পাশাপাশি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে বয়স্কশিক্ষার আয়োজন আছে, এ কবিতায় তারই স্পষ্ট স্বীকৃতি মেলে—

“...........এই- সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে

দিতে হবে ভাষা—এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে

ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা,ডাকিয়া বলিতে হবে—

‘মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;

যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,

যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে;”[২৫]

এই প্রতিবাদ মনস্কতাকে জাগিয়ে তোলা পল্লীর মানুষের মনে আত্মশক্তি জাগিয়ে তোলারই নামান্তর। পল্লীর সঙ্কীর্ণ সীমায়িত জীবনে বৃহৎ বিশ্বচেতনার সঞ্চার ঘটিয়ে, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীভূত করে, আত্মশক্তি ও আত্মসম্মানবোধকে জাগিয়ে তুলে, দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যকে পরাজিত করে পরিপূর্ণ এক মানব-পৃথিবী গড়ার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং সেই অনুযায়ী যাবতীয় পরিকল্পনা গড়ে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রায় সমগ্র জীবন জুড়ে চলেছে সেই কার্যধারা। এ কবিতায় কবি তারই উচ্চকিত আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন—

“ কবি তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ

তবে তাই লহো সাথে,তবে তাই করো আজি দান।

বড়ো দুঃখ,বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার

বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।

অন্ন চাই,প্রাণ চাই,আলো চাই,চাই মুক্ত বায়ু,

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,

সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্যমাঝারে, কবি,

একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।”[২৬]

জীবনের এই পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কঠিন বন্ধুর এই পথে যাত্রা করতে হলে প্রয়োজন স্বার্থত্যাগ, নিঃসীম দুঃখস্বীকার, সঙ্কল্পে অবিচল দৃঢ়তা, সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা। সমকালীন দেশহিতৈষীদের মধ্যে কিন্তু মেকি দেশপ্রেম আর ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতার হীন প্রয়াস তীব্র হয়ে উঠেছিল। যে দেশোন্নয়ন রবীন্দ্রনাথের কাছে মানবকল্যাণের চরমাদর্শ বলে পরিগণিত হয়েছিল, তার নিতান্ত অভাব দেখেছিলেন সমকালীন দেশ হিতৈষীদের মধ্যে। তাই দেশব্রতীদের এই মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন—

"………বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,

মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ

বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।"[২৭]

এই স্বার্থত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মানবকল্যাণের নিমিত্ত বুদ্ধদেবের মত মহৎ প্রাণের মহৎ দুঃখসাধনা ও ত্যাগ স্বীকারকে জীবনাদর্শ রূপে সকলের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন—

"……………..শুনিয়াছি তারি লাগি

রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্নকন্থা, বিষয়ে বিরাগী

পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে

সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে

প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস

অতি পরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা

নীরবে করুণ নেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা

সৌন্দর্যপ্রতিমা।"[২৮]

জীবনের প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথের কাছে পল্লীউন্নয়ন ভাবনা সৌন্দর্যসাধনার নামান্তর বলে পরিগণিত হয়েছিল। কবির অন্তরস্থিত এই 'নিরুপমা সৌন্দর্যপ্রতিমা' কবির জীবনদেবতারই নামান্তর। সে জীবনদেবতা কবির জীবনকে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা তুচ্ছতাকে ছিন্ন করে ক্রমে এক পূর্ণতার অভিমুখে গতি দান করেন। পল্লীউন্নয়নের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত রূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে যে বিরূপ নানা সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়, সে খবর আমাদের জানা। কিন্তু কবি সেই সকল তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে আপন সঙ্কল্পে ও

সত্যনিষ্ঠায় অটল থেকে নিজ পরিকল্পনাকে যে একদা সফল ও সাকার করে তুলেছিলেন, সে কেবল তার অন্তরস্থিত প্রেরণাশক্তি জীবনদেবতার কারণেই। সুতরাং 'সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে' সকল ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ, সুখকে বিসর্জন দিয়ে পল্লীর মানুষের মঙ্গলসাধনা ব্রতে পূর্ণতা লাভের নামান্তর হল পূর্ণতার প্রতিরূপ কবির বিশ্বপ্রিয়া বা জীবনদেবতাকে পাবারই এক অনিবার্য প্রক্রিয়া। তাই কবি জানিয়েছেন, এ কাজে যেদিন তিনি সফল হবেন সেদিন 'তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব প্রেমতৃষা'[২৯]।

আসলে 'চিত্রা'-পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে জীবনদেবতা তত্ত্বের কথা বলেছেন তাঁর 'অন্তর্যামী', 'জীবনদেবতা'র মত একাধিক কবিতায়, তা আসলে মানুষের আত্মশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার এক মানবিক প্রক্রিয়া মাত্র। কাব্যের সূচনা অংশেই রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—"বস্তুতঃ চিত্রায় জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলননাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোন নায়ক- নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই, এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়।" কর্মের পথে নিজের সকল জীর্ণতা ও সঙ্কীর্ণতাকে ঝরিয়ে যখনিই মানুষ আত্মশক্তির পূর্ণতা নিয়ে জেগে ওঠে ,তখনিই তো আমাদের মাঝে কবিকথিত 'মনের মানুষ' তথা জীবনদেবতার অস্তিত্বকে টের পাওয়া যায়। সে জাগরণ সম্পূর্ণ হলে সকলে 'রাজা' হয়ে যায়। আর যে আর্থ-সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় সকলেই রাজা হবার যোগ্যতা অর্জন করে সেখানে মানবসত্তার দ্বন্দ্বহীন স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। তখন বলপ্রয়োগকারী শাসন ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন হয় না। কেননা—

"আমরা   সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,

নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।-"[৩০]

উত্তেজনা রাজনৈতিক উচ্ছ্বাসের পথ ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষের আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেছেন 'চৈতালী'র 'বঙ্গমাতা' কবিতায়—

'পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে

মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে......

পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে

বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালোছেলে করে।"

বিশ্বের বিপদ-সঙ্কুল জীবনের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলা মায়ের গৃহবিলাসী সন্তানেরা মানুষ হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা করেছেন কবি। পরনির্ভরতা বা অন্যের অন্ধ হাস্যকর অনুকরণ নয়, চেয়েছিলে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি মানুষের যথার্থ ভালোবাসা বা দেশাত্মবোধকে জাগিয়ে তুলে তাদের আত্মমর্যাদাবোধে প্রতিষ্ঠিত করতে। 'পর-বেশ' কবিতায় কবি একারণেই বলেছেন—

"কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ।

ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ!

পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান

তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান?......

ওই তুচ্ছ টুপিখান চড়ি তব শিরে

ধিক্কার দিতেছে না কি তব স্বজাতিরে।"

'কল্পনা'র 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতায় ইংরেজ কতৃক উৎপীড়িত-শোষিত বঙ্গভূমির প্রতি স্বদেশবাসীর দায়িত্বহীনতা, আলস্যকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করে কবি তাদের প্রসুপ্ত দেশভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন—

"................. রয়েছ, মা, ভুলি

তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি

সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,

তোমার ললাটশোভা সীমন্তরতন,

তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে

বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে।"

'কল্পনা'র 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই বঙ্গলক্ষ্মীকে অপমানকারী ইংরেজের তাঁবেদার একশ্রেণীর বাঙালির আত্মসম্মানহীনতা ও অহঙ্কার বা গর্বকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করে দেশমাতার সামর্থ্য ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদনের প্রয়াস নিয়েছেন—

"পরধনে ধিক্ গর্ব, করি করজোড়

ভরি ভিক্ষাঝুলি!

পুণ্যহস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে

তাই যেন রুচে ,

মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে

তাহে লজ্জা ঘুচে।”

দেশ বলতে যে বৃহৎ পল্লীবাংলাকে বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার উন্নয়নের জন্য গভীর দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকারকে দেশনেতাদের একটা বড় অংশই যে স্বীকার করতে পারেননি, তা পূর্বেই জানিয়েছি। যারা পেরেছিলেন, তাদেরকে তথাকথিত ‘হতভাগ্য’ হিসেবে চিহ্নিত করে দেশনেতাদের কৃত্রিম দেশপ্রেম ও ভণ্ডামিকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন কবি –

“লুকোক তোমার ডঙ্কা শুনে কপট সখার শূন্য হাসি।

পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে মিথ্যে চাটু মক্কা কাশী।”[৩১]

দেশোন্নয়নের নামে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনই হয়ে উঠেছিল অধিকাংশ দেশনেতার অভিপ্রেত। অধিকাংশ সভা সমিতিতে সাহেব সুবো বরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। উদ্দেশ্য গভীর—সাহেবতোষণের দ্বারা আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। দেশোন্নয়নের এ সকল কর্মসভা থেকে প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের অপমানিত করে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল—যেমনটা ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ একারণেই লিখেছেন—

“এসেছিল দ্বারে পূজা দেখিবারে

দেবীর বিনীত ভক্ত,

কেন যায় ফিরে অবনত শিরে

অপমানে আঁখি রক্ত?

উৎসবশালা, জ্বলে দীপমালা,

রবি চলে গেছে অস্তে—

কুতুহলীদলে কী বিধান-বলে

বাধা পায় দ্বারী হস্তে?

ইহারা কি তবে অনাচারী হবে,

সমাজ হইতে ভিন্ন ?

পূজাদানধ্যানে ছেলেখেলা-জ্ঞানে

এরা মানে মানে ঘৃণ্য ?

উত্তর

না,না, এরা সবে ফিরিছে নীরবে

দীন প্রতিবেশীবৃন্দে—

সাহেব-সমাজ আসিবেন আজ'

এরা এলে হবে নিন্দে।"[৩২]

'কপট সখা'র এই মিথ্যাচারিতা দেশের বৃহৎ স্বার্থের অন্তরায় ছিল। দেশ বলতে যে বৃহৎ সংখ্যক অশিক্ষিত সাধারণ জনতার কথা রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিম জানিয়েছিলেন তারা এদের কাছে ব্রাত্য ছিল। তাদের জন্য কোন পরিকল্পনা এদের মধ্যে ছিল না, তাদের কল্যাণের মর্মমূলে পৌঁছানো আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ দেশীয় নেতাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দেশের উন্নতি এদের কাছে হুজুগে পরিণত হয়েছিল মাত্র। রবীন্দ্রনাথ এর ব্যঙ্গাত্বক বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

"অনুরাগভরে ঘুচাবার তরে

বঙ্গভূমির দুঃখ

এ সভা মহতী,এর সভাপতি

সভ্যেরা দেশমুখ্য।

এরা দেশহিতে চাহিছে সঁপিতে

আপন রক্তমাংস—

তবে এ সভাকে ছেড়ে কেন থাকে

এ দেশের অধিকাংশ ?

কেন দলে দলে দূরে যায় চলে'

বুঝে না নিজের ইষ্ট,

যদি কুতুহলে আসে সভাতলে'

কেন বা নিদ্রাবিষ্ট ?

তবে কি ইহারা নিজ-দেশ ছাড়া

রুধিয়া রয়েছে কর্ণ

দৈবের বশে পাছে কানে পশে

শুভকথার এক বর্ণ ?

উত্তর

না,না, এঁরা হন জনসাধারণ,

জানে দেশভাষামাত্র,

স্বদেশ সভায় বসিবারে হায়

তাই অযোগ্য পাত্র।"[৩৩]

এর পাশাপাশি দেশোন্নয়নের বৃহৎ দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া ত্যাগব্রতী দুঃখসাধক দেশব্রতীদের মহৎ জীবনাদর্শের বর্ণনা করে লিখেছেন—

"যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা , লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।

ভাঙা কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভৃত্যগণে।

দগ্ধভালে প্রলয়-শিখা

দিক্, মা, এঁকে তোমার টীকা—

পরাও সজ্জা লজ্জাহারা জীর্ণকন্থা ছিন্নবাস।

হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।”[৩৪]

দেশের বৃহৎ সমস্যার সমাধানে যোগ্যতাহীন ব্যক্তিদের নির্বাচনকে রবীন্দ্রনাথ সেদিন মেনে নিতে পারেননি। সেই নির্বাচন জাতীয় রাজনীতিতে কী বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল রবীন্দ্রনাথ তা নিজেই স্বচক্ষে দেখেছিলেন। ‘জুতা আবিষ্কার’ কবিতায় হবু রাজা ও গবু মন্ত্রীর রূপকের আড়ালে রবীন্দ্রনাথ সে কথাকেই ব্যক্ত করেছেন। হবু ও গবু মিলে সারা দেশে যে বিরাট অপহ্নবের সৃষ্টি করেছিল নিজ অযোগ্যতার কারণে, এক সামান্য চর্মকার এক নিমিষেই তার সমাধান করে দেয়। অথচ যোগ্য এই সকল লোকের কোন কদরই নেই রাজার কাছে। তারা মন্ত্রীর মত নিজেদের অযোগ্যতাকে ঢাকার জন্য নানা অজুহাতের সৃষ্টি করে মাত্র। বস্তুতঃ মত ও পথের নানা বৈপরীত্যই রবীন্দ্রনাথকে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও লক্ষ্যহীন কর্মপ্রয়াস থেকে দূরে সরিয়ে এনেছিল এইসময়। তারই ছবি ধরা আছে ‘খেয়া’র ‘বিদায়’ কবিতায়—

“বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই।

কাজের পথে আমি তো আর নাই।

এগিয়ে সবে যাও-না দলে দলে,

জয়মাল্য লও-না তুলি গলে,

আমি এখন বনচ্ছায়াতলে

অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই।

তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই। ...

তোমরা আজি ছুটেছো যার পাছে

সে-সব মিছে হয়েছে মোর কাছে—

রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাঙা গড়া,

মতের লাগি দেশ বিদেশে লড়া,

আলবালে জলসেচন করা

উচ্চশাখা স্বর্ণচাঁপার গাছে।

পারিনে আর চলতে সবার পাছে।"

নিছক আধ্যাত্মিক চেতনা-জাগৃতিই এ-কবিতার সারাৎসার নয়। কবিতাটি সম্বন্ধে ড. অনুত্তম ভট্টাচার্য যথার্থই মন্তব্য করেছেন—

"সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা কবিচিত্তে এক ধরণের ক্লান্তির ছায়াপাত ঘটিয়েছে। লক্ষ্যসাধনে সহযাত্রীদের উচ্ছ্বাসপ্রবণতা ও মতাদর্শে তিনি যেন আর ঠিকমতো আস্থা রাখতে পারছেন না। তাই সেখান থেকে সরে আসার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন।"[৩৫]

'নৈবেদ্যে' রবীন্দ্রনাথ তাঁর সকল কর্মে পরমদেবতার প্রকাশকে কামনা করলেও জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেননি।জানিয়েছেন—'আঘাতসংঘাত-মাঝে দাঁড়াইনু আসি'[৩৬]। বিশ্বসঙ্কটের পটভূমিকায় পরম দেবতার কাজে নিজেকে কর্মক্ষেত্রে বিলীন করে দিতে চেয়েছেন—

"ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন

কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।" [৩৭]

বাংলাদেশের বৃহৎ পল্লীগ্রামই রবীন্দ্রনাথের কাছে হয়ে উঠেছে সেই বিরাট ও বিপুল কর্মক্ষেত্র । সেখানেই আপন কর্মের মাঝে পরম দেবতার মঙ্গলময় প্রবর্তনাকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। বৃহৎ দেশ তখন ইংরেজের পদানত। পরাধীনতা, দাসত্ব, শোষণ, পীড়নে এ দেশের মানুষের ভীত সন্ত্রস্ত প্রাণ তখন অসহায় দিশাহীন। আত্মবমাননাকে শিরোধার্য করে সেদিন মানুষ আপন মর্যাদা ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে পশুবৎ জীবন যাপন করছিল। রবীন্দ্রনাথ তাই তার পরম দেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

"এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়

দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—

লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,

এই চিরপেষণযন্ত্রণা,ধূলিতলে

এই নিত্য অবনতি,দন্ডে পলে পলে

এই আত্ম-অবমান,অন্তরে বাহিরে

এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে

সহস্রের পদপ্রান্ত তলে বারম্বার

মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার—

এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে

চূর্ণ করি দূর করো।”[৩৮]

আপন কর্মে মঙ্গলময়ের অভিপ্রায়কে সত্য করে তোলার জন্য দেশের তথা পল্লীর মানুষকে রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদাবোধে সমুন্নত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আত্মশক্তিতে সমুন্নত মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধকে জাগ্রত করে তুলতে দেশীয় অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন—যা 'নৈবেদ্য'র অনেক কবিতারই মূল সুর।

নদীবিধৌত পল্লীপ্রধান বংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের পল্লীপ্রাণ সঙ্কীর্ণচেতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মনকে বিশ্বচেতনার নব নব স্পর্শের দ্বারা সচল ও সজীব রাখতে চেয়েছিলেন। দেখেছিলেন মানুষ কীভাবে জীবনকে সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রাচারের নিগড়ে বেঁধে ফেলে মিথ্যার বেসাতি গড়ে তুলেছে জীবনভর। আশাহীন আনন্দহীন সে জীবনে সত্তার তিলে তিলে ক্ষয়। মানবিক মুক্তদৃষ্টি তথা চেতনার স্বাধীনতা বা প্রগতিচেতনা আনয়নের জন্য তাই রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্যে'র অনেক কবিতায় এমন উচ্চারণ রেখেছেন—

“ চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,

জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর

আপন প্রাঙ্গনতলে দিবসশর্বরী

বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি,

যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে

উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে

দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়

অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি

বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,

পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা

তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—

নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ

ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।”[৩৯]

'বলাকা' পর্বের কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথ সমাজজীবনে মানুষের কুসংস্কার জীর্ণতা অন্ধবিশ্বাসের স্থানূত্বকে কাটিয়ে জীবনের সার্বিক গতির স্বপক্ষে সওয়াল করেছেন। পল্লীপ্রাণ ভারতবর্ষের সমাজ অন্ধ বিশ্বাস কুসংস্কারের ঘেরাটোপে তখনো ঘুমিয়ে। তাকেই জীবনের মহৎ চরিতার্থতা হিসেবে বিধান দেয় পরম পাকা প্রবীণ সমাজপতিরা।শিলাইদহ-পতিসরের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ রবীন্দ্রনাথ তাই 'বলাকা'র 'সবুজের অভিযান' কবিতায় এরই বিরুদ্ধাচরণ করে বলেছেন—

“খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়;

আর তো কিছুই নড়ে না রে

ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।

ওই যে প্রবীণ, ওই যে পরম পাকা,

চক্ষু-কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা

ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা

অন্ধকারে বন্ধকরা খাঁচায়।”

রবীন্দ্রনাথ এই সীমায়িত সঙ্কীর্ণ চেতনাকে বিশ্বচেতনার সঙ্গে সম্মিলিত করতে চেয়েছিলেন। তাই এ-কবিতায় তিনি সমাজের প্রবীণদের সম্পর্কে লিখেছেন—

“বাহিরপানে তাকায় না যে কেউ

দেখে না যে বান ডেকেছে

জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।”

চেতনার স্বাধীনতা,ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা,রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও মানবিক মুক্তদৃষ্টি ছাড়া যে বৃহত্তর ভারতের মুক্তি বা উন্নতি নেই, প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালে যে মানুষের সঙ্কট ও যন্ত্রণার কোন শেষ থাকবে না, সে কথা বারবার বলেছেন কবি। বলাকার ৩ সংখ্যক কবিতাটি এরই দৃষ্টান্ত বিশেষ।এ কবিতায়ও কবি জানিয়েছেন—

“শিকলদেবীর ওইযে পূজাবেদী

চিরকাল কি রইবে খাড়া।......

আনরে টেনে বাঁধা-পথের শেষে।

বিবাগী কর্ অবাধপানে,

পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।......

ঘুঁচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে

পথে চলার বিধিবিধান যাচা।”

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন পল্লীর রক্ষণশীল সমাজে আঘাত করতে গেলে কতবড় প্রত্যাঘাতকে সহ্য করতে হয়। সমাজের রক্ষণশীল প্রবীণরা তাদের অধিকারের এক বিঘত জমি ছাড়তে চায় না নব্যপন্থী প্রগতিশীলদের। নতুন ভাবনা বা চিন্তাচেতনাকে তারা সন্দেহের চোখে দেখে, তাকে সামাজিক অপহ্নব বলে চিহ্নিত করে। তাই সমাজকল্যানের তথা দেশোন্নয়নের কাজে যে অনেক আঘাত, অনেক বিপদ আছে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু আশ্বাস দিয়েছিলেন মিথ্যা এবং সত্যের এই

লড়াইয়ে সত্যের জয় নিশ্চিৎ। কবিতায় অনুরূপ মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

"তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে এ কি বিষম কাণ্ডখানা।
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।"[৪০]

'বলাকা'র যৌবনবন্দনা বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে পুরাতনকে বর্জন করে নবীনকে বরণ করে নেবার অনুরূপ প্রগতিচেতনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় কবি পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে বেচাকেনার পরিবর্তে 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার' উদ্ঘাটনের অপেক্ষায় উচ্চকিত থেকেছেন। আছে 'অনাগরিক' মানুষের পথ চলার ছবি। দেশের প্রগতির যারা কাণ্ডারী, তাদের আত্মত্যাগের ছবিকে এ কবিতায়ও খুঁজে পাই।সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, পীড়ন, জাত্যাভিমানজনিত কারণে মনুষ্যত্বের অপমান ইত্যাদির দায় এদেশের মানুষেরও ছিল। কেননা অন্যায়, শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে তারা ভীরুতার কারণে প্রতিবাদী হতে পারেনি। তাই—

"বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,"

রবীন্দ্রনাথ তাই নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছিলেন—‘এ আমার এ তোমার পাপ’। এই পাপ স্খালনের জন্যই কবি মানুষকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে অন্যায় শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে উচ্চকিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। সর্বপ্রকার বন্ধনকে ছিন্ন করে রাজনৈতিক, ব্যক্তিক তথা চেতনার স্বাধীনতা আনতে চেয়েছিলে।

‘মহুয়া’র ‘প্রতীক্ষা’ কবিতায় কবির দেশোন্নয়নের ভাবনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যক্ত হয়েছে। তিনের দশকের উপান্তে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ পীড়ন বেড়ে চলেছিল। ‘হ্রস্ব যারা’ তারা ‘দীর্ঘ ছায়া’ ধরে সমাজে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছিল। এদের হাত থেকে দেশকে মুক্তিদানের লক্ষ্য আমাদের স্বদেশের বেশ কিছু সংখ্যক ভাগ্যের দোহাই দেওয়া মানুষের মনের মধ্যে তো ছিলই না, উপরন্তু তাঁরা সেই সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়াদের ঘৃণাভরে ছুঁড়ে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খেয়েই জীবনের পরমার্থ খুঁজেছিল। রাজনৈতিক নেতাদের ‘কুটিল সিদ্ধি’ লাভের ইচ্ছা, জাতিবিরোধ বেড়ে চলেছিল। এমতাবস্থায় জাতির ভিতরের নানাপ্রকার বন্ধনকে ছাড়িয়ে না উঠে বাইরে নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের দ্বারা যে দেশের উন্নতি আসবে না, একথা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, মানুষকে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করে আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে।তাই লিখেছেন—

“ ভাগ্যের ভিক্ষুক চাহে কুটিল সিদ্ধির আশীর্বাদ,
ধুলিতে-খুঁটিয়া তোলা বহুজন-উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ।

কুৎসায় বিস্তারি দেয় পঙ্কে-ক্লিন্ন গ্লানি,
কলহেরে শৌর্য বলে জানি,
ভাবি, দুর্যোগের সিন্ধু তরিব হেলায়
বঞ্চনার ভঙ্গুর ভেলায়।
বাহিরে মুক্তিরে ব্যর্থ খুঁজি,
অন্তরে বন্ধন করি পুঁজি,
অশক্তি মজ্জার রক্তে,শক্তি বলে জানি ছলনাকে,
মর্মগত খর্বতায় সর্বকালে খর্ব করি রাখে।”[৪১]

পল্লীর মানুষের কুসংস্কার মুক্তদৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কতটা অন্তরায় তার ছবি আছে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'মানী' কবিতায়—

"ভক্তেরা মন্দিরে

পূজারির কৃপা বহু-দামে কিনে পূজা দিয়ে যায় ফিরে

ঝিল্লিমুখর বেণুবীথিকার ছায়ে

আপন নিভৃত গাঁইয়ে

তখন একাকী বৃথা-বিচিত্র পাষাণভিত্তি-মাঝে

দেবতার বুকে জান সে কী ব্যথা বাজে।

বেদীর বাঁধন করি ধূলিসাৎ

অচলেরে দিয়ে নাড়া

মানুষের মাঝে সে-যে পেতে চায় ছাড়া।"

এ সভ্যতা কবির কাছে তাই 'লক্ষ্যশূন্য'—মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী। মানুষের আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে , ভালোবাসা দিয়ে গড়া কোন সমুন্নত মানবসভ্যতার ভোরে তা আমাদের পৌঁছে দেয় না। কবি তাঁর সমকালেই দেখেছিলেন ইংরেজের মত সাম্রাজ্যবাদী কিছু মানুষ যন্ত্রসভ্যতায় বলীয়ান হয়ে কেবল অশ্বমেধের ঘোড়া ছোটাতে ব্যস্ত। কিন্তু এ ঘোড়া অশ্বমেধের ঘোড়া নাকি সভ্যতার গভীরতর অসুখের দিকে ছুটে চলা ঘোড়া, তার হদিস তারা নিজেরাও জানতো না। সকলকে ফাঁকি দিয়ে সকলের আগে সকলে পৌঁছবে বলে মানবতাহীন এক নির্মম বিশ্বের অভিমুখে ইঁদুর দৌড়ে সামিল। দেশের তথা পল্লীর যে বৃহত্তর অসহায় মানুষের শোষণের পথ বেয়ে, তাদের পিঠে পা দিয়ে কয়েকজন প্রভুত্বকামী মানুষের নির্মম দিশাহীন সভ্যতা আসতে চলেছে , সে সম্পর্কে কবি 'পরিশেষ' থেকেই উচ্চকিত হয়েছেন। যে মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের জগৎকে গড়ে তুলেছিলেন এতদিন ধরে তার ভেঙে পড়ার ছবি দেখে ব্যথিত হয়েছেন বার বার। 'পরিশেষে'র 'লক্ষ্যহীন' কবিতায় কবি রূপকের আড়ালে এই কথাগুলিই বলতে চেয়েছেন—

"রথী কহে, যেতে হবে আগে।'

'কোনখানে' শুধাইল। রথী বলে,' কোনোখানে নহে,

শুধু আগে।" 'কোন তীর্থে,কোন সে মন্দিরে' গৃহী কহে।

'কোথাও না,শুধু আগে।'

'কোন বন্ধু-সাথে হবে দেখা।'

'কারো সাথে নহে,যাব সব-আগে আমি মাত্র একা।'

ঘর্ঘরিত রথবেগে গৃহভিত্তি করি দিল গ্রাস;

হাহাকারে, অভিশাপে, ধূলিজালে ক্ষুভিল বাতাস

সন্ধ্যার আকাশে।আঁধারের দীপ্ত সিংহদ্বার-বাগে

রক্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে।"

'পরিশেষে'র 'প্রার্থনা' কবিতায়ও কবি দেখিয়েছেন শক্তির দম্ভ কীভাবে মৃত্তিকার সমতলে থাকা মানুষদের আশা, আকাঙ্খাকে পদদলিত করে। নিরন্ন মানুষের বাসগৃহটুকুকে ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে স্বার্থের পরিপূর্তি ঘটায়। এই অহঙ্কার ও বর্বরতার সামনে এদেশের মানুষের শোচনীয় বিপর্যয়ের ছবি আছে এ কবিতায়ও—

"..............দুঃখীর আশ্রয়বাসা

নিশ্চিন্তে ভাঙিয়া আনে দুর্দাম দুরাশা হোমানলে

আহুতি-ইন্ধন জোগাইতে; নিঃসঙ্কোচ গর্বে বলে,

আত্মতৃপ্তি ধর্ম হতে বড়ো; দেখি আত্মম্ভরী প্রাণ

তুচ্ছ করিবারে পারে মানুষের গভীর সম্মান

গৌরবের মৃগতৃষ্ণিকায়;সিদ্ধির স্পর্ধার তরে

দীনের সর্বস্ব সার্থকতা দলি দেয় ধূলি-পরে

জয়যাত্রাপথে;"

কবি তাই ত্যাগ ও আত্মশক্তির জোরে এই প্রতিকূলতাময় পরিস্থিতিকে অতিক্রমণের জন্য বুদ্ধের ত্যাগ-তিতিক্ষাময় জীবনাদর্শকে এদেশের মানুষের অবলম্বনীয় বলে মনে করেছেন। বৃহত্তর জনকল্যাণের জন্য বুদ্ধের যে ত্যাগ ও কল্যাণচেতনা সেই আদর্শের অনুকরণের দ্বারা সাধারণের মনে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা ও আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন—

"ভরসা হারাল যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস

তোমারি করুণাবিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ,

আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি।"[৪২]

'শ্যামলী'র 'অমৃত' কবিতায় কবি দেশের কাজে নিয়োজিত হবার মহত্ত্বের দিকটিকে সংহত কাব্যরূপ দিয়েছেন। কবিতাটির কথক নায়িকা অমিয়াকে ভালোবাসতেন। কিন্তু অমিয়ার পরিবারের সঙ্গে ধনের অসাম্য নিরসনের জন্য কথক যাত্রা করেন বিদেশে। ধনের সঞ্চয়-মোহ অমিয়ার স্মৃতিকে ঢেকে দেয়। সেখানে সফল হয়ে ফিরে আসেন একদিন। কিন্তু অমিয়া ততদিনে বিবাহ করে ঘর বেঁধেছে মাধোপাড়ার রায়বাহাদূরের ছেলে মহীভূষণের সঙ্গে। উপকরণের আড়ম্বরের লোভে নয়, মহীভূষণের বিষয়াতিরিক্ত মহত্তর আকাঙ্খার কারণে। ব্যক্তি সুখ নয়, দেশের পরাধীনতা ও গ্লানির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই। বিষয়বুদ্ধির তুলনায় দেশের কাজে নিজেকে আত্মোৎসর্গ করাতেই তাঁর আগ্রহ। রাশিয়ার বৈপ্লবিক চেতনা ও দেশোন্নয়নের মন্ত্র তাঁর চিত্তের গভীরে।তাই—

"লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে

রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো   বাদুড়টা।"

একটি গ্রামকে স্বংসম্পূর্ণ করে তুলতে হলে, মানুষকে আত্মশক্তিতে জাগিয়ে তুলতে গেলে যে ত্যাগ ও সমর্পণের প্রয়োজন হয় তা সমকালীন দেশীয় নেতাদের মধ্যে ছিল না। অমিয়া এবং তার স্বামীর ত্যাগ ও সহনশীলতা সেই সকল দেশীয় নেতাদের কাছে যেন এক তীর্যক জীবনাদর্শ হিসেবে চিত্রিত —

"অমিয়ার শেষ কথা এই,

"এসেছি তাঁরই কাজে।

উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি

করেছেন আমাকে উদ্ধার।"

আমি শুধালেম, "কোথায় আছেন তিনি।"

আমি শুধালেম, "কোথায় আছেন তিনি।"

অমিয়া বললে, "জেলখানায়।"

পল্লীর কুসংস্কারাগ্রস্ত সংকীর্ণমনা মানুষের চেতনার যথার্থ জাগরণ ছাড়া, আত্মশক্তির উজ্জীবন ছাড়া, বাইরে থেকে কতকগুলি গালভরা বাক্য দ্বারা যে পল্লীর মানুষের দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করা সম্ভব নয়, তারই ব্যঙ্গাত্মক ছবি পাই 'খাপছাড়া'র ৩৫ সংখ্যক কবিতায়—

'ঘোষালের বক্তৃতা

করা কর্তব্যই,

বেঞ্চি চৌকি আদি

আছে সব দ্রব্যই।

মাতৃভূমির লাগি

পাড়া ঘুরে মরেছে,

একশো টিকিট বিলি

নিজহাতে করেছে।"

চোখ বুজে ভাবে, বুঝি

এল সব সভ্যই।

চোখ চেয়ে দেখে,বাকি

শুধু নিরেনব্বই।"

মানুষের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধের জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এই পথে পল্লীর মানুষের আত্মশক্তির জাগরণের ছবি আছে 'ছড়ার ছবি'র 'মাধো' কবিতায়। এ কবিতায় রায়বাহাদুর কিষনলালের ছেলের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় মাধোকে তার পিতা জগন্নাথ নিজের মনিবের হাতে তুলে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। সেই অনুসারে মাধোকে দশ-বিশজন লোক লাগিয়ে ধরে এনে খাটের খুরোয় বেঁধে রাখেন মনিবের পেয়াদার হাতে তুলে দেবেন বলে। কিন্তু—

"মনিব বাড়ির পেয়াদা এল দিন হল যেই শেষ।

দেখলে দড়ি আছে পড়ি, মাধো নিরুদ্দেশ।

মাকে শুধায়, "এ কী কান্ড"।" মা শুনে কয়, "নিজে

আপন হাতে বাঁধন তাহার আমিই খুলেছি যে।

মাধো চাইল চলে যেতে; আমি বললেম, যেয়ো,

এমন অপমানের চেয়ে মরণ ভালো সেও।"

স্বামীর 'পরে হানল দৃষ্টি দারুণ অবজ্ঞার ;

বললে, "তোমার গোলামিতে ধিক্ সহস্রবার।"

নারীর অনুরূপ আত্মজাগরণের কথাকেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক রচনায়। পাশাপাশি 'প্রান্তিক' কাব্যে যন্ত্রসভ্যতাপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামনে এদেশের মানুষের আত্মসম্মানহীন ভীরুতা, আপন স্বার্থপরতার ছবিকে প্রকট করে তুলেছেন—

"..................একদিকে স্পর্ধিত ক্রুরতা ,

মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্য দিকে ভীরুতার

দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি

কৃপণের সতর্ক সম্বল—সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো

ক্ষণিক-গর্জন-অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়

নিরাপদ নীরব নম্রতা।"[৪৩]

এই মানুষকে অন্তরের শক্তিতে শক্তিশালী করে তুলতে না পারলে স্পর্ধিত ক্রুরতাকে ছিন্নভিন্ন করার শক্তি আমদের কোথায় ? এই শক্তিকে রবীন্দ্রনাথ তাই দেশের অন্তর থেকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।এ পৃথিবীকে ছেড়ে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তিতে ক্রমোন্নত সেই সকল মানুষের কাছে নিজের আহ্বানকে সোচ্চারে জানান দিয়ে গিয়েছেন—

"বিদায় নেবার আগে তাই

ডাক দিয়ে যাই

দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে

প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।" ৪৪

রবীবন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন মানুষের দুঃখে, কষ্টে, ভয়ে আত্মশক্তি এক বীর্যময় অনুপ্রেরণা হয়ে দেখা দিক। 'আরোগ্য'র ১৬ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন—

"অন্নহারা গৃহহারা চায় ঊর্ধ্বপানে,

ডাকে ভগবানে।

যে দেশে সে ভগবান মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে

সাড়া দেন বীর্য রূপে দুঃখে কষ্টে ভয়ে,

সে দেশের দৈন্য হবে ক্ষয়,

হবে তার জয়।"

খ. ধনী-নির্ধনের ব্যবধান হ্রাস :

মানবহৃদয়ে স্থান লাভের ঐকান্তিক আকাঙ্খায় কবির হৃদয়ের প্রসার যে অনেকটাই বেড়ে গেছিল 'কড়ি ও কোমল'-এর সময় থেকেই, সে কথা আগেই বলেছি। মানুষের প্রতি ব্যাপক গভীর এক সহানুভূতির বোধ কবির মধ্যে জন্ম নিয়েছে এই সময় থেকে। কিন্তু তারও পূর্বে 'কবিকাহিনী'র মধ্যেই ধনী-দরিদ্রের পার্থক্যহীন, জাত-পাতের ব্যবধানহীন, সর্বপ্রকার বন্ধনহীন এক সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন—যা তাঁর পরবর্তীকালের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে উঠেছে :

"অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে, দেব,

এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি!

নাইক দরিদ্র ধনী অধিপতি প্রজা—

কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন

মর্যাদার অপমান করিবে না মনে,

সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,

কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস!”[৪৫]

‘কড়ি ও কোমলে’র ‘কাঙালিনী’ কবিতায় অনুরূপ সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে ধনীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা কাঙালিনী মেয়েটিকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনায় পরবর্তী ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করার যে প্রয়াস দেখা যায়, শ্রেণীবৈষম্যহীন সমাজ গঠনের যে প্রয়াস দেখা যায় ‘কাঙালিনী’ কবিতায় তারই পূর্ব-প্রতিভাস রচিত হয়েছে—

“আনন্দময়ীর আগমনে

আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।

হেরো ওই ধনীর দুয়ারে

দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।

উৎসবের হাসি-কোলাহল

শুনিতে পেয়েছে ভোরবেলা,

নিরানন্দ গৃহ তেয়াগিয়া

তাই আজ বাহির হইয়া

আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে

দেখিবারে আনন্দের খেলা।”

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে একতরফা সম্পদ সঞ্চয়ে ধনী দরিদ্রের এই পার্থক্য কীভাবে বেড়ে গেছে ‘রাশিয়ার চিঠি’র মত একাধিক রচনায় রবীন্দ্রনাথ তা ব্যক্ত করেছেন। নিজে সচেষ্ট হয়েছেন এই বিভেদটুকুকে মুছে ফেলার জন্য। শেষ পর্বের ‘আকাশপ্রদীপ’ কাব্যের ‘ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে’ কবিতায় তাই দেখা যায় পুরানো এক ছড়াকে ঘিরে একটি সামাজিক ভাবনার ব্যঞ্জনাগভীর উপস্থাপনকে। ছড়াটি হল—

“ ‘ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,

সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে।’”

ছড়াটির মধ্যে নিহিত আছে এক ব্যথার ইতিহাস। ডাকাতের সঙ্গে বিবাহে অসহায়ের উপর বলপ্রয়োগ ও আনুষঙ্গিক নির্যাতনের ইতিবৃত্ত লুকিয়ে আছে। তবু সে সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা ছিল বিবাহের উপর। ক্ষমতাবান তার ক্ষমতার প্রয়োগ করলেও তার মধ্যে বেঁচে ছিল এক ধর্মবোধ—অসহায় তারই মধ্যে নিজের ন্যূনতম সুরক্ষাটুকু লাভ করেছে। সেকালে পল্লীর মধ্যে ধনীই কিন্তু দরিদ্রের প্রধান সহায় হয়েছে, তার রক্ষণের দায়িত্ব স্বীকার করেছে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে থাকে এ ছবি। চতুর্দিকে ক্ষমতাবানের উদ্ধত লোভ বীভৎস হয়ে দেখা দেয়। সম্পদ সঞ্চয়ের প্রবণতা যে আত্মকেন্দ্রিক চেতনার প্রসার ঘটায়, যে নিষ্ঠুর স্বার্থপরতাকে জন্ম দেয় তা ধনী-দরিদ্রের, ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাহীন বা অসহায়ের মধ্যে গড়ে তোলে ঘোর ব্যবধান। সৃষ্টি হয় সামাজিক অপহ্নবের। তাই 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' ছড়াটির তাৎপর্য একালে আর আগের মতো ধরা দেয় না। সে যেন ব্যথার কোন এক গভীর গূঢ় দিকের ইঙ্গিত করে।

জমিদারের ঢাকের বাদ্যিতে তাই যে উৎসবের ঘোষণা থাকে, তা কবির কাছে আনন্দের শিহরণ বয়ে আনে না। কেননা এ উৎসবে পল্লীর সাধারণ দরিদ্র মানুষকে সম্মিলিত করা হয়নি। তাই মানবিক মিলনের আন্তরিকতা ও আনন্দের ব্যাপ্তিতে কোথায় যেন সুর কেটে গেছে । পল্লীর নিরন্ন অসহায় মানুষের জীবন বিপর্যয়ে আজ ধনী এসে দরিদ্রের পাশে দাঁড়ায় না। নির্ধন বা অসহায়ের বুকফাটা কান্নায় আজ পল্লীমায়ের আঁচল সিক্ত হয়ে ওঠে। সেখানে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে কেবল। সেই বেদনার রেশ জীবনের পরতে পরতে মিশে থাকায় ঢাকের বাদ্যি আর আগের মতো আনন্দের শিহরণ তুলতে পারে না পল্লীজীবনে। কবি তাই এ কবিতায় লিখেছেন—

"জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,

ঢঙ ঢঙিয়ে ঘন্টা দোলে গলায়।

বিকেলবেলার চিকন আলোর আভাস লেগে

ঘোলা রঙের আলস ভেঙে উঠি জেগে।

হঠাৎ দেখি বুকে বাজে টন্‌টনানি

পাঁজরগুলোর তলায় তলায় ব্যথা হানি।

চটকা ভাঙে যেন খোঁচা খেয়ে—

কই আমাদের পাড়ার কালো মেয়ে—

ঝুড়ি ভ'রে মুড়ি আনত কাঁচামিঠা,

আনির স্থলে দিতেম তাকে চার-আনিটা।

ঐ যে অন্ধ কলুবুড়ির কান্না শুনি—

কদিন হল জানি নে কোন্ গোঁয়ার খুনি

সমস্ত তার নাতনিটিকে

কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্ দিকে।

আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে,

যৌবন তার দ'লে গেছে, জীবন গেছে চুকে।

বুক-ফাটানো এমন খবর জড়ায়

সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।

শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে—

'উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার' বাজে আকাশ জুড়ে।

অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—

'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,

ঢঙ্‌ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।"[৪৬]

সমাজ-কল্যাণের স্বার্থেই রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে ধনী-দরিদ্রের এই বিভেদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখনী নানাভাবে সক্রিয় থেকেছে। কেননা দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক গুরুত্বকে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। সেকারণেই তাদের 'কালের যাত্রা'র নিয়ন্ত্রক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। 'আরোগ্য' কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতায় তাই লিখেছেন—

"মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল,
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পাঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরুগুরু গর্জন গুন্‌গুন্ স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।

দুঃখ সুখ দিবসরজনী

মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।

শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে

ওরা কাজ করে।"

গ. শিল্প :

রবীন্দ্রকাব্যে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন শিল্পভাবনার স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়েছে। সেদিন দেশের বাঙালিরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থতার আকাঙ্খায় এতটাই ব্যস্ত ছিল যে দেশের প্রতি কোন দায়িত্ববোধের স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। এই দায়িত্বহীনতার পরোক্ষ ফল ফলেছিল দেশের অর্থনীতিতে। দেশীয় শিল্পগুলি পাশ্চাত্য দেশগুলির শিল্পবিপ্লবের প্রবল তাড়নায় মৃত্যুমুখে ঢলে পড়তে শুরু করে। রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ উচ্চারণই রেখেছেন তাঁর 'মানসী'র 'শ্রাবণের পত্র' কবিতায়—

"দেখিছ না আঁখি খুলে   ম্যাঞ্চেস্ট্র লিভারপুলে

দেশী শিল্প জলে গুলে করিল finish।"

দেশের মানুষের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা এতে সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। অনাহার আর নিঃসীম দারিদ্র্য সেদিন দেশের মানুষের ভবিতব্যতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রামীণ কুটির শিল্পের বিকাশের উপর জোর দিয়েছিলেন। মাটির নানা প্রকার পাত্র তৈরী শিল্প থেকে শুরু করে শস্য পেষাই করে তৈল নিষ্কাষণ প্রক্রিয়ার উপরও জোর দিয়েছিলেন। এসবই ছিল পল্লীর অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার আশ্রয়স্থল। একাজে যন্ত্রের ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৯৬ নাগাদ, যখন রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্বে পাকাপাকি ভাবে নিযুক্ত হয়ে শিলাইদহ-পতিসরে বসবাস করছেন, সেই সময়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লেখা 'নদী' গ্রন্থে এরই স্বাক্ষর রয়েছে—

" কোথাও কলুদের কুঁড়েখানি,

সেথায় ক্যাঁ কোঁ ক'রে ঘোরে ঘানি।

কোথাও কুমারের ঘরে চাক,

দেয় সারাদিন ধরে পাক।"

রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের দুটি বড় দিক ছিল গোপালন এবং মৃৎশিল্প। পল্লীর মানুষ যে এ দুটি বিষয়ের উপর অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্ভরশীল ছিলেন তা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। টুকরো চিত্রে পল্লীর মানুষের সেই ঐকান্তিক নির্ভরতার ছবি এঁকেছেন 'শিশু ভোলানাথ'-এর 'বৃষ্টি রৌদ্র' কবিতায়—

"গোরুটা কার থেকে থেকে

খোঁটায়-বাঁধা উঠছে ডেকে

ভিজছে সারাক্ষণ।

গদাই কুমোর অনেক ভোরে

সাজিয়ে নিয়ে উঁচু করে

হাঁড়ির উপর হাঁড়ি

চলছে রবিবারের হাটে,

গামছা মাথায় জলের ছাঁটে

হাঁকিয়ে গোরুর গাড়ি।"

তাঁতের কাজ বা তাঁতশিল্প যে পল্লীর অর্থনৈতিক বুনিয়াদের একটি বড় দিক ছিল তার পরিচয় আছে 'বুধু' কবিতায়—

"মাঠের শেষে গ্রাম,

সাতপুরিয়া নাম।

চাষের তেমন সুবিধা নেই কৃপণ মাটির গুণে,

পঁয়ত্রিশ ঘর তাঁতির বসত, ব্যবসা জাজিম বুনে।"

পল্লীর অন্যান্য শিল্পের মতো গুড় তৈরি যে একটি লাভজনক ব্যবসা বা শিল্প ছিল তার পরিচয় আছে 'আরোগ্য'র ৪ সংখ্যক কবিতায়—

"গঞ্জের টিনের চালাঘরে

গুড়ের কলস সারি সারি,

চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর

ভিড় করে মাছি।"

পাশপাশি পাটের ব্যবসার ছবিও কাব্যে স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে একদা পাটের ব্যবসায় নেমেছিলেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পাটের ব্যবসা পল্লীর অর্থনৈতিক বুনিয়াদের একটা বড় ভিত্তি ছিল । এরই পরিচয় পাই পূর্বোক্ত কবিতায়—

"রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি

পাটের বোঝাই ভরা,

একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন

আড়তের আঙিনায়।"

এই ছবিগুলি গ্রামীণ অর্থনীতির ভিতগুলিকে চিনিয়ে দেয়, যেগুলির উন্নয়নের পরিকল্পনাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্বে প্রতিষ্ঠা দেন। অর্থকরী শস্য সর্ষেরও প্রসঙ্গ পাই এ কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই পল্লীর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পন্থা হিসেবে রবিশস্য চাষের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন—সর্ষে যার মধ্যে অন্যতম। আড়তের সামনের রাস্তার বর্ণনা দিয়ে এ কবিতায় কবি জানিয়েছেন—

"সর্ষে আছে স্তূপাকার

গোলায় তোলার অপেক্ষায়।"

ঘ. শিক্ষা :

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তথা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে দেশ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। স্বাধীনতা, জাতীয়তাবোধের মত ধারণাগুলি এদেশের অশিক্ষিত দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের কাছে ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট। আমাদের দেশের একটি বৃহৎ অংশই পল্লীর অন্তর্গত। অথচ সেখানকার মানুষদের জন্য অর্থাৎ দেশের বৃহৎসংখ্যক মানুষের আত্মজাগরণের জন্য তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কোন

পরিকল্পনাই ছিল না বলা চলে। দেশাত্ববোধ, জাতীয়তাবোধ, ইতিহাসবোধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুলে দেশের মানুষের আত্মজাগরণের জন্য যে প্রাথমিক শর্ত হিসেবে শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, তার ন্যূনতম আয়োজন ছিল না| ফলে দেশের বৃহৎসংখ্যক মানুষ স্বদেশচেতনার স্পর্শবঞ্চিত ছিল। দেশ বিদেশের নানা সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে আপামর জনসাধারণের কোন যোগ ছিল না। অথচ রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে বিশ্বের গণআন্দোলনকারীদের প্রসঙ্গ তুলে বক্তৃতার ঝড় বয়ে যেত। অশিক্ষিত শ্রোতাসাধারণের মর্মে গিয়ে তা পৌঁছত না। এই বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন, সেদিন তাই মুষ্টিমেয় মানুষের গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছিল। 'মানসী'র 'বঙ্গবীর' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সেই নিরর্থকতার দিকটিকে স্পষ্টতই চিহ্নিত করেছেন—

" ম্যারাথন আর থর্মপলিতে
কী যে হয়েছিল বলিতে বলিতে
শিরায় শোণিত রহে গো জ্বলিতে
পাটের পলিতে-সম।
মূর্খ যাহারা কিছু পড়ে নাই
তারা এত কথা কি বুঝিবে ছাই—
হাঁ করিয়া থাকে, কভু তোলে হাই—
বুক ফেটে যায় মম।

আগাগোড়া যদি তাহারা পড়িত
গারিবাল্‌ডির জীবনচরিত
না জানি তাহলে কী তারা করিত
কেদারায় দিয়ে ঠেস!
মিল করে করে কবিতা লিখিত,
দু-চারটে কথা বলিতে শিখিত,

কিছুদিন তবু কাগজ টিকিত—

উন্নত হত দেশ—

না জানিল তারা সাহিত্যরস,

ইতিহাস নাহি করিল পরশ,

ওয়াশিংটনের জন্ম-বরষ

মুখস্থ হল নাকো।

ম্যাট্‌সিনি-লীলা এমন সরেস

এরা সে কথার না জানিল লেশ—

হা অশিক্ষিত অভাগা স্বদেশ,

লজ্জায় মুখ ঢাকো।”

রবীন্দ্রনাথ সমকালীন দেশনেতাদের কাছে শিক্ষা ও স্বরাজ ভাবনার একটি আদর্শকে তুলে ধরতে চেয়েছেন ‘শ্যামলী’র ‘অমৃত’ কবিতায়। এ কবিতার দেশনায়ক মহীভূষণকে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে বেছে নেন নায়িকা অমিয়া। অমিয়া উপকরণের প্রাচুর্য থেকে মুক্তি পেতে মহীভূষণকে বিবাহ করে পল্লীর উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করে। সেই ছিল তার প্রকৃত বৃহত্তর দেশ সেবা। কবিতা-কথকের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

“অনেক সন্ধানের পর

দেখা হল শেষে।

কোন বারো-ভুঁইঞাদের আমলের

একখানা তিন-কাল-পেরোনো গ্রাম—

একটি পুরোনো দিঘির ধারে—

দিঘির নামেই লোচনদিঘি তার নাম।

সেখানে ভুলে-যাওয়া তারিখের

ঝাপসা অক্ষর-পট-ওয়ালা

ভাঙা দেবালয়।

পূর্বখ্যাতির কোন সাক্ষী রাখে নি,

আছে সে অশ্বত্থের পাঁজর- ভাঙা

আলিঙ্গনে জড়িয়ে পড়া।

পাড়ির উপরে বুড়ো বটের তলায়

একটি নূতন আটচালা ঘর,

সেইখানে গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়।”

বাংলার পল্লীগুলির এমনি হতশ্রী চেহারা দাঁড়িয়েছিল সেদিন। নাগরিক জীবনের বিলাস আর ঔজ্জ্বল্য থেকে বহু দূরের এই অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে পল্লীর উন্নয়নের দ্বারা বৃহত্তর দেশোন্নয়নের ভাবনা, ত্যাগস্বীকার অমিয়ার মত সেদিনের ক'জন দেশনায়কের মধ্যেই বা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের মতো হাতে গোণা দু'একজন ছাড়া ! দেশের পল্লীউন্নয়নের জন্য সর্বাপেক্ষা যে গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তা হল শিক্ষার দ্বারা পল্লীর মানুষের মনকে যাবতীয় অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তিদান। অমিয়া সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই আত্মোৎসর্গ করেছিল। নিতান্ত স্বল্প উপকরণের আয়োজনে জীবন অতিবাহনের দ্বারা অমিয়ার সেই ত্যাগ স্বীকারকে রবীন্দ্রনাথ ধরেছেন তাঁর লেখনীর আঁচড়ে—

“নিয়ে গেল স্কুলের মধ্যে

দালানের পুব দিকটাতে

শতরঞ্চের পর্দা দিয়ে ভাগ করা ঘরে।

একটা তক্তপোশের উপর

বিছানা রয়েছে গোটানো।

টুলের উপর সেলাইয়ের কল,

ছিটের খাপে ঢাকা সেতার

দেয়ালে-ঠেসান-দেওয়া।

দক্ষিণের দরজার সামনে মাদুর পাতা,

তার উপরে ছড়িয়ে আছে

ছাঁটা কাপড়, নানা রঙের ফিতে,

রেশমের মোড়ক।

উত্তর কোণের দেয়ালে

ছোটো টিপায়ে হাত-আয়না,

চিরুনি,তেলের শিশি,

বেতের ঝুড়িতে টুকিটাকি।"

এ বর্ণনা জানান দেয়, অমিয়ার পাঠশালায় প্রথাগত শিক্ষাদানের পাশাপাশি রেশমের সুতো দিয়ে বস্ত্র তৈরির মতো হস্তশিল্পের নানা শিক্ষা দেওয়া হোতো। শুধু তাই নয় পাঠশালায় যে কৃষি সংক্রান্ত শিক্ষা প্রদান করা হোতো তারও আভাস পাওয়া যায়। বিলিতি বেগুনের চারা চাষের দ্বারা কৃষির উন্নতির প্রয়াস পল্লীগ্রামে তখনো কৃষকদের কাছে শিক্ষনীয় বিষয়। অমিয়া নিজেই কিন্তু এ কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। পাঠশালার বাগানে নানাপ্রকার শাকসব্জির চাষেরও বন্দোবস্ত করেছে অমিয়া। এভাবেই তো রবীন্দ্রনাথ গ্রাম-স্বরাজ স্থাপনের কথা বলেছিলেন।

কিন্তু নাগরিক বিলাস আর ঔজ্জ্বল্যকে ছেড়ে সেদিন কোন দেশনেতাই পল্লীর উন্নয়নের জন্য গ্রামে থেকে কাজ করতে রাজী ছিলেন না। ছোটর উপকার করার জন্য রবীন্দ্রনাথ লোকহিতকারীদের 'ছোট'র সমতলে নেমে আসার কথা বলেছিলেন। সে কথা সেদিনের দেশনেতারা কানেই তোলেননি। তাঁরা কেবল বৃহত্তর পল্লীবাংলার বাইরে, নাগরিক জীবনের বিলাসের মাঝে বসে, অমিয়ার মত দেশোন্নয়নের মহৎ কাজকে যাঁরা সেদিন মাথায় তুলে নিয়েছিলেন তাঁদের গায়ে কাদা ছিটিয়েই নিজেদের কর্মকৃতিত্বের পরাকাষ্ঠাকে জানান দিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এ কবিতায় অমিয়ার মধ্য দিয়েই যেন তাঁদের উদ্দেশ্যে এক তীর্যক ব্যঙ্গের চাবুক হেনেছেন—

"চোখের আড়ে

আমার দামি জুতোজোড়াটার দিকে তাকিয়ে

বললে অনায়াসে,

“বেশি বর্ষায় আগাছায় চাপা পড়েছে

বিলিটি বেগুনের চারা;

এসো-না, নিড়িয়ে দেবে।”

বোঝা গেল না, ঠাট্টা কি সত্যি।

জামার আস্তিনে ছিল মুক্তোর বোতাম,

লুকিয়ে আস্তিনটা দিলেম উলটিয়ে।

অমিয়ার জন্য একটা ব্রোচ ছিল পকেটে,

বুঝলেম দিতে গেলে

হীরেটাতে লাগবে প্রহসনের হাসি।”

শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আশ্রমিক শিক্ষাভাবনার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার একপ্রকার সাঙ্গীকরণ ঘটিয়েছিলেন। পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে রচিত ‘চিত্রা’র ‘ব্রাহ্মণ’ কবিতায় প্রাচীন ভারতের আশ্রমিক শিক্ষার এক ছবিকে ফুটে উঠতে দেখা যায়—

“আসিয়াছে ফিরে

নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ

মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ

বনান্তর হতে;ফিরায়ে এনেছে ডাকি

তপোবন গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি

শ্রান্ত হোমধেনুগণে; করি সমাপন

সন্ধ্যাস্নান সবে মিলি লয়েছে আসন

গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটির প্রাঙ্গণে

হোমাগ্নি আলোকে।”

প্রকৃতির উদার সান্নিধ্যে বসে গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক আলাপের মধ্যস্থতায় শিক্ষাদান প্রণালী শান্তিনিকেতন পর্বের শিক্ষাপ্রণালীর অন্যতম বিশেষ দিক ছিল। নীতিশিক্ষার পাশাপাশি এই শিক্ষায় তাত্ত্বিক শিক্ষাদান প্রণালীরও সামঞ্জস্যময় অনুসরণ ছিল। এই ব্যবস্থায় নিসর্গপ্রকৃতি আর মানবমনের মিশ্রণে বোধের এক অকৃত্রিম বৃহৎ পরিসর রচিত হত—

“শুন্যে অনন্ত গগনে

ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি ;নক্ষত্র মন্ডলী

সারিসারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতুহলী

নিঃশব্দ শব্দের মতো। নিভৃত আশ্রম

উঠিল চকিত হয়ে; মহর্ষি গৌতম

কহিলেন, ‘বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,

করো অবধান।”

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার ছবি পাই ‘বালক’ কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে পল্লীউন্নয়ন কেন্দ্রিক যে শিক্ষার কথা বলেছেন, তাতে শিক্ষার্থী যাতে তার প্রবণতার পথে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রকৃতির সাহচর্যবঞ্চিত প্রথাগত নীরস শিক্ষার বাইরে হাতে কলমে শিক্ষাদানের উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ জাতীয় শিক্ষায় আনন্দের যেমন আয়োজন থাকতো তেমনি বাস্তব প্রয়োজন পূরণের অনুকূল করে তোলা যেত শিক্ষাকে। এ জাতীয় শিক্ষাভাবনা কথা রবীন্দ্রনাথ নানা স্থলে বলেছেন। কাব্যে এরই পরিচয় পাই ‘পুনশ্চে’র ‘বালক’ কবিতায়—

“বাপ মা চায় পড়ে শুনে হবে সদর-আলা;

সর্দার পোড়ো ওকে টেনে নামায় গাধার থেকে,

হেঁচড়ে আনে বাঁশবন দিয়ে,

হাজির করে পাঠশালায়।

মাঠে ঘাটে হাটে বাটে জলে স্থলে তার স্বরাজ—

হঠাৎ দেহটাকে ঘিরলে চার দেওয়ালে,

মনটাকে আঠা দিয়ে এঁটে দিলে

পুঁথির পাতার গায়ে।”

বয়স্ক শিক্ষার অন্যতম পন্থা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নৈশবিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরই ছবি আছে খাপছাড়ার ১১ সংখ্যক কবিতায়। মেছুয়াবাজার থেকে চারজন পালোয়ান পলায়ন করে অন্যের বাড়িতে জঞ্জাল সাফ করার কাজ নেয়। উদ্দেশ্য—

“ কেঁদে বলে, “আমাদের

নেই কোনো গার্জন,

ভেবেছিনু হেথা হয়

নৈশ বিদ্যালয়—

নিখরচা জীবিকার

বিদ্যা-উপার্জন।”

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের মনে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি প্রীতি বা ভালোবাসা অপেক্ষা বিদেশী সব কিছুর প্রতি মনের মধ্যে যে একধরণের অর্থহীন মোহ দেখেছিলেন তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। অন্তসারশূন্য সেই পাশ্চাত্যপ্রীতির পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘খাপছাড়া’র ৪৩ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

“ আদর করে মেয়ের নাম

রেখেছে ক্যালিফোর্ণিয়া,

গরম হল বিয়ের হাট

ওই মেয়েরই দর নিয়া।

মহেশদাদা খুঁজিয়া গ্রামে গ্রামে

পেয়েছে ছেলে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ নামে,

শাশুড়ি বুড়ি ভীষণ খুশি

নামজাদা সে বর নিয়া—

ভাটের দল চেঁচিয়ে মরে

নামে গুণ বর্ণিয়া।”

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এভাবেই দেশের নারীশক্তিকে নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করে চলেছে। শিক্ষা থেকে তাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। আর চেয়েছে—

“মেয়েরাও বই যদি নিতান্তই পড়ে

মন যেন একটু না নড়ে।

নূতন বই কি চাই, নূতন পঞ্জিকা খানা কিনে

মাথায় ঠেকায়ে তারে প্রণাম করুক শুভদিনে।

আর আছে পাঁচালির ছড়া,

বুদ্ধিতে জড়াবে জোরে ন্যাশনাল কালচারের দড়া।”[৪৭]

হাতেকলমে বা বৃত্তিমুক্ষী শিক্ষার উপর রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন পর্ব থেকেই জোর দিয়েছিলেন। পুঁথিগত শিক্ষার উপর তিনি আশ্বাস রাখতে পারেননি। তাই গোপালন বিদ্যার মত বিদ্যাকে সরিয়ে রেখে পুঁথিগত বিদ্যাচর্চার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে—

“দলে দলে জোট করে পাঞ্জাবি গোয়ালায়।

বলে তারা, গোরু পোষা গ্রাম্য এ কারবার

প্রগতির যুগে আজ দিন এল ছাড়বার।

আজ থেকে প্রত্যহ রাত্তির পোয়ালেই

স্তূপ রচা দুইবেলা খড়-ভিসি-ঘাসটার

ছেড়ে দিয়ে হবে ওরা ইস্কুলমাস্টার।

হাম্বাধ্বনি যাহা গো-শিশু গো-বৃদ্ধের

অন্তর্ভূত হবে বই-গেলা বিদ্যের।

যত অভ্যেস আছে লেজ মলে পিটোনো

ছেলেদের পিঠে হবে পেট ভরে মিটোনো।”[৪৮]

ঙ. গ্রাম-শহরের পার্থক্য দূরীকরণ :

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর অন্যতম বিশেষ দিক ছিল গ্রাম-শহরের পার্থক্য দূরীকরণ। ‘মানসী’র ‘বধূ’ কবিতায় কবির অনুভূতির যে অভিপ্রকাশ আছে তার মধ্যে তার প্রকাশ স্পষ্ট।পল্লীর উন্মুক্ত উদার নিসর্গ পরিসর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপূরক। সেখানকার জীবন যান্ত্রিক নয়, আবদ্ধ নয়—সত্তার এক উদার উন্মুক্ত আনন্দময় মুক্তি আছে তাতে—

“ অশথ উঠিয়াছে   প্রাচীর টুটি

সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি।

শরতে ধরাতল   শিশিরে ঝলমল,

করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।

প্রাচীর বেয়ে বেয়ে   সবুজে ফেলে ছেয়ে

বেগুনি-ফুলে-ভরা লতিকা দুটি।

ফাটলে দিয়ে আঁখি   আড়ালে বসে থাকি,

আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি।

মাঠের পরে মাঠ,মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এ ধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁসে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি
কে জানে কত শত নূতন দেশে।"

অন্যদিকে নগর জীবনের বিপরীত ছবিটিকে তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ এ কবিতায় লিখেছেন—

"কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট —
পাখির গান কই পাখির ছায়া।
কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে
খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে।.........

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা!
ইঁটের 'পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট—
নাইকো ভালোবাসা নাইকো খেলা।"

এই আবদ্ধ জীবন, এই একাকীত্ব বা বিচ্ছিন্নতা, জীবন-যান্ত্রিকতা শহরের জীবনকে করে তোলে অভিশপ্ত, একঘেয়ে। এখানে তাই ‘তৃপ্তি যে নাই কেবল নেশা/ঠেলাঠেলি, নাই তো মেশা/ আবর্জনা জমে উপার্জনে।’ বস্তুপুঞ্জের পাহাড়ের তলায় এখানে চাপা পড়ে যায় সহমর্মিতা, সামাজিকতার মত মূল্যবান মানবিক সম্পদগুলো। তাই রবীন্দ্রনাথ পল্লীর স্বাস্থ্য, সামাজিকতা, খাদ্য আর শহরের সম্পদ ও মনীষার পারস্পরিক আদানপ্রদানের দ্বারা এক সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার জন্য গ্রাম ও শহরের পার্থক্যকে যথাসম্ভব কমিয়ে আনার প্রয়াস নিয়েছিলেন।

‘চিত্রা’র ‘নগরসংগীত’ কবিতায় কবি পল্লীজীবন ও শহরজীবনের পার্থক্যকে স্পষ্টতই তুলে ধরেছেন।যদিও কবি বিশেষ মানসিকতার বশবর্তী হয়ে নগর জীবনের দোলায় আত্মাহুতি দিতে চেয়েছেন ক্ষণিকের তরে। তবু কবি-মানসিকতার অভিমুখ নিরুপণে অসুবিধা ঘটে না। নাগরিক জীবনাচরণের বর্ণনা দিয়ে কবি জানিয়েছেন–

“ওই রে নগরী–জনতারণ্য
শত রাজপথ গৃহ অগণ্য,
কতই বিপণি,কতই পণ্য
কত কোলাহল কাকলি।

কত-না অর্থ কত অনর্থ
আবিল করিছে স্বর্গমর্ত,
তপনতপ্ত ধূলি-আবর্ত
উঠিছে শূন্য আকুলি।...........

করুণ রোদন কঠিন হাস্য,
প্রভূতদম্ভ বিনীত দাস্য,
ব্যাকুল প্রয়াস,নিঠুর ভাষ্য,
চলিছে কাতারে কাতারে।”

নাগরিক জীবনে অর্থের কিংবা বস্তুসম্পদের প্রাচুর্যই যে জীবনের অনেক অনর্থের মূল সেকথা অনস্বীকার্য।এই বস্তুসম্পদের চাপে প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি তিরোহিত হয়। জীবনের নিষ্ঠুরতা যান্ত্রিকতায় প্রাণের সব রস এখানে শুকিয়ে আসে। ধূলিমলিন এ পরিবেশ প্রাণের কিংবা জীবনের ক্ষেত্রে অনুকূল নয়—

"নরনারী সবে আনিয়া তূর্ণ

প্রাণের পাত্র করিয়া চূর্ণ

বহ্নির মুখে দিতেছে পূর্ণ

জীবন-আহুতি ঢালিয়া।

চারিদিকে ঘিরি যতেক ভক্ত

স্বর্ণবরণমরণাসক্ত

দিতেছে অস্থি, দিতেছে রক্ত,

সকল শক্তি সাধনা।"[৪৯]

পল্লীর শান্তিসমাহিত উদার নিসর্গ প্রতিবেশে সত্তার আনন্দময় অভিপ্রকাশের দিকেই তাই কবির অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। নাগরিক পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক হতে বলেছেন। নিছক লোভরিপুর বশবর্তী হয়ে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত নাগরিক প্রাণ প্রকৃতি-পরিবেশের যে বিনাশ ডেকে আনছে তাতে মানুষের সত্তার শান্তিময় আনন্দময় পূর্ব-অবস্থানটুকু নষ্ট হচ্ছে। একারণেই নাগরিক কোলাহল ও জটিলতার বাইরে পল্লীজীবনকে তাঁর অধিকাংশ সময়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন কবি। 'চিত্রা'র 'নগরসংগীত' কবিতায় কবি তাই বিশেষ অভীপ্সাকে ব্যক্ত করে বলেছেন—

"কোথা গেল সেই মহান্ শান্ত

নব নির্মল শ্যামল কান্ত

উজ্জ্বল নীল বসনপ্রান্ত

সুন্দর শুভ ধরণী।

আকাশ আলোকপুলকপুঞ্জ,

ছায়া সুশীতল নিভৃত কুঞ্জ,

কোথা সে গভীর ভ্রমরভঞ্জ,

কোথা নিয়ে এল তরণী।"

'চৈতালী'র 'সভ্যতার প্রতি' কবিতায়ও কবি গ্রাম ও নগরের পার্থক্য দূরীকরণের কথা বলেছেন। নিছক যন্ত্র সভ্যতার আনন্দহীন বস্তুসম্পদের বিকাশ চাননি। তপোবনের সেই পুণ্যছায়াময় আত্মবিকাশের আনন্দময় পরিবেশটুকুই কামনা করেছেন। জানিয়েছেন—

" দাও ফিরে সে অরণ্য ,লও এ নগর,

লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর

হে নবসভ্যতা!"....................

.................পাষাণপিঞ্জরে তব

নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব—

চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,

বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,

পরানে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন

অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।"

এই আকাঙ্খার মধ্যেই কিন্তু নিহিত রয়েছে ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা, চেতনার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা—যা রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনারও অন্যতম দিগদর্শন ছিল। ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে বিশ্বচেতনাকে সমীকৃত করার জন্য যে উদার পরিবেশের প্রয়োজন, যে আসক্তিমুক্ত মনের প্রয়োজন তা পল্লীপ্রকৃতির মতো অনাবিল পরিবেশেই সম্ভব বলে কবি মনে করেছেন। কবিতাটি তারই প্রতিভাস বহন করে।

গ্রাম ও নগরের বৈপরীত্যময় ছবি আছে 'পূরবী'র 'মাটির ডাক' কবিতায়। এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে কবি নিজের মানস-অভীপ্সার অভিমুখটিকে এখানেও চিহ্নিত করে দিয়েছেন। পল্লীর স্বাস্থ্য, ঐক্য, পরিবেশ কবির প্রাণের সামগ্রী ছিল। পাশাপাশি নাগরিক সমাজে আবদ্ধ জীবনের যান্ত্রিকতা, পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত জীবনাচরণের বাইরে জীবনকে মুক্ত রূপে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। গ্রাম ও শহরের সমন্বয় চেয়েছিলেন, ধনের সুষম বন্টন চেয়েছিলেন, প্রকৃতি ও জীবনের নিবিড় সংযোগ রক্ষায় উদ্যোগী হয়েছিলেন—

"আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন; ....
হেথা হতে গেলেম দূরে
কোথা যে ইঁটকাঠের পুরে
বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে;
তৃপ্তি যে নাই কেবল নেশা
ঠেলাঠেলি , নাই তো মেশা,
আবর্জনা জমে উপার্জনে।
যন্ত্র-জাঁতায় পরান কাঁদায়,
ফিরি ধনের গোলক-ধাঁধায়,
শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে;
পথ বেড়ে যায় ঘুরে ঘুরে,
লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে,
কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।"

গ্রাম ও নগরের পার্থক্য দূরীকরণের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বীথিকা'র 'কলুষিত' কবিতায়—

"শ্যামল পাণের উৎস হতে
অবারিত পুণ্যস্রোতে
ধৌত হয় এ বিশ্ব ধরণী
দিবসরজনী।

হে নগরী ,আপনারে বঞ্চিত করেছ সেই স্নানে,

রচিয়াছ আবরণ কঠিন পাষাণে।

আছ নিত্য মলিন অশুচি,

তোমার ললাট হতে গেছে ঘুঁচি

প্রকৃতির স্বহস্তের লিখা

আশীর্বাদটিকা।

ঊষা দিব্যদীপ্তিহারা

তোমার দিগন্তে এসে ।রজনীর তারা

তোমার আকাশদুষ্ট জাতিচ্যুত, নষ্ট মন্ত্র তার,

বিক্ষুব্ধ নিদ্রার

আলোড়নে ধ্যান তার অস্বচ্ছ আবিল,

হারালো সে মিল

পূজাগন্ধী নন্দনের পারিজাত-সাথে

শান্তিহীন রাতে।”

এই অমিল গড়ে তুললো জীবনের ক্লিন্ন যান্ত্রিকতা, মুখ ও মুখোশের দ্বৈততা, জীবনের হিংস্রতা আর জটিলতা। মানবসভ্যতার পাশাপাশি মানব চরিত্রের মধ্যেকার সহজ সরলতা নষ্ট হল। জীবনের কৃত্রিম যান্ত্রিকতা জাগিয়ে দিল মানুষের ভিতরকার বীভৎস পশুসত্তাকে—

“হেথা সুন্দরের কোলে

স্বর্গের বীণার সুর ভ্রষ্ট হল বলে

উদ্ধত হয়েছে ঊর্ধ্বে বীভৎসের কোলাহল,

কৃত্রিমের কারাগারে বন্দীদল

গর্বভরে

শৃঙ্খলেরে পূজা করে।

দ্বেষ ঈর্ষা কুৎসার কলুষে

আলোহীন অন্তরের গুহাতলে হেথা রাখে পুষে

ইতরের অহঙ্কার—

গোপন দংশন তার;

অশ্লীল তাহার ক্লিন্ন ভাষা

সৌজন্যসংযমনাশা।”[৫০]

এর তুলুনায় পল্লীর মুক্ত আরণ্যক জীবনাদর্শও যে কবির কাছে অনেক শ্রেয় ,তার অকৃত্রিম সরলতাকে নাগরিক জীবন-মানের বিকল্প হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন—যা তাঁর পল্লীউন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোত ছিল—

“এর চেয়ে আরণ্যক তীব্র হিংসা সেও

শতগুণে শ্রেয়।

ছদ্মবেশ-অপগত

শক্তির সরল তেজে সমুদ্যত দাবাগ্নির মতো

প্রচন্ড নির্ঘোষ;

নির্মল তাহার রোষ,

তার নির্দয়তা

বীরত্বের মাহাত্ম্যের উন্নতা।

প্রাণশক্তি তার মাঝে

অক্ষুন্ন বিরাজে।”[৫১]

পল্লীর এক বিশেষ শ্রেণীর সুবিধাবাদী ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের শোষণ পীড়নেই যে পল্লীর বৃহৎসংখ্যক মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী সেকথা অস্বীকারের উপায় নেই।

নগরজীবনে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ পল্লীর মানুষকে যতই সেদিক পানে টানুন না কেন পল্লীর স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিনষ্টিই যে এর প্রধান কারণ ছিল সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শোষণ আর পীড়নের ফলে পল্লীর মানুষ কীভাবে মফঃস্বলের চটকলে কাজ নিতে বাধ্য হয় শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে তার দৃষ্টান্ত আছে। সেখানে জীবনের যে অসুরক্ষা আর বিবিক্তুতা, তার ইঙ্গিত দিতে ভোলেননি অমর কথাসাহিত্যিক। 'ছড়ার ছবি'র 'মাধো' কবিতায়ও দেখি অনুরূপ ছবি। রায়বাহাদুর ও তার লোকজনের অপমান আর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতেই মাধোকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। কাজ নিতে হয় বাংলাদেশের পাটের কলে। কিন্তু পাটের বাজার যখন পড়ে এল তখন কারখানার মজুরদের মাইনে কমিয়ে দিল সাহেবরা। তখন শ্রমিকরা ধর্মকলের ডাক দিল। সাহেব যদিও মাধোকে দলের সঙ্গে যোগ না দিয়ে থেকে যেতে বলেন কিন্তু বেইমানি করে আত্মসম্মান বিক্রয়ের বিনিময়ে সে থাকতে পারলো না। কাজ ছাড়তে বাধ্য হল। ততদিনে কেটে গেছে তার জীবনের বিশ-পঁচিশ বছর। অবশেষে বাধ্য হয়েই ফিরতে হল গ্রামে। কিন্তু তখন সেখানে ঘটে গেছে অনেক বদল—

"মা মরেছে, বাপ মরেছে, বাঁধন গেছে ঘুচে।

পথে বাহির হল ওরা ভরসা বুকে আঁটি,

ছেঁড়া শিকড় পাবে কি আর পুরনো তার মাটি।"

'সহজপাঠ' দ্বিতীয় ভাগের সপ্তম পাঠে পল্লীর মানুষের নগরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক নির্ভরতার ছবি ফুটে উঠেছে—

"আমি-যে রোজ সকাল হ'লে

যাই শহরের দিকে চ'লে

তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চ'ড়ে,

সকাল থেকে সারা দুপুর

ইঁট সাজিয়ে ইঁটের উপর

খেয়ালমত দেওয়াল তুলি গ'ড়ে।

সমস্ত দিন ছাতপিটুনী

গান গেয়ে ছাত পিটোয় শুনি,

অনেক নীচে চলছে গাড়ি ঘোড়া।

বাসনওয়ালা থালা বাজায়,

সুর ক'রে ওই হাঁক দিয়ে যায়

আতাওয়ালা নিয়ে ফলের ঝোড়া,

সাড়ে চারটে বেজে ওঠে,

ছেলেরা সব বাসায় ছোটে

হোহো ক'রে উড়িয়ে দিয়ে ধুলো,-

রোদ্দুর যেই আসে প'ড়ে

পুবের মুখে কোথা ওড়ে

দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো।

আমি তখন দিনের শেষে

ভারা থেকে নেমে এসে

আবার ফিরে আসি আপন গাঁয়ে,

জানো না কি আমার পাড়া

যেখানে অই খুঁটি-গাড়া

পুকুরপাড়ে গাজনতলার বাঁয়ে।"

ছিন্নমূল মানুষের এ সমস্যা আরো গভীর ও ব্যাপক। পল্লীর স্বয়ংপূর্ণতার জন্য তাই রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের শহরমুখী অনির্দিষ্ট জীবনের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। পল্লীবাসী স্বদেশের মাটিতেই যাতে স্বনির্ভরশীল হতে পারে তার জন্য নানা পরিকল্পনা করেছিলেন, গ্রাম ও শহরের বিভেদকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন।

চ. রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ :

'চিত্রা'য় কবির মন সৌন্দর্যের রসকুঞ্জ ছেড়ে বাস্তবের মাটিতে নেমে আসতে চেয়েছে। 'চিত্রা' যদিও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য অনুধ্যানের কাব্য তবু এ কাব্যের মর্ত্যমুখীনতার সুরটি বেশ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যের ভূমিকা অংশে জানিয়েছেন—"লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছে।আমার কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা করে দেখলে হয়তো তারা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন।"রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা'য় 'লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণী' প্রাঞ্জল কাব্যরূপ লাভ করেছে। এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ-পতিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছেন। পল্লীজীবনকে নিতান্ত কাছ থেকে দেখেছেন এবং পল্লীজীবনের নানা টুকরো চিত্রের প্রকাশ ঘটেছে এ সময়ের কাব্যে।

নদীকেন্দ্রিক বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে যাতায়াতের পথঘাট যে নিতান্ত কম ছিল তা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলেছি। বর্ষাকালে অধিকাংশ সময় সেই পথগুলি জলের তলায় চলে যেত। ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নৌকাই ছিল প্রধান সহায়। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের অভিজ্ঞতা তারই স্বাক্ষর বহন করে। শিলাইদহ পর্বে রচিত 'নদী' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তারই বর্ণনা দিয়ে জানিয়েছেন—

"তীরে কোথাও বসেছে হাট,
নৌকা ভরিয়া রয়েছে ঘাট।"

হাটে যাতায়াতের জন্য নদীই যে প্রধান অবলম্বন ছিল রবীন্দ্রনাথের জমিদারি দেখাশোনার ক্ষেত্রে প্রায়শই জলপথে যাত্রার দৃশ্যে তার পরিচয় মেলে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই হোক আর মাঠের ফসল বা কৃষিজাত পণ্যের পরিবহনই হোক, উভয়ক্ষেত্রে জলপথই ছিল একমাত্র আশ্রয়। এরই পরিচয় আছে 'ছড়ার ছবি'র 'জলযাত্রা' কবিতায়—

'নৌকা বেঁধে কোথায় গেল,যা ভাই মাঝি ডাকতে,
মহেশগঞ্জে যেতে হবে শীতের বেলা থাকতে।
পাশের গাঁয়ে ব্যবসা করে ভাগ্নে আমার বলাই,
তার আড়তে আসব বেচে খেতের নতুন কলাই। ......
তার পরেতে মেলে যদি পালের যোগ্য হাওয়া

এক পহরে চলে যাব মুখ্‌লুচরের ঘাটে,

যেতে যেতে সন্ধ্যে হবে খড়কে ডাঙার হাটে।"

'সোনার তরী'র নাম-কবিতাতেই ফুটে উঠেছিল অনুরূপ চিত্রকল্প—নৌকায় ধানের আঁটি বয়ে নিয়ে যাবার ছবি। 'ছড়ার ছবি'র 'পদ্মায়' কবিতাতেও দেখি অনুরূপ ছবি—

"পাশ দিয়ে সব নৌকা বড়ো বড়ো

পরদেশিয়া নানা ক্ষেতের ফসল ক'রে জড়ো

পশ্চিমে হাট বাজার হতে, জানি নে তার নাম,

ঝপ ঝপিয়ে দাঁড়ে।

খোরাক কিনতে নামত দাঁড়ি ছায়ানিবিড় পাড়ে।"

নদীর পাড় বা পল্লীর অনুন্নত সঙ্কীর্ণ সীমিত সংখ্যক রাস্তা যে পল্লীর অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক নির্দেশক, এ-কারণেই যে যাতায়াতের জন্য জলপথকে আশ্রয় করা ছাড়া উপায় থাকতো না, তার ছবি আছে 'আরোগ্য'র ৪ সংখ্যক কবিতায়—

"গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে গেছে দূরপানে

নদীর পাড়ির 'পর দিয়ে।

প্রাচীন অশথতলা,

খেয়ার আশায় লোক ব'সে

পাশে রাখি হাটের পসরা।"

এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ পল্লী অঞ্চলে একাধিক বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বাঁধ নির্মাণের দ্বারা পল্লীর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করে তুলে অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়াস নিয়েছিলেন।

ছ. মৎসশিকার ও মাছচাষ :

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। পল্লীর মানুষের নদী-নির্ভরতার ছবি রবীন্দ্রকাব্যে স্পষ্ট। নদীকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থারও টুকরো ছবি ধরা পড়েছে শিলাইদহ পর্বে রচিত 'চিত্রা' কাব্যের—

"………বসি এক বাঁধা নৌকা-'পরি
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি
রৌদ্রে পিঠ দিয়া।"[৫২]

হাতে বোনা জাল দিয়ে মাছধরে পল্লীর জেলে সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা লাভের প্রচেষ্টার ছবি এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবু সে প্রয়াস যে জেলেটিকে বৃদ্ধকালাবধি স্বচ্ছলতার মুখ দেখাতে পারেনি তা কবির বর্ণনায় স্পষ্ট। পল্লীর মানুষের একাংশ যে জেলে জীবনকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল তার ছবি ছড়িয়ে আছে একাধিক কবিতায়। পূর্বোক্ত একাধিক কবিতা তারই পরিচয় বহন করে। ইলিশ মাছ শিকার পদ্মার জেলেদের কাছে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা লাভের একটি বড় আশ্রয় ছিল। বর্ষাকালে ইলিশ মাছের আধিক্য যে পল্লীর জীবনে স্বচ্ছলতার আলাদা মাত্রা নিয়ে আসতো সে কথা পাই 'ছড়ার ছবি'র 'পদ্মায়' কবিতায়—

"পুবে হাওয়ার এল ঋতু, আকাশ জোড়া মেঘ;
ঘরমুখো ঐ নৌকোগুলোয় লাগল অধীর বেগ।
ইলিশ মাছ আর পাকা কাঁঠাল জমল পারের হাটে,
কেনা বেচার ভীড় লাগল নৌকো-বাঁধা ঘাটে।"

'আরোগ্য'র ৪ সংখ্যক কবিতায়ও আছে অনুরূপ মৎসশিকারের ছবি—

"জেলেনৌকা এল ঘাটে,
ঝুড়ি কাঁখে জুটেছে মেছনি;
মাথার উপরে ওড়ে চিল।
মহাজনি নৌকোগুলো ঢালুতটে বাঁধা পাশাপাশি।
মাল্লা বুনিতেছে জাল রৌদ্রে বসি চালের উপরে।"

বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছ চাষের যে উদ্যোগের কথা রবীন্দ্ররচনার অপরাপর ধারায় পাই, কাব্যে তেমন ছবি ধরা পড়েনি। তবে মৎসশিকার এবং তার উপর পল্লীর মানুষের অর্থনৈতিক নির্ভরতার ছবিটি কাব্যে স্পষ্ট।

জ. প্রজাশোষণ ও জমির উপর প্রজার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ভাবনা :

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় পল্লীবাংলার সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বাস্তব ছবিটিকে রূপ দিয়েছেন। জমিদার নিজের জমিকে দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে সমান করার জন্য উপেনের শেষ সম্বল পৈতৃক ভিটেটুকুকে কীভাবে আদালতে মিথ্যে ডিক্রিজারি করে কেড়ে নিয়েছিলেন , তার বাস্তব ছবিটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেদিন একজন দরিদ্র কৃষকের পক্ষে শহরে উপস্থিত হয়ে আদালত কিংবা আইন কানুনের সাহায্যগ্রহণ যে কতটা অসম্ভব ছিল বঙ্কিম তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের 'আইন' শীর্ষক রচনায় জানিয়েছিলেন। কবিতাটির বাস্তব পটভূমি সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ অধিকারী জানিয়েছেন—

" 'দুইবিঘা জমি'র পটভূমিও যে শিলাইদহ পল্লী, এর চরিত্র, ঘটনা সমস্তই যেন এই গ্রামেরই কোন বাস্তব চিত্র, তার প্রধান প্রমাণই উদ্ধৃত পঙ্ক্তি দুটি—

রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে

তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

এই হাটখোলা, নন্দীর গোলা আর মন্দির সেকালের শিলাইদহ গ্রামের। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গ্রামের মধ্যে দিয়ে আসতে হলে যে কোন পথিককেই এই কয়টি স্থান পর পর অতিক্রম করতে হত।

অধিকারী-পরিবারের প্রবল প্রতাপান্বিত মেজ কর্তা গুরুচরণ তাঁদের ভদ্রাসন, পাকাবাড়ি, চন্ডীমণ্ডপ, বৈঠকখানা, ভিন্ন ভিন্ন সরিকের অন্দরমহল, বাগিচার জন্য যে দু-তিনজন গরিব দু-বিঘার মালিককে উচ্ছেদ করলেন, তাঁদের অন্যতম ছিল যদু দত্ত। এই যদু দত্তই রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপেন। জমিদারি সেরেস্তার অতি পুরানো জরিপি কাগজ ইত্যাদিতে এখনো তাদের নাম পাওয়া যাবে।" [৫৩]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে ইংরেজ সরকার জমিদারের স্বার্থ রক্ষায় অধিক তৎপর ছিল। এমতাবস্থায় পক্ষপাতমূলক সে আইনের সাহায্য গ্রহণ করে কৃষকের পক্ষে

লাভবান হওয়া সম্ভবপর ছিল না বললেই চলে। কৃষকদের অশিক্ষা আর অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জমিদার- মহাজনেরা তাদের প্রথমে ঋণের অলজ্ঘ্য জালে বেঁধে ফেলতো। অবশেষে তাকেই হাতিয়ার করে তারা কৃষকের ভিটেমাটি পর্যন্ত আত্মসাৎ করতো। ফলে নিজের জমি বা বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত হয়ে নিরুদ্দেশ জীবনকে বেছে নেওয়া ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর থাকতো না। এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ উপেনের জীবন-পরিণাম অবলম্বনে তারই বাস্তব ছবিটিকে তুলে ধরেছেন—

“শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, ‘বুঝেছ উপেন,এ জমি লইব কিনে।’
কহিলাম আমি, ‘তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখ মোর আছে বড়ো জোর মরিবার মতো ঠাঁই।’
শুনি রাজা কহে, ‘বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে।’ কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, ‘করুণ রক্ষে গরিবের ভিটেখানি। ......’
পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি,সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি—
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।”

জমিদারের তুলনায় জমিদারের পারিষদ কিংবা অধঃস্তন কর্মচারীদের অত্যাচার বা বিরূপতা যে অধিক ছিল তা এ কবিতার মালী কিংবা জমিদারের পারিষদ বর্গের আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ জমির উপর প্রজা বা কৃষকের স্থায়ী স্বত্ত্বের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। কিন্তু সেকাজে এগিয়েও রবীন্দ্রনাথ কেন পিছিয়ে এসেছিলেন তা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই জানিয়েছি।

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বা শোষণভিত্তিক শ্রেণীসমাজের মনুষ্যত্বভ্রষ্ট স্বরূপটিকে রবীন্দ্রনাথ তীব্র ভাষায় ভাষায় আক্রমণ করে তাঁর মানস-অভিমুখটিকে নির্দিষ্ট করেছেন 'নবজাতকে'র 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতায়—

"ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভুরিভোজীদের
নিদারুন সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।"

রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবের বিরোধী ছিলেন এমনটা ঠিক বলা যায় না। তাই সভ্যতার এই অপহ্নব, এই শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের আত্মিক জাগরণ বা বৈপ্লবিক উত্থানকেই প্রার্থনা করেছেন যেমনটা তাঁর 'মুক্তধারা'র মত নাটকগুলিতে প্রত্যক্ষ করা যায়—

" প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে-দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করেছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুলবীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে

দুর্বলতার রাশি,

লাগুক তাহাতে আগুন লাগুক

ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।”

এ কবিতায় কবি যে ‘বিপুলবীর্য শান্তি’র কথা বলেছেন, তার জাগরণ ঘটবে যে উপায়ে, সে তো আত্মশক্তিতে বলীয়ান শোষিত মানুষের বৈপ্লবিক উত্থানের পথেই—

“ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত

পূর্ণ করিয়া শেষে

নূতন জীবন নূতন আলোকে

জাগিবে নূতন দেশে।”

রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ বা শোষণের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী মানসিকতার ছবি পাই তারই প্রতিরূপ অঙ্কিত হয়েছে ‘সেঁজুতি’ কাব্যের ‘জন্মদিন’ কবিতায়। কবি জানিয়েছেন—

“.........শুনি তাই আজি

মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।

তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে

পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,

সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে

ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে

তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, ‘এ প্রহসনের

মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,

নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি

দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।’

বলে যাব, ‘দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়

গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।' ”

ঝ. জাতপাত ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ :

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর উন্নয়ন কর্মে নিয়োজিত হয়ে দেখেছিলেন পল্লীর মানুষ জাত-পাত, অস্পৃশ্যতার ঘেরাটোপে এমনি আবদ্ধ যে, তাদের ঐক্যবদ্ধ করে সমৃদ্ধ পল্লী গঠন করা এক অর্থে অসম্ভব প্রায়। পল্লীর মানুষ আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে যে পল্লীর যথার্থ উন্নয়ন সম্ভব নয়, সেকথা রবীন্দ্রনাথ নানা স্থলে বলেছেন। তাই পল্লীর মানুষকে এই জাত-পাত অস্পৃশ্যতার কূপমন্ডূকতা থেকে মুক্ত করে তুলতে চেতনাসংস্কারের প্রয়াস নেন। ধর্মীয়, জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে নয়, মানুষের প্রকৃত পরিচয় যে তার আত্মঅভিজ্ঞানে, মনুষ্যত্বের পরিচয়ে—এই বোধে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি।

এরই ফলশ্রুতি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা'র 'ব্রাহ্মণ' কবিতা। এ কবিতার বড়ো আবেদন নিহিত আছে কুসংস্কার বর্জিত উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। গুরু গৌতম ব্রাহ্মণপুত্র ছাড়া অন্য কাউকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করতেন না। কিন্তু এই গৌতমের কাছে একদা এক বালক এসে উপস্থিত হয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য। গুরু তাকে তার পিতৃপরিচয় জানাতে বলেন। বালকের পিতৃপরিচয় না জানা থাকার কারণে পরের দিন মায়ের কাছ থেকে জেনে এসে জানাবে বলে বিদায় নেয়। পরদিন প্রাতঃকালে গুরু গৌতমকে বালকটি এসে অকপট সত্যবচনে জানায়—

“পুছিলাম

জননীরে, কহিলেন তিনি, সত্যকাম,

বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,

জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জাবালার ক্রোড়ে—

গোত্র তব নাহি জানি।”

বালকের এই কথায় আশ্রমের অন্যান্য বালকেরা যখন ব্যঙ্গ বা ধিক্কারে সরব ঠিক সেই মুহূর্তে গুরু গৌতম আসন ছেড়ে উঠে বালকটিকে নিজ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। বলেন—

“...... 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত।

তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।”

ঋষিগৌতমের এই বাচনিকতায় প্রকট হয়ে উঠেছে ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা মনুষ্যত্বের গৌরবময় দিকটি। বালকের সত্যবচনের অকপট সরলতায় মনুষ্যত্বের সেই অটল গৌরবকেই গুরু গৌতম প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর পল্লী উন্নয়ন ভাবনায় অনুরূপভাবে জাত-পাত-অস্পৃশ্যতাকে পাশ কাটিয়ে এক পরিপূর্ণ মানববিশ্ব গড়তে চেয়েছিলেন।

মানব সেবাই যে ঈশ্বরকে পাবার সবচেয়ে মহত্ত্বর পন্থা সেকথা বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথেরও মূল বক্তব্য ছিল।'চৈতালী' কাব্যের 'দেবতার বিদায়' কবিতায় অনুরূপ প্রতিচ্ছবিকেই ফুটে উঠতে দেখা যায়।মন্দিরের এক প্রবীণ ভক্ত রোগশোকে জীর্ণ, বস্ত্রহীন এক দীন ব্যক্তিকে আশ্রয় না দিয়ে বিতাড়িত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই জীর্ণ ব্যক্তিটি দেবতার স্বরূপ ধরে জানিয়ে দেন , তিনি মন্দির ছেড়ে যাচ্ছেন। কেননা—

" "জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে,

গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে" "

এই সংস্কারমুক্ত মানবিক বোধই রবীন্দ্রনাথকে মানবসেবায় নিয়োজিত করেছিল এবং পল্লীর মানুষের মনে এই বোধেরই সঞ্চার ঘটাতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে মানব-দেবতার ধারণাটি গড়ে ওঠার পিছনে অনুরূপ বোধই ক্রিয়াশীল থেকেছে।

রবীন্দ্রনাথ কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসের স্থাণুত্বকে এড়িয়ে এক প্রগতিশীল সমাজ গড়ার কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। 'চৈতালি'র 'দুই উপমা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই কুসংস্কারের জড়তার বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিমত জ্ঞাপন করেছেন—

"যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে

সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে;

যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়

পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।"

পল্লীর মানুষের এই জীর্ণ লোকাচার, অন্ধবিশ্বাসের ভয়ানক পরিণামকে চিত্রিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'কথা'র 'দেবতার গ্রাস' কবিতায়। গ্রামের সম্ভ্রান্ত মৈত্র মহাশয় গঙ্গাসাগরে তীর্থস্নান করতে যাবেন। সেকথা রাষ্ট্র হবার পর অনেক 'বালবৃদ্ধ নরনারী' সঙ্গী হিসেবে জুটে গেল। বিধবা যুবতী মোক্ষদার কাতর অনুনয়কেও মৈত্র মহাশয় ঠেলতে পারলেন না।

সন্তান রাখাল ছোট থেকেই মাসির কাছে মানুষ। তার কাছে তাকে রেখে যাবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত মৈত্র মহাশয় রাজী হন। কিন্তু তাঁর যাত্রাকালে দেখা গেল সন্তান রাখাল পূর্ব থেকে নৌকায় উঠে গঙ্গাসাগরে যাবার জন্য প্রস্তুত। কিছুতেই তাকে নিবারণ করতে না পারায় অগত্যা মৈত্রমহাশয় তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু মোক্ষদা রেগে গিয়ে বলে ওঠে –"চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।' এমন কথা উচ্চারণ করার জন্য অবশ্য মৈত্র মহাশয় মোক্ষদাকে গোপনে তিরস্কার করেন।

কিন্তু স্নান যাত্রা সেরে ফেরার পথে নৌকা উত্তুরে বাতাসের প্রবল বিক্ষোভে বেসামাল হয়ে উঠল। সমুদ্রের তরঙ্গরাশি শীতের বাতাসের সঙ্গে মিশে উদ্ধত বিদ্রোহে যাত্রীগণের প্রাণ কেড়ে নিতে প্রস্তুত যেন। এমতাবস্থায় নৌকার মাঝি সকলকে ডেকে বলে—

" 'বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ

যা মেনেছে দেয় নাই,তাই এত ঢেউ,

অসময়ে এ তুফান! শুন এই বেলা,

করহ মানত রক্ষা; করিয়ো না খেলা

ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।'"

পল্লীর মানুষ অন্ধবিশ্বাস বশতঃ নিজেদের যা কিছু অর্থ-বস্ত্র সব কিছু জলে ফেলে দেয়। তাতেও যখন সমুদ্র শান্ত হল না তখন মৈত্র মহাশয় সহসা মোক্ষদাকে দেখিয়ে বলেন—

" 'এই সে রমণী

দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে

চুরি করে নিয়ে যায়।'"

নৌকার সন্ত্রস্ত যাত্রীরা তখন প্রাণের তাগিদে অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে ছেলেটিকেই জলে ফেলে দেওয়ার জন্য গর্জে ওঠে। মোক্ষদা তার সন্তানকে রক্ষা করার জন্য মৈত্র মহাশয়ের চরণ জড়িয়ে ধরলেও মৈত্র মহাশয় জানান—

" 'মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,

শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে!

শোধ্ দেবতার ঋণ;সত্য ভঙ্গ করে

এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে!'"

মোক্ষদার মাতৃহৃদয় এই যুক্তিকে কিছুতেই মানতে পারে না। এ যে জননীর অন্তরের কথা নয়, অন্তর্যামী দেবতা তা ভালভাবেই জানেন বলে তার বিশ্বাস। কিন্তু সম্মিলিত জনতার অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কার দেবতার চেয়েও শক্তিশালী হয়ে কতবড় হানি ঘটাতে পারে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন কবিতাটির ট্র্যাজিক পরিণাম রচনার মধ্য দিয়ে—রাখালকে সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়ার মর্মান্তিক চিত্র অঙ্কনে।

পল্লীর এই কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস জীবনে কী অপহ্নব ঘটায় তার ব্যাঙ্গাত্মক ছবি এঁকেছেন কবি 'কথা'র 'বিসর্জন' কবিতায়। পর পর দুটি ছেলের মৃত্যুর পর যখন মল্লিকার তৃতীয় পুত্র জন্মাল তখন তার স্বামীরও মৃত্যু ঘটলো। গ্রামের লোকেরা জানালো এ তার পূর্ব-জনমের পাপের ফলভোগ মাত্র। তাই মল্লিকা তার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এর পর নিজেকে যে সকল রীতি-আচারের মধ্যে সঁপে দেয়, তা গ্রামীণ মানুষের অন্ধবিশ্বাসের একটি ছবিকে তুলে ধরে—

"..............মন্দিরে মন্দিরে

যেথা সেথা গ্রামে গ্রামে পূজা দিয়া ফিরে,

ব্রত ধ্যান উপবাসে আহ্নিকে তর্পণে

কাটে দিন, ধূপে দীপে নৈবেদ্যে চন্দনে

পূজাগৃহে; কেশে বেঁধে রাখিল মাদুলি

কুড়াইয়া শত ব্রাহ্মণের পদধূলি;

শুনে রামায়ণ-কথা; সন্ন্যাসী সাধুরে

ঘরে আনি আশীর্বাদ করায় শিশুরে।

বিশ্বমাঝে আপনারে রাখি সর্বনীচে

সবার প্রসন্নদৃষ্টি অভাগী মাগিছে

আপন সন্তান লাগি।"

কিন্তু এত কিছুর পরেও মল্লিকা তার ছেলেকে অশুভ শক্তির প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে পারলো না। দেড় বছর বয়সে তার ছেলের যকৃতের বিকার ঘটলো। তখন ব্রাহ্মণের অজুহাত দাঁড়ালো, কলিকালে ভক্তির নিতান্ত অভাবই এর মূল কারণ| তাঁর কাছ থেকে প্রকৃত ভক্তি ও নিষ্ঠার এক কাহিনী শোনে মল্লিকা। এক বন্ধ্যা নারী তাঁর প্রথম গর্ভের সন্তান গঙ্গার কাছে মানত করে। কিন্তু পুত্র-জন্মের পর অভাগী তার স্বামীকে হারায়। ছেলেকে নিয়ে গঙ্গার কাছে গিয়ে তাকে সমুদ্রে সঁপে দিতে চেয়ে জলে ফেলে দিলে মাতা ভাগীরিথী তার নিষ্ঠায় প্রসন্ন হয়ে মকরবাহিনী রূপ ধরে শিশুটিকে পুনরায় মায়ের কোলে সমর্পণ করেন। এই কাহিনী ব্রাহ্মণটি নাকি তাঁর মায়ের কাছ থেকে শুনেছিলেন মাত্র। এই অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মল্লিকাও অবশেষে তার অসুস্থ শিশুটিকে সুস্থ করে দেবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে গৃহের অদূরবর্তী জাহ্নবীর জলে সমর্পণ করে। কিন্তু কাতর মিনতি সত্ত্বেও আর জাহ্নবী তার সন্তানটিকে ফিরিয়ে দেয়নি। অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারের যূপকাষ্ঠে এইভাবে এক অসহায় মানবপ্রাণের মৃত্যু ঘটে। পল্লীপ্রাণ কুসুংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতাকে এভাবেই ব্যঙ্গবিদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথ চেতনার সংস্কার আনতে চেয়েছেন এ কবিতায়।

আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের চেতনার স্বাধীনতা, ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের স্বার্থান্বেষী মানসিকতা, বিভাজন নীতি, ভারতীয়দের প্রতি অশ্রদ্ধেয় মনোভাব, 'নেটিভ' বলে গালিগালাজ এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল। সভ্যতা বিধ্বংসী সংকীর্ণ জাতিপ্রেম, মানবধর্ম বিরোধী বক্সার বিদ্রোহ দমনের নিষ্ঠুরতা ও আফ্রিকার বোয়ার যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা মানুষের সকল অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই উচ্চারণ করেছিলেন—

"স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে

ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়মন্থনক্ষোভে

ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি

পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি

জাতিপ্রেম নামধরি প্রচণ্ড অন্যায়

ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি

শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।”[৫৪]

রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্যতাবিরোধী মানসিকতার পরিচয় আছে ‘পরিশেষে’র ‘জলপাত্র’ কবিতায়—যার অনুসৃতি আছে ‘চণ্ডালিকা’ নৃত্যনাট্যের মধ্যেও। এ কবিতায় এক অস্পৃশ্য নারীর কাছ থেকে ভরা দুপুরে তৃষ্ণার জল চেয়ে খাওয়ায় নারীটি বলেছে—“প্রভু, তুমি পূজনীয়। আমার কী জাত,/ জান তাহা হে জীবননাথ।/ তবুও সবার দ্বার ঠেলে/ কেন এলে / কোন দুখে/ আমার সম্মুখে।” কিন্তু মুক্তমনা প্রভু জানিয়েছেন—

“পুণ্য যথা মৃত্তিকার এই বসুন্ধরা

শ্যামল কান্তিরে ভরা

সেই মতো তুমি

লক্ষ্মীর আসন, তাঁর কমলচরণ আছ চুমি।”

এ মানসিকতাকে মানুষের মধ্যেই জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জাতপাত নির্বিশেষে মানবসমন্বয়ের কথা বলেছিলেন পল্লীর উন্নয়নের স্বার্থে। অনুরূপ মানসিকতা নিয়েই একদা রবীন্দ্রনাথ সিয়ামের জনগনের সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ‘পরিশেষ’ কাব্যের ‘সিয়াম : প্রথম দর্শনে’ কবিতায় কবি তাই বুদ্ধের মানবতাবাদী বাণীর স্বপক্ষে উচ্চারণ রেখেছেন। জাপানের জনসাধারণকে সেই মানবতাবাদী মুক্ত চেতনায় উদবুদ্ধ করতে চেয়ে বলেছেন—

“সে মন্ত্রভারতী

দিল অস্খলিত গতি

কত শতশতাব্দীর সংসার যাত্রারে—

শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে

এক ধ্রুব কেন্দ্র সাথে

চরম মুক্তির সাধনাতে—

সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে—

এক ধর্ম , এক সংঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে।”

এই সর্বধর্ম সমন্বয়কেই কবি তাঁর পল্লীউন্নয়নের লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু ধর্মের সাম্প্রদায়িক মোহের জালে জড়িয়ে মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির বিকৃতি চাননি, চেয়েছিলেন মানবমুক্তির আলোককে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। চেয়েছিলেন মানবকল্যানের পথে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে—

“ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে

অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।

নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,

ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।

শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,

শাস্ত্রে মানে না,মানে মানুষের ভালো।”[৫৫]

পল্লীর তথা দেশের যে বৃহৎ জনসাধারণ, যাদের শক্তির উপর ভর করে আসবে স্বাধীনতা ও মানবমুক্তি, তাদের মধ্যেই বিভেদ সৃষ্টি করে দেশের তরী যারা বাইতে চায় তাদের পতন বা ভরাডুবি নিশ্চিত বলে কবি জানিয়েছেন। সমকালীন দেশীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ প্রবণতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে মানব মুক্তির জন্য, এ অভাগা দেশে পল্লীর অশিক্ষিত নিরক্ষর মানুষগুলোর শিক্ষা বা জ্ঞানের আলোক বিতরণের জন্য কবি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। কবিতায় সে-কথারই প্রতিফলন স্পষ্ট—

“যে দেবে মুক্তি তারে খুঁটিরূপে গাড়া,

যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া,

যে আনিবে প্রেম অমৃত-উৎস হতে

তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে,

তরী ফুটা করি পার হতে গিয়ে ডোবে,

তবু এরা কারে অপবাদ দেয় ক্ষোভে।......

যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে

ভাঙো ভাঙো ,আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,

ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,

এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।”[৫৬]

'পুনশ্চে'র 'শুচি' কবিতায়ও কবি অস্পৃশ্যতাবিরোধী মনোভাবকেই তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। তাই পুরোহিত রামানন্দ কর্তৃক মন্দির থেকে অস্পৃশ্য মানুষেরা বিতাড়িত হওয়ায় দেবতা ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাঁরই দ্বারা মার্গদর্শন ঘটায় অবশেষে পুরোহিত নাভা চণ্ডাল এবং কবির জোলাকে আপন ভাই হিসেবে বুকে টেনে নিয়েছেন, মানব-দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন—

“রামানন্দ বললেন, 'আমার ঠাকুরকে এতদিন

যেখানে হারিয়েছিলুম

আজ তাকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে।'

'পুনশ্চে'র 'মুক্তি' কবিতায়ও দেখি মন্দিরের সঙ্কীর্ণ আচার থেকে মুক্তি নিয়ে ,সাধারণ মানুষের মাঝে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে, তাদের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করে, ঈশ্বরের বিরাট প্রেমের ক্ষেত্রে নিজেকে সমীকৃত করেছেন পেশোয়া বাজীরাও। সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় আচার থেকে মুক্তি নিয়ে বৃহত্তর মানব কল্যাণের পথই যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির সর্বোত্তম পন্থা সে কথা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। 'প্রেমের সোনা' কবিতায় এই মানব-প্রেমের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। 'স্নান সমাপন' কবিতায়ও দেখি অন্ত্যজ ভাজন মুচির পাড়াকে দূরে রেখে স্নানে যাওয়ায় গুরু রামানন্দ ঈশ্বরবোধে তলাতে পারলেন না। তাকে বুকে টেনে নিয়েই অবশেষে ঈশ্বরবোধে উপনীত হতে পারলেন। ভাজন মুচিকে তাই তিনি জানিয়েছেন—

“ 'স্নানে গেলেম তোমার পাড়া দূরে রেখে,

তাই যিনি সবাইকে দেন ধৌত করে

তার সঙ্গে মনের মিল হল না।

এতক্ষণে তোমার দেহে আমার দেহে

বইল সেই বিশ্বপাবন ধারা। ......

এতক্ষণে মিলল তাঁর দর্শন

তোমার ললাটে আর আমার ললাটে—

মন্দিরে আর হবে না যেতে।' ”

'পুনশ্চে'র 'প্রথম পূজা' কবিতায়ও দেখি অন্ত্যজ কিরাতরা সমাজে অস্পৃশ্য। তাই—'কিরাত থাকে সমাজের বাইরে'। তাদের মন্দিরে প্রবেশে রাজা বিধিনিষেধ আরোপ করলেও দেবতা কিন্তু কিরাত দলপতির কাছ থেকেই তাঁর ভক্তিবিনম্র পূজা গ্রহণ করেছেন। কেননা এই সামাজিক বিভেদ, অস্পৃশ্যতা ঈশ্বরের কাছে কখনোই কাম্য নয়। 'শিশুতীর্থ' কবিতায়ও অনুরূপভাবে জাত-পাত, অস্পৃশ্যতার ঊর্ধ্বে মানবতাবাদের গ্রহণীয়তার দিকটিকে একটি দীর্ঘ আখ্যানের মধ্যস্থতায় তুলে ধরেছেন কবি। রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন ভাবনায়ও এই জাত-পাত অস্পৃশ্যতার ঊর্ধ্বে উঠে, মানবতাবাদী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ দেশ সংগঠনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচেতনার বাইরে আচরণীয় এই উদার মানব ধর্মের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পত্রপুটে'র পনেরো সংখ্যক কবিতায়—

“ওরা অন্ত্যজ ,ওরা মন্ত্রবর্জিত।

দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে

পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে। ....

কবি আমি ওদের দলে—

আমি ব্রাত্য,আমি মন্ত্রহীন,

দেবতার বন্দীশালায়

আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।

পূজারী হাসিমুখে মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসে,

আমাকে শুধায়, “দেখে এলে তোমার দেবতাকে?”

আমি বলি, ‘না।’

অবাক হয় শুনে;বলে, “জানা নেই পথ?”

আমি বলি, ‘না।’

প্রশ্ন করে, “কোনো জাত নেই বুঝি তোমার?”

আমি বলি, ‘না।’”

রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই একটাই জাতি—যার নাম মানবজাতি। একটাই ধর্ম—যার নাম মানবধর্ম। এই বোধে মানুষকে উদবুদ্ধ করে ঐক্যবদ্ধ গ্রাম সংগঠনের পরিকল্পনা নিয়েছেন তিনি। এক আদর্শ সাম্যবাদী মানববিশ্ব গড়ে তোলার আদর্শ প্রতিষ্ঠাই যে তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

ঞ. কৃষি :

গ্রামীণ অর্থনীতির একটি বড় ভিত্তি হল কৃষিকাজ। রবীন্দ্রকাব্যে কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ অর্থনীতির ছবিও ধরা পড়েছে। আষাঢ় মাসে নবীন বর্ষার আগমনে পল্লীঅঞ্চলে কৃষকের কাজের চাপ অনেক বেড়ে যায়। ‘আষাঢ়’ কবিতায় কৃষক গৃহিণীর ত্রস্ত উদ্বেগের মধ্যে এর প্রকাশ আছে—

“বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর

আউশের ক্ষেত জলে ভর- ভর,

কালিমাখা মেঘে ও পারে আঁধার

ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে।

ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।

ওই ডাকে শোন ধেনু ঘন ঘন,

ধবলীরে আনো গোহালে।

এখনি আঁধার হবে,বেলাটুকু পোহালে।

দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি

মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি?”

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—“বর্ষার আগমনে বাঙ্লার চাষীর কাজের চাপ আর সৌন্দর্যের হাতছানি এই দুই-এ মেশামেশি একটি যথার্থ মানস ছবি ত্রস্ত উৎকণ্ঠার ছন্দে দ্রুত বর্ণসম্পাত ও রেখাবিন্যাসে উজ্জ্বল হইয়াছে।”[৫৭] সেইসঙ্গে পল্লীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে একটি বড় দিকের উপর রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন সেই গোপালন ব্যবস্থার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য কবিতায়।

কৃষিই ছিল পল্লীর প্রধান জীবিকা নির্বাহের উপায়স্বরূপ। নানাপ্রকার শস্যের পাশপাশি আখের চাষ, আম-কাঁঠাল-কলা ইত্যাদি ফলের চাষের পরিচয় রবীন্দ্রকাব্যে স্পষ্ট। বাঁশ ও বেতের চাষ পল্লীর অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার একটি বড় অবলম্বন ছিল—

“কোথাও ধারে ধারে ওঠে বেত,

কোথাও দুধারে গমের ক্ষেত।.......।।

মাঠে কলাই সরিষা ধান,

তাহার কে করিবে পরিমাণ।

কোথাও নিবিড় আখের বনে

শালিক চরিছে আপন মনে। ......

কোথাও ধানের ক্ষেতের ধারে

ঘন কলাবন বাঁশঝাড়ে

ঘন আম কাঁঠালের বনে

গ্রাম দেখা যায় এক কোণে।”[৫৮]

'পুনশ্চ' রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে তাঁর পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তারই ছবি ধরা পড়েছে রবীন্দ্রকাব্যে। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের রুক্ষভূমি ছিল কৃষির পক্ষে প্রতিকূল। জমির শক্ত মাটিতে কৃষিকাজ করা ছিল খুবই কঠিন। কেননা সেচের সুবন্দোবস্ত তেমন ছিল না। জলাশয়গুলির জলকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু রবিশস্যের চাষের বন্দোবস্ত করা হয়। 'কোপাই' কবিতায় কবি তাই বলেছেন—'পুকুরের ধারে সর্ষেখেত'। 'আরোগ্য' কাব্যের ৩ সংখ্যক কবিতায়ও কবি জানিয়েছেন—

"পুকুরের ধারে ধারে সর্ষেক্ষেতে পূর্ণ হয়ে যায়

ধরণীর প্রতিদান রৌদ্রের দানের,

সূর্যের মন্দিরতলে পুষ্পের নৈবেদ্য থাকে পাতা।"

'কোপাই' কবিতাতেই আছে কৃষিকাজের একটি বিষেশ অঙ্গ হিসেবে ধান চাষের ছবি। ধান কাটার পর জমির মধ্যেই ধান ঝাড়ানোর বন্দোবস্ত করা হত। খড়ের আঁটিগুলি বিচালি হিসেবে কিংবা ঘরের ছাউনি হিসেবে ব্যবহৃত হত। গরুর গাড়িতে করে খড়ের আঁটিগুলিকে ঘরে আনা হত। মাটির পাত্র তৈরিও গ্রামীণ অর্থনীতির একটি বড় আশ্রয় ছিল। 'কোপাই' কবিতায় এ সবেরই টুকরো ছবি ধরা আছে—

"পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি

আঁঠি আঁঠি খড় বোঝাই করে;

হাটে যাবে কুমোর

বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে;"

ধান ছাড়াও নানাপ্রকার শাক-সব্জির চাষ পল্লীর মানুষের নিজের চাহিদা মিটিয়ে অর্থনৈতিক সুরক্ষার একটি আশ্রয় হয়ে উঠতো। নানাপ্রকার ফলের চাষ পল্লীর মানুষের অর্থ উপার্জনেরও অন্যতম আশ্রয় ছিল। 'পুনশ্চে'র 'বাসা' কবিতায় তার পরিচয় আছে—

"বাড়ির পিছন দিকটাতে

শাক-শবজির খেত।

বিঘে-দুয়েক জমিতে হয় ধান।

আর আছে আম-কাঁঠালের বাগিচা

আস-শেওড়ার বেড়া দেওয়া।”

ধান, আখ ও আখজাত দ্রব্য, ফল-শাক-সবজির চাষের ছবি পাই ‘শেষ সপ্তকে’র এগারো সংখ্যক কবিতায়—

“হাটের মাঝখানকার পথে

চলেছে গোরুর গাড়ি।

কলসীতে নতুন আঁখের গুড়, চালের বস্তা,

গ্রামের মেয়ে কাঁখের ঝুড়িতে নিয়েছে

কচুশাক, কাঁচা আম, শজনের ডাঁটা।”

পল্লীজীবনে দানাশস্যের চাষ কৃষকের জীবনের যে একটি বড় আর্থনৈতিক বুনিয়াদের ভিত্তি ছিল তার ছবি আছে ‘ছড়ার ছবি’র ‘খাটুলি’ কবিতায়। এক ব্যক্তির সন্তানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—

“দুঃখ অনেক পেয়েছে ও হয়তো ডুবছে দেনায়,

হয়তো ক্ষতি হয়ে গেছে তিসির বেচাকেনায়।”

তিসির কেনাবেচায় লোকসান কৃষকের জীবনে বহুমাত্রিক পরিণামকে সূচিত করতো। পারিবারিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি হয়তো মহাজনের ঋণের জালে তাকে জড়িয়ে পড়তে হত। পল্লীর দানাশস্য চাষের বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘সানাই’ কাব্যের ‘সানাই’ কবিতায়ও বলেছেন—

“হেথা-হোথা পলিমাটি স্তরে

পাড়ির নীচের তলে

ছোলা-ক্ষেত ভরেছে ফসলে।

অরণ্যে নিবিড় গ্রাম নীলিমার নিম্নান্তের পটে;”

দানাশস্য চাষের পাশাপাশি কাঁঠালের চাষ, পাটের চাষ পল্লীর মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার বড় আধার ছিল। এদের উপর ভিত্তি করে পল্লী এলাকায় মহাজনী কারবার সমৃদ্ধি লাভ করে। ‘ছড়ার ছবি’র ‘পদ্মায়’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এরই পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—

“ইলিশমাছ আর পাকা কাঁঠাল জমল পারের হাটে,

কেনাবেচার ভীড় লাগলো নৌকা-বাঁধা ঘাটে।

ডিঙি বেয়ে পাটের আঁঠি আনছে ভারে ভারে,

মহাজনের দাঁড়িপাল্লা উঠল নদীর ধারে।

হাতে পয়সা এল, চাষী ভাবনা নাহি মানে,

কিনে নতুন ছাতা জুতো চলেছে ঘর-পানে।

পরদেশিয়া নৌকাগুলোর এল ফেরার দিন,

নিল ভরে খালি-করা কেরোসিনের টিন।”

‘ছড়ার ছবি’র ‘বুধু’ কবিতায়ও কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতির ছবি আছে। ধু ধু বালির ডাঙার কারণে সাতপুরিয়া নামক গ্রামে কৃষিকাজের তেমন সুবিধা নেই। তাই পল্লীর মানুষেরা নদীর ধারে ধারে পলিমাটি যুক্ত অঞ্চলে কাঁকুড় ও তরমুজের চাষ করে কীভাবে নিজেদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করে চলেন—

“নদীর ধারে খুঁড়ে খুঁড়ে পলিমাটির খুঁজে

গৃহস্থেরা ফসল করে কাঁকুড়ে তরমুজে।”

‘সহজপাঠ’ প্রথম ভাগের তৃতীয় পাঠের মধ্যেও আছে পল্লীর কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক জীবনের ছবি। যাতায়াত ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে জলপথই যে পল্লীর মানুষের প্রধান অবলম্বন ছিল সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এমতাবস্থায় পল্লীর মানুষের কৃষি নির্ভরতার টুকরো উদ্ভাসন রচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“কোথাও বা ধানক্ষেত জলে আধো ডোবা,

তারি ’পরে রোদ পড়ে কিবা তার শোভা।

ডিঙি চড়ে আসে চাষী , কেটে লয় ধান,

বেলা গেলে গাঁয়ে ফেরে গেয়ে সারিগান।”

কৃষীকেন্দ্রিক গ্রামীণ অর্থনীতির আরো ছবি পাই ‘সহজ পাঠে’র প্রথম ভাগের তৃতীয় পাঠে—

“ঢেঁকী পেতে ধান ভানে বুড়ী,

খোলা পেতে ভাজে খই-মুড়ি। ...

আঙিনায় কানাই বলাই

রাশি করে সরিষা কলাই।”

‘সহজ পাঠে’র দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় পাঠে যে হাটের ছবি পাওয়া যায় তাও কিন্তু পরোক্ষে কৃষিজাত দ্রব্য ও তার উপর নির্ভরশীল পল্লীর মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয়টি চকিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—

“ জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে

গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।

উচ্ছে বেগুন পটল মূলো,

বেতের বোনা ধামা কুলো,...

খড়ের আঁটি নৌকা বেয়ে

আনল যত চাষীর মেয়ে।”

এ সবই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পল্লীচিত্র হয়ে ধরা পড়েছে। কিন্তু ছবিগুলি গ্রামীণ অর্থনীতির ছবিটিকেও তুলে ধরেছে স্পষ্ট রেখায়। রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়নের যে পরিকল্পনা গড়ে তোলেন তাতে পল্লীর অর্থনৈতিক ভিত্তির এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাগুলোর উপরেই অধিক গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়াস নিয়েছিলেন। কেননা কৃষি পণ্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদার উপরেই নির্ভর করেই গড়ে ওঠে ভারী শিল্প।

ট. গরু-মহিষ পালন ও দুগ্ধ শিল্প :

পল্লীর অর্থনৈতিক ভিত্তির একটি বড় দিক ছিল গোপালন। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে ব্যাপক উদ্যোগ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। গোরু যে গ্রামীণ অর্থনীতির একটি বড় অবলম্বন ছিল তার স্বাক্ষর রয়েছে 'নদী' গ্রন্থে—

"সেথা গোয়ালেতে গোরু বাঁধা

কত কালো পাটকিলে সাদা। ......

সেথায় বোঝাই গরুর গাড়ি

ধীরে চলিয়াছে ডাক ছাড়ি।"

গোরু পল্লী অঞ্চলে তৎকালে যাতায়াত ও ভার বহনের অত্যন্ত সহায়ক ও প্রয়োজনীয় গৃহপালিত পশু হিসেবে প্রতিপালিত হত। আজো সে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। 'ক্ষণিকা'র 'কৃষ্ণকলি' কবিতায় এই গৃহপালিত পশুর জন্য কৃষক কন্যার ব্যস্তসমস্ত ছবিকে ফুটে উঠতে দেখি—

"ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে

ডাকিতেছিল শ্যামল দুটি গাই,

শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে

কুটীর হতে ত্রস্তে এল তাই।"

গো-জাত নানা দ্রব্যসামগ্রীও যে পল্লীর মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি ছিল তার পরিচয় আছে 'পুনশ্চ' কাব্যের 'বাসা' কবিতায়—

"সকাল বেলা আমার প্রতিবেশিনী

গুন্ গুন্ গাইতে গাইতে মাখন তোলে দই থেকে,"

'বিচিত্রিতা'র 'গোয়ালিনী' কবিতায়ও আছে অনুরূপ ছবি। গোরুর দুধ থেকে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী কীভাবে পল্লীর মানুষের জীবনের প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠেছে তার পরিচয় দিতে গিয়ে কবি জানিয়েছেন—

"হাটেতে চল পথের বাঁকে বাঁকে,

হে গোয়ালিনী, শিশুরে নিয়ে কাঁখে।

হাটের সাথে ঘরের সাথে

বেঁধেছ ডোর আপন হাতে

পুরুষ কল-কোলাহলের ফাঁকে।"

পল্লীজীবনে গোপালন ব্যবসা একটি পরিবারের শুধু নয়, গোটা গ্রামের কর্মসংস্থান বা স্বাচ্ছন্দ্যের বহতা ধারা কীভাবে গড়ে তুলতে পারতো তার ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ 'ছড়ার ছবি'র 'সুধিয়া' কবিতায়—

"গয়লা ছিল শিউনন্দন, বিখ্যাত তার নাম,

গোয়ালাবাড়ি ছিল যেন একটা গোটা গ্রাম।

গোরু চরার প্রকাণ্ড খেত, নদীর ওপার চরে,

কলাই শুধু ছিটিয়ে দিত পলি জমার 'পরে।

জেগে উঠত চারা তারই, গজিয়ে উঠত ঘাস,

ধেনুদলের ভোজ চলত মাসের পরে মাস।"

রবীন্দ্রনাথ তার পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীতে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে ঠিক এভাবেই গোচারণ ভূমির পাশাপাশি গোখাদ্য হিসেবে স্বাস্থ্যকর ঘাসের চাষের বন্দোবস্ত করেছিলেন। এই গোপালন পল্লীর মানুষের নিছক প্রয়োজন পূরণ করতো না, অর্থনৈতিক সুরক্ষারও কত বড় আশ্রয় ছিল তার ছবিও এঁকেছেন পূর্বোক্ত 'সুধিয়া' কবিতায়—

'গোপাষ্টমীর পর্বদিনে প্রচুর হত দান,

গুরুঠাকুর গা ডুবিয়ে দুধে করত স্নান।

তার থেকে সব ক্ষীর নবনী তৈরি হত কত,

প্রসাদ পেত গাঁয়ে গাঁয়ে গয়লা ছিল যত।"

কিন্তু অনাবৃষ্টি আর মন্বন্তর একদিন এই শিউনন্দনকে সর্বস্বান্ত করে দিল। প্রবল বন্যায় তার স্ত্রী-পুত্র ভেসে গেল, সঙ্গে গোরুগুলোও। নদীমাতৃক বাংলাদেশের গ্রামগুলির এই দুর্দশা দেখেই রবীন্দ্রনাথ বাঁধ নির্মাণের বিপুল উদ্যোগ নিয়েছিলেন— যা পল্লীর যাতায়াত এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। যাইহোক, সব হারিয়ে শিউনন্দন যখন প্লাবন অন্তে বাড়িতে ফিরে এসে কেবল ইষ্টদেবতার স্মরণ ছাড়া অন্য কোন পন্থা ভেবে বের করতে পারলো না তখন তার দশা দেখে ছেলে সামরু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো :

" বলে উঠল, "দেবতাকে তোর কেন মরিস ডাকি

দয়াটা বাঁচিয়ে যেটুকু আজও রইল বাকি

ভার নেব তার নিজের 'পরেই, ঘটুক -নাকো যাই আর,

এর বাড়া তো সর্বনাশের সম্ভাবনা নাই আর।"

এই বলে সে বাড়ি ছেড়ে পাঁকের পথে ঘুরে

চিহ্ন-দেওয়া নিজের গোরু অনেক দূরে দূরে

গোটা পাঁচেক খোঁজ পেয়ে তার আনলে তাদের কেড়ে,

মাথা ভাঙবে ভয় দেখাতেই সবাই দিল ছেড়ে।

ব্যবসাটা ফের শুরু করল নেহাত গরিব চালে,

আশা রইল জমে উঠবে আবার কোনোকালে।"

গো-জাত সামগ্রী এবং তাকে কেন্দ্র করে পল্লীর মানুষের জীবিকা প্রতিপালনের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ 'ছড়া'র ৮ সংখ্যক কবিতায়—

"পেয়াদা ঘি আনে তিন মটকা।

গাওয়া ঘি সে নয়, সে-যে ভয়সা—

সের-করা দাম পাঁচ পয়সা।

বাবু বলে, দাম খুব জেয়াদা,

কাজে ইস্তফা দিল পেয়াদা।

উমেদার এল আজ পয়লা

গোয়াড়ির যত গোড়ো গয়লা।”

‘খাপছাড়া’র ‘খাটুলি’ কবিতায়ও দেখি গোরুই হয়ে উঠেছে এক কন্যার বিবাহদানের একমাত্র আশ্রয়—‘হয়তো গোরু বেচতে হবে মেয়ের বিয়ের দায়ে’। এ কাব্যের ‘বুধু’ কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কেবল গোরুর গাড়ির ব্যবসা করেই মোড়ল বুধু কীভাবে সাংসারিক স্বচ্ছলতা ফিরে পায়, দু-পয়সার মুখ দেখে—‘গোরুর গাড়ির ব্যবসা বুধুর চলছে হেসে-খেলেই’।

কৃষিক্ষেত্র থেকে ফসল বা খড়ের আঁটি বাড়ি আনা, কৃষিজাত দ্রব্য হাটে নিয়ে যাওয়া, পল্লীপথে যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা, কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করা কিংবা গোজাত দ্রব্যসমূহের উপযোগিতার দিক থেকে পল্লী অঞ্চলে গোরু-মোষের ভূমিকা চাষীর কাছে এক অর্থে বিকল্পহীন। ‘সানাই’-এর ‘অপঘাত’ কবিতায় দেখি পল্লীর অর্থনৈতিক ভিত্তির অন্যতম অবলম্বন হিসেবে গোসম্পদকে অনুরূপ কাজে লাগানোর ছবি—

“বিচালি-বোঝাই গাড়ি চলে দূর নদিয়ার হাটে
জনশূন্য মাঠে।
পিছে পিছে
দড়ি-বাঁধা বাছুর চলিছে।”

গো-সম্পদের অনুরূপ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ‘চিত্রবিচিত্র’র ‘ঝড়ো রাত’ কবিতায়—

“ঘন্টা গোরুর গলে
বাজিয়ে ঠনঠন।
নীচে গাড়ির তলে
ঝুলিছে লণ্ঠন।
যাবে অনেক দূরে
বেণীমাধব-পুরে—
ডাইনে চাষের মাঠ,

বাঁয়ে বাঁশের বন।”

রবীন্দ্রনাথের ‘সহজ পাঠ’ দ্বিতীয় ভাগের মধ্যেও আছে ‘কুমোর -পাড়ার গোরুর গাড়ি’র কথা, আছে জিনিসপত্র বোঝাই করে নিয়ে তার হাটের অভিমুখে ধাবমান ছবি। এ গ্রন্থের প্রথম ভাগের তৃতীয় পাঠে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পল্লীজীবনে গোরু-মোষের অর্থনৈতিক গুরুত্বকে চিহ্নিত করে লিখেছেন—

“বিধু গয়লানী মায়ে পোয়

সকাল বেলায় গোরু দোয়। ...

বড়োবউ মেজোবউ মিলে

ঘুঁটে দেয় ঘরের পাঁচিলে”

পল্লীজীবনে গোরু-মোষের এই বহুমাত্রিক অবদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক প্রথায় গোরু-মোষ চাষের দ্বারা পল্লীর অর্থনৈতিক মানের উন্নয়ন ঘটানোর পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতনে তাঁর সেই বিপুল কর্মপরিকল্পনা কীভাবে বিস্তার লাভ করেছিল তার পরিচয় আছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে।

ঠ. অরণ্য সংরক্ষণ :

রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্যতম বিশেষ দিক ছিল অরণ্যসংরক্ষণ। মানুষের জীবনে অরণ্যের বিপুল ভূমিকার কথা রবীন্দ্রনাথ তার একটি চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন(ভিয়েনার হোটেল ইম্‌পীরিয়লে বসে লেখা ১৯২৬-এর ২৩ শে অক্টোবরের চিঠি), যেটি কবির ‘বনবাণী’ কাব্যের ভূমিকা অংশে ব্যবহৃত হয়েছে—

“ আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে- যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়—তাঁর কোন স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ যুগান্তর গুণগুণিয়ে ওঠে।

ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতারা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা হলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ সমুদ্রের কুলে, যে-সমুদ্রের উপরের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীর তলে ‘শান্তম্

শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনেরবাণী শুনি। ....

এখানে ভোরে উঠে হোটেলের জানালার কাছে বসে কতদিন মনে করেছি শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দরূপ আমি দেখব আমার সেই লতার শাখায় শাখায়; প্রথম- প্রৈতির বন্ধবিহীন প্রকাশরূপ দেখব সেই নাগকেশরের ফুলে ফুলে। মুক্তির জন্যে প্রতিদিন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন সকলের চেয়ে মনে পড়ে আমার দরজার কাছের সেই গাছগুলিকে। তারা ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনি। প্রতিদিন অরুণোদয়, প্রতি নিস্তব্ধ রাত্রে তারার আলোয় তাদের ওঙ্কারের সঙ্গে আমার ধ্যানের সুর মেলাতে চাই। এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটের সময়—তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ—অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকে উদ্দাম বেগে পালিয়ে যাবার জন্য। পালাব কোথায়। কোলাহল থেকে সংগীতে। এই আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম তখন মনে পড়ে গেল, সেও সংগীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে, তাদের কাছে চুপ করে বসতে পারলেই সেই সুরের নির্মল ঝরনা আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পারবে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে তবেই আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই।......"

অরণ্য বা বৃক্ষের এই সুবিপুল মহিমা সম্পর্কে জনসাধারণের মনের মধ্যে সচেতনতা আনয়নের জন্য অরণ্যউৎসবেরও আয়োজন করেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রকাব্যে এই উৎসবের যে ছবি আছে সে সম্পর্কে উৎসব উপ-অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অরণ্যের সেই সুবৃহৎ ভূমিকার স্বীকৃতি আছে 'চৈতালী'র 'বন' কবিতায়। নগরজীবন ইঁট-কাঠের ইমারত গড়ে তোলার জন্য 'প্রাণে প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সচল' যে নিসর্গপরিবেশকে প্রায় বিদায় জানিয়েছে , তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ লখেছেন—

"তুমি দাও ছায়াখানি,দাও ফুল ফল,

দাও বস্ত্র,দাও শয্যা, দাও স্বাধীনতা;

নিশিদিন মর্মরিয়া কহ কত কথা

অজানা ভাষার মন্ত্র; বিচিত্র সংগীতে

গাও জাগরণ গাথা; গভীর নিশীথে

পাতি দাও নিস্তব্ধতা অঞ্চলের মতো

জননীবক্ষের; বিচিত্র হিল্লোলে কত

খেলা কর শিশু সনে; বৃদ্ধের সহিত

কহ সনাতন বাণী বচন-অতীত।”

অরণ্যের অনুরূপ মহিমা কীর্তিত হয়েছে ‘সাবিত্রী’ কবিতায়। এ কবিতায় কবি সাবিত্রীর অন্ধকার বিনাশী তেজোদ্দীপ্ত স্বরূপের মাঝে সত্তার আত্মউজ্জীবনের প্রতিভাসকে খুঁজে পেয়েছেন—‘তোমার হোমাগ্নি-মাঝে আমার সত্যের ছবি আছে’। প্রকৃতি ও জীবনের এই নিবিড় একাত্মতাকে রবীন্দ্রনাথ তাই কাখনোই হারাতে চাননি। গাছ অনন্ত কাল ধরে পত্র-ফল-ফুল-পুষ্প দ্বারা পল্লীর তথা সারা পৃথিবীর মানুষের অশেষ উপকার করে চলেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষরোপণের উপর অধিক জোর দিয়েছিলেন—বৃক্ষরোপণ উৎসবেরও প্রচলন করেছিলেন। অথচ কবি দেখেছেন একশ্রেণীর স্বার্থপর সুবিধাবাদী শ্রেণী প্রকৃতি-রূপা বনস্পতিদের বধ্বংস করে চলেছে। এর মূল্য মানুষকেই যে একদিন চোকাতে হবে, সে বিষয়ে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের সে কথার প্রাসঙ্গিকতা আরো প্রকট হয়ে উঠছে।‘বনস্পতি’ কবিতায় কবি বলেছেন পৃথিবীর প্রতি যার প্রেম ‘নিত্য নব পত্রে ফলে ফুলে’ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাকে দস্যুর মত লুটে নিতে চায় সুবিধাবাদীর দল। তাই কবির সাবধান বাণী—

“অকস্মাৎ দস্যুতায় তারে রিক্ত করি নিতে চাও

সর্বস্ব তাহার তব সাথে?

ছিন্ন করি লবে যাহা চিহ্ন তার রবে না কোথাও,

হবে তারে মুহূর্তে হারাতে।

যে লুব্ধ ধূলির তলে লুকাতে চাহিবে তব লাভ

সে তোমারে ফাঁকি দেবে শেষে।

লুন্ঠনের ধন লুঠি সর্বগ্রাসী দারুণ অভাব

উঠিবে কঠিন হাসি হেসে।”

'মহুয়া'র নাম-কবিতায় কবি গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৃক্ষ বা অরণ্যের ব্যাপক ভূমিকার কথা বলেছেন। অর্থনীতির পাশাপাশি পল্লীর পরিবেশের স্থিতাবস্থা রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকার স্পষ্ট স্বীকৃতি উচ্চারিত হয়েছে এ কবিতায় —

"...কালবৈশাখীর ক্রুদ্ধ কলরোল

শাখাব্যূহ ঘিরে

আশ্বাস করিস দান শঙ্কিত বিহঙ্গ অতিথিরে।

অনাবৃষ্টিক্লিষ্ট দিনে,

বিশীর্ণ বিপিনে,

বন্য বুভুক্ষুর দল ফেলে রিক্ত পথে,

দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি ভরে তারা তোর সদা ব্রতে। ......

'বনবাণী'র 'বৃক্ষবন্দনা', 'শাল্ 'বৃক্ষরোপণ উৎসব', 'পরিশেষে'র 'আঘাত', 'বীথিকা'র 'গরবিণী' কবিতায়ও কবি বৃক্ষ বা অরণ্যের অনুরূপ সামাজিক ভূমিকার পরিচয় দিয়েছেন। পরিবেশ রক্ষায় প্রাচীনকাল থেকে এই বৃক্ষের সুমহান আদর্শের কথা বলেছেন কবি। জীবন ও পরিবেশকে স্বচ্ছল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলার ক্ষেত্রে বৃক্ষের উপযোগিতার কথা বলেছেন কবি বহুমুখে। তাঁর পল্লীউন্নয়ন যজ্ঞে একারণেই অরণ্যসংরক্ষণ, অরণ্য উৎসব বিশেষ মাত্রা লাভ করেছিল।

ড. অগ্নিনির্বাপণ কর্মসূচী :

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের দুঃখ ও যন্ত্রণাকে নিতান্ত কাছ থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা জীর্ণ কুটীরে কষ্টে সৃষ্টে তাদের জীবন অতিবাহিত হতো। সেই কুটীরে অগ্নিসংযোগ ঘটলে গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে তছনছ হয়ে যেত। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়তো। এক বিশেষ শ্রেণীর সুবিধাবাদী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য এমন অমানবিক কাজে নিয়োজিত হত। পূর্ববর্তী অধ্যায়েই সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

'কথা'র 'সামান্য ক্ষতি' কবিতায় অনুরূপ ছবিটিকে প্রত্যক্ষ করি। রাণী তার বিলাসী মানসিকতায় শীত নিবারণের জন্য কৃষকের জীর্ণ কুটীরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে উত্তরবায়ুর প্রভাবে লোল অগ্নিশিখা সারা পল্লীর কুটীরগুলিকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। এতে পল্লীর দরিদ্র প্রজারা গৃহহীন হয়ে রাজদ্বারে কেঁদে পড়ে—

"তখন সভায় বিচার-আসনে

বসিয়াছিলেন ভূপতি।

গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে,

দ্বিধাকম্পিত গদগদ ভাষে

নিবেদিল দুখ সংকোচে ত্রাসে

চরণে করিয়া বিনতি।"

কিন্তু অধিকাংশ সময়ে জমিদার বা রাজা প্রজাহিতৈষী না হলে প্রজার এ কাতর প্রার্থনা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতো রাজদ্বার হতে। 'দীনদান' কবিতায় বহ্নিদাহে গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন বিংশতিসহস্র প্রজা রাজদ্বারে এসে কেঁদে পড়লেও রাজা তাদের কোন সাহায্য করেননি। এমতাবস্থায় নিরন্ন দুঃখক্লিষ্ট প্রজা বাধ্য হত মহাজন বা জমিদারের ঋণের জালে প্রজন্ম পরম্পরায় আবদ্ধ হতে, কিংবা অরণ্যে গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে, কিংবা জীর্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে আশ্রয় নিতে। এ কবিতার রাজা প্রজাহিতৈষী ছিলেন বলে রানীকে ভিখারীর বসন পরিয়ে শাস্তি দিয়ে প্রজার ক্ষতির স্বরূপ সম্পর্কে তাকে অবগত করানোর প্রয়াস নিয়েছেন। এ আসলে আদর্শ পল্লীশাসক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কর্তব্যকর্মের দিকনির্দেশ। অগ্নিদাহে প্রজার ক্ষতির ব্যাপকতা ও গভীরতাকে অনুধাবন করা যে স্বাচ্ছন্দ্যবিলাসী ব্যক্তির পক্ষে কঠিন তারই দিকনির্দেশ আছে রাণীর প্রতি রাজার নির্দেশে—

"পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,

'মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে—

এক প্রহরের লীলায় তোমার

যে কটি কুটীর হল ছারখার

যত দিনে পার সে-কটি আবার

গড়ি দিতে হবে তোমারে।

বৎসরকাল দিলেম সময়,

তার পরে ফিরে আসিয়া

সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি

সবার সমুখে জানাবে যুবতী

হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি

জীর্ণ কুটীর নাশিয়া।’”

ঢ. উৎসবের আয়োজন ও আনন্দের পথে সাংস্কৃতিক উজ্জীবন :

শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির সদস্য-সদস্যাদের দ্বারা আয়োজিত হিন্দুমেলায় অংশগ্রহণ করার। এ মেলার একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল জাতপাতের ঊর্ধ্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও ঐক্যকে সুগ্রথিত করা। সমকালের ‘বান্ধব’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘হোক ভারতের জয়’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাই আহ্বান জানিয়েছিলেন—

“এসো এসো ভ্রাতৃগণ! সরল অন্তরে

সরল প্রীতির ভরে

সবে মিলি পরস্পরে

আলিঙ্গন করি আজ বহুদিন পরে।

এসেছে জাতীয় মেলা ভারতভূষণ

ভারত সমাজে তবে

হৃদয় খুলিয়া সবে

এসো এসো এসো করি প্রিয় সম্ভাষণ।

দূর করো আত্মভেদ বিপদ-অঙ্কুর

দূর করো মলিনতা

বিলাসিতা অলসতা,

হীনতা ক্ষীণতা দোষ করো সবে দূর। ......

হল না কিছুই করা যা করিতে এলে—

এই দেখো হিন্দুমেলা,

তবে কেন কর হেলা,

কী হবে কী হবে আর তুচ্ছ খেলা খেলে ?”

দেশ জননীর বিপন্নতা দেখে এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমী মন ব্যথিত হয়েছে। ‘প্রতিবিম্ব’ এবং ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় প্রকাশিত যথাক্রমে ‘প্রকৃতির খেদ’ প্রথম পাঠ, এবং ‘প্রকৃতির খেদ’ দ্বিতীয় পাঠ কবিতা দু’টিতে কবির বিমর্ষ হৃদয়ের ছাপ পড়েছে দেশমাতৃকার মুখচ্ছবি অঙ্কন করতে গিয়ে। এই নিরানন্দ দেশজননীর মুখকে উজ্জ্বল করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ পল্লী এলাকায় একাধিক মেলা এবং উৎসবের আয়োজন করেন। ‘নবান্ন’ উৎসব তাদের মধ্যে অন্যতম। ‘কল্পনা’র ‘শরৎ’ কবিতায় কবি শরৎকালে পল্লীর ঘরে ঘরে ‘নবান্ন’ উৎসব পালিত হওয়ার অনুরূপ ছবিকেই তুলে ধরেছেন। ঠিক একই সময়ে বাঙালির প্রিয় দুর্গোৎসব বাংলার পল্লীগুলোকে কীভাবে আনন্দ ও কিছুটা সমৃদ্ধিতে ভরে দেয় তার ছবি এঁকেছেন কবি এ কবিতায়—

“জননী, তোমার শুভ আহ্বান

গিয়েছে নিখিল ভুবনে—

নূতন ধান্যে হবে নবান্ন

তোমার ভবনে ভবনে।

অবসর আর নাহিকো তোমার—

আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,

গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার

ভরিয়া উঠিছে ভবনে।..............

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়

আয় তোরা সবে ছুটিয়া—

ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী,

অন্ন যেতেছে লুটিয়া।

ওপার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,

ওপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,

কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়—

আয় তোরা সবে জুটিয়া।

ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী

অন্ন যেতেছে লুটিয়া।"

পল্লীজীবনে অনুরূপ মেলা বা উৎসব আনন্দময় যে শুভ অবসর বয়ে আনে, জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা ভুলে মানুষ যে পরম আনন্দে মেতে ওঠে, বিনিময়ের অর্থনৈতিক পরিসর রচিত হয়, তার বর্ণনা মেলে 'ক্ষণিকা'র 'সুখদুঃখ' কবিতায়—

"বসেছে আজ রথের তলায় স্নান যাত্রার মেলা—

সকাল থেকে বাদল হল,ফুরিয়ে এল বেলা।

আজকে দিনের মেলামেশা

যত খুশি যতই নেশা

সবার চেয়ে আনন্দময় ওই মেয়েটির হাসি—

এক পয়সায় কিনেছে ও তালপাতার এক বাঁশি।

বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি আনন্দ স্বরে।

হাজার লোকের হর্ষধ্বনি সবার উপরে।”

পল্লীর মেলা বা উৎসবগুলি যে মানুষের মধ্যেকার জাত-পাতের ভেদাভেদ দূর করে তাদেরকে এক গভীর ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে, সে কথা আগেই জানিয়েছি । এই ঐক্য চেতনা আমাদের মধ্যে জন্ম দেয় জাতীয়তাবাদী ভাবনার। আশাহীন ভাষাহীন এ দেশের পল্লীগ্রামে মেলাগুলি নতুন প্রাণোন্মাদনা সঞ্চারের ক্ষেত্রেও একটি বড় ভূমিকা নিত। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে শিবাজী উৎসবের প্রচলন করা হয়েছিল এই কারণেই। রবীন্দ্রনাথ ‘শিবাজী-উৎসব’ কবিতায় তাই বলেছেন—

“এ কথা ভাবেনি কেহ এ তিন শতাব্দ-কাল ধরি—

জানেনি স্বপনে—

তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি

দিবে বিণা রণে।

তোমার তপস্যা তেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্ধান

আজি অকস্মাৎ

মৃত্যুহীন বাণীরূপে আনি দিবে নতুন পরাণ।”

মেলায় সকল শ্রেণীর মানুষকে একত্রে মিলিয়ে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ পল্লী গড়ে তোলা যেমন রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল, একই সঙ্গে মেলাগুলিতে নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী বিক্রির সুযোগ সৃষ্টির দ্বারা পল্লীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ‘পুনশ্চে’র ‘প্রথম পূজা’ কবিতায় মেলার সেই ছবিটিকে তুলে ধরেছেন কবি, যদিও এ মেলাটি শেষ অবধি সফলতার মুখ দেখেনি—

“কার্তিক পূর্ণিমা, পূজার উৎসব।

মঞ্চের উপরে বাজছে বাঁশি মৃদঙ্গ করতাল,

মাঠজুড়ে কানাতের পর কানাত,

মাঝে মাঝে উঠেছে ধ্বজা।

পথের দুই ধারে ব্যাপারীদের পসরা—

তামার পাত্র, রূপোর অলঙ্কার, দেব মূর্তির পট, রেশমের কাপড়;

ছেলেদের খেলার জন্যে কাঠের ডমরু, মাটির পুতুল, পাতার বাঁশি;

অর্ঘ্যের উপকরণ, ফল মালা ধূপ বাতি, ঘড়া ঘড়া তীর্থবারি।

বাজিকর তারস্বরে প্রলাপবাক্যে দেখাচ্ছে বাজি,

কথক পড়ছে রামায়ণকথা।"

পল্লীর উৎসবের অনুরূপ ছবি পাওয়া যায় 'চিত্রবিচিত্র'র 'পৌষ-মেলা' কবিতায়। এ যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন পর্বের পৌষমেলার একটি টুকরো চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন—

"শীতের দিনে নামল বাদল, বসল তবু মেলা।

বিকেল বেলায় ভীড় জমেছে, ভাঙল সকাল বেলা'

পথে দেখি দু-তিন-টুক্‌রো কাঁচের চুড়ি রাঙা,

তারি সঙ্গে চিত্র-করা মাটির পাত্র ভাঙা।"

পল্লীর নিরানন্দ জীবনে উৎসব যে আনন্দমুখরতার কলরোল সৃষ্টি করতো তার ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ 'চত্রবিচিত্রে'র 'উৎসব' কবিতায়ও—

"দুন্দভি বেজে ওঠে ডিম্‌-ডিম্‌ রবে,

সাঁওতাল-পল্লীতে উৎসব হবে।

পূর্ণিমাচন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারায়

সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়। ......

ওই শুনি পথে পথে হৈ হৈ ডাক,

বংশীর সুরে তালে বাজে ঢোল ঢাক।

নন্দিত কণ্ঠের হাস্যের রোল

অম্বর তলে দিল উল্লাসদোল।"

রবীন্দ্রনাথ পল্লবাসীর চেতনাসংস্কারের জন্য, নিরানন্দ জীবনে কিছুটা আনন্দের সঞ্চার করার জন্য পল্লীসাহিত্যচর্চা ও সংরক্ষণের কথা বলেছিলেন। বিশেষতঃ পল্লীর অভাব-দারিদ্র্য-নিরাশা থেকে কিছু সময়ের জন্য মুক্তির লক্ষ্যে রূপকথা জাতীয় গ্রন্থপাঠের উপর জোর দিয়েছিলেন। তারই ছবি আছে 'সানাই' কাব্যের 'রূপকথায়' কবিতায়—

"কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা

মনে মনে। ......

তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপকথার,

পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপকথার,

পারুলবনের চম্পারে মোর হয় জানা

মনে মনে। ....

সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে

যাই ভেসে দূর দেশে,

পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার দিই হানা

মনে মনে।

ণ. পক্ষীপালন ও সংরক্ষণ :

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর অন্যতম বিশেষ দিক ছিল পক্ষী সংরক্ষণ। পক্ষী মানুষের জীবনের সৌন্দর্যচেতনাকে, মাধুর্যের অনুভূতিকে পরিপূর্ণতা দান করে। 'পরিশেষ' কাব্যের 'চিরন্তন' কবিতায় কবি এ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে বলেছিলেন—

"শুনেছিলেম পল্লীতলে, এই কোকিলের গানে

অসীম কালের অনির্বচনীয়

প্রাণে আমার শুনিয়েছিল, 'তুমি আমার প্রিয়'।

সেই ধ্বনিটি কানন ব্যেপে পল্লবে পল্লবে

জলের কলরবে

ওপার-পানে মিলিয়ে যেত সুদূর নীলাকাশে।”

যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ যত ঘটেছে বন্য প্রাণী হননের কাজ সমান গতিতে এগিয়ে গেছে। পক্ষী শিকারের ফলে পল্লীর সৌন্দর্য তাঁর পূর্বের শ্রী হারায়, বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হতে বসে। ‘বনবাণী’ কাব্যের ‘চামেলিবিতান’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পক্ষীশিকারীর উদ্দেশ্যে তাই শ্লেষ হেনে বলেছেন—

“নাশ করে যে আগ্নেয় বাণ

মুহূর্তে আগ্নেয় তোর প্রাণ—

তার লাগি বসুন্ধরা

হয়নি সবুজে ভরা,

তার লাগি ফুল নাহি ধরে।

যে বসন্তে প্রাণে প্রাণে

বেদনার সুধা আনে

সে বসন্ত নহে তার তরে।

ছন্দ ভেঙে দেয় সে যে’

অকস্মাৎ উঠে বেজে

অর্থহীন চকিত চীৎকার,

ধূমাচ্ছন্ন অবিশ্বাস

বিশ্ববক্ষে হানে ত্রাস,

কুটিল সংশয় কদাকার।

রবীন্দ্রসাহিত্যে পক্ষীপালন ও পক্ষীসংরক্ষণের ছবি আছে ‘ছড়ার ছবি’র ‘ভজহরি’ কবিতায়। ভজহরি কেবল দেশের নয়, বিদেশ থেকেও নানাপ্রকার পাখি সংগ্রহ

করে আনতো। এদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হত গঙ্গাফড়িং এবং অন্যান্য পোকামাকড়। এই ফড়িং বা পোকামাকড় খেয়ে পাখি বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। পল্লীর কৃষকের ধান কিংবা অন্যান্য চাষাবাদে তাই এই সকল পোকামাকড় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো না—তাদের মৃত্যু ছিল নিশ্চিত। পক্ষীপালন বা সংরক্ষণের হিতকরী দিকের নির্দেশ পাই এই কবিতায়—

"ভজু বলত, "পোকার দেশে আমিই হচ্ছি দত্যি

আমার ভয়ে গঙ্গাফড়িঙ ঘুমোয় না একরত্তি।

ঝোপে ঝোপে শাসন আমার কেবলই ধরপাকড়,

পাতায় পাতায় লুকিয়ে বেড়ায় যত পোকামাকড়।""

'আকাশপ্রদীপ' কব্যের 'পাখির ভোজ' কবিতায় সকালবেলার 'মুড়ি খাবার নিমন্ত্রণে' জড়ো হওয়া শালিক, পায়রা, কাকেদের উল্লাস কবির অন্তরের আনন্দের স্রোতকে উদবেলিত করে তুলেছে। প্রাণের এই সহজ আনন্দের আয়োজনই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন স্তিমিতপ্রাণ, মূঢ়, ম্লান, মূক পল্লীবাংলার বুকে। তাই পক্ষীপালন ও তার সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছিলেন তাদের আনন্দের ধারাকে প্রাণের পথে পল্লীপ্রাণ মানুষের মনে পৌঁছে দেওয়ার জন্য—

"এই যে বহায় ওরা

প্রাণস্রোতের পাগলাঝোরা,

কোথা হতে অহরহ আসছে নাবি

সেই কথাটাই ভাবি।........

চতুর্দিকে ছড়িয়ে ফেলে নিবিড় উল্লাস—

যুগের পরে যুগ তবু হয় না গতিহারা,

হয় ক্লান্ত অনাদি সেই ধারা।

সেই পুরাতন অনির্বচনীয়

সকালবেলায় রোজ দেখা দেয় কি ও

আমার চোখের কাছে

ভীড় করা ঐ শালিকগুলির নাচে।”

ছড়া’র ৩ সংখ্যক কবিতায়ও পল্লীজীবনে পক্ষীপালনের অনুরূপ ছবি পাই ঝিনেদার জমিদারের পরিচয় প্রসঙ্গে—

“ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা

সে বছর পুষেছিল একপাল পায়রা।

বড়োবাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়,

পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।

হাঁসগুলো জলে চলে আঁকা বাঁকা রকমে

পায়রা জমায় সভা বক্-বক্-বকমে।”

ত. নারীর স্বাধিকার :

পল্লীর তথা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে নারীশক্তির নিতান্ত আবশ্যকতা রয়েছে সে কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর প্রতি অবহেলা ও অত্যাচার থেকে সরে আসেনি। তার সব অধিকারকে কেড়ে নিয়ে ভোগ্য পণ্যে পরিণত করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাই নারীর স্বাধীকার ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রয়াসী হয়েছেন, তাদের কর্মসংস্থানের দ্বারা স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ‘পলাতকা’র ‘চিরদিনের দাগা’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নারীর প্রতি পরিবারের তথা সমাজের অবহেলা অন্যায়ের ছবিটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রমথনাথ বিশী জানিয়েছেন—“চিরদিনের দাগা কবিতার নায়িকা শৈলবালা অবাঞ্ছিত কিশোরী নারীর প্রতিনিধি, যে নারী জন্মক্ষণ হইতেই অভিভাবকের মনে বিবাহদানের উদ্বেগ জাগাইয়া দিয়া প্রতিমুহূর্তে অবহেলিত হইতে থাকে।”[৫৭]

কবিতায় অনুরূপ চিত্রের অনুবর্তন স্পষ্ট। একে একে তিন মেয়ের পরও যখন শৈলবালার জন্ম হল তখন অবহেলা আর অপমান ছাড়া তার জীবনে আর কিছু জুটলো না—

“বিনা- দোষের অপরাধে শৈলবালার জীবন হল শুরু,

পদেপদে অপরাধের বোঝা হল গুরু।

কারণ বিনা যে-অনাদর আপনি ওঠে জেগে

বেড়েই চলে সে যে আপন বেগে।

মা তারে কয় ‘পোড়ার মুখী’, শাসন করে বাপ—

এ কোন অভিশাপ

হতভাগী আনলি বয়ে—শুধু কেবল বেঁচে-থাকার পাপ।”

এ আসলে শৈলর পিতা-মাতার মনেরই বিকার।কিন্তু কবি জানতেন— ‘নিজের মনের বিকারটিরেই শৈল ওরা কয়,/ ওদের শৈল বিধির শৈল নয়’।

এ কাব্যের ‘মুক্তি’ কবিতায়ও কবি নারীর সেই স্বাধিকারের কথাই বলেছেন। পিতৃতান্ত্রিক এ সমাজ ‘নামিয়ে চক্ষু, মাথায় ঘোমটা টেনে’ যে নারীটি আজীবন ‘দশের ইচ্ছা বোঝাই করা’ নিষ্ফল জীবন যাপন করে, তাকে সতীলক্ষ্মীর মহিমায় আবৃত করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বস্তুতঃ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে চলে মাত্র । নারীত্বের সফলতার যে বৃহৎ পরিসর সাংসারিক সঙ্কীর্ণ পরিসীমার বাইরে থেকে যায়, তার কোন খোঁজ পায় না এই সতীলক্ষ্মীরা। বাল্য বিবাহের মত সামাজিক ব্যাধির শিকার হয়ে নয় বছর বয়স থেকে সাংসারিক কাজের মাঝে তাদের যেভাবে জুতে দেওয়া হয়,তার থেকে মুক্তি ঘটে মৃত্যুর উপান্তে এসে। এ-কবিতার নায়িকা তাই জানিয়েছে—

“এই জীবনটা ভালো, কিংবা মন্দ, কিংবা যা-হোক-একটা- কিছু

সে-কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগুপিছু।

আকটানা এক ক্লান্ত সুরে

কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে।

বাইশ বছর রয়েছি সেই এক-চাকাতেই বাঁধা

পাকের ঘোরে আঁধা।

জানি নাই তো আমি যে কী,জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা

কী অর্থে যে ভরা।

শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী

মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,

রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,

বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা।”

এই আবদ্ধতার বাইরে মুক্তি লাভ করেই নারী জেনেছে তার নারীত্বের স্বতন্ত্র সফলতা। অনুভব করেছে –

“আমি নারী, আমি মহিয়সী,

আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না- বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।

আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,

মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।”

‘পলাতকা’র ‘ফাঁকি’ কবিতায়ও কবি নারীর প্রতি পুরুষের অবহেলার ছবিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।বিনুর প্রতি স্বামীর অবহেলার ছবি পাই তেইশ বছর বয়সে অসুস্থ হবার পর প্রথম শ্বশুর বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার দৃশ্যে।সংক্ষিপ্ত পরিসরে জমিদারী শোষণ ও তার ফলপরিণামের একটি ছবিকে খুঁজে পাই এ কবিতায় ব্যক্ত রুক্মিণীর জীবন-কাহিনীতে।গ্রামে তাদের সাত বিঘে জমি ছিল। কিন্তু আকালের সময় জমিদারের অত্যাচার ও শোষণের ফলেস্বভূমি থেকে তাদের উৎখাত হতে হয়। তাদের স্থান হয় স্টেশন সংলগ্ন কুলিকামিনদের বস্তিতে। রবীন্দ্রনাথ এই কারণেই জমির উপর প্রজার স্থায়ী স্বত্বের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। জাত-পাত শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্বক বর্ণনা আছে এ কবিতায়। রুক্মিণী সম্পর্কে বিনুর স্বামী তাই ভেবেছে—

“জাতে হয়তো মেথর হবে, কিংবা নেহাত ওঁচা,

যাত্রীঘরের করে ঝাড়ামোছা,

পঁচিশ টাকা দিতেই হবে তাঁকে!”

এ কাব্যের ‘নিষ্কৃতি’ কবিতায়ও কবি নারীর স্বাধীকারের স্বপক্ষে নিজের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। মঞ্জুলী নিজ পছন্দের পাত্র পুলিনকে স্বচ্ছায় বিবাহ করে তার পরিচয় দিয়েছে। একই সঙ্গে নিরর্থক জাত-পাত বা কৌলীন্যের অন্ধ সংস্কার সন্তানের জীবনে কী ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে তার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে মঞ্জুলীর প্রথম বিবাহের বৈধব্য

পরিণতি চিত্রায়ণের মধ্যস্থতায়। এ কবিতার মহেশ জাত-পাত-ধর্মের ঊর্ধ্বে মানুষের কল্যাণকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করেছে।

নারীকে ‘সবলা’ হিসেবে গড়ে তোলার যে আকাঙ্খা রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে ছিল, ‘মহুয়া’র সবলা কবিতায় নারীর অনুরূপ ছবিটি রয়েছে। এ কবিতায় নারী কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবার জন্য ‘বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী’ বাসরকক্ষে পুরুষের কাছে যেতে চায়নি, তাকে প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী করে তোলার জন্য পুরুষের কাছে দাবি উত্থাপন করেছে। ‘আপন ভাগ্য’ জয় করার জন্য দুর্বল লজ্জার আবরণকে খুলে ফুলে জীবনের ‘তরঙ্গগর্জনোচ্ছ্বাস’ ক্ষুব্ধ সিন্ধুর মাঝে নিজেকে সঁপে দিয়ে নারীত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ চেয়েছে—

“হে বিধাতা’আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের ’পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে নির্বারিত স্রোতে।”

পল্লীজীবনে নারীশক্তির ব্যাপকতর গুরুত্বের ছবিটিকে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন ‘বীথিকা’র ‘সাঁওতাল মেয়ে’ কবিতায়—

“আমি দেখি চেয়ে,
ঈষৎ সংকোচে ভাবি –এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে

করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা
শুশ্রুষার স্নিগ্ধসুধা-ভরা,

আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরি—

মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি

পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।

সাঁওতাল মেয়ে ঐ ঝুড়ি ভরে নিয়ে আসে মাটি।”

পল্লীজীবনে অল্পবয়স্ক কিশোরী মেয়েরা পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের তাগিদে কীভাবে কাজের মধ্যে নিয়ত নিজেদেরকে সঁপে দিতে বাধ্য হয়, কীভাবে তাদের একঘেয়ে আনন্দহীন জীবন যান্ত্রিকতার নীরস খাদে বয়ে চলে জীবনের সব মহত্তর সম্ভাবনাকে মাটি করে দেয় ,তার ছবি আছে ‘ছড়ার ছবি’র ‘প্রবাসে’ কবিতায়—

“বিকেলবেলায় একটুখানি কাজের অবকাশে

খোলা দ্বারের পাশে

দাঁড়িয়ে আছে পাড়ার তরুণ মেয়ে

আপন-মনে অকারণে বাহির-পানে চেয়ে।”

এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীর নারীদের স্বাধিকারের স্বপক্ষে, তাদের স্বনির্ভরতা দানের জন্য নানা পরিকল্পনাকে গড়ে তুলেছিলেন।

পল্লীগ্রামে একজন নারীই যে পরিবারের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পরিবহনে পুরুষের বিকল্প অবস্থান নিতে পারে তার কথা বার বার জানিয়েছেন। ‘ ছড়ার ছবি’র ‘দেশান্তরী’ কবিতায় স্বামীর অবর্তমানে পল্লীগ্রামে একজন স্ত্রীলোক পুরুষশক্তির বিকল্প হিসেবে সংসারের অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে কীভাবে পূরণ করে তারই বর্ণনা পাই—

“স্ত্রী বলেছে বারে বারে যে করে হোক খেটে

সংসারটা চালাবে সে , দিন যাবে তার কেটে।

ঘর ছাইতে খড়ের আঁঠির যোগান দেবে সে যে,

গোবর দিয়ে নিকিয়ে নেবে দেয়াল পাঁচিল মেঝে।

মাঠের থেকে খড়কে কাঠি আনবে বেছে বেছে,

ঝাঁটা বেঁধে কুমোরটুলির হাটে আসবে বেচে।

ঢেঁকিতে ধান ভেনে দেবে বামুনদিদির ঘরে,

খুদকুঁড়ো যা জুটবে তাতেই চলবে দুর্বছরে।”

নারীর স্বাধিকার ও স্বনির্ভরতা অর্জনের অপর দৃষ্টান্তকে খুঁজে পাওয়া যায় ‘ছড়ার ছবি’র ‘অচলা বুড়ি’ কবিতায়—

“সাঁৎরাপাড়ার কায়েতবাড়ির বিধবা এক মেয়ে,

এককালে সে সুখে ছিল বাপের আদর পেয়ে।

বাপ মরেছে, স্বামী গেছে, ভাইরা না দেয় ঠাঁই,

দিন চালাবে এমনতরো উপায় কিছু নাই।

শেষকালে সে ক্ষুধার দায়ে, দৈন্যদশার লাজে

চলে গেল হাসপাতালে রোগীসেবার কাজে। ......

গ্রামের লোকে ছি- ছি করে, জাতে ঠেলল তাকে,

একলা কেবল অচল আদর করে ডাকে।

সে বলে, “তুই বেশ করেছিস যা বলুক-না যেবা,

ভিক্ষা মাগার চেয়ে ভালো দুঃখী দেহের সেবা।””

যে নারীশক্তির উপর নির্ভর করে দেশের মুক্তির কথা ভাবা হয়েছিল, পল্লীজীবনে সেই নারী শক্তির তিলে তিলে ক্ষয় দেখেছিলেন কবি । শেষরাতে জেগে উঠে দুর্গা নাম নিয়ে তাদের কর্ম্মদিবসের সূত্রপাত হয়। খিড়কির ডোবায় বাসি এঁটোবাসন মাজা, তারপর সজিকোটা, মাছকাটার উপান্তে ‘তিন চার দফা রান্না’র ফিরিস্তি। এভাবেই কেটে যায় বেলা আড়াইটে অবধি। এরপর ‘বিড়ালকে দিয়ে কাঁটাকুটি’ পান-দক্তা মুখে পুরে ঘুম। আর তারপরে রাত্তিরে রুটি আর বাসি তরকারির আয়োজন। বিকেলবেলা আগাছাভরা পুকুরে আগাছা সরিয়ে ভিজে শাড়ি গায়ে জল নিয়ে ঘরে ফেরা, অতঃপর ছাদে বসে ননদীর কেশ পরিচর্যা, পরচর্চা পরনিন্দা, তাই নিয়ে পাড়ায় তুমুল কলহ, স্বামীকে লুকিয়ে পুত্রের স্বস্ত্যয়নের জন্য খরচের যাবতীয় বন্দোবস্ত করা, ভবিষ্যৎ জামাতার খোঁজখবর

নেওয়ার কাজেই তাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন অতিবাহিত হত। তারা মন্দিরে জীবরক্তপাতে এতটুকু বিচলিত হয় না, 'সে- রক্তের ফোঁটা দেয় সন্তানের মাথে'। অথচ তাদেরই সন্তানের কঠিন অসুখে 'ভিড় করে আসে দ্বারে ডাক্তারের গাড়ি'। যারা শুভক্ষণ ও শুভদিন দেখে ঘরের বাইরে পা বাড়াতে ভয় পায়—

"সেই দেশে দেবতার কুপ্রথা অদ্ভুত

সবচেয়ে অনাচারী সেথা যমদূত।

ভালো লগ্নে বাধা নেই, পাড়ায় পাড়ায় দেয় ডঙ্কা।

সব দেশ হতে সেথা বেড়ে চলে মরণের সংখ্যা।"

যদি কোন নারী শিক্ষা লাভ করে পল্লীর কুসংস্কার ও জীর্ণ প্রথায় আচ্ছন্ন সমাজে নিজের স্বাধিকারকে জানান দিত তাহলে রক্ষণশীল সমাজের কাছে তা ম্লেচ্ছতারই নামান্তর বলে পরিগণিত হত—

"দুর্গতি দিয়েছে দেখা; বঙ্গনারী ধরেছে শেমিজ,

বি. এ. এম. এ. পাস করে ছড়াইছে বীজ

যুক্তি-মানা ঘোর ম্লেচ্ছতার।

ধর্মকর্ম হল ছারখার।

শীতলামায়ীরে করে হেলা;

বসন্তের টীকা নেয়; 'গ্রহণের বেলা

গঙ্গাস্নানে পাপ নাশে'

শুনিয়া মূর্খের মতো হাসে।"

আর 'জন্মদিনে' কাব্যের 'অবিচার' কবিতায় কবি আমাদের দেশের নারীদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে লিখেছেন—

"নারীর দুখের দশা অপমানে জড়ানো

এই দেখি দিকে দিকে ঘরে ঘরে ছড়ানো।

জানো কি এ অন্যায় সমাজের হিসাবে

নিমেষে নিমেষে কত হলাহল মিশাবে?

পুরুষ জেনেছে এটা বিধিনির্দিষ্ট

তাদের জীবন-ভোজে নারী উচ্ছিষ্ট।"

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

"একদা পুরুষ যদি পাপের বিরুদ্ধে

দাঁড়ায়ে নারীর পাশে নাহি নামে যুদ্ধে

অর্ধেক- কালি-মাখা সমাজের বুকটা

খাবে তবে বারে বারে শনির চাবুকটা।"

থ. ছাগল চাষ :

ছাগল চাষের ছবি পাই 'ছড়ার ছবি'র 'বুধু' কবিতায়। এ কবিতায় কবি জানিয়েছেন—

"সামনে মাঠে ছাগল চরছে ক'টা,

শুকনো জমি, নেইকো ঘাসের ঘাসের ঘটা।

কী যে ওরা পাচ্ছে খেতে ওরাই সেটা জানে,

ছাগল বলেই বেঁচে আছে প্রাণে।"

অনুরূপ অনেক টুকরো ছবি ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন রবীন্দ্রকবিতায়। যেমন 'ছড়া'র ৫ সংখ্যক কবিতায় কবি লিখেছেন—

"ছাগলছানা ঘুরে বেড়ায়

কচি ঘাসের খোঁজে তার।"

কিন্তু এই ছাগল চাষ বৈজ্ঞানিক প্রথায় ছাগল চাষ নয়। খাদ্যের অভবে পল্লীর গৃহপালিত ছাগলগুলো অস্বাস্থ্যের শিকার হত। অধিকাংশ সময় সেগুলি অকালে প্রাণ হারাত। তাই রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক প্রথায় অধিক লাভের জন্য শঙ্কর প্রজাতির ছাগলচাষের উপর জোর দিয়েছিলেন। এমনকি পশুচিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থাও গড়ে তুলেছিলেন।

দ. স্বাস্থ্য :

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের জন্য যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে পল্লীর মানুষের চিকিৎসা ও সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থাকরণ কিছুটা স্বতন্ত্র মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্রে, তাবিজ-তাগায় বিশ্বাসী পল্লীর মানুষ চিকিৎসার অভাবে কীভাবে অকালে প্রাণ হারাতো তার ছবি রবীন্দ্রসাহিত্যে বহুস্থলে চিত্রিত হয়েছে। ‘পুনশ্চে’র ‘ছেলেটা’ কবিতায় শিশু মৃত্যুর ছবি স্থান পেয়েছে। সিঁধুগোয়ালিনীর ছবি আঁকতে গিয়ে কবি বলেছেন—

“তার ছেলেটি মরে গেছে সাত বছর হল,

বয়সে ওর সঙ্গে তিন দিনের তফাত।”

পল্লীজীবনে শিশু মৃত্যুর ছবি আছে ‘ছড়ার ছবি’র ‘খাটুলি’ কবিতায়ও—

“নাতনি গেছে ,রাখে তারি পোষা ময়নাটাকে,

তেমনি কচি গলায় ওকে ‘দাদু’ বলে ডাকে।”

শিশুমৃত্যুর অনুরূপ ছবি আছে ‘ছড়ার ছবি’র ‘বুধু’ কবিতায়। এ কবিতায় বুধু মোড়লের বর্ণনা দিয়ে কবি লিখেছেন—

“হেমন্তের এই রোদ্‌দুরটা লাগছে অতি মিঠে,

ছোটো নাতি মোগ্‌লুটা তার জড়িয়ে আছে পিঠে।

স্পর্শপুলক লাগছে দেহে ,মনে লাগছে ভয়

বেঁচে থাকলে হয়।

গুটি তিনটি মরে শেষে ওইটি সাধের নাতি,

রাত্রিদিনের সাথী।.........

দেবতা পাছে ঈর্ষাভরে নেয় কেড়ে মোগ্‌লুকে

আঁকড়ে রাখে বুকে।

এখনো তাই নাম দেয় নি, ডাক নামেতেই ডাকে,

নাম ভাঁড়িয়ে ফাঁকি দেবে নিষ্ঠুর দেব্‌তাকে।”

সুরুল ছিল তখন ম্যালেরিয়ার পীঠস্থান। পল্লীজীবনে ম্যালেরিয়া ছিল এক দুরুপনেয় অভিশাপের মত। চিকিৎসার অভাবে পল্লীর প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষই যে ম্যালেরিয়া ঘটিত যকৃতের অসুখে ভুগতো এবং তাদের অনেকেই যে ম্যালেরিয়ায় মারা পড়তো, তার কথা পূর্ব অধ্যায়েই আলোচনা করেছি৷ ‘খাপছাড়া’র ২৮ সংখ্যক কবিতায় তারই পরিচয় আছে। কথায় কথায় ‘ আশ্চর্যি’ লাগা জিতেনের ঝিয়ের মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনায় এর পরিচয় স্পষ্ট—

“শুনলে, জামাইবাড়ি ছিল বুড়ি ঝিনাদায়,

ছ বছর মেলেরিয়া ভুগে ভুগে চিনা দায়,

সেদিন মরেছে শেষে পুরানো সে ওর ঝি,

জিতেন চশমা খুলে বলে ‘আশ্চর্যি’৷

ম্যালেরিয়ার অনুরূপ প্রবল প্রকোপের ছবি পাওয়া যায় ‘ছড়ার ছবি’র ‘খাটুলি’ কবিতায়—

“মাসে দুবার ম্যালেরিয়া কাঁপন লাগায় গায়ে,

ডাগর ছেলে চাকরি করতে গঙ্গাপারের দেশে

হয়তো হঠাৎ মারা গেছে ওই বছরের শেষে;”

‘খাপছাড়া’র ৮৩ সংখ্যক কবিতায়ও ম্যালেরিয়ার অনুরূপ বিভীষিকায় আক্রান্ত হয়ে দেশান্তরী হবার ছবি আছে।

পল্লীজীবনে চিকিৎসার ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং যোগ্য ডাক্তারের নিতান্ত অভাব রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল। চিকিৎসা ও যোগ্য ডাক্তারের অভাবে পল্লীর অবস্থা

ঠিক কেমন দাঁড়ায় তাঁর ছবি আছে ৭৬ সংখ্যক কবিতায়। হাতুড়ে ডাক্তারের কবলে পল্লীর নির্মম পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে কবি লিখেছেন —

"পাড়াতে এসেছে এক নাড়ীটেপা ডাক্তার,
দূর থেকে দেখা যায়
অতি উঁচু নাক তার।

নাম লেখে ওষুধের ,
এ দেশের পশুদের
সাধ্য কী পড়ে তাহা
এই বড়ো জাঁক তার।

যেথা যায় বাড়ি বাড়ি
দেখে যে ছেড়েছে নাড়ি,
পাওনাটা আদায়ের
মেলে না যে ফাঁক তার।
গেছে নির্বাক পুরে
ভক্তের ঝাঁক তার।"

রবীন্দ্রনাথ একারণেই দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। পাশকরা ডাক্তারের নিয়োগের পাশাপাশি আধুনিক ঔষধপত্রের দ্বারা চিকিৎসার যাবতীয় বন্দোবস্ত করেন।

শারীরিক বিকাশের অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যে শরীর চর্চার কথা বলেছেন পল্লীসংগঠন কর্মসূচীতেও তার প্রচলন ঘটান। শরীর চর্চাকে তখন যে অনেকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন তার ছবি আছে 'ছড়ার ছবি'র 'সুধিয়া' কবিতায় —

"সামরু যখন ছোট ছিল পালোয়ানের পেশা

ইচ্ছা করেছিল নিতে,ওই ছিল তার নেশা।

খবর পেল,নবাববাড়ি কুস্তিগিরের দল

পাল্লা দেবে—সামরু শুনে অসহ্য চঞ্চল।"

পল্লীর মানুষের সচেতনতার অভাব , কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস সুস্বাস্থ্যের পথে কতটা অন্তরায় ছিল, তার ছবি এঁকেছেন কবি 'প্রহাসিনী'র 'ভোজনবীর' কবিতায়। বাঙালিকে ভোজনবীর বলে ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ এ কবিতায় জানিয়েছেন—

"মাথা ধরায় মাথার শিরা হোক-না ঝংকৃত,

পেটের নাড়ি ব্যথায় টংকৃত।

ওডিকোলোনে ললাট ভিজে

মাদুলি আর তাগা- তাবিজে

সারাটা দেহ হবে অলঙ্কৃত।

যখন আধিভৈতিকের বাজিবে শেষ ঘড়ি

গলায় যমদৌতিকের দড়ি'

হোমিয়োপ্যাথি বিমুখ যবে,

কবিরাজিও নারাজ হবে'

তখন আবধৌতিকের বড়ি।

তাহার পরে ছেলে তো আছে বাপেরই পথে ঢুকে

অম্লশূলসাধনকৌতুকে।

কাঁচা আমের আচার যত

রহিবে হয়ে বংশগত,

ধরাবে জ্বালা পারিবারিক বুকে।”

পল্লীর আবর্জনাময় পরিবেশ, পানাপুকুরের দুষিত গন্ধ মশা-মাছির সৃজনভূমি হয়ে উঠেছিল। তাই ম্যালেরিয়ার প্রকোপে যকৃত কিংবা লিভারের সমস্যায় ভুগছিল বৃহৎ সংখ্যক মানুষ। তারই ছবি এঁকেছেন কবি ‘প্রহাসিনী’র মশকমঙ্গলগীতিকা’য়।

ধ. গ্রামসংগঠন :

জমিদারের কবলে পড়ে সাধারণ প্রজাদের সর্বস্বান্ত হবার ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন। মামলা মকদ্দমার মাধ্যমে প্রজাদের সর্বস্বান্ত করে সম্পত্তি বৃদ্ধি করে চলার ছবি আছে ‘পুনশ্চ’ কাব্যের ‘বালক’ কবিতায়—

“দশ-আনির টাক-পড়া মোটা জমিদার

লোকে বলে দিঘির স্বত্ব তারই—

বেলা দশটায় সে চাপড়ে চাপড়ে তেল মাখে বুকে পিঠে,

ঝপ করে দুটো ডুব দিয়ে নেয়,

বাঁশবনের তলা দিয়ে দুর্গা নাম করতে করতে চলে ঘরে—

সময় নেই, জরুরী মকর্দমা।

দিঘিটা আছে তার দলিলে, নেই তার জগতে।”

পল্লী জীবনে মামলা মকদ্দমা গ্রামীণ অর্থনীতির কতটা অন্তরায় ছিল তার ছবি আছে ‘খাপছাড়া’র ২৫ সংখ্যক কবিতায়। এ কবিতায় দেখি পরার্থে মামলা চালাতে গিয়ে এক ব্যক্তি স্বর্বস্বান্ত হয়েছেন। তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে কবি লিখেছেন—

“চলেছে উদারভাবে সম্বল-খোয়ানি—

গিনি যায়,টাকা যায়,সিকি যায় দোয়ানি,

হল সারা বাঁটোয়ারা উকিলে ও আমলায়।

গিয়েছে পরের লাগি অন্নের শেষ গুঁড়ো
কিছু খুঁটে পাওয়া যায় ভসি তুষ খুদকুঁড়ো
গোরুহীন গোয়ালের তলাহীন গামলায়।

পল্লীজীবনে জমিদারের বাড়িতে বেগার খাটা বা বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদানের যে নিয়ম চালু ছিল তা ছিল প্রজা স্বার্থের প্রধান অন্তরায়। বিশেষ এক শ্রেণীর জমিদারেরা প্রজার শ্রমকে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার বলে ভেবে নিয়েছিল। শ্রমদানে অস্বীকৃতি কী বিষময় ফলকে তাদের জীবনে ফলিয়ে তুলতো তার ছবি আছে 'ছড়ার ছবি'র 'অচলা বুড়ি' কবিতায়—

"জমিদারের মায়ের শ্রাদ্ধ,বেগার খাটার ডাক,
রাই ডোম্‌নির ছেলে বললে, কাজের যে নেই ফাঁক,
পারবে না আজ যেতে।শুনে কোতলপুরের রাজা
বললে, ওকে যে করেই হোক দিতে হবে সাজা। ...
সাক্ষ্য দিল হরিশ মৈত্র, দিল মাখনলাল—
ডাক লুঠের এক মোকদ্দমায় মিথ্যে জড়িয়ে ফেলে
গোষ্ঠকে তো চালান দিল সাত বছরের জেলে।"

গোষ্ঠর অপরাধ, সে মিশনরীর স্কুলে পড়ে 'কম্পোজিটরের' কাজ শিখে শহরে গিয়ে ঢের আয় করে থাকে। তাঁর শিক্ষিত মন তাই বেগার শ্রমের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু পল্লীর জমিদারের স্বার্থান্বেষী মানসিকতা কত ক্রূর ছিল তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন দীর্ঘদিনের পল্লীবাসে থেকে জমিদারি পরিচালনা করতে গিয়ে। নিজের লোকবল ও অর্থবলকে কাজে লাগিয়ে নানারকম মামলায় জড়িয়ে পল্লীর অসহায় মানুষদের দুরবস্থার অন্ত রাখতো না এরা। মামলার খরচ বহন করতেই সর্বস্বান্ত হতে হত পল্লীর

অসহায় মানুষগুলিকে। একারণেই রবীন্দ্রনাথ ‘মণ্ডলী প্রথা’র প্রচলন করে মামলা মোকদ্দমা গ্রামের মধ্যেই মিটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার বিকাশ ছাড়া যে জমিদারদের এ হেন মানসিকতায় আঘাত হানা যাবে না সেকথা রবীন্দ্রনাথ কতকটা গোষ্ঠর মধ্যস্থতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষকে ‘ছোটলোক’ হিসেবে বিচার করে যে জাতপাতের বেড়াজাল গড়ে তুলেছে তা পল্লীর ঐক্যবদ্ধ বিকাশের যে ঘোর অন্তরায় সে কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন। এ কাব্যের ‘সুধিয়া’ কবিতায়ো দেখি মহাজন পুঁজিপতি দুনিচাঁদ ছেলের বায়না রাখতে গিয়ে অন্যায়ভাবে আইনকে ফাঁকি দিয়ে ডিক্রি জারি করে গোষ্ঠর প্রিয় গোরু সুধিয়াকে হস্তগত করেছে।

এই শোষণ পীড়নের বৃহত্তর এক রূপ হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির শোষণ ও ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির উপলক্ষে মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ইংরেজের কাজের মধ্যেওএর প্রকাশ দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।পল্লীর অর্থনৈতিক জীবনে এই শক্তির ধ্বংসাত্বক যে প্রভাব দেখা গেছিল, তাঁরও ছবি আছে রবীন্দ্র কাব্যে—

“সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকট দর্শন,
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ, ...
গর্জিয়া প্রার্থনা করে
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
আত্মীয়বন্ধন করি দিবে ছিন্ন
গ্রাম-পল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন,
হানিবে শূন্য হাতে বহ্নি-আঘাত,
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ,”

ন. পুকুর সংস্কার :

রবীন্দ্রনাথ পল্লী অঞ্চলে পা দিয়েই দেখেছিলেন গ্রামগুলির হতশ্রী অস্বাস্থ্যকর চেহারা । বিশেষতঃ পল্লীর পুকুরগুলির দুরবস্থা রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়েছিল। গ্রামের যে পুকুরের জল পল্লীর মানুষেরা নিত্য ব্যবহার করতেন, সেগুলি এক অর্থে ছিল এঁদো ডোবা পুকুর। ‘ছড়ার ছবি’র ‘প্রবাসে’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এরই ছবি এঁকেছেন—

"ডোবার মধ্যে পাতা-পচা পাঁক-জমানো জলে

গম্ভীর ঔদাস্যে অলস আছে মহিষগুলি

এ ওর পিঠে আরামে ঘাড় তুলি।"

'সেঁজুতি'র 'ঘরছাড়া' কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথ পল্লীর পুকুরগুলির প্রায় একইরকম বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

"যেতে যেতে পথপাশে

পানাপুকুরের গন্ধ আসে,"

পল্লীর সীমাহীন দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের ফলে সেকালে প্রত্যেক পল্লীপরিবারের স্বতন্ত্র পুকুরই ছিল না। পুকুর-কেন্দ্রিক যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য তাই পল্লীর অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারের পুকুরের উপরই নির্ভর করতে হত। আগাছা আর কচুরিপানায় ভরা পল্লীর পুকুরগুলির দূষিত জল মানুষ প্রতিদিনের কাজে ব্যবহার করতো। এরকমই এক নারীর ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ 'প্রহাসিনী'র 'নারীর কর্তব্য' কবিতায়—

"জনার্দন ঠাকুরের

পানাপুকুরের

পাড়ের কাছে ঢাকা কলমির শাকে।

গা ধুয়ে তাহারই এক ফাঁকে,

ঘড়া কাঁখে,গায়েতে জড়ায়ে ভিজে শাড়ি......

ঘরে ফিরে যায় দ্রুতপায়ে"

এই দূষিত জল ব্যবহারের ফলে পল্লীর মানুষের পেটের ও শরীরের নানাপ্রকার প্রাদুর্ভাব ঘটতো। পল্লীর এঁদো পুকুরের অনুরূপ ছবি আছে 'খাপছাড়া'র ৬ সংখ্যক কবিতায়—

"খেঁদুবাবুর এঁধো পুকুর,মাছ উঠেছে ভেসে;

পদ্মমণি চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল ঠেসে।

আপনি এল ব্যাক্‌টিরিয়া, তাকে ডাকা হয় নাই।

হাঁসপাতালের মাখন ঘোষাল বলেছিল, ভয় নাই।

সে বলে, সব বাজে কথা, খাবার জিনিস খাদ্য—

দশ দিনেতেই ঘটিয়ে দিল দশ জনারই শ্রাদ্ধ।"

রবীন্দ্রনাথ তাই পল্লীর নতুন পুকুর খননের পাশাপাশি পুরনো পুকুর সংস্কারের উপরও জোর দিয়েছিলেন।

প. মানবকল্যাণের অনুকূলে যন্ত্রের ব্যবহার :

রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রের বিরোধিতা করেননি। তিনি চেয়েছিলেন মানবকল্যানের অনুকূলে যন্ত্রের ব্যবহার। তাঁর পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীতে এর ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা মানবকল্যাণ চেয়েছিলেন। কিন্তু সমকালীন শাসকশক্তি এই যন্ত্রকে মানব কল্যাণের বিপরীতে ব্যবহার করায় কবি লিখেছিলেন—

"......এ দিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে

উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে

যন্ত্রপক্ষ হুঙ্কারিয়া নরমাংস ক্ষুধিত শকুনি,

আকাশেরে করিল অশুচি।"[৬০]

একদিন বিধাতা পাখিদের প্রাণ আর পাখিদের গানকে আকাশের সুরে বেঁধে দিয়েছিলেন। তাই 'যুগে যুগে তারা গগনের পথে পথে/ জীবনের বাণী দিয়েছিল আনি/ অরণ্যে পর্বতে'। কিন্তু যে পাখা ছিল প্রকৃতির সুরে রঙে গাঁথা সৃষ্টির নিজস্ব সম্পদ আজ যন্ত্র-পাখা এসে সেখানে বিপত্তি বাধালো—

"আজি একি হল, অর্থ কে তার জানে।

স্পর্ধা-পতাকা মেলিয়াছে পাখা

শক্তির অভিমানে।

তারে প্রাণদেব করেনি আশীর্বাদ।

তাহারে আপনা করে নি তপন,

মানেনি তাহারে চাঁদ।

আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি

কর্কশ স্বরে গর্জন করে

বাতাসেরে জর্জরি।

আজি মানুষের কলুষিত ইতিহাসে

উঠি মেঘলোকে স্বর্গ-আলোকে

হানিছে অট্টহাসে।”[৬১]

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন প্রযুক্তির মানবমুখীন ব্যবহার। কিন্তু যখন তা বিশ্ববিধানের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল, আগুন আর কালো ধোঁয়া যখন ঢেকে দিল আকাশের মুখ, যখন পরিবেশের ভারসাম্য হল বিঘ্নিত, যখন সমগ্র আকাশ জুড়ে চললো মহাবিনাশের অগ্নিযুদ্ধ তখন রবীন্দ্রনাথ এর স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন। তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকে বিশ্ববিধানের পরিপন্থী হিসেবে যন্ত্রের ব্যবহারে কবি বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায়ও প্রার্থনা জানিয়েছেন রুদ্রের কাছে—

“এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায় তলে

রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি

প্রলয়ের রোষানলে।

আর্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন—

শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি

সার্থক হোক পুন।”[৬২]

যন্ত্রের মানবকল্যাণ-নিরপেক্ষ ভূমিকার সমালোচনা আছে 'চিত্রবিচিত্র'র 'উড়োজাহাজ' কবিতায়ও—

“ওরে যন্ত্রের পাখি,

ওরে রে আগুন-খাকী,

একি ডানা মেলি আকাশেতে এলি,

কোন নামে তোরে ডাকি?

কোন রাক্ষুসে চিলে

কী বিকট হাড়গিলে

পেড়েছিল ডিম প্রকাণ্ড ভীম,

তোরে সে জন্ম দিলে।”

খ. রবীন্দ্রগানে পল্লীউন্নয়ন ভাবনা:

রবীন্দ্রসৃষ্টির একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে আছে প্রায় তিন হাজার গান। এই গানের মধ্যেও ধরা আছে তাঁর দেশ উন্নয়ন সম্পর্কিত ভাবনার কিছু প্রতিরূপ। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের গানগুলি ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়নের বা আত্মশক্তি জাগরণের বাণীবহ। ‘গীতাঞ্জলি’,‘গীতিমাল্য,‘গীতালি’তে এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আছে। এ তিনটি কব্যের অধিকাংশ কবিতাগুলিই গান হিসেবে প্রচলিত। তাই পূর্বোক্ত অধ্যায় থেকে সরিয়ে এনে এই অধ্যায়ের মধ্যেই তাদের প্রাসঙ্গিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ক. আত্মশক্তির উজ্জীবন প্রয়াস :

পূর্বে এও বলেছি, রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় সঙ্গে মিশে ছিল জাতির অধ্যাত্মিক উন্নতির পরিকল্পনাও। কারণ তিনি মনে করতেন জাতিকে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারাই ত্যাগে ও বীর্যে সমুন্নত করে তোলা সম্ভব। জানিয়েছেন— “ আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ নাই। এটা কি ধর্মবলেরই একটা লক্ষণ নহে। আধ্যাত্মিকতা কি কেবল জনসঙ্গ বর্জন করিয়া শুচি হইয়া থাকে এবং নাম জপ করে। আধ্যাত্মিক শক্তিই কি মানুষকে বীর্য দান করে না।”[৬৩]

একারণেই হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ একদা জানিয়েছিলেন —

"ঠাকুরকে ঘুম থেকে তোলা, কাপড় পরানো, পাছে তার পিত্তি পড়ে এই ভয়ে যথাসময়ে আদর করে খাওয়ানো ইত্যাদি ব্যাপারের বাস্তবতা আমার মতো লোকের কাছে নেই, তোমাদের কাছে আছে তোমাদের স্ত্রী প্রকৃতির নিরতিশয় প্রয়োজনের মধ্যে—যেমন করে হোক্ সেই প্রকৃতিকে চরিতার্থতা দেবার মধ্যে। প্রাণের বেদনা যে আমার প্রাণেও বাজে না, তা নয়, কিন্তু সে বেদনা যথাস্থানেই কাজ খোঁজে, কাল্পনিক সেবায় নিজেকে তৃপ্ত করবার চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব। আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়,—আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে—সেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণা সত্য, পিত্তিও পড়ে, ঘুমেরও দরকার আছে—যে দেবতা স্বর্গের তাঁর মধ্যে এসব কিছুই সত্য নয়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা করেচেন, সেইখানে নারীর পূজা সত্য হয়েচে। মানুষের মধ্যে যে দেবতা ক্ষুধিত তৃষিত রোগার্ত শোকাতুর, তাঁর জন্যে মহাপুরুষেরা সর্ব্বস্ব দেন, প্রাণ নিবেদন করেন, সেবাকে ভাববিলাসিতায় সমাপ্ত না করে তাকে বুদ্ধিতে বীর্য্যে ত্যাগে মহৎ করে তোলেন। তোমার লেখায় তোমাদের পূজার বর্ণনা শুনে আমার মনে হয় এ সমস্তই অবরুদ্ধ অতৃপ্ত অসম্পূর্ণ জীবনের আত্মবিড়ম্বনা। আমার মানুষরূপী ভগবানের পূজাকে এত সহজ করে তুলে তাঁকে যারা প্রত্যহ বঞ্চিত করে তারা প্রত্যহ নিজে বঞ্চিত হয়। তাদের দেশের মানুষ একান্ত উপেক্ষিত, সেই উপেক্ষিত মানুষের দৈন্যে ও দুঃখে সে দেশ ভারাক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে সকল দেশের পিছনে পড়ে আছে।"[৬৪]

কবি রবীন্দ্রনাথ তাই কর্মের পথেই মানবরূপী দেবতার সেবার দ্বারা তাঁর ঈশ্বরের প্রতি, প্রভুর প্রতি ভালোবাসাকে ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন। মানবের মাঝেই তো তার সহাবস্থান। তাই জানিয়েছিলেন—

"ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা

প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে।"[৬৫]

পল্লীর মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে গভীর ভালোবাসা তা তাঁর পরমের প্রতি ভালোবাসারই নামান্তর। জীবনের প্রথম পর্বে অন্তরের 'নিরুপমা সৌন্দর্যপ্রতিমা'র প্রেরণায় যে মানবসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে সে প্রেরণা যোগ আরো গভীর হয়ে এসেছে অধ্যাত্মপর্বে রচিত কবিতা ও গানে। পূজার ৩৬৩ সংখ্যক গানে রবীন্দ্রনাথ একারণেই জানিয়েছিলেন—

" বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।। ......

সবার পানে যেথায় বাহু প্রসারো

সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারও।”

কিন্তু সেই ঈশ্বরের সন্তান আজ পরমুখাপেক্ষী—ভিক্ষার ধনেই দিনাতিপাতে অভ্যস্ত। পরের কাছে আত্মবিক্রয় আর মনুষ্যত্ব বর্জিত দাসত্বকে মেনে নিয়ে পশুপ্রায় জীবনযাপন করে চলেছে। আর তাই কবির চোখে পড়েছে—

“আজি এ ভারত লজ্জিত হে,

হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে।।

নাহি পৌরুষ, নাহি বিচারণা কঠিন তপস্যা, সত্যসাধনা—

অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মেসকলই ব্রহ্মবর্জিত হে।।”[৬৬]

দেশ তথা জাতিকে—পল্লীর মানুষকে এই দাসত্ব ওপরনির্ভরতা থেকে মুক্ত করে আত্মশক্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন | ১৯২৮-এ লেখা একটি গানে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—

“ বাহিরের এই ভিক্ষা-ভরা থালি এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,

অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে

প্রভু, তোমার দানে,তোমার দানে, তোমার দানে।”[৬৭]

এই মূল্যবান সম্পদ অর্জনই রবীন্দ্রনাথের কাছে ‘সোনার হরিণ’ লাভের সাধনার নামান্তর। তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন—“তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই”| সে পথেই আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠে রাজা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অধিক।

অন্তরের শক্তিতে বলীয়ান হতে পারলেই বাইরের অত্যাচার আর পীড়ন আমাদের কাছে গৌণ হয়ে যায়। শারীরিক পীড়নের বাইরে আত্মশক্তির সেই অবিনশ্বরতার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘গীতবিতানে’র ‘পূজা’ পর্যায়ের ১৯৮ সংখ্যক গানে, যা রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’ নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠে প্রযুক্ত হয়েছে—

“ তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।

তোর মারে মরম মরবে না।।

তাঁর আপন হাতের ছাড়চিঠি সেই যে

আমার মনের ভিতর রয়েছে এই যে,

তোদের ধরা আমায় ধরবে না।।"

সাম্রাজ্যবাদী শিক্তিকে, তার পীড়নকে এভাবেই জয় করার কথা বলেছিলেন 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয় বৈরাগী। তাঁর এই পন্থা আসলে গান্ধী পন্থারই নামান্তর। পরাধীন পল্লীর মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মত রবীন্দ্রনাথও আত্মশক্তির উপর নির্ভরতার কথা বলেছিলেন। এই আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেই নিছক শারীরিক পীড়নের ভয় আর ভয় বলেই মনে হবে না। তখন নিঃসংশয়ে উচ্চারণ করা যায়—

"আমি মারের সাগর পাড়ি দেব ভীষণ ঝড়ের বায়ে

আমার ভয়ভাঙা এই নেয়ে।।"[৬৮]

রবীন্দ্রনাথ বিপদ-প্রতিবন্ধকতায় ঈশ্বরের কাছে করুণ প্রার্থনা নয়, মানুষের অন্তর্গত আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে তার মোকাবিলার মানবিক প্রয়াসের উপরই অধিক জোর দিতে চেয়েছেন। গানের মধ্যেই ধরা আছে সেই বিশ্বাসের সুর—

"বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা—

বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,

দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।।"[৬৯]

কিন্তু সমকালীন দেশনেতাদের মধ্যে অনুরূপ কোন চেতনা-উদ্গমের অবশেষকে দেখতে পাননি রবীন্দ্রনাথ। তাঁরা দেশের প্রকৃত সমস্যার সমাধান অপেক্ষা কেবল লোকহিতকারীর অহংবোধ নিয়েই দেশের উদ্ধারের কাজে নেমেছিলেন। কিন্তু দেশ বলতে রবীন্দ্রনাথ দেশের যে আপামর বৃহৎ সংখ্যক মানুষের কথা বলেছেন, সেই 'ছোটোর উপকার করিতে হইলে' যে অহংবোধকে বিসর্জন দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, ত্যাগের পথই যে দেশনেতাদের অবলম্বনীয় হওয়া আবশ্যক সে কথা বার বার বলেছেন—

"এস' দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা।

মহাভিক্ষু, লও সবার অহঙ্কার ভিক্ষা।"[৭০]

এর কারণ ব্যাখ্যা পাই 'পূজা' পর্যায়ের ৪৯০ সংখ্যক গানে। রবীন্দ্রনাথের আত্মগত ক্ষেদোক্তি যেন সমকালীন দেশনেতাদের কার্যাবলী ও মানসিকতার প্রতিবাদ হয়ে দেখা দিয়েছে এ গানে—

" অহঙ্কার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের

রিক্ত ভূষণ দীন দরিদ্র সাজে

সবার পিছে, সবার নীচে সব হারাদের মাঝে।।

ধনে মানে যেথায় আছে ভরি সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি,

সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে

সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে

সবার পিছে,সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।।"

রাজনৈতিক বুলি কপচিয়ে, আত্ম-আস্ফালনের দ্বারা দেশের যে প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়, তা রবীন্দ্রনাথ বার বার তাঁর রচনায় স্পষ্ট করেছেন। পূর্বোক্ত আলোচনাই তাঁর স্বাক্ষর দেবে। 'গীতবিতানে'র 'স্বদেশ' পর্যায়ের ২৭ সংখ্যক গানে রবীন্দ্রনাথ এরই প্রতিধ্বনি করেছেন—

'ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি,

দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী।।

মরিস মিথ্যে ব'কে ঝ'কে, দেখে কেবল হাসে লোকে,

নাহয় নিয়ে আপন মনের আগুন মনে মনেই জ্বললি।।

অন্তরে তোর আছে কী যে নেই রটালি নিজে নিজে,

নাহয় বাদ্য গুলো বন্ধ রেখে চুপেচাপেই চললি।।

কাজ থাকে তো কর্ গে না কাজ, লাজ থাকে তো ঘুচা গে লাজ,

ওরে, কে যে তোরে কী বলেছে নেই বা তাতে টললি।"

রবীন্দ্রনাথ তাই জানিয়েছিলেন প্রত্যেক দেশনেতা যদি আমাদের দেশের যে বৃহত্তর অঞ্চল পল্লীগ্রাম, তার কোন একটি অঞ্চলের বা পল্লীর উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহলেই কৃষিপ্রধান পল্লীপ্রধান ভারতবর্ষের যথার্থ উন্নয়ন ঘটবে। কিন্তু তার জন্য যে বৃহৎ স্বার্থত্যাগ ও সঙ্কল্পে অটল আস্থার প্রয়োজন ছিল, তা হাতে গোণা দু-একজন ছাড়া তৎকালীন অধিকাংশ দেশনেতাদের মধ্যেই দেখতে পাননি। তাঁর আহ্বানকে সেদিন কবির খামখেয়ালিপনা বলে উপহাস করা হয়েছে। কবি তাই 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় লিখেছিলেন—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।

একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।।

যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,

যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়—

তবে পরান খুলে

ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।।

যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,

যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—

তবে পথের কাঁটা

ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে।।"[৭১]

এ বিশ্বাসকে কবি কেবল নিজের মধ্যে নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও জাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবি যেমন দেশের সাধারণ মানুষের মনে আশা ও বিশ্বাসকে সঞ্চারিত করে তাদের আত্মউজ্জীবন ঘটাতে চেয়েছিলেন, গানেও তেমনি ভাবেই বলেছেন—

"নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।

যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।

ওরে মন, হবেই হবে।।

পাষাণসমান আছে পড়ে, প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে,

আছে যারা বোবার মতন তারাও কথা কবেই কবে।"[৭২]

কিন্তু এই পথের পথিকের পক্ষে হঠাৎ সাফল্য লাভের আশা ছিল ক্ষীণ । ঘরে বাইরে এই পথের পথিকের সামনে যে দুস্তর বাধা নেমে আসবে, পথ যে কঠিন হয়ে পড়বে এ কথা বলাকার সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ বলে আসছিলেন। কিন্তু নিশ্চেষ্টতা ও আলস্যই যে সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ নয়, তা রবীন্দ্রনাথ বারে বারে বলেছেন।'স্বদেশ' পর্যায়ের ৪ সংখ্যক গানে রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন—

শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের প্রাণী -

হয়তো তোমার আপন ঘরে

পাষান হিয়া গলবে না।

বন্ধ দুয়ার দেখলি ব'লে অমনি কি তুই আসবি চলে—

তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে,

হয়তো দুয়ার টলবে না।।"

কিন্তু বারে বারে ঠেলতে ঠেলতেই যে 'নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার' একদিন উদ্ঘাটিত হবেই, সেই ভরসাটুকু রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক গানের মধ্যেই প্রতিধ্বনিত করেছেন— 'নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন, হবেই হবে'। একদিন একজনের হাতে কাটা খালেই সামাজিক বিপ্লব আসবে। একজনের প্রদর্শিত পথেই সকলেই হাঁটবে। একারণেই রবীন্দ্রনাথ দু-একটি গ্রাম বেছে নিয়ে মডেল গ্রাম তৈরির দ্বারা সারা ভারতবাসীকে দেশোন্নয়নের মার্গ দর্শন করাতে চেয়েছিলেন। গানের মধ্যে আছে এরই স্পষ্ট আভাস—

"পাষাণ সম আছে পড়ে, প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে,

আছে যারা বোবার মতন তারাও কথা কবেই কবে।।.........

ঘন্টা যখন উঠবে বেজে দেখবি সবাই আসবে সেজে—

এক সাথে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে।।"[৭৩]

আমাদের শক্তি যে ফুরিয়ে যায়নি, পরের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তির মত হীন অবস্থা যে এখনো এসে পৌঁছয়নি, সে বিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথ স্থিত থেকেছেন। আমাদের অবশিষ্ট শক্তিকে জাগিয়ে তুলে দেশমাতৃকার পায়ে সঁপে দেওয়ার কথা বলেছেন—

"কিছু মোর নেই ক্ষমতা সে যে ঘোর মিথ্যে কথা,

এখনো হয়নি মরণ শক্তিশেলে—

আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি চরণে তোর দেব মেলে।"[৭৪]

আত্মশক্তি ও আত্মসম্মানবোধের উজ্জীবন প্রয়াস আছে 'জাতীয় সংগীত' পর্যায়ের ৪ নং গানে। এ গানে রবীন্দ্রনাথ জাতির ভীরুতা, আত্মসম্মানহীনতা, স্বদেশ প্রীতির নিতান্ত অভাব দেখে তাকে পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্খায় উচ্চারণ করেছেন—

"একি অন্ধকার এ ভারতভূমি!

বুঝি, পিতা, তারে ছেড়ে গেছ তুমি।

প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে— কে তারে উদ্ধার করিবে।। ....

দেখো চেয়ে তব সহস্র সন্তান লাজে নতশির, ভয়ে কম্পমান,

কাঁদিছে সহিছে শত অপমান—লাজ মান আর থাকে না।

হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া, তোমারেও তাই গিয়াছে ভুলিয়া,

দয়াময় ব'লে আকুল হৃদয়ে তোমারেও তারা ডাকে না।"

আত্মসম্মান ও নিজের মধ্যেকার নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য কবিতার পাশাপাশি গানের মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথ দেশ ও জাতির অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন—

"কী আনন্দ গান উঠিত গগনে, কী প্রতিভাজ্যোতি ঝলিত।

ভারত-অরণ্যে ঋষিদের গান   অনন্ত সদনে করিত প্রয়াণ—

তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া   সকলে মিলিয়া চলিত।”[৭৫]

দেশজননীর সমৃদ্ধি আনবেন যাঁরা, রবীন্দ্রনাথ তাদের মধ্যে আত্মত্যাগ ও দুঃখ স্বীকারের পরিবর্তে দেখেছিলেন কপট অহমিকা আর মিথ্যার চাতুরীকে, দেখেছিলেন তাদের বচনসর্বস্বতাকে। ‘গীতবিতানে’র ‘জাতীয় সংগীত’ পর্যায়ের ১০ সংখ্যক গানে তাই লিখেছেন —“এরা কী দেবে তোরে! কিছু না, কিছু না। মিথ্যা কবে শুধু হীনপরানে”। পরানুকরণ বা পরের দাসত্ব ভুলে দেশমাতার বন্দনার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ‘জাতীয় সংগীত’ পর্যায়ের ১১ সংখ্যক গানেও—

“বিশকোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে   রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,

বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে   দশ দিক সুখে হাসিবে।”

কিন্তু দেশমাতৃকাকে ভুলে পরের ভাষা ওঐতিহ্য নিয়ে আজ সকলে মাতামাতি করে। নিজের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে অপমান করে।ব্যথিত হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ এরই প্রতিকার কল্পে লিখেছেন—

“কাহার সুধাময় বাণী   মিলায় অনাদর মানি।

কাহার ভাষা হায়   ভুলিতে সবে চায়।.........

ক্ষণের স্নেহ-কোল ছেড়ে রুচে না মুখে আর।

সে যে আমার জননী।”[৭৬]

এই প্রতিবন্ধকতাকে দূর করার জন্যই দেশের স্বার্থে আত্মত্যাগের পন্থাকেই শ্রেয় পন্থা বলে মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের দেশীয় শিক্ষা ও আবহমান সংস্কৃতির উজ্জীবনের পথেই যে আমাদের সব প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব –এই বিশ্বাসে স্থিত থেকেছেন। উচ্চারণ করেছেন—

“দাও আমাদের অভয় মন্ত্র, অশোক মন্ত্র তব ।

দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র, দাও গো জীবন নব।

যে জীবন ছিল তব তপোবনে ,   যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,

মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবন, চিত্ত ভরিয়া লব।”[৭৭]

খ. রাজনৈতিক স্বাধীনতা :

রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তি বিকাশের অন্যতম পন্থা হিসাবে অপরাপর প্রয়োজনের পাশপাশি রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকার করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ ও পীড়ন দুর্বল জাতির কিংবা সভ্যতার প্রগতির রথকে আটকে দিয়ে তাদের স্বার্থের সিদ্ধি চায়। কিন্তু বহুকে বঞ্চিত করে যে ধন কয়েকজন সুবিধাবাদী দখল করতে চায়, তা যে চিরস্থায়ী হবে না— এ বিষয়ে কবি নিশ্চিত।শোষিত পীড়িত মানুষই যে একদিন এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, তাদের ধন ছিনিয়ে নেবে—এই বিশ্বাসকে মানুষের মনে গেঁথে দিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সব অপমান ও বন্ধনকে মানুষই একদিন সরিয়ে ফেলবে-এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের গানে স্পষ্ট :

"নীচে বসে আছিস কে রে, কাঁদিস কেন?

লজ্জাডোরে আপনাকে আপনাকে রে বাঁধিস কেন?......

ধূলার 'পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে—

বিনা অস্ত্র বিনা সহায় , লড়তে হবে।।"[৭৮]

এই কঠিন লড়াইয়ের পথে থাকবে অনেক দুঃখ, অনেক আত্মত্যাগ। কিন্তু বন্ধুর কঠিন সেই পথ অতিক্রম করতে হলে আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠা নিতান্ত জরুরি । গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেই বাণীকেই ঘোষণা করেছিলেন সেদিন—

" তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,

তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।

ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,

হয়তো রে ফল ফলবে না।।

আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই বলেই কি রইবি থেমে—

ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি,

হয়তো বাতি জ্বলবে না।।"[৭৯]

এই বারে বারে বাতি জ্বালার প্রয়াসের মধ্যেই আছে সমাজের স্থবিরতাকে, পরাধীনতার আত্ম-অবমাননাকে অতিক্রম করে চলিষ্ণুতার অভিজ্ঞান। দেশকে সেই প্রাণহীন

স্থবিরতা থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য, একদা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন স্বদেশচেতনা-উদ্দীপক বেশ কিছু গান—

"এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' ব'লে ভাসা তরী।।
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে, ভাই, ডাক দে আজি—
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে, খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি।।
দিনে দিনে বাড়্ল দেনা, ও ভাই, করলি নে কেউ বেচা কেনা—
হাতে নাই রে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন ক'রে—
ওরে, দে খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি।।"[৮০]

স্বদেশ পর্যায়ের ৩৬ সংখ্যক গানেও দেখি আত্মশক্তির উপর নির্ভর করেই রবীন্দ্রনাথ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। শারীরিক পীড়নের ভয়কে জয় করা তখনিই সম্ভব যখন অন্তরের অমলিন আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হয়। এই অন্তর্গত শক্তির সহনশীলতাই শোষক বা পীড়কের শোষণ বা পীড়নের সীমারেখা নির্দেশ করে দেয়। সেই সীমা পেরিয়ে গেলেই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান আসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখ দিয়ে তাই জানিয়েছেন—

"যা খুশি তাই করতে পারো গায়ের জোরে রাখো মারো—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে তিনি যা সন সেটাই সবে।।"

আসলে রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক মন শক্তি কিংবা ধনের বিষম বন্টনের বিরুদ্ধে সাম্যবাদী মানসিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। জানিয়েছেন—"তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই , রবার যেটা সেটাই রবে"। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ক্যাপিট্যালিষ্ট দেশগুলির প্রাণের আনন্দ বর্জিত নিছক বস্তুসম্পদ সঞ্চয়প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারেননি। 'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ মানসিকতার স্পষ্ট প্রকাশ আছে। ধনতান্ত্রিক স্বার্থ চরিতার্থতার লক্ষ্যে এ বিশ্বের বিধানকে উল্লঙ্ঘন করে যাওয়ার কুফল দেখানো হয়েছে 'মুক্তধারা' নাটকে। 'স্বদেশ' পর্যায়ের ৩৬ সংখ্যক গানেও দেখি এরই স্পষ্ট প্রতিধ্বনি—

“অনেক তোমার টাকাকড়ি, অনেক দড়া অনেক দড়ি,

অনেক অশ্ব অনেক করী—অনেক তোমার আছে ভবে।

ভাবছ হবে তুমিই যা চাও, জগৎটাকে তুমিই নাচাও—

দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে হয়না যেটা সেটাও হবে।।”

প্রায় পূর্বোক্ত রবীন্দ্রকথার প্রতিধ্বনি আছে ‘স্বদেশ’ পর্যায়ের ৪৩ সংখ্যক গানে। ইংরেজের অত্যাচার ও পীড়ন যতই বাড়বে ততই যে এদেশের মানুষ সচেতন হয়ে উঠবে, সংঘশক্তি আরো মজবুত হবে , তারই বার্তা আছে এ গানে—

“ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে গড়বে ততই দ্বিগুন করে,

ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে ঢেউ উঠবে।”

প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে দেশের আপামর মানুষের হাত ধরেই আসা সম্ভব -এ ভাবনা রবীন্দ্রনাথের। তাই যে দেশের অধিকাংশ মানুষ পল্লীতে বাস করে , তাদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছতে না পারলে, তাদের একতার বাঁধনে বাঁধতে না পারলে , তাদের দুঃখকে নিজেদের দুঃখ হিসেবে জীবনে গ্রহণ না করলে, দেশনেতাদের পক্ষে যে দেশের বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে আন্দোলনের পথে আনা সম্ভব নয় তা রবীন্দ্রনাথ জানতেন।‘বিচিত্র’ পর্যায়ের ৬৪ সংখ্যক গানে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

“আমাকে যে বাঁধবে ধরে , এই হবে যার সাধন,

সে কি অমনি হবে।

আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,

সে কি অমনি হবে।।”

দেশের দুর্দশা দূর করার জন্য , পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দেশের উন্নয়নের জন্য কংগ্রেসী আবেদন-নিবেদন নীতিকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেননি। নিজের আত্মশক্তি বা স্ব-ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠা ভিন্ন ভিক্ষার হীন পন্থা রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রহণীয় হয়নি। তাই গানের মধ্যে তিনি বলেছেন—

"আবেদন আর নিবেদনের থালা ব'হে ব'হে নতশির।

কাঁদিয়ে সোহাগ, ছি ছি একি লাজ! জগতের মাঝে ভিখারির সাজ—

আপনি করিনে আপনার কাজ, পরের পরে অভিমান।।"[৮১]

দেশের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য মানুষকে যে প্রাণের জোরে প্রথমে আত্মশক্তির উপরই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে , এ গানে রবীন্দ্রনাথ তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন—

" 'দাও দাও' বলে পরের পিছু পিছু কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না তো কিছু—

মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও, প্রাণ আগে করো দান।।"[৮২]

গ. চেতনার স্বাধীনতা :

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনায় আত্মশক্তির জাগরণের অন্যতম উপায় হিসেবে আমাদের চেতনার স্বাধীনতার কথা বলেছেন। চেতনাকে সঙ্কীর্ণতার ঘেরাটোপ থেকে যতই মুক্ত করা যায়, ততই আমাদের প্রাণে বৃহৎ চেতনার পরশ এসে লাগে। সেই বৃহতের স্পর্শে চৈতন্যের যে শুদ্ধিকরণ ঘটে, তা সত্তার কাছে পরম মূল্যবান এক শক্তি হয়ে ধরা পড়ে। কারণ 'চৈতন্যে মড়ক' সত্তা কিংবা সমাজের বিকাশ-প্রগতির প্রধান অন্তরায়।

চৈতন্যের এই বৃহৎ প্রসৃতির কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, গান - সর্বত্রই বলেছেন। চৈতন্যের প্রসার কীভাবে সত্তার আলোকময় নব জীবনবর্তিকাকে প্রজ্জ্বলিত করে তার ছবি আছে 'পূজা' র **১০৯** সংখ্যক গানে—

"প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে

মোরে আরো আরো আরো আলো দাও প্রাণ।

তব ভুবনে তব ভবনে

মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।।"

মনের এই সংকীর্ণতা মুক্তির জন্য চাই ত্যাগ ও দুঃখদহনের। এই ত্যাগের পথাবলম্বনের কথাই কিন্তু বার বার দেশীয় নেতাদের বলে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। সে মহত্তর প্রচেষ্টার আনন্দালোক একবার চোখে এসে লাগলে সাংসারিক স্বার্থ আর বস্তুসম্পদ সঞ্চয়ের নিরর্থকতা সহজেই প্রতীয়মান হবে। জীবনের মহত্তর আকাঙ্খার জন্য মন প্রস্তুত হয়ে

উঠবে। বৃহত্তর মঙ্গলকে তখনি অন্তরে স্থান দেওয়ার জন্য প্রাণ লালায়িত হয়ে উঠবে— যেমনভাবে প্রাণ লালায়িত হয়ে উঠেছিল গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রে। মনের শক্তি তখন অযুত পরিমাণে বেড়ে যাবে। 'পূজা'র ২২০ সংখ্যক গানে রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন—

" যে রাতে মোর দুয়ার গুলি ভাঙল ঝড়ে

জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে।।

সব যে হয়ে গেল কালো, নিবে গেল দীপের আলো,

আকাশপানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে?

অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি।

ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি।"

চৈতন্যের উন্মীলনই আমাদের চালিত করে বৃহৎ বিশ্বের দিকে। পৃথিবীর নব নব জ্ঞানের বিকীরণ সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরি করে। তখনি প্রাণের মাঝে জাগে জিজ্ঞাসার স্ফুলিঙ্গ—

"আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে।

বলে শুধু, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে।।"[৮৩]

এই জানার আগ্রহ, জিজ্ঞাসার স্ফুলিঙ্গ জাগায় চেতনা, আর চেতনা আনে প্রগতি। সামাজিক প্রগতির স্বার্থে একারণেই রবীন্দ্রনাথ দেশের অশিক্ষিত অজ্ঞ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের সর্বাগ্রে চৈতন্যের মুক্তি বা স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছেন। সে স্বাধীনতা একবার অর্জিত হলেই জাত-পাত, দলাদলি, হিংসার সঙ্কীর্ণ বাতাবরণকে দূরে সরিয়ে সর্বমানবের সঙ্গে এক নিবিড় প্রাণ-ঐক্যের অনুভূতি অন্তরে জাগে। সেই উপলব্ধির কথাই ব্যক্ত হয়েছে 'প্রকৃতি' পর্যায়ের ৮ সংখ্যক কবিতায়—" আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ, / তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান"। আর তখনি মনে হয়—

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর।

আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর।"[৮৪]

সব বিভেদ ভুলে, সব বিরোধ ভুলে তখনি মানুষ এক বৃহৎ বিশ্বপরিবারের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। মানুষের প্রাণে জাগে আন্তর্জাতিকতাবোধ। দেশের উন্নয়ন কর্মে এই আন্তর্জাতিক মনের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

ঘ. কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস :

'চৈতন্যে মড়ক' লাগা থেকে রেহাই দিতে রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যেকার নানা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের মূলকে উৎপাটিত করতে চেয়েছিলেন। জাত-পাতের বিনাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। 'পূজা'র ১৪৬ সংখ্যক গানে এরই ছবি ধরা আছে—

"আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে

ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।

আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে

যদি আমায় পড়ে তাহার মনে

বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।।"

এ খানে যে ঘরের কথা বলে হয়েছে, সে ঘর হল মনের ঘর। মনের কলুষ মুক্তির কথা বা তার প্রয়োজনীয়তার কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই কুলুষ মুক্তি আমদের মধ্যে সঞ্চার করে শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলীকে। এই শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলীই আমাদের রাজা করে দেয়। আর রবীন্দ্রসাহিত্যে 'রাজা'র সঙ্গে মিলনের 'সত্ত্ব'ই তো তাই—

" আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,

নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী সত্বে।–"

রবীন্দ্রনাথের রাজা আসলে এমন কতকগুলি শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলীর সমবায়িক ধারণা, যার উদ্গম ঘটলে প্রয়োজন হয় না কোনো সামাজিক শাসনের, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের। রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ পল্লীপরিকল্পনা করেছিলেন, তার প্রতিটি মানুষকে অনুরূপ আদর্শের অনুকূলে বিকশিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। মানুষের সকল কুসংস্কারমুক্তির দ্বারা তার পূর্ণ বিকাশের বন্দোবস্ত করেছিলেন। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ মানববিশ্ব গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে আর্থিক বিকাশ এবং মানবিক গুণাবলী বিকাশের ভারসাম্য রক্ষায় কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

'স্বদেশ' পর্যায়ের ১১ নং গানে রবীন্দ্রনাথ তাই জানিয়েছেন—

"সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,

সঙ্কটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মান।

মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।"

'আপনা মাঝে শক্তি ধরো' আসলে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার দিকনির্দেশ। মাঝে মাঝে এ দেশ হয়তো আত্মবিস্মৃতির কারণে তার আধিপত্য ও গৌরবকে হারিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস—

"নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার

জানি জানি তোর বন্ধনডোর ছিঁড়ে যাবে বারে বার।।

ক্ষণে ক্ষণে তুই হারায়ে আপনা সুপ্তিনিশীথ করিস যাপনা—

বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার।।"[৮৫]

এর জন্যই প্রয়োজন প্রগতি চেতনার। প্রয়োজন শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের বাইরে গিয়ে মুক্ত দৃষ্টিতে জীবনের নিত্য নতুন প্রগতিশীলতাকে বহন করে আনার শক্তি। 'বিচিত্র' পর্যায়ের ১১৪ নং গানে অনুরূপ চেতনাসম্পন্ন মানুষের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন—

"দেশে দেশে নিন্দে রটে, পদে পদে বিপদ ঘটে—

পুঁথির কথা কই নে মোরা ,উলট কথা কই।।

জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে, সকল-অনাসৃষ্টি।

ছুটি নিলেন বৃহস্পতি, রইল শনির দৃষ্টি।

অযাত্রাতে নৌকো ভাসা, রাখি নে, ভাই, ফলের আশা—

আমাদের আর নাই যে গতি ভেসেই চলা বই।।"

রবীন্দ্রনাটকে অনুরূপ শ্রেণীর চরিত্রসৃষ্টির দৃষ্টান্ত হল ঠাকুরদা চরিত্র। মুক্তমনা এই মানুষটির জাত-পাত-বিভেদ অতিক্রমী মানসিকতা ও জীবনের আনন্দময় রসচেতনার প্রতি পক্ষপাত সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীতে অনুরূপমনের

মানুষের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। জাত পাতের বেড়াজালে শতচ্ছিন্ন পল্লীর নিরানন্দ জীবনে আনন্দ ও আলো সঞ্চারের ক্ষেত্রে এঁদের নিতান্ত আবশ্যকতা রয়েছে। 'নাট্যগীতি' পর্যায়ের ৯২ এবং ৯৩ নং গানে এর পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

ঙ. শিল্প :

দেশীয় শিল্পের বিকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রযত্নের অন্ত ছিল না। বঙ্গভঙ্গের সমকালে বিদেশী পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্যের ব্যবহারের হিড়িক পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বঙ্গভঙ্গের সময়কার নিছক বয়কট আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। ' ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের মানসচরিত্র নিখিলেশের কার্যকলাপে এর স্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। তিনি বিদেশী পণ্য বর্জন করে দেশীয় উদ্যোগে পণ্য উৎপাদনের উপর জোর দিয়েছিলেন, যা পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে দেশীয় শিল্পোদ্যোগে রূপলাভ করেছিল। বিদেশী পণ্যের বিপুল সমাহারে সেদিন দেশীয় শিল্পগুলি মরতে বসেছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেশীয় শিল্পের বিনাশ সাধনের যাবতীয় উদ্যোগ নিয়েছিল। এমতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ দেশীয় শিল্পকে বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। দেশকে, দেশের প্রতিটি জিনিস প্রত্যেক মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও ঐক্যকে জাগিয়ে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ অনেক দেশাত্মবোধক গান লিখেছিলেন। 'স্বদেশ' পর্যায়ের ১ নং গানে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

"আমার সোনার বাংলা , আমি তোমায় ভালোবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।......

ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে,

সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,

তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,

মরি হায়, হায় রে—

ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা তোমার রাখাল তোমার চাষী।।

ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে—

দে গো তোর পায়ের ধূলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে।

ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,

মরি হায়, হায় রে –

আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা, তোর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি।।"

চ. জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা :

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন পল্লীর মানুষের জাত-পাত, অস্পৃশ্যতা তাদের মধ্যে একতা গড়ে তুলতে পারেনি। এই ভেদ বুদ্ধি দূর করার অভিপ্রায় বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই তাঁর গানের মধ্যে স্পষ্ট শরীর ধারণ করেছিল। পূর্বোক্ত গানের মধ্যেকার 'আমার যে ভাই তারা সবাই' কথাটির মধ্যে এর স্পষ্ট প্রকাশ আছে। অনুরূপ চেতনার প্রকাশ দেখা যায় নিম্নোক্ত গানটিতেও—

"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে ?।.........

সেই প্রাণের টানে টেনে আনে—সেই প্রাণের বেদন জানে না কে?।

মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে—

সেই নবীন আশে হৃদয় হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।।"[৮৬]

স্বদেশ পর্যায়ের ২ সংখ্যক গানেও তাই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভূমিকে 'বিশ্বময়ী' রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং দেখেছেন তাতে 'বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা'। এই বিশ্বময়ীর কোলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ কে দূরে সরিয়ে একত্র মিলনের ছবি পাওয়া যায় স্বদেশ পর্যায়ের 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' , 'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে', 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল' ইত্যাদি গানের মধ্যে।

আসলে মানুষকে সম্মান দান না করলে যে তারাও দেশনেতাকে সম্মান জানাবে না , ছোটর সমান হতে না পারলে যে ছোটর উপকার করা সম্ভব নয়, একথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকহিত'-এর মতো একাধিক প্রবন্ধে বারে বারে বলেছেন। স্বদেশ পর্যায়ের ১০ নং গানে রবীন্দ্রনাথ এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন—

"রাজা সবারে দেন মান,   সে মান আপনি ফিরে পান,

মোদের খাটো করে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে—

নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী সত্ত্বে?"

গানটি রবীন্দ্রনাথের 'রাজা নাটকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। রাজাও কিন্তু তাঁর প্রজাদের উপর বলপ্রয়োগ নয়, রাজা হয়ে ওঠার স্বাধীনতা ও অবকাশ দিয়েছেন। জাত-পাত বিভেদ ভুলে সবাইকে রাজা সমান অধিকার ও সম্মান বিতরণের মাধ্যমেই তাদেরকে সংগঠিত করতে চেয়েছেন। দেশের কাজে ঠিক এমনি ভাবেই জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা ভুলে ঐক্যচেতনায় উদবুদ্ধ হবার কথা বলেছেন কবি স্বদেশ পর্যায়ের ১৫ নং গানে। 'মহামানবের সাগরতীর' দাঁড়িয়ে ভারতের মহান ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ গানে আহ্বান জানিয়েছেন —

" এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান।

এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীষ্টান।

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।

এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান ভার।

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,   মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা

সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—

আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।"

অনুরূপ রবীন্দ্র-ভাবনার প্রতিফলন আছে 'গীতবিতানে'র 'জাতীয় সংগীত' পর্যায়ের ৭ নং গান— 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'-এর মধ্যেও। দেশের মুক্তির জন্য সকল মানুষেরই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভূমিকা রয়েছে। তাই তাদের জড়তা মুক্তি, সংস্কার মুক্তি অনিবার্য। 'স্বদেশ' পর্যায়ের ১৮ নং গানে রবীন্দ্রনাথ তাই আহ্বান জানিয়েছেন—

"পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও

নিয়ে যাও সাথে করে—

কেহ নাহি আসে, একা চলে যাও

মহত্ত্বের পথ ধরে।

পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন,

ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন—

সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন,

মিছে নয়নের জল ভাই!

আগে চল্ আগে চল্ ভাই ।।

চিরদিন আছি ভিখারির বেশে

জগতের পথপাশে—

যারা চলে যায় কৃপা চোখে চায়,

পদধূলা উড়ে আসে।

ধূলি শয্যা ছেড়ে ওঠো ওঠো সবে

মানবের সাথে যোগ দিতে হবে—

তা যদি না পারো চেয়ে দেখো তবে

ঐ আছে রসাতল ভাই!

আগে চল্, আগে চল্ ভাই।।"

ছ. উৎসব :

পল্লীর নিরানন্দ জীবনে আনন্দের সঞ্চারের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে নানারকম উৎসবের প্রচলন বা আয়োজন করেন, তারও পরিচয় আছে রবীন্দ্রনাথের গানে। বসন্ত উৎসব তাদের মধ্যে অন্যতম। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে প্রতিবছর বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়—যা অদ্যাবধি চলে আসছে। এই উৎসবে আশ্রমবাসীদের পাশাপাশি পল্লীর মানুষেরাও অংশগ্রহণ করতেন এবং আনন্দে মেতে উঠতেন। এই উৎসবের বিবরণ আছে 'গীতবিতানে'র একাধিক গানে। 'প্রেম' পর্যায়ের ২২০ নং গানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

" লাগিল দোল জলে স্থলে,   জাগিল দোল বনে বনে –

সোহাগিনীর হৃদয়তলে বিরহিনীর মনে মনে।

মধুর মোরে বিধুর করে   সুদূর কার বেণুর স্বরে,

নিখিল হিয়া কিসের তরে দুলিছে অকারণে।

আনো গো আনো ভরিয়া ডালি করবীমালা লয়ে,

আনো গো আনো সাজায়ে থালি কোমল কিশলয়ে।

এসো গো পীত বসনে সাজি,   কোলেতে বীণা উঠুক বাজি,

ধ্যানেতে আর গানেতে আজি যামিনী যাক বয়ে।

এসো গো এসো দোলবিলাসী বাণীতে মোর দোলো,

ছন্দে মোর চকিতে আসি মাতিয়ে তারে তোলো।

অনেক দিন বুকের কাছে   রসের স্রোত থমকি আছে,

নাচিবে আজি তোমার নাচে সময় তারি হল।।"

বসন্ত উৎসবের অনুরূপ ছবি আছে 'প্রকৃতি' পর্যায়ের ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ২১০ নং গানেও। এই পর্যায়ের ১৯৭ নং গানটি বসন্ত উৎসব বিষয়ক একটি জনপ্রিয় গান—

"ওরে গৃহবাসী খোল্, দ্বার খোল্,   লাগল   যে দোল।

স্তলে জলে বনস্থলে লাগল যে দোল।

দ্বার খোল্ দ্বার খোল্।।"

এই উৎসবেরই ছবি পাওয়া যাবে 'প্রকৃতি' পর্যায়ের ১৪২ ও ১৪৩ নং গানে। রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসব' নাটকে দেখা যায় 'মজার মানুষ' ঠাকুরদাকে পল্লীর নিরানন্দ

জীবনে আনন্দের সঞ্চারের লক্ষ্যে ছেলেদের নিয়ে শারদোৎসবে মেতে উঠতে। শরৎকালের এই উৎসবের বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৪২ নং গানে লিখেছেন—

"কী করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি। আহা, হাহা, হা।।
কেয়া পাতার নৌকা গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে—
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব চলবে দুলে দুলে'
রাখাল ছেলী সঙ্গে ধেনু চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু চাঁপার বনে লুটি। আহা, হাহা, হা।"

১৪৩ নং গানেও রবীন্দ্রনাথ শারদোৎসবের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

"আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরির খেলা রে ভাই, লুকোচুরির খেলা—
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই –লুকোচুরি খেলা।।........
ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে।
ওরে, আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুঠ করে।।
যেন জোয়ার- জলে ফেনার রাশি বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা।।"

শারদোৎসবের অনুরূপ বর্ণনা আছে 'প্রকৃতি' পর্যায়ের ১৪৮ নং গানেও—"শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে'-তে।

পল্লীর উৎসবের অন্যতম দিক হিসেবে পৌষ উৎসবের ছবি পাওয়া যায় 'প্রকৃতি' পরযায়ের ১৭৯ নং গানে। গানটি রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের theme song হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে—

"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় আয়।

ডালা যে তোর ভরেছে আজ পাকা ফসলে , মরি হায় হায় হায়।। ......

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।

ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোল দুয়ার খোলো।

আলোর হাসি উঠলো জেগে   ধানের শিষে শিশির লেগে–

ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে,   মরি   হায় হায় হায়।।"

জ.   কৃষি :

রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেই ফুটে উঠেছে কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ অর্থনীতির টুকরো ছবি। পল্লীবাংলা থেকে সাধারণ ছবি চয়ন করে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব জবানীতে 'প্রেম' পর্যায়ের ২৩৫ নং গানে লিখেছেন–

"দিনান্তবেলায় শেষের ফসল নিলেম তরী-'পরে,

এ পারের কৃষি হল সারা,

যাব ওপারের ঘাটে।।"

এ একেবারে পদ্মাবিধৌত পল্লীবাংলার কৃষকদের পরিচিত ছবি। প্রকৃতি পর্যায়ের ১৭৮ নং গানেও ফুটে উঠেছে কৃষকদের শীতকালীন ধানকাটার ব্যস্ততার ছবি–

"এল যে শীতের বেলা বরষ-পরে।

এবার ফসল কাটো, লও গো ঘরে।।

করো ত্বরা, করো ত্বরা, কাজ আছে মাঠ-ভরা–

দেখিতে দেখিতে দিন আঁধার করে।।"

বাংলার পল্লীর মানুষের কাছে ধান চাষ সম্বৎসরের খাদ্যসংগ্রহের একমাত্র মাধ্যম। এই জমির সঙ্গে, কৃষির সঙ্গে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক। 'বিচিত্র' পর্যায়ের ১৩০ নং গানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন এই পল্লীবাংলার কৃষকদের মনের কথাকে, এঁকেছেন তাদের বেঁচে থাকার ভরসার ছবিকে–

" আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে— সকল ধরা হেসে ওঠে
অঘ্রাণেরই সোনার রোদে, পূর্ণিমারই চন্দ্রে।।"

মাটির সঙ্গে বা জমির সঙ্গে পল্লীর মানুষের তাই প্রাণের সম্বন্ধ। পল্লীপ্রধান ভারত বর্ষের গ্রামগুলিতে উৎপাদিত ফসলের উপর নির্ভর করেই এ দেশের বিকাশ-সমৃদ্ধি। এদেশের মানুষের বাঁচা-মরা দিগন্ত বিস্তৃত পল্লীমায়ের আঁচল ব্যেপে কৃষির যে বহতা ধারা তার উপর নির্ভরশীল। কৃষকের শ্রমে ফসলের যে নব নব সৃজন তার উপর ভিত্তি করে আসে সভ্যতার নবতর বিকাশ। পল্লীর মাটি আজ অধীর আগ্রহে কৃষকের হাতের স্পর্শ পাবার জন্য তাকিয়ে আছে। তাঁর বুকের থেকে নিঃসৃত জলের ধারাই পল্লীর বিস্তৃত প্রান্তরে আনে সবুজের সমারোহ। 'আনুষ্ঠানিক' পর্যায়ের ১৫ নং গানে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ কথাগুলিকেই গেঁথে তুলেছেন—

"ফিরে চল্ ফিরে চল্, ফিরে চল্ মাটির টানে—
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।।
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে, হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,
ডাক দিল যে গানে গানে।।
দিক হতে ঐ দিগন্তরে কোল রয়েছে পাতা,
জন্মমরণ তারি হাতের অলখ সুতোয় গাঁথা।
ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা সাগর পানে আত্মহারা রে
প্রাণের বাণী বয়ে আনে।।"

পল্লীজীবনে জমির সঙ্গে কৃষকের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার ছবিটিকে ফুটে উঠতে দেখা যায় 'গীতবিতানে'র 'আনুষ্ঠানিক' পর্যায়ের ১৬ নং গানেও—

"আয় রে মোরা ফসল কাটি -

ফসল কাটি,ফসল কাটি।

মাঠ আমাদের মিতা ওরে, আজ তারি সওগাতে

মোদের ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে।।

মোরা নেব তারি দান, তাই-যে কাটি ধান,

তাই-যে গাহি গান—তাই- যে সুখে খাটি।।"

ঝ. জলসেচ :

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের রুক্ষ পরিবেশে কৃষির স্বার্থে তথা পানীয় জলের প্রয়োজন পূরণের জন্য রবীন্দ্রনাথ বহু কূপ ও নলকূপ নির্মাণ করেন। পল্লীর মানুষের কাছে গ্রীষ্মকালে জলের কি ভয়াবহ সঙ্কট ছিল তা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ তাই আধুনিক যন্ত্রপাতি সহযোগে শান্তিনিকেতনে কূপ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। এই উপলক্ষে ১৩২৯-এর ৪ঠা বৈশাখ রচনা করেন নিম্নোক্ত গানটি, যা পল্লীর সেচ ব্যবস্থার দিকনির্দেশ হয়ে উঠেছে—

"এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, কলকল্ ছলছল্।।

এসো এসো উৎসস্রোতে গূঢ় অন্ধকার হতে

এসো হে নির্মল কলকল্ ছলছল্।।.........

মরুদৈত্য কোন্ মায়াবলে

তোমারে করেছে বন্দী পাষাণ শৃঙ্খলে।

ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা এসো বন্ধহীন ধারা,

এসো হে প্রবল, কলকল্ ছলছল্।"

ঞ. যন্ত্র :

রবীন্দ্রনাথ মানব সভ্যতার অনুকূলে যন্ত্রের ব্যবহারের পক্ষে মত পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমকালেই রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যন্ত্রের বিরূপ ব্যবহার মানব সভ্যতার পক্ষে কতটা বিভীষিকাময় হয়ে উঠতে পারে। এর আভাস দিয়ে 'বিচিত্র' পর্যায়ের ৭৯ নং গানে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রবন্দনা করে বলেছেন—

" নমো যন্ত্র, নমো— যন্ত্র, নমো—যন্ত্র, নমো –যন্ত্র!

তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত, তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,

তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংসবিকট দন্ত।।

তব দীপ্ত-অগ্নি-শত-শতঘ্নী-বিঘ্নবিজয় পন্থ।

তব লৌহগলন শৈলদলন অচলচলন মন্ত্র।।

কভু কাঠলোষ্ট্র-ইষ্টক দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া,

কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-লঙ্ঘন লঘু মায়া।

তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র।

তব পঞ্চভূতবন্ধনকর ইন্দ্রজালতন্ত্র।।"

ট. বৃক্ষরোপণ :

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন পল্লীর পরিবেশ রক্ষায় শুধু নয়, পল্লীর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গাছের একটি বড় ভূমিকা আছে।তাই বৃক্ষরোপণ উৎসব ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে (২৫ শে বৈশাখ, ১৩৩২) শান্তিনিকেতনে পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছিলেন—

" মরুবিজয়ের কেতন ওড়াও শূন্যে হে প্রবল প্রাণ।

ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে হে কোমল প্রাণ।।

মৌনী মাটির মর্মের গান কবে উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,

মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে হে মোহন প্রাণ।।

পথিক বন্ধু, ছায়ার আসন পাতি এসো শ্যাম সুন্দর।

এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথী, মাতাও নীলাম্বর।

ঊষায় জাগাও শাখায় গানের আশা , সন্ধ্যায় আনো বিরামগভীর ভাষা,

রচি দাও রাত্রে সুপ্ত গীতের বাসা হে উদার প্রাণ।।”

উৎস নির্দেশ :

১. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। নেপাল মজুমদার। ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ১ম খণ্ড। দে’জ । ১৯৯৫। পৃ: ২৬।

২. দিল্লী দরবার। রবীন্দ্ররচনাবলী , ১৭শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৩৫।

৩. ভারতী। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৭শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬।

৪. তদেব।

৫. কবিকাহিনী, ৪র্থ সর্গ। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৪৪৯।

৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৫১।

৭. নেপাল মজুমদার। ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ১ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬।

৮. নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। প্রভাতসংগীত। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২০। পৃ: ৫৩।

৯. নেপাল মজুমদার। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩।

১০. গ্রামে। ছবি ও গান। রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৯৭।

১১. প্রাণ। কড়ি ও কোমল। রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৬১।

১২. মঙ্গলগীত। কড়ি ও কোমল। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৮০।

১৩. বঙ্গভূমির প্রতি। কড়ি ও কোমল। পূর্বোক্ত। পৃ: ২১৭।

১৪. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছেলেবেলা। পিতৃস্মৃতি। জিজ্ঞাসা। ১৩৮৭। পৃ: ১১-১২।

১৫. আহ্বানগীত। কড়ি ও কোমল। পূর্বোক্ত। পৃ: ২১৯।

১৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ২২০।

১৭. দুরন্ত আশা। মানসী। রবীন্দ্ররচনাবলী ১ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৯২।

১৮. শ্রাবণের পত্র। মানসী। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৬৪।

১৯. দুরন্ত আশা। মানসী। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৯১-২৯২।

২০. দেশের উন্নতি। মানসী। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৯৬।

২১. সোনারতরী। সোনার তরী। রবীন্দ্ররচনাবলী ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২০। পৃ: ১০।

২২. তদেব।

২৩. বিশ্বনৃত্য। সোনার তরী। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৯।

২৪. এবার ফিরাও মোরে। চিত্রা। রবীন্দ্ররচনাবলী ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৪২।

২৫. তদেব।

২৬. তদেব।

২৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৪৩।

২৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৪৪।

২৯.তদেব।

৩০. রাজা। রবীন্দ্ররচনাবলী ৫ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ২৭৮।

৩১. হতভাগ্যের গান। কল্পনা। রবীন্দ্ররচনাবলী ৪র্থ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ১২৬।

৩২. উন্নতিলক্ষণ। কল্পনা। পূর্বোক্ত। ১৪২১। পৃ: ১৪৫।

৩৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৪৬-১৪৭।

৩৪. হতভাগ্যের গান। কল্পনা। পূর্বোক্ত। পৃ: ১২৬।

৩৫. অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্ররচনাভিধান ২য় খণ্ড। দীপ প্রকাশন। ১৯৯৯। পৃ: ১৮৭।

৩৬. ৪৭ সংখ্যক কবিতা। নৈবেদ্য। রবীন্দ্ররচনাবলী ৪র্থ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮৮।

৩৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮৯।

৩৮. ৪৮ সংখ্যক কবিতা। নৈবেদ্য। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮৯।

৩৯. ৭২ সংখ্যক কবিতা। নৈবেদ্য। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৯৯।

৪০. সবুজের অভিযান। বলাকা। রবীন্দ্ররচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ২৪৩-২৪৪।

৪১. প্রতীক্ষা। মহুয়া। রবীন্দ্ররচনাবলী ৮ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৩৬।

৪২. প্রার্থনা। পরিশেষ। রবীন্দ্ররচনাবলী ৮ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২২৬।

৪৩. ১৭ সংখ্যক কবিতা। প্রান্তিক। রবীন্দ্ররচনাবলী ১১শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ১১৮।

৪৪. ১৮ সংখ্যক কবিতা। প্রান্তিক। পূর্বোক্ত। পৃ: ১১৮।

৪৫. কবিকাহিনী, ৪র্থ সর্গ। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪ শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৫১।

৪৬. ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে। আকাশপ্রদীপ। রবীন্দ্ররচনাবলী ১২শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৯২।

৪৭. নারীর কর্তব্য। প্রহাসিনী। রবীন্দ্ররচনাবলী ১২ শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৬।

৪৮. ৯ সংখ্যক কবিতা। ছড়া। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩ শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ১০৮।

৪৯. নগরসংগীত। চিত্রা। রবীন্দ্ররচনাবলী ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৭১।

৫০. কলুষিত। বীথিকা। রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৭৩-৭৪।

৫১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৪।

৫২. সুখ। চিত্রা। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৩৪।

৫৩. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ। ১৯৭৬। পৃ: ৩১৭-৩১৮।

৫৪. ৬৪ সংখ্যক কবিতা। নৈবেদ্য। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৯৬।

৫৫. ধর্মমোহ। পরিশেষ। রবীন্দ্ররচনাবলী ৮ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২০৬।

৫৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৪।

৫৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধায়। রবীন্দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষা ১ম খণ্ড। ১৪০৩। মিত্র ও ঘোষ। পৃ: ১৬২-১৬৩।

৫৮. নদী। রবীন্দ্ররচনাবলী ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১২৪-১২৬।

৫৯. প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রসরণী। ১৪১৫। মিত্র ও ঘোষ। পৃ: ১৯৪-১৯৫।

৬০. ১৭ সংখ্যক কবিতা। প্রান্তিক। রবীন্দ্ররচনাবলী ১১শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১২০।

৬১. পক্ষীমানব। প্রান্তিক। পূর্বোক্ত। পৃ: ১১৯।

৬২. পূর্বোক্ত। পৃ: ১২০।

৬৩. পথের সঞ্চয়। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩ শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৬৩০।

৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪১৮। পৃ: ৪২-৪৩।

৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। পূজা পর্যায় ৯৪ সংখ্যক গান। বিশ্বভারতী। ১৪২১। পৃ: ৪৩।

৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। স্বদেশ পর্যায় ৩৮ সংখ্যক গান।পূর্বোক্ত। পৃ: ২৬২।

৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। পূজা পর্যায় ৯৪ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৪।

৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। পূজা পর্যায় ১৯৯ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ৮৯।

৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। পূজা পর্যায় ২২৭ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ১০০।

৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। পূজা পর্যায় ৪০৬ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৬৭।

৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। স্বদেশ পর্যায় ৩ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৪৪।

৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। স্বদেশ পর্যায় ৬ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৪৬।

৭৩. তদেব।

৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। স্বদেশ পর্যায় ২৯ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৫৯।

৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ৩। জাতীয় সংগীত পর্যায় ৪ সংখ্যক গান। বিশ্বভারতী। ১৪১৬। পৃ: ৮১৭।

৭৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ৩। জাতীয় সংগীত পর্যায় ১২ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ৮২১।

৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ৩। জাতীয় সংগীত পর্যায় ১৩ সংখ্যক গান।পূর্বোক্ত। পৃ: ৮২২।

৭৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। পূজা পর্যায় ২৫৯ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ১১২।

৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। স্বদেশ পর্যায় ৪ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৪৫।

৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। স্বদেশ পর্যায় ৫ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৪৫।

৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ৩। জাতীয় সংগীত পর্যায় ৯ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ৮১৯।

৮২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৮২০।

৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। পূজা পর্যায় ৫৮৬ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৩৪।

৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ৩। নাট্যগীতি পর্যায় ৫৯ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৯০।

৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। স্বদেশ পর্যায় ১২ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৪৮।

৮৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। স্বদেশ পর্যায় ৯ সংখ্যক গান। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৪৭।

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ও ভ্রমণসাহিত্যে পল্লীভাবনা

সাহিত্যিক ও কর্মী রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঘটনাবহুল জীবনে পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। পথে ও পথের প্রান্তে নানা ঘটনাধারা তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ ও ঋদ্ধ করে তুলেছে। সেই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কখনো বা তাকে পত্রে প্রকাশ করেছেন কখনো বা তাকে ভ্রমণসাহিত্যের আধারে গেঁথে তুলেছেন। এই অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে দেশ ও পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত ভাবনাগুলি একটি বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে। পল্লী উন্নয়ন যজ্ঞের ঋত্বিক রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ অভিজ্ঞতা ও পরিকল্পনার সারকথাকে নিম্নোক্ত কতকগুলি শিরোনামে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হল।

ক. শিক্ষা :

পল্লীর মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় ১৮৯০ থেকেই স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছিলেন। শিলাইদহের কুঠিবাড়িই তখন রবীন্দ্রনাথের কাছে স্থায়ী নিবাস হয়ে উঠেছিল। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের অশিক্ষা-অজ্ঞতাকে নিতান্ত কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাদের দারিদ্র্যের এবং বিপর্যয়ের মূল কারণ যে শিক্ষা—একথা তিনি বেশ ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই পল্লীসংগঠন কর্মের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে উদ্যোগ নিয়েছিলেন শিক্ষার বিকাশ ও প্রসারের জন্য। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন—“ শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ। এর সংকল্পের মূল্য আছে, ফলের কথা আজ কে বিচার করবে।”[১]

ফলের কথা পরবর্তী এক অধ্যায়ে বিস্তৃত রূপে আলোচিত হয়েছে। সে বিষয়টিকে আপাতত ভাবে মূলতুবি রেখে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নকেন্দ্রিক শিক্ষাসংস্কারের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। পল্লীর মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন ও তার আর্থিক ভারবহনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অকৃপণ ছিলেন। ১৮৯১-এ লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন—

“এমনি করে আধ-ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করে গেল, মাঝে মাঝে মুখস্থ বক্তৃতা ভুলে যাচ্ছিল, আবার আকাশের দিকে চেয়ে সংশোধন করে নিচ্ছিল। বিষয়টা হচ্ছে তাদের স্কুলে টুল

এবং বেঞ্চির অপ্রতুল হয়েছে—সে কাষ্ঠাসনের অভাবে 'আমরাই বা কোথায় উপবেশন করি, আমাদের পূজনীয় শিক্ষক মশায়ই বা কোথায় উপবেশন করেন, এবং পরিদর্শক মহাশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই বা কোথায় আসন দান করা যায়!' ছোট্ট ছেলের মুখে এই অনর্গল বক্তৃতা শুনে আমার এমনি হাসি পাচ্ছিল! বিশেষতঃ এই জমিদারি কাছারিতে, যেখানে অশিক্ষিত চাষারা নিতান্ত গ্রাম্য ভাষায় আপনাদের যথার্থ্য দারিদ্র্যদুঃখ জানায়—যেখানে অতিবৃষ্টি দুর্ভিক্ষে গোরু বাছুর হাল লাঙল বিক্রি করেও উদরান্নের অনটনের কথা শোনা যাচ্ছে, যেখানে 'অহরহ' শব্দের পরিবর্তে 'রহরহ', 'অতিক্রমের' স্থলে 'অতিক্রয়' ব্যবহার, সেখানে টুল বেঞ্চির অভাবে সংস্কৃত বক্তৃতা কানে এমনি অদ্ভুত শোনায়। অন্যান্য আমলা এবং প্রজারা এই ছোকরার ভাষার প্রতি এতাদৃশ দখল দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল—তারা মনে মনে আক্ষেপ করছিল, 'বাপ-মা'রা আমাদের যত্ন করে লেখাপড়া শেখায় নি, নইলে আমরাও জমিদারের সামনে দাঁড়িয়ে এই রকম শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করতে পারতুম।'আমি শুনতে পেলুম একজন আর-একজনকে ঠেলে ঈষৎ বিদ্বেষের ভাবে বলছে, 'একে কে শিখিয়ে দিয়েছে।' আমি তার বক্তৃতা শেষ না হতেই তাকে থামিয়ে বললুম, 'আচ্ছা, তোমাদের টুল-বেঞ্চির বন্দোবস্ত করে দেব।'"[২]

শিলাইদহ-পতিসর পর্ব থেকেই তাই রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের অশিক্ষাও অজ্ঞতা দূর করার অভিপ্রায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েরও গোড়াপত্তন করেন। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন—"তুমি ত কাল বৃহস্পতিবারে এলে না—আমি অত্যন্ত চটে বোটে করে একেবারে কুষ্টিয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির। তোমার নামে নালিশ দায়ের কর্ত্তে নয়—তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কুষ্টিয়ায় একটা হাইস্কুল হয়েছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করতে তাঁর সঙ্গে এবং মুন্সেফ বাবুর সঙ্গে মোলাকাৎ করা আবশ্যক হয়েছিল।"[৩]

পরবর্তী সময়ে তাই রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে দেশোন্নয়নের অনুকূল শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন। তারও বহু পূর্বে শিলাইদহ-পতিসর পর্বের পল্লীসংগঠন কার্য চলাকালীন রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়কে কৃষিশিক্ষার জন্য আমেরিকা প্রেরণ করেন, যাতে রথীন্দ্রনাথের সহযোগী হিসেবে পল্লীসংগঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা একটি চিঠিতে সেই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—"নগেন্দ্রকে কৃষিশিক্ষাতেই প্রবৃত্ত করিয়ে দেওয়া ভালো। ceramics শিখে এদেশে সুবিধা হবে না। এখানে একটিমাত্র কম্পানি আছে তার অর্থাভাবে শোচনীয় অবস্থা। নিজের টাকায় এ কাজ চল্‌বেনা। অতএব ওকে এমন একটা কিছু শিখিয়ে নিস্ যাতে ও তোদের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করতে পারে।"[৪] রবীন্দ্রনাথ

এভাবেই পল্লী সংগঠনের দক্ষ কর্মীদের গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছেন। কারণ তিনি একথা বুঝেছিলেন যে, দক্ষ কর্মীর অভাবে কোন পরিকল্পনাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংগঠনের আনুষঙ্গিক হিসেবে শিক্ষাসংস্কারের যে কর্মপ্রয়াস নিয়েছিলেন জমিদারি ভাগবাঁটোয়ারা হবার ফলে কিছুটা বিঘ্নিত হয়। কিন্তু কালিগ্রামে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের রূক্ষ প্রান্তরকেই তাঁর পল্লী সংগঠনের পরবর্তী ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সর্বপ্রথম শিক্ষাকেই পল্লীউন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের পিছনে ছিল সাইমন কমিশনের রিপোর্ট। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন— "আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্ম্মবিরোধ, কর্ম্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য, সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। সাইমন কমিশনে ভারতবর্ষের সমস্ত অপরাধের তালিকা শেষ করে ব্রিটিশ শাসনের কেবল একটিমাত্র অপরাধ কবুল করেচে সে হচ্চে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষাবিধানের ত্রুটি।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ একই সালে লেখা অপর একটি চিঠিতে জাপানের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে জানিয়েছেন— "জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্পকালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েচে, দেশের অর্থ উৎপাদনের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেচে, বর্ত্তমান তুরস্ক প্রবলবেগে এই শিক্ষা অগ্রসর করে দিয়ে ধর্ম্মান্ধতার প্রবল বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করবার পথে চলেছে। "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।" কেন না ঘরে আলো আসতে দেওয়া হয়নি,--যে আলোতে আজকের পৃথিবী জেগে, সেই শিক্ষার আলো ভারতের রুদ্ধ দ্বারের বাইরে।"[৬]

'রাশিয়ার চিঠি'র ১ ও ৩ নং পত্রেও রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বহুকালাগত বঞ্চনার কথাকে উল্লেখ করেছেন—" মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের মূলে হচ্ছে তার সুশিক্ষা। আমাদের দেশে তার রাস্তা বন্ধ, কারণ 'ল অ্যান্ড অর্ডার' আর কোনো উপকারের জন্য জায়গা রাখলে না, তহবিল একেবারে ফাঁকা। আমি দেশের কাজের মধ্যে একটি কাজকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলুম; জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা দেবার শিক্ষা দেব বলে এতকাল ধরে আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়েছি। এজন্যে কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যও প্রত্যাখ্যান করতে চাই নি, প্রত্যাশাও করেছি, কিন্তু তুমি জান কতটা ফল পেয়েছি। বুঝতে পেরেছি, হবার নয়। মস্ত আমাদের পাপ, আমরা অশক্ত।

তাই যখন শুনলুম, রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে, তখন মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরো যদি ভাঙে তো

ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে, অশক্তকে শিক্ষা দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা—অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই 'পরে নির্ভর করে। ফাঁকা 'ল অ্যান্ড্ অর্ডার' নিয়ে না ভরে পেট, না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে সর্বস্ব বিকিয়ে গেল।"[৭]

ইংরেজ এদেশে একরকম শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছিল। কিন্তু সে শিক্ষা ছিল নিতান্তই ছাঁচে ঢালা কেরানী গড়ার কলমাত্র। ইংরেজ-প্রবর্তিত সেই শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানিয়েছেন—"দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনার স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায়, ইহাই তাহার সবচেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনার আইন খাটাইবে, ইহাই তাহার মতলব। সুতরাং এই বৃহৎ বিদ্যার কল কেরানিগিরির কল হইয়া উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের নুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।[৮]"

রবীন্দ্রনাথ তাই আমাদের দেশের শিক্ষার লক্ষ্য নির্দেশ করে বলেছিলেন— "তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি-মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুল-মাষ্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে, এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশের সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা—এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।"[৯]

একারণেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে প্রাথমিক ভাবে শিক্ষার বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রিয় পত্নীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এ-ও ছিল একপ্রকার অবলম্বন বিশেষ। একারণে রবীন্দ্রনাথকে কি কঠিন অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে চালিত হতে হয়, তার পরিচয় তাঁর লেখা চিঠিপত্রে বিধৃত আছে। এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— " ঈশ্বর আমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন—এক্ষণে আমাকে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। আপনার দ্বারে আমার এই প্রার্থনা যে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের একটি ছাত্রের ব্যয়ভার আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অধিক নহে, বৎসরে ১৮০ টাকা। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে যদি এই টাকাটি দেন তবে তাহা আমার পরলোকগতা পত্নীর মৃত্যুবার্ষিক মঙ্গলদান বলিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিব এবং তাহাতে ঈশ্বর আপনারও কল্যাণ করিবেন।"[১০]

১৩০৯-এর অগ্রহায়ণে হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কয়েকটি দরিদ্র বালককে বিনা বেতনে পড়াইয়া থাকি। তাহাদের ব্যয়ভার আমরা বান্ধবদের মধ্যে পরস্পর ভাগ করিয়া লইবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। একটি বালকের ভার আপনি যদি গ্রহণ করেন তবে উপকৃত হইব। হিসাব করিয়া দেখা গেছে প্রত্যেক বালকের খাই খরচের জন্য মাসে প্রায় ১৫ টাকা অর্থাৎ বৎসরে ১৮০ টাকা লাগে। প্রতি বর্ষে অগ্রহায়ণ মাসে এই ১৮০ টাকা বার্ষিক দান পাইবার জন্য আমি সুহৃদগণের দ্বারে সমাগত। আপনাকে বলিতে সঙ্কোচ করিব না আমার পরলোকগত পত্নীর কল্যাণকামনার সঙ্গে আমি এই ভিক্ষাব্রত জড়িত করিয়াছি।"[১১]

আসলে তৎকালীন পল্লীগ্রামের শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব প্রতিকৃতির কিঞ্চিৎ পরিচয় নিলে রবীন্দ্রনাথের এরূপ মহৎ উদ্দেশ্যের কারণ স্পষ্ট বোঝা যায়। যে মৃণালিনী দেবীর কল্যাণ-উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের জন্য ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিও কিন্তু পল্লীর প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে প্রাক-বৈবাহিক জীবনে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিচারণার সূত্রে জানিয়েছেন—

"খুলনা জিলার দক্ষিণডিহি গ্রামের শুকদেবের বংশধর বেণীমাধব রায়চৌধুরীর প্রথম সন্তান ভবতারিণী (মৃণালিনী)। ......দক্ষিণডিহি গ্রামে এমন-কি গ্রামের চতুর্দিকে ক্রোশের মধ্যেও উচ্চ-শিক্ষার বিদ্যালয় ছিল না। গ্রামে একটি প্রাইমারি পাঠশালা ছিল, এই পাঠশালায় মৃণালিনীর বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত হয়। প্রথম বর্গ পর্যন্ত অবাধে পড়াশুনা চলিয়াছিল। কিন্তু সমাজে নিন্দার ভয়ে সুদূর পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে নাই; কাজেই বাংলা বাংলা লেখাপড়ার সাধ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে এইখানেই মিটাইতে হইয়াছিল।"[১২]

এমন যে পল্লীগ্রাম—যা পল্লীপ্রধান বৃহৎ ভারতবর্ষেরই প্রতিরূপবিশেষ—তার উন্নয়ন ভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে দেশের যে প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব নয়, তা রবীন্দ্রনাথ বেশ বুঝেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ কি অসম্ভব ত্যাগ স্বীকার করে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকে ক্রমে এক সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন তার চকিত উদ্ভাসন আছে মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে আলাপচারিতার মধ্যে—"এই যে বিশ্বভারতী এত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছি, আমার অবর্তমানে এর আর মূল্য কিছুই থাকবে না ? এর পিছনে যে কী পরিশ্রম আছে তাতো জানো না, কী দুঃখের সে সব দিন গেছে যখন ছোট বৌর গহনা পর্যন্ত নিতে হয়েছে। চারিদিকে ঋণ বেড়ে চলেছে, ঘর থেকে খাইয়ে পরিয়ে ছেলে যোগাড় করেছি, কেউ ছেলে তো দেবেই না, গাড়ি ভাড়া করে অন্যকে বারণ করে আসবে। এইরকম সাহায্যই স্বদেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছি। আর তখন চলেছে একটির পর একটি মৃত্যুশোক, সে দুঃখের ইতিহাস সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। লোকে জানে উনি শৌখিন

বড়লোক। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হয়েছিলুম, আমার সংসারে কিছুমাত্র বাবুয়ানা ছিল না। ছোটবৌকেও অনেক ভার সইতে হয়েছে, জানি সে কথা তিনি মনে করতেন না। কিন্তু এত বাধা যদি দেশের লোকের কাছ থেকে না পেতুম তাহলে শুধু অর্থাভাবে এত কষ্ট পেতে হত না।”[১৩]

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন যাতে দেশগঠনের কাজে আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলা যায়। ১৯০১-এ জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা একটি চিঠিতে অনুরূপ উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— “ শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম-গন্ধ থাকিবে না—ধনী দরিদ্র সকলেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোনমতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থ-চেষ্টা এবং আড়ম্বর হইতে কোন মহৎ কার্য্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারো মুখরোচক হয় না। এতদিনকার ইংরেজি বিদ্যায় আমাদের কাহাকেও যথার্থ কর্ম্মযোগী করিতে পারিল না কেন ? মহারাষ্ট্র দেশে ত তিলক ও পরঞ্জপে আছে, আমাদের এখানে সে-রকম ত্যাগী অথচ কর্মী নাই কেন ? ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে—দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্যে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে।”[১৪]

বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ এমন এক শিক্ষা প্রণালীর কথা ভাবছেন, যা কেবল কতকগুলি ছাঁচে ঢালা কেরানি গড়ে তুলবে না; দেশের জন্য ত্যাগী ও কর্মী মানুষ গড়ে তুলবে। প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথ দেশীয় শিক্ষার স্বতন্ত্র আদর্শ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা বিদ্যালয়ের রীতি-আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে জানিয়েছেন—“আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে পরমার্থ—ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে—সংযমের দ্বারা ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা শুচিতা দ্বারা একাগ্র নিষ্ঠা দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগসাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই যোগসাধনা।

ইহা ধর্মব্রত। পৃথিবীতে অনেক জিনিষই কেনাবেচার সামগ্রী বটে , কিন্তু ধর্ম্ম পণ্যদ্রব্য নহে। ইহা এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্য প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাহারা

শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিস দিতেন যাহা গুরু শিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দানপ্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।

ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারামার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। ..."[১৫]

পূর্ববর্তী অধ্যায়েই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন প্রয়াসের মূলে ছিল এ পৃথিবীকে আদর্শ মানববিশ্ব হিসেবে গড়ে তোলার এক ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত স্থাপন। কিন্তু পরবর্তীসময়ে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্পর্কে সমালোচনা শুরু হয়। এমতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ সুরুলের কুঠিবাড়িতে কৃষিবিভাগের (Department of Agriculture) প্রতিষ্ঠা করে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োগ ও প্রসারে মনোনিবেশ করেন। পল্লীর উন্নয়ন ও পল্লীসংগঠনে সেই শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগের আয়োজন করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—"...বোলপুরের নিকটবর্ত্তী সুরুলের বাড়িটি সিংহদের কাছ হইতে আট হাজার টাকা দিয়া কিনিয়া বসিয়া আছি এবং সেই দেনাটা শোধ করিবার চিন্তাও করিতেছি। গীতাঞ্জলি হইতে মাঝে মাঝে কিছু কিছু যদি পাওয়া যায় তবে ঐ দেনাটা কালক্রমে শোধ হইবার আশা আছে। ইতিমধ্যে ঐ বাড়িটা বিদ্যালয়ের ব্যবহারে লাগাইবার কথা ভাবিবেন। রথী ফিরিয়া গেলে ঐখানে তাহার ল্যাবরেটরি স্থাপন করিয়া ঐ সূত্রে তাহার সঙ্গে কয়েকটি ছাত্রকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার সংকল্প আমার মনে আছে।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার জন্য রথীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, সন্তোষ ঘোষ সহ বেশ কয়েকজনকে বিদেশে পাঠান প্রশিক্ষণের জন্য। পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁদের পল্লী উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত করেন। রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

" মুকুল শিকাগোতে একটা স্টুডিয়োতে ভর্ত্তি হয়েচে। Etching শিখ্‌চে। Etching এ ওর একটু স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। পিয়ার্সন ওর দুই একটা এচিং লন্ডনে Muirhead Bone এর কাছে পাঠিয়েছিলেন—তিনি খুব উৎসাহ দিয়ে প্রশংসা করে চিঠি লিখেচেন। ও যদি ভালরকম করে এচিং শিখে যায় তাহলে আমাদের দেশের পক্ষে একটা নতুন জিনিষ হবে। এখানে একজন অল্পবয়স্ক Polish Sculpture আছে তাঁর স্টুডিয়োতে গিয়েছিলুম—আশ্চর্য্য তার ক্ষমতা—মুকুলের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়েচে—ওর সংসর্গে মুকুলের উপকার হবে।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথ যে মানববিশ্বের কল্পনা করেছিলেন, সে মানববিশ্বে কেবল আধ্যাত্মিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াই গুরুত্ব পায়নি, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপ্রণালীর

মধ্যে যে ধর্মচেতনার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন তাকে কিন্তু সংসারাশ্রমের অনুকূল করেই গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন। বিশ্বের বৈজ্ঞানিক জীবনচেতনা ও ইতিহাস চেতনা থেকে তা বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাই সে শিক্ষা যেমন ছিল আধ্যাত্মিক তেমনি বৈজ্ঞানিকও বটে। বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—"ধর্ম্মের যে দিকটা বিশুদ্ধভাবে আধ্যাত্মিক, সেখানে ধর্ম্ম স্বপ্রতিষ্ঠ। যে দিক প্রাকৃতিক সে দিকে ইতিহাস বা বিজ্ঞানের বিচার চলবেই। ......বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে মানলে ভক্তিকে খর্ব্ব করা হয় না তার কারণ এই যে সেখানে বিজ্ঞানেই ঈশ্বরের প্রকাশ—সর্বশক্তিমান আপনার প্রকাশের আপনি প্রতিবাদ করতে পারেন না, যেমন আত্মহত্যা করা তাঁর সাধ্যের অতীত। বিজ্ঞান ও ইতিহাসের যাথার্থ্য মানা তাঁরই যাথার্থ্য মানার অঙ্গ—বিজ্ঞান-বিরোধিতা নাস্তিকতা, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক—বিজ্ঞানেই তাঁর লীলা, অবৈজ্ঞানিক ছেলেমানুষীতে নয়।"[১৮]

সমাজ-বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়-শিক্ষাকে তাই বিদ্যালয়ের প্রথাগত চৌহদ্দির মধ্যে না রেখে তার ব্যাপক সামাজিক তাৎপর্য নিরূপণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। শিক্ষাকে বৃহত্তর সমাজকল্যাণকর্মে নিয়োজিত করে সমাজবৈজ্ঞানিকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেই সমর্পণ যে ব্রহ্মের প্রতি অনন্ত সংযোগের মাধ্যম মাত্র—এ বিষয়টি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সেবার মধ্য দিয়েই, দেশীয় সংস্কৃতি-সংস্কারের উজ্জীবনের পথেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীনতার পরাকাষ্ঠাকে স্পর্শ করার পক্ষপাতী ছিলেন। এ শিক্ষা তাই শিক্ষার্থীর আত্মমর্যাদাবোধ, স্বদেশপ্রীতি, ঐতিহ্যচেতনা ও জাতীয়তাবোধ জাগরণের অনুকূল হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন ছাত্র-যুব-সসমাজের জন্য এ শিক্ষা ছিল মহামূল্যবান। কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বলেছেন—

" ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান করিতে চাই। পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে—তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশ, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষাস্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা—এমনকি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনো সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ব ছিল সেই মহত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব—নিজের ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই

হইতে পারিব না—অতএব , বরঞ্চ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীয় অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।”[১৯]

এ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অসহিষ্ণুতা নয়। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে বিশ্বভারতীতে চেয়েছিলেন শিক্ষাসমবায় রচনা করতে। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের শিক্ষার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাই এক নিবিড় সমবায় রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। যদুনাথ সরকারের সমালোচনার প্রত্যুত্তরে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—“ এখানে যে কৃষিবিভাগ খোলা হইয়াছে তাহা যদি কাছে আসিয়া দেখিতেন তবে দেখিতে পাইতেন যে তাহা যেমন বৈজ্ঞানিক তেমনি কার্য্যোপযোগী, তাহার কার্য্যক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রণালী বহুব্যাপক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ ও আরোগ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য হাঁসপাতাল সমেত একটি শিক্ষাবিভাগ খুলিবার চেষ্টা করিতেছি, হয়ত শীঘ্র ছোট আকারে তাহার গোড়াপত্তন করিতে পারিব। এখানে ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, চামড়া পাকা করিবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ...... “কেঁথা সেলাইয়ের প্যাটার্ণ ও আলিপনার নক্‌সা” সম্বন্ধে য়ূরোপের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিৎ ও আর্ট সমালোচকদের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে......এই সকল পদার্থকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া কেহ অবজ্ঞা না করে এবং সেই সঙ্গেই জ্ঞানসাধনায় বিজ্ঞানের যে স্থান আছে তাহাকেও সকলে সম্মান করিতে শেখে।”[২০]

রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে লিখেছেন— “ পাঠভবনের হাতের কাজ, কলের কাজ, ইন্দ্রিয়বোধ চর্চ্চা, সামাজিকতা চর্চ্চা, গৃহসামগ্রীর পারিপাট্য, পরিবেশের সৌষ্ঠবসাধন প্রভৃতিব্যাপারে যে সব খরচ অত্যাবশ্যক সেইগুলো জোগাবার জন্যেই আমি বিশেষভাবে প্রেসিডেন্ট্ ফন্ড খুলেছিলুম। ঐ কাজগুলো যেন মনোযোগ বা উপকরণ অভাবে বন্ধ না থাকে—এবং যেন ঐচ্ছিকভাবে না হয়ে আবশ্যিকভাবে করানো হয়। মাঝে মাঝে ইংরেজি নাটক অভিনয় ভাষাশিক্ষার পক্ষে উপযোগী এ কথা যেন মনে থাকে—অবশ্য এই সুযোগে উচ্চারণ এবং একসেন্টের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত। অভিনয় উৎসব প্রভৃতি উপলক্ষ্যে শ্রীনিকেতনের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ছেলেদের ঘনিষ্ট যোগ থাকা অবশ্য কর্তব্য—এমন কি সাঁওতালপাড়া ও ভুবনডাঙার ছেলেদেরও কোন কোন বিশেষ উপলক্ষ্যে এদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া উচিত। গ্রামের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ শিক্ষায় কালীমোহন যদি ছেলেদের সাহায্য করে তাহলে ভালো হয়—আমি বারবার বলেচি এই শিক্ষা খুবই দরকারী।”[২১] রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল নির্দেশ দিয়েছেন, তার ঠিক একবছর পরে রাশিয়ায় গিয়ে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এরই প্রতিচ্ছবিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেখানকার শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিল—“ “ আমরা গাঁয়ের লোকদের শিক্ষা দেবার জন্যে পাড়াগাঁয়ে যাই—কী করে পরিষ্কার হয়ে থাকতে হয়, সকল কাজ কী করে বুদ্ধিপূর্বক করতে হয়, এই-সব তাদের

বুঝিয়ে দিই। অনেক সময়ে আমরা তাদের মধ্যে গিয়েই বাস করি, নাটক অভিনয় করি, দেশের অবস্থার কথা বলি।””[২২]

ললিত কলার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য জাপান থেকে জুজুৎসু শিক্ষক এনে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতে চেয়েছিলেন। আজ—একবিংশ শতাব্দীতে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য যে ক্যারাটে শিক্ষার উপযোগিতার কথা বলা হচ্ছে তারও উদ্যোগ ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা উদ্যোগের মধ্যে। রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“ জুজুৎসু শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই কথা। এই বিদ্যাটা আমাদের মেয়েদের পর্য্যন্ত শেখা উচিত। যদি ভালো শিক্ষক পাওয়া যায় ত চেষ্টা করা উচিত। আমাদের দেশে আজকালকার দিনে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এর খুব দরকার হয়েচে।”[২৩]

রবীন্দ্রনাথ সারা পৃথিবী থেকে শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের বোলপুরে আহ্বান করে এনে ব্যবহারিক ও নৈতিক, দেশী ও বিদেশীয় শিক্ষার সমবায় রচনার উপরই জোর দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই জানিয়েছেন—“যে কথা বলে আমি ভারতবর্ষের লোককে বিশেষভাবে আপীল করেচি সে হচ্চে বিশ্বভারতীতে ভারতীয় বিদ্যার সমবায়।”[২৪] রবীন্দ্রনাথ আসলে বিদেশী শিক্ষার ছাঁচ থেকে মুক্ত দেশীয় ঐতিহ্য আশ্রিত এমন এক শিক্ষার সমবায় রচনা করতে চেয়েছিলেন যার মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ববিকাশের সামগ্রিক আয়োজন থাকবে, ব্যবহারিক প্রয়োজনের পাশাপাশি যে শিক্ষার সর্বজাতিক সামাজিক বৃহত্তর তাৎপর্য থাকবে।

বিশ্বভারতীকে এভাবেই রবীন্দ্রনাথ এক স্বতন্ত্র মাপের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৯২৫-এ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর এই স্বাতন্ত্র্যের দিকটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন—“ তা ছাড়া এই পরীক্ষা-পাস করাবার ইস্কুলটি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বভারতীর আদর্শসঙ্গত জিনিষ নয়—দেশে এই উদ্দেশ্য নিয়ে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান আছে।”[২৫] দশ বছর পরে লেখা একটি চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ একই মত পোষণ করে রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন— “ ......ধীরেন ইচ্ছা প্রকাশ করেছে শান্তিনিকেতনে লন্ডন ম্যাট্রিক তরানোর একটা খেয়া ঘাট বসাবে। শুনে একটুও ভালো লাগচে না—শান্তিনিকেতনের আদর্শ যে ক্রমশই বিগড়ে চলেছে এ তারি একটা নিদর্শন—ষোল আনা ইঙ্গবঙ্গ snobbish ভাবে যে স্বর্গলোক কামনা করে আমাদের মধ্যে সেই নেশা যদি প্রবেশ করে তাহলে কোথায় গিয়ে উত্তীর্ণ হব। কলেজ ব্যাপারটা ক্রমশই শান্তিনিকেতনের মধ্যে বিজাতীয়তার পথ প্রশস্ত করতে বসেচে। বারিষ্টার মহলের ছেলেদের সাহেবি দীক্ষা দেবার ভার আমাদের নিতে হবে না কি? যে শিক্ষার শেষলক্ষ্য বিলাতের দিকে শান্তিনিকেতনে তারি বড় রাস্তা বানাতে হবে ? ভবিষ্যতের হাওয়া যদি এই

দুরাশার দিকেই বয় আমি কোনো কথা বল্‌ব না কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বেই এর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়েচে বলেই মনে জানব।”[২৬]

আসলে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য বা অভিমুখ ছিল পল্লীপ্রাণ দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ। আগামী ভারতবর্ষ বা আগামী দিনের পৃথিবীর মানবমুক্তি আসবে যে পথ ধরে শিক্ষার মধ্যে তারই আয়োজন রাখতে চেয়েছিলেন। আর তাই শান্তিনিকেতনকে নিছক লণ্ডন মেট্রিক তরানোর খেয়াঘাট বানানোর বিরুদ্ধে প্রাথমিক ভাবে চরম অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন। রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—“ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুল্‌তে হবে—ঐখানে সর্ব্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আস্‌চে—ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্চে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে—ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোলবৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে—সর্ব্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে।”[২৭]

বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন মুসলমান,শিখ, পারসী ইত্যাদি সকল বিদ্যার আদর্শ সমন্বয়ক্ষেত্র রূপে বিশ্বভারতীকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এর মূলে ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর অসাম্প্রদায়িক মানসচেতনাকে লালনের এক পথপ্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থা যে তার পল্লীসংগঠনেরই একটি বিশেষ প্রক্রিয়াবিশেষ একথা আগেই জানিয়েছি। জাত-পাতের বিভেদকে ডিঙিয়ে ঐক্যবদ্ধ দেশ বা পল্লী গঠন করতে হলে যে অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার প্রয়োজন হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেই তার আয়োজন রেখেছিলেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে জানিয়েছেন—

“ আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্চে—হিন্দু পল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দুধর্ম্ম হিন্দু সমাজের মূলেই এমন একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েচে যাতে করে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখে হিন্দু সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে idealize করে কোনো আত্মঘাতী শ্রুতিমধুর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর আমার ইচ্ছাই হয় না।

যাই হোক, একদিকে বোলপুর বিদ্যালয়ে ভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে অভদ্র এবং অভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে ভদ্র করে উভয় শ্রেণীর বিচ্ছেদ দূর করবার চেষ্টা করচি।”[২৮]

রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রায় অনুরূপ অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে লিখেছেন —"হিন্দু মুসলমান সমস্যার কূল পাওয়া যায় না। লাঠালাঠির দ্বারা কোনো জিনিষের সমাধান হয় না। যে রীতিমত জ্ঞান-শিক্ষা দ্বারা ধর্মান্ধতার আরোগ্য ঘটে তা ছাড়া উপায় নেই। য়ুরোপেও এককালে এই বিপদ ছিল, তারা কেবল শিক্ষা দ্বারা মনের বিকার ঘুচিয়ে তবে উদ্ধার পেয়েছে। আমাদের ৩৩ কোটিকে তেমন শিক্ষা কবে দেবে, কে দেবে ?"[২৯] 'রাশিয়ার চিঠি'র ২ নং পত্রেও রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে জানিয়েছেন সেখানেও একদা হিন্দু মুসলমানের 'কাটাকাটি মারামারি' চলতো। কিন্তু তার অবসান ঘটানো সম্ভব হয়েছে কেবল শিক্ষার বিস্তারের দ্বারা। সুতরাং একই উপায়ে আমাদের দেশ থেকেও সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে শিক্ষার প্রসারের দ্বারাই অনায়াসে দূর করা যেত। 'কিন্তু শতাধিক বৎসরের ইংরেজ-শাসনের পরে দেশে শতকরা পাঁচজনের কপালে শিক্ষা জুটেছে, সে শিক্ষাও শিক্ষার বিড়ম্বনা।"[৩০] 'রাশিয়ার চিঠি'র ৫ নং পত্রেও রাশিয়ার কৃষকদের সঙ্গে কথোপকথনকালে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

অথচ দেশ-বিদেশে আমাদের পল্লীপ্রাণ ভারতবর্ষের শিক্ষার নিতান্ত অপ্রতুলতার দিকটি নয়, হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের বিষয়টিকে বেশি করে রটনা করার পাকা দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। এর কারণ নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ চাঁছাছোলা ভাষায় বলেছেন—"অশিক্ষার অনিবার্য ফলে আমাদের বুদ্ধিতে চরিত্রে যে দুর্বলতা, ব্যবহারে যে মূঢ়তা, দেশ-বিদেশের কাছে তার রটনা চলছে। ইংরেজিতেই কথা চলিত আছে, যে কুকুরকে ফাঁসি দিতে হবে তাকে বদনাম দিলে কাজ সহজ হয়। যাতে বদনামটা কোনোদিন না ঘোচে তার উপায় করলে যাবজ্জীবন মেয়াদ ও ফাঁসি দুই'ই মিলিয়ে নেওয়া চলে।"[৩১]

'রাশিয়ার চিঠি'র 'উপসংহার' অংশে রবীন্দ্রনাথ আরো কড়া ভাষায় জানিয়েছেন— "দেশব্যাপী অশিক্ষাজনিত বিপদ দূর করবার উপায় কমিশনের পরামর্শমাত্র দ্বারা লাভ করা যায় না—সে সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের তেমনি তৎপর হওয়া উচিত যেমন তৎপর ব্রিটিশ গবর্মেন্ট নিশ্চয়ই হত যদি এই সমস্যা ব্রিটেন দ্বীপের হত। সাইমন কমিশনকে আমাদের প্রশ্ন এই যে, ভারতের অজ্ঞতা-অশিক্ষার মধ্যেই এতবড় মৃত্যুশেল নিহিত হয়ে এতদিন রক্তপাত করছে, এই কথাই যদি সত্য হয় তবে আজ একশো ষাট বৎসরের ব্রিটিশ শাসনে তার কিছুমাত্র লাঘব হল না কেন। কমিশন কি সংখ্যাতথ্যযোগে দেখিয়েছেন পুলিসের ডান্ডা জোগাতে ব্রিটিশরাজ যে খরচ করে থাকেন তার তুলনায় দেশকে শিক্ষিত করতে এই সুদীর্ঘকাল কত খরচ করা হয়েছে। দূরদেশবাসী ধনী শাসকের পক্ষে পুলিশের ডাণ্ডা অপরিহার্য কিন্তু সেই লাঠির বংশগত যাদের মাথার খুলি তাদের শিক্ষার ব্যয়বিধান বহু শতাব্দী মুলতুবি রাখলেও কাজ চলে যায়।"[৩২]

পাবনা কনফারেন্সের সময় থেকেই তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে পল্লীর মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলোক নিয়ে পোঁছোনোর কথা বলে আসছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সে বক্তব্যকে রাজনৈতিক নেতারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি। 'রাশিয়ার চিঠি'র ৪ নং পত্রে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই এ বিষয়ে জানিয়েছেন—" আমার মনে আছে পাবনা কন্‌ফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড়ো একজন রাষ্ট্রনেতাকে বলেছিলুম, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই তাহলে সব-আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ করতে হবে। তিনি সে কথাটাকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না।......সেদিনকার পরেও অনেকদিন চলে গেল। সেই পাবনা কন্‌ফারেন্সে পল্লী সম্বন্ধে যা বলেছিলুম তার প্রতিধ্বনি অনেকবার শুনেছি—শুধু শব্দ নয়, পল্লীর হিতকল্পে অর্থও সংগ্রহ হয়েছে, কিন্তু দেশের যে উপরিতলায় শব্দের আবৃত্তি হয় সেই খানটাতেই সেই অর্থও আবর্তিত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে, সমাজের যে গভীরতলায় পল্লী তলিয়ে আছে সেখানে তার কিছুই পৌঁছল না।"[৩৩]

বৃটিশ সরকার আমাদের দেশে শেষ পর্যন্ত যে প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করে সেও কিন্তু প্রজাদের অর্থে। এর জন্য ব্রিটিশ সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সামান্য কোন দায় স্বীকার করেনি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু চেয়েছিলেন সরকার সেই দায় ভার গ্রহণ করুক। কিন্তু সেই দায়িত্বভার গ্রহণ অপেক্ষা সরকার দায় এড়িয়ে যাবার অভিনব পন্থা গ্রহণ করে। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

" কাগজে পড়লুম, সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন উপলক্ষে হুকুম পাস হয়েছে প্রজাদের কান ম'লে শিক্ষাকর আদায় করা, এবং আদায়ের ভার পড়েছে জমিদারের 'পরে। অর্থাৎ যারা অমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছে শিক্ষার ছুতো করে তাদেরি মার বাড়িয়ে দেওয়া।

শিক্ষাকর চাই বৈকি, নইলে খরচ জোগাবে কিসে। কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যে যে কর, কেন দেশের সবাই মিলে সে কর দেবে না। সিভিল সার্ভিস আছে, মিলিটারি সার্ভিস আছে, গভর্ণর ভাইসরয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন, কেন তাঁদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই। তাঁরা কি এই চাষীদের অন্নের ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেনসন নিয়ে অবশেষে দেশে গিয়ে ভোগ করেন না। পাটকলের যে-সব বড়ো বড়ো বিলাতি মহাজন পাটের চাষীর রক্ত দিয়ে মোটা মুনাফার সৃষ্টি ক'রে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের কোনোই দায়িত্ব নেই ? যে-সব মিনিস্টার শিক্ষা-আইন

পাশ নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁদের উৎসাহের কানাকড়ি মূল্যও কি তাঁদের নিজের তহবিল থেকে দিতে হবে না।”[৩৪]

কিন্তু কেবল প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে এ দেশের দরিদ্র মানুষকে—বিশেষতঃ পল্লীবাসীকে সীমাবদ্ধ রেখেই যে স্বরাজ আসবে না রবীন্দ্রনাথ জানতেন। পরিবর্তিত সমাজ-পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নবীন প্রগতিশীল উদ্ভাবনী শিক্ষার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন— “ আমার মতে শিক্ষার প্রণালী হচ্ছে বৈরাগীর রাস্তায়। ছাত্রদের নিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। চলতে চলতে নিয়ত নব নব বিস্ময়ে অজানার ভিতর দিয়ে জেনে চলাই হচ্ছে প্রাণবান শিক্ষা। প্রাণের ছন্দের সঙ্গে এই শিক্ষাপ্রবাহের তাল মেলে।বদ্ধ ক্লাস হচ্ছে প্রাণধর্মী চিত্তের সহজ জ্ঞানের পথে কঠিন বাধা। খাঁচার মধ্যে পাখিকে বাঁধা খোরাক খাওয়ানো যায়, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ পাখি হতে শেখানো যায় না। বনের পাখি ওড়ার সঙ্গে খাওয়ার মিল করে আনন্দিত হয়। প্রকৃতির অভিপ্রায় ছিল চলার সঙ্গে পাওয়ার মিল করে মানুষকে শেখানো। কিন্তু, হতভাগ্য মানবসন্তানের পক্ষে চলা বন্ধ করে দিয়ে শেখানোই শিক্ষাপ্রণালী বলে গণ্য হয়েছে। তাতে কত ব্যর্থতা, কত দুঃখ তার হিসেব কে রাখে। আমি তো পথ-চলা শিক্ষাব্যবস্থার কথা অনেকবার প্রস্তাব করেছি। কিন্তু কারো মন পাই নে। কারণ, যারা ভদ্র শিক্ষা পেয়েছে তারা বাঁধনের শিক্ষাকেই বিশ্বাস করতে শিখেছে। আমার ভাগ্য আমাকে শিক্ষায় বিবাগী করেছে বলেই খোলা পথের শিক্ষার ধারাকেই আমি সব চেয়ে সম্মান দিই।”[৩৫]

রবীন্দ্রনাথ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের পল্লী তথা সকল স্তরের মানুষের প্রবেশকে অবাধ করতে চেয়েছিলেন। সে কারণেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। শ্রীনিকেতন উৎসবে কথিত একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন—“ আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষাবিধি বলে একটা পদার্থের আবির্ভাব হয়েছে। তারই নামে স্কুল কলেজ ব্যাঙের ছাতার মতো ইতস্তত মাথা তুলে উঠেছে। এমনভাবে এটা তৈরি যে, এর আলো কলেজি মণ্ডলের বাইরে অতি অল্পই পৌঁছয়—সূর্যের আলো চাঁদের আলোয় পরিণত হয়ে যতটুকু বিকীর্ণ হয় তার চেয়েও কম। বিদেশী ভাষার স্থূল বেড়া তার চার দিকে। মাতৃভাষার যোগে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি সে চিন্তার সাহস অতি অল্প। সে যেন অন্তপুরিকা বধূর মতোই ভীরু। আঙিণা পর্যন্তই তার অধিকার, তার বাইরে চিবুক পেরিয়ে তার ঘোমটা নেমে পড়ে। মাতৃভাষার আমল প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেই, অর্থাৎ সে কেবল শিশুশিক্ষারই যোগ্য—অর্থাৎ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা শেখার সুযোগ নেই, সেই বিরাট জনসং ঘকে বিদ্যার অধিকার সম্বন্ধে চিরশিশুর মতই গণ্য করা হয়েছে। তারা কোন মতেই পুরো মানুষ হয়ে উঠবে না, অথচ স্বরাজ সম্বন্ধে তারা পুরো মানুষের অধিকার লাভ করবে, চোখ বুজে এইটে আমরা কল্পনা করি।”[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার বিকাশের স্বার্থে নানারকম গবেষণা যাতে চালানো যেতে পারে তার অনুকূলে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই বিপুল কর্মযজ্ঞের যাঁরা ঋত্বিক ছিলেন তাঁদের সহায়ক ভূমিকাও কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে রথীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন—" গোরাকে বোম্বাইয়ে চেষ্টা করবার জন্য রেখে এলুম। সেখানে সে technical এর জন্যে কিছু করতে পারবে বলে আশা হয়। লেগে থাকতে পারলে তবে চেষ্টা সফল হতে পারে, একবার এসে ঘুরে গেলে কিছুই হয় না। Morris বলেচে এবার বোম্বাইয়ে গিয়ে মাসখানেক রীতিমত চেষ্টা করলেই টেকনিকালের দরকার মত টাকা ও জিনিষ সে নিশ্চয়ই জোগাড় করতে পারবে। এন্ড্রুজকে লিখে দিয়েচি টাটাকে এই জন্যে বিশেষ করে ধরতে। ক্ষিতিমোহন বাবু এলে টাকা তোলার কাজে শিকি পয়সার সাহায্য হত না, সুতরাং না এসে ক্ষতি হয় নি। শাস্ত্রীর প্রধান লক্ষ্য পুঁথি সংগ্রহে, সেইকাজে তিনি লেগে গেছেন, কিন্তু টাকা সংগ্রহ তাঁর দ্বারা কতটা হবে ঠিক জানিনে। বোধ হচ্চে তিনি লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে কিছু টাকা তুলতেও পারেন। আমাদের ওখানে ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বই খুব কম আছে—যদি লাইব্রেরির নামে হাজার দশেক টাকা ওঠে তাহলে রিসার্চ করবার উপযুক্ত বই সংগ্রহ হতে পারবে।"[৩৭]

গোরা অর্থাৎ গৌরগোপাল ঘোষ পরবর্তী সময়ে শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পল্লী সংগঠন কর্মের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। গবেষণা ও সৃজনশীলতাকে যে রবীন্দ্রনাথ অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন তার পশ্চাতেও আমাদের দেশের বিশেষ সমাজ পারিপার্শ্বিকতা ক্রিয়াশীল থেকেছে। চীন থেকে রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—" আমাদের দেশের শিক্ষিতদের বুদ্ধিবৃত্তি স্কুল-বয় শ্রেণীর, নিতান্ত হাল্কা, পড়া মুখস্থ করা গোচের। এদের সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে প্রায়ই মাঝে মাঝে চমক লাগে। এরা ভাবতে জানে, এবং এমন সব কথা বলে যাতে ভাবিয়ে দেয়। .... এদের সঙ্গে আমাদের এতটা তফাৎ কেন অনেক ভেবেচি। আমার মনে হল, যেমন প্রাচীন অরণ্যভূমিতে বহুযুগের পাতা পড়ে মাটি স্তরে স্তরে জীবনীশক্তিতে ভরে ওঠে এদেরও তাই—এদের মনের জমি তৈরি। আমরা বাঙালীরা ঘোর পাড়াগেঁয়ে, হঠাৎ শিক্ষিত হয়ে বুলি আওড়াতে শিখেচি, বিদ্যাকে অন্তরঙ্গ করে নিতে পারি নি। সেইজন্যে আমাদের দেশে পলিটিক্স ছাড়া বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে অধিকাংশ লোকেই রস পায় না। ওখানে ভালো করে ভাববার ও কথা কবার সুযোগ হয় না—নিতান্ত খেলোরকমের আলোচনায় ওখানকার দিন রাত্রি ফেনার মতো ভেসে চলে যায়—মানুষগুলো সজীব খবরের কাগজ—চিন্তার চেহারা অবাস্তব পোলিটিকাল বক্তৃতামঞ্চ ও দৈনিক কাগজের ছাঁচে ঢালা।"[৩৮]

পল্লীউন্নয়নের জন্য যার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ খুব বেশী করে অনুভব করেছিলেন সেটি হল বয়স্ক শিক্ষার প্রসার। রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এরই ছবি দেখে

অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৩০-এ মস্কো থেকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—" আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্চে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা যে কি আশ্চর্য্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্চে তা দেখ্‌লে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্ম্মা হয়ে না থাকে এ জন্যে কি প্রচুর আয়োজন ও কি বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্যে নয়—মধ্য এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেচে—সায়ান্সের শেষ ফসল পর্য্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই।"[৩৯] এর প্রায় বছর দশেক পরে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ভাবনার অভিপ্রকাশ ঘটিয়ে লিখেছেন—" পৃথিবীতে আজ যে-সব জাতি যে কোনো রকম লড়াই চালাচ্ছে তাদের সকলেরই জোর সর্বজনীন জনশিক্ষায়। বর্তমান যুগ শিক্ষিত বুদ্ধির যুগ, স্পর্ধিত মাংসপেশীর যুগ নয়। জাপানের তো কথাই নেই—বড়ো বড়ো অন্য সকল প্রাচ্য জাতিই সর্বত্র জনশিক্ষাসত্র খুলেছেন। আজকের দিনে আমরা দেশের বহু কোটি চোখ-বাঁধা মোহের বাহন নিয়ে এগোতে পারব না। মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রেখে জনশিক্ষায় মন দিয়েছেন। বোধ করি প্রমাণ পেয়েছেন ভীড় জমিয়ে অসহযোগ দেখতে দেখতে অসহ্য হয়ে ওঠে।"[৪০]

রবীন্দ্রনাথ এই দীক্ষায় শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক ছাত্রই পল্লীর শিক্ষাবিস্তারের ন্যায় মহৎ কাজে পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারই দৃষ্টান্ত মেলে আশ্রমের ভূতপূর্ব ছাত্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধবাসরে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত একটি ভাষণে—" ভুবনডাঙার গরীবদের জন্যে সে এখানে যে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে গেছে, তার কথা তোমরা সবাই জান। চাঁদা সংগ্রহ করে আমরা অনেক সময়ে মঙ্গল অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু তার চেয়ে বড় হচ্চে নিজের সাধ্য দ্বারা, নিজের উপার্জনের অর্থের দ্বারা কাজ করা। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে মুলু তাই করেচে। সে পুরানো কাগজ নিযে বোলপুরে বয়ে নিয়ে বিক্রী করে এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ কর্‌ত। সে নিজে তাদের শেখাত, তাদের আমোদ দিত। এ সম্বন্ধে আশ্রমের কর্তৃপক্ষের কোনো সাহায্য সে নেয়নি। এই অনুষ্ঠানটি কেবল যে তার ইচ্ছা থেকে প্রসূত, তা নয়, তার নিজের ত্যাগের দ্বারা গঠিত।"[৪১]

শ্রীনিকেতনে এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ লোকশিক্ষাসংসদ নামে স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাগ গড়ে তুলেছিলেন। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েচি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করচে। আমাদের কর্ম্মীরা কিছুদিন যদি এখানে

এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তাহলে ভারি উপকার হত।”[৪২] শিক্ষাসত্রের বহুমাত্রিক উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“ আমাদের সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র হচ্চে শ্রীনিকেতন এই কথা আমাদের মনে রাখা চাই। শিক্ষাসত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। একটুখানি ছিটে ফোঁটা শেখানো নয়—গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার—বিশেষত ফলিত বিজ্ঞান। ম্যাডাম দিনা আমাদের ইলেক্‌ট্রিসিটি ও জল দেবেন কথা আছে। এরই কলঘরের কাজে ছেলেদের হাত পাকাতে হবে। আমাদের ওখানে ছাপাখানা আছে তাতেও পালা করে ছেলেদের শিক্ষানবিশি করা উচিত, তা ছাড়া মোটরের কাজ—শুধু গাড়ি চালানো নয়, ওর যন্ত্রতত্ত্ব। কলম ধরা ছাড়া আর সব বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাত দুটো থাকে আড়ষ্ট, সর্ব্বদা কল নাড়া চাড়া করে' এইটে ঘোচানো চাই। সমবায় প্রণালীর তত্ত্ব ওদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ করতে হবে; তারপরে শরীরবিজ্ঞান। এখানকার ছেলেদের মধ্যে বিভাগ করে কর্ম্মের ভার দেওয়া হয়েচে দেখ্‌লুম, ওদের আবাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একদল স্বাস্থ্য, একদল ভাণ্ডার ইত্যাদি নানারকম তদারকের দায়ত্ব নেয়, কর্তৃত্ব সবই ওদের হাতে, কেবল একজন পরিদর্শক থাকে। শান্তিনিকেতনে আমি চিরকাল এই সমস্ত নিয়ম প্রবর্ত্তন করতে চেষ্টা করেচি—কেবলি নিয়মাবলি রচনা হয়েচে কোন কাজ হয়নি।”[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ ‘রাশিয়ার চিঠি’তে লিখেছেন—“ মস্কৌ শহরে নদীতীরে সাবেক কালের একটি উদ্যানবেষ্টিত সুন্দর প্রাসাদে তুর্কমেনদের জন্য শিক্ষক শিক্ষিত করবার একটি বিদ্যাভবন (Turcomen People’s Home of Education) স্থাপিত হয়েছে। সেখানে সম্প্রতি একশো তুর্কমেন ছাত্র শিক্ষা পাচ্ছে, বারো তেরো বছর তাদের বয়স।”[৪৪] রবীন্দ্রনাথ যে পল্লীশিক্ষার সম্প্রসারণ চেয়ে পরবর্তীসময়ে শ্রীনিকেতনে শিক্ষাচর্চা বিভাগ খুলে শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলেন, তার পিছনে রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার প্রেরণা স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মে নারীশিক্ষা একটি বড় জায়গা জুড়ে আছে। এদেশের নারীদের শিক্ষার জন্য তার সচেতন প্রয়াস ও ভাবনার অন্ত ছিল না। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের পাশপাশি তাই রবীন্দ্রনাথ একটি বালিকা বিদ্যালয়েরও পত্তন করেছিলেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা ১৯০৯-এর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“ বিদ্যালয়টি বেশ পূর্ণ হয়ে এসেছে। ক্রমে এর পাশে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট চারা আপনিই গজিয়ে উঠেছে এবং হু হু করে সেটি বেড়ে ওঠবার মতলব করেচে।

অনেকদিন থেকে মনে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভয়ে এগই নি—ঠাকুর যখন আপনিই ঘরে এসেছেন পূজা না করে ত আর নিষ্কৃতি নেই।"[৪৫]

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নারীশিক্ষার এই উদ্যমকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং ক্রমশ একে শক্তপোক্ত রূপ দেবার প্রয়াস নিয়েছেন। পূর্বোক্ত চিঠিটি লেখার ঠিক সাত বছর পরে ১৯১৬-তে টোকিও থেকে রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বতন্ত্র আকাঙ্খা ব্যক্ত করে লিখেছেন—" তিন চার দিনের জন্যে এখানে একটি মেয়ে ইস্কুলে আতিথ্য ভোগ করে এসেচি। আমাদের সকলেরই খুব ভালো লেগেচে। জাপানী মেয়েদের উপর আমার ভক্তি বেড়ে গিয়েচে। আমি ত এদের মত এমন মেয়ে কোথাও দেখি নি। আমার ভারি ইচ্ছে হচ্চে এবার দেশে ফিরে গিয়ে সুরুলের বাড়িতে খুব ভালোরকম একটি মেয়ে ইস্কুল খুলবো। আমেরিকায় বই বিক্রি করে যদি যথেষ্ট টাকা পাই এবং যদি আবার দেশে ফিরি তাহলে এই আমার কাজ হবে।"[৪৬]

খ. স্বাস্থ্য :

পল্লীকে স্বনির্ভর করে তোলার প্রক্রিয়া হিসেবে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর স্বাস্থ্য কীভাবে রক্ষিত হতে পারে এই নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তখন পল্লীগ্রামে সরকারী চিকিৎসা ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজেই হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসার বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে নিজের এবং পল্লীর মানুষদের চিকিৎসা কাজে আত্মনিয়োগ করেন। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে জানিয়েছেন—

"আমি নিজের ডাক্তারি নিজেই করে থাকি। রোগের দুঃখটা আমাকেই ভোগ করতে হয় অথচ তার সুযোগটা অন্যে ভোগ করবে কেন? একসময়ে বহু যত্নে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার চর্চ্চা করেছিলুম। কিন্তু রোগের লক্ষণ এবং বহুবিস্তৃত ওষুধের ফর্দ্দের মধ্যে এত বেশি হাৎড়াতে হয় যে বইগুলো এবং ওষুধের বাক্সটা বিদায় করে দিয়েছি। এখন বাইয়োকেমিকের আশ্রয় নিয়েছি—ফল পাই ভালো। ....আমার নিকটবর্ত্তীদের উপরে চিকিৎসা চালাই—কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।"[৪৭]

১৯৩২-এ লেখা একটি পত্রে বাসন্তীদেবীকে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন—"তোমার মাকে বোলো তাঁর এক্‌জিমার ওষুধ কেলি সাল্‌ফ্‌ ও নেট্রম ম্যুর, ৬-এর পর্য্যায়ে। Kali Sulf, 6x Natrum Mur 6x। এখানে এসে আমার অনেকগুলি রোগী জুটে গেছে।"[৪৮] পল্লীর মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ এভাবে নিজেই চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। চিঠিপত্রের নবম খণ্ডে ১৫৮ সংখ্যক পত্রেও চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ পরিচয় নিহিত আছে।

বোলপুরের মত পল্লী অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নততর করে গড়ে তোলার জন্য সেখানে হাসপাতাল পত্তনের পরিকল্পনা করেন প্রাথমিক ভাবে। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যদুনাথ সরকারকে জানিয়েছেন—" গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ ও আরোগ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য হাঁসপাতাল সমেত একটি শিক্ষাবিভাগ খুলিবার চেষ্টা করিতেছি, হয়ত শীঘ্র ছোট আকারে তাহার গোড়াপত্তন করিতে পারিব।"[৪৯] পল্লী অঞ্চলের স্বাস্থ্যসুরক্ষার জন্য একজন প্রজাহিতৈষী জমিদার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নিয়ে কি নিঃসীম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে—

" ডাক্তারের কথা লিখেচ ওটা আলোচ্য বটে। কিন্তু যেহেতু ঐ একটা বড় খরচ যা আমরা নিজের স্বার্থে করিনে প্রজাদের জন্যে করি, এই কারণে ওটাতে হাত দিতে কিছুতে ইচ্ছা করেনা। এই ডাক্তার এবং ডাক্তারখানায় আমাদের জমিদাররীর এবং তারও চতুর্পার্শ্বের লোকের বিশেষ উপকার হয়েচে এই কথা যখন শুনতে পাই তখন সকল অভাবের দুঃখের উপর ঐ সুখটাই বড় হয়ে ওঠে। বিরাহিমপুরে প্রজাহিতের এই একটিমাত্র কার্য্যে সফল হয়েচি। লজ্জা এই যে হাঁসপাতালের চাঁদা আদায় করে' আজ পর্য্যন্ত তার একটি ইঁটও ভিতের উপর চড়েনি। আমাদের যা কিছু দেনা হয়েচে তা যদি আমাদের জমিদারীর এইরকম কাজের জন্য হত আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য শোক করতুম না—কেননা এই ঋণ অন্যদিকে এমনভাবে সেন্ট-পার্সেন্ট্ সুদের উপরে শোধ হত যে হ্যান্ডনোট লিখে আনন্দ করতুম। আমার ত সব চেয়ে দুঃখ হয় এই জন্যে যে, প্রজাদের জন্যে লোকসান করবার পূর্ণ অধিকার আমার হাতে নেই তাহলে আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে ওদের মধ্যে গিয়ে বসতুম—মনের সাধে বিষয় নষ্ট করতে করতে সুখে মরতুম। তাই অর্থ নষ্ট করবার যে সুবিধাটুকু এই জায়গায় তৈরি করতে পেরেচি তাই নিয়ে অন্তিম কাল পর্য্যন্ত কেটে যাবে—তার পরে যারা বিষয় ভোগ করচে তারা তার দায়ও ভোগ করবে, তাতে এই বিশ্বজগতের কি আসে যায়, আর, আমারি বা কি মাথাব্যথা ! "[৫০]

গ. ধনী-নির্ধনের ব্যবধান হ্রাস :

রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ গ্রাম পরিকল্পনা করেছিলেন, যে পল্লীসমাজের স্থাপনা চেয়েছিলেন সেখানে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানকে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার জন্য প্রয়াস নিয়েছিলেন। ধনী দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাসের অর্থ এই নয় যে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে অসাম্য থাকবে না। তেমনটা অতীতে ছিল এবং তখন আমাদের পল্লীসমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে একটি ধর্মের সম্পর্ক ছিল। একে অন্যের পরিপূরক হয়ে তারা কাজ করেছে এবং সমাজের ঐক্য ও সামঞ্জস্য বজায় থেকেছে। কিন্তু আজ ধনের ব্যক্তিগত সঞ্চয় যে

নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা ও মানবিক বিচ্ছিন্নতার জন্ম দিচ্ছে, তার অবসান চেয়েছিলেন। রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তারই ছবি দেখে অভিভূত হয়ে লিখেছিলেন—

"রথী, রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখচি আশ্চর্য্য ঠেকচে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলেচে। চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে কম পরে, কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্য্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোষে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে, সব কিছু থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিল্‌সুজ্, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"[৫১]

রাশিয়া এই সকল মানুষের উন্নয়নের দ্বারা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ সে দেশে গিয়ে দেখেছিলেন সর্বব্যাপী নির্ধনতার স্বতন্ত্র এক সামাজিক স্বরূপ— " আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দখা যায় না। তার প্রধান কারণ, আর-আর সব জায়গায় ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সব চেয়ে বড় করে চোখে পড়ে—সেখানে দারিদ্র্য যবনিকার আড়ালে নেপথ্যে; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর, দুঃখে দুর্দশায় দুষ্কর্মে নিবিড় অন্ধকার। কিন্তু বাইরে থেকে গিয়ে আমরা যেখানে বাসা পাই সেখানকার জানলা দিয়ে যা-কিছু দেখতে পাই সমস্তই সুভদ্র, শোভ্ সুপরিপুষ্ট। এই সমৃদ্ধি যদি সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেত তা হলে তখনই ধরা পড়ত, দেশের ধন এত কিছু বেশী নয় যাতে সকলের ভাত কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে জোটে। এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে; দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা। দেশ-জোড়া এই অধন আর কোথাও দেখি নি বলেই প্রথমেই এটা আমাদের খুব চোখে পড়ে। অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে তারাই একমাত্র।"[৫২]

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দেখেছিলেন একদিন ভারতের সমাজটাই ছিল প্রধানত পল্লীসমাজ। সেই সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত সম্পত্তির একটা সামঞ্জস্য ছিল। ধনী সেদিন আপনার ধনকে নিজের কাজে লাগাতে অগৌরব বোধ করতো। তারা সেদিন স্বেচ্ছা ও সমাজগত ইচ্ছার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে। পল্লীর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়নের সামাজিক ধর্ম পালন করেছে। ফলে—"......ধন ও অধনের একটা মস্ত বিভেদ তখন ছিল অবর্তমান। ধন আপন বৃহৎ সঞ্চয়ের দ্বারা নয়, আপন মহৎ দায়িত্ব পূরণ

করে তবে সমাজে মর্যাদা লাভ করত; নইলে তার ছিল লজ্জা। অর্থাৎ সম্মান ছিল ধর্মের, ধনের নয়। এই সম্মান সমর্পণ করতে গিয়ে কারও আত্মসম্মানের হানি হত না। এখন সেদিন গেছে বলেই সামাজিক-দায়িত্বহীন ধনের প্রতি একটা অসহিষ্ণুতার লক্ষণ নানা আকারে দেখা যাচ্ছে।”[৫৩]

বিশেষ করে ইউরোপীয় সভ্যতা নগরে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ঐশ্বর্য সেখানে ধনী-নির্ধনের ব্যবধানকে বাড়িয়ে তুলেছে। চ্যারিটির দ্বারা যেটুকু সেখানে যোগসাধন হয় তাতে সান্ত্বনা বা সম্মান কোনটাই নেই। সেখানে ধনী-নির্ধনের সামাজিক সম্বন্ধ বিকৃত কিংবা বিচ্ছিন্ন । ঐশ্বর্যের আড়ম্বর সেখানে ব্যক্তিগত ভোগে। জীবনযাত্রার আদর্শ বেনিয়ান ও উপকরণবহুল হওয়ায় ধনী নির্ধনের ভেদ সেখানে প্রবল হয়ে চোখে পড়ে। এই ভেদবুদ্ধি সমাজে কিভাবে মহামারী বা মড়কের মতো ছড়িয়ে পড়ে বিপদ ডেকে আনছে তার বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

“......আধুনিক কালে ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয় ধনীকে যে প্রবল শক্তির অধিকার দিচ্ছে তাতে সর্বজনের সম্মান ও আনন্দ থাকতে পারে না। তাতে একপক্ষে অসীম লোভ, অপর পক্ষে গভীর ঈর্ষা, মাঝখানে দুস্তর পার্থক্য। সমাজে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বড়ো হয়ে উঠলো। এই প্রতিযোগিতা নিজের দেশের এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর, এবং বাহিরে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের। তাই চারদিকে সংশয়হিংস্র অস্ত্র শাণিত হয়ে উঠেছে, কোনো উপায়েই তার পরিমাণ কেউ খর্ব করতে পারছে না। আর, পরদেশী যারা এই দূরস্থিত ভোগরাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃশতা যুগের পরে যুগে বেড়েই চলেছে। এই বহুবিস্তৃত কৃশতার মধ্যে পৃথিবীর অশান্তি বাসা বাঁধতে পারে না, এ কথা যারা বলদর্পে কল্পনা করে তারা নিজের গোঁয়ার্তমির অন্ধতার দ্বারা বিড়ম্বিত। যারা নিরন্তর দুঃখ পেয়ে চলেছে সেই হতভাগারাই দুঃখবিধাতার প্রেরিত দূতদের প্রধান সহায়; তাদের উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হচ্ছে।”[৫৪]

রবীন্দ্রনাথ তাই নির্ধন মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যাপারে সুবিধার জন্য প্রাণপাত করেছিলেন। রাশিয়ায় যে প্রয়াস দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজ জমিদারীর মধ্যে বহু পূর্ব থেকেই সে কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। এমনকি তিনি একটি চিঠিতে রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন—“ যে রকম দিন আসচে তাতে জমিদারীর উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চল্‌বে না। ও জিনিষটার উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চল্‌বে না। ও জিনিষটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল এবার সেটা আরো পাকা হয়েচে। যে সব কথা বহুকাল ভেবেচি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেচে। দুঃখ এই যে ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েচি।”[৫৫]

রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ মন নিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের পল্লীগুলির অতীত ঐতিহ্যের কথা। লিখেছেন—" একসময় আমাদের গ্রামে উচ্চনীচের ভেদ ছিল না তা নয়—প্রভু ছিল, দাস ছিল; পণ্ডিত ছিল, অজ্ঞান ছিল; ধনী ছিল, নির্ধন ছিল; কিন্তু সকলের সুখদুঃখের উপর সকলের দৃষ্টি ছিল। পরস্পর সম্মিলিত হয়ে একত্রীভূত একটা জীবনযাত্রা তারা তৈরি করে তুলেছিল। পূজা পার্বণে আনন্দ-উৎসবে সকল সম্বন্ধে প্রতিদিন তারা নানারকমে মিলিত হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে এসে গল্প করেছে দাদাঠাকুরের সঙ্গে। যে অন্ত্যজ সেও একপাশে বসে আনন্দের অংশ গ্রহণ করেছে। উপর-নীচ জ্ঞানী-অজ্ঞানীর মাঝখানে যে রাস্তা যে সেতু সেটা খোলা ছিল।"[৫৬]

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন দেশের মধ্যমপন্থী রাষ্ট্রনায়কেরা এই সকল মানুষগুলোর জন্য কিছু করা তো দূর অস্ত, কেবল না-পাবার নিষ্ফল ক্রন্দন ধ্বনিতে সময় অতিবাহিত করে চলেছে। এই নিষ্ফলা রাজনীতি সেদিন দরিদ্র ভারতবাসীর সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, তাদের শ্রেণীগত রূপান্তর আনতে পারেনি। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

" ......আমাদের দেশের মধ্যমপন্থী রাষ্ট্রনায়কদের নকল দেখা যাচ্চে আজ দেবসভায়। মেঘের গর্জ্জন নেই বিদ্যুৎ নেই, কেবল অজস্র অবিশ্রান্ত ক্রন্দনের পালা। চাষীরা তাকিয়ে ছিল এই বৃষ্টির আশায়। কচি ধানগুলো শুকিয়ে আসছিল সেই সঙ্গে চাষীদের মুখ। মর্ত্ত্যলোকে ওদের আছে মহাজন, আকাশে আছেন পার্জ্জন্য দেব,—উপরওয়ালা বর্ষণ না করলে নিচেরওয়ালাও বর্ষণ বন্ধ করে। আর ওরাই কূর্ম্মের মতো আমাদের সবাইকে, জমিদারকে উকিলকে ডাক্তারকে পণ্ডিতমশায়কে। অথচ ওরাই অস্পৃশ্য উপেক্ষিত অশিক্ষিত, আধপেটা, আধমরা।"[৫৭]

এই রাজনৈতিক নেতারা ভুলে গেছিল- " যাদের আমরা ছোটো করে রেখেছি মানবস্বভাবের কৃপণতাবশত তাদের আমরা অবিচার করেই থাকি। তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অর্থসংগ্রহ করি; কিন্তু তাদের ভাগে পড়ে বাক্য, অর্থটা অবশেষে আমাদের দলের লোকের ভাগ্যেই এসে জোটে। মোট কথাটা হচ্ছে, দেশের যে অতি ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশ নয়।"[৫৮]

রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তাই সেদিনের পল্লীগুলিকে মহাশ্মশানে পরিণত করেছিল। 'রাশিয়ার চিঠি'র একস্থলে রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন—"কিন্তু ভারতের যে ধনে বিদেশী বনিক বা রাজপুরুষেরা ধনী তার ন্যূনতম উচ্ছিষ্টমাত্রই ভারতের ভাগে পড়ে। পাটের চাষীর শিক্ষার

জন্যে, স্বাস্থ্যের জন্যে সুগভীর অভাবগুলো অনাবৃষ্টির নালাডোবার মতো হাঁ করে রইল, বিদেশীগামী মুনাফা থেকে তার দিকে কিছুই ফিরল না। যা গেল তা নিঃশেষে গেল। পাটের মুনাফা সম্ভবপর করবার জন্যে গ্রামের জলাশয়গুলি দূষিত হল—এই অসহ্য জলকষ্ট নিবারণের উদ্দেশে বিদেশী মহাজনদের ভরা থলি থেকে এক পয়সা খসল না। যদি জলের ব্যবস্থা করতে হয় তবে তার সমস্ত ট্যাক্সের টান এই নিঃস্ব নিরন্নদের রক্তের উপরই পড়ে। সাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে রাজকোষে টাকা নেই—কেন নেই। তার প্রধান কারণ। প্রভূত পরিমাণ টাকা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণই ত্যাগ করে চলে যায়—এ হল লোভের টাকা, যাতে করে আপন টাকা ষোলো-আনাই পর হয়ে যায়। অর্থাৎ জল উবে যায় এ পারের জলাশয়ে আর মেঘ হয়ে তার বর্ষণ হতে থাকে ও পারের দেশে। সে দেশের হাঁসপাতালে বিদ্যালয়ে এই হতভাগ্য অশিক্ষিত অসুস্থ মুমূর্ষু ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল অপ্রত্যক্ষভাবে রসদ জুগিয়ে আসছে।”[৫৯]

ঘ. আনন্দের পথে সাংস্কৃতিক উজ্জীবন, উৎসব ও অনুষ্ঠান :

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর একটি বিশেষ দিক ছিল আনন্দের পথে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন। এর দ্বারা পল্লীর স্তিমিত নিরানন্দ জীবনে আনন্দের সঞ্চার ঘটাতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন—

“ আনন্দ না থাকিলে উন্নতি হইবে কী করিয়া! আশা উৎসাহ সঞ্চয় করিব কোথা হইতে? অকৃতকার্যকে সিদ্ধির পথে বারবার অগ্রসর করিয়া দিবে কে! আমাদের এই নিরানন্দের দেশে উঠিতে ইচ্ছা করে না, কাজ করিতে ইচ্ছা করে না, একবার পড়িয়া গেলেই মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়। প্রাণ না দিলে কোনো কাজ হয় না—কিন্তু প্রাণ দিব কিসের পরিবর্তে! আমাদের প্রাণ কাড়িয়া কাড়িয়া লইবে কে! আনন্দ নাই, আনন্দ নাই—দেশে আনন্দ নাই, জাতির হৃদয়ে আনন্দ নাই। কেমন করিয়া থাকিবে! আমাদের এই স্বল্পায়ু ক্ষুদ্র শীর্ণ দেহ, অম্লশূলে বিদ্ধ, ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ, রোগের অবধি নাই—বিশ্বব্যাপিনী আনন্দসুধার অনন্ত প্রস্রবণধারা আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না—এই জন্য নিদ্রা তার ভাঙে না, একবার শ্রান্ত হইয়া পড়িলে শ্রান্তি আর দূর হয় না, একবার কার্য ভাঙিয়া গেলে কার্য আর গঠিত হয় না, একবার অবসাদ উপস্থিত হইলে তাহা ক্রমাগতই ঘনীভূত হইতে থাকে।”[৬০]

এই নিরুদ্যম আনন্দহীনতা থেকে পল্লীর মানুষকে মুক্তিদানের লক্ষ্যে নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাই রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনায় উৎসব অনুষ্ঠানের একটি মহৎ ও বৃহৎ ভূমিকা ছিল। এরকমই একটি অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পথে ও পথের প্রান্তে’ গ্রন্থে লিখেছেন—“ মেয়েরা ঋতুরঙ্গ অভিনয় করবে

আজ সন্ধ্যাবেলায়। তাদের অভ্যাস করাতে হবে। ......যারা লোকহিত-ব্রতপরায়ণ সন্ন্যাসী তারা বলে বাস্তব সংসারে দুঃখ দৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে এই বিলাসের অবতারণা কেন। তারা জানে 'দরিদ্রনারায়ণ' তো নাচ শেখেন নি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলই ছট্‌ফট্ করে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই। এরা এই কথাটা ভুলে যায় যে, দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হত তা হলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগত না, এটাকে পাগলামি বলতুম। কিন্তু ছন্দের এই সুসম্পূর্ণ রূপলীলাটি যখন দেখি তখন মন বলতে থাকে এই জিনিসটি অত্যন্ত সত্য—ছিন্নবিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছন্নভাবে চার দিকে যা চোখে পড়তে থাকে তার চেয়ে অনেক গভীরভাবে নিবিড়ভাবে।"[৬১]

পল্লীপুনর্গঠনে উৎসব ও অনুষ্ঠানের স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ অপর একটি চিঠিতে লিখেছেন—" আমরা যেখানেই যে কোনো কাজেই কয়েকজন মিল্‌তে চেষ্টা করেচি সেখানে কত ঔদাসীন্য, কত অহমিকা, কত বিরোধ ভেতরে থেকে নানা মূর্ত্তিতে বেরিয়ে পড়তে থাকে। এইসব গ্লানি দূর করবার জন্যে আমাদের মিলিত কাজকে সকলে এক হয়ে উৎসবের রূপ দেওয়া আবশ্যক। আনন্দকে সুন্দরকে নানা মূর্ত্তিতে নানা উপলক্ষ্যে প্রকাশ করা চাই। সেই প্রকাশে সকলেই আপন আপন ইচ্ছার আপন আপন শক্তির যোগদান করতে থাক্‌লে তবেই আমাদের ভিতরকার খোঁচাগুলো ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হয়ে যায়,—ঝরণার জল ক্রমাগত বইতে থাকলে তলার নুড়িগুলি যেমন সুডোল হয়ে আসে।"[৬২] দেশের মানুষের এই ঐক্যকে জাতীয় চেতনাকে সংগঠিত করার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রের শিবাজীর দেশপ্রেমকে সামনে রেখে শিবাজী উৎসবেরও প্রচলন করেন। সুবোধ চন্দ্র মজুমদারকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—" যে রকম গতিক দেখা যাচ্চে আগামী শনিবারের পূর্ব্বে যে ছুটি পাব, সে আশা দেখচি নে। এক লক্ষ্মীছাড়া শিবাজী মেলা নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত আটক পড়েছে, কাজেই তার পরে শুক্রবারে প্রবন্ধ পাঠ করে শনিবারে আমি খালাস পাব।"[৬৩]

পল্লীর নিরানন্দ জীবনকে আনন্দময় করে তোলার জন্য, মানব-ঐক্য ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করে গড়ে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সকল উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তাদের কতকগুলি জমিদারের কাছারিবাড়িতেই উদ্‌যাপিত হত। এতে সাধারণ প্রজারাও অংশ নিত। এরকম একটি উৎসব হল পুণ্যাহ উৎসব। এই উৎসবকে রবীন্দ্রনাথ প্রজাশোষক জমিদারের পুণ্যাহ উৎসব করে তোলেননি। এই উৎসবকে তিনি পল্লীর প্রজাদের কাছে আনন্দময় এক উৎসবে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই উৎসবের বর্ণনা দিয়ে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—" কাল বাজনাবাদ্য উপাসনা

ইত্যাদি করে পুণ্যাহ হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলায় কাছারিতে একদল কীর্ত্তনওয়ালা এসেছিল। তাদের কীর্ত্তন শুন্‌তে রাত এগারোটা হয়ে গেল।"[৬৪]

শান্তিনিকেতনেও নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত একাধিক নাটকের অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেন। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি পল্লীর মানুষেরাও এই অভিনয় দেখার সুযোগ লাভ করতো। অনুরূপ একটি উৎসব হল বসন্ত উৎসব। রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—" এখানে দোলপূর্ণিমায় এরা উৎসব করতে প্রস্তুত হচ্চে। ফাল্গুনীকে সংক্ষিপ্ত করে সেইটে আমবাগানে অভিনয়ের প্রস্তাব চলচে। ভালোই হবে বলে বিশ্বাস।"[৬৫] ' চিঠিপত্র' ৩য় খণ্ড-এর ৯০ সংখ্যক চিঠিতেও বসন্ত উৎসবের এবং ৯৬ ও ৯৭ সংখ্যক চিঠিতে বর্ষামঙ্গল উৎসব পালনের প্রস্তুতির কথা আছে। আর ১৮১ সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বর্ষামঙ্গল উৎসবের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—" বর্ষামঙ্গল উৎসবের আয়োজন চলচে। আগামী বৃহস্পতিবারে দিন স্থির হয়েছে। খুকু যদি আসতে পারত নাচ গানে সে নিশ্চয় খুশি হয়ে যেত। গোটা কয়েক নতুন গানও তৈরি করতে হোলো, নইলে এরা ছাড়ে না।"[৬৬]

শ্রীনিকেতনের যে দুটি উৎসবের সঙ্গে পল্লীর প্রজা বা কৃষকদের একেবারে প্রত্যক্ষ গভীর যোগ ছিল তা হল 'হলকর্ষণ' ও 'বৃক্ষরোপণ' উৎসব। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—" এখানে ও শ্রীনিকেতনে যে দুটো উৎসব হয়ে গেছে তার সমস্ত বিবরণ তোমরা পেয়েচ। এখানে হোলো বৃক্ষরোপণ, শ্রীনিকেতনে হোলো হলচালন। বৃক্ষরোপণের ইতিহাসটা তোমাকে লিখতে সঙ্কোচ বোধ করি—কিন্তু আমার বিশ্বাস মীরা সব কথা ফাঁস করে দিয়েচে। মীরা কাজটাকে অন্যায় বলেই আমাকে ভর্ৎসনা করেচে কিন্তু আমি ঠিক তার উল্‌টোই মনে করি। তোমার টবের বকুল গাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হোলো। পৃথিবীতে কোনো গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পারো না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল—শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন—আমি একে একে ছটা কবিতা পড়লুম—মালা দিয়ে চন্দন দিয়ে ধূপধূনো জ্বালিয়ে তার অভ্যর্থনা হোলো। এখন সে বেশ আছে, তোমার টব থেকে তাকে ধরায় অবতীর্ণ করানো হোলো—আমি এই উপলক্ষ্যে ছোট একটি গল্প লিখেছিলুম সেটা পড়লুম।"[৬৭]

ঙ. আত্মশক্তির বিকাশ :

রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রাণকেন্দ্র পল্লীকে তাঁর নিজস্ব শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আবহমান কাল থেকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন বাংলার পল্লী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থেকেও নিজের স্বাতন্ত্র্য নিজে বজায় রেখেছে। রাষ্ট্রের কতৃত্ব সেখানে গিয়ে তেমন

পৌঁছয় না। তাই ইউরোপীয় 'নেশন'-এর ধাঁচে নয়, রবীন্দ্রনাথ এদেশে যুগ যুগ ধরে টিকে থাকা গ্রাম-সমাজের ঐতিহ্যকে মান্যতা দিয়ে পল্লীস্বরাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। একটি চিঠিতে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— " আমাদের দেশে "নেশন" ছিল না ও নাই সে কথা সত্য—তাহার পরিবর্ত্তে কি আছে বা ছিল সেইটেই ভাল করিয়া বিচার্য্য। কারণ, ধরিয়া রাখিবার মত কিছু একটা না থাকিলে ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত যাহা আছে তাহা কি আশ্রয় করিয়া থাকিত ? "[৬৮]

আমাদের দেশের গ্রামসমাজই পল্লীর কল্যাণভার বহন করেছে। সুতরাং গ্রামসমাজকে ভিত্তি করে সামাজিক কল্যাণই এদেশের মুক্তির একমাত্র পথ। এই পথেই আমাদের দেশ ভিতর থেকে আত্মশক্তিতে বলবান হয়ে উঠলে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা সূচিত হবে বলে রবীন্দ্রনাথের অভিমত। এভাবে বৃহত্তর পল্লী-ভারতবর্ষ আত্মশক্তিতে ভিতর থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠলে সেই জাগরণই দেশের যথার্থ স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি আনবে বলে তিনি মনে করেছেন। নিছক রাজনৈতিক উত্তেজনা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতায় যে সে কাজ সম্ভব নয় তা তিনি বার বার জানিয়েছেন। জগদীশ চন্দ্র বসুকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

" মহাত্মাজি বলেচেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আমরা থাক্‌ব এবং সে রকম থাকবার ইচ্ছা না করা "religiously wrong" অর্থাৎ ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমি তা বলি নে। আমি বলি, স্বাধীনতা বাইরের কোন একটা ঘটনার উপর নির্ভর করে না; দেশের যে অবস্থা ঘট্‌লে স্বাধীনতার মূল পত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয় সে অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না—তার সাধনা তার চেয়েও কঠিন ও বিচিত্র—তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্যা চাই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা তপস্যা নয়। যে সব কাজে মনের সমস্ত শক্তির জাগরণ ও দীর্ঘকালের প্রাত্যহিক ত্যাগস্বীকার চাই সে কাজে যখন আমাদের ছেলেদের কোনো উৎসাহ দেখি নে যখন দেখি তারা নিরন্তর তীব্র হৃদয়াবেগের নেশায় মেতে থাকতে চায় "তদা ন সংশে বিজয়ার, সঞ্জয়।"[৬৯]

আসলে আমাদের দেশের অবস্থার সঙ্গে উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। আমাদের দেশের মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাদবর্তী, জাত-পাতের দ্বারা বিচ্ছিন্ন, অভাব-দারিদ্র্যে শতচ্ছিন্ন। পল্লীপ্রধান ভারতবর্ষের এটাই ছিল সেদিনের সাধারণ ছবি। এই দেশকে যদি ভিতরের দিক থেকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা না যায় তাহলে নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতাও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তাই রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—" সন্ন্যাসী বলচে তামাকে সোনা করবার একটা সহজ প্রক্রিয়া আমি জানি, আমি বল্‌চি সোনা

যথানিয়মে উপার্জ্জন করতে হবে অন্য কোন প্রক্রিয়া নেই—তখন তুমি যদি আমার উপর রাগ কর তাতে এই প্রমাণ হয় যে, উপার্জ্জন করবার মত উদ্যম তোমার নেই অথচ সোনা পাবার লোভ তোমার পুরো মাত্রায়—এমন মানুষকে বিধাতা পুরস্কার দেন না। চরকা চালিয়ে কোনো ফল হয় না এ কথা কেউ বলে না, তার যেটুকু ফল তাই হয় তার বেশি হয় না। কুইনিন্ খেলে ম্যালেরিয়া সারে, ম্যালেরিয়া সারলে দেশের পরম উপকার ঘটে, কিন্তু কুইনিন খেলে স্বরাজ হয় এ কথা কুইনীন বিক্রির মহাজনও বলে না"[৭০] এর ঠিক এগারো বছর পরে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎবাণীর সত্য স্বরূপটিকে স্পষ্টাক্ষরে চিহ্নিত হতে দেখা গেছে—"রাষ্ট্রিক অধিকারের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে আলোচনা চল্‌চে আজকাল—যেন লঙ্কাভাগ করতে বসেচি অথচ সমস্ত লঙ্কাই যাচ্চে তলিয়ে। তুমি তো সন্তানের জননী, হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ তোমার ছেলেমেয়েদের দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে একদিন তুমি চলে যাবে। কিন্তু সে কী ভবিষ্যৎ, ভেবে দেখো।"[৭১]

রবীন্দ্রনাথ বিদেশী শাসকের হাতে দেশবাসীর বিপর্যয়ের জন্য বিদেশী শত্রুকে নিছক দোষ দিতে নারাজ। তিনি মনে করেছেন এর মূল নিহিত আছে আমাদের নিজেদের মধ্যে। একটি চিঠিতে হেমন্তবালা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সন্দেহ নেই বিদেশীর হাত দিয়ে মার খেয়ে থাকি কিন্তু সেই বিদেশীকে দিয়ে আমাদেরকে আঘাত করাচ্চে কে? আমাদের ভিতরকার সেই পাপ সেই কলি যে চিরদিন দেশের মানুষকে নানা প্রকারে বঞ্চিত করে এসেচে—তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার মতো কৌতূহলও যার নেই। যে মারের জমি বহুকাল থেকে আমরা নিজের হাতে তৈরি করেচি সেইখানেই আজ শত শতাব্দীর বেশি কাল ধরে বিদেশী মারের ফসল বুনে আসচে।"[৭২] রবীন্দ্রনাথের এ মতকে সেদিনের রাজনৈতিক নেতারা গ্রহণ করেননি। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাশিয়া ঘুরে এসে আত্মবিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দিয়েছেন পল্লীকে বা জাতিকে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে দেশের যথার্থ হিত আসবে না। হেমন্তবালা দেবীকে আর একটি চিঠিতে জানিয়েছেন—

"আমি যখন "স্বদেশী সমাজ" লিখেছিলুম তখন তৎকালীন কন্‌গ্রেসওয়ালারা আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। বিদেশী গবর্মেন্টের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে রফানিষ্পত্তির কাজকেই তাঁরা ভারতবাসীর মোক্ষসাধন বলে স্থির করেছিলেন। তাঁরা অবজ্ঞা করে বলেছিলেন বেন্থাম প্রভৃতি পণ্ডিতরা স্টেট সম্বন্ধে যে মত প্রচার করেছেন আমি অশিক্ষাবশত সেসব কিছুই জানিনে বলেই এমন কথা বলতে পেরেছি যে প্রজারা নিজেদের শাসনশক্তি নিজেরাই উদ্ভাবন করতে পারে। আমি যদি ভালোমানুষের মত দেশের জনসাধারণকে বাদ দিয়ে ইংরেজিশিক্ষিত এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের যুগলমিলন ঘটিয়ে তাই নিয়ে কন্‌গ্রেসের মঞ্চের উপর স্বেদ কম্প পুলক প্রভৃতি দশ দশার শাস্ত্রবাহিত লক্ষ্মণ প্রকাশ করতে পারতুম,

তাহলে তখনকার দিনে উঁচু চৌকিই পেতুম। সে সুযোগ গেল। কিন্তু আমার সেদিনকার কথার টুক্‌রো নিয়ে পরবর্ত্তী অনেক দেশাত্মবোধী তাঁদের বাণীরূপে ব্যবহার করেছেন এবং দেশে ধন্য হয়েছেন। ......দেশের যথার্থ কাজ বল্‌তে আমি যা বুঝি তার জন্যে আমি নিজের সর্ব্বস্বান্ত করেছি, কিন্তু যেহেতু দশজনের ফরমাস মতো সে কাজ গড়া হয়নি, দেশাত্মবোধীরা কেউ তার ত্রিসীমানায় না এসেও দূর থেকে নিরন্তর তাকে নিন্দা করেছে অবজ্ঞা করেছে, বাধা দিয়েচে। তবুও আমার উপায় নেই। তাদের ছাঁচে ঢালাইকরা পুতুল বিক্রি করে বাজারে নাম করতে ইচ্ছা থাকলেও সেটা আমার সাধ্যের অতীত। অতএব শেষদিন পর্য্যন্ত আমার কাজ আমাকে করতেই হবে।”[৭৩]

এই কাজে রবীন্দ্রনাথ যে কঠোর বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—“ প্রায় সত্তর বছর হোলো—এতকাল আমার ধৈর্যচ্যুতি হয় নি। নিজেদের দেশের অতি দুর্ব্বহ মূঢ়তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশি করে দোষ দিয়েছি। অতি সামান্য শক্তি নিয়ে অতি সামান্য প্রতিকারের চেষ্টাও করেছি কিন্তু জীর্ণ আশার রথ যত মেইল চলেছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যার দড়ি ছিঁড়েছে, চাকা ভেঙেচে। দেশের হতভাগাদের দুঃখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়েছি। কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়েচি, তাঁরা বাহবাও দিয়েচেন , যেটুকু ভিক্ষে দিয়েচেন তাতে জাত যায় পেট ভরে না। সবচেয়ে দুঃখ এবং লজ্জার কথা এই যে তাঁদের প্রসাদলালিত আমাদের স্বদেশী জীবরাই সবচেয়ে বাধা দিয়েছে। যে দেশ পরের কর্ত্তৃত্বে চালিত সেই দেশে সবচেয়ে গুরুতর ব্যাধি হলো এই—সে সব জায়গায় দেশের লোকের মনে যে ঈর্ষা, যে ক্ষুদ্রতা, যে স্বদেশ বিরুদ্ধতার কলুষ জন্মায় তার মতো বিষ নেই।”[৭৪]

স্বদেশের বিরোধিতা বা দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি এদেশের মানুষ কতটা শ্রদ্ধাশীল তার একটি পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিলাত-প্রবাসী বাঙালিদের সম্পর্কে বলেছেন—“ বাঙালিরা ইংরেজদের কাছে স্বদেশের লোকেদের ও আচার ব্যবহারের যত নিন্দে করেন, এমন একজন ভারতদ্বেষী অ্যাংগ্লো-ইন্ডিয়ানও করেন না। তিনি নিজে ইচ্ছা করে কথা পাড়েন ও ভারতবর্ষের নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রাণ খুলে হাস্যপরিহাস করেন। তিনি গল্প করেন যে, আমাদের দেশে বল্লভাচার্যের দল বলে একরকম বৈষ্ণবের দল আছে। তাদের সমস্ত অনুষ্ঠান সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকেন সভার লোকদের হাসাবার অভিপ্রায়ে, নেটিব নচ-গার্লরা কী রকম করে নাচে অঙ্গভঙ্গি করে তার নকল করেন ও তাই দেখে সকলে হাসলে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর নিতান্ত ইচ্ছে, তাকেই ভারতবর্ষীয় দলের মধ্যে গণ্য না করে। সাহেব-সাজা বাঙালিদের প্রতি পদে ভয়, পাছে তাঁরা বাঙালি বলে ধরা পড়েন।”[৭৫]

রবীন্দ্রনাথ তাই যে কাজের কথা বলেছেন সে আসলে দেশের প্রাণকেন্দ্র পল্লীকে তার আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—"তাই মনে হয় নিজেদের স্বভাবগত সমাজগত প্রথাগত সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও নিজের দেশের ভার যে করেই হোক নিজেকেই নিতে হবে। পরের উপর নির্ভর করে থাকলে দুর্ব্বলতা বেড়েই চলে, তা ছাড়া ইতিহাসের আবর্ত্তমান দশাচক্রে অনন্তকাল ইংরেজের শাসন অচলপ্রতিষ্ঠ থাকতেই পারে না। নিজের ভাগ্য নানা ভুলচুক নানা দুঃখকষ্ট বিপ্লবের মধ্য দিয়েই নিজে নিয়ন্ত্রিত করবার শিক্ষা আমাদের পাওয়া চাই।-সেই শিক্ষার আরম্ভপথ আমার অতি ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারেই আমি নিয়েছিলুম।"[৭৬]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একথাকে কেউ গুরুত্ব দেয়নি। 'রাশিয়ার চিঠি'র একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—"কিন্তু যখন এ কথা কাউকে বলে কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকে শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্য কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হল—আচ্ছা , আমিই এ কাজে লাগব। এই সংকল্পে আমার সহায়তা করবার জন্যে সেদিন একটিমাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন।"[৭৭]

মহাত্মা গান্ধী কিন্তু একদা রবীন্দ্রনাথের ভাবনার গুরুত্বকে বুঝেছিলেন। তাই তিনি তাঁর আন্দোলনের অভিমুখ পরিবর্তন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—"তার স্বর উঠচে পলিটিক্সের হাটে। কিন্তু তার মধ্যে কী ক্ষুদ্রতা, কত মিথ্যার মিশোল সকল দেশের পলিটিক্সেই আছে। কিন্তু সে যেন দুধের সঙ্গে জলের মিশোল। আমাদের এখানে গোড়ার জিনিষটাই জল, অবাস্তবতা—তাতে হেবায়াই ট্যাবের দোকান থেকে কেনা টিনের দুধের ছিটে। গোড়ায় মস্ত ফাঁকি রয়ে গেছে—এতদিন ধ্বস্তাধ্বস্তির পরে তার দিকে মহাত্মাজির নজর পড়েছে।"[৭৮] সুতরাং মিথ্যা দিয়ে নয়, আত্মশক্তি অর্জনের মধ্য দিয়েই দেশকে সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রমের সাধনা করতে হবে—যেমনভাবে রাশিয়া করে চলেছে। সামাজিক জড়তা, আলস্যকে দূরে সরিয়ে ত্যাগের পথে আমাদের যাত্রা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় তাই জানিয়েছেন—

".........আমাদের জাগিবার সময় আসিয়াছে। আমরা সমাজের ভিতর হইতে ও বাহির হইতে আঘাত পাইতেছি, দুঃখ পাইতেছি। আমরা দৈন্যে দুর্ভিক্ষে পীড়িত। সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়াছে; একান্নবর্তী পরিবার খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতেছে; এবং সমাজে ব্রাহ্মণের পদ ক্রমশই এমন খাটো হইয়া আসিতেছে যে, 'ব্রাহ্মণসমাজ' প্রভৃতি সভাসমিতির সাহায্যে ব্রাহ্মণ চীৎকারশব্দে আপনাকে ঘোষণা করিয়া আপনার দুর্বলতা সপ্রমাণ করিয়া তুলিতেছে। পল্লীসমাজের পঞ্চায়েত-প্রথা গবর্মেন্টের চাপরাশ গলায় বাঁধিয়া আত্মহত্যা করিয়া ভূত হইয়া পল্লীর বুকে চাপিতেছে; দেশের অন্নে টোলের আর পেট ভরিতেছে না,

দুর্ভিক্ষের দায়ে একে একে তাহারা সরকারি অন্নসত্রের শরণাপন্ন হইতেছে; দেশের ধনী-মানীরা জন্মস্থানের বাতি নিবাইয়া দিয়া কলিকাতায় মোটরগাড়ি চড়িয়া ফিরিতেছে; এবং বড়ো বড়ো কুলশীল আপনার যথাসর্বস্ব এবং কন্যাটিকে লইয়া বি. এ. পাস-করা বরের পায়ে বৃথা মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। এই-সমস্ত দুর্লক্ষণের জন্য কলিযুগকে বিদেশী রাজাকে বা স্বদেশী ইংরেজিনবিশকে গালি দিয়া কোনো ফল নাই। আসল কথা, আমাদের দিনের বেলাকার প্রভু তাঁহার চাপরাশি পাঠাইয়াছে; আমাদের সনাতন শয়নাগার হইতে সে আমাদিগকে টানিয়া বাহির না করিয়া ছাড়িবে না।”[৭৯]

আমাদের নিজেদের মধ্যেকার এই দুর্বলতাকে অতিক্রম করে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। তা না করতে পারলে যে বাইরের শক্তির হাত থেকে রক্ষা নেই, সেকথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানিয়েছেন—“আমরা কিমা-করা মাংস, বাঁচবার জন্যে নই, গলাধঃকৃত হবার জন্যেই। আমাদের শতধাবিভক্ত জীর্ণ জনসমাজ কোনো আগন্তুক অকল্যাণকে এ পর্য্যন্ত ঠেকাতে পারে নি। আমরা আত্মঘাতী জাত; বাহির থেকে মারের নানা পথ নিজের হাতে সনাতনী নৈপুণ্যে পাকা করে বাঁধিয়ে রেখেছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী পরাভবে অভিভূত হতে হতেও তা নিয়েই শ্লাঘা ক'রে থাকি। মারটাই কেবল পেয়ে এসেছি তার থেকে শিক্ষা পাই নি। ইতিহাসে আমাদের সমস্ত দুর্ব্বলতা ও অস্বাস্থ্যের কারণগুলোকে সযত্নে সর্ব্বদেহেমনে পোষণ ক'রেও বেঁচে থাকব, আমরা বিধাতাপুরুষের এত বড়ো আদুরে ছেলে নই। পরের অনুকম্পার পরেই আমাদের পরিত্রাণ যদি নির্ভর করে তবে এই অনুকম্পালাভের জন্যেও শক্তির প্রয়োজন আছে। সেই শক্তির দ্বারা ভিক্ষার লাঘবতা অনেকটা দূর হয়। দুর্ব্বলের অহঙ্কার অত্যন্ত হেয়। সেই ক্লীব অহঙ্কার নিয়ে জোর গলায় আজকাল হুঙ্কার দিয়ে বলি, করব না ভিক্ষে, নিজের জোরেই দাবী সার্থক করব। ভালো কথা, কিন্তু হায় রে, জোড়ভাঙা সমাজে সেই নিজের জোরটা কোন্‌খানে?”[৮০]

আত্মশক্তি অর্জন বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝিয়েছেন, তার আলোচনা একাধিক চিঠিতেই আছে। জাতি তার ভিতরের সমস্ত দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠে ভিতরের দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠলেই আত্মশক্তির সাধনা সম্পূর্ণ হয়। অমিয় চক্রবর্তীকে অনুরূপ একটি চিঠিতে জানিয়েছেন—

“ আমার নিজের এত দিনের অভ্যস্ত পথেই আমি সান্ত্বনা পাই। গণদেবতার পূজা সকল পূজার আরম্ভে, আমাদের শাস্ত্রে এই কথা বলে। স্বদেশসেবায় সেই প্রথম পূজার পদ্ধতি হচ্ছে এমন সকল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যাতে জনগণ সুস্থ হয়, সবল হয়, শিক্ষিত হয়, আনন্দিত হয়, আত্মসম্মানে দীক্ষিত হয়, সুন্দরকে নির্মলকে আবাহন করে আনে আপন প্রাত্যহিক জীবিকার ক্ষেত্রে, এবং যাতে আত্মরক্ষায় আত্মকল্যাণসাধনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে সকলে সম্মিলিত হতে পারে। আমার সামান্য শক্তিতে ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে এই

কাজে মন দিয়েছি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে। মহাত্মাজী যখন স্বদেশকে জাগাবার ভার নিয়েছিলেন তখন একান্তমনে কামনা করেছিলুম তিনি জনগণের বিচিত্র শক্তিকে বিচিত্র পথে উদ্বোধিত করবেন। কেননা আমি জানি দেশকে পাওয়া বলতে বোঝায় তাকে তার পরিপূর্ণতার মধ্যে পাওয়া। দেশের যথার্থ স্বাধীনতা হচ্ছে তাই যাতে তার সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তি মুক্তিলাভ করে।"[৮১]

এই অবরুদ্ধ শক্তিকে জাগিয়ে তোলার উপায় নির্দেশ দানের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে একাধিক পত্রপত্রিকার প্রকাশের দ্বারা জনসচেতনতা তৈরির বন্দোবস্ত করেন। 'শান্তিনিকেতন' 'ভাণ্ডার'-এর মতো পত্রিকাগুলি এর দৃষ্টান্তবিশেষ। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের আধারেই তার পরিচয় নিহিত আছে। ১৯০৫-এ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে জানিয়েছেন—" ভাণ্ডার বাহির হইয়াছে— প্রথম সংখ্যা ছাপার ভুলের ভাণ্ডার হইয়াছে। ভাণ্ডারের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব ও প্রশ্ন, অমনি এক আধটা প্রবন্ধ ঠিক করিয়া রাখিবেন। এই কাগজটাকে কেজো কাগজ করিতে চাই।"[৮২]

চ. ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা ও তার বিকাশ :

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের উন্নয়নের পন্থা হিসেবে ব্যক্তির আত্মশক্তির সমূহ বিকাশ চেয়েছিলেন। তাই রাশিয়ায় গিয়ে সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা দেখে মনে হয়েছে— "...মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমতো ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসেবে এরা ফ্যাসিস্ট্‌দেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায়, ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে। এইরকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মতো ভাল ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনোই চিরদিন পারে না। উপযুক্তমত নায়ক পরম্পরাক্রমে পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।"[৮৩]

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ব্যষ্টির গুরুত্বকে আদৌ খাটো করে দেখেননি। তিনি যে সামাজিক সাম্য কল্পনা করেছিলেন তাতে ব্যষ্টি-বর্জিত সমষ্টির অস্তিত্ব অবাস্তব বলেই পরিগণিত হয়েছিল। একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন—"সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল বলেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেছে। ....সেই ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় করে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার করে দিয়ে সমাজরক্ষা করবে কে। অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্‌ণ যুগে বলশেভিক নীতিই

চিকিৎসা; কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেইদিনই রোগীর শুভদিন।”[৮৪]

ছ. চেতনার স্বাধীনতা :

রবীন্দ্রনাথ দেশোন্নয়নের কাজে নিয়োজিত হয়ে দেখেছিলেন দেশের মানুষ অশিক্ষা-অজ্ঞতার কারণে কি কূপমন্ডূকতার মাঝে বাস করে। তাই চেয়েছিলেন সত্তার বিস্তৃতি, চেতনার স্বাধীনতা। চিঠিপত্রেও তাঁর অনুরূপ ভাবনার সুস্পষ্ট অভিপ্রকাশ আছে। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন—

“আমাদের বাংলা দেশের কোণে একটা বিশ্বপৃথিবীর হাওয়া উঠেচে এইটে আমাদের সকলের অনুভব করা উচিত। এইখানে রামমোহন রায় সর্ব্বজনীন ধর্ম্মের আলোকে জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন—সেই প্রভাতের আলোকই বাংলাদেশের নবজাগরণের প্রথম ঊষালোক। সেই আলোকে যে বিশ্বের সুর বেজেচে সেই সুরই আমাদের সুর—সেই সুরই মানব ইতিহাসের আসন্ন ভাবীযুগের সুর। একদিন চৈতন্য আমাদের বৈষ্ণব করেছিলেন সেই বৈষ্ণবের জাত নেই কুল নেই—আর একদিন রামমোহন রায় আমাদের ব্রহ্মলোকে উদ্বোধিত করেচেন—সেই ব্রহ্মলোকেও জাত নেই দেশ নেই। বাংলা দেশের চিত্ত সর্ব্বকালে সর্ব্ব দেশে প্রসারিত হোক্, বাংলা দেশের বাণী সর্ব্বজাতি সর্ব্বমানবের বাণী হোক্। আমাদের বন্দে মাতরং মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র নয়—এ হচ্চে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌বে।”[৮৫]

চেতনার এই স্বাধীনতাই দেশের মানুষের মধ্যে নিয়ে আসবে প্রগতি। দেশের নারী সমাজের কাছে একারণেই রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা জানিয়েছেন সমস্ত রকম চেতনার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নবীন দিনের নবীন চেতনাকে বরণ করে নেবার মতো চেতনার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। একটি চিঠিতে কাদম্বিনী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“ ......সমস্ত জাতিকে জড়তার মধ্যে ডুবিয়া মরিতে দিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেকের উপরেই নবযুগের পরম দায়িত্ব রহিয়াছে—আসক্তির বন্ধন কাটিতেই হইবে, মুক্তির জন্য জাগিতেই হইবে—তোমরা দেশের মা, তোমরা দেশকে পিছনের দিকে টানিয়ো না—নূতনের মধ্যে অনেক আশঙ্কা অনেক বিপদ আছে তবু সেই যুগবিধাতার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া তোমাদের সন্তানদিগকে যাত্রার পথেই অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে।”[৮৬]

একই সময়ে লেখা অপর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বচেতনার সঙ্গে সংযোগের অত্যাবশ্যকতা ব্যক্ত করে জানিয়েছেন— “যে মনুষ্যলোকে আসিয়াছি সেখানে একটা প্রবেশাধিকার পাওয়া দরকার। এখান হইতেই ত পাথেয় সঞ্চয় করিতে হইবে।

পালা শেষ না করিতে পারিলে ত ছুটি নাই—মনুষ্যত্বের পালাটা সম্পূর্ণ করিতে হইলে তাহাকে সকল দিকেই পূর্ণ করিয়া যাইতে হইবে। অদ্যকার যুগে পৃথিবীর একটা মস্ত শক্তির ক্ষেত্র য়ুরোপ—সেখানে এমন একটি বিরাটের আবির্ভাব হইয়াছে যাহা সমস্ত জগৎটাকে টলাইতেছে—যাহা বিদ্যুৎকে বাঁধিতেছে, পৃথিবীকে দোহন করিতেছে, মানুষের চিত্তসমুদ্রকে মন্থন করিতেছে—তাহাকে যদি ভালো করিয়া দেখিয়া ও চিনিয়া না যাই তবে পৃথিবীর বর্তমান যুগের কাছ হইতে ঠিকমতো বিদায় লওয়া হইবে না।”[৮৭]

চেতনার এই সীমায়িত পরিসর ভারতবর্ষের মত দেশের আধ্যাত্মিক জাতিকে কতটা পঙ্গু ও কূপমন্ডূকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে তার ছবি এঁকেছেন কবি একাধিক পত্রে। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা এমনি একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—“ যথার্থ ভারতবর্ষ মহাভারতবর্ষ। মনুসংহিতা ও রঘুনন্দনের ছাঁটাকাঁটা হাড়-বেরকরা শুচিবায়ুগ্রস্ত ভারতবর্ষ নয়। যে দেশ কেবলি বিশ্বের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে নাক তুলে চলে সে রুগ্ন দেশ—আমি সেই বাতে পঙ্গু দেশের মানুষ নই। আমি ভারতবর্ষের মানুষ—সেই ভারতবর্ষ স্বাস্থ্যের প্রাবল্য দ্বারাই চিরশুচি,--সেই আমার মহাকাব্যের চিরন্তন ভারতবর্ষ।”[৮৮] এই মৃতপ্রায় পঙ্গু জাতিকে তাই প্রাণচৈতন্যে জাগিয়ে তোলাই রবীন্দ্রনাথের কাছে অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ‘চিঠিপত্র’ ৯ম খণ্ডের ১৪৯ সংখ্যক চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরূপ মানসচেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিছক একজন সমাজসংস্কারক নন, বিশ্বকবিও বটে। পল্লীসংগঠন কর্মে ঔপনিষদিক আদর্শে কাঙ্খিত মানব বিশ্ব গড়ে তুলতে গিয়ে এই বিশেষ দিকটিকে তিনি উপেক্ষা করেননি।

মানুষকে বিশ্ববোধে উপনীত করলেই কেবল তার পক্ষে বোঝা সম্ভব “ঐশ্বরিক বিধানকে যদি মানতে হয় তাহলে দেশে কালে তাকে বিশ্বভূমিকার উপরে স্থাপিত করা চাই। ব্রিটনের রাষ্ট্রনীতি যদি জগদীশ্বরের ইচ্ছানুকূল ধর্মনীতির অন্তর্গত হয় তা হলে সেই নীতির মধ্যে কেবল ইংরেজের নয় আমাদেরও সমান স্থান আছে। আমরাও মানুষ, আমরাও ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং আমাদের মানবমর্যাদা , আমাদেরও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ধর্মনীতির ক্ষেত্রে সম্মানের যোগ্য।”[৮৯] এই সম্মান, আত্মমর্যাদা ও অধিকারবোধে সমুন্নত জাতি গড়ে তোলার জন্যই বিশ্বচেতনার সঙ্গে প্রতিটি মানুষের সম্পৃক্তির আবশ্যকতা অনুধাবন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, লণ্ঠন লেকচার, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার স্থাপনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের অনুরূপ চেতনাপ্রসৃতি আনতে চেয়েছিলেন।

জ. রাজনৈতিক স্বাধীনতা :

রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন কর্মসূচীর একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু তার অর্জন যে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েই করাটা যথোপযুক্ত—

একথা রবীন্দ্রনাথ বারে বারে বলেছেন। আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সে পথ ধরে অগ্রসর হয়নি। সন্ত্রাস, উত্তেজনা, স্বার্থপরতা তাকে কলুষিত করেছে। এর ফলশ্রুতির দিকনির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছেন—"আমাদের দেশে জেল খাটাই মনুষ্যত্বের পরিচয়স্বরূপ হয়ে উঠ্‌চে। জেলখানার ভয় না ঘোচাতে পারলে আমাদের কাপুরুষতা দূর হবে না। দু চারজন করে জেলে যেতে যেতে ওটা অভ্যাস হয়ে যাবে—বিশেষ কিছু মনেই হবে না। যেমন আমাদের ম্যালেরিয়া আছে—মাঝে মাঝে ভুগচি, মাঝে মাঝে সারচে, মাঝে মাঝে মরচিও—জেলখাটাও আমাদের ভদ্রসমাজের তেমনি একটা নিত্যনৈমিত্তিক অনিবার্য্য আধিব্যাধির মধ্যে গণ্য হয়ে উঠ্‌বে।"[৯০]

একারণেই রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করার ভ্রান্ত নীতির বিরোধিতা করেছেন। 'চার অধ্যায়' উপন্যাস তারই প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশেষ। চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ মানসিকতার প্রতিরূপ স্পষ্টতই অঙ্কিত হয়েছে। নির্ঝরিণি সরকারকে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

" দেশের যে দুর্গতি-দুঃখ আমরা আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহার গভীর কারণ আমাদের জাতির অভ্যন্তরে নিহিত হইয়া রহিয়াছে—গুপ্ত চক্রান্তের দ্বারা নরনারী হত্যা করিয়া আমরা সে কারণ দূর করিতে পারিব না আমাদের পাপের বোঝা কেবল বাড়িয়াই চলিবে।

এই ব্যাপারে যে সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দণ্ডনীয় হইয়াছে তাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারেনা—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই দণ্ড আমাদের সকলের দণ্ড—ঈশ্বর আমাদিগকে এই বেদনা দিলেন—কারণ, বেদনা ব্যতীত পাপ দূর হইতেই পারেনা—সহিষ্ণুতার সহিত এ সমস্তই আমাদিগকে বহন করিতে হইবে—এবং ধর্ম্মের প্রশস্ততর পথকেই অবলম্বন করিতে হইবে।"[৯১]

দলীয় রাজনীতির সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বরাজ সাধনার কাজকে নিঃশব্দে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কারণ তিনি জানতেন - " প্রকৃত স্বাধীনতা ভাবের স্বাধীনতা। বৃহৎ ভাবের দাস হইলেই আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ ও গৌরব অনুভব করিতে পারি। তখন কেই বা রাজা কেই বা মন্ত্রী! তখন একটা উঁচু সিংহাসনমাত্র গড়িয়া আমাদের চেয়ে কেহ উঁচু হইতে পারে না। সেই গৌরব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সহস্র বৎসরের অপমান দূর হইয়া যাইবে, আমরা সকল বিষয়ে স্বাধীন হইবার যোগ্য হইব।"[৯২] কিন্তু সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনীতির দ্বারা এটা যে হবার নয়, জাতিকে জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার বেড়ায় শতধাবিচ্ছিন্ন করে যে তা করা সম্ভব নয়, সেটা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। তাই একটা সময়ের পর রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক দলগুলির থেকে নিজেকে

সরিয়ে নিয়ে আপন কার্যসিদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করেছেন। এর জন্য নানা সময়ে নানা রাজনৈতিক দলের বিরাগভাজন হয়েছেন। তাঁর জীবনের গভীরে জাতির এই ক্ষুদ্র লক্ষ্যভ্রষ্ট রাজনীতি কি তিক্ততার জন্ম দিয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে একটি চিঠিতে বলেছেন—" সুভাষ বসুর দল আমাকে তাদের এক বাজারে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করছিল। আমার শরীরের প্রতি তাদের দয়ামায়া নেই, জোর করেই বলতে হোলো তাদের বাজারে পদার্পণ করবার মহদুদ্দেশে আমি আয়ুক্ষয় করতে পারব না।

আমাকে ভিন্ন ভিন্ন দল বাঁটোয়ারা করে নিতে চায়—আমি আত্মরক্ষার জন্যে নির্লিপ্ত থাকিতে চাই—নইলে আমার কাজ বন্ধ হয়। সব দলকেই বিরক্ত করি। যদি না করতুম তবে এই সব ক্ষুদে দলদের তলায় দলিত হয়ে জীবন ব্যর্থ হোত। এত ক্ষুদ্রতা বাংলা দেশের বাইরে আর কোথাও নেই। পালাতে ইচ্ছা করে। পালাবার সময় হোলো। তখন স্মরণসভার ধূম লাগ্‌বে।"[৯৩]

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনয়নের ক্ষেত্রে আবেদন নিবেদনের নীতি নিয়ে চলেছে, দেশের আত্মশক্তির জাগরণের জন্য কোন প্রয়াস তাদের মধ্যে নেই। দীনেশ চন্দ্র সেনকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—" ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রাচীন শাস্ত্রের দিকে মনকে টানিয়াছিলেন politics সম্বন্ধেও সেইরূপ কিছুদিন হইতে দেশের লোককে দেশের দিকেই টানিবার চেষ্টা চলিতেছিল। তৎকালে শিক্ষিত লোকেরা যেমন সহজে শাস্ত্রের দিকে স্বদেশী ধর্ম্ম ও স্ব সমাজের দিকে ফিরিতে চাহেন নাই এখনকার দিনেও সেইরূপ শিক্ষিত agitationওয়ালা সহজে আবেদন নিবেদনের পালা বন্ধ করিয়া স্বদেশের জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইতে প্রস্তুত হন নাই।

.........ইতিমধ্যে আশু চৌধুরী বর্দ্ধমান কন্‌ফারেন্সে পোলিটিক্যাল ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপন করিয়া গালি খান। কিন্তু দেশ অন্তরে অন্তরে স্বদেশী ভাবে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে পার্টিশন ব্যাপার একটা উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া এই স্বদেশী আন্দোলনকে স্পষ্টরূপে বিকশিত করিয়া তুলিল। বস্তুতঃ বয়কট করার ছেলেমানুষী ইহার প্রাণ নহে।"[৯৪]

বয়কটের ছেলেমানুষীর কথা বাদ দিলেও মহাত্মা গান্ধী সেদিন রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশেষ পন্থা হিসেবে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মেনে নিতে পারেননি। চিঠিপত্রের ১২শ খণ্ডে ১৯২২-এ কালিদাস নাগকে লেখা ১২ক সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ মানসিকতার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

পরবর্তীকালে ১৯৩৪-এ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

"১৯১৬ থেকে ১৭ খৃষ্টশক পর্য্যন্ত আমেরিকায় বক্তৃতায় নিযুক্ত ছিলুম। সেই সময়ে সংবাপত্র যোগে খবর পাওয়া যেত,—মহাত্মাজি অসহযোগ প্রচার করচেন। এ কথা স্বীকার করব, আমার সেটা ভালো লাগে নি। তার কারণ, যেমন খিলাপতের লক্ষ্য ভারতবর্ষের বাইরে, অসহযোগের লক্ষ্য প্রায় তাই। ইংরেজরাজের সঙ্গে কোমর বেঁধে সহযোগই চালাই বা অসহযোগই জাগাই, তাতে আমাদের সাধনা কেন্দ্রভ্রষ্ট হয়। ওটা কলহমাত্র, সেই কলহের পরিণামে সার্থকতা নেই। মহাত্মাজি দেশের লোকের মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, অতবড়ো প্রভাব অপর পক্ষকে তারস্বরে অস্বীকার করবার নঙর্থক উদ্দেশে খরচ হয়ে যাচ্চে, এই কথা কল্পনা করে আমার মন পীড়িত হয়েছিল। সেদিন আমার মনে এই একান্ত কামনা জাগছিল যে মহাত্মাজি নিজের চারদিকে দেশের বিচিত্র শক্তিকে আহ্বান করবেন দেশের বিচিত্র সেবার কাজে। কারণ, দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য পূর্ত্তকার্য্য বাণিজ্য—এই কর্ত্তব্যগুলিকে প্রবল বলে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে চালনা করাই যথার্থ দেশকে লাভ করা, জয় করা। সকলে মিলে কেবল চরকার সুতো কাটায় দেশচিত্তের সম্পূর্ণ উদ্বোধন হতে পারেই না। জানি এই সংকল্পে বাধার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল—তখন সেই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করা সার্থক হোতো। এত দিন ধরে সংগ্রাম তো যথেষ্টি হোলো, দুঃখের তো অন্ত নেই। তার পরিবর্তে আজ রক্তহীন সাদা কাগজ পাওয়া গেল। সেই কাগজে শূন্যতা যথেষ্ট কিন্তু রচনা কতটুকু?"[৯৫]

একারণেই স্বায়ত্ত্ব শাসনের জন্য কংগ্রেস সেদিন দেশের সভায় সভায় উত্তেজনা বিস্তার করে আসছিল রবীন্দ্রনাথ তাকে দেশ উদ্ধারের যথার্থ পথ বলে মানেননি। এর অবাস্তবতা ও কৃত্রিমতা সম্বন্ধে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন—

"ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে নাচগান বর্ষণ করে বেড়ানো এই আমার এক কাজ হয়েচে। হাসি পায় মনে করলে যখন ভাবি এই সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রনেতারা সমস্ত দেশ জুড়ে বক্তৃতামঞ্চে কন্‌গ্রেসের উত্তেজনা বিস্তার করে বেড়াচ্চেন, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে কারো মনে কোন সন্দেহ মাত্র নেই। কিন্তু কী স্তূপাকার অবাস্তবতা, কৃত্রিমতা। এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের অনৈক্য কেবল ভাষাগত নয় স্থানগত নয় মজ্জাগত। পরস্পরের মানবসম্বন্ধ কেবল যে শিথিল তা নয়, অনেকস্থলেই বিরুদ্ধ। আমরা ভোটের ভাগবিভাগ নিয়ে তুমুল তর্ক বাঁধিয়েছি, যেন অন্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলেও ভোটের সামঞ্জস্যে এই ফাটল ধরা দেশের সর্ব্বনাশ নিবারণ করতে পারবে। আজকাল আমি সমস্ত ব্যাপারটাকে নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখবার চেষ্টা করি; মরবার কারণ যেখানে আছে সেখানে মরেই এর চেয়ে সহজ কথা কিছু নেই। পার্লামেন্টরি রাষ্ট্রতন্ত্র ! একি বিলিতি দাওয়াইখানা থেকে ভিক্ষে

করে আন্‌লেই তখনি আমাদের ধাতের সঙ্গে মিলে যাবে! নিয়ুয়র্কের আকাশ-আঁচড়া বাড়ি আমাদের পলিমাটির উপর বসিয়ে দিলে সেটা তার অধিবাসীদের কবর হয়ে উঠবে। সাদা কাগজের মোড়কে আমাদের ভাগে কী দান কী পরিমাণে এসে পৌঁছল সেটা বেশি কথা নয়, যাকে দেওয়া হচ্চে তারি পাঁচ আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে কতটা টেঁকে সেইটেই ভাববার বিষয়। সত্যি কথা বল্‌তে গেলে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় যে আমাদের এতখানি দিতে প্রস্তুত হয়েচে। সন্দেহ নেই যে এই দেওয়াটাই শেষ কথা নয়, এটা আমাদের ভবিষ্যতের বড়ো দাবীকে উত্তেজিত করে দেওয়া মাত্র—থলির মুখ খুলল, এর পরে শেষ পর্য্যন্ত থলি ঝেড়ে দিতে হবে,—ওর শিলমোহরটা এবার টুট্‌ল। বিদেশী সাম্রাজ্যের এতটা দাক্ষিণ্য ইংরেজ জাতের ছাড়া আর কোনো জাতের হাত দিয়ে হতে পারতো না। হয়তো এই দানের সঙ্গে সঙ্গে সুবুদ্ধিও আছে। জগৎ জুড়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘূর্ণিবাতাস জেগে উঠচে তাতে ভারতবর্ষের মন না পেলে ভারতবর্ষকে শেষ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করা সম্ভব হতে পারে না। যে মুসলমানকে আজ ওরা সকলরকমে প্রশ্রয় দিচ্চে সেই মুসলমানই একদিন মুষল ধরবে।”[৯৬]

রবীন্দ্রনাথ তাই এই ধরণের রাজনৈতিক স্বাধীনতায় আস্থা রাখতে পারেননি। এর অবাস্তবতার পাশাপাশি শাসকগোষ্ঠীর ফ্যাসিস্ট মানসিকতাকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক চিনে নিতে পেরেছিলেন। তাই সাবধানবাণী উচ্চারণ করে রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—“ ডান হাত দিয়ে নেশনের স্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে তাকে স্বাধীনতার ঢোক গিলিয়ে দেবার আশ্বাস দেওয়া কেবল ব্যক্তিবিশেষেরই অধিকারায়ত্ব এই সর্বনেশে মত দেশকে খোকা করে রাখবার উপায়। তুমি তো জানো আমাদের দেশে একদল সন্ন্যাসী গাঁজা খেয়ে বুদ্ধিকে বিহ্বল করে, সেটা তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গস্বরূপ। বুদ্ধিতে তারা বিশ্বাস করে না। ফাসিস্ট দলপতি দলের বুদ্ধির প্রতি একটুও বিশ্বাস রাখে না। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণরা যখন শূদ্রদের একেশ্বর অধিনেতা ছিলেন তখন সর্বাগ্রে তাদের বুদ্ধিকে পায়ের তলায় চেপে রেখেছিলেন—হুকুম ছিল পদধূলি পাবে, কিন্তু ছাড়া পাবে না, মেনে চলবে কিন্তু ভেবে চলবে না। পৃথিবীতে বোধ হয় সেই সব প্রথম প্রথম ফাসিস্ট নীতির প্রবর্তনা। কোনো রাষ্ট্রিক শক্তির অক্ষুণ্ণতা যদি নির্ভর করে অধিকাংশের বুদ্ধি-পঙ্গুতার পৃষ্ঠে স্বল্পাংশের বুদ্ধি-স্বাধীনতার নিরাপদে অধিরোহণ তাহলে—থাক্‌গে ও সব কথা, আমরা অন্য কালের লোক।”[৯৭] চিঠিপত্র ১১শ খণ্ডের ১১৮, ১২৯ সংখ্যক চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি উপনিবেশ দখলের লড়াইয়ে কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাতে মেতে উঠে মনুষ্যত্ববোধ ও মানবকল্যাণের বিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন।

ঝ. নারী ও তার স্বাধিকার :

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর একটি বড় দিক ছিল পল্লীর মানুষের আত্মিক উন্নয়ন। দেশের নারীশক্তির জাগরণ ও নারীকে তার স্বাধিকার প্রদান এই আত্মিক শক্তিকে জাগিয়ে তোলারই এক অনিবার্য প্রক্রিয়া বিশেষ। রবীন্দ্রনাথ নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র শক্তি ও সমানাধিকারকে নিজের জীবনাচরণে সত্য বলে মেনেছিলেন এবং তার গুরুত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন। নিজের স্ত্রীকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—

" আমাকে সুখী করবার জন্যে তুমি বেশি কোন চেষ্টা কোরো না—আন্তরিক ভালবাসাই যথেষ্ট। অবশ্য তোমাতে আমাতে সকল কাজ ও সকল ভাবেই যদি যোগ থাক্‌ত খুব ভাল হত—কিন্তু সে কারো ইচ্ছায়ত্ত নয়। যদি তুমি আমার সঙ্গে সকল রকম বিষয়ে সকল রকম শিক্ষায় যোগ দিতে পার ত খুসি হই—আমি যা কিছু জান্‌তে চাই তোমাকে তা জানাতে পারি—আমি যা শিখতে চাই তুমিও আমার সঙ্গে শিক্ষা কর তাহলে খুব সুখের হয়। জীবনে দুজনে মিলে সকল বিষয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়—তোমাকে কোন বিষয়ে আমি ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছা করিনে—কিন্তু জোর করে তোমাকে পীড়ন করতে আমার শঙ্কা হয়।"[৯৮]

দেশের উন্নয়নে, পল্লীসংগঠন কর্মে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন নারীশক্তির সংযোজন। তার স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার আবশ্যকতাকে উপলব্ধি করেছিলেন।কিন্তু আমাদের দেশের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস নারীশক্তির মুক্তির পথে ছিল প্রধান অন্তরায়। আমাদের রক্ষণশীল সমাজ নারীশক্তির সেই উপযোগিতা স্বীকার করেনি কিংবা নারীর স্বাধিকারের কথা ভাবেই নি। বরং নানাভাবে তারা এর বিরুদ্ধ অবস্থান নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে লিখেছেন—

" আমাদের দেশে মেয়েদের জীবনক্ষেত্র বেড়া দিয়ে খাটো করা, তার মধ্যে মানুষের চিত্ত সব খোরাক পায় না, উপবাসী থাকে। সুবিধা এই, অধিকাংশ মানুষ সঙ্কীর্ণ সীমার উপযুক্ত হয়েই জন্মায়, যাদের ডানা নেই আকাশের অধিকার হারালেও তাদের চলে। ঘরকন্নার সঙ্কীর্ণতা বা ধর্ম্মাচরণের সঙ্কীর্ণতা সে সব মেয়েদের মনকে বঞ্চিত করে না। বরঞ্চ তারা এই নিয়ে খেলাচ্ছলে একরকম আরাম পায়—তাদের কোনো নালিশ নেই। তোমার হৃদয় মনকে অত সহজে শিকল পরিয়ে তুমি দমিয়ে রাখতে পারচ না। তাই কষ্ট পাচ্চ। তোমার এই সঙ্কীর্ণ অবস্থায় থেকেও তুমি মুক্তির আস্বাদ পেতে পারতে যথেষ্ট পড়াশোনায়, এবং রচনার মধ্যে। বহির্জগতের স্বাধীনতা, যা তোমার নিজের ছেলের আছে, তা তোমার নেই,- মানুষের এই মস্ত অধিকার থেকে তুমি বঞ্চিত। কাজেই অন্তর্জগতের মধ্যে সঞ্চরণের স্থান

প্রশস্ত করা ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই। নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে' সেটাকে সত্য করে তুলতে পারো যদি তবে তাতেই পাবে আনন্দ।”[৯৯]

অপর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নারীশক্তি ও নারী-স্বাধিকারের স্বপক্ষে সওয়াল করে হেমন্তবালা দেবীকে লিখেছেন—“ দেশের জন্যে আমি তোমাকেও ভাবাতে চাই—তুমি কি দেশের মেয়ে নও ? ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে বেদনা দিতে আমার একটুও ভালো লাগে না—কিন্তু বিধাতার অভিসম্পাতে যে বেদনা প্রায় বিশকোটি হিন্দুর প্রাপ্য চোখ বুজে নিজেকে ভুলিয়ে তুমি তার থেকে নিষ্কৃতি পাবে কী করে ? এ সমস্ত ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক নয়—এ সমস্ত দুর্ভাবনা চতুর্দ্দিকব্যাপী সুকঠোর বাস্তবতার উপরে প্রতিষ্ঠিত।”[১০০]

রবীন্দ্রনাথ নারীদের বিষয়ে ঠিক এই অভিজ্ঞতাটি লাভ করেছিলেন জাপানে গিয়ে। সেখানকার মেয়েদের কুসংস্কারমুক্ত আন্তরিক প্রগতিশীলা স্বরূপটিকে দেখে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের কুসংস্কার-অন্ধবিশ্বাস-সামাজিক রক্ষণশীলতা নারীদের যে মনকে সঙ্কীর্ণ সীমায়িত পরিসরে আবদ্ধ করে রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে পরিণত করেছিল, তার বিপরীত ছবিটিকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন জাপানে। ‘জাপান যাত্রী’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

“লোকের কাছে শুনতে পাই এখানকার পুরুষেরা অলস ও আরামপ্রিয়, অন্য দেশের পুরুষের কাজ প্রায় সমস্তই এখানে মেয়েরা করে থাকে। ......কেবল বাইরে বেরতে পারাই যে মুক্তি তা নয়, অবাধে কাজ করতে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড়ো মুক্তি। পরাধীনতাই সবচেয়ে বড়ো বন্ধন নয়, কাজের সংকীর্ণতাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠোর খাঁচা।

এখানকার মেয়েরা সেই খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে এমন পূর্ণতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাছে সংকুচিত হয়ে নেই; রমণীয় লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী।”[১০১]

এই নারীকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাঙ্খিত নারীর প্রতিরূপ বলে মেনেছিলেন। দেশের জন্য এঁদের কথাই ভাবতে হবে বলে জানিয়েছেন। তাই একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন—

“ যদি আবার চীন জাপান দিয়ে ভারতবর্ষে যাই তাহলে একবার এইসব আসবাব এখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। কিন্তু জাপানী মেয়েরা না হলে এসব জিনিস তেমন সুন্দর করে করা যায় তা চিরদিন অনুভব করতে পারতুম। এবারে কয়দিন এখানকার মেয়ে কলেজের অতিথি হয়ে এদের মেয়েদের হৃদয়ের গভীরতা সরলতা, শ্রদ্ধাপরতা ও মাধুর্য্য দেখে পিয়ার্সন মুকুল এন্ড্রুজ আমরা সকলেই খুব আশ্চর্য্য হয়েচি। এরকম যে কোনো

য়ুরোপীয় মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না। একথা এরা মানতে বাধ্য হয়েচে। যেটা আশা করিনি সেই আন্তরিক ধর্ম্মভাব এদের মধ্যে দেখে আমি বড় গভীর তৃপ্তি লাভ করেচি।"[১০২]

নারীর চিত্তশক্তির পূর্ণ বিকাশ চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কেবল পরিবার জীবনের সীমায়িত পরিসর থেকে মুক্ত করে জাতির মনন ও শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে নারী তার স্বকীয় অভিজ্ঞান গড়ে তুলুক—রবীন্দ্রনাথের এই ছিল ঐকান্তিক শুভৈষণা। অপর একটি চিঠিতে তিনি আক্ষেপ করে তাই নির্ঝরিণী সরকারকে লিখেছেন—

"আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের কবিত্বশক্তি থাকিলেও তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে না। তাহারা অন্তঃপুরে যে পারিবারিক গণ্ডীটুকুর মধ্যে বদ্ধ থাকেন সেখানে জীবনের অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ এবং সেখানে কল্পনাবৃত্তি প্রসারতা লাভ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া নানা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যরচনার সহিত পরিচয়ের দ্বারা চিত্তবৃত্তির যে স্ফূর্তি ঘটে আমাদের মেয়েদের সে সুযোগও অতি অল্প।"[১০৩]

ঞ. কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতা :

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের মর্মমূলে ধর্মের নামে কুসংস্কারের পাহাড়কে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে দেখেছিলেন। ধর্মের নামে মূঢ়তা আসলে আমাদের শক্তিকেই পঙ্গু করে তোলার অনিবার্য প্রক্রিয়াবিশেষ। তাই কাদম্বিনী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে পরাধীন ভারতের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছেন—" এখন আমাদের এমন সময় এসেছে যখন এই সমস্ত মোহজঞ্জালকে চিরাভ্যস্ত মমত্ববুদ্ধিবশত স্বদেশের মর্ম্মস্থানে গুরুভার পর্ব্বতের মত স্তূপাকার জমিয়ে রাখা আর চল্‌বে না।"[১০৪] আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল মন মানুষের ধর্মকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ আচরণীয় ধর্ম বলে স্বীকার করেছে। মনুষ্যত্বের সাধনাই যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, মানব সেবাই যে ঈশ্বরের সমীপবর্তী হবার প্রশস্ত পথ সেকথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানিয়েছেন কাদম্বিনী দেবীকে লেখা অপর এক পত্রে— "ঠাকুরের বিবাহ দেওয়া, তাঁকে খাওয়ানো পরানো, ঔষধ খাওয়ানো ইত্যাদি নিরতিশয় খেলা। ঠাকুরকে খাওয়াতে পরাতে হয় বটে কিন্তু সে হচ্ছে যেখানে তিনি খান পরেন—সে কেবল মানুষের মধ্যে, জীবের মধ্যে। তাঁর সেবা তিনি সেইখান থেকেই সত্যভাবে গ্রহণ করেন—অন্য কোনো রকম করে দিতে গেলে তাঁকে ফাঁকি দেওয়া হয়।"[১০৫]

রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষকে এই নিরতিশয় মূঢ়তা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। এই মূঢ়তা জাতিকে জড়তা ও দাসত্বের নিগড়ে বেঁধে তাদের স্বাধীন চিন্তা ও প্রগতিশীলতাকে রুদ্ধ করে ফেলছে। কাদম্বিনী দেবীকে লিখেছেন—" তাহারা দেবতাকে যেভাবে গ্রহণ করে, দেবকাহিনীসকলকে যেরূপ অত্যন্ত ক্ষুদ্রভাবে বিশ্বাস করে এবং ধর্ম্মের নামে যেরূপে মনুষ্যত্ববিরুদ্ধ দুর্নীতিকেও বরণ করিয়া লয় তাহাতে কি সমস্ত জাতির

মর্ম্মস্থলে মৃত্যুবাণ বাজে নাই ? দেশের মানুষকে কি এইরূপ অন্ধতার মধ্যে ফেলিয়া রাখিব?"[১০৬] একারণেই আজ দেশের দিকে দিকে জাত পাত অস্পৃশ্যতার বেড়া মানুষকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে সমাজের ঐক্যশক্তিকে শিথিল করে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীসংগঠন কর্মে দরিদ্রনারায়ণের সেবাকেই তাই উৎকৃষ্ট ধর্মসাধনা হিসেবে মেনেছিলেন। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন—"আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়, আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে.......।"[১০৭]

এ আসলে রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক ভাবনার উত্তরাধিকার। প্রথম অধ্যায়েই উল্লিখিত হয়েছে , রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা আদর্শ মানববিশ্ব গড়ে তোলারই এক ক্ষুদ্র প্রতীকী প্রয়াস মাত্র। একটি চিঠিতে হেমন্তবালা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে, যে উপনিষদকে একদা বাংলাদেশের বেদ-বর্জ্জিত নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেছিল রামমোহন রায়ের জাল-করা, --যে উপনিষদ মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন, যে উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব বলে গিয়েছেন জীবের প্রতি অপরিমেয় প্রীতিই ব্রহ্মবিহার, সেই পরম চরিতার্থতা দেউলে দরোগায় নয়,পাণ্ডাপুরোহিতের পদসেবায় নয়। ....মানুষের আত্মায় যিনি মহাত্মা, মানুষের কর্ম্মে যিনি বিশ্বকর্মা, আমি জেনে না জেনে সেই দেবতাকেই মেনেচি—তিনি যেখানে উপবাসী পীড়িত সেখান থেকে আমার ঠাকুরের ভোগ অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারিনে। খৃষ্ট বলেচেন, বিবস্ত্রকে যে কাপড় পরায়, নিরন্নকে যে অন্ন দেয় সেই আমাকেই কাপড় পরায়, নিরন্নকে যে অন্ন দেয় সে আমাকেই অন্ন দেয়—এই কথাটাই ব্রহ্মভাষ্য। এই কথাটাকেই "দরিদ্র্যনারায়ণ" নাম দিয়ে হালে আমরা বানিয়েছি—দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণকে উপলব্ধি ও সেবা করার কথাটা ভারতের জালস্বাক্ষর করা—আমাদের উপলব্ধি প্রধানত গো-ব্রাহ্মণের মধ্যে।"[১০৮] 'চিঠিপত্র' ৯ম খণ্ডের ২১, ২৩, ২৪ নং পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাই জাতপাতের ঊর্ধ্বে মানবকল্যাণকেই মহৎ ধর্ম হিসেবে মেনেছেন। এই ধর্মকেই অন্তরের ধর্ম হিসেবে স্বীকার করার জন্য পল্লীর মানুষের চৈতন্যের জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। কেননা বাহ্যিক আচারসর্বস্ব ধর্মই দেশে দেশে পল্লীতে পল্লীতে মানুষের মধ্যে রক্তপাত ও বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলেছে। সমাজ এক সঙ্কীর্ণ দলতান্ত্রিকতার শিকার হয়ে এক সার্বিক মূঢ়তার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।

হেমন্তবালা দেবীকে লেখা অপর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— " যারা স্বভাবতই দলচর লোক তারাও দলের চাপরাস পরে সগর্ব্বে খুসি হয়ে বেড়ায়। সকল ধর্ম্মসমাজেই দলের অত্যাচার আছে। কেননা, অধিকাংশ লোকেরই অন্তরের আবরণ শেষ পর্যন্ত খোলে না। এই কারণে তারা বাইরের দিক থেকে চালিত হবার ঔৎসুক্যে বাহ্যিকতাকেই চিরদিনের মতো আঁকড়ে ধরে এবং তারাই এই বাহ্যিকতার জবরদস্তি নিয়ে

অন্যের উপর অত্যাচার করতে ছাড়ে না। ধর্ম্মের নামে যত উন্মত্ততা যত রক্তপাত সে তো এই বাহ্যিককে নিয়েই। ধর্ম্মের অভিমান এই নিয়েই, মূঢ়তা এইখানে।"[১০৯] 'চিঠিপত্র' ৯ম খণ্ডের ৩০ সংখ্যক চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি, চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলিম সংঘাত যে ব্যাপক গণহত্যা ঘটায় তার জন্য রবীন্দ্রনাথের মন কিরকম অশান্ত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সীমিত সামর্থ্য নিয়ে পল্লীসমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু সমাজকে একেবারে ভেঙে দিয়ে নতুন সমাজ গড়ার কথা রবীন্দ্রনাথ ভাবেননি। এদিকের বিচারে বলা চলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সংস্কারপন্থী মানসিকতার অধিকারী। একটি চিঠিতে হেমন্তবালা দেবীকে জানিয়েছেন– " সমাজ নিয়ে ভাঙাগড়া করবার সখ আমার একটুকুও নেই, তবে এটা জানি যে, এই অচল জড় সমাজ গলায় বেঁধে আমরা দুর্গতির তলায় নেবেছি। বিদেশী শত্রুকে ভয় করিনে কিন্তু এই সাংঘাতিক সমাজকে ভয় করি, মারের বীজ পুঁতে রেখেচে আমাদের মজ্জায়।"[১১০]

সমাজের যে ধর্মীয় কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতা আমাদের বুদ্ধিকে 'শৃঙ্খলিত' করে, পুরুষকারকে 'গুরুভারগ্রস্ত' করে, দৈহিক মানসিক রাষ্ট্রিক অমঙ্গলের সূত্রপাত ঘটায় রবীন্দ্রনাথ তাকে সমাজ থেকে উৎপাটিত করতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাসের পাশপাশি চিঠিপত্রেও এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উচ্চারিত হতে দেখা যায়। নিরর্থক সামাজিক আচার-আচরণের পশ্চাতে আমাদের দেশের যে শক্তির অপচয়, মনুষ্যত্বের অপমান, সামাজিক পশ্চাদপদতা তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে লিখেছেন–

"আমাদের দেশের ভক্তির সঙ্গে পূজার সঙ্গে সর্ব্বমানবের এমন বিচ্ছেদ, তার প্রতি এত ঔদাসীন্য যে সে আমি সইতে পারিনে। আচার বিচারের মূঢ়তায় সমস্ত দেশের বুক যে কি জোরে চেপে ধরেছে তা একখানা পাঁজি পড়লেই বোঝা যায়। ......অল্পদিন আগে আমাদের আশ্রমের কাছে একটি বিবাহ দেখেছি—তার স্ত্রীয়াচার বারো আনা বিশুদ্ধ বর্ব্বরতা। এই আচারের বর্ব্বরতায় সমস্ত দেশে আমাদের মনুষ্যত্বকে অপমানিত করচে। বিধাতার দত্ত বুদ্ধির সম্মান একেবারে ঘুচে গেছে, আমাদের স্বরচিত চোখে ঠুলি দেওয়া অন্ধতাকে আমরা ধর্মের নামে পূজা করি। এইখানে আমাদের পরাভব হতেই হবে। মানুষের দুঃখ আজ জগদ্ব্যাপী—তার মাঝখানে আমাদের সমাজ জুড়ে নিরর্থকতার বিপুল আয়োজন আমাকে লজ্জিত ও দুঃখিত করে। সে কথা তোমার কাছে লুকোতে পারিনে। তুমি মনে করতে পার এটা আমার মজ্জাগত বৈদেশিকতা, তা যদি সত্য হয় তাহলে স্বাদেশিকতা অশ্রদ্ধেয়। সম্প্রতি এখানে জগজ্জননীর নামে জীবরক্তের স্রোত বয়ে গেছে আর তাই নিয়ে যে উন্মত্ততা সে অনার্য্যের উন্মত্ততা—অথচ সেও ধর্ম্ম এবং মেয়েরাও এই রক্ত নিয়ে ছেলের কপালে ফোঁটা দিয়ে দেয়, মনে করে মা এর আশীর্ব্বাদ পেলে।"[১১১] এই ধর্মীয় উন্মত্ততা বা হিংস্রতা

সমাজে কি ভয়ঙ্কর রূপ নেয় তার পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে আর একটি চিঠিতে লিখেছেন— " বোলপুরের কাছে কঙ্কালীতলা বলে এক তীর্থে বৎসরে একবার বিশেষ পরবে নানা ভক্তের মানৎরূপে বহু শত পাঁঠার বলিদান হয়, নিকটের জলাশয় রক্তে লাল হয়ে ওঠে। এই লুব্ধ হিংস্রতাকে যদি পূজা নাম দিতে কুণ্ঠা না হয় তাহলে পাণ্ডার পা পূজাকেও ভক্তি নাম দিতে পার। ভক্তিকে রিপুর দলে ফেলো না।"[১১২]

এই ধর্মমোহ থেকে মুক্ত হতে না পারলে যে ভারতবর্ষের মুক্তি নেই সে কথা রবীন্দ্রনাথ 'চিঠিপত্রে'র একাধিক চিঠিতেই জানিয়েছেন। বলেছেন পারস্য, আরব, জাপান ধর্মমোহ থেকে মুক্ত হয়েই রাষ্ট্রক্ষেত্রে মুক্তি পাবার অধিকারী হয়েছে। ভারতবর্ষকেও এই পথেই মুক্তি অর্জন করতে হবে। মনুষ্যত্বের তথা আত্মশক্তির উদ্বোধনের পথেই আসবে সেই মুক্তি। তাই অস্পৃশ্যতা, ধর্মবিলাসিতা, ভাবমোহ থেকে মুক্ত হয়ে মানবিক দৃষ্টিকোণকে আরো প্রসারিত করতে হবে, মানব ধর্মকেই আন্তরিক ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে । কিন্তু হেমন্তবালা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন এ দেশের যে বিহ্বল ভক্তি—" সে মানুষকে চেয়ে দেখে না, ঠেকিয়ে রাখে; মানুষের মূঢ়তা মলিনতা দূর করবে কি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে অশ্রুবর্ষণ করে। নিজের শুচিতারক্ষার আগ্রহে তারা যদি মানুষকে দূরে রাখে তবে সেই সব মানুষের কলঙ্কগুলো জমে উঠ্‌বে না কেন? যখন তা চোখে পড়ে তখন তারা নিজের পবিত্রতাবোধের খাতিরেই নাসাকুঞ্চন করে কিন্তু সেই সব মানুষের পরিত্রাণের কথা ভাবে কি?"[১১৩]

রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন আমাদের দেশে মুসলিমের তুলনায় হিন্দু সমাজের মধ্যেই মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সব থেকে বেশি। এই অনৈক্য হিন্দু সমাজকে ক্রমশ যে আত্মিক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে তা রবীন্দ্রনাথের কাছে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—" মুসলমান, ধর্ম্মে এক, আচারে এক, বাংলার মুসলমান, মাদ্রাজের মুসলমান, পাঞ্জাবের মুসলমান এবং ভারতবর্ষের বাইরের মুসলমান সমাজে সবাই এক, বিপদে আপদে সবাই এক হয়ে দাঁড়াতে পারে । এদের সঙ্গে ভাঙাচোরা হিন্দুজাত পারবে না। আরো একবার আফগানিস্থানের পাঠানদের হাতে কানমলা খাবার দিন ঘনিয়ে আসচে। পি, সি, রায় অরণ্যে রোদন করচেন, বলচেন বাঙালির অন্ন পরের হাতে যাচ্চে। কিন্তু বাংলার মুসলমানরা পিছয় নি—দেশে বিদেশে তাদের দেখেচি জীবিকা উপার্জ্জনে—কেননা বিধিনিষেধের নাগপাশ তাদের হাজার পাকে জড়িয়ে রাখে নি। মজ্জাগত অনৈক্যজনিত দুর্ব্বলতা এবং সহস্রবিধ বিধিনিষেধের বোঝা ঘাড়ে করে এই জাত বাঁচবে কী করে?"[১১৪]

সনাতন হিন্দু সমাজই যে মুসলিমদের দূরে ঠেলে দিয়ে জাতিকে খণ্ডিত করেছে এবং করে চলেছে তা রবীন্দ্রনাথের চোখে স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। ১৯২২-এ কালিদাস

নাগকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানাচ্ছেন—" আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেচে। আমি যখন প্রথম জমিদারি-কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বস্তে দিতে হলে জাজিমের একপ্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য আচার অবলম্বীদের অশুচি বলে' গণ্য করার মত মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই।-ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে মুসলমানের মত দুই জাত, একত্র হয়েছে;—ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল,— আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল,— এক পক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এ'রা কি করে মিলবে?"[১১৫]

এভাবে যে আমাদের দেশের উন্নয়ন তথা জাতির স্বাস্থ্যকর মুক্তি কখনোই আসবে না এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট উচ্চারণ রেখেছেন হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি পত্রে— " মানুষকে হিন্দু সমাজ অবমাননার দ্বারা দূর করে দিয়েছে, সকলের চেয়ে লজ্জার বিষয় এই যে সেই অবমাননা ধর্ম্মের নামেই। সনাতনীরা নিত্যধর্ম্মবিদ্রোহী বলেই দেশবিদ্রোহী। মুসলমানের কাছে একদিন তারা হেরেছে আবার হারবে। মুসলমানের আর যত দোষ থাক তারা ঈশ্বরকে খণ্ডিত করে নি, তাদের ধর্ম্মের বিধানেই তাদের ঐক্য। আমাদের ধর্ম্মের বিধানেই আমাদের অনৈক্য। এই অনৈক্যের ফাটল দিয়েই বহু শতাব্দী ধরে আমাদের শক্তি গেল বহিঃসৃত হয়ে। সনাতনীরা যদি এই অন্ধ সংস্কারের ভেদবুদ্ধিকেই, এই নরনারায়ণের অবমাননাকেই ধর্ম্মের অনুশাসন ব'লে আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে স্বদেশের মুক্তির সাধকেরা কদাচ তাদের এই আত্মবিনাশের পন্থাকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। বিদেশী যারা বাহির থেকে আমাদের হাতে হাতকড়ি লাগিয়েছে, ভিতর থেকে হিন্দুরা নিজের হাতে তাদের চেয়ে আরও বেশি কড়া শিকল এঁটে দিয়ে সেই শিকলকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করচে। আমাদের এই দুর্ভাগ্য নিয়ে কন্‌গ্রেস সাহস করে সমালোচনা করে নি—মহাত্মাজি প্রভৃতি দুই একজন ব্যক্তিগত ভাবে করে থাক্‌বেন।"[১১৬]

কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে সমালোচনা করা আর কংগ্রেসের মুখপাত্র হয়ে সমালোচনা করার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে গান্ধীজীর মত রাজনৈতিক নেতাদের স্ববিরোধী আচরণের সমালোচনা করে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন— " গান্ধি বলেন, পৃথিবীর লোক scienceএর নাম করে অনেক পাপ করচে। কিন্তু ধর্ম্মের নাম করে তার চেয়ে অনেক বেশি পাপ করে। আমাদের দেশে যে-untouchability নিয়ে তিনি কিছুদিন লড়েছিলেন সেও ত ধর্ম্মের উপরেই টিকে আছে—আরো এমন হাজার হাজার পাপ আছে। সতীদাহ ত ধর্মানুষ্ঠান ছিল। কিন্তু তাই বলে ধর্ম্মটাকে ত কেউ— অন্তত মহাত্মা—ঝাড়েমূলে উপ্‌ড়ে ফেলতে পরামর্শ দেন না।"[১১৭]

ব্রিটিশ সরকার বা দেশীয় রাজনৈতিক নেতারাও তাদের ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের তাগিদে এদেশের মানুষের মনের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করেছিলেন। এই বিভেদের বীজ ঐক্যবদ্ধ জাতি বা দেশ গঠনের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় ছিল। তাই রাজনৈতিক দল বা কংগ্রেসের উপর রবীন্দ্রনাথ আস্থা রাখতে পারেননি। তিনি জানতেন—" আমাদের দেশে কংগ্রেস ...সাধারণ সামাজিক ঐক্যের ভিতর থেকে আপনি সজীব ভাবে বেড়ে ওঠে নি। তাকে স্থাপন করা হয়েছে এমন একটা সামাজিক অনৈক্যের উপরে, যে অনৈক্য প্রত্যেক পাঁচদশ ক্রোশ অন্তর অতলস্পর্শ গর্ত খুঁড়ে রেখেছে এবং সেই গর্তগুলোকে দিনরাত আগলে রয়েছে ধর্মনামধারী রক্ষক দল।"[১১৮]

এই ধর্মধ্বজীরা সেদিন সমাজের গভীরে বিভেদের কি বাতাবরণ গড়ে তুলেছিল তার পরিচয় দিয়ে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন—

"পোলিটিকাল পক্ষপাতে যে মনোভাবের সৃষ্টি এবং যে সকল আচরণের উদ্ভব হচ্চে সেটা অব্যাহত থাকলে যে রকম সাম্প্রদায়িক নিন্দনীয়তা ক্রমশই প্রচন্ড হয়ে উঠবে তার মত বর্ব্বর ও অরুচিকর আর কিছু হোতে পারে না। ......একটা দৃষ্টান্ত, মসজিদের সামনে দিয়ে হিন্দু শোভাযাত্রায় বাজনা বাজিয়ে চলা। এতদিন এ নিয়ে কথা ওঠেনি আজও না হয় না উঠত; যদি উঠেইছে তা হোলে কিছুক্ষণের জন্যে মসজিদের উপাসকদের প্রতি শ্রদ্ধা ক'রে বাজনা না হয় বন্ধ রাখাই হোত, এরকম রফানিস্পত্তি অত্যন্তই সহজ। কিন্তু যে মনোভাব থাকলে সহজ ব্যাপারও অসাধ্য হয় সেইটেই সবচেয়ে বিপদের বিষয়। খুব সম্ভব হিন্দু শোভাযাত্রীদের হাতে মসজিদের সামনে এলেই ঢাকের কাঠি দ্বিগুণ প্রবল হয়ে ওঠে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসকদের কারো কারো কাছে শুনেছি ঠিক তাঁদের উপাসনাকালে সরস্বতী পূজোর ভাসানের বাজনা উপাসনামন্দিরের সামনে অস্বাভাবিক উদ্যমের সঙ্গে বেড়ে ওঠে। দেবভক্তি ছাড়িয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নিজের দেবতারই অবমাননা করে। ......আমি তো ছিয়াত্তরে পা দিয়েছি৷ আমার এই দীর্ঘকালের কেবল শেষ কয়েক বৎসরই সাম্প্রদায়িক দুর্বুদ্ধির আকস্মিক উত্তেজনা অমানুষিক বীভৎসতার আকারে প্রবল হয়েছে দেখতে পাই৷ লজ্জা সকলেরই পক্ষে, এবং বিপদ সমস্ত দেশের।"[১১৯]

তাই জাতপাত, বাহ্য আচার আচরণ, শাস্ত্রবুদ্ধি, সাম্প্রদায়িক ধর্ম অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ৷ আসবে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মুক্তি ও জাতীয় ঐক্য এই মানব ভক্তিতেই রবীন্দ্রনাথের ছিল পূর্ণ আস্থা। সেই ভক্তিকেই তাঁর গ্রামসংগঠনের একটি বড় হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন। একটি পত্রে একথা স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—" অতএব আমাকে ভিন্ন জাতের মানুষ বলেই জেনো, আমি তোমাদের ত্যাজ্য। আমার গতি হবে কোথায় সে জন্যে আমি ভাবিই নে...... যে বিধাতা আমাকে বুদ্ধি দিয়েচেন, মানুষভ্রাতার প্রতি শ্রদ্ধা দিয়েছেন, মানবপ্রেমের ত্যাগ পরায়ণ দুঃসাধ্য সাধনার দিকে আহ্বান করেছেন, তাঁকে ভক্তি

করেই আমার ভক্তিবৃত্তিকে ধন্য বলে মানি—তাঁরই বিধান আমার যুক্তিতে আমার শুভবুদ্ধিতে সহজ বলে বোধ হয়, তাই আমার শিরোধার্য্য।”[১২০]

তাই কর্মের পথকেই রবীন্দ্রনাথ বেছে নিয়েছিলেন। এই কর্মের মহত্ত্ব বা গৌরবকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন জাপান যাত্রাকালে চীনের বন্দরে নরনারীর কর্মব্যস্ততার মধ্যে। আর নিশ্চিৎ হয়েছিলেন—“ কাজের এই মূর্তিই চরম মূর্তি, একদিন এরই জয় হবে। ......এদের মেয়ে পুরুষ ছেলে সকলে মিলে কাজ করবার এই ছবি দেখে আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখতে পাব ? সেখানে মানুষ আপনার বারো-আনাকে ফাঁকি দিয়ে কাটাচ্ছে। এমন সব নিয়মের জাল, যাতে মানুষ কেবলই বেধে-বেধে গিয়ে জড়িয়ে পড়েই নিজের অধিকাংশ শক্তির বাজে খরচ করে এবং বাকি অধিকাংশকে কাজে খাটাতে পারে না—এমন বিপুল জটিলতা এবং জড়তার সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। চারিদিকে কেবলই জাতির সঙ্গে জাতির বিচ্ছেদ, নিয়মের সঙ্গে কাজের বিরোধ, আচারধর্মের সঙ্গে কালধর্মের দ্বন্দ্ব।”[১২১]

ট. ত্যাগস্বীকার :

দেশের উন্নয়নের জন্য রবীন্দ্রনাথ আমাদের ত্যাগের পথানুসরণের কথা বলেছিলেন। এই ত্যাগের পথই আমাদের সার্থকতার শীর্ষে নিয়ে যাবে। এই বিষয়ে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজপুত্র রথীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন—

“ এই পৃথিবীতে আমরা রাজা নই, সৈনিক নই, বণিক নই, আমরা ভিক্ষু—আমাদের বুদ্ধ ছিলেন ভিক্ষু, আমাদের দেশের যাঁরা পূজ্যতম ঋষি ছিলেন তাঁরা ছিলেন ভিক্ষু—তাঁরা ধনের শৃঙ্খল গলায় পরেন নি বলেই রক্ষা পেয়েচেন এবং রক্ষা করেচেন—বিধাতার কাছ থেকে তাঁরা অকিঞ্চনতার বরমাল্য লাভ করেছিলেন। আমরাও আজ অকিঞ্চন—আমরা পথের পথিক—আমাদের দেশই বা কোথায়, জাতই বা কোথায় ? কিন্তু সেই পথের অধিকার, সেই অকিঞ্চনতার গৌরব আমরা গ্রহণ করতে পারচি নে কেন ? বিধাতা যাদের ধন দিয়েচেন মান দিয়েচেন আমরা হাঁ করে তাদের দিকে তাকিয়ে আছি বলেই নিজের মর্য্যাদা একেবারে ভুল্‌তে বসেচি। তারা যা তারা তাই—বিধাতা তাদের যা দিয়েচেন তারা তা ভোগ করুক, কিন্তু আমাদের যা দিয়েচেন তার কি সীমা আছে ?”[১২২]

এই ত্যাগমন্ত্রে বাঙালী তথা ভারতবাসী উদ্বুদ্ধ হতে পারেনি। বরং দু-একজন যে মহৎপ্রাণ এই কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাদের কাজের বিরূপ সমালোচনার দ্বারা নিজ অক্ষমতাকে ঢাকার প্রয়াস নিয়েছেন নিরন্তর। একটি চিঠিতে হেমন্তবালা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন—

"তুমি লিখেচ দরিদ্র ও অস্পৃশ্যদের আর্থিক সহায়তার জন্য যাঁরা স্বার্থত্যাগ করেচেন তাঁরা সাহিত্যিক নন, তাঁরা ধনী নন, তাঁরা অমুক অমুক অমুক। আমি কিছু করেছি কিনা তার হিসাব তোমার কাছে দিতে চাইনে কিন্তু যদি এক পয়সা ব্যয় নাও করে থাকি তাই বলেই কি যেটা উচিত সেটাকে উক্ত করতেও পারব না ? আমি পাড়ায় পাড়ায় আগুন নিবিয়ে বেড়াই নে, চেষ্টা করতে গেলে পারিও নে, তাই বলে কি তুমি আমাকে লিখ্‌তে দেবে না যে লোকের ঘরে আগুন দেওয়া অন্যায়। আমি যে সকল কাজ করে থাকি যারা তার কোনো খোঁজ রাখে না, তারা আমার কাজের খোঁটা দিয়ে থাকে, বাঙালির মধ্যে জন্মেছি বলে আমার এই দুর্ভাগ্য।"[১২৩]

পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ দেশগুলি যে বড় হয়ে উঠেছে তার মূলে আছে এই ত্যাগের মহিমা। নিছক পলিটিক্যাল ভিক্ষাবৃত্তি, রিফর্ম আইন পাশ বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের দ্বারা যে তা অর্জন করা যায় না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরূপ মানসিকতার অভিব্যাক্তি ঘটিয়ে লিখেছেন—

"পশ্চিম দেশ বড় হয়ে উঠেচে, অর্থ সংগ্রহের দ্বারা নয়, আত্মবিসর্জনের দ্বারা। এত বহু লোক এখানে ভাবে জন্য বস্তুকে, ভাবীর জন্যে উপস্থিতকে ত্যাগ কর্‌চে যে তার সংখ্যা নেই। সেই রকম অনেক লোককে দেখেচি। যতই দেখ্‌চি ততই মানবাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাচ্চে। জগতে যত কিছু উন্নতি ঘটেচে মানুষের সেই আত্মদানের দ্বারা—ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা নৈব নৈব চ। কোনো রিফর্ম্‌ বিল্‌ আমাদের দুঃসমুদ্র পার করাতে পারবে না—আত্মার বন্ধন কখনই বাইরে থেকে ঘুচবে না—ভারতবর্ষ এই আত্মার বন্ধনের দ্বারাই জর্জ্জর—মণ্টেগু্য সাহেব তাকে বাঁচাবে কি করে ?"[১২৪]

এই বন্ধনমুক্তির কাজে অগ্রসর হতে গেলে যে ত্যাগশুভ্র মানসিকতা বা তপস্যার পথাবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল তা রবীন্দ্রনাথ সমকালে কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক দলের মধ্যেও দেখতে পাননি। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"মুক্তির সাধনা তপস্যার সাধনা। সেই তপস্যা সাত্ত্বিক, এই জানি মহাত্মার উপদেশ। কিন্তু এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একত্র হয়েছেন তাঁদের মন কি উদার ভাবে নিরাসক্ত? তারা পস্পরকে আঘাত করে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে, তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারে নেই যে-উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোভ থেকে উদ্ভূত। ভিতরে ভিতরে কন্‌গ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদী গড়ে উঠছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাই নি যখন মহাত্মাজীকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলীনি ও হিট্‌লারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন। সত্যের যজ্ঞে যে-কন্‌গ্রেসকে গড়ে তুলেছেন তপস্বী, তার বিশুদ্ধতা কি তাঁরা রক্ষা করতে পারবেন

শক্তিপূজায় নরবলি সংগ্রহের কাপালিক মুসোলীনি ও হিট্‌লার যাঁদের আদর্শ। আমি সর্বান্তকরণে শ্রদ্ধা করি জওহারলালকে, যেখানে ধন বা অন্ধধর্ম বা রাষ্ট্রপ্রভাব ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ সীমায় শক্তির ঔদ্ধত্য পুঞ্জীভূত করে তোলে সেখানে তার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি কন্‌গ্রেসের দুর্গদ্বারে দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করে নি। এত দিন পরে অন্তত আমার মনে সন্দেহ প্রবেশ করেছে। কিন্তু আমি পোলিটিশিয়ান নই এই প্রসঙ্গে সে কথা কবুল করব।"[১২৫]

ঠ. গ্রামসংগঠন :

কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচী বা লক্ষ্য যে দেশের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ নয়, বঙ্গ-ভঙ্গ পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষিত থেকে রবীন্দ্রনাথ তা স্পষ্টতই অনুধাবন করেছিলেন। এ বিষয়ে কবির অভিমত কংগ্রেসের কাছে কতটা গ্রহণীয় বলে মনে হয়েছিল পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনেই স্পষ্ট হয়ে গেছিল। এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু পাবনা সম্মেলনের অনেক পূর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংগঠন—বিশেষ করে গ্রাম-স্বরাজ স্থাপনে যে উদ্যোগী হয়েছিলেন তার পরিচয় নিহিত আছে ১৯০৮-এ শিলাইদহ থেকে সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লেখা নিম্নোক্ত পত্রে—"আমি এখানকার গ্রাম্যসমাজ স্থাপনার চেষ্টায় এখনো আবদ্ধ আছি। ভূপেশের সহযোগিতা করিবার জন্য পূর্ববঙ্গ হইতে একজন উৎসাহী যুবক পাওয়া গিয়াছে। আশা হইতেছে এ কাজ সফল হইয়া উঠিবে। আর একটি যুবককে পূর্ববঙ্গে সমাজ গঠনের জন্য নিযুক্ত করিয়াছি—সে ছেলেটিও ভাল—তাহার দ্বারা অনেক কাজ পাইব মনে করিতেছি।"[১২৬]

এমতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের মঞ্চে উপস্থিত হয়ে কেবল স্বেদ-পুলক-কম্প দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে উত্তেজিত করার ভ্রান্ত নীতি থেকে সরে আসেন। বলা চলে রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশের প্রাণকেন্দ্র পল্লীতেই এককভাবে উন্নয়ন কার্যে প্রয়াস চালিয়ে যান। অমলা বসুকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারীর মধ্যে পল্লীগঠনকার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েক জন পূর্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। তারা পল্লীর মধ্যে থেকে সেখানকার লোকদের সঙ্গে বাস করে তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিচার প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা তাদের । কাটানো, জঙ্গল সাফ করানো, প্রভৃতি সমস্ত কাজের উদ্যোগ হচ্চে। আমাদের পল্লীর ভিতরে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করে এমন সুগভীর নিরুদ্যম, যে, সে দেখলে স্বরাজ স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কথাকে পরিহাস বলে মনে হয়—ও সকল কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু যাঁরা সবচেয়ে উচ্চৈঃস্বরে একেবারেই সপ্তমে গলা চড়িয়ে এই সকল শব্দ ঘোষণা করেন এই বিষয়টাতে সকলের চেয়ে নিশ্চেষ্ট। সুরেন্দ্রবাবুরা

পল্লীসমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছেন—তাঁরা কলকাতায় ৯ নম্বর ওয়ার্ডে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন—পল্লীগ্রামেও লাগবেন বলে আশা দিয়েছেন। কিন্তু চরমপন্থীরা কেবল চরমের কথাই ভাবচেন, উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই নিশ্চেষ্ট। এ পর্য্যন্ত এঁদের দ্বারা একটি অতি ক্ষুদ্র কাজো হয় নি। অথচ এঁরাই মডারেট দলকে কর্ম্মহীন বাক্যবিশারদ বলে গাল দিয়ে এসেছেন। এঁরা কেবলই কথা নিয়ে কলহ করচেন কাজেই আমার মত জরাজীর্ণকেও কাজের ক্ষেত্রে নাবতে হয়েছে। আমি সভা-স্থলের আহ্বানে আর সাড়া দিচ্চি নে—কিন্তু সেই জন্যেই দেশের যেটা সকলের চেয়ে প্রয়োজন সেটা সাধনের জন্যে আমার যেটুকু সাধ্য তা প্রয়োগ করতেই হবে। আপনারা যখন ফিরে আস্‌বেন—আশা করচি তত দিনে আমাদের শিলাইদহের গ্রামগুলি অনেকটা গঠিত হয়ে উঠতে পারবে।”[১২৭]

পল্লীকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ কৃষিব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেন। কালীগ্রামকে কতকগুলি বিভাগে ভাগ করে তাদের পরিচালনসমিতি গড়ে তোলার পাশাপাশি কৃষিব্যাঙ্কের দ্বারা গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার প্রয়াস নেন। ১৯১৪-তে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—“কালিগ্রামে কোনো রকম পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে একবার নগেন্দ্রকে লিখো সে যেন বিভাগস্থাপনের পূর্ব ও পরের ইসমনবিশি ও আয়ব্যায় তুলনা করে একটা রিপোর্ট পাঠায়। নূতন ব্যবস্থায় খরচপত্র বাড়বে কি কম্‌বে এবং কি পরিমাণে বাড়বে কমবে সেটা বেশ পরিষ্কার জানা ভাল। আমার বোধ হয় আপাতত যদি ব্যাঙ্কের কাজের উপরে নগেন্দ্রকে পতিসর বিভাগের চার্জ্জ দেওয়া হয় তাহলে কাজ চলে যেতে পারে।”[১২৮]

রবীন্দ্রনাথ কেবল কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। ব্যাঙ্কে কিংবা অন্যত্র যে পরিমাণ অর্থ তিনি প্রজাস্বার্থে নিয়োজিত করেছিলেন তাদের যথাযথ হিসাব ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। একজন দক্ষ প্রশাসকের এটি একটি বড় বৈশিষ্ট্য অবশ্যই। প্রমথ চৌধুরীকে এ বিষয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছেন—“ আমি খগেনকে আমার তরফের আইন-সচিব নিযুক্ত করলে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত হতে পারব—অন্তত রক্তপাত ঢের কম হবে। আমি তাকে মাসিক বেতন দিয়ে বিদ্যালয়ে এবং ব্যাঙ্কে আমার যে বিষয়ব্যবস্থা আছে আমার তরফে তার পরিদর্শক ও কার্য্যকর্ত্তা নিযুক্ত যদি করি তবে আমার মত অকর্ম্মণ্য ও নির্ব্বোধ কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিরাপদে থাক্‌তে পারে। যতদূর দেখা গেল সর্ব্বাধিকারীর অধিকার আমার পক্ষে একটু বেশি দুর্মূল্য অথচ তার ফলও অনিশ্চিত।”[১২৯]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংগঠন প্রক্রিয়াকে এভাবেই একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। এ কেবল নিজের জমিদারীতন্ত্রকে শক্তপোক্ত করার বিষয়ী বুদ্ধিমাত্র নয়, এ হল অর্থের অনাবশ্যক অপচয় রোধ করে প্রজাসাধারণের হিত বা

কল্যাণের জন্য গ্রামীণ সমাজ-অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ়তর করার একটি সৎ প্রচেষ্টামাত্র। এ বিষয়ে স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ কালিগ্রামে সাধারণ প্রজার কাছ থেকে সাধারণ বৃত্তি নামে যে রাজস্বটুকু আদায় করতেন তা কিন্তু প্রজাস্বার্থে ব্যায়িত হত—যার মধ্যে জমিদারের নিজের আর্থিক অনুদান বৃহদংশ জুড়ে থাকতো। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

"কালিগ্রাম ও বিরাহিমপুরে যাতে বিভাগের কাজে কোনো ত্রুটির সম্ভাবনা না থাকে আমি সেইজন্যে বিশেষভাবে লেগেছি। এ পর্য্যন্ত যে সব অনিয়ম ও নিষ্ফলতা ঘটেচে সে কেবল যোগ্য লোকের অভাবে। আমি কিছুতেই আর সে রকম ঘট্‌তে দেব না। ......

কালিগ্রামে সাধারণবৃত্তি বৎসরে এগারো হাজার টাকা ওঠে। এ পর্য্যন্ত এতবড় মোটা টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় নষ্ট হচ্ছিল—বিভাগে এর যে রকম হিসাব রাখা চলছিল সে দেখে আমি ভারি বিরক্ত হয়ে এসেচি। তার আমি পাকা নিয়ম করে দিয়েছি। এই সাধারণ বৃত্তির অন্তর্গত সমস্ত কাজ ও হিসাব যাতে রীতিমত সদরে যায় তার বন্দোবস্ত করেচি। তোমার সঙ্গে দেখা হলে সব বলব।"[১৩০] 'চিঠিপত্র' ৫ম খণ্ডের ৪৬ সংখ্যক চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ প্রজাহিতৈষী মানসিকতা ও কার্যাবলীর পরিচয় স্পষ্ট।

পল্লীর বিচার বা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শক্তপোক্ত করে গড়ে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলী প্রথার প্রবর্তন করেন। এই প্রথা সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন—যা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে। একটি চিঠিতে তারই আভাস দিয়ে রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন—" ইতিমধ্যে আমি আমাদের জমিদারিকে পাঁচ ছটা মণ্ডলীতে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলীতে পল্লীসমাজ গড়ে তোলবার চেষ্টা করচি যাতে আমাদের পরে প্রজাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে এবং তারা একত্র হয়ে নিজেদের হিতসাধন করতে পারে এই চেষ্টাতেই আমি প্রবৃত্ত হয়েছি। লেগে থাক্‌লে নিশ্চয়ই অনেকটা ফল পাওয়া যাবে।"[১৩১]

পল্লীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কো-অপারেটিভ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলে পল্লীর উন্নয়নের যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কিন্তু দক্ষ কর্মীর অভাবে রবীন্দ্রনাথ অতটা সফলতা পাননি। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষেদের সঙ্গে তাই রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন— " নিয়মাবলী রচনা করে কোনো লাভ নেই—নিয়ামকদের পক্ষে যেটা আন্তরিক নয় সেটা উপেক্ষিত না হয়ে থাকতে পারে না। শুধু এই কারণেই গোরার হাতে কো-অপারেটিভ পড়ে ওটা কেবল খাতাঞ্চিখানার মধ্যেই আট্‌কা পড়ে রইল, কিছুতেই স্বক্ষেত্রে প্রসার লাভ করতে পারল না। অথচ গ্রামের কাজের পক্ষে কো-অপারেটিভটাই সর্ব্বপ্রধান ভূমিকা, আমাদের বিপুল দৈন্য সমস্যা সমাধানের পক্ষে ঐটেই সর্ব্বপ্রধান উপায়।"[১৩২]

সেই উপায়টাকেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাশিয়ায় গিয়ে। দৃষ্টান্ত অলগভো কো-অপারেটিভ স্বাস্থ্যাগারের মতো স্বাস্থ্যাগারগুলি। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় পাই—

“সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, শ্রমিকদের জন্যে বাসা নির্মাণ যার প্রধান কর্তব্য; সেই সোসাইটির নাম বিশ্রান্তিনিকেতন:The Home of Rest। এই অলগভো তারই তত্ত্বাবধানে।

এমনতরো আরো চারটে সানাটোরিয়ম এর হাতে আছে। খাটুনির ঋতুকাল শেষ হয়ে গেলে অন্তত ত্রিশ হাজার শ্রমক্লান্ত এই পাঁচটি আরোগ্যশালায় এসে বিশ্রাম করতে পারবে। প্রত্যেক লোক একপক্ষকাল এখানে থাকতে পারে আহারের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত, আরামের ব্যবস্থা, ডাক্তারের ব্যবস্থাও আছে। কো-অপারেটিভ প্রণালীতে এইরকম বিশ্রান্তিনিকেতন স্থাপনের উদ্যোগ ক্রমশই সাধারণের সম্মতি লাভ করছে।”[১৩৩]

ড. পুকুর খনন ও জলসেচ :

জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম শিলাইদহের পল্লীতে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। শিলাইদহ রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় জায়গা হলেও ক্রমে তার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। শিলাইদহ ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে মৃণালিনী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার অবস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন— “ ...কুয়ো এবং পুকুর দুয়েরই জল যাচ্ছেতাই—চারদিকেই ম্যালেরিয়ার ধূম—আমরা ঠিক [‘সময়ে’] শিলাইদহ ত্যাগ করেছি—নইলে ছেলেদের নিয়ে ব্যামো হয়ে বিপদে পড়তুম।”[১৩৪]

শান্তিনিকেতনের পল্লীর ছবিটাও এর থেকে কিছু পৃথক ছিল না। ‘পিতৃস্মৃতি’তে রথীন্দ্রনাথ অসুস্থ মাকে বোলপুর থেকে কলকাতা নিয়ে আসার সময় সেখানকার একটি বিশেষ দৃশ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—“ একসময়ে নজরে পড়ল জনশূন্য মাঠের মাঝে ভাঙা পাড় অর্ধেক বোজা একটি পুকুর—তার যেটুকু জল আছে, ঢেকে গেছে অসংখ্য শাদা পদ্মফুলে।”[১৩৫] এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীর জল ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর প্রয়াস নেন। রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—“ রথী, জেনীভাতে Madame Dinaবলে একটি মহিলার সঙ্গে দৈবাৎ আলাপ হল, তাঁর স্বামী ছিলেন ভারতবর্ষীয়। স্বামীর স্মরণার্থে ভারতবর্ষে কিছু একটা ভালোরকম দান করা এর সঙ্কল্প। ...... শুধু শান্তিনিকেতন নয় গ্রামের লোকেরাও যাতে আলো জল পায় এই তার ইচ্ছে। হ্যারির সঙ্গে এই সম্বন্ধে তাঁর আলাপ চলচে। হবে বলেই সকলের বিশ্বাস। বলেচেন এই মোট দান ছাড়াও যাবজ্জীবন এর খরচ চালাবার জন্যে দিতে থাকবেন। বুঝতে পারচিস্ ব্যাপারটা সামান্য হবে না। ঠিক এই রকমেরই একটি দান তিনি তাঁর নিকটবর্ত্তী দশ

বারোটা গ্রামকে দিয়েচেন। শুধু যদি জল আলো পাই তাহলে আর কিছুই না পেলেও এবারে য়ুরোপে আমার আসা সার্থক হবে।”[১৩৬]

বোঝা যায়, এই শান্তিনিকেতন ও পার্শ্বস্থ পল্লীতে জলসঙ্কট কতটা ভয়াবহ ছিল। তাই তিনি শান্নতিনিকেতনে বিদেশ থেকে আনা পাম্প বসিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—“ ওদিকে ওখানে আনাড়িদের হাতে জলের পাম্প গিয়েছে বিগড়ে।”[১৩৭] দক্ষ কর্মীর অভাবে এদেশের দেশোন্নয়ন কর্মসূচির কি দশা হতে পারে তারই পরিচয় মেলে আলোচ্য চিঠিটিতে । বাসন্তী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর এই জলসমস্যা মেটানোর উপলক্ষ্যে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার বর্ণনা দিয়ে জানিয়েছেন—

“ জানো তো এবার এদেশে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি গেছে, ক্ষেতে ফসল নেই, লোকের পেটে নেই অন্ন, গায়ের বস্ত্র জীর্ণ। এসব দেখে সংসারের উপর ধিক্কার জন্মে। কিছু কিছু চেষ্টা করচি এদের বাঁচিয়ে রাখতে, কিন্তু আমাদের সাধ্যের অতীত। এখানে একটা সাবেক কালের দীঘি ছিল , সেটা প্রায় বুজে এসেছিল—খোঁড়াবার ব্যবস্থা করেছি, তাতে গেল দুই মাস ধরে পাঁচশো লোক খেটে খেতে পাচ্চে। যে পর্য্যন্ত না অঘ্রাণ মাসে ফসল ওঠে সে পর্য্যন্ত এদেশের লোকের অনাহার চলবে।”[১৩৮]

ঢ. বাঁধনির্মাণ :

শিলাইদহ-সাহাজাদপুরে পা রেখেই রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন পল্লীর যোগাযোগ ব্যবস্থার কি চরম প্রতিকূলতা। বিশেষ করে বর্ষার সময় নদী ও বর্ষার জল পদ্মাবিধৌত পল্লীবাংলার কি দুরবস্থা ঘটাতো তার পরিচয় রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ একাধিক চিঠিতে। এরকমই একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনী দেবীকে জানিয়েছেন—“কাল দিনের বেলাও খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। নদীর জলও অনেকখানি বেড়ে উঠেছে । শস্যের ক্ষেত সমস্তই জলে ডুবে গেছে—জল আর একফুট বাড়লেই আমাদের বাগানের কাছে আসে। যেদিকে চেয়ে দেখি খানিকটা ডাঙ্গা খানিকটা জল।”[১৩৯]

প্রায় বছর দশেক পরে কালিগ্রাম থেকে লেখা অপর একটি চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে জানিয়েছেন—“মৃদু মন্থর গমনে চল্‌তে চল্‌তে বিলের মধ্যে পড়া গেল। জান ত বিল সমুদ্র-বিশেষ—চারিদিকে জল থৈ থৈ করচে মাঝে মাঝে ডোবা ধানের মাথা ভেসে আছে—মাঝে মাঝে এক একটা গ্রাম এক একটা ছোট দ্বীপের মত জলের উপর জেগে রয়েছে—গোরুগুলোর চরবার জায়গা নেই—মানুষগুলোর নড়বার স্থান নেই—ডোঙায় করে ডিঙিতে করে এগ্রামে ওগ্রামে যাতায়াত—তোমরা বোলপুরের মত জায়গায় থেকে এ রকম দৃশ্য কল্পনাই করতে পারবে না।”[১৪০] এই

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মূল কারণ পল্লী অঞ্চলে নদীবাঁধ কিংবা যাতায়াতের জন্য বাঁধের নিতান্ত অভাব। রবীন্দ্রনাথ তাই বাঁধ নির্মাণ করে বন্যা প্রতিরোধের পাশাপাশি যাতায়াত ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তোলার ব্যবস্থা নেন। বন্যার ফলশ্রুতি স্বরূপ পল্লীর মানুষের কি দুরবস্থা ঘটতো, তার জন্য রবীন্দ্রনাথের গৃহীত ব্যবস্থা কি ছিল—এর পরিচয় মেলে বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে—" বন্যাপীড়িত বাংলার সাহায্যের জন্যে কিছু চেষ্টা না করে স্থির থাকা অসম্ভব। বন্যায় আমাদেরও উপজীবিকা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এর আগে যে বন্যা হয়েছিল তাতে ঋণ করে প্রজাদের সাহায্য করেছি—দ্বিতীয় বার ঋণ বাড়াতে সাহস হয় না। তাই স্থির করেছি কলকাতায় বর্ষামঙ্গল দেখিয়ে বর্ষাজনিত অমঙ্গল কথঞ্চিৎ দূর করতে চেষ্টা করব।"[১৪১]

ণ. কৃষি :

রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন ভাবনায় আয়ার্ল্যাণ্ডের মনীষী জর্জ রাশেলের দ্বারা অনেকখানি প্রভাব ছিল। Freeman সাপ্তাহিকে রাসেল যে 'Lesson of Revolution' নামের প্রবন্ধটি লেখেন, তা রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট ভাবিয়েছিল। একটি পত্রে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন—"Irelandএর মনীষী *AE* (George Russel) Freeman সাপ্তাহিকে lessons of Revolution নামক যে প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন তাহাতে আমাদের ভাবিবার কথা অনেক আছে, সেই জন্য কাগজখানি আপনাকে পাঠাইলাম।"[১৪২] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-সংগঠনের প্রয়াস এর বহু পূর্বের সূচনা। আমি কেবল রবীন্দ্রভাবনায় রাশেলের সমাজতান্ত্রিক ভাবনার প্রতিস্থাপনার দিকটিকে চিহ্নিত করতে চাইছি।

ভারতবর্ষের কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতির বর্তমান অবস্থার বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে প্রতিমা দেবীকে জানিয়েছেন—"এমন এক কাল ছিল, পৃথিবীতে চিনি বিতরণের ভার ছিল ভারতবর্ষের। আজ এই জাভার হাট থেকে চিনি কিনে বৌবাজারের ভীমচন্দ্র নাগের সন্দেশ তৈরি হয়। ধরণী স্বভাবত কী দান করেন আজকাল তারই উপরে ভরসা রাখতে গেলে ঠকতে হয়, মানুষ কী আদায় ক'রে নিতে পারে এইটেই হল আসল কথা।"[১৪৩]

এই দুরবস্থার কারণ নির্দেশ করে অপর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে লিখেছেন—"আমাদের কর্তৃপক্ষ তাঁদের গোয়ালবাড়ি ভারতবর্ষে বসিয়েছেন, চা আর পাট নিয়ে এতকাল তাঁদের হাট গুলজার হল; কিন্তু, এদিকে আমাদের চাষের ক্ষেত নির্জীব হয়ে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে জিব বেরিয়ে পড়ল চাষীদের। এতকাল পরে আজ হঠাৎ তাঁদের নজর পড়েছে আমাদের ফসলহীন দুর্ভাগ্যের প্রতি। কমিশন বসেছে, তার রিপোর্টও

বেরোবে। দরিদ্রের চাকভাঙা মনোরথ রিপোর্টের টানে নড়ে উঠবে কিনা জানি নে, কিন্তু রাস্তা বানাবার কাজে যে-সব রাজমজুর লাগবে মজুরি মিলতে তাদের অসুবিধে হবে না। মোটকথা, ওলন্দাজরা এখানে কৃষিক্ষেত্রে খুব ওস্তাদি দেখিয়েছে; তাতে এখানকার লোকের অন্নের সংস্থান হয়েছে, কর্তৃপক্ষেরও ব্যাবসা চলছে ভালো। এর মধ্যে তত্ত্বটা হচ্ছে এই যে, দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিস ব্যবহার করব, এটা ভালো কথা; কিন্তু দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিস উৎপাদনের শক্তি বাড়াতে হবে, এটা হল পাকা কথা। এইখানে বিদ্যার দরকার; সেই বিদ্যা বিদেশ থেকে এলেও তাকে গ্রহণ করলে আমাদের জাত যাবে না, পরন্তু জান্ রক্ষা হবে।”[১৪৪]

অনুরূপ অবস্থায় পল্লীস্বরাজ স্থাপনের অন্যতম পন্থা হিসেবে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির সার্বিক উন্নয়নে জোর দিয়েছিলেন। যৌথচাষ বা সমবায় কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সমবায় কৃষিব্যবস্থার পত্তনের জন্য রবীন্দ্রনাথ কতটা আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন কলকাতা থেকে রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে তার পরিচয় আছে—

“ দেশে ফেরবার আগে একবার তোকে আমেরিকায় southern statesগুলো ঘুরে আসতে হবে। তার পরে intensive culture study করবার জন্যে ফ্রান্স হলাণ্ড জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশেও পর্য্যবেক্ষণ করে আস্তে হবে। আমেরিকায় জমির অভাব নেই—সেখানে বড় বড় ক্ষেত্রে বড় রকমের চাষ হয়—আমাদের দেশে অতবড় ক্ষেত্র কোনো এক জায়গায় এক সংলগ্ন পাওয়া অসম্ভব। অতএব এখানে চাষাদের শিক্ষা দিতে গেলে ছোট ছোট ভূমিখণ্ড কি করলে দুই একজনের চেষ্টায় যথাসম্ভব অধিক ফসল ফলাতে পারে তারই দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে। কেবল খুব কষে জমি তৈরি করা এবং rotation of crops যতবেশি হতে পারে তারই পরীক্ষা করা চাই। যন্ত্রতন্ত্র খুব সাদাসিধে রকমের না হলে আমাদের চাষাদের কাজে লাগবে না। তবে চাষারা অনেকে সমবেত হয়ে যদি কাজ করতে পারে তাহলেই নানা হিসাবে ভাল হয় কিন্তু আমাদের দেশের হাওয়ায় কি চাষা কি ভদ্রলোক কোনোমতে সমবেত হতে জানে না। তোরা ফিরে এসে চাষাদের মধ্যে থেকে তাদের মতিগতি যদি ফেরাতে পারিস ত দেখা যাবে।”[১৪৫]

পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে চাষাদের মধ্যেকার বিভেদ দূর করে তাদের সমবায় প্রণালীর আওতায় আনার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা নিরাময়ের এটিও একটি বড় উপায়। রাশিয়ার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—“ আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধন-উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায় নীতির জয় হোক, এই আমি কামনা করি। কারণ, এই নীতিতে যে সহযোগিতা আছে তাতে সহযোগীদের ইচ্ছাকে চিন্তাকে তিরস্কৃত করা হয় না বলে মানবপ্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। সেই প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ করে দিয়ে জোর খাটাতে গেলে

সে জোর খাটবে না।”[১৪৬] তাই জমির উপর প্রজাকে স্থায়ী স্বত্ত্ব প্রদান করে সমবায় প্রণালীতে চাষের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একটি চিঠিতে জানিয়েছেন— “চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে—জমির স্বত্ত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি-অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসিতে জল আনা একই কথা।”[১৪৭]

কিন্তু এই দুটি ক্ষেত্রেই যে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল তা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। একটি চিঠিতে সেই প্রতিবন্ধকতার পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—“কিন্তু এই দুটো পন্থাই দুরূহ। প্রথমত চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমূহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বৈ কমবে না। কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করেছিলুম। শিলাইদহে আমি যে বাড়িতে থাকতুম তার বারান্দা থেকে দেখা যায়, খেতের পরে খেত নিরন্তর চলে গেছে দিগন্ত পেরিয়ে। ভোরবেলা থেকে হাল লাঙল এবং গোরু নিয়ে একটি-একটি করে চাষী আসে, আপন টুকরো খেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ করে চলে যায়। এরকম ভাগ-করা শক্তির যে কতটা অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। চাষীদের ডেকে যখন সমস্ত জমি একত্র করে কলের লাঙলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে বললুম, তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে। কিন্তু, বললে, আমরা নির্বোধ, এতবড়ো ব্যাপার করে তুলতে পারব কী করে। আমি যদি বলতে পারতুম, এ ভার আমিই নেব, তা হলে তখনই মিটে যেতে পারতো।”[১৪৮] রবীন্দ্রনাথের একক প্রয়াসের দ্বারা তা সম্ভব ছিল না কেবল তা নয় কৃষকের নিজস্ব আত্মশক্তির উজ্জীবনের পথেও এটি ছিল অন্যতম বাধা। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। বোলপুরের কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর হাতে আসার পর রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে পুনর্বার প্রয়াস নিয়েছিলেন। কিন্তু এদেশের পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী কর্মচারীরা ‘চিন্তা করার সাহস’ বা ‘কর্ম করার দক্ষতা’র অভাবে তাকে বাস্তব রূপ দানে ব্যর্থ হয়।

কিন্তু রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবনারই আধুনিকতম রূপায়ণকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই প্রণালী নারী-কল্যাণ প্রচেষ্টার উপযোগী ছিল। তাই রাশিয়ায় মহিলারা দলবদ্ধভাবে নিজেরা নানা প্রদেশে ঘুরে বেড়িয়ে মেয়েদের মধ্যে কাজ করে ‘চিত্তের ও অর্থের উন্নতিসাধনে’ প্রয়াসী হয়েছে। আর “ঐকত্রিক দলের চাষী-মেয়েদের জীবনযাত্রা সহজ করে দেবার জন্যে প্রত্যেক ঐকত্রিক ক্ষেত্রে একটি করে শিশুপালনাবাস, শিশুবিদ্যালয়, আর সাধারণ পাকশালা স্থাপিত হয়েছে।”[১৪৯]

তাছাড়া সমবায় প্রণালীতে চাষের সুবিধা হিসেবে আধুনিক যন্ত্রপাতি, মেশিন ও সারের ব্যবহারের সুবিধা নেওয়া যায় বলে কম খরচে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়। রাশিয়ার সুখোজ প্রদেশের এক চাষী রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছে—" প্রতিদিন আমাদের আটঘন্টা কাজ করবার মেয়াদ। যারা তার বেশি কাজ করে তারা উপরি পারিশ্রমিক পায়। শীতের সময় খেতের কাজের পরিমাণ কমে; তখন চাষীরা বাড়ি-তৈরি রাস্তা-মেরামত প্রভৃতি নানা কাজে শহরে চলে যায়। এই অনুপস্থিতির সময়েও তারা বেতনের এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে আর তাদের পরিবারের লোক তাদের নির্দিষ্ট ঘরে বাস করতে পায়।"[১৫০]

কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার ঐকত্রিক ব্যবস্থায় একটি ত্রুটিকে লক্ষ্য করেছিলেন। এই ব্যবস্থার একটা বড় সমস্যা হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বাতন্ত্র্যকে অনেকেই বিলিয়ে দিতে চায় না। তাছাড়া জমির বা সম্পদের পরিমাণও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চাষী অপেক্ষা সমৃদ্ধ চাষীর ক্ষেত্রে অনেক বেশী থাকে। সেক্ষেত্রে উৎপাদিত লভ্যাংশের বিলি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অসমতা ঘটে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সম্পদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বিষয়কে একেবারেই উপেক্ষা করেননি। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি একটি মাঝামাঝি ব্যবস্থা নেবার পথ নির্দেশ দিয়েছেন—" অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্‌বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই তা হলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতার প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।

......একথা বলা চলে না যে, মানুষের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না; কিন্তু বলা চলে যে স্বার্থপরতা থাকবে না। অর্থাৎ নিজের জন্যে কিছু নিজত্ব না হলে নয়, কিন্তু বাকি সমস্তই পরের জন্যে হওয়া চাই। আত্ম এবং পর উভয়কেই স্বীকার করে তবেই তার সমাধান সম্ভব।"[১৫১] রাশিয়া তাদের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে এই সমস্যাকে অস্বীকার করেছে। এই সত্য বা ত্যাগের আদর্শ থেকে পাশ্চাত্যের দেশগুলি বিচ্যুত হয়ে গায়ের জোরের দ্বারা কেবল তাকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করে চলেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অনুগত করার আকাঙ্ক্ষায় দেশকে নতুন শিক্ষায় ও আদর্শে গড়ে তোলার জন্য একটি মডেল গ্রাম গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন, যা সারা দেশের কাছে আদর্শ হয়ে উঠবে। শান্তিনিকেতনে ছিল তারই যাবতীয় কর্মপ্রয়াস—

" আমার ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের আমি অনেকবার বলেছি, লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ববোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি করে থাকি শান্তিনিকেতনের ছোটো সীমার মধ্যে তারই একটি সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার—সেই ব্যবস্থায়

যখন এখানকার সমস্ত কর্ম সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন এইটুকুর মধ্যে আমাদের সমস্ত দেশের সমস্যার পূরণ হতে পারবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অনুগত করে তোলবার চর্চা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে হতে পারে না, তার জন্যে ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়—সেই ক্ষেত্র আমাদের আশ্রম।"[১৫২]

যাইহোক কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা তার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে নানা যন্ত্রপাতি এনে কৃষিগবেষণাগার বা ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রয়াস নেন। শুধু তাই নয়, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও পতিত জমিকে কৃষিযোগ্য করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসের অন্ত ছিল না। কৃষির সহায়ক গোপালন এবং গো-খাদ্য সৃষ্টির দিকেও ছিল রবীন্দ্রনাথের সচেতন দৃষ্টি। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন—

"তোদের ল্যাবরেটরির জন্যে কুষ্টের এঞ্জিনটা পাবার কোনোই বাধা হবে না। সেটা কত H.P. জেনে নিস্--যজ্ঞেশ্বর জিজ্ঞাসা করলে সে বোধ হয় বল্‌তে পারবে।ঐটের সঙ্গে আলো পাখা পাম্প সমস্তই জোড়া যেতে পারবে।

যদু সরকার (পাট্‌না কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক) এসেছেন—তিনি আমাকে বলেছিলেন, গয়ায় খানিকটা জমি ফসল হত না বলে পড়ে ছিল—শিবপুরের একজন ছাত্র মাটি পরীক্ষা করে সেখানে খেঁসারির চাষ করাতে প্রচুর খেঁসারি হয়েছে—এখন তার চারিপাশের চাষারা তাদের পতিত খারাপ জমিতে খেঁসারি দিয়ে খুব লাভ করেচে—তোদের ওখানে খারাপ জমিতে এর পরীক্ষা করিস্। ভাল জমির জন্যে ত ভাবনা নেই—খারাপ জমি উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। যেখানে জলের অত্যন্ত অভাব সেখানকার জন্যে অষ্ট্রেলিয়ার কি একটা গাছ লাগিয়ে ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও বিশেষ ফল পাওয়া গেছে—সেই গাছ গোরুর খাদ্য। গাছটা কি জান্‌লে বোলপুরের জন্যে চেষ্টা করা যেতে পারে।"[১৫৩]

রবীন্দ্রনাথ যান্ত্রিকতার বিরোধিতা করলেও যন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিলেন না। কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা উৎপাদন যে অনেক গুণে বাড়িয়ে নেওয়া তোলা যায়, তা তিনি অনুভব করেছিলেন এবং বিদেশ থেকে নানা আধুনিক যন্ত্রপাতি এনে কৃষি ও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর প্রয়াস নেন। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রানু অধিকারীর মা আশা অধিকারীকে বার্লিন থেকে লিখেছেন— " আমাদের দেশে কোনো এক সময়ে গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণ বোধ হয় ছিলেন কৃষির দেবতা, গোয়ালার ঘরে তার বিহার; তাঁর দাদা বলরাম হলধর ঐ লাঙল অস্ত্রটা হোলো মানুষের যন্ত্রবলের প্রতীক। কৃষিকে বলদান করেচে যন্ত্র। আজকের দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোনো কিনারায় বলরামের দেখা নেই—তিনি লজ্জিত—যে দেশে তাঁর অস্ত্রে তেজ আছে সেই সাগরপারে তিনি চলে গেছেন। রাশিয়ার কৃষি বলরামকে

ডাক দিয়েচে, দেখ্‌তে দেখতে [য] সেখানকার কেদারখণ্ডগুলো অখণ্ড হয়ে উঠল, তাঁর নূতন হলের স্পর্শে অহল্যা ভূমিতে প্রাণ সঞ্চার হয়েচে। একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, রামেরই হলযন্ত্রধারী রূপ হচ্চে বলরাম।–১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এদেশে শতকরা ৯৯ জন চাষি আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখে নি। তারা সেদিন আমাদেরই চাষীদের মতো সম্পূর্ণ দুর্ব্বলরাম ছিল, নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্ব্বাক। আজ দেখ্‌তে দেখতে [য] এদের ক্ষেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেচে। আগে এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায় বলে কৃষ্ণের জীব—আজ এরা হয়েছে বলরামের দল।”[১৫৪]

ধান ও ভুট্টার চাষের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ রেশম চাষেও যে তৎপর হয়েছিলেন, তার পরিচয় আছে জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা একটি চিঠিতে—

“ শ্রী যুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—দশ বারোজন লোক অহর্নিশি তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাতা আনার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে—লরেন্স্‌ স্নান-আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীট-সেবায় নিযুক্ত। আমাকে সে দিনের মধ্যে দশ বার করিয়া টানাটানি করে—প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। ইংরেজ জাতি কেন যে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হয় তাহার প্রত্যক্ষ কারণ দেখিতেছি। উহাদের শক্তি চালনা করিবার জন্য বিধাতা ঊনপঞ্চাশ বায়ু নিযুক্ত করিয়াছেন, অথচ উহাদের মধ্যে বোঝাই এত আছে যে কাৎ করিতে পারে না। এখন যদি আমাদের কীটশালায় একবার আসিতে পারিতেন তবে একটা দৃশ্য দেখিতে পাইতেন। বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। কোন এক সময় ছুটী পাইলে এদিককার কথা স্মরণ করিবেন।

আমার চাষ-বাসের কাজ মন্দ চলিতেছে না। আমেরিকান ভুট্টার বীজ আনাইয়াছিলাম—তাহার গাছগুলা দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছে। মাদ্রাজি সরু ধান রোপণ করাইয়াছি, তাহাতেও কোন অংশে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু সোম্‌বারে সস্ত্রীক আমার শস্যক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিবেন।”[১৫৫]

কৃষিব্যবস্থাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য এবং মহাজনদের কবল থেকে বাঁচিয়ে সকল প্রজার কাছে কৃষির সুবিধাটুকু পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথ কৃষিব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যাঙ্কে নোবেল পুরস্কারের পুরো টাকাটাই সঞ্চিত রেখেছিলেন প্রজাস্বার্থে। ব্যাঙ্কের থেকে সাধারণ মানুষ কেবল কৃষিঋণ পেত তা নয়, সেখানে ব্যাঙ্কিং প্রথা মেনে টাকা জমা রাখা হত নির্দিষ্ট সুদের বিনিময়ে। প্রতিমা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে এরই পরিচয় রয়েছে—“ মীরার জন্য মাসিক টাকার ব্যবস্থা করে দিয়ো, আর পতিসর ব্যাঙ্কে তার যে টাকা জমা আছে সে টাকার সুদ কি রকমভাবে খাটচে

কি হচ্চে সেটা যেন পরিস্কার করে জানতে পারি এবং মীরাও জানতে পারে। ওর কাছে পাস্ বই না থাকার অর্থ কি তা ত বুঝতে পারিনে।"[১৫৬]

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর কৃষিব্যাঙ্কে নিয়োজিত অর্থ নিয়ে কিছু টানাপোড়েন সৃষ্টি হলেও রবীন্দ্রনাথ যে প্রাণপণে কৃষিব্যাঙ্কের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তার পরিচয় পাই নিম্নোক্ত চিঠিতে—" স্পষ্ট দেখা যাচ্চে আমাদের ব্যাঙ্কে বিশ্বভারতীর টাকা আছে এতে কারো কারো মন উদ্বিগ্ন হয়েছে। অবশ্য নোবেল প্রাইজের টাকা সম্বন্ধে কোনো কথা তোলবার অধিকার অন্তত আমি বেঁচে থাকতে কেউ দাবী করবেনা। অন্য টাকাটা সম্বন্ধে বোধ হয় শীঘ্রই একটা হুকুম আসবে। তার পূর্ব্বে অনতিবিলম্বে এর কিনারা হওয়া চাই। আমি জানি ফস্ করে, এমন কি, দীর্ঘ কালেও টাকাটা উপ্‌ড়ে ফেলা শক্ত। অতএব পাঁচুপুর বা অন্য কোনো মহাজনের কাছ থেকে ধার করতে হবে। যদি আমার সই দরকার হয় আমি সই দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যত শীঘ্র হয় ততই ভালো।"[১৫৭]

ত. শিল্প :

রবীন্দ্রনাথ গ্রামস্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে কুটীরশিল্পের উপর জোর দিয়েছিলেন। পল্লীর মধ্যে সেকালে ঢেঁকিতেই ধানভানার চল ছিল। তাই ধানভানার কল বসিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একটি চিঠিতে রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন— " বোলপুরে একটা ধানভানা কল চল্‌চে—সেইরকম একটা কল এখানে আনাতে পারলে বিশেষ কাজে লাগ্‌বে। এ দেশ ধানেরই দেশ—বোলপুরের চেয়ে অনেক বেশি ধান এখানে জন্মায়।"[১৫৮] এই ব্যবসাটিকে লাভদায়ী করে তোলার জন্য সমবায় পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথ একইসঙ্গে অধিকসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান করতে ঘটাতে চেয়েছিলেন। কৃষিব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দিয়েও ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমবায় প্রণালীতে পল্লীর মানুষের ঐক্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। একটি চিঠিতে তাই রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন—

"আমার ইচ্ছা ৫/১০ টাকা শেয়ার করে এখানকার অনেক চাষায় মিলে এই কলটা যদি চালায় তাহলেই ওদের মধ্যে মিলে কাজ করবার যথার্থ সূত্রপাত হতে পারবে। আমাদের ব্যাঙ্ক থকে ধার দিয়ে এই ধানভানার ব্যবসাটা এখানে সহজেই চালানো যেতে পারে—নগেন্দ্র এবং জানকী দুজনেরই বিশ্বাস এই কাজটা এখানকার যোগ্য এবং এতে প্রজাদের উপকার হবে।

এই কলের সন্ধান দেখিস্।"[১৫৯]

মৃতশিল্পের উজ্জীবনেও রবীন্দ্রনাথ সবিশেষ প্রয়াস নেন। শান্তিনিকেতনের কঠিন এঁটেল মাটি গ্রীষ্মকালে আরো কঠিন হয়ে উঠতো। এই কঠিন মাটিতে কৃষিকাজ আরো

কঠিন হয়ে উঠতো একারণে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে কঠিল এঁটেল মাটিকে কাজে লাগিয়ে মৃৎশিল্পের বিকাশে মনোনিবেশ করেছিলেন। রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে তারই স্বাক্ষর স্পষ্ট— " ......এখানে চাষাদের কোন্ industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না—এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জান্‌তে চাই pottery জিনিষটাকে cottage industry রূপে গণ্য করা চলে কিনা। একবার খবর নিয়ে দেখিস্— অর্থাৎ ছোটখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কি না। মুসলমানরা যে রকম সান্‌কির জিনিস ব্যবহার করে এরা যদি সেইরকম মোটাগোছের প্লেট বাটি প্রভৃতি তৈরি করতে পারে তাহলে উপকার হয়।"[১৬০]

শুধু মাটির তৈরি পাত্র বা জিনিসপত্র নয়, শান্তিনিকেতনের এঁটেল মাটিকে ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি এনে টালি তৈরির কুটির শিল্প গড়ে তুলেছিলেন। টালি তৈরির শিল্প শ্রীনিকেতনে কতটা ব্যাপক রূপ নিয়েছিল প্রথম অধ্যায়েই তার বিবরণ আছে। পাশাপাশি ছাতা তৈরির পদ্ধতি শিখিয়ে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষকে স্বয়ম্ভর করে তুলতেও চেয়েছিলেন। একটি চিঠিতে অনুরূপ প্রয়াসের আকাঙ্খা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন—

" আরেকটা জিনিষ আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে।

নগেন্দ্র বল্‌ছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আন্‌তে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায় পেরে ওঠে না—খোলা পেলে সুবিধা হয়।"[১৬১]

পল্লীর তথা দেশের শিল্পায়নের জন্য রবীন্দ্রনাথ বিদেশের ঋণ স্বীকারেও কুণ্ঠিত হননি। জগদীশ চন্দ্র বসুকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন— " কারখানা ঘরের কাজ চালাইবার উপযুক্ত Engine lathe প্রভৃতির কথা তোমার চিঠিতে পড়িয়া বিশেষ লোভ জন্মিতেছে। আমি যেমন করিয়া পারি বোলপুরে টেক্‌নিকাল বিভাগ খুলিব। ধর্ম্মপাল আমাকে গোটাকতক কল দিতে স্বীকার করিয়াছে। তাহার কতকগুলি কৃষি-ব্যাপারের যন্ত্র আছে, একটা কাপড় কাচিবার আমেরিকান কল আছে। সে বলে আমি যদি টেকনিকাল বিভাগ খুলি তাহা হইলে আমাকে সাহায্য জোগাড় করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার condition এই যে এই টেকনিকাল বিভাগের নাম রাখিতে হইবে Indo-American Industrial School । আমি তাহাকে লিখিয়াছি সাহায্যের পরিমাণ যদি যথেষ্ট এবং যদি যথার্থ কাজের হয় তাহা হইলে আমেরিকার ঋণ স্বীকার করিতে আপত্তি করিব না।"[১৬২]

পল্লীর তাঁতশিল্পকে লাভদায়ী একটি ব্যবসা হিসেবে গড়ে তুলে পল্লীর অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ কারণে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ কাপড়ের কল স্থাপন করে কাজও শুরু করেছিলেন। শিলাইদহ থেকে প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি চিঠিতে তারই পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

" এখানে একটি কাজ ভালরূপ হইতে পারে। এখানকার জোলাদিগকে সুতা দাদন দিয়া তোয়ালে, ন্যাপকিন্, বিছানার চাদর, কোটের কাপড়, টেবিলক্লথ প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্য সস্তায় প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতায় বিক্রয় করান যাইতে পারে। কুষ্টিয়ার এই সকল কাপড় ঢাকা গোয়ালন্দ প্রভৃতি নানাস্থানে প্রভূত পরিমাণে বিক্রয় হয়। এখানে কি কি কাপড় কি মূল্যে বিক্রয় হয় এবং কলিকাতায় তাহার কিরূপ কাট্‌তি হইতে পারে তাহা এখানে আসিয়া যদি কোন অভিজ্ঞ লোক সন্ধান লইয়া যায় তাহা হিলে ভাল হয়। তাঁতি ও জোলাদিগকে সূতা দাদন দিবার সুবিধা এই যে, প্রথমতঃ সূতার দরের উপরে যে লাভ তাহা পাওয়া যায় তাহার পরে কাপড়ের উপরকার লাভটাও পাওনা হয়—এবং দাদন পাইলে জোলারা সম্ভবতঃ কাপড়ের দরেও একটু বিশেষ লাভ দিয়া থাকে। এই কাজটা ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বিস্তৃত করিলে লাভজনক হইতে পারে এইরূপ আমার বিশ্বাস। কুষ্টিয়ার সুতার র‍্যাপার শীতের সময় অজস্র পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে—সেই মার্কেট্, দাদন প্রভৃতি দ্বারা নিজে হস্তগত করিলে মস্ত কারবার হইতে পারে।"[১৬৩]

এছাড়া চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদির বিকাশের দ্বরা রবীন্দ্রনাথ যে পল্লীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি নিদর্শন গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন তা তাঁর চিঠিপত্রেও হদিস মেলে। এমনি একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যদুনাথ সরকারকে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন—"এখানে ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, চামড়া পাকা করিবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।"[১৬৪]

থ. মানবকল্যাণের অনুকূলে যন্ত্রের ব্যবহার :

রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার প্রগতিকে মেনে, কালের অপ্রতিরোধ্য যাত্রাকে স্বীকার করে মানবকল্যাণের অনুকূলে যন্ত্রের ব্যবহারের স্বপক্ষে ছিলেন। সে কথা পূর্বোক্ত অধ্যায়েই বলেছি। পাশাত্য দেশগুলি যে সম্পদ সঞ্চয়ের কাজে লেগেছিল সেও ছিল যন্ত্রনির্ভর। এভাবে ধনের বাহন হয়েছে যন্ত্র, আর যন্ত্রের বাহন হয়েছে মানুষ। যান্ত্রিক সম্পদ প্রতিষ্ঠার বেদীরূপে তারা তৈরি করেছে শহর । রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তার উদর কীভাবে ক্রমে বেড়ে গেছে। ইংল্যান্ড, নিউইয়র্কের মতো শহরগুলি বহু গ্রাম-উপগ্রামের প্রাণশক্তি গ্রাস করে

তারা কেমন ভাবে বৃহৎ দানবীয় রূপ ধারণ করেছে। রাশিয়ার চিঠিতে একাধিক স্থলে রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ মানসিকতা যন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ নয়। তাঁর বিরুদ্ধতা আসলে পল্লীপ্রকৃতির শান্তিবিনাশকারী যন্ত্রশক্তির মানবকল্যাণ-বিরোধী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। একটি পত্রে তিনি তাই জানিয়েছেন—" এ কথা সত্য, একটা প্রকণ্ড দানবীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ আপনার শক্তিকে অনুভব করে। সেও বহুমূল্য, আমি তাকে অবজ্ঞা করব না। কিন্তু সেই শক্তি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষী সম্বন্ধ-বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র কেবলই সঙ্কীর্ণ হতে থাকে তবে সেই শক্তি শক্তিশেল হয়ে উঠে মানুষকে মারে, মারবার অস্ত্র তৈরি করে, মানুষের সর্বনাশ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে, অনেক মিথ্যার সৃষ্টি করে, অনেক নিষ্ঠুরতাকে পালন করে, অনেক বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করে সমাজে। এ হতেই হবে। দরদ যখন চলে যায়, মানুষ অধিকাংশ মানুষকে যখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো দেখতে অভ্যস্ত হয়, ... তখন তারা মানুষকে দেখে না, মানুষের মধ্যে কলকে দেখে।"[১৬৫]

যন্ত্রকে মানবকল্যাণের অনুকূলে ব্যবহারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কতটা লালায়িত ছিলেন তার পরিচয় পাই নিম্নোক্ত পত্রটিতে—

" আজ দেখলুম একটা বাংলা কাগজ এই ব'লে আক্ষেপ করেছে যে, বেহারের ইংরেজ মহাজন কলের লাঙলের সাহায্যে চাষ শুরু করেছে, তাতে ক'রে আমাদের চাষীদের সর্বনাশ হবে। লেখকের মত এই যে, আমাদের চাষীদের আধপেটা খাওয়াবার জন্যে মানুষের বুদ্ধি-শক্তিকে অনন্তকাল নিষ্ক্রিয় ক'রে রেখে দিতে হবে। লেখক একথা ভুলে গেছেন যে, চাষীরা বস্তুত মরছে নিজের জড়বুদ্ধির ও নিরুদ্যমের আক্রমণে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যাপারে আমি আর-আর অনেক প্রকারের আয়োজন করেছি, কিন্তু যে শিক্ষার সাহায্যে মানুষ একান্ত দৈহিক শ্রমপরতার অসম্মান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে তার আয়োজন করতে পারলুম না এই দুঃখ অনেক দিন থেকে আমাকে বাজছে। দেহের সীমা থেকে যে বিজ্ঞান আমাদের মুক্তি দিচ্ছে আজ য়ুরোপীয় সভ্যতা তাকে বহন করে এনেছে—একে নাম দেওয়া যাক বলরামদেবের সভ্যতা। তুমি জান বলরামদেবের একটু মদ খাবারও অভ্যাস আছে, এই সভ্যতাতেও শক্তিমত্ততা নেই তা বলতে পারি নে, কিন্তু সেই ভয়ে শক্তিহীনতাকেই শ্রেয় গণ্য করতে হবে এমন মূঢ়তা আমাদের না হোক।"[১৬৬]

দ. গ্রাম ও নগর :

ভারতবর্ষীয় গ্রাম-সমাজের আবহমান কাল ধরে টিকে থাকার শক্তির অনুসন্ধান করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন আমাদের দেশের পল্লী সরকারের সাহায্য ছাড়াই স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে। তাই গ্রামস্বরাজ স্থাপনের স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ সওয়াল

করেন। গ্রাম ও নগরের মধ্যে অর্থনৈতিক ও আত্মিক বিভেদের বাতাবরণটিকে এভাবেই তিনি ভেঙে ফেলে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নিয়েছিলেন। গ্রাম-নগরের বিভেদ ভারতবর্ষের সমাজকে কোন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে এনে উপনীত করেছিল, তার বর্ণনা দিয়ে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন—

" কিন্তু এই নগরে আর গ্রামে যে পার্থক্য সে যেন ভাইবোনের পার্থক্যের মতো, তারা এক বাড়িতেই থাকে, তাদের মাঝে প্রাচীর নেই। আধুনিক ভারতে শিল্পচর্চা প্রভৃতি নানা বিষয়ে নগরে গ্রামে ছাড়াছাড়ি। সহরগুলি যে দীপ জ্বালে তার আলো গ্রামে গিয়ে পড়েই না। দেশের সম্পত্তি যেন ভাগ হয়ে গেছে, গ্রামের অংশে যেটুকু পড়েচে তাতে আচার অনুষ্ঠান বজায় রাখা সম্ভব নয়। এই কারণে সমস্ত দেশ এক হয়ে কোনো শিল্প কোনো বিদ্যাকে রক্ষণ ও পোষণ করতে পারে না। তাই সহরের লোক যখন দেশের কথা ভাবে তখন সহরকেই দেশ বলে জানে, গ্রামের লোক দেশের কথা ভাবতেই জানেনা।" [১৬৭]

উৎস নির্দেশ:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭০ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪১৭। পৃ: ১২২।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২ সংখ্যক পত্র। ছিন্নপত্রাবলী। বিশ্বভারতী। ১৪১১। পৃ: ৩২।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১৯ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৩৯৯। পৃ: ১১৫।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪১৯। পৃ: ১৩।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১০৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১২শ খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৩৯৩। পৃ: ১৩৭।

৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৩৮।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩ সংখ্যক পত্র। রাশিয়ার চিঠি। রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৫৬১।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষাবিধি। পথের সঞ্চয়। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩শ খণ্ড। বিশ্বভারতী

সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৬৯৭-৬৯৮।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লক্ষ্য ও শিক্ষা। পথের সঞ্চয়। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭০০।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩ সংখ্যক পত্র। পরিশিষ্ট-১, চিঠিপত্র ১ম খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪১৭। পৃ: ১০৬।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৮ সংখ্যক পত্র। পরিশিষ্ট-১, চিঠিপত্র ১ম খন্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১০৯।

১২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধায়। মৃণালিনী দেবী। কবির কথা। বিশ্বভারতী। ১৩৬১। পৃ: ৬৪।

১৩. মৈত্রেয়ী দেবী। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। দে'জ। ২০১৩। পৃ: ৪৪।

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১০৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৩৭।

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১৩শ খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৩৯৮। পৃ: ১৬৩।

১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৯ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২-৩৩।

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪২ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৫।

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১০ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪১৮। ৩৯৫-৩৯৬।

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১৩শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৬৪-১৬৫।

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১৫শ খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪০২। পৃ: ২৫।

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১০৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৬২।

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬ সংখ্যক পত্র। রাশিয়ার চিঠি। রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৭২।

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১০৮ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৬৮।

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ৫৮ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৯৩।

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৮৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১৩শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১১১।

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ১৫১ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৩৫।

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ৪১ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭০।

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫০ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১৩শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭১।

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৯৮ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪০০। পৃ: ২৮১।

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩ সংখ্যক পত্র। রাশিয়ার চিঠি। রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৬০।

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫ সংখ্যক পত্র। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৬৯।

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপসংহার। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৯৬।

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪ সংখ্যক পত্র। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৬২।

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৯ সংখ্যক পত্র। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ম খণ্ড। পৃ: ৫৮১।

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরিশিষ্ট, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি। রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৯৪-৪৯৫।

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পল্লীসেবা। পরিশিষ্ট, রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬১১।

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ৬৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১০০।

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ১০৬ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৬৪।

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ১২৩ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯২।

৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪১৭। পৃ: ২৮৯।

৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত ভাষণ। পরিশিষ্ট, চিঠিপত্র ১২শ খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৩৯৩। পৃ: ৩৩২।

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ১২৩ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড।পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯২।

৪৩. তদেব।

৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১ সংখ্যক পত্র। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৮৬।

৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫৪ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১৩শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৯।

৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩৯ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৭।

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩৭ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪১৮। পৃ: ৮৫।

৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৯ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪১৩।

৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১৫শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৫।

৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬২ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৩২-২৩৩ ।

৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২৩ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯০।

৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২ সংখ্যক পত্র। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৫৭।

৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপসংহার। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬০১।

৫৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৬০২।

৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ১২৮ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২০১।

৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রামবাসীদিগের প্রতি। পরিশিষ্ট, রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬০৮।

৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৫০ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৬৫।

৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পল্লীসেবা।পরিশিষ্ট, রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬১২।

৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপসংহার। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৯৫।

৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র। রবীন্দ্ররচনাবলী ১ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২০। পৃ: ৮৭৬।

৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪৭ সংখ্যক পত্র। পথে ও পথের প্রান্তে। রবীন্দ্ররচনাবলী ৯ম খণ্ড। রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন। পৃ: ৬৬৬।

৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪৩ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬১।

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৮ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১৩শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৪৫।

৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৮ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১ম খন্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫০।

৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ৯৩ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৪৩।

৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮১ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩০৮।

৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪৭ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৩য় খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪২০। পৃ: ৮৬।

৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১৫শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৫।

৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭৭ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৭ম খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৩৯৯। পৃ: ১০৭।

৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭৯ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৭ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১১০।

৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২৪ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২১৭।

৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৩ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৫।

৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১০১ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৮২।

৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১০৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৪০।

৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫ সংখ্যক পত্র। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র। রবীন্দ্ররচনাবলী ১ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২০। পৃ: ৮১৪।

৭৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭০ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১২০।

৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫ সংখ্যক পত্র। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৬২।

৭৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬৯ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১১৬।

৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমাজভেদ। পথের সঞ্চয়। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৬৯০।

৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৮৯ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯৭।

৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৯০।

৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১৫শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯।

৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩ সংখ্যক পত্র। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৯০।

৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপসংহার। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬০২।

৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ৪২ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭২।

৮৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৩ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৭ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৬।

৮৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৭ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৯।

৮৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২১ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২১১।

৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২৪ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২২।

৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ২ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৪।

৯১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৭ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৩৫।

৯২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র। রবীন্দ্ররচনাবলী ১ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৮৭৫।

৯৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫০ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১০২।

৯৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩২ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১০ম খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪০২। পৃ: ৩৩।

৯৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১৯ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৬৬।

৯৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭০ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১১৮।

৯৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১০ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৫১।

৯৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৪ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১ম খন্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩।

৯৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৯৯ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৭৮।

১০০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২৪ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২১৭।

১০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ পরিচ্ছেদ। জাপানযাত্রী। রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০৪।

১০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ৪০ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৮।

১০৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ১৮ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৭ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৬১।

১০৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৬ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৭ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৫।

১০৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৬ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৭ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫১।

১০৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩০ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৭ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৭।

১০৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪২।

১০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২০ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৬।

১০৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩২ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৮।

১১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪৮ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১০১।

১১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫৪ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১০৮।

১১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৫৬ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৭৪।

১১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৯০ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৬৩।

১১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২৪ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২১৬।

১১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮৭।

১১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২৩।

১১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৭ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৬।

১১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮৩।

১১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৮৯ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯৪।

১২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৫৭ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৭৫।

১২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একাদশ পরিচ্ছেদ। জাপানযাত্রী। রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪১৮-৪১৯।

১২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ৪২ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭২।

১২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৯৮ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৭৬।

১২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৪ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৩।

১২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১১শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮১।

১২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১৩শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৫১।

১২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৯০।

১২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৩ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৭৫।

১২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩৭ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯৪।

১৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪১ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯৮।

১৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৭।

১৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ১২৩ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯৩।

১৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২ সংখ্যক পত্র। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৮৯-৫৯০।

১৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩৬ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১ম খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪১৭। পৃ: ৬৮।

১৩৫. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুঃখের আঘাত। পিতৃস্মৃতি। জিজ্ঞাসা। ১৩৮৭। পৃ: ৮০।

১৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ১২২ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৮৮।

১৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ১৪৮ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২২৮।

১৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৬ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪২৮।

১৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৮ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৪।

১৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৬।

১৪১.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩৮।

১৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৮৬।

১৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩৮ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৩য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬১-৬২।

১৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩ সংখ্যক পত্র। জাভা যাত্রীর পত্র। রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৩৩।

১৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । ৩ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৬।

১৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপসংহার। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬০২।

১৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪ সংখ্যক পত্র। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৬২।

১৪৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৬২-৫৬৩।

১৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫ সংখ্যক পত্র। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৬৭।

১৫০. তদেব।

১৫১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৬৮।

১৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬ সংখ্যক পত্র। রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৭১।

১৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৮।

১৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৮।

১৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড।পূর্বোক্ত। পৃ: ৫।

১৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৬ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৩য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮।

১৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৯১ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৪১।

১৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮।

১৫৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৯।

১৬০. তদেব।

১৬১. তদেব।

১৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৫।

১৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭২ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৬-৫৭।

১৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৫ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ১৫শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৫।

১৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রামবাসীদিগের প্রতি। পরিশিষ্ট, রাশিয়ার চিঠি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬০৮।

১৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪০ সংখ্যক পত্র। পথে ও পথের প্রান্তে। রবীন্দ্ররচনাবলী ৯ম খণ্ড। রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন। ১৪১৩। পৃ: ৬৬২।

১৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৮৭ সংখ্যক পত্র। চিঠিপত্র ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪১৯। পৃ: ১৩৫।

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে পল্লীপ্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের অপরাপর সাহিত্যধারার পাশাপাশি কথাসাহিত্যের ধারায়ও পল্লীউন্নয়ন সংক্রান্ত চিন্তাচেতনার প্রতিফলন স্পষ্ট। পল্লীর মাঝে স্থায়ীভাবে বসবাসের শুরু ১৮৮৯ এর শেষ থেকে। এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে পল্লীসম্পর্কিত অভিজ্ঞতাগুলি পরিপুষ্টি লাভ করে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীসংগঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে এর অনেক আগে থেকেই তাঁর অনুরূপ চিন্তাচেতনার অভিপ্রকাশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত সেই আর্থ-সামাজিক ছবিকে, চিন্তা-চেতনার বিন্যাসকে নিম্নোক্ত স্বতন্ত্র দুটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে—

ক. রবীন্দ্র-উপন্যাসে পল্লীপ্রসঙ্গ

খ. রবীন্দ্র-ছোটগল্পে পল্লীপ্রসঙ্গ

ক. রবীন্দ্র-উপন্যাসে পল্লীপ্রসঙ্গ:

ক. বউঠাকুরাণীর হাট :

রবীন্দ্রনাথের ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাস ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে রচিত ঐতিহাসিক রোম্যান্স শ্রেণীর উপন্যাস। এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন সংক্রান্ত

ভাবনার প্রত্যক্ষ অভিপ্রকাশ নেই। কিন্তু রাজকুমার উদয়াদিত্য চরিত্রের প্রতি রাজ্যের প্রজাদের যে স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসার প্রকাশ আছে সে আসলে তার প্রজাকল্যাণকামী মানসিকতারই পুরস্কার বিশেষ। টুকরো কিছু চিত্রে ঘুরে ফিরে এসেছে পল্লীজীবনের কিছু প্রতিবন্ধকতার ছবি। রামচন্দ্রের রাজ্য চন্দ্রদ্বীপে বন্যার দাপটে মানুষের যে অবস্থা দাঁড়ায় তাঁর চকিত উদ্ভাস আছে। বিভার বিশেষ হৃদয়ানুভূতির বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—" যখন রামমোহন গল্প করিল গত বর্ষার বন্যায় তাহার ঘরবাড়ি সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে একাকী তাহার বৃদ্ধ মাতাকে পিঠে করিয়া সাঁতার দিয়া মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়াছিল ও দুইজনে মিলিয়া সমস্ত রাত্রি সেখানে যাপন করিয়াছিল তখন বিভার ক্ষুদ্র বুকটির মধ্যে কী হৃৎকম্পই উপস্থিত হইয়াছিল।"[১]

এ কেবল চন্দ্রদ্বীপের কোন একটি বিশেষ বন্যা নয়। চন্দ্রদ্বীপে এভাবে যে প্রায়ই বন্যার প্রাদুর্ভাবে প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে, তার পরিচয় মেলে জামাতা রামচন্দ্রের সঙ্গে রাজা উদয়াদিত্যের কথোপকথনের মধ্যে। কেবল বন্যা নয় পল্লীর মানুষের মনে মন্ত্র-তন্ত্র ভূত-প্রেত বশীকরণে যে অন্ধ বিশ্বাস তার কিছু আলোকিত উদ্ভাসন রচিত হয়েছে এ উপন্যাসে।

তবে 'বউ- ঠাকুরানীর হাট' ইতিহাসকে প্রকাশ করেছে ঠিকই, কিন্তু সে ইতিহাস বাংলার রাষ্ট্রিক ইতিহাস নয়, তার মধ্যে নিহিত থেকেছে এক সামাজিক ইতিহাস ও তৎসংলগ্ন এক দিকনির্দেশ। এ কেবল রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের ব্যক্তি-প্রতাপের কাহিনী নয়, এ হল সামাজিক ইতিহাসের বৃহত্তর প্রতাপের ইতিবৃত্ত। ক্ষমতার উচ্চমঞ্চে বসে যে প্রতাপ সমাজের দুর্বল, অশক্ত নরনারীর ব্যক্তিজীবনকে অন্যায়ভাবে দলিত মথিত করে তোলে, ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থসাধনের জন্য আপন খেয়ালে যে অমানবিক পীড়নে অকুণ্ঠিত, বাংলার সমাজ জীবনের সেই বিভীষিকা এ উপন্যাসে রাজকীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। সমালোচক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি' গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস' প্রবন্ধে তাই জানিয়েছেন—

"যে অহঙ্কৃত শক্তি ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা সমাজ জীবনে অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, সেই শক্তি বৌঠাকুরানীর হাট উপন্যাসে দুটি রূপে ব্যক্ত। প্রথমত ও প্রধানত প্রতাপাদিত্য চরিত্রে , দ্বিতীয়ত রামচন্দ্র চরিত্রে। প্রতাপ ও রামচন্দ্র অত্যাচারীর দুই মূর্তি। ....উত্তরযুগের বিভিন্ন উপন্যাস ও বিচিত্র প্রবন্ধে পরিণততর মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির পর্যালোচনা করেছেন, এখানে তারই ভূমিকা। স্বদেশ ও স্বধর্ম মানুষের প্রিয়। এই প্রিয়ত্ব জীবনকে সৌন্দর্য ও সার্থকতায় মন্ডিত করতে পারে, আবার এর বিকৃত, অসহজ রূপ ঠিক বিপরীত ধর্মী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, জীবনে চরম দুর্যোগ ও দুর্গতি টেনে আনে। স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশের হিতকামনা গৌরবজনক

সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ভৌগোলিক সীমাটাকে একান্ত করে যদি খণ্ড দৃষ্টি, একদেশদর্শী মন জীবনের সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং অন্ধভক্তির বিভ্রান্তিতে বিশ্বের অমঙ্গল আনে, স্বদেশের কল্যাণও তিরোহিত হয়। ....

ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই। জীবনকে ধারণ করে বিকাশ ও বর্ধনের পথে যা প্রাগ্রসর করে দেয় , চৈতন্যকে যা উদ্বোধিত, প্রসারিত করে মানব জীবনে পরম শান্তি ও শ্রীর আবির্ভাব ঘটায়, তাই ধর্ম। বিভিন্ন ধর্ম বিচিত্র পথে এই কল্যাণকেই কামনা করে। কিন্তু যে আচার-সর্বস্ব, অসহিষ্ণু, সঙ্কীর্ণমনা, হিংস্র ধর্মান্ধতা ধর্মের ছদ্মবেশে জীবনে প্রবেশ করে, সে অধর্মের নামান্তর।

প্রতাপের চরিত্রে দুই জাতীয় অন্ধতার সমন্বয় ঘটেছে। সেখানে স্বাদেশিকতা ও হিন্দুত্ব নেই, আছে স্বদেশিয়ানা ও হিন্দুয়ানী। ......

.... যে প্রমত্ত দেশাভিমান ও ধর্মাভিমানের আবেগ ও উদ্দীপনা সত্যকে আচ্ছন্ন করে জীবন ছন্দকে আঘাত করে, তার অর্থহীন আস্ফালন, অসঙ্গত রূঢ়তা এবং অমঙ্গলকর অশুভ পরিণতিটি লেখক নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন তাঁর শান্ত, সহজ সত্য দৃষ্টি ও নিরাবেগ মন নিয়ে। ...

বৌঠাকুরানীর হাট উপন্যাসে কালো অক্ষরে যে রাঙা রক্তের ইতিহাস লেখা হল, তাতে সেই শিকলভাঙ্গা রাঙা আগুনের ইন্ধন,—রাঙা আকাশের ইশারা।”[২]

খ. রাজর্ষি :

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস ‘রাজর্ষি’। মানুষের অন্ধ-কুসংস্কার, জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের দ্বারা দেশের মানুষের আত্মিক উন্নয়ন রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দেশের ধর্মব্যবসায়ীর স্বরূপকে চিহ্নিত করণের পাশাপাশি অন্ধসংস্কারের ভয়ঙ্কর পরিণতিকে চিত্রিত করেছেন। অন্ধসংস্কার অপেক্ষা উদার চেতনাপ্রসৃতির মহৎ মূল্যকেই রবীন্দ্রনাথ চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন—যা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের পল্লী উন্নয়ন যজ্ঞের একটি অন্যতম অবলম্বিত পন্থা হয়ে উঠেছিল।

এ উপন্যাসের ছোট্ট মেয়ে হাসি ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে প্রস্তরময় ঘাটের সোপানে রক্তের দাগ দেখেরাজা গোবিন্দমাণিক্যকে প্রশ্ন করে ‘এত রক্ত কেন!’ কারণ পূর্বদিন রাত্রে একশো-একটি মহিষ দেবীর পূজায় বলিদান দেওয়া হয়। এই ছোট্ট প্রশ্ন মানবপ্রেমী রাজা

গোবিন্দমাণিক্যকে ব্যাকুল করে তোলে। যিনি জগতের মাতা তিনি কী করে রক্তপিপাসিনী হতে পারেন এই প্রশ্ন রাজার মনেও সোচ্চার হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু এত রক্ত কেন—এই প্রশ্নের নিরুচ্চার যন্ত্রণা নিয়ে হাসি যখন রাজার কোলে শুয়েই মৃত্যুবরণ করলো, তখন রাজা গোবিন্দ মাণিক্য ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে পশুবলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এরই প্রতিক্রিয়ায় রাজপুরোহিত রঘুপতির সঙ্গে রাজার সংঘাত শুরু হয়। এই ঘোষণায় মন্ত্রী থেকে শুরু করে রাণী, রাজার ভ্রাতা নক্ষত্ররায় ও অন্যান্য সভাসদরাও সমূহ অনিষ্টের আশঙ্কা করেন। শুধু তাই নয়, অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত হতে না পারায় রাজার ভ্রাতা এবং সভাসদদের ভাবনার সূত্রকে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছেন নিম্নোক্ত বিবরণে—

"সভাসদেরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতে লাগিল, " এ যে মগের মুল্লুক হইয়া দাঁড়াইল। আমরা তো জানি বৌদ্ধ মগেরাই রক্তপাত করে না, অবশেষে আমাদের হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে নাকি!"

নক্ষত্ররায়ও তাহাদের মতে সম্পূর্ণ মত দিয়া কহিলেন, হাঁ, শেষে হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে নাকি!"

সকলেই ভাবিল, অবনতির লক্ষণ ইহা হইতে আর কী হইতে পারে! মগে হিন্দুতে তফাত রহিল কী!"[৩]

আসলে বহুকাল প্রচলিত নৃশংস প্রথাকে মুক্ত দৃষ্টিতে বিচার করার স্বচ্ছ মানসিকতা গোবিন্দমাণিক্যের মতো রঘুপতি বা অন্য কারো ছিল না। তাই একদা জয়সিংহ রাজাকে শাস্ত্রের নির্দেশ উল্লেখ করে পশুবলির যাথার্থ্য সম্পর্কে জানালে রাজা তাঁর মুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে জানিয়েছিলেন—" "শাস্ত্রের যথার্থ বিধি কেই-বা পালন করে। আপনার প্রবৃত্তি অনুসারে সকলেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। যখন দেবীর সম্মুখে বলির সকর্দম রক্ত সর্বাঙ্গে মাখিয়া সকলে উৎকট চীৎকারে ভীষণ উল্লাসে প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে থাকে, তখন কি তাহারা মায়ের পূজা করে, না নিজের হৃদয়ের মধ্যে যে হিংসারাক্ষসী আছে সেই রাক্ষসীটার পূজা করে! হিংসার নিকটে বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়াই শাস্ত্রের বিধি।"[৪]

এ আসলে বলিদান প্রথা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেরই দৃষ্টিকোণ। রবীন্দ্রনাথের একাধিক পত্রে অনুরূপ ভাবনার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি আছে। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের মনে এই মুক্ত মানবিক দৃষ্টির সঞ্চার, অন্ধকুসংস্কার থেকে তাদের মুক্ত করা যে কত কঠিন কাজ রবীন্দ্রনাথ পল্লীর অভ্যন্তরে উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেই বুঝেছিলেন। ধর্মপ্রাণ মানুষের সেই ধর্মীয় গোঁড়ামির পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসের মধ্যে অত্যন্ত সচেতন ভাবেই। পশুবলি নিষিদ্ধ হবার পর ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের দিক থেকে

কোলাহল করতে করতে চলে আসা এক দল মানুষের কথোপকথনকে এই সূত্রে তুলে ধরা যেতে পারে—

" বুড়া বলিতেছে, "বাপ-পিতামহের কাল থেকে এই তো চলে আসছে জানি, আজ রাজার বুদ্ধি কি তাঁদের সকলকে ছাড়িয়ে উঠল!"

যুবা বলিতেছে, " এখন আর মন্দিরে আসতে ইচ্ছে করে না, পূজার সে ধুম নেই।"

কেহ বলিল, " এ যেন নবাবের রাজত্ব হয়ে দাঁড়ালো।"

তাহার মনের ভাব এই যে, বলিদান সম্বন্ধে দ্বিধা একজন মুসলমানের মনেই জন্মাইতে পারে, কিন্তু একজন হিন্দুর মনে জন্মানো অত্যন্ত আশ্চর্য।

মেয়েরা বলিতে লাগিল, " এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।"

একজন কহিল, "পুরুত-ঠাকুর তো স্বয়ং বললেন যে , মা স্বপ্নে বলেছেন তিন মাসের মধ্যে এ দেশ মড়কে উচ্ছন্ন যাবে।"

হারু বলিল, " এই দেখো-না কেন, মোধো আজ দেড় বছর ধরে ব্যামো ভুগে বরাবর বেঁচে এসেছে, যেই বলি বন্ধ হল অমনি সে মারা গেল।"

ক্ষান্ত বলিল, " তা কেন, আমার ভাশুরপো, সে যে মরবে এ কে জানত! তিন দিনের জ্বর। যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অমনি চোখ উলটে গেল।"

ভাশুরপোর শোকে এবং রাজ্যের অমঙ্গল-আশঙ্কায় ক্ষান্ত কাতর হইয়া পড়িল।

তিনকড়ি কহিল, " সেদিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগল, একখানা চালাও বাকি রইল না।"

চিন্তামণি চাষা তাহার একজন সঙ্গী চাষাকে কহিল, " অত কথায় কাজ কী, দেখো-না কেন এ বছর যেমন ধান সস্তা হয়েছে এমন অন্য কোনো বছর হয় নি। এ বছর চাষার কপালে কী আছে কে জানে!"

বলিদান বন্ধ হইবার পরে এবং পূর্বেও যাহার যাহা-কিছু ক্ষতি হইয়াছে, সর্বসম্মতিক্রমে ঐ বলি বন্ধ হওয়াই তাহার একমাত্র কারণ নির্দিষ্ট হইল। এ দেশ পরিত্যাগ

করিয়া যাওয়াই ভালো, এইরূপ সকলের মত হইল। এ মত কিছুতেই পরিবর্তিত হইল না বটে, কিন্তু দেশেই সকলে বাস করিতে লাগিল।”[৫]

এমন ধর্মান্ধ প্রজাদের কীভাবে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করা যায় তা ধর্মব্যবসায়ীদের কাছে অজানা নয়। রঘুপতিও ঠিক অনুরূপ পন্থাই অবলম্বন করে। মন্দিরের প্রতিমার পশ্চাৎভাগ প্রজাদের দিকে স্থাপিত করে সাধারণ প্রজাকে এই বার্তা দিতে চান যে রাজার নির্দেশে মা তাদের প্রতি বিমুখ হয়েছেন। এভাবেই দেশের প্রজাদেরকে রঘুপতি রাজার বিরুদ্ধে উদ্বেজিত করে তোলার প্রয়াস নেয়। সে তার রাজধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিজেকে নিয়োজিত করে।

কিন্তু এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দমাণিক্যের মধ্য দিয়ে প্রকৃত রাজা বা জননেতার স্বরূপটিকে তুলে ধরেছেন। ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থ নয়, বৃহত্তর দেশের স্বার্থই একজন আদর্শ জননেতার কাছে প্রাথমিকতা পাওয়া উচিত। স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ দেশের প্রকৃত কল্যাণ বা উন্নয়নের জন্য জননেতাদের যে পথে এবং যে আদর্শকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে বলেছিলেন, গোবিন্দমাণিক্য ভ্রাতা নক্ষত্র রায়কে অনুরূপ আদর্শ পালনেরই নির্দেশ দিয়ে বলেছেন–

“ তুমি কি মনে কর রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজছত্র ? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান ? শত-সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলে গ্রহণ করো, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো–এ যে করে সে-ই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখবরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে সে তো দস্যু–সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশি বর্ষিত হইতেছে, সেই অভিশাপধারা হইতে কোনো রাজছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে, অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া সে সোনার অলংকার করিয়া পরে, তাহার ভূমি বিস্তৃত রাজবস্ত্রের মধ্যে শত শত শীতাতুরের মলিন ছিন্ন কন্থা।”[৬]

রাজা বা দেশনেতা যখন ক্ষমতা বা পদের লোভে অন্ধ হয়ে তার কর্তব্য বিস্মৃত হন তখন প্রজাকল্যাণের এমত মহৎ আদর্শ কোথায় তলিয়ে যায়, তারও কিছু নিদর্শন এ উপন্যাসে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সাজাহান পুত্র সুজাকে বাংলার অধিপতি নিযুক্ত করলেও দিল্লীশ্বরের মৃত্যুশয্যার খবর পেয়ে তিনি তাঁর সকল রাজধর্ম বিস্মৃত হলেন।

সিংহাসনের লালসা সুজাকে এতটাই তার রাজধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেয় যে দেশ এবং দেশের সাধারণ জনসাধারণের জীবনের মূল্য তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। তাঁর সৈন্যবাহিনী দিল্লী অভিমুখে রওনা হওয়ার সময় যে প্রবল অরাজকতার পরিচয় দেয় তাঁর বাস্তব ছবি তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজাহিতৈষী বা জনকল্যাণকামী মানসিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন—

"দগ্ধ কুটির, পরিত্যক্ত গ্রাম, মর্দিত শস্যক্ষেত্র লক্ষ্য করিয়া রঘুপতি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রঘুপতি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ সত্ত্বেও আতিথ্য পাওয়া দুর্ঘট। কারণ পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্যেরা যে পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে কেবল দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছে। সৈন্যেরা অশ্ব ও হস্তীপালের জন্য অপক্ক শস্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। কৃষকের মরাইয়ে একটি কণা অবশিষ্ট নাই। চারিদিকে কেবল লুণ্ঠনাবশিষ্ট বিশৃঙ্খলা। অধিকাংশ লোক গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়াছে। দৈবাৎ যে দু-একজনকে দেখা যায় তাহাদের মুখে হাস্য নাই। তাহারা চকিত হরিণের ন্যায় সতর্ক। কাহাকেও তাহারা বিশ্বাস করে না, দয়া করে না। বিজন পথের পার্শ্বে গাছের তলায় লাঠি-হাতে দুই-চারিজনকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়; পথিক-শিকারের জন্য তাহারা সমস্ত দিন অপেক্ষা করিয়া আছে। ধূমকেতুর পশ্চাদ্‌বর্তী উল্কারাশির ন্যায় দস্যুরা সৈনিকদের অনুসরণ করিয়া লুণ্ঠনাবশেষ লুঠিয়া লইয়া যায়। এমন-কি মৃতদেহের উপর শৃগাল-কুকুরের ন্যায় মাঝে মাঝে সৈন্যদল ও দস্যুদলে লড়াই বাধিয়া যায়। নিষ্ঠুরতা সৈন্যদের খেলা হইয়াছে, পার্শ্ববর্তী নিরীহ পথিকের পেটে খপ করিয়া একটা তলোয়ারের খোঁচা বসাইয়া দেওয়া বা তাহার মুণ্ড হইতে পাগড়ি-সমেত খানিকটা খুলি উড়াইয়া দেওয়া তাহারা সামান্য উপহাসমাত্র মনে করে। গ্রামের লোকেরা তাহাদের দেখিয়া ভয় পাইতেছে দেখিলে তাহাদের পরম কৌতুক বোধ হয়। লুণ্ঠনাবশেষে তাহারা গ্রামের লোকদের উৎপীড়ন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। দুইজন মান্য ব্রাহ্মণকে পিঠে পিঠে সংলগ্ন করিয়া টিকিতে টিকিতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্য প্রয়োগ করে । দুই ঘোড়ার পিঠে একজন মানুষকে চড়াইয়া ঘোড়াদুটাকে চাবুক মারে; দুই ঘোড়া দুই বিপরীত দিকে ছুটিয়া যায়, মাঝখানে মানুষটা পড়িয়া গিয়া হাত-পা ভাঙে। এইরূপ প্রতিদিন নূতন নূতন খেলা তাহারা আবিষ্কার করে। অকারণে গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া যায়। বলে যে, বাদশাহের সম্মানার্থ বাজি পুড়াইতেছে। সৈন্যদের পথে এইরূপ অত্যাচারের শত শত চিহ্ন পড়িয়া আছে। এখানে রঘুপতি আতিথ্য পাইবেন কোথায় ! কোনোদিন অনাহারে কোনোদিন অল্পাহারে কাটিতে লাগিল। রাত্রে অন্ধকারে এক ভগ্ন পরিত্যক্ত কুটিরে শ্রান্তদেহে শয়ন করিয়াছিলেন, সকালে উঠিয়া দেখেন এক ছিন্নশির মৃতদেহকে সমস্ত রাত্রি বালিশ করিয়া শুইয়াছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে রঘুপতি ক্ষুধিত হইয়া কোনো কুটিরে গিয়া দেখিলেন, একজন লোক তাহার ভাঙা সিন্দুকের উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে—বোধ হয় তাহার লুণ্ঠিত ধনের জন্য শোক করিতেছিল—কাছে গিয়া ঠেলিতেই সে গড়াইয়া পড়িয়া গেল। মৃতদেহ মাত্র, তাহার জীবন অনেক কাল হইল চলিয়া গিয়াছে।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে তাঁর নানা প্রবন্ধে রাজনৈতিক ক্ষমতা বা অধিকার অপেক্ষা আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠার কথা বলবেন, স্বনির্ভরতা বা শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব অর্জনের কথা বলবেন, এ উপন্যাস যেন তারই মুখবন্ধ। ড. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ কারণেই মন্তব্য করেছেন— " 'বউঠাকুরানীর হাট'এর নিহিত স্তরে যে কথাটি ঘনীভূত ছিল, 'রাজর্ষি' তে যে কথাটি আরো ঘন, সেটার মধ্যেই ছিল পরবর্তী সমগ্র রবীন্দ্রনাথের পূর্বাভাস। সেই হল রাষ্ট্রনৈতিক বা ধর্মনৈতিক উগ্রতার সম্মোহকে চিনতে পারা। 'রাজাকে বধ করে রাজ্য মেলে না'—'রাজর্ষি'র এই অস্পষ্ট ও ক্ষীণ উক্তির মধ্যে আছে রাজনৈতিক চরমবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নৈতিক ভূমিকার অগ্রচারী রূপ। 'বউঠাকুরানীর হাট' -এর প্রতাপাদিত্য ও উদয় সুরমা সংঘাতের অসংঘঠিত কাঠামোর মধ্যে আছে পরিণত রবীন্দ্রনাথের একটা প্রধান 'মোটিফ'এর শিথিল গোড়াপত্তন—অহৃদয় শক্তিমান যান্ত্রিকতার সঙ্গে সংবেদী প্রাণের সংঘর্ষ। প্রায় ক্ষেত্রেই তা বিনষ্টির ভিতর দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যায় অন্ধ যন্ত্র বা যন্ত্রপ্রতিম শক্তির নৈতিক শূন্যতাকে।"[৮]

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, ত্রিপুরাও এর ব্যতিক্রম নয়। কৃষিকেন্দ্রিক দেশে কৃষিব্যবস্থার বিপর্যয় যে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করে তার পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে—"এই বৎসরে ত্রিপুরায় এক অভূতপর্ব ঘটনা ঘটিল। উত্তর হইতে সহসা পালে পালে ইঁদুর ত্রিপুরার শস্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। শস্য সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিল, এমন-কি, কৃষকের ঘরে শস্য যত-কিছু সঞ্চিত ছিল তাহাও অধিকাংশ খাইয়া ফেলিল—রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। ......স্থানে স্থানে চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইল, প্রজারা বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিল।"[৯]

এমতাবস্থায় প্রজাহিতৈষী রাজা গোবিন্দমাণিক্য দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাদের এক বছরের জন্য খাজনা মাপ করে প্রজাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই জনকল্যাণমূলক কাজের ফলেই প্রজাদের দেশে ক্রমে স্থিতাবস্থা ফিরে এসেছে—" ত্রিপুরায় ইঁদুরের উৎপাত যখন আরম্ভ হয় তখন শ্রাবণ মাস। তখন ক্ষেত্রে কেবল ভুট্টা ফলিয়াছিল, এবং পাহাড়ে জমিতে ধান্যক্ষেত্রেও পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিন মাস কোনোমতে কাটিয়া গেল—অগ্রহায়ণ মাসে নিম্নভূমিতে যখন ধান কাটিবার সময় আসিল তখন দেশে আনন্দ পড়িয়া গেল। চাষারা স্ত্রীলোক বালক যুবক বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া দা হাতে লইয়া ক্ষেত্রে গিয়া পড়িল। হৈয়া হৈয়া শব্দে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিল। জুমিয়া রমণীদের গানে মাঠ-বাট ধ্বনিত হইয়া উঠিল।"[১০]

কিন্তু পল্লী অঞ্চলে নদীবাঁধ বা রাস্তাঘাট সুরক্ষিত না থাকায় ঝড়-বৃষ্টির প্রকোপে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হত তার ছবি রবীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে পূর্ববঙ্গের জমিদারীতেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এর একটি চকিত উদ্ভাসন

রচনা করেছিলেন। কিন্তু এ উপন্যাসে তার ব্যাপক গম্ভীর রূপকে চিত্রিত করেছেন। গোবিন্দ মাণিক্যের অনুগত পুরোহিত ও আমাত্য বিল্বন নোয়াখালির নিজামতপুরের যে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই গ্রামের বিপর্যয়ের অনুরূপ পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

" রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় উত্তর ও উত্তর-পূর্ব হইতে প্রবল বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। অবশেষে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া ঝড়ের বেগ কমিয়া গেল। এমন সময়ে রব উঠিল— বন্যা আসিতেছে। কেহ ঘরের চালে উঠিল, কেহ পুষ্করিণীর পাড়ের উপর গিয়া দাঁড়াইল, কেহ বৃক্ষশাখায়, কেহ মন্দিরের চূড়ায় আশ্রয় লইল। অন্ধকার রাত্রি, অবিশ্রাম বৃষ্টি—বন্যার গর্জন ক্রমে নিকটবর্তী হইল, আতঙ্কে গ্রামের লোকেরা দিশাহারা হইয়া গেল। এমন সময়ে বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। উপরি-উপরি দুই বার তরঙ্গ আসিল, দ্বিতীয় বারের পরে গ্রামে প্রায় আট হাত জল দাঁড়াইল। পরদিন যখন সূর্য উঠিল এবং জল নামিয়া গেল, তখন দেখা গেল—গ্রামে গৃহ অল্পই অবশিষ্ট আছে, এবং লোক নাই—অন্য গ্রাম হইতে মানুষ-গোরু, মহিষ-ছাগল এবং শৃগাল-কুকুরের মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়াছে। সুপারির গাছগুলা ভাঙিয়া ভাসিয়া গেছে, গুঁড়ির কিয়দংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে। বড়ো বড়ো আম-কাঁঠালের গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়া কাত হইয়া পড়িয়া আছে। অন্য গ্রামের গৃহের চাল ভাসিয়া ভাসিয়া ভিত্তির শোকে ইতস্তত উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। অনেকগুলো হাঁড়ি-কলসী বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। অধিকাংশ কুটিরই বাঁশঝাড় আম কাঁঠাল মাদার প্রভৃতি বড়ো বড়ো গাছের দ্বারা আবৃত ছিল, এইজন্য অনেকগুলি মানুষ একেবারে ভাসিয়া না গিয়া গাছে আটকাইয়া গিয়াছিল। কেহ বা সমস্ত রাত্রি বন্যাবেগে দোদুল্যমান বাঁশঝাড়ে দুলিয়াছে, কেহ বা মাদারের কন্টকে ক্ষতবিখত, কেহ বা উৎপাটিত বৃক্ষ-সমেত ভাসিয়া গেছে। জল সরিয়া গেলে জীবিত ব্যক্তিরা নামিয়া আসিয়া মৃতের মধ্যে বিচরণ করিয়া আত্মীয়দিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অধিকাংশ মৃতদেহই অপরিচিত এবং ভিন্ন গ্রাম হইতে আগত। কেহই তাহাদিগকে সৎকার করিল না পালে পালে শকুনি আসিয়া মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল।"[১১]

প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এই বিপর্যয় পল্লীর জীবনে কি মহাসঙ্কট বয়ে আনে, পূর্বোক্ত উদ্ধৃতাংশটি তারই প্রমাণ। ভারতবর্ষের অনেক গ্রামেই বর্ষার সময় অনুরূপ বন্যাপরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। এতে পল্লীর মানুষ কীভাবে গ্রামছাড়া হয়ে দেশান্তরী হয়, কীভাবে চরম অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়ে, তারই প্রতীকি ছবি আছে এ উপন্যাসে। বন্যার জল সরে গেলেও কিন্তু রেহাই মেলে না। নোয়াখালির নিজামতপুর গ্রামের বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, এই সময়ে মৃতদেহে পুকুরের জল দূষিত হয়ে এবং অন্যান্য নানা কারণে গ্রামে মড়ক আরম্ভ হয়। উঁচু জমিতে বসবাসকারী বন্যার প্রকোপ থেকে বেঁচে যাওয়া পাঠানদের পাড়ায় মড়কের প্রথম সূত্রপাত ঘটে। মৃতদেহকে

কবর দেবার বা এই দুর্দিনে পরস্পরকে সেবা করার মত সুযোগ বা অবসর কারো রইল না। কারণ পল্লীর মধ্যে জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার ভেদাভেদ এত প্রবল ছিল যে সেই বেড়া ঠেলে কেউ কারো সাহায্য বা সেবার জন্য অগ্রসর হত না। তাই—“হিন্দুরা কহিল, মুসলমানেরা গো-হত্যা পাপের ফল ভোগ করিতেছে। জাতি-বৈরিতায় এবং জাতিচ্যুতিভয়ে কোনো হিন্দু তাহাদিগকে জল দিল না বা কোনো প্রকার সাহায্য করিল না।”[১২]

রবীন্দ্রনাথ একারণেই তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীতে পল্লীরমধ্যে জাত-পাতের ভেদাভেদহীন এক মানবসমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কেননা তাঁর পল্লীউন্নয়ন নিছক জীবিকার আয়োজনে সীমাবদ্ধ ছিল না, মানবিক সমৃদ্ধির অনুকূলে নির্মিত এক পরিকল্পনা হয়ে উঠেছিল। যাইহোক, এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর অনুরূপ প্রেক্ষাপটে বিল্বন সন্ন্যাসীর চরিত্রটিকে প্রতিস্থাপিত করে যেন গ্রামীণ বিপর্যয় থেকে মুক্তির দিশা নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর কয়েকজন চেলাসহ পীড়িত পাঠানদের সেবা করতে লাগলেন। তাদেরকে পথ্য-পাণীয়-ঔষধ দান করে, মৃতদেহগুলি কবর দিয়ে পল্লীর স্থিতাবস্থা আনার চেষ্টা করলেন। তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে জানালেন—

“ আমি সন্ন্যাসী, আমার কোনো জাত নাই। আমার জাত মানুষ। মানুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত ! ভগবানের সৃষ্ট মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনই বা কিসের জাত!”[১৩] এই মুক্ত মানবিক চেতনাকে গ্রহণ করার মত শিক্ষা বা চেতনাসংস্কার নিজামতপুরের হিন্দু প্রজাদের ছিল না। তাই তারা বিল্বনের কাজ ভালো কি মন্দ ঠিক করে উঠতে পারলো না। কেবল অসম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞানের জায়গা থেকে বললো ‘ভালো নহে’—যদিও তাদের অন্তরের বাণী এর বিপরীতই ছিল। বিল্বন পাঠানের ছোট ছোট ছেলেদের মড়কের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য হিন্দুদের কাছে নিয়ে যান। কিন্তু তারা তাদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। বিল্বন অবশেষে তাদের নিয়ে পল্লীর একটি বড় ভাঙা মন্দিরে আশ্রয় নেন। গ্রামের থেকে অনেক দূরে বসবাসকারী মুসলমান জমিদারকে অবশেষে রাজী করিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকা ও চাল এনে পল্লীর পীড়িত মানুষদের সেবার ব্যবস্থা করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী উন্নয়ন যজ্ঞে বিল্বনের মতই দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত জাতপাতের ঊর্ধ্বে উদার মানবিক চেতনাসম্পন্ন কর্মীদের অনুসন্ধানে নিয়োজিত থেকেছেন। এ উপন্যাসে প্রজাকল্যাণে নিয়োজিত গোবিন্দমাণিক্য তাই বিল্বনকেই তাঁর প্রধান আশ্রয় হিসেবে মেনেছেন। এই ত্যাগের পথকেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত দেশকর্মীর পথ বলে মনে করেছেন। সেই ত্যাগধর্মে দীক্ষা নিয়েই গোবিন্দমাণিক্য বা বিল্বন ক্ষমতার ঐশ্বর্য ছেড়ে সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাই মন্তব্য করেছেন—

"...রাজা ধ্রুবকে লইয়া বনে গিয়া বাস করিবেন শুনিয়া বিল্বন বলিলেন, 'বনে কি কখনো মানুষ গড়া যায়। বনে কেবল একটা উদ্ভিদ পালন করিয়া তোলা যাইতে পারে। মানুষ মনুষ্য সমাজেই গঠিত হয়। (৩৬শ পরিচ্ছেদ) ইহার পর ত্রিপুরা ত্যাগ করিয়া বিল্বন নোয়াখালির নিজামতপুরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে ভয়ংকর মড়কের প্রাদুর্ভাব হইলে তিনি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যেরূপ সেবা করিয়াছিলেন তাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার বশ হইয়াছিল। পাঠক ৪১শ পরিচ্ছেদটি পাঠ করিলে দেখিবেন রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের মধ্য দিয়া দেশসেবার কী আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। বিল্বনের কর্মযোগী চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ সৃষ্টি।"[১৪]

দেশের জনসাধারণের রাজা হতে গেলে তাকেও যে ত্যাগের পথে সাধনার পথে ঋষির সমান গৌরব অর্জন প্রয়োজন, তা গোবিন্দমাণিক্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। ভ্রাতৃবিরোধ, গৃহবিবাদ বা রক্তপাতের মত পথকে এড়াতেই গোবিন্দমাণিক্য ত্যাগের পথকেই বেছে নিয়েছেন। নক্ষত্র রায় ও সুজার মিলিত বাহিনীকে বাধা না দিয়ে নিঃশব্দে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে সন্ন্যাসের জীবনকে বেছে নিতে পেরেছেন। মানুষের সেবা বা কল্যাণই অবশেষে গোবিন্দমাণিক্যের অবলম্বিত পথ হয়েছে। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, " 'আমি আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না, লোকালয়ের মধ্যে বাস করিয়া কাজ করিতে শিখিব।' " এই উপলক্ষে রামুর দক্ষিণে রাজাকুলের কাছে মগেদের যে দুর্গ আছে, আরাকানরাজের অনুমতি নিয়ে তিনি পল্লীশিক্ষার জন্য সেখানে একটি পাঠশালা খুলে বসেন। পল্লীর শিশুদের শিক্ষাদান করে তাদের দোষমুক্ত পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই রাজার কাছে জীবনাদর্শ বলে বিবেচিত হয়—

"একটি মানুষের জীবন যে কত মহৎ ও কী প্রাণপণ যত্নে পালন ও রক্ষা করিবার দ্রব্য, তাহা গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক। তাঁহার চারি দিকে অনন্তফলপরিপূর্ণ মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়, ইহাই দেখিয়া এবং নিজের চেষ্টায় ইহাই সাধন করিয়া গোবিন্দমাণিক্য নিজের অসম্পূর্ণ জীবন বিসর্জন করিতে চান। ইহার জন্য তিনি সকল কষ্ট সকল উপদ্রব সহ্য করিতে পারেন।"[১৫]

এই পথেই যে জীবনের স্থায়ী সুখের সন্ধান লাভ সম্ভব উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি চৈতন্যের তাই-ই ছিল সারকথা। বঙ্কিম তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৮৫) প্রবন্ধ গ্রন্থের 'আমার মন', "একা-'কে গায় ওই'"-এর মত একাধিক প্রবন্ধে অনুরূপ ভাব ব্যক্ত করেছেন। একই সময়ে দাঁড়িয়ে অনুরূপ বাঙালি চৈতন্যের সংস্কারে লালিত ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দমাণিক্যকে অনুরূপ পথেই চালিত করেছেন—যা তাঁর ব্যক্তিগত কর্মময় জীবনের সঙ্গে অনেকটাই মেলে। শান্তিনিকেতন পর্বে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকে অনুরূপ পথেই পরিচালিত করেছেন। উপন্যাসে রঘুপতিও একদা

তাঁর কৃতকর্মের ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে অন্ধসংস্কার আর অহমিকাবোধকে বিসর্জন দিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছেন এবং গোবিন্দমাণিক্যের অবলম্বিত পথকেই আপন জীবনের পথ হিসেবে বেছে নিতে চেয়েছেন। গোবিন্দমাণিক্যকে তিনি বলেছেন—

" "আমি সমস্ত দেখিয়াছি, কিছুতেই সুখ নাই। হিংসা করিয়া সুখ নাই, আধিপত্য করিয়া সুখ নাই, তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহাতেই সুখ। আমি তোমার পরম শত্রুতা করিয়াছি, আমি তোমাকে হিংসা করিয়াছি, তোমাকে আমার কাছে বলি দিতে চাহিয়াছিলাম, আজ আমাকে তোমার কাছে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে আসিয়াছি।""[১৬]

রাজা গোবিন্দমাণিক্য উপন্যাসের সমাপ্তিতে বিল্বনের অনুরোধে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর পুনরায় দেশে ফিরে নিজের কাঁধে রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু সে যে পরোক্ষে জনকল্যাণের এক বৃহত্তর সুযোগের প্রত্যাশায়, উপন্যাসের সমাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ তার দিকনির্দেশ দিয়ে রেখেছেন। জাত-পাতের ঊর্ধ্বে মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগকারী গোবিন্দমাণিক্য সম্বন্ধে সমাপ্তিতে জানিয়েছেন—

" 'দুর্ভাগা সুজার প্রতি আরাকান-পতির নৃশংসতা স্মরণ করিয়া গোবিন্দমাণিক্য দুঃখ করিতেন। সুজার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি তরবারের বিনিময়ে বহুতর অর্থ-দ্বারা কুমিল্লা-নগরীতে একটি উৎকৃষ্ট মসজিদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি সুজা-মসজিদ বলিয়া বর্তমান আছে।

গোবিন্দমাণিক্যের যত্নে মেহেরকুল আবাদ হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বিস্তর ভূমি তাম্রপত্রে সনন্দ লিখিয়া দান করেন। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কুমিল্লার দক্ষিণে বাতিসা গ্রামে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তিনি অনেক সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, কিন্তু সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। এজন্য অনুতাপ করিয়া ১৬৬৯ খৃ: অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।'""[১৭]

গ. চোখের বালি:

'চোখের বালি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ 'আঁতের কথা'র বিশ্লেষণে নিয়োজিত হয়েছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তার বিস্তৃত ছবি এ উপন্যাসে ধরা পড়েনি। তবে 'চোখের বালি' রচনাকালে (১৯০৩) রবীন্দ্রনাথ পতিসর-শান্তিনিকেতন পর্বের পল্লীউন্নয়ন যজ্ঞের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ফলে এ উপন্যাসে দু'একটি ক্ষেত্রে পল্লীকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার প্রতিভাস রচিত হয়েছে।

লক্ষণীয় যে, ‘কড়ি ও কোমল’-‘ছবি ও গান’-‘মানসী’ রচনাকালে পল্লীকে বাইরে থেকে দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল—

‘ বিরামে কাটায়, আরামে ঘুমায়

গাছপালা বন কুঁড়েগুলি’[১৮]

মনে হয়েছিল ‘কাহিনীতে ঘেরা’ বাংলার পল্লীগুলি যেন ‘মায়াদেবীদের মায়া-রাজধানী’। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পল্লীর বাস্তবতার মাঝে রবীন্দ্রনাথ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং পল্লীজীবনকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার সূত্রে তার বাস্তবতা সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা লাভ করেন। এ উপন্যাসে ‘মনের কারখানাঘরে’র বস্তুনিষ্ঠ কথাকার সেই সচেতন বাস্তবতাবোধ থেকে পল্লীর বাস্তব প্রতিরূপটিকে জাগিয়া তুলেছেন। বিহারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিনোদিনী যেদিন পল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হয় সেদিনও তার চক্ষে পল্লীর একটি সুস্নিগ্ধ মনোরম রূপ জেগে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

“ বিনোদিনী যখন যাত্রীশূন্য মেয়েদের গাড়িতে চড়িয়া বাতায়ন হইতে চষামাঠ ও ছায়াবেষ্টিত এক-একখানি গ্রাম দেখিতে পাইল, তখন তাহার মনে স্নিগ্ধনিভৃত পল্লীর জীবনযাত্রা জাগিয়া উঠিল। সেই তরুচ্ছায়াবেষ্টনের মধ্যে তাহার স্বরচিত কল্পনা-নীড়ে নিজের প্রিয় বইগুলি লইয়া কিছুকাল নগরবাসের সমস্ত ক্ষোভ, দাহ ও ক্ষতবেদনা হইতে সে শান্তিলাভ করিতে পারিবে, এই কথা তাহার মনে হইতে লাগিল, আর যেন কিছুর দরকার নাই—মন যেন এইরূপ সুবর্ণরঞ্জিত স্তব্ধবিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে সমস্ত ভুলিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিতে চায়, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ দুঃখসাগর হইতে জীবনতরীটি তীরে ভিড়াইয়া নিঃশব্দ সন্ধ্যায় একটি নিষ্কম্প বটবৃক্ষের তলায় বাঁধিয়া রাখিতে চায়, আর কিছুতেই কোনো প্রয়োজন নাই।”[১৯]

কিন্তু বিনোদিনীর এই দৃষ্টির মধ্যে মিশেছিল প্রেমের নবোন্মেষ অনুভূতি। তাই সেই সরসদৃষ্টি পরিপার্শ্বকে তারই রঙে রাঙিয়ে নিয়েছিল। বিহারীর প্রেমের মাঝে আশ্রয়ের আশ্বাস তার জীবনের তটভূমির উপর দিয়ে বয়ে চলা তরঙ্গক্ষুব্ধ তটিনীর বিক্ষুব্ধতাকে যেন ম্লান করে দিয়ে একটি শান্তির বাতাবরণকে বিছিয়ে দিয়েছিল। পল্লীর রূঢ় বাস্তবতার মাঝে যখন সে বাস্তবিক এসে দাঁড়ালো তখন এক নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল তার সেই কল্পজগৎটি। জেগে উঠল আমাদের দেশের তাবৎ পল্লীর এক নিরানন্দময় খণ্ডচিত্র— যা অর্থনৈতিক ক্লিষ্টতায় ম্লান, যা জীর্ণতায় দীনতায় অশিক্ষায় আলোহীনতায় আর অস্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র এক জীবনের ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথ নিঁখুত অভিজ্ঞতাকে রূপ দিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষাচিত্রে—

" তৃষিত বক্ষে এই শান্তির আশা বহন করিয়া বিনোদিনী আপনার কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু হায়, শান্তি কোথায়। কেবল শূন্যতা এবং দারিদ্র্য। চারি দিকেই সমস্ত জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন, অনাদৃত, মলিন। বহুদিনের রুদ্ধ স্যাঁতসেঁতে ঘরের বাষ্পে তাহার যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। ঘরে অল্পস্বল্প যে-সমস্ত আসবাবপত্র ছিল, তাহা কীটের দংশনে, ইঁদুরের উৎপাতে ও ধূলার আক্রমণে ছারখার হইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বিনোদিনী ঘরে গিয়া পৌঁছিল—ঘর নিরানন্দ অন্ধকার। কোনোমতে সরষের তেলে প্রদীপ জ্বালাইতেই তাহার ধোঁয়ায় ও ক্ষীণ আলোতে ঘরের দীনতা আরো পরিস্ফুট হইল। আগে যাহা তাহাকে পীড়ন করিত না, এখন তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল—তাহার সমস্ত বিদ্রোহী অন্তঃকরণ সবলে বলিয়া উঠিল, 'এখানে তো এক মুহূর্তও কাটিবে না।' কুলুঙ্গিতে পূর্বেকার দুই-একটা ধুলায়-আচ্ছন্ন বই ও মাসিক পত্র পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহা ছুঁইতে ইচ্ছা হইল না। বাহিরের বায়ুসম্পর্কশূন্য আমবাগানে ঝিল্লি ও মশার গুঞ্জনস্বর অন্ধকারে ধ্বনিত হইতে লাগিল।"[২০]

রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনায় এটাও স্পষ্ট যে বিনোদিনীর অভ্যাস বা মানসিকতার মধ্যে যে পরিবর্তন সে বস্তুত গ্রাম ও নগর জীবনের মধ্যেকার পার্থক্যের কেন্দ্রমূল থেকেও অনেকাংশে বিস্তার লাভ করেছে। নতুবা বিনোদিনী গ্রামেরই মেয়ে। পল্লীর জীবনধারার সঙ্গে তার সঙ্গতি রক্ষার ক্ষেত্রে তেমন অসুবিধা হবার কথা নয়। আসলে নগর জীবনের বিলাসিতা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যই যে আজ তার জীবনকে পল্লীজীবনের সঙ্গে নিতান্তই বেমানান করে তুলেছে, গ্রামের পরিবেশে তার দমবন্ধ অবস্থা সে দিকেরই জানান দেয়—প্রেমের শূন্যতাবোধ সেখানে আদৌ ততটা ক্রিয়াশীল নয়।

শিলাইদহ-পতিসরে রবীন্দ্রনাথ পল্লীজনকল্যাণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। জমিদারী শোষণ পীড়নকেই তিনি উপজীব্য করেননি। বাংলার নবজাগরণপ্রসূত নবীন মূল্যবোধ এর পিছনে যতই ক্রিয়াশীল থাকুক না কেন, সাধারণ মানুষের হিতসাধনা দ্বারা মানসিক সন্তোষ লাভের ইচ্ছাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিপত্রে ব্যক্ত করেছেন। এ উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথের মানসচরিত্র বিহারী নিজেকে মানুষের কল্যাণের মধ্যে সঁপে দিয়ে মানসিক 'স্থায়ী সুখে'র সন্ধান করেছে। মৃত্যুকালে রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডেকে তাঁর সেই কল্যাণমূলক কাজে স্বতন্ত্র অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে গেছেন—"বিহারীকে ডাকিয়া রাজলক্ষ্মী কহিলেন, " বাবা বিহারী, কাল মহিন বলিতেছিল, তুই গরিব ভদ্রলোকদের চিকিৎসার জন্য একটি বাগান করিয়াছিস—ভগবান তোকে দীর্ঘজীবী করিয়া গরিবের হিত করুন। আমার বিবাহের সময় আমার শ্বশুর আমাকে একখানি গ্রাম যৌতুক করিয়াছিলেন, সেই গ্রামখানি আমি তোকে দিলাম, তোর গরিবদের কাজে লাগাস, তাহাতে আমার শ্বশুরের পুণ্য হইবে।"[২১]

শুধু বিহারী নয়, আত্মসংস্কারের লক্ষ্যে মহেন্দ্রও শেষ পর্যন্ত এ-পথেই অগ্রসর হতে চেয়েছে। মানসিক সন্তোষের ঐকান্তিক অভিপ্রায়ে একজন ডাক্তার হিসেবে মহেন্দ্র বিহারীর পাশে থেকে ত্যাগের পথে জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চেয়েছে। বিহারীকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাই মহেন্দ্র বলেছে—" "বিহারী, তুমিও ভাবিয়া দেখো, যে জীবন আমি গঠন করিয়াছি, তাহাকে লইয়া আলস্যভরে আর উপভোগ করিবার জো নাই— কর্মের দ্বারা তাহাকে যদি টানিয়া লইয়া না চলি, তবে কোন্ দিন সে আমাকে টানিয়া অবসাদের মধ্যে ফেলিবে। তোমার কর্মের মধ্যে আমাকে স্থান দিতেই হইবে।"[২২]

ঘ. গোরা :

'গোরা' উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের দেশভাবনার মূল্যবান দিকগুলিকেই ধারণ করে আছে। গোরার জীবনের বিবর্তনের রেখাপথ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরূপ ভাবনাসমূহের অভিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। গোরার সঙ্কীর্ণ হিন্দুত্ববাদ থেকে বৃহত্তর জাতীয়তাবোধে উত্তরণই এ উপন্যাসের মূল সুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন ভাবনায় এ ভাবেই জাত-পাত-অস্পৃশ্যতাকে অতিক্রম করে এক বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

গোরা শিশুকাল থেকেই তার পাড়ার এবং ইস্কুলের ছেলেদের সর্দারি করতো। মাস্টার-পণ্ডিতের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলার কাজেই ছিল তার প্রধান আমোদ। কিন্তু বয়স বাড়লেই সে ছেলেদের ক্লাবে 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' এবং 'বিংশতি কোটি মানুষের বাস'-এর মত দেশাত্মমূলক কবিতা ও গান আবৃত্তি করে, ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করে ক্ষুদ্র বিদ্রোহীদের দলপতি হয়ে ওঠে। ক্রমে বয়স্ক সভায় গোরার প্রবেশ ঘটে। মহিম গোরার এই বিদ্রোহী মনোভাবের পিছনে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক ও ব্রিটিশ সরকারের তীব্র সমালোচক হরিশ মুখোপাধ্যায়ের তীব্র প্রভাবকেই দেখতে পেয়েছিল। তাই গোরাকে 'পেট্রিয়ট-জ্যাঠা' বা 'হরিশ মুখুজ্জে দি সেকেন্ড' বলে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু গোরার ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব পথে ঘাটে নানা ছুতায় ইংরেজ ঠ্যাঙানোর অভিসন্ধি খুঁজে বেড়াতো। গোরা এই সময় কেশব চন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিও আকৃষ্ট হয়। কিন্তু হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রতি তার মনে যথার্থ শ্রদ্ধার জন্ম হয়। এর পর থেকেই গোরা হিন্দুত্ববাদে গভীর ভাবে আস্থাশীল হয়ে ওঠে।

নিজের জন্ম বৃত্তান্ত উদ্ঘাটিত হবার পূর্ব পর্যন্ত উপন্যাসে তাই আমরা গোরার মধ্যে এক কট্টর হিন্দুত্ববাদী মানসিকতাকে প্রত্যক্ষ করি। পথের দুর্ঘটনা থেকে বিনয় পরেশবাবুদের উদ্ধার করার পর তাঁদের বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ প্রসঙ্গে গোরা যে ভাষায় বিনয়কে সতর্ক করে তার থেকে গোরার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়—

"ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো-ভাগাড়ে গিয়ে মরবে, তোমার আচার-বিচার কিছুই থাকবে না, কম্পাস-ভাঙা কাণ্ডারীর মতো তোমার পূর্ব-পশিমের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে—তখন মনে হবে জাহাজ বন্দরে উত্তীর্ণ করাই কুসংস্কার, সংকীর্ণতা—কেবল না-হক ভেসে চলে যাওয়াই যথার্থ জাহাজ চালানো।"[২৩]

কিন্তু গোরার এই রক্ষণশীল মানসিকতা, এই জাত-পাতের বেড়াজাল বা প্রাচীর সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের কত বড় অন্তরায় ছিল সে কথা গোরাকে সেভাবে নাড়া দেয়নি। দেশের প্রাণকেন্দ্র পল্লীকে নিয়ে যে বৃহত্তর ভারতবর্ষ তার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে গেলে যে এই প্রাচীরের বিনাশ অত্যন্ত জরুরী গোরা তা প্রাথমিক ভাবে স্বীকার করেনি। কিন্তু ঔপন্যাসিক গোরার বিপরীতে আনন্দময়ী-বিনয়কে কেন্দ্র করে চেতনার সেই বিপরীত একটি স্রোতকে উপন্যাসে বহমান রেখে গোরার—এমনকি বৃহত্তর পাঠক সম্প্রদায়ের চেতনা-উদ্গমের প্রয়াস নিয়েছেন।

আনন্দময়ী এই সকল জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার ঊর্ধ্বে এক বৃহত্তর চেতনালোকে অবস্থান করেছেন। গোরা তাঁর মায়ের এই জাতীয় অকুলীন ব্যবহারকে অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেনি। আনন্দময়ীকে গোরা কতকগুলি অর্থহীন আচার বা নিয়মের নিগড়ে বাঁধতে চেয়েছেন। কিন্তু আনন্দময়ী গোরাকে স্পষ্টতই জানিয়েছেন—" কিন্তু তোকে কোলে নিয়েই আমি আচার ভাসিয়ে দিয়েছি তা জানিস? ছোট ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না। সে কথা যেদিন বুঝেছি সেদিন থেকে এ কথা নিশ্চয় জেনেছি যে আমি যদি খৃষ্টান বলে ছোটো জাত বলে কাউকে ঘৃণা করি তবে ঈশ্বর তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। তুই আমার কোল ভরে আমার ঘর আলো করে থাক, আমি পৃথিবীর সকল জাতের হাতেই জল খাব।"[২৪]

তবু ধর্মের মোহে অন্ধ হয়ে গোরা জানিয়ে দিয়েছে আনন্দময়ীর খ্রীষ্টান দাসী লছমিয়াকে বিদায় করে না দিলে সে তাঁর মায়ের ঘরে জল বা আহার গ্রহণ করবে না। যে লছমিয়া গোরার শিশুকালে বসন্ত হলে আপ্রাণ চেষ্টায় সেবা যত্ন করে তাকে বাঁচিয়েছে, তার প্রতি গোরার এ হেন নির্দেশে যে অনেক অজ্ঞানতা মিশে আছে সে কথা স্নেহময় তিরস্কারে আনন্দময়ী স্পষ্টতই জানিয়েছেন। কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেননি। বরং গোরাকে জানিয়ে দিয়েছেন—" তুই যা করছিস এ তুই জ্ঞানে করছিস নে, তা আমি তোকে বলে দিলুম। আমার মনে এই কষ্ট রইল যে তোকে মানুষ করলুম বটে, কিন্তু—যাই হোক গে, তুই যাকে ধর্ম বলে বেড়াস সে আমার মানা চলবে না—না হয়, তুই আমার ঘরে আমার হাতে নাই খেলি—কিন্তু তোকে তো দু'সন্ধে দেখতে পাব, সেই আমার ঢের।"[২৫]

বিনয় গোরার ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে ছাড়িয়ে উঠে গোরার এমত আচরণের প্রাথমিক প্রতিবাদ জানাতে পারেনি। কিন্তু গোরার এ সকল আচরণ যে বাড়াবাড়ি ঠেকে তা সে স্পষ্টতই জানিয়েছে। একথা ঠিক যে গোরার এই হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদের পরিপুষ্টির জন্যেই—তার মধ্যে অন্তরায় যাই থাকুক না কেন। এই ভাববাদী জাতীয়তাবাদই গোরাকে সংবাদপত্রে হিন্দুধর্মের নিন্দুক ইংরেজ মিশনারীর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণে প্ররোচিত করেছে। ভাবিয়েছে—"এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে, যা-কিছু স্বদেশের তারই প্রতি সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া।"[২৬] বলিয়েছে—

"এই যেখানে আমরা পড়ছি শুনছি , চাকরির উমেদারি করে বেড়াচ্ছি। দশটায়-পাঁচটায় ভূতের খাটুনি খেটে কী যে করছি তার কিছুই ঠিকানা নেই, এই জাদুকরের মিথ্যে ভারতবর্ষটাকেই আমরা সত্য ব'লে ঠাউরেছি ব'লেই পঁচিশ কোটি লোক মিথ্যে মানকে মান বলে, মিথ্যে কর্মকে কর্ম বলে দিনরাত বিভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছি—এই মরীচিকার ভিতর থেকে কি আমরা কোনোরকম চেষ্টায় প্রাণ পাব! আমরা তাই প্রতিদিন শুকিয়ে মরছি। একটি সত্য ভারতবর্ষ আছে—পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ, সেইখানে স্থিতি না হলে আমরা কি বুদ্ধিতে কি হৃদয়ে যথার্থ প্রাণরসটা টেনে নিতে পারব না। তাই বলছি, আর সমস্ত ভুলে, কেতাবের বিদ্যে, খেতাবের মায়া, উঞ্ছবৃত্তির প্রলোভন, সব টান মেরে ফেলে দিয়ে সেই বন্দরের দিকেই জাহাজ ভাসাতে হবে—ডুবি তো ডুবব, মরি তো মরব। সাধে আমি ভারতবর্ষের সত্য মূর্তি, পূর্ণ মূর্তি কোনোদিন ভুলতে পারি নে!"[২৭]

এ আসলে আমাদের দেশের যে নিজস্ব প্রকৃতি, প্রাচীন ভারতের যে নিজস্ব সাধনা, সে পথেই দেশের মুক্তি ও বিকাশকে ত্বরান্বিত করে তোলার আকাঙ্খা বিশেষ। কিন্তু ক্রমেই গোরার মধ্যেকার বিশ্বাসে ধীরে ধীরে চিড় ধরতে শুরু করেছে। তার বিশ্বাস ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তন করেছে। আসলে গোরার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের এবং সমকালের দেশভাবনার এক স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন—" ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসানকালে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার পরিবর্তে হিন্দুজাতীয়তাবাদী আদর্শ......তীব্র ও প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল,......। সেই যুগে লিখিত রবীন্দ্রনাথের নববর্ষ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণ, সমাজভেদ, প্রভৃতি প্রবন্ধে আমরা তাঁহার 'হিন্দুয়ানি'র একটা বিস্তারিত চিত্র পাইয়াছি। তারপর স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তীকালে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ এই 'হিন্দুয়ানি'র গণ্ডি অতিক্রম করিয়া এক অখন্ড বিশ্বমানবতার ও বিশ্বজাগতিকতার সত্যে উপনীত হইতেছেন। হিন্দুধর্ম হইতে সর্বধর্মসমন্বয়, জাতীয়তাবাদ হইতে বিশ্বজাগতিকতাবাদ—কবি জীবনের এই

আদর্শ-অন্বীক্ষার সুদীর্ঘ গতিপথটিই যেন গোরা উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।"[২৮]

গোরা যে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নানে গেছে তা কোন পুণ্য সঞ্চয়ের আকাঙ্খায় নয়, গঙ্গাস্নানের প্রতি বিশ্বাসবশেও নয়। আসলে "গোরা যে ত্রিবেণীতে স্নান করিতে সংকল্প করিয়াছে তাহার কারণ এই যে, সেখানে অনেক তীর্থযাত্রী একত্র হইবে। সেই জনসাধারণের সঙ্গে গোরা নিজেকে এক করিয়া মিলাইয়া দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে ও দেশের হৃদয়ের আন্দোলনকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে চায়। যেখানে গোরা একটুমাত্র অবকাশ পায় সেখানেই সে তাহার সমস্ত সংকোচ, সমস্ত পূর্বসংস্কার সবলে পরিত্যাগ করিয়া দেশের সাধারণের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রে নামিয়া দাঁড়াইয়া মনের সঙ্গে বলিতে চায়, "আমি তোমাদের তোমরা আমার।""[২৯]

কিন্তু এই ভাবাদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা আমাদের দেশে কত কঠিন গোরা তার একটি আঁচ পায় ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নানের জন্য স্টীমারে করে যাত্রার সময়। গোরা যতই মনে মনে ভাবুক না কেন "আমি তোমাদের তোমরা আমার", বাস্তবে তাকে কার্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের দেশীয় লোকেদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা এবং শ্রদ্ধার ও সহযোগিতার অভাব। একথা রবীন্দ্রনাথ বার বার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তারই বাস্তব ছবিটিকে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে—

" গ্রহণের স্নান উপলক্ষ্যে কোনো স্টীমার-কোম্পানি কাল প্রত্যুষে যাত্রী লইয়া ত্রিবেণী রওনা হইয়াছিল। পথের মধ্যে মধ্যে এক-এক স্টেশন হইতে বহুতর স্ত্রীলোক যাত্রী দুই-এক জন পুরুষ-অভিভাবক সঙ্গে লইয়া জাহাজে উঠিতেছিল। পাছে জায়গা না পায় এজন্য ভারি ঠেলাঠেলি পড়িয়াছিল। পায়ে কাদা লইয়া জাহাজে চড়িবার তক্তাখানার উপরে টানাটানির চোটে পিছলে কেহ বা অসম্বৃত অবস্থায় নদীতে পড়িয়া যাইতেছে; কাহাকেও বা খালাসি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে; কেহ বা নিজে উঠিয়াছে, কিন্তু সঙ্গী উঠিতে পারে নাই বলিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে—মাঝে মাঝে দুই-এক পসলা বৃষ্টি আসিয়া তাহাদিগকে ভিজাইয়া দিতেছে, জাহাজে তাহাদের বসিবার স্থান কাদায় ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের মুখে চোখে একটা ত্রস্তব্যস্ত উৎসুক সকরুণ ভাব; তাহারা শক্তিহীন। অথচ তাহারা এত ক্ষুদ্র যে, জাহাজের মাল্লা হইতে কর্তা পর্যন্ত কেহই তাহাদের অনুনয়ে এতটুকু সাহায্য করিবে না ইহা নিশ্চয় জানে বলিয়া তাহাদের চেষ্টার মধ্যে ভারি একটা কাতর আশঙ্কা প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় গোরা যথাসাধ্য যাত্রীদিগকে সাহায্য করিতেছিল। উপরের ফার্স্ট ক্লাসের ডেকে একজন ইংরেজ এবং একটি আধুনিক ধরণের বাঙালিবাবু জাহাজের রেলিং ধরিয়া পরস্পর হাস্যালাপ করিতে করিতে চুরুট মুখে তামাশা দেখিতেছিল। মাঝে মাঝে কোন

যাত্রীর বিশেষ কোনো আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া ইংরেজ হাসিয়া উঠিতেছিল এবং বাঙালিটিও তাহার সঙ্গে যোগ দিতেছিল।"[৩০]

গোরা এর তীব্র প্রতিবাদ করে। কিন্তু 'আধুনিক ধরণের বাঙালিবাবু'টি কেবল তার নিজের স্বদেশীয়দের হীন, মূঢ় বলেই প্রতিপন্ন করেনি, সে যে দেশের অপরাপর সাধারণ মানুষের দলভুক্ত নয় এটা প্রমাণ করার জন্য খানসামাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে মুরগির কোন ডিশ পাওয়া যাবে কিনা। খানসামা এর প্রতিকূল উত্তর দিলে বাবুটি তার পার্শ্ববর্তী ইংরেজটিকে শুনিয়ে বলে যে "creature comforts সম্বন্ধে জাহাজের সমস্ত বন্দোবস্ত অত্যন্ত যাচ্ছেতাই"[৩১] । এই যে স্বদেশকে, স্বদেশের মানুষকে, স্বদেশীয় যাবতীয় ব্যবস্থাকে হীন প্রতিপন্ন করা, তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা; এই অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে দেশের মানুষ মুক্ত হতে না পারলে যে দেশের মঙ্গল নেই তা রবীন্দ্রনাথ বার বার জানিয়েছেন। গোরার সব চেয়ে বড় আক্ষেপ সেখানেই। তাই শিক্ষিত বাঙালি যে সাধারণ মানুষের দুর্গতি দেখে বিদেশীকে ডেকে নিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে হাসতে পারে, সেই আক্রোশ গোরাকে দগ্ধ করতে থাকে। দেশের মানুষ নিজেদের এতটাই হীনতম স্তরে নিজেদের নামিয়ে এনেছে যে তাদেরকে পশুর মত লাঞ্ছনা করলেও তা তারা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সংগতভাবে স্বীকার করে। এর মধ্যে গোরা দেশব্যাপী এমন এক সুগভীর অজ্ঞানতাকে প্রত্যক্ষ করে যে তাতে তার বুক ফেটে যেতে থাকে।

এই অভিজ্ঞতাই গোরাকে পরেশবাবুর গৃহে হারানবাবুর বিরুদ্ধে তর্কে প্ররোচিত করে—

" কোনো বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট বা জজ ডিস্ট্রিক্টের ভার লইয়া যে কখনো কাজ চালাইতে পারিবে না, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য হারান বাঙালির চরিত্রে নানা দোষ ও দুর্বলতার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে গোরার মুখ লাল হইয়া উঠিল—সে তাহার সিংহনাদকে যথাসাধ্য রুদ্ধ করিয়া কহিল, " এই যদি সত্যই আপনার মত হয় তবে আপনি আরামে এই টেবিলে বসে বসে পাঁউরুটি চিবুচ্ছেন কোন্ লজ্জায়!"

হারান বিস্মিত হইয়া ভুরু তুলিয়া কহিলেন, "কী করতে বলেন ?"

গোরা। হয় বাঙালি-চরিত্রের কলঙ্ক মোচন করুন, নয় গলায় দড়ি দিয়ে মরুন গে। আমাদের জাতের দ্বারা কখনো কিছুই হবে না, এ কথা কি এতই সহজে বলবার ? আপনার গলায় রুটি বেধে গেল না ?"[৩২]

আসলে দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব ছাড়া, নিজেদের মধ্যেকার গভীর ঐক্য ছাড়া যে সাধারণ মানুষের প্রকৃত কল্যাণ বা মুক্তি সাধন সম্ভব নয়, একথা বিশ্বাস করতো গোরা। সংশোধন তো ঢের পরের কথা। দেশের সকল প্রথা ও সংস্কার, যা দেশবাসীকে এক হতে দিচ্ছে না, তাদের সংস্কার তখনিই সম্ভব যখন দেশবাসীকে ভালোবেসে তাদের হিতাকাঙ্খায় মানুষ আত্মনিয়োগ করবে। কেননা—“ “...বাপ-মায়ের সংশোধন সহ্য করা যায় কিন্তু পাহারাওয়ালার সংশোধনে শোধনের চেয়ে অপমান অনেক বেশি; সেই সংশোধন সহ্য করতে হলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। আগে আত্মীয় হবেন তার পর সংশোধক হবেন—নইলে আপনার মুখের ভালো কথাতেও আমাদের অনিষ্ট হবে””[৩৩]

গোরার এই ভাবনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। গোরা এখনো তার সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই সংস্কার বা সংশোধন অপেক্ষা সে জাতির প্রতি শ্রদ্ধা বা ভালোবাসাকে কিছু অধিক গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে ঠিকই। কিন্তু সংস্কারের যে পদ্ধতি-প্রকরণের কথা সে জানিয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনারও মূল সূত্র ছিল । ছোটোর উপকার করতে হলে যে ছোটোর সমান হতে হবে , আত্মাভিমানের মদকে বিসর্জন দিতে হবে, সেকথা রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্ব থেকেই বলে আসছেন—‘লোকহিতে’র মতো প্রবন্ধে যা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন।

সুতরাং আত্মসংস্কারের পথে আত্মশক্তির অর্জনের দ্বারাই ভারতবাসীকে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে হবে। ভারতবর্ষের যে নিজস্ব অতীত ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যের পথেই দেশের মুক্তির সন্ধান করতে হবে। উনিশ শতকের বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন বাঙালির দেশীয় ঐতিহ্যবিচ্যুত জীবনাচরণকে, অন্ধ পাশ্চাত্যানুসরণকে। সে যে আমাদের জাতির মধ্যে কত বড় দ্বন্দ্বকে জাগিয়ে তুলেছিল আজকের দিনেও তার ধারা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে সমাজে বয়ে চলেছে। বিনয়ের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়েছেন—“ অতীতকে অতীত বলে বরখাস্ত করে বসে আছি বলেই কি সে অতীত? বর্তমানের হাঁকডাকের আড়ালে পড়ে সে আমাদের দৃষ্টির অতীত হয়েছে বলেই অতীত নয়—সে ভারতবর্ষের মজ্জার মধ্যে রয়েছে। কোনো সত্য কোনোদিনই অতীত হতে পারে না। সেই জন্যই ভারতবর্ষের এই সত্য আমাদের আঘাত করতে আরম্ভ করেছে। একদিন একে যদি আমাদের একজনও সত্য বলে চিনতে ও গ্রহণ করতে পারে তা হলেই আমাদের শক্তির খনির দ্বারে প্রবেশের পথ খুলে যাবে—অতীতের ভাণ্ডার বর্তমানের সামগ্রী হয়ে উঠবে। আপনি কি মনে করছেন ভারতবর্ষের কোথাও সেরকম সার্থকজন্মা লোকের আবির্ভাব হয় নি?”[৩৪]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষেত্রেও দেখেছিলেন এদেশের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইংরেজের অন্ধ অনুকরণকে। দেখেছিলেন এই ভাবে ইংরেজের কৃপাদৃষ্টিলাভের দ্বারা দেশীয় সমাজে নিজেদের ভিন্ন শ্রেণী হিসেবে গণ্য করে তোলার বা আত্ম-অহঙ্কার চরিতার্থতার হীন মানসিকতাকে। গোরার অভিজ্ঞতাও ছিল রবীন্দ্রনাথের ন্যায়। তাই বিনয় বুঝেছে—" এই যে বরদাসুন্দরী আজ বিনয়কে তাঁহার মেয়েদের ইংরেজি হস্তলিপি ও শিল্পকাজ দেখাইয়া ও আবৃত্তি শুনাইয়া মাতৃগর্ব প্রকাশ করিতেছিলেন, গোরার কাছে যে ইহা কিরূপ অবজ্ঞাজনক তাহা বিনয় মনে মনে সুস্পষ্ট কল্পনা করিতেছিল। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে যথেষ্ট হাস্যকর ব্যাপার ছিল; এবং বরদাসুন্দরীর মেয়েরা যে অল্পস্বল্প ইংরেজি শিখিয়াছে, ইংরেজ মেমের কাছে প্রশংসা পাইয়াছে, এবং লেফ্‌টেনান্ট গবর্নরের স্ত্রীর কাছে ক্ষণকালের জন্য প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে, এই গর্বের মধ্যে এক হিসাবে একটা দীনতা ছিল। কিন্তু এ-সমস্ত বুঝিয়া জানিয়াও বিনয় এ ব্যাপারটাকে গোরার আদর্শ-অনুসারে ঘৃণা করিতে পারে নাই।"[৩৫]

এর মধ্যে বিনয়ের প্রেম, হৃদয়ের ঔদার্য অবশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু গোরার কাছে ব্যক্তিপ্রেমের তুলনায় দেশপ্রেম অধিক মাহাত্ম্য লাভ করেছে। দেশের জন্য এই ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। বিনয়কে একদা গোরা তাই বলেছে—" "বিনয়, তোমার এ প্রেমকেও পার হয়ে আসতে হবে—আমি বলছি ওখানে থামলে চলবে না। আমাকে যে মহাশক্তি আহ্বান করেছেন তিনি যে কত বড়ো সত্য একদিন তোমাকে আমি তা দেখাবো।"[৩৬] দেশের যে রূপ গোরাকে অনুরূপ ভাবনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে গোরা বিনয়কে বলেছে—"ভাই, আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখতে পাচ্ছি সে তো সৌন্দর্যের মাঝখানে নয়—সেখানে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য, সেখানে কষ্ট আর অপমান।সেখানে গান গেয়ে, ফুল দিয়ে পুজো নয়; সেখানে প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে পুজো করতে হবে—আমার কাছে সেইটেই সব চেয়ে বড়ো আনন্দ মনে হচ্ছে—সেখানে সুখ দিয়ে ভোলাবার কিছু নেই—সেখানে নিজের জোরে সম্পূর্ণ জাগতে হবে, সম্পূর্ণ দিতে হবে—মাধুর্য নয়, এ একটা দুর্জয় দুঃসহ আবির্ভাব—এ নিষ্ঠুর, এ ভয়ংকর—...... রক্তবর্ণ আকাশ-ক্ষেত্রে একটা বন্ধনমুক্ত জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছি—আজকেকার এই আসন্ন প্রভাতের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি—দেখো আমার বুকের ভিতরে কে ডমরু বাজাচ্ছে।"[৩৭]

গোরা নিজের জোরে যে জেগে ওঠার কথা বলেছে, তাই-ই হল আত্মশক্তির অর্জনের পথ। আত্মশক্তি অর্জনের দ্বারা আমাদের মধ্যেকার ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতা পরস্পর বিচ্ছিন্নতাকে যদি ঠিকমতো কাটিয়ে উঠতে না পারা যায় তাহলে এদেশের মানুষ আত্মশক্তির উপর নির্ভর হবে কী করে! এ দায়িত্ব যে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই নিতেই হবে এ কথা গোরা বা বিনয় উভয়ের মন্তব্যেই বার বার প্রকাশ পেয়েছে। গোরা যে পাড়ার

নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ঘরে যাতায়াত করতো, তাদের আতিথ্য গ্রহণ করতো সে কতকটা দেশের মানুষের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার তাগিদে; 'তাহাদের উপকার করিবার বা উপদেশ দিবার জন্য নহে'।[৩৮]

কিন্তু নিজেকে এঁদের সঙ্গে একাত্ম বোধ করলেই যে দেশব্যাপী এই বৃহৎ সমাস্যার সমাধান সম্ভব নয়, গোরার প্রাথমিক পর্বের ভাববাদী জাতীয়তাবাদী মন বুঝে উঠতে পারেনি। শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের পল্লীজীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা, গ্রাম-নগরের মাঝে যে বিচ্ছিন্নতাকে গড়ে দিয়েছিল দেশোন্নয়নের পথে তাই-ই ছিল অন্যতম প্রধান অন্তরায়। তাই পল্লীর সাধারণ মানুষের সঙ্গে শহুরে মানুষের মিলনের পথ কেবল দেষহিতৈষিতার মহতাকাঙ্খার দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়। সে একমাত্র তাদের জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগের দ্বারা, শিক্ষা-সংস্কারের পথেই হওয়া সম্ভব। তবেই সে মিলন ভিতরের থেকে গড়ে ওঠা এক শক্ত সামাজিক বন্ধনে পরিণত হবে। গোরা যে তার শিকার ও ক্রিকেটের দলে ভদ্র ছাত্রদের সঙ্গে ছুতার-কামারের ছেলেদের একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিল, সে মিলন হয়ে উঠেছিল ভয়ের শাসনে বাইরে থেকে গড়ে ওঠা এক বন্ধন। রবীন্দ্রনাথ তার ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছেন—"এই মিশ্রিত দলের মধ্যে নন্দ সকলপ্রকার খেলায় ও ব্যায়ামে সকলের সেরা ছিল। ভদ্র ছাত্রেরা কেহ কেহ তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল, কিন্তু গোরার শাসনে সকলেরই তাহাকে দলপতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইত।"[৩৯]

এইরূপ কৃত্রিম মিলনের দ্বারা যে বৃহত্তর সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব নয়, এ কথা রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা সামাজিক সমন্বয় নয়, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সমাজকেই নিজের উদ্যোগে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে হবে। তবেই সেই মিলন হবে যথার্থ হিতকরী মিলন। কিন্তু শিক্ষার সংস্পর্শশূন্য কুসংস্কারপীড়িত গ্রাম্য মন নিজেদের যথার্থ হিত সম্বন্ধেই সচেতন নয়। তারা তাদের আজন্মলালিত সংস্কার বা বিশ্বাসকেই জীবনের পরমার্থ বলে স্বীকার করে।

সমাজের উচ্চ-সম্প্রদায়ের বাবুদের পরামর্শ বা উপদেশকে ঠিক অনুরূপ মানসিকতা থেকেই তারা সন্দেহ করেছে। তাই নন্দের ধনুষ্টঙ্কারের মত অসুখের চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে নন্দের মা গোরার পরামর্শকে যাতে উপেক্ষা করা যায় তার জন্য নন্দের অসুস্থতার খবরটুকু পর্যন্ত গোরাকে দিতে চায়নি। বিনিময়ে "...... নন্দর মা জোর করিয়া বলিল, তাহার ছেলেকে ভূতে পাইয়াছে। ভূতের ওঝা কাল সমস্ত রাত তাহার গায়ে ছেঁকা দিয়াছে, তাহাকে মারিয়াছে এবং মন্ত্র পড়িয়াছে। ব্যামোর আরম্ভে গোরাকে খবর দিবার জন্য নন্দ একবার অনুরোধ করিয়াছিল—কিন্তু পাছে গোরা আসিয়া ডাক্তারি মতে চিকিৎসা করিবার জন্য জেদ করে এই ভয়ে নন্দর মা কিছুতেই গোরাকে খবর পাঠাইতে দেয় নাই।"[৪০] এরই ফলশ্রুতি হিসেবে নন্দর বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ঘটেছে।

পল্লীর সাধারণ মানুষের আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে জাত-পাত-অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার-অশিক্ষা কি প্রবল বোঝা হয়ে চেপে বসেছে, মানুষকে তার জন্য কি ব্যাপক মূল্য দিয়ে যেতে হচ্ছে নন্দের এই জীবন-পরিণাম তারই পরিচয়বাহী। গোরা এ সত্যের মুখোমুখি হয়ে বুঝেছে—“সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে রেখেছে। দেবতা,অপদেবতা, পেঁচো, হাঁচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ—ভয় যে কত তার ঠিকানা নেই—জগতে সত্যের সঙ্গে কী রকম পৌরুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তা এরা জানবে কী করে?”[৪১] চেতনার এই সঙ্কীর্ণতা, সত্তার এই সীমাবদ্ধতা দেশের প্রাণকেন্দ্র প্রত্যন্ত পল্লীতে কী ব্যাপক তা গোরা টের পায় তার দেশ ভ্রমণের কালে চরঘোষপুরের গ্রামে গিয়ে। গোরার সেই বিশেষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“ ভদ্রসমাজ শিক্ষিতসমাজ ও কলকাতা-সমাজের বাহিরে আমাদের দেশটা যে কিরূপ গোরা তাহা এই প্রথম দেখিল। এই নিভৃত প্রকান্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দুর্বল—সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন—প্রত্যেক পাঁচ-সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত—পৃথিবীর বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে চলিবার পক্ষে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত—তুচ্ছতাকে যে সে কতই বড়ো করিয়া জানে এবং সংস্কারমাত্রেই যে তাহার কাছে কিরূপ নিশ্চলভাবে কঠিন—তাহার মন যে কতই সুপ্ত, প্রাণ যে কতই স্বল্প, চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ—তাহা গোরা গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন করিয়া বাস না করিলে কোনো মতেই কল্পনা করিতে পারিত না।”[৪১]

এই অভিজ্ঞতা থেকে সেদিনের অধিকাংশ দেশনেতাই বঞ্চিত ছিলেন। ‘ভদ্রসমাজ শিক্ষিতসমাজ’ বলতে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত শহুরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন, যাঁরা সেদিন দেশের উন্নয়ন যজ্ঞে এসে ভীড়েছিলেন। গোরা সেই শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরই প্রতিনিধি। সমালোচক ভূদেব চৌধুরী তাঁর ‘রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে’ গ্রন্থে এই দিকটির প্রতি আলোকপাত করে বলেছেন—

“ আসলে মধ্যবিত্ত শহুরে বাবু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সে, সমকালীন ঔপনিবেশিক জীবনব্যবস্থায় দেশজোড়া বৃহত্তর জীবনস্রোত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ত্রিশঙ্কুর অবস্থা যাদের। মধ্যবিত্ত জীবনের বিচ্ছিন্নতার বিড়ম্বনা, এবং ভারতবর্ষের সংহত জীবন-সাধনার পক্ষে তার বিভেদমূলক ভয়াবহ পরিণাম, রবীন্দ্রনাথের মতো কোনোদিন অনুভব করেন নি কেউ। গ্রাম্য ‘ছোটলোক’দের সম্পর্কে শহুরে ভদ্রলোকের উপেক্ষা, অজ্ঞতা ও বিমুখতার কুৎসিত কিন্তু সঠিক ছবিটি এঁকেছেন গোরার ভ্রমণকাহিনীর উপলক্ষ্যে। ঐ টুকুই একমাত্র নয়, গ্রাম-শহরের ঐ বিভেদ-বিচ্ছিন্ন জীবনের পরস্পর সমান্তরাল দুটি ধারাকে আবার একসূত্রে মিলিয়ে দিতে পারাতেই যে ‘চিরন্তন ভারতবর্ষ’র উজ্জীবনপন্থা, সে দিশেটিও ধরা আছে ঐ

'গোরা' উপন্যাসেই, এবং ঐ একবারের জন্যেই। তার পরের উপন্যাস 'চতুরঙ্গ'তেই শহুরে মধ্যবিত্তের স্বতোবিচ্ছিন্নতার প্রথম চূড়ান্ত সমুদ্ভাস। রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টিকে নানা দিক হতেই গ্রহণ করেনি আধুনিক ভারতের ইতিহাস।"[৪২]

গোরার এ বিষয়ে একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে এ উপন্যাসে। গোরা গ্রামে থাকাকালীন একটি পল্লীতে আগুন লাগে। এতবড় বিপদেও দলবদ্ধভাবে সংকটের বিরুদ্ধে একত্রে কাজ করার শক্তি কি সামান্য গোরা তা টের পায়। সকলে গোলমাল, কান্নাকাটি দৌড়ঝাঁপ করলেও বাস্তবে কাজের মত কোন কাজই তারা করে উঠতে পারলো না। সে পাড়ায় কাছে জলাশয় ছিল না; মেয়েরা দূর থেকে জল বয়ে এনে কেবল ঘরের কাজ চালায়। এ গাঁয়ে পূর্বেও একাধিকবার আগুন লেগেছে। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্য ঘরে একটি কূপ খুঁড়ে রাখে সঙ্গতিপূর্ণ একটি লোকেরও সে চিন্তা ছিল না। একে তারা দৈবের উৎপাত বলে বিশ্বাস করে নিরুদ্যম হয়ে আছে। পল্লীকে রক্ষা করার জন্য এদের মধ্যে ঐক্য তো দূরের কথা, সামান্য প্রয়াস মাত্রও দেখা যায় না। এই নিরুদ্যম আলস্যপরতা পল্লীর বুক জুড়ে যেন বোঝার মত চেপে আছে। পাড়ার একান্ত প্রয়োজন সম্বন্ধে যাদের বোধশক্তি এমন অসাড় তাদের কাছে সমস্ত দেশ ও কল্যাণ বা উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা যে বিদ্রূপের নামান্তর মাত্র গোরা সে কথা সেদিন স্পষ্টতই অনুমান করে।

কারাগার থেকে মুক্ত হবার পর গোরা যখন পল্লীর মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে তখন গোরা আর এক সত্যের মুখোমুখি হয়। গোরা বুঝতে পারে পল্লীর সমাজের বন্ধন শিক্ষিত ভদ্রসমাজের চেয়ে অনেক বেশি। প্রত্যেক ঘরের খাওয়াদাওয়া শোওয়াবসা কাজকর্ম সমস্তই সমাজের নিমেষহীন চোখের উপর দিনরাত্রি ঘটে চলেছে। প্রত্যেক লোকেরই লোকাচারের প্রতি এমন একটা সহজ বিশ্বাস যে সে বিষয়ে তাদের মনে কোন সন্দেহ বা তর্কের অবকাশ নেই। এই লোকাচার বা বিশ্বাস তাদের প্রতিদিনের জীবনে যে কোন শক্তি সঞ্চার করছে এমন নয়। আচারকে পালন করে চলা ছাড়া এরা মনের থেকে কোন মঙ্গলের কথা বোঝে না, বোঝাতে গেলেও বোঝে না। দন্ডের দ্বারা, দলাদলির দ্বারা, নিষেধটাকেই এমন বড় করে তুলেছে যে তার জালেই তাদের সমগ্র সত্তা বাঁধা পড়েছে। এদের মত ভীত অসহায় আত্মহিত বিচারে অক্ষম জীব কোথাও পৃথিবীতে আছে কিনা সে বিষয়ে গোরার মনেই প্রবল সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

পল্লীজীবনে কুসংস্কারের বেড়াজালের সঙ্গে মিশেছে মহাজনের ঋণের জাল। এ-দুইয়ে মিলে এদের মুক্ত দৃষ্টি বা মানবিক বোধকে এতটাই আচ্ছন্ন করেছে যে এরা ঐক্য অপেক্ষা হীন দলাদলির প্রতি, জীবনের দাবি অপেক্ষা সামাজিক আচার বিচারের প্রতি এদের সর্বস্ব যেন পণ করে বসে আছে। গোরা তাই স্পষ্টতই বুঝতে পারে—

" ইহার মধ্যে এমন কোনো বড়ো ঐক্য নাই যাহা সকলকে বিপদে সম্পদে পাশাপাশি দাঁড় করাইতে পারে। গোরা না দেখিয়া থাকিতে পারিল না যে, এই আচারের অস্ত্রে মানুষ মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে নিঃস্বত্ব করিতেছে। কতবার সে দেখিয়াছে সমাজে ক্রিয়াকর্মে কেহ কাহাকেও দয়ামাত্রও করে না। একজনের বাপ দীর্ঘকাল রোগে ভুগিতেছিল, সেই বাপের চিকিৎসা পথ্য প্রভৃতিতে বেচারা সর্বস্বান্ত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কাহারও নিকট হইতে তাহার কোন সাহায্য নাই- এ দিকে গ্রামের লোকে ধরিয়া পড়িল তাহার পিতাকে অজ্ঞাতপাতকজনিত চিররুগণ্‌তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সে হতভাগ্যের দারিদ্র্য অসামর্থ্য কাহারও অগোচর ছিল না, কিন্তু ক্ষমা নাই। সকলপ্রকার ক্রিয়াকর্মই এইরূপ। যেমন ডাকাতির অপেক্ষা পুলিস-তদন্ত গ্রামের পক্ষে গুরুতর দুর্ঘটনা, তেমনি মা-বাপের মৃত্যুর অপেক্ষা মা-বাপের শ্রাদ্ধ সন্তানের পক্ষে গুরুতর দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া উঠে। অল্প আয় অল্প শক্তির দোহাই কেহই মানিবে না, যেমন করিয়া হউক সামাজিকতার হৃদয়হীন দাবি ষোলো-আনা পূরণ করিতে হইবে। বিবাহ উপলক্ষে কন্যার পিতার বোঝা যাহাতে দুঃসহ হইয়া উঠে এই জন্য বরের পক্ষে সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করা হয়, হতভাগ্যের প্রতি লেশমাত্র করুণা নাই। গোরা দেখিল এই সমাজ মানুষকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করে না, বিপদের সময় ভরসা দেয় না, কেবল শাসনের দ্বারা নতি স্বীকার করাইয়া বিপন্ন করে।"[৪৩]

নাগরিক জীবনে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তবু সাধারণের মঙ্গলের জন্য এক হয়ে দাঁড়াবার শক্তি বাইরে থেকে নানা রূপে কাজ করে থাকে। কিন্তু বাংলার পল্লীগুলিতে বাইরের কোন আলোড়ন তেমন করে গিয়ে পৌঁছয় না। ফলে বাংলার পল্লীগুলিতে একধরণের অপরিবর্তনীয় নিশ্চেষ্টতা যেন স্তূপীকৃত হয়ে থেকে প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলছে। পল্লীর তথা স্বদেশের এই গভীরতর দুর্বলতার দিকটি, মিথ্যে আচারের নিরর্থকতার দিকটি, নিশ্চেষ্টতার দিকটি গোরার চোখের সামনে অনাবৃত হয়ে পড়ায় তার এতদিনকার আচারধর্মে কোথায় যেন বড় একটা চিড় ধরলো—"যে ধর্ম সেবারূপে, প্রেমরূপে, করুণারূপে, আত্মত্যাগরূপে এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধারূপে সকলকে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়, কল্যাণ দেয়, কোথাও তাহাকে দেখা যায় না। যে আচার কেবল রেখা টানে, ভাগ করে, পীড়া দেয়, যাহা বুদ্ধিকেও কোথাও আমল দিতে চায় না, যাহা প্রীতিকেও দূরে খেদাইয়া রাখে, তাহাই সকলকে চলিতে-ফিরিতে উঠিতে-বসিতে সকল বিষয়েই কেবল বাধা দিতে থাকে। পল্লীর মধ্যে এই মূঢ় বাধ্যতার অনিষ্টকর কুফল এত স্পষ্ট করিয়া এত নানা রকমে গোরার চোখে পড়িতে লাগিল, তাহা মানুষের স্বাস্থ্যকে জ্ঞানকে ধর্মবুদ্ধিকে কর্মকে এত দিকে এতপ্রকারে আক্রমণ করিয়াছে দেখিতে পাইল যে, নিজেকে ভাবুকতার ইন্দ্রজালে ভুলাইয়া রাখা গোরার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।"[৪৪]

পল্লীসমাজের হিত সাধন করাটাও যে কত বড় কঠিন কাজ তা গোরার কল্পনার বাইরে ছিল। পল্লীর মানুষ নিজেদের হিত সম্পর্কে সচেতন নয় বলেই তাদের কোন প্রকার কল্যাণ করতে গেলেই তারা সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। নাগরিক সমাজের শিক্ষিত বাবুসম্প্রদায়ের প্রতি এই ঝোঁকটা যেন কিছু অধিক। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীর যথার্থ হিতসাধনে আগুয়ান ব্যক্তিকে পল্লীসমাজের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদেরই একজন হয়ে ওঠার কথা বলেছিলেন। ছোটোর হিত করতে গেলে যে ছোটোর সমতলে নেমে আসার প্রয়োজন আছে, তাদের জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে নিবিড় ঐক্য রচনার প্রয়োজন আছে একথা গোরা প্রাথমিক ভাবে বুঝে উঠতে পারেনি। তাই পল্লীর হিতসাধনে আগুয়ান গোরাকে পল্লীর মানুষ সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে— “ সকালবেলায় কিছু খাইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইত, একেবারে রাত্রে ফিরিয়া আসিত। ট্রেনে করিয়া কলকাতার কাছাকাছি কোনো-একটা স্টেশনে নামিয়া পল্লীগ্রামের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিত। সেখানে কলু কুমার কৈবর্ত প্রভৃতিদের পাড়ায় সে আতিথ্য লইত। এই গৌরবর্ণ প্রকাণ্ডকায় ব্রাহ্মণটি কেন যে তাহাদের বাড়িতে এমন করিয়া ঘুরিতেছে, তাহাদের সুখদুঃখের খবর লইতেছে, তাহা তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিত না; এমন-কি, তাহাদের মনে নানাপ্রকার সন্দেহ জন্মিত। কিন্তু গোরা তাহাদের সমস্ত সংকোচ-সন্দেহ ঠেলিয়া তাহাদের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে সে অপ্রিয় কথাও শুনিয়াছে, তাহাতেও নিরস্ত হয় নাই।”[৪৫]

এভাবেই গোরা পল্লীর সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার নিরসনে প্রয়াসী হয়। গ্রামের নীচ জাতির মধ্যে স্ত্রী লোকের সংখ্যা কম হওয়ায় অনেক পণ দিয়েও বিবাহযোগ্যা মেয়ে পাওয়া যেত না। এর ফলে অনেক পুরুষকে আজীবন এবং অনেককে অধিক বয়স পর্যন্ত বিবাহ না করে থাকতে হত। বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হলেও সেই সমাজে কিন্তু বিধবা বিবাহের উপর কঠোর বিধিনিষেধ ছিল। এর ফলে ঘরে ঘরে সমাজের স্বাস্থ্য যে দূষিত হয়ে উঠছিল তার অনিষ্ট ও অসুবিধা সম্পর্কে সমাজের মানুষ অবহিত থাকলেও তার কোন প্রতিকারের কথা তারা ভাবতেই পারে না। তাই গোরা এই সামাজিক বিধিনিষেধকে ভেঙে নতুন নিয়ম প্রবর্তনের প্রয়াস নেয়। কিন্তু সমাজের পুরোহিতদের বশ করতে পারলেও সমাজের বৃহত্তর জনসাধারণের সমর্থন সে পেল না। বরং সমাজের লোকেরা পল্লীর মধ্যে বাইরে থেকে আসা এই ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। তারা স্পষ্টতই জানিয়েছে, ব্রাহ্মণেরা বিধবা বিবাহ দিলেই তারাও এই বিবাহের আয়োজন করবে। গোরার উপর তারা যে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো তার কারণ, তারা মনে করলো গোরা তাদের হীন জাতি বলে অবজ্ঞা করছে। তাদের মতো লোকের পক্ষে যে হীন আচার অবলম্বন করাই শ্রেয় গোরা তা প্রচার করার উদ্দেশ্যেই গ্রামে এসেছে বলে তারা বিশ্বাস করেছে।

গোরা প্রাথমিক ভাবে পল্লীর কল্যাণসাধনায় নীচ জনসাধারণের সংস্রবকে অনিবার্য বলে মনে করেনি। তার নিজের হিন্দু সংস্কার তখনো তার মধ্যে বাধার সৃষ্টি করেছে। সে ভেবেছে—"...যাহার প্রতি সমগ্রের হিতের ভার তাহার নির্লিপ্ত থাকিবার বিধি আমাদের দেশে চলিয়া আসিয়াছে। প্রজার সঙ্গে একেবারে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলে তবেই যে প্রজাপালন করা রাজার পক্ষে সম্ভব হয় এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রজাদের সম্বন্ধে রাজার যেরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন সংস্রবের দ্বারা তাহা কলুষিত হয়। এই কারণে, প্রজারা নিজেই ইচ্ছা করিয়া তাহাদের রাজাকে দূরত্বের দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। রাজা তাহাদের সহচর হইলেই রাজার প্রয়োজন চলিয়া যাইবে।"[৪৬] কিন্তু যেদিন গোরা কৃষ্ণদয়ালবাবুর কাছ থেকে নিজের জন্মবৃত্তান্ত অবগত হয়েছে সেদিনের পর থকে গোরার সব আড়াল, সব দ্বন্দ্ব, সব মিথ্যা গরিমা মুছে গেছে। সেদিনই গোরা দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম বোধ করেছে, মাটির কোলে মাটির সন্তান হয়ে নব জন্ম গ্রহণ করেছে। পরেশবাবুকে গোরা তার মনের সেই বিশেষ ভাব অভিব্যক্ত করে জানিয়েছে—

" আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন। দেখুন, আমি বাংলার অনেক জেলায় ভ্রমণ করেছি, খুব নীচ পল্লীতেও আতিথ্য নিয়েছি—আমি কেবল শহরের সভায় বক্তৃতা করেছি তা মনে করবেন না—কিন্তু কোনোমতেই সকল লোকের পাশে গিয়ে বসতে পারি নি—এতদিন আমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদৃশ্য ব্যবধান নিয়ে ঘুরেছি—কিছুতেই সেটাকে পেরোতে পারি নি। সেজন্য আমার মনের ভিতরে খুব একটা শূন্যতা ছিল। এই শূন্যতাকে নানা উপায়ে কেবলই অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছি—এই শূন্যতার উপরে নানাপ্রকার কারুকার্য দিয়ে তাকেই আরো বিশেষরূপ সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করেছি!" কিন্তু " আজ এক মুহূর্তেই আমার সেই ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মতো উড়ে গেছে। আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ সুখদুঃখ জ্ঞান-অজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের কাছে এসে পৌঁচেছে—আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি—সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে—সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়—সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণক্ষেত্র।"[৪৭]

গোরার এই আত্মসংস্কারমুক্ত মন তাই তার দেশজননীর প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছে মা আনন্দময়ীর মধ্যে—যিনি এতদিন জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার ঊর্ধ্বে মানুষকে মানুষের পরিচয়ে গ্রহণ করেছেন। এই সংস্কারমুক্ত মন ছাড়া যে আমাদের ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না, দেশের প্রকৃত কল্যাণ বা উন্নয়নের পথকে বেছে নেওয়া যায় না

তা গোরা উপলব্ধি করেছে। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর একটি বড় দিক ছিল তাই জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার ভেদাভেদ শূন্য এক উদার মানব সমাজ গড়ে তোলা। অনুরূপ সংস্কারমুক্ত মন না হলে যে দরিদ্রনারায়ণের তথা দেশের সেবা করার অধিকার অর্জন করা যায় না, গোরার স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক ঐক্যের প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিভেদকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, পল্লীগ্রামে গোরার চোখে সেই বাস্তব ছবিটিই ধরা পড়েছে। তার অন্তর এতে ব্যথিত হলেও গোরা স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছে—"...গ্রামে কোনো আপদ বিপদ হইলে মুসলমানেরা যেমন নিবিড়ভাবে পরস্পরের পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হয় হিন্দুরা এমন হয় না। গোরা বার বার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে এই দুই নিকটতম প্রতিবেশী সমাজের মধ্যে এতবড়ো প্রভেদ কেন হইল। যে উত্তরটি তাহার মনে উদিত হয় সে উত্তরটি কিছুতেই তাহার মানিতে ইচ্ছা হয় না। এ কথা স্বীকার করিতে তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল যে, ধর্মের দ্বারা মুসলমান এক, কেবল আচারের দ্বারা নহে। একদিকে যেমন আচারের বন্ধন তাহাদের সমস্ত কর্মকে অনর্থক রাখে নাই, অন্যদিকে তেমনি ধর্মের বন্ধন তাহাদের মধ্যে একান্ত ঘনিষ্ঠ। তাহারা সকলে মিলিয়া এমন একটি জিনিসকে গ্রহণ করিয়াছে যাহা 'না'-মাত্র নহে, যাহা 'হাঁ'; যাহা ঋণাত্বক নহে, যাহা ধনাত্বক; যাহার জন্য মানুষ এক আহ্বানে এক মুহূর্তে একসঙ্গে দাঁড়াইয়া অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে।"[৪৮]

হিন্দু সমাজের এই রক্ষণশীলতা, এই আত্মবিচ্ছেদ, আচার সর্বস্ব বাহ্যাড়ম্বর থেকে গোরা তাই একদা মুক্ত হতে চেয়েছে। দেশের কল্যাণক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিভেদশূন্য সর্বসংস্কারমুক্ত উদার মানবধর্মকেই অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে। গোরার এ সিদ্ধান্তে সমকালের দেশোন্নয়নে আত্মোৎসর্গীকৃত সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট ঐতিহাসিক চিহ্ন স্বাক্ষরিত হয়েছে। ড. উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

" সমকালীন ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মান্দোলনের মধ্যে যেমন সর্বধর্ম-সমন্বের কথা ছিল বলে তরুণ সমাজ আকৃষ্ট হয়েছিল, তেমনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত হয়ে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হলেন তখন তাঁর ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি তরুণ সমাজকে মুগ্ধ করেছিল। বিশেষ করে, ১৮৭৮ সালেই—যখন 'গোরা' উপন্যাসের ঘটনা শুরু হচ্ছে, তখনই ভারতীয় তরুণ সমাজের সামনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় ঐক্যবোধের উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক সংকটে হ্যাম্‌প্‌ডেন সিডনি ইত্যাদি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব যেমন এসেছেন, তরুণ ইটালিয়ানদের মনে মাৎসিনি যেমন

প্রেরণা দিয়েছেন, আমাদের দেশে (সুরেন্দ্রনাথের সময় থেকে) প্রায় তিনশো বছর আগে শিখগুরু নানক যেমন হিন্দু মুসলমানকে একত্র করবার চেষ্টা করেছেন সেই সব সফল চেষ্টার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর এই সময়কার (১৮৭৮) একটি বক্তৃতার অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি:

'In the name, then, of a common country, let us all, Hindus Musalmans, Christians, Parsees, members of the great Indian Community, throw the pall of oblivion over jealousies and dissensions of bygone times, and embracing one another in fraternal love and affection live and work for the benefit of our fatherland.'

বোধহয়, সুরেন্দ্রনাথের আগে ভারতীয় ঐক্যের জন্য এমন আবেগপূর্ণ আবেদন আর কেউ করে নি। এবং এই আবেদনে যে-ভারতবোধের কথা আছে তা অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গোরারও সিদ্ধান্ত।"[৪৯]

দেশের সঙ্কীর্ণ পল্লীগুলি সম্পর্কে, দেশের প্রাণকেন্দ্র গ্রামগুলির বাস্তবতা সম্পর্কে দেশের শিক্ষিত সমাজ যে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অনভিজ্ঞ, সেকথা পূর্বেই বলেছি। গোরা দেশের প্রতি প্রবল ভালোবাসায় আত্মসংস্কারের পথে সাধারণের পাশে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, শহুরের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের এই বিরাট দুর্গতির থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখেছে। গ্রাম ও নগরের এই বিচ্ছিন্নতার সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে সচেতন গোরা তাই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই একজন বিনয়কে লক্ষ্য করে বলেছে—"আর তুমি-আমি মনে করছি যে আমরা যখন দু-পাতা বিজ্ঞান পড়েছি তখন আমরা আর এদের দলে নেই। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জেনো চারদিকের হীনতার আকর্ষণ থেকে অল্প লোক কখনোই নিজেকে বই-পড়া বিদ্যার দ্বারা বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।"[৫০] চর-ঘোষপুরের গ্রামে গিয়ে শহুরে মতিলাল ও রমাপতির আচরণ দেখে গোরার ঠিক একই অনুভব মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল—

" সকলের চেয়ে গোরার কাছে আশ্চর্য এই লাগিল যে , মতিলাল ও রমাপতি এই-সমস্ত দৃশ্যে ও ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হইত না, বরঞ্চ গোরার ক্ষোভকে তাহারা অসংগত বলিয়াই মনে করিত। ছোটলোকেরা তো এইরকম করিয়াই থাকে, তাহারা এমনি করিয়াই ভাবে, এই-সকল কষ্টকে তাহারা কষ্টই মনে করে না। ছোটলোকদের পক্ষে এরূপ ছাড়া আর যে কিছু হইতেই পারে, তাহাই কল্পনা করা তাহারা বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ করে। এই অজ্ঞতা জড়তা ও দুঃখের বোঝা যে কী ভয়ংকর প্রকাণ্ড এবং এই ভার যে আমাদের শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-দরিদ্র সকলেরই কাঁধের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেককেই

অগ্রসর হইতে দিতেছে না, এই কথা আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া গোরার চিত্ত রাত্রিদিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিল।"[৫১]

গোরা দেশের,—বৃহত্তর ভারতবর্ষের এই ত্রুটি দূরীকরণকেই প্রাথমিকতা দিতে চেয়েছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন নয়। এমন নয় যে, রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ একথাই জানিয়েছিলেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য অস্থির না হয়ে আমাদের মধ্যেকার ত্রুটিসমূহের সংস্কারে মনোনিবেশ করা উচিত। অনেকের অবশ্য অভিমত ছিল যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরই ও-সকল সংস্কারের কথা ভাবা যাবে। কিন্তু এই অভিমতকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি। তাঁর মতে কবে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসবে তার জন্যে বসে না থেকে আমাদের মধ্যেকার ত্রুটিগুলির সংশোধনের জন্য, আত্মশক্তি অর্জনের জন্য তৎপর হতে হবে। জমি তৈরি না থাকলে হঠাৎ করে হাতে স্বাধীনতার বীজ এসে পড়লে তাকে বপন করার মত কর্ষিত ক্ষেত্র পাওয়া যাবে না। গোরাও ঠিক একই ভাবে উপন্যাসে বিনয়কে বলেছে—

"বিনয়, আমি তোমাকে বারবার বলছি, এ কথা এক মুহূর্তের জন্যে স্বপ্নেও অসম্ভব বলে মনে কোরো না যে আমাদের এই দেশ মুক্ত হবেই, অজ্ঞানতাকে চিরদিন জড়িয়ে থাকবে না এবং ইংরেজ তাকে আপনার বাণিজ্যতরীর পিছনে চিরকাল শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে বেড়াতে পারবে না। এই কথা মনে দৃঢ় রেখে প্রতিদিনই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার জন্য ভবিষ্যতের কোন্- এক তারিখে লড়াই আরম্ভ হবে তোমরা তারই উপর বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ। আমি বলছি, লড়াই আরম্ভ হয়েছে, প্রতি মুহূর্তে লড়াই চলছে, এ সময়ে যদি তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারো তা হলে তার চেয়ে কাপুরুষতা তোমাদের কিছুই হতে পারে না।"[৫২]

দেশের উন্নতির জন্য, পল্লীর জাগৃতির জন্য পুরুষের শক্তির সঙ্গে দেশের নারীশক্তির যোগ যে নিতান্ত আবশ্যক এ-কথা রবীন্দ্রনাথের মত গোরাও একসময় ভেবেছে। উপন্যাসে বিনয় গোরাকে স্পষ্টতই জানিয়েছে, ঘরের কাজের মধ্যে ঘরের লোকে ঘরের মেয়েদের গতানুগতিক ভাবে দেখলে তাদের যথার্থ মূল্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। নিজেদের গ্রার্হস্থ্য প্রয়োজনের বাইরে আমরা দেশের মেয়েদের যদি দেখতে পাতাম, তাদের মূল্য ও শক্তিকে যদি স্বীকার করা যেত, তাহলে স্বদেশের সৌন্দর্য ও সম্পূর্ণতাকে আমরা চোখের সামনেই দেখতে পেতাম। কিন্তু আমাদের দেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সেদিন মেয়েদের কেবল প্রকাশহীন অন্তরালে রেখে তাদের দিয়ে করিয়েছে ঘরের কাজ। তাই 'ঘরের মেয়ে'দের 'বিশ্বের মেয়ে' হিসেবে আত্মপ্রকাশে তখনো তেমন অবকাশ রচিত হয়নি—অন্তত 'গোরা' রচনার সমকালে। ফলে আমাদের দেশ তার সৌন্দর্য,শক্তি ও পূর্ণ স্বরূপ নিয়ে জেগে উঠতে পারেনি। বিনয় তাই বলেছে—" ...আমি জানি নে ঠিক কতটা পরিমাণে এবং কী

রকম ভাবে আমাদের মেয়েরা সমাজে প্রকাশ পেলে তাদের মর্যাদার লঙ্ঘন হয় না, কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে, মেয়েরা প্রচ্ছন্ন থাকাতে আমাদের স্বদেশ আমাদের কাছে অর্ধসত্য হয়ে আছে—আমাদের হৃদয়ে পূর্ণপ্রেম এবং পূর্ণশক্তি দিতে পারছে না।"[৫৩]

গোরার সংস্কার গোরাকে প্রাথমিক ভাবে এই বোধে উপনীত হতে না দিলেও সুচরিতার সংস্পর্শে আসার পর গোরা তাকে স্বীকার করেছে। তার সনাতন সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেও গোরা সুচরিতাকে স্পষ্টতই আহ্বান জানিয়ে বলেছে—"...... "এ কথা নিশ্চয় জানবেন ভারতের একটা বিশেষ প্রকৃতি বিশেষ শক্তি, বিশেষ সত্য আছে, সেইটের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারাই ভারত সার্থক হবে, ভারত রক্ষা পাবে। ইংরেজের ইতিহাস পড়ে এইটে যদি আমরা না শিখে থাকি তবে সমস্তই ভুল শিখেছি। আপনার প্রতি আমার এই অনুরোধ, আপনি ভারতবর্ষের ভিতরে আসুন, এর সমস্ত ভালোমন্দের মাঝখানেই নেবে দাঁড়ান,—যদি বিকৃতি থাকে তবে ভিতর থেকে সংশোধন করে তুলুন, কিন্তু একে দেখুন, বুঝুন, ভাবুন, এর দিকে মুখ ফেরান, এর সঙ্গে এক হোন—এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, বাইরে থেকে খৃস্টানি সংস্কারে বাল্যকাল হতে অস্থিমজ্জায় দীক্ষিত হয়ে, একে আপনি বুঝতেই পারবেন না, একে কেবলই আঘাত করতেই থাকবেন, এর কোনো কাজেই লাগবেন না।"[৫৪]

গোরার এই আহ্বানের পূর্বেই দেশের উন্নতির স্বার্থে নারী শক্তির উপযোগিতা ব্যাখ্যা করে সুচরিতা নিজেই বলেছে—" 'যাদের পক্ষে দুটি-একটি পরিবারের মধ্যেই সমস্ত বিশ্বজগৎ তারা কখনোই সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারে না—এবং তারা মানুষ না হলেই পুরুষের সমস্ত বড়ো কাজকে নষ্ট করে অসম্পূর্ণ করে পুরুষকে তারা নীচের দিকে ভারাক্রান্ত করে নিজেদের দুর্গতির শোধ তুলবেই। নন্দর মাকে আপনারা এমন করে গড়েছেন এবং এমন জায়গায় ঘিরে রেখেছেন যে, আজ প্রাণের দায়েও আপনারা যদি তাকে সুবুদ্ধি দিতে চান তো সেখানে গিয়ে পৌঁছবে না।' "[৫৫] শুধু নন্দর মায়ের কুসংস্কার নয়, আমাদের দেশের মেয়েদের অন্ধ সংস্কারও যে তাদের চেতনাকে কিরকম সীমায়িত করে তোলে, জীবনযাত্রায় ও মনন চেতনায় তারা কতটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তার সার্থক উদাহরণ হরিমোহিনী চরিত্র।

কিন্তু এরই বিপরীত অবস্থানে রেখে রবীন্দ্রনাথ আনন্দময়ীকে এঁকেছেন। তাঁর চিত্তের যে কুসংস্কার-মুক্ত ঔদার্য, যে প্রসার, ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি বিশ্বচেতনার সঙ্গে যে যোগ তা তাঁকে উপন্যাসে প্রগতিশীলা নারীশক্তির প্রতীক করে তুলেছে। তিনিই আমাদের দেশের শক্তি ও সৌন্দর্যের আধার। গোরা তাই আনন্দময়ীর মধ্যেই তার মাতৃভূমি যথার্থ ভারতবর্ষকে খুঁজে পেয়েছে। বিনয় তাই অনুরূপ নারীশক্তির কথা জানিয়ে আনন্দময়ীকেই বলেছে—"আমরা দেশকে বলি মাতৃভূমি, কিন্তু দেশের সেই নারীমূর্তির মহিমা দেশের স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি প্রত্যক্ষ না করি—বুদ্ধিতে, শক্তিতে, কর্তব্যবোধের ঔদার্যে আমাদের

মেয়েদের যদি পূর্ণ পরিণত সতেজ সবল ভাবে আমরা না দেখি—ঘরের মধ্যে দুর্বলতা সংকীর্ণতা এবং অপরিণতি যদি দেখতে পাই—তা হলে কখনোই দেশের উপলব্ধি আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না।”[৫৬]

উপন্যাসে আনন্দময়ীর পাশাপাশি একটি পল্লীরমণীর ছবি পাই যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার ঊর্ধ্বে মানবিক বোধ যার মধ্যে স্বতন্ত্র মাত্রা লাভ করেছে। চরঘোষপুরে গোরা যে হিন্দু নাপিত-দম্পতির সাক্ষাৎ লাভ করে তারা হিন্দু হলেও একটি মুসলিম ছেলেকে নিজেদের গৃহে যেভাবে সন্তানস্নেহে লালন পালন করেছে, তার মধ্যেই এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। বিদ্রোহী ফরু সর্দারের পুত্রকে নিজেদের কাছে রেখে তার দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে এই নাপিত দম্পতি কৃষক বিদ্রোহে তাদের অংশীদারিত্বকে স্বীকার করেছে। প্রবল পুলিসী ধরপাকড় এবং অত্যাচারের মাঝেও নাপিত-দম্পতি যে গ্রাম ছেড়ে যেতে পারেনি সেও কিন্তু মুসলমান প্রজা-অধ্যুষিত পল্লীর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত দায়বদ্ধতায়। নাপিত জানিয়েছে—“আজ এ পাড়ার পুরুষ বলতে আর বড়ো কেউ নেই, আমি যদি যাই তা হলে মেয়েগুলো ভয়েই মারা যাবে।”[৫৭]

চর-ঘোষপুরের এই অভিজ্ঞতা গোরাকে আত্মসংস্কারমুক্তির পথে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে। যে রক্ষণশীল হিন্দু ধর্ম-সংস্কারকে গোরা এতদিন জীবনের পরমার্থ ভেবেছে, তার মর্মমূলে সে বিষয়ে দ্বিধা প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই হিন্দু ব্রাহ্মণ মাধব চাটুজ্জের বাড়ির উদ্দেশ্যে খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য গোরা রমাপতির সঙ্গে যাত্রা করলেও মাঝ পথ থেকে রমাপতিকে বিদায় দিয়ে সে পুনরায় সেই নাপিতের গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। রবীন্দ্রনাথ গোরার এই বিশেষ মানসিকতার পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—“ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় গোরাকে অভিভূত করিয়াছিল, কিন্তু দুর্বৃত্ত অন্যায়কারী মাধব চাটুজ্জের অন্ন খাইয়া তবে জাত বাঁচাইতে হইবে, এ কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই তাহার অসহ্য বোধ হইল। তাহার মুখ-চোখ লাল ও মাথা গরম হইয়া মনের মধ্যে বিষম একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, ‘ পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা এ কী ভয়ংকর অধর্ম করিতেছি! উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে আর উৎপাত স্বীকার করিয়া মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে!”[৫৮] এই বোধই গোরাকে ক্রমশ জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার ভেদাভেদহীন উদার মানবধর্মের পথে নিয়ে গেছে।

এই উদার মানবধর্মেরই যথার্থ পরিপোষক হিসেবে আমরা উপন্যাসে পরেশবাবু চরিত্রকে পাই। এই মানবধর্মকেই ললিতা পরেশবাবুর জীবনের ‘সত্য’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। হারানবাবুদের সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় দলাদলির ঊর্ধ্বে হৃদয়ের মানব সত্যকেই তিনি

বড় হিসেবে জেনেছেন। তাই হারানবাবুকে ললিতা বলেছে—"আপনাদের মতো বাবা সত্যকে ভয় করেন না—সত্যকে বাবা ব্রাহ্মসমাজের চেয়েও বড়ো বলে জানেন।"[৫৯] ধর্ম বা সম্প্রদায়ের স্বার্থে মানুষ নয়, মানুষের প্রগতিশীল স্বার্থেই ধর্মের গ্রহণযোগ্যতাকে বিচার করা উচিত। বহুজাতি ও সম্প্রদায় অধ্যুষিত ভারতবর্ষে প্রগতিশীলতার স্বার্থেই যে আমাদের এই ধর্মীয় অন্ধতাকে অতিক্রম করে যাওয়া উচিত—একথা গোরাকে বিনয়ও বলেছে—"ব্যক্তি ও সমাজের ভিত্তির উপরে ধর্ম নয়, ধর্মের ভিত্তির উপরেই ব্যক্তি ও সমাজ। সমাজ যেটাকে চায় সেইটেকেই যদি ধর্ম বলে মানতে হয় তা হলে সমাজের মাথা খাওয়া হয়। সমাজ যদি আমার কোনো ন্যায়সংগত ধর্মসংগত স্বাধীনতায় বাধা দেয় তা হলে সেই অসংগত বাধা লঙ্ঘন করলেই সমাজের প্রতি কর্তব্য করা হয়।"[৬০]

ঠিক অনুরূপ জায়গা থেকেই উপন্যাসে পরেশবাবুও বলেছেন—"... ললিতার সঙ্গে বিনয়ের বিবাহে যখন কোন দোষ নেই, এমন-কি, সেটা উচিত, তখন সমাজে যদি বাধে তবে সে বাধা মানা কর্তব্য নয় বলে আমার মন বলছে। মানুষকেই সমাজের খাতিরে নিজেকে কেবল প্রশস্ত করে তুলতে হবে। সে জন্য যারা দুঃখস্বীকার করতে রাজি আছে আমি তো তাদের নিন্দা করতে পারবো না।""[৬১] সমাজের সংকীর্ণতাকে ভেঙে প্রগতি আনবে যারা সমাজের প্রতিকূলতায় তাদের বক্ষে দুঃখের পাহাড় জমে উঠবে ঠিকই কিন্তু এই পথেই যে ভারতবর্ষকে একদিন একত্রে মিলতে হবে, এই সত্যের আহবানেই যে মানুষকে একদিন সব সংস্কার মুক্ত হয়ে, ভাঙনের সব ভয়কে জয় করে মানবধর্মকেই গ্রহণ করতে হবে, রবীন্দ্রনাথ তার আভাসটিকে এ উপন্যাসে রেখে গেছেন। বিনয়কে লেখা পরেশবাবুর চিঠির মধ্যে সেই আভাসই দ্যোতিত হয়েছে—

" পৃথিবীতে যাহারা সাহস করিয়া নিজের জীবনের দ্বারা নব নব সমস্যার মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হয় তাহারাই সমাজকে বড়ো করিয়া তুলে। যাহারা কেবলই বিধি মানিয়া চলে তাহারা সমাজকে বহন করে মাত্র, তাহাকে অগ্রসর করে না। ......ঈশ্বর কোনো এক অবস্থার মধ্যে তাঁহার সৃষ্টিকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখেন না, তাহাকে নব নব পরিণতির মধ্যে চিরনবীন করিয়া জাগাইয়া তুলিতেছেন; তোমরা তাঁহার সেই উদ্‌বোধনের দূতরূপে নিজের জীবনকে মশালের মতো জ্বালাইয়া দুর্গম পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে, যিনি বিশ্বের পথচালক তিনিই তোমাদিগকে পথ দেখান—আমার পথেই তোমাদিগকে চিরদিন চলিতে হইবে এমন অনুশাসন আমি প্রয়োগ করিতে পারিব না।তোমাদের বয়সে আমরাও একদিন ঘাট হইতে রশি খুলিয়া ঝড়ের মুখে নৌকা ভাসাইয়াছিলাম, কাহারও নিষেধ শুনি নাই। আজও তাহার জন্য অনুতাপ করি না। যদি অনুতাপ করিবার কারণ ঘটিত তাহাতেই বা কী? মানুষ ভুল করিবে, ব্যর্থ হইবে, দুঃখও পাইবে, কিন্তু বসিয়া থাকিবে না; যাহা উচিত বলিয়া জানিবে তাহার জন্য আত্মসমর্পণ করিবে; এমনি করিয়াই পবিত্রসলিলা সংসারনদীর

স্রোত চিরদিন প্রবাহমান হইয়া বিশুদ্ধ থাকিবে। ইহাতে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য তীর ভাঙিয়া ক্ষতি করিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া চিরদিনের জন্য স্রোত বাঁধিয়া দিলে মারীকে আহ্বান করিয়া আনা হইবে—ইহা আমি নিশ্চয় জানি।"[৬২]

পল্লীর কৃষকদের উপর ইংরেজদের অত্যাচার কী নিদারুণ রূপ ধারণ করেছিল রবীন্দ্রনাথ তার ছবি এঁকেছেন উপন্যাসে চর-ঘোষপুরের প্রজাদের উপর যে নিদারুণ অত্যাচার ও শোষণ তা গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলতো। দেশের পুলিশ-প্রশাসনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে পল্লীগুলিকে কীভাবে মহাশ্মশানের রূপ দিয়েছিল তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"চরে নীলের জমি লইয়া প্রজাদের সহিত নীলকুঠির বিরোধের অন্ত নাই। অন্য সমস্ত প্রজা বশ মানিয়াছে, কেবল এই চর-ঘোষপুরের প্রজাদিগকে সাহেবরা শাসন করিয়া বাধ্য করিতে পারে নাই। এখানকার প্রজারা সমস্তই মুসলমান এবং ইহাদের প্রধান ফরুসর্দার কাহাকেও ভয় করে না। নীলকুঠির উৎপাত উপলক্ষে দুই বার পুলিসকে ঠেঙাইয়া সে জেল খাটিয়া আসিয়াছে; তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, তাহার ঘরে ভাত নাই বলিলেও হয়, কিন্তু সে কিছুতেই দমিতে জানে না। এবারে নদীর কাঁচি চরে চাষ দিয়া এ গ্রামের লোকেরা কিছু বোরো ধান পাইয়াছিল—আজ মাসখানেক হইল নীলকুঠির ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং আসিয়া লাঠিয়ালসহ প্রজার ধান লুঠ করে। সেই উৎপাতের সময় ফরু সর্দার সাহেবের ডান হাতে এমন এক লাঠি বসাইয়াছিল যে ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া তাহার সেই হাত কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এত বড়ো দুঃসাহসিক ব্যাপার এ অঞ্চলে আর কখনো হয় নাই। ইহার পর হইতে পুলিসের উৎপাত পাড়ায় পাড়ায় যেন আগুনের মতো লাগিয়াছে—প্রজাদের কাহারও ঘরে কিছু রাখিল না, ঘরের মেয়েদের ইজ্জত আর থাকে না। ফরুসর্দার এবং বিস্তর লোককে হাজতে রাখিয়াছে, গ্রামের বহুতর লোক পলাতক হইয়াছে। ফরুর পরিবার আজ নিরন্ন, এমন-কি, তাহার পরনের একখানি মাত্র কাপড়ের এমন দশা হইয়াছে যে, ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিত না; তাহার একমাত্র বালক পুত্র তমিজ, নাপিতের স্ত্রীকে গ্রামসম্পর্কে মাসি বলিয়া ডাকিত; সে খাইতে পায় না দেখিয়া নাপিতের স্ত্রী তাহাকে নিজের বাড়িতে আনিয়া পালন করিতেছে। নীলকুঠির একটা কাছারি ক্রোশ-দেড়েক তফাতে, দারোগা এখনো তাহার দলবল লইয়া সেখানে আছে, তদন্ত উপলক্ষে গ্রামে যে কখন আসে এবং কী করে তাহার ঠিকানা নাই। গতকল্য নাপিতের প্রতিবেশী বৃদ্ধ নাজিমের ঘরে পুলিসের আবির্ভাব হইয়াছিল। নাজিমের এক যুবক শ্যালক, ভিন্ন এলেকা হইতে তাহার ভগিনীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল—দারোগা নিতান্তই বিনা কারণে 'বেটা তো জোয়ান কম নয়, দেখেছ বেটার বুকের ছাতি' বলিয়া হাতের লাঠিটা দিয়া তাহাকে এমন একটা খোঁচা মারিল যে তাহার দাঁত ভাঙিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তাহার ভগিনী এই অত্যাচার

দেখিয়া ছুটিয়া আসিতেই সেই বৃদ্ধাকে এক ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। পূর্বে পুলিস এ পাড়ায় এমনতরো উপদ্রব করিতে সাহস করিত না, কিন্তু এখন পাড়ার বলিষ্ঠ যুবাপুরুষমাত্রই হয় গ্রেফতার নয় পলাতক হইয়াছে। সেই পলাতকদিগকে সন্ধানের উপলক্ষ করিয়াই পুলিস গ্রামকে এখনো শাসন করিতেছে। কবে এ গ্রহ কাটিয়া যাইবে তাহা কিছুই বলা যায় না।”[৬৩]

গোরা একথাও জানিয়েছে যে, আমাদের দেশের মধ্যবিত্তরা ইংরেজ সরকারের অবিনশ্বরতায় দৃঢ় আস্থাবান। এই কারণে তারা চাকরির উন্নতি ছাড়া আর কোন কিছু ভাবে না। দেশের ধনীরা পর্যন্ত গবর্মেন্টের কোন একটা খেতাব পেলেই জীবন সার্থক বলে মনে করে। তাদের জীবনের গতিপথ অল্প একটু অগ্রসর হয়েই থেমে যায়। জীবনের বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধন এবং সেই প্রয়োজনে যাবতীয় কর্মপ্রয়াসকে তারা অনাবশ্যক বলে মনে করে। রবীন্দ্রনাথ এই কারণে তাঁর একাধিক প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন, সরকারী চাকুরি অপেক্ষা দেশীয় কাজ এবং তাকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর আমাদের জোর দেওয়া উচিত। বিনয়কে একারণেই যে গোরা সরকারী চাকুরীতে বাধা দেয় সে কথা বিনয় নিজেই সুচরিতাকে জানিয়েছে। ‘গোরা’ উপন্যাসে সুচরিতাকে লক্ষ্য করে জানিয়েছে—

“...“আপনি মনে করবেন না গবর্মেন্টের উপর রাগ করে আমি এমন কথা বলছি। গবর্মেন্টের কাজ যারা করে তারা গবর্মেন্টের শক্তিকে নিজের শক্তি বলে একটা গর্ব বোধ করে এবং দেশের লোকের থেকে একটা ভিন্ন শ্রেণীর হয়ে ওঠে—যত দিন যাচ্ছে আমাদের এই ভাবটা ততই বেড়ে উঠছে। আমি জানি আমার একটি আত্মীয় সাবেক কালের ডেপুটি ছিলেন—এখন তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। তাঁকে ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বাবু, তোমার বিচারে এত বেশি লোক খালাস পায় কেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন—সাহেব, তার একটি কারণ আছে; তুমি যাদের জেলে দাও তারা তোমার পক্ষে কুকুর-বিড়াল মাত্র, আর আমি যাদের জেলে দিই তারা যে আমার ভাই হয়। এত বড়ো কথা বলতে পারে এমন ডেপুটি তখনো ছিল এবং শুনতে পারে এমন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটেরও অভাব ছিল না। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে চাকরির দড়াদড়ি অঙ্গের ভূষণ হয়ে উঠছে এবং এখনকার ডেপুটির কাছে তাঁর দেশের লোক ক্রমেই কুকুর-বিড়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এবং এমনি করে পদের উন্নতি হতে হতে তাঁদের যে কেবলই অধোগতি হচ্ছে এ কথার অনুভূতি পর্যন্ত তাঁদের চলে যাচ্ছে। পরের কাঁধে ভর দিয়ে নিজের লোকদের নিচু করে দেখব এবং নিচু করে দেখবামাত্রই তাদের প্রতি অবিচার করতে বাধ্য হব, এতে কোনো মঙ্গল হতে পারে না।””[৬৪]

‘গোরা’ উপন্যাসে মাধব চাটুজ্জে চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সুবিধাবাদী এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ছবি আঁকতে চেয়েছেন। দুর্বৃত্ত, অন্যায়কারী মাধব চাটুজ্জে নীলকুঠির

সাহেবের গোমস্তাগিরিতে এমন হাত পাকিয়েছে যে স্বদেশী হিসেবে, একজন মানুষ হিসেবে সে তার যাবতীয় আত্মসম্মানকে বিসর্জন দিতে সামান্য কুণ্ঠা করেনি। গোরা তাকে অপমান করলে সে ক্রুদ্ধ দারোগাকে তাই নিঃসঙ্কোচে জানিয়ে দেয়—"......নীলকুঠির সাহেবের গোমস্তাগিরি করে খাই, তার চেয়ে আর তো কিছু বলবার দরকার করে না। রাগ করো না দাদা, তুমি যে পুলিসের দারোগা, তোমাকে যমের পেয়াদা বললে কি গাল হয়? বাঘ মানুষ মেরে খায়, সে বোষ্টম নয়, সে তো জানা কথা। কী করবে, তাকে তো খেতে হবে।"[৬৫]

এই নির্লজ্জ অকপট হিংস্রতায় এরা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে প্রজাশোষণ বা দেশদ্রোহিতা এদের ব্যক্তিস্বার্থের কাছে নিতান্ত গৌণ হয়ে যায়। দেশ ও দেশের মানুষের সর্বনাশ করে এরা আখের গোছাবার পথে অত্যন্ত কৌশলে অগ্রসর হয়। নাপিত তাই নিঃসঙ্কোচে জানিয়েছে, মাধব চাটুজ্জের মতো নির্দয় এবং কৌশলী লোক আর দেখা যায় না। চর-ঘোষপুরের গ্রামের প্রজাবিদ্রোহকে রুখে দিতে যে দারোগাকে সে তার গৃহে প্রতিপালন করে তার অনেক বেশি উশুল আদায় করে নেয় প্রজাদের কাছ থেকেই। তার এই সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত মানসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজেই সে গোরাকে জানিয়েছে—""মশায়, যা বলছেন সে কথাটা ঠিক—আমাদের এ কসাইয়ের কাজ—আর ঐ-যে বেটা দারোগা দেখছেন ওর সঙ্গে এক বিছানায় বসলে পাপ হয়—ওকে দিয়ে কত যে দুষ্কর্ম করিয়েছি তা মুখে উচ্চারণ করিতেও পারি নে| আর বেশিদিন নয়—বছর দুত্তিন কাজ করলেই মেয়ে-কটার বিয়ে দেবার সম্বল করে নিয়ে তার পরে স্ত্রী-পুরুষে কাশীবাসী হব|""[৬৬]

গোরা বুঝে গেছিল আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি এই সুবিধাবাদী মানসিকতা থেকে কিংবা সরকারের প্রতি নিজেদের আনুগত্য প্রকাশেই নিয়োজিত থাকে তাহলে পল্লীর শোষিত নির্যাতিত জনসাধারণের মুক্তি বা উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ একেবারেই রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনার গোড়ার কথা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালে দেখেছিলেন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় তথা দেশনেতারা পল্লীর সমস্যাগুলি সম্পর্কে উদাসীন। তাঁদের অনেকেই সভাসমিতিতে ইংরেজকে আহ্বান করে এনে যে ব্যক্তিগত সুবিধা বা স্বার্থ চরিতার্থতায় কীভাবে মেতে উঠেছিল 'মানসী'র একাধিক কবিতায় কিংবা একাধিক প্রবন্ধে তা জানিয়েছেন। 'গোরা'-তেও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, পল্লীর এই সকল দুঃস্থ প্রজাদের প্রতি শহুরে শিক্ষিত মানুষের মনে কোন সহানুভূতি ছিল না। তাদের মাঝে থেকে তাদের দুঃখের অংশীদার হয়ে গোরা যেভাবে তাদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছে, যেভাবে তাদের দুঃখমোচনে প্রয়াসী হয়েছে—তার মধ্যে যে আইডিয়াই কাজ করুক না কেন—অনুরূপ মানসিকতা কিন্তু শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মতিলাল বা রমাপতির মধ্যে দেখা যায় নি। বরং চর-ঘোষপুরের প্রজাউত্থানের ব্যাপারে রমাপতি ভাবতে পেরেছে—

" বেটারা প্রবলের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে চায় ইহা গোঁয়ার মুসলমানের স্পর্ধা ও নির্বুদ্ধিতার চরম বলিয়া তাহার কাছে মনে হইল। যথোচিত শাসনের দ্বারা ইহাদের এই ঔদ্ধত্য চূর্ণ হইলেই যে ভালো হয় ইহাতে তাহার সন্দেহ ছিল না। এই প্রকারের লক্ষ্মীছাড়া বেটাদের প্রতি পুলিসের উৎপাত ঘটিয়াই থাকে এবং ঘটিতেই বাধ্য এবং ইহারাই সেজন্য প্রধানত দায়ী এইরূপ তাহার ধারণা। মনিবের সঙ্গে মিটমাট করিয়া লইলেই তো হয়, ফেসাদ বাধাইতে যায় কেন, তেজ এখন রহিল কোথায়? বস্তুত রমাপতির অন্তরের সহানুভূতি নীলকুঠির সাহেবের প্রতিই ছিল।"[৬৭]

কৃষিকেন্দ্রিক ভারতবর্ষের বিচারব্যবস্থা কি পক্ষপাতদুষ্ট ছিল, তার জেরে পল্লীর সাধারণ অশিক্ষিত অজ্ঞ প্রজাসাধারণের কি দুরবস্থার সৃষ্টি হত, তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনকে তা কীভাবে বিধ্বস্ত ও বিপন্ন করে দিত, তারও ছবি পাই 'গোরা' উপন্যাসে। কোনপ্রকার বিচার না করে কেবলমাত্র বিদ্রোহী গ্রামকে শাসন করার জন্যই ইংরেজ সরকার সাতচল্লিশজন কৃষককে হাজতে পাঠায়। আর্থিক দুরবস্থার কারণে তাদের পক্ষে উকিল নিয়োগ করে জামিন নেওয়াও সম্ভব ছিল না। গোরা তার সহপাঠী সাতকড়ি উকিলকে ধরে ওইসকল প্রজাদের জামিন-খালাসের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে আবেদন করে ও প্রজাদের হয়ে মকদ্দমা চালাতে চায়। চর-ঘোষপুরের প্রজাদের 'বদমায়েস' বলায় গোরার সঙ্গে পূর্বে এই ম্যাজিস্ট্রেটের কিছু উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। নিছক একারণেই তিনি রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে ক্ষমতার দম্ভেই কৃষকদের জামিন নামঞ্জুর করে দেন। ফলে 'চৌদ্দ বৎসরের ছেলে হইতে আশি বৎসরের বুড়া পর্যন্ত হাজতে পচিতে লাগিল।"[৬৮]

গোরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সাতকড়িকে অনুরোধ করে। কিন্তু এই পক্ষপাতমূলক বিচারব্যবস্থায় ইংরেজের বিরুদ্ধে সাক্ষী কিংবা উকিল সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কারণ জানিয়ে সাতকড়ি গোরাকে জানায়—"... "আরে, ইংরেজ মেরেছে যে—সেটা দেখছ না! প্রত্যেক ইংরেজটিই যে রাজা—একটা ছোটো ইংরেজকে মারলেও যে সেটা একটা ছোটোরকম রাজবিদ্রোহ। যেটাতে কিছু ফল হবে না সেটার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা করতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কোপানলে পড়ব সে আমার দ্বারা হবে না।""[৬৯] গোরা তাও কলকাতায় গিয়ে উকিল ধরে কিছু করা যায় কিনা তার একটা চেষ্টা করে দেখতে চেয়েছে। কিন্তু গোরা যা ভেবেছে তার সামর্থ্যের জায়গা থেকে, তা পল্লীর সাধারণ নিরন্ন প্রজাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। যারা নিজেদের জামিনের অর্থটুকু সংগ্রহ করতে পারে না তাদের পক্ষে কলকাতায় গিয়ে থেকে, উকিল ধরে বিচারের বন্দোবস্ত করার মত আর্থিক সামর্থ্যের অধিকারী ছিল না। সর্বোপরি সাতকড়ি হালদারের মতে সে চেষ্টা পক্ষপাতমূলক বিচারব্যবস্থার কারণে সাধারণ প্রজার পক্ষে যে 'মিথ্যে চেষ্টা' মাত্র হয়ে দাঁড়াত, বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুক্ষীণ হওয়ার নামান্তর হয়ে দাঁড়াত, সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সাধারণ প্রজার দুরবস্থার খানিকটা টের পাওয়া যায় এক্ষেত্রে গোরার দুরবস্থা দেখে। যে অবস্থার শিকার হওয়া থেকে গোরার মতো শিক্ষিত সমর্থ মানুষও সক্ষম হয়নি, তার থেকে সাধারণ প্রজারাই বা রক্ষা পাবে কীভাবে! উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ একটি ঘটনাসূত্রে এর পরিচয় দিয়েছেন। পল্লীর মেলা উপলক্ষে কলকাতার ছাত্রদের সঙ্গে গ্রামের ছাত্রদের ক্রিকেট যুদ্ধের আয়োজন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে কলকাতার ছেলেরা নিজেদের প্রস্তুতির মহড়া দিতে গিয়ে ক্রিকেটের গোলা একটি ছাত্রের পায়ে এসে লাগে এবং ছাত্রটি গুরুতর আহত হয়। এমতাবস্থায় মাঠের লাগোয়া পুষ্করিণীটি থেকে একটি চাদরের টুকরো ভিজিয়ে ছাত্রটির পায়ে বাঁধতে গেলে পাহারাওয়ালারা এসে ছাত্রদের ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে তাদের অকথ্য ভাষায় অপমান করে। ফলে কলকাতার ছাত্রদের সঙ্গে তাদের মারামারির উপক্রম হয়। কারণ পল্লীর এই পুকুরটি নাকি পানীয় জলের জন্য রিজার্ভ করা ছিল, যা কলকাতার ছাত্ররা জানতো না। রবীন্দ্রনাথ স্বল্প পরিসরে পল্লীর পানীয় জলের নিদারুণ অবস্থার প্রতি দিকনির্দেশ করার প্রয়াস নিয়েছেন। পুকুরের জলই শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে পানযোগ্য জলের একমাত্র ভবিতব্যতা। ইংরেজ সরকার পল্লীকে শোষণ করলেও তার সামান্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে কোনপ্রকার দায় স্বীকার করেনি।

যাইহোক, এই গণ্ডগোলের মধ্যে গোরা এসে পড়ায় কনস্টেবল পিটিয়ে সেই যাত্রায় গোরা অন্যায়ের প্রতিকার করে। কিন্তু এর জন্য গোরাকে চরম মূল্য দিতে হয়। গোরা পুলিস গোরাকে কয়েদ করে। বিনয় কিংবা সাতকড়ি হালদার গোরাকে জামিনে মুক্ত করতে চাইলেও গোরা তার প্রতিবাদ জানায়। তার টাকা আছে বলে বন্ধু আছে বলে সে খালাস পাক, তা সে চায় না। যদি দেশে উকিলের কড়ি না জোগাতে পেরে প্রজা হাজতে পচে মরে, জেলে মরে, রাজা মাথার উপরে থাকতেও ন্যায়বিচার পয়সা দিয়ে কিনতে প্রজাকে সর্বস্বান্ত হতে হয়, তবে তেমন বিচারের জন্য গোরা সিকি-পয়সা খরচ করতেও রাজি নয়।

সাতকড়িকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আমাদের দেশের পূর্ববর্তী মুসলমান শাসকের সময়কার বিচারব্যবস্থার ঘুষ ও ঘুষির প্রসঙ্গটিকে উত্থাপন করেছেন অত্যন্ত কৌশলে। সে আমলেও বিচার ব্যবস্থায় কাজির ঘুষের বন্দোবস্ত করতে হত। কিন্তু ইংরেজের পক্ষপাতমূলক বিচার ব্যবস্থার অনৈতিকতা ও ভয়াবহতা তুলনা পাওয়া যায় এ উপন্যাসে—“ গোরা কহিল, “ ঘুষ দেওয়া তো রাজার বিধান ছিল না। যে কাজি মন্দ ছিল সে ঘুষ নিত, এ আমলেও সেটা আছে। কিন্তু এখন রাজদ্বারে বিচারের জন্যে দাঁড়াতে গেলেই, বাদী হোক প্রতিবাদী হোক, দোষী হোক, নির্দোষ হোক, প্রজাকে চোখের জল ফেলতেই হবে। যে পক্ষ নির্ধন, বিচারের লড়াইয়ে জিত-হার দুই তার পক্ষে সর্বনাশ। তার পরে রাজা যখন বাদী আর আমার মতো লোক প্রতিবাদী, তখন তাঁর পক্ষেই উকিল

ব্যারিষ্টর—আর আমি যদি জোটাতে পারলুম তো ভালো, নইলে অদৃষ্টে যা থাকে! বিচারে যদি উকিলের সাহায্যের প্রয়োজন না থাকে তবে সরকারি উকিল আছে কেন? যদি প্রয়োজন থাকে তো গবর্মেন্টের বিরুদ্ধপক্ষ কেন নিজের উকিল নিজে জোটাতে বাধ্য হবে? এ কি প্রজার সঙ্গে শত্রুতা? এ কী রকমের রাজধর্ম?''''[৭০] একারণেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাতন্ত্রের বাইরে স্বতন্ত্র দেশপরিকল্পনার কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

ঙ. চতুরঙ্গ :

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনার প্রতিলিপি রচিত হয়েছে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসেও। জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা ও ধর্মমোহের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসেও তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ রেখেছেন। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় 'জ্যাঠামশায়'। এই অধ্যায়ে গ্রাম থেকে কলকাতায় পড়তে আসা উপন্যাসের কথক শ্রীবিলাস তার গাঁয়ের জাত-পাত অধ্যুষিত পল্লীসমাজের একটি ছবিকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই সমাজের একজন হিসেবে শ্রীবলাসের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন কীভাবে প্রথমে ধাক্কা খেয়েছিল, কীভাবে তা মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের অন্তরায় হয়ে উঠেছিল তার বর্ণনা দিয়েছে শ্রীবিলাস। জানিয়েছে—"আমাদেরও গাঁয়ে মল্লিক-উপাধিধারী এক ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু জানিয়াছি, শচীশ সোনার-বেনে। আমাদের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর—জাতি হিসাবে সোনার-বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি। আর, নাস্তিককে নরঘাতকের চেয়ে, এমন-কি, গো-খাদকের চেয়েও পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতাম।"[৭১] কিন্তু ক্রমে জ্যাঠামশাই-শিষ্য শচীশের সংস্পর্শে এই জাত-পাত ভেদাভেদের সঙ্কীর্ণতাকে ছাড়িয়ে ওঠে শ্রীবিলাস এবং নাস্তিক্যে তার গুরু শচীশকেও ছাড়িয়ে যায়।

কলকাতার পল্লীর বাসিন্দা হলেও হরিমোহন সামাজিক বা মানবিক প্রগতি চেতনাকে আত্মস্থ করতে পারেনি। তার কারণ হরিমোহন শিশুকালে অসুস্থ ছিলেন। তাগাতাবিজ থেকে শুরু করে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, সন্ন্যাসীর জটা নিংড়ানো জল, বিশেষ পীঠস্থানের ধুলা, অনেক জাগ্রত ঠাকুরের প্রসাদ ও চরণামৃত, গুরু-পুরোহিতের অনেক টাকার আশীর্বাদ তাকে নাকি সমস্ত অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেছিল। কিন্তু এ সকল বিধিবিধান তাকে মনের দিক থেকে যে কতটা 'কাহিল' করে তুলেছিল তার বর্ণনা উপন্যাসে স্পষ্ট।

হরিমোহনের মনের প্রসার এই সকল সঙ্কীর্ণ সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আটকা পড়েছিল বলেই ভাই জগমোহনের প্রগতিচেতনাকে বুঝে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাকে কেবল এক অনাসৃষ্টি বলেই মনে হয়েছে তার। এমনকি জ্যাঠামশায়ের আধুনিক চিন্তাচেতনায় সমৃদ্ধ পুত্র শচীশকে যখন ভাইয়ের হাত থেকে উদ্ধার করতে

পারলেন না তখন সমস্ত পাড়াতে হরিমোহন দাদার নামে কুৎসার প্রচারকে বহুগুণিত করে তুলেছে। এ ক্ষেত্রে তার শারীরিক বা মানসিক কোনরকম 'কাহিল' দশার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। কুসংস্কার-অস্পৃশ্যতা-জাতপাত কীভাবে পল্লীর মানুষের জীবনের উন্নয়ন বা প্রগতিতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় রবীন্দ্রনাথ তার আভাসটিকে এই কাহিনীর মধ্যস্থতায় উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

জগমোহন ও শচীশ তাই যখন পল্লীর অনগ্রসর মানুষের হিতার্থে তাদের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেছে তখন হরিমোহনের সঙ্কীর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনই সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে—

" জগমোহনের নাস্তিকধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা। সেই ভালো করার মধ্যে অন্য যে-কোন রস থাক্ একটা প্রধান রস এই ছিল যে, নাস্তিকের পক্ষে লোকের ভালো করার মধ্যে নিছক নিজের লোকসান ছাড়া আর কিছুই নাই—তাহাতে না আছে পুণ্য না আছে পুরস্কার, না আছে কোনো দেবতা বা শাস্ত্রের বক্শিসের বিজ্ঞাপন বা চোখ রাঙানি। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনে আপনার গরজটা কী' তিনি বলিতেন, কোনো গরজ নাই, সেইটেই আমার সব চেয়ে বড়ো গরজ। তিনি শচীশকে বলিতেন, দেখ্ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।

'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনের' প্রধান চেলা ছিল তাঁর শচীশ। পাড়ায় চামড়ার গোটাকয়েক বড়ো আড়ত। সেখানকার যত মুসলমান ব্যাপারী এবং চামারদের লইয়া জ্যাঠায় ভাইপোয় মিলিয়া এমনি ঘনিষ্ঠ-রকমের হিতানুষ্ঠানে লাগিয়া গেলেন যে, হরিমোহনের ফোঁটাতিলক আগুনের শিখার মতো জ্বলিয়া তাঁর মগজের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইবার জো করিল। দাদার কাছে শাস্ত্র বা আচারের দোহাই পাড়িলে উলটা ফল হইবে, এইজন্য তাঁর কাছে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অন্যায় অপব্যায়ের নালিশ তুলিলেন। দাদা বলিলেন, তুমি পেট-মোটা পুরুতপাণ্ডার পিছনে যে টাকাটা খরচ করিয়াছ আমার খরচের মাত্রা আগে সেই পর্যন্ত উঠুক তার পরে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হইবে।"[৭২]

জ্যাঠামশায়ের এ হেন আচরণের পিছনে কাজ করেছে যুগের নবজাগ্রত জীবনবোধ। হরিমোহনরা তো কোনকালেই 'বাহির পানে' তাকায় না। তাদের 'চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা'। ফলে তাদের পক্ষে পৃথিবীর নতুন নতুন চিন্তা-চেতনার স্রোতকে উপলব্ধি করা এবং জীবনে তাকে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাটুকু বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। চেতনার স্বাধীনতার পথে অন্তরায় বহুকালাগত পুঁথিগত ধর্ম ও সংস্কার। কিন্তু বুদ্ধি আর

জ্ঞান দিয়ে নবীন জীবনবোধকে আত্মস্থ করার মতো আরো যে বৃহত্তর মানবধর্ম তা তাদের কাছে কোন মূল্য পায় না। সেই মূল্যমানতার মহার্ঘতা জ্যাঠামশাই চরিত্রটিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তাই জানিয়েছেন—

"......যুগের আদর্শকে বাংলার নবযৌবনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বঙ্গ-সাহিত্যের রঙ্গভূমিতে জ্যাঠামশায়কে আনবার একান্ত প্রয়োজন ছিল। নতুন যুগ নীতির কোন আদর্শকে অনুসরণ করে চলেছে, সে কথা আজ আমরা ভালো করেই জানি।

একদিন ছিল, আনুষ্ঠানিক ধর্মকেই যখন আমরা বড়ো বলে মেনেছি। আজ এল নবযুগের প্রভাত। এই প্রভাত আমাদের কাছে বহন করে নিয়ে এলো নবধর্মের বাণী। এই নবধর্মের বাণী কী। মানুষের সেবা।The Worship of God is replaced by the service of Man......

এই যে নবধর্ম যার মর্মবাণী হল মানবসেবা—এই নবধর্মের জয়ধ্বজা 'চতুরঙ্গে'র জ্যাঠামশাইয়ের হাতে। জ্যাঠামশায় সোনার বেনে হয়েও দ্বিজোত্তম, কারণ যে অনুভূতি জাগলে মানুষ পুরাতন জীবনের সংকীর্ণতাকে পশ্চাতে ফেলে একটা আধ্যাত্মিক নবজীবনের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে—সকলের সঙ্গে আপনার ঐক্যবোধের সেই অনুভূতি জ্যাঠামশায়ের জীবনকে অপূর্ব ঐশ্বর্য দান করেছে।"[৭৩]

কিন্তু এই নিয়ে হরিমোহনের সঙ্কীর্ণ আচার ধর্মের সঙ্গে জগমোহনের উদার মানব ধর্মের প্রকান্ড বিরোধ উপস্থিত হয়। হরিমোহন শচীশকে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসে যে তারা কীভাবে এ বাড়িতে মুসলমান চামারকে ডেকে খাওয়ায় সে তা দেখে নেবে। জগমোহনকে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে গেলে তিনি বলেন যে—"তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ, আমি কথা কই না। আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব, ইহাতে বাধা দিয়ো না।"[৭৪] কিন্তু হরিমোহন তার অভ্যস্ত শাস্ত্রধর্ম দিয়ে বুঝে পায় না মুসলমান চামারেরা কীভাবে দেবতার শিরোপা পায়। শাস্ত্রের বিধিবিধান আমাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে কীভাবে মুছে দেয়, মানধর্মের প্রতিপালনে কতটা বাধার সৃষ্টি করে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এর পূর্বে 'রাজর্ষি' উপন্যাস বা তার নাট্যরূপ 'বিসর্জনে'র মধ্যে আমরা পেয়েছি। এ উপন্যাসেও জগমোহন হরিমোহনকে একই সুরে জানিয়েছেন—" হাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা। তাহাদের আশ্চর্য এই এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোনো দেবতা তাহা পারে না। আমি সেই আশ্চর্য রহস্য দেখিতে ভালোবাসি, তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি। দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে তুমি খুশি হইতে।"[৭৫]

কিন্তু জগমোহনের এই মানবদেবতার স্বরূপ, তাদের উন্নয়ন বা সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মাহাত্ম্যকে বোঝার ক্ষমতা আমাদের দেশের সঙ্কীর্ণ ধর্মান্ধ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে শিক্ষাও তাদের ছিল না তখন। ফলে এমন ধরণের মহত্তর জনকল্যাণমূলক কাজেও এদেশের সমাজ কতটা বিরোধী হয়ে উঠতে পারে, তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিজীবনে পেয়েছিলেন। এ উপন্যাসেও তার স্পষ্ট বর্ণনা আছে। জগমোহন মানবদেবতার সেবায় নিয়োজিত হতে চাইলে হরিমোহন তার সঙ্গে কোমর বেঁধে বিবাদে অগ্রসর হয়। যা নিয়ে তাদের সংসার চলতো সেটা ছিল দেবত্র সম্পত্তি। জগমোহন বিধর্মী, আচারভ্রষ্ট –সেকারণে তিনি সেবায়েত হবার অযোগ্য, এই মর্মে জেলাকোর্টে হরিমোহন নালিশ রুজু করে। মাতব্বর সাক্ষীরও অভাব ছিল না। পাড়াসুদ্ধ ধর্মভীরু লোক এই মামলায় সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হয়।

হরিমোহনের এই চক্রান্ত অতি সহজেই সফল হয়। সত্যপথের পথিক মুক্তমনা জগমোহন আদালতে দাঁড়িয়ে স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, তিনি দেবদেবী মানেন না, খাদ্য-অখাদ্য বিচার করেন না। কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে এও জানান যে মুসলমানরা ব্রহ্মার কোন্খান থেকে জন্মেছে তিনি জানেন না কিন্তু তাদের সঙ্গে তাঁর খাওয়া-দাওয়ায় কোন বাধা নেই। এই স্বীকারোক্তির ফল ও জগমোহনের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—" মুনসেফ জগমোহনকে সেবায়েত-পদের অযোগ্য বলিয়া রায় দিলেন। জগমোহনের পক্ষের আইনজ্ঞরা আশা দিলেন এ রায় হাইকোর্টে টিকিবে না। জগমোহন বলিলেন আমি আপিল করিব না। যে-ঠাকুরকে আমি মানি না তাহাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। দেবতা মানিবার মতো বুদ্ধি যাহাদের, দেবতাকে বঞ্চনা করিবার মতো ধর্মবুদ্ধিও তাহাদেরই।"[৭৬]

আসলে দেবতা যে হরিমোহনের এ চক্রান্তে অসন্তুষ্ট, তিনি নিজেই যে সবচেয়ে বড় ফাঁকিতে পড়লেন তা জগমোহনের এ মন্তব্যে স্পষ্ট। হরিমোহনের এই বিধর্মী আচরণে তাই দুই ভাইয়ের বাড়ির মাঝামাঝি একটি বিভেদের প্রাচীর গড়ে ওঠে। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস বা মানুষের সঙ্কীর্ণ দলাদলি কীভাবে একটি আত্মবিচ্ছিন্ন সমাজের জন্ম দেয়, কীভাবে দরিদ্র দেশ ভারতবর্ষের বুকে নিরর্থক মামলা-মকদ্দমা অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়ে মানুষকে দুর্বল করে তোলে, কীভাবে তা তাদের এক নিশ্চিত পতনের অভিমুখে চালিত করে হরিমোহন ও জগমোহনের মধ্যেকার মামলা তারই সাক্ষ্য বহন করে।

পুরন্দর একদিন বাড়ি থেকে চামারদের তাড়াতে পারেনি বলে যে গাত্রদাহ উপলব্ধি করে, মামলা জেতার পর যেন তারই প্রতিশোধ নিতে বাড়িতে ঢাক ঢোলের প্রবল ধ্বনি তুলে নিজের উদ্যোগে দু'দিন ধরে ব্রাহ্মণ ভোজন করায়। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ অর্থ, যা নিছক নিজের অহংবোধ চরিতার্থতার জন্য ব্যয়িত হল, তা যদি দরিদ্র দেশের নিরন্ন মানুষের উন্নয়নে বা হিতার্থে ব্যয়িত হত, সে দান হয়ে দাঁড়াতো অমূল্য। উনিশ

শতকের এই নবীন জীবনবোধ পুরন্দর বা হরিমোহনকে যে নাড়া দিল না তার মূলে রয়েছে তাদের শিক্ষার অভাব। হরিমোহনের সংস্কারাছন্ন শৈশবের পরিচয় পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। পুরন্দরকে তার স্বভাবের পথে চালিত হতে দেওয়ায় তার পক্ষেও কিছু পড়াশোনা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সকাল সকাল বিবাহ করে সে সংসারী হয়ে ওঠার চেষ্টা করে করে। ফলে শিক্ষার অভাবই তাদেরকে জগমোহনের প্রগতিকর্মে বাধা সৃষ্টিতে প্রণোদিত করেছে। নইলে যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শচীশ মশালের মতো জ্বলেছে, তার কতকাংশ অবশ্যই হরিমোহন বা পুরন্দরের মধ্যে অবশ্যই বর্তাতো।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীতে এ কারণেই শিক্ষার উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। শিক্ষার অভাবদেশের উন্নয়নে কতটা বাধা হতে পারে তেমন বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকেই তিনি পল্লীসংগঠনের কাজ করে গেছেন। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দেশব্রতী মানুষদের কাছে সুকঠিন ত্যাগস্বীকারের আদর্শকে বার বার তুলে ধরেছিলেন। সেই ত্যাগস্বীকারের একটি প্রোজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন জ্যাঠামশাই চরিত্রটিকে। তিনি এত কঠিন সামাজিক প্রতিবন্ধকতায়ও তাঁর জীবনাদর্শ থেকে সরে আসেননি। যাকে তিনি জীবনে সত্য বলে জেনেছেন তার জন্য তাঁর জীবনপণ সংগ্রাম এক শ্রেষ্ঠ সমাজবাদীর পরিচয়কে তুলে ধরে। স্বগৃহ ত্যাগ করে ভাড়াবাড়িতে থেকে, শিক্ষকতার কাজ নিয়ে তিনি দেশের ভাবী সন্তানদের গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। পাড়ার মুসলমান ব্যাপারি ও চামারদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় গড়ে তাদের শিক্ষার কাজে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, মুক্তহস্তে দান করেছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বাধা দেবার চেষ্টা করেছে হরিমোহন কিংবা পুরন্দরের মতো অশিক্ষিতপটু মানসিকতা।

ননীবালাকে সামাজিক অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে যে সামাজিক অসম্মানের মুখোমুখি হয়েছেন, তাতে জগমোহন সামান্যতম বিচলিত হননি। কারণ, তাঁর কর্মের প্রতিষ্ঠা ছিল সত্যের উপর। সেই সত্যের জন্য অনায়াসে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন জগমোহন তাতে এক শ্রেষ্ঠ সমাজবাদীর খোরাক মেলে উপন্যাসে। কলকাতায় প্লেগ দেখা দিলে প্লেগের চেয়ে রাজ-তকমা-পরা চাপরাসিদের ভয়েই লোকেরা বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। হরিমোহন বুঝেছিল, তাদের প্রতিবেশী চামারগুলোর এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভবাবনা অধিক। তাই কালনায় গঙ্গার ধারে বাড়ি পেয়ে সেখানে উঠে যায়। যাবার বেলা সে জগমোহনকে সঙ্গে যাবার কথা বললেও জগমোহন চামারদের ফেলে একা যেতে অস্বীকার করেন। এই ত্যাগস্বীকারের পথে শচীশও জগমোহনের সঙ্গী হয়। পাড়ায় প্লেগ দেখা দিলে হাসপাতালে যাবার ভয়ে কেউ ডাক্তারে খবর দিতে চাইল না। জগমোহন তখন নিজের বাড়িতেই প্রাইভেট হাসপাতাল খুলে মানুষের চিকিৎসা করতে শুরু করলেন। মানুষের সেবা করতে গিয়ে নিজের হাসপাতালেই জগমোহনের মৃত্যু ঘটে।

যে ধর্মকে জগমোহন জীবনে সত্য বলে জেনেছিলেন তার জন্যই তিনি অকাতরে জীবন দান করতে কুণ্ঠিত হননি। শচীশকে মৃত্যুর সময় তাই তিনি বলেছেন—“এতদিন যে ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেশ বকশিশ চুকাইয়া লুইলাম—কোনো খেদ রহিল না।”[৭৭] তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে দলিলটুকু লিখে যান সেও ছিল তাঁর জীবনধর্মের অনুকূল। দলিলে তিনি লিখেছেন—“......কোনদিন এ বাড়িতে পূজা-অর্চনা হইতে পারিবে না, নীচের তলায় পাড়ার মুসলমান চামার ছেলেদের জন্য নাইট্‌স্কুল বসিবে, আর শচীশের মৃত্যুর পর সমস্ত বাড়িটাই ইহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য দান করিতে হইবে। পৃথিবীতে পুণ্যের উপরে জ্যাঠামশায়ের সব চেয়ে রাগ ছিল; তিনি বৈষয়িকতার চেয়ে এটাকে অনেক বেশি নোংরা বলিয়া ভাবিতেন, পাশের বাড়ির ঘোরতর পুণ্যের হাওয়াটাকে কাটাইয়া দিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইংরাজিতে তিনি ইহাকে বলিতেন স্যানিটারি প্রিকশন্‌স।”[৭৮]

দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য রবীন্দ্রনাথ সেদিন এমনিই নিস্বার্থ আত্মত্যাগের আহ্বান জানিয়েছিলেন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে, ত্যাগব্রতী মানুষদের কাছে। জ্যাঠামশায় চরিত্রটিকে জাগ্রত ডিরোজিয়ানের যে আদর্শেই নির্মাণ করতে চান না কেন, তাঁর চরিত্র নির্মাণের গভীরে সমকালীন পল্লী তথা দেশোন্নয়নে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তিচরিত্রের একটি ভাবাদর্শ অবশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু নিঃসন্দেহে ট্র্যাজিক। কিন্তু জাতির মানোন্নয়নে কোন প্রগতিশীল বার্তা রেখে গেলেন তিনি আমাদের কাছে? সমালোচকের ভাষায় বলা চলে—

“......জীবন গেলেও জীবনের আদর্শ থেকে যায়। জ্যাঠামশায়ের জীবনের আদর্শ আজ বাংলাদেশের হৃদয়ে পূজা পেতে আরম্ভ করেছে। হরিমোহনের দলের সমস্ত নিন্দা-শরকে অগ্রাহ্য করে জ্যাঠামশায়ের নির্ভীক চেলারা একটা নূতন সমাজ গড়বার জন্য অভিযান শুরু করেছে। আজকে ঘরে ঘরে লড়াই বেধেছে হরিমোহনে আর জগমোহনে, পুরন্দরে আর শচীশে।বাপে বেটায় লড়াই, ভায়ে ভায়ে লড়াই, আদর্শে আদর্শে লড়াই, সত্যে আর মিথ্যার লড়াই, নবীনে আর প্রবীণে লড়াই। জ্যাঠামশায়ের আর শচীশের নিন্দায় প্রবীণেরা পঞ্চমুখ, কারণ জ্যাঠামশায়ের ভাষায় ‘আমাদের নাস্তিকের ধর্মশাস্ত্রে ভালো কাজের জন্য নিন্দার নরকভোগ বিধান।’ যারাই সমাজের পুরাতন আদর্শকে বর্জন করে নূতন আদর্শকে সৃষ্টি করবে তাদের ভাগ্যেই নিন্দা আর লাঞ্ছনা অনিবার্য। এই সত্যকে নীট্‌শে অনেকদিন আগেই ঘোষণা করেছেন। The Good must crucify him that inventeth for himself his own virtue! That is truth. পাঁজি-পুঁথির বিধানকে ভেঙে নিজেদের বিধানকে যারা সৃষ্টি করে তাদের প্রতি ধার্মিকের (হরিমোহনের মতো ধার্মিক) কোনোকালেই বিতৃষ্ণার অন্ত নেই। ধার্মিকেরা তাদের ক্রুশে দেয়, আগুনে ছুঁড়ে ফেলে, ফাঁসিতে ঝোলায়, কারাগারে

পচিয়ে মারে, একঘরে করে—তবুও তাদেরই আদর্শ শেষ-পর্যন্ত জয়ী হয় এবং ভবিষ্যতের কাছ থেকে পূজার অর্ঘ্য পায়। এই পুরন্দর আর হরিমোহনের দল, এই তথাকথিত সাধুরা আর ধার্মিকেরা হল মানুষের ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড়ো শত্রু—কারণ এদের দৃষ্টি সর্বদার জন্য পিছনের পানে। একদিন জার্মানিতে নীট্‌শে বলেছিলেন,

Break, break the Good and Righteous! O My brethren, have ye understood this word?

ভাঙো! ভাঙো, যারা ধার্মিক আর সাধু—তাদের ভাঙো! 'চতুরঙ্গে'র জ্যাঠামশায়কে সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ নীট্‌শের এই বাণীই কি বজ্রগর্জনে ঘোষণা করলেন না বাংলার নবযৌবনের কানে?"[৭৯]

এ উপন্যাসের অপর উল্লেখযোগ্য চরিত্র শচীশ। তার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের অন্ধ ধর্মমোহ থেকে মুক্তির একটি মার্গকে প্রশস্ত করে তুলতে চেয়েছেন অত্যন্ত সচেতন ভাবেই। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে বার বার শচীশের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন—'ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন'। আমাদের দেশে ধর্মকে সহজলভ্য করার প্রয়াস বহুদিন ধরে চলে আসছে। গুরুর পা টিপে আর তামাক সেজে যদি তার অনুগ্রহ লাভ করা যায় আর সেবায় খুশি হয়ে তিনি যদি কানে একটিবার মন্ত্র দেন তাহলে আর ভাবনা কী? এই যে গুরুকে অবলম্বন করে সহজে ঈশ্বরলাভের প্রয়াস—এর মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ফাঁকি আছে। এই ফাঁকিকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও বরদাস্ত করতে পারেন নি। উপন্যাসে শচীশকে তাই শ্রীবিলাস বলেছে—" দেখো শচীশ, আমার বোধ হয় তোমার একজন কোনো গুরুর দরকার, যার উপরে ভর করিয়া তোমার সাধনা সহজ হইবে।"[৮০] এই প্রস্তাবে শচীশ বিরক্ত হয়। জানায় "চুপ করো বিশ্রী, চুপ করো—সহজকে কিসের দরকার? ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন।"[৮১] 'ভুলবো না আর সহজেতে'—একথা তো রবীন্দ্রনাথের নিজেরই। সহজেতে তিনি নিজেও ভোলেননি, সহজ দিয়ে তিনি আমাদেরও ভোলাতে চাননি। বিধাতার বাঁশির সুর যে শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদে! তাঁর গান তো সহজ গান নয়।

যে কান থাকলে বজ্রনাদের মধ্যেও বাঁশি শোনা যায় সেই কান শচীশ চেয়েছে তার স্রষ্টার কাছ থেকে। আরামকে সে চায়নি। পরম সত্যের উপলব্ধি কখনো আরামের রাস্তা ধরে আসতে পারে না। আসলে—" রবীন্দ্রনাথ সেই কবি যিনি অতন্দ্র প্রহরীর মতোই তূর্যহাতে দন্ডায়মান ছিলেন জাতিকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য, আর তিনি কবির স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন, প্রগতির সর্বাপেক্ষা মারাত্মক শত্রু হচ্ছে আরাম। গুরুবাদের মধ্যে চিত্তের সর্বনেশে আরামপ্রিয়তা। ঈশ্বরকে অন্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা—এই যদি ধর্ম হয় তবে ধর্ম কখনও পরের হাত থেকে পাওয়া

যায় না। গুরু কানে মন্ত্র দেবেন আর সেই মন্ত্রের যাদুতে নিমেষের মধ্যে আমার উপলব্ধি হয়ে যাবে, উপলব্ধির জন্য আমার নিজের সাধনার কোনো প্রয়োজন নেই—এমন কথা যারা বলে তারা বৃদ্ধ হলেও বৃদ্ধ শিশুর পর্যায়েই পড়ে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগুরু তাই একবাক্যে বলেছেন—যে পথ মানুষকে ঈশ্বরের পদপ্রান্তে পৌঁছে দেয় সে ক্ষুরের ধারের মতই শাণিত এবং দুর্গম। বাইবেলে আছে, Straight is the gate, and narrow the way, and few there be that find it. ঈশ্বরকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করার পথ যদি সহজই হবে, তবে দেখতাম ডজন ডজন মহাপুরুষ রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি অতি কঠিন এবং কঠিন বলেই মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে এত দুর্লভ।..........."[৮২]

অথচ আমাদের দেশের একশ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী যখন এই মৌল সত্যকে ভুলে গিয়ে গুরুবাদের সহজ রাস্তাকে মুক্তির রাস্তা বলে নির্দেশ দেয় তখন বুঝতে পারি ঐ ধর্মব্যবসায়ীর দল সত্যের কঠিন নির্মল মূর্তিকে এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিরকাল সত্যের কাছেই তাঁর বাণী ও কর্মের অর্ঘ্য অর্পণ করেছেন। 'চতুরঙ্গে'র শচীশ তাই বলেছে—" আর-সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন; যদি তাঁকে পাইতো আমিই তাঁকে পাইব নাহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।"[৮৩] সমালোচকও জানিয়েছেন—

" মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের কবিতায় পাই—

"No one can acquire for another—not one,

No one grow for another—not one

কেউ কাউকে কিছু পাইয়ে দিতে পারে না। পেতে হলে নিজেকেই তপস্যা করে পেতে হবে—এই হচ্ছে চিরকালের সত্য। 'চতুরঙ্গে'র শ্রীবিলাস যখন শচীশকে বলল— সত্যকে পাবার জন্য পথ দেখাবার দরকার আছে আর গুরু সেই পথপ্রদর্শক তখন শচীশ অধীর হয়ে উত্তর দিয়েছে,

'ওগো, এ তোমার ভূগোল-বিবরণের সত্য নয়—আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন—গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ'।

ভগবানের কাছে নিয়ে যাবার জন্য পথপ্রদর্শকের কোনো প্রয়োজন আছে— একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি। গুরুর পথ ধরে চললে গুরুর চেলার সংখ্যা বাড়ানো যায়। কিন্তু সে পথে কি ভগবানকে পাওয়া যায়?"[৮৪]

আসলে ঈশ্বর যদি সত্য হন তবে চালাকির দ্বারা নয়, মহাবীর্যের দ্বারাই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। নেচে, কেঁদে, গেয়ে ভাবসম্ভোগে তলিয়ে গিয়ে নয়, নির্জন তপস্যার দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা তাকে লাভ করা যায়। লীলানন্দ স্বামীর আখড়া দিনরাত যে নাচ গান নিয়ে রসের ভাবসাগরে ডুবে আছে তা যে মানুষকে চরম রসাতলে তলিয়ে দেয়, নবীনের বিপথগামিতা ও স্ত্রীর আত্মহনন সেদিকেরই একটি সংক্ষিপ্ত দিকনির্দেশ। অথচ আমাদের শাস্ত্রেই তো বলেছে পরম পুরুষকে উপলব্ধি করতে হলে দরকার চিত্তের স্থৈর্য্য, মনকে করা চাই একাগ্র, নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো।

শচীশ তাই 'পা-টেপা আর তামাক সাজা'র পালায় যবনিকা টেনে যেখানে গেছে সেখানে কীর্তন নেই, নৃত্য নেই, রসের চর্চা নেই, গুরু নেই, সহজের ফাঁকি নেই। বরং সেখানে আছে কঠিন সত্যকে মর্মের মধ্যে উপলব্ধির জন্য ভিতরে ভিতরে একটা প্রচন্ড সংগ্রাম। অন্তরে অন্তরে শচীশের অভিযান চলেছে পরম সত্যকে জয় করার জন্য, উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। ধর্মকে এভাবেই শচীশ নিজের ভিতর থেকে জন্ম দিতে চেয়েছে ত্যাগ আর দুঃখ সাধনাকে স্বীকার করে নিয়ে। এই সাধন-দহনে নির্মল আত্মবিকাশের পথে শচীশের যে প্রেম-সাধনা সেই-ই তো মনুষ্যত্বের ক্রমউদ্‌বর্তনের সাধনা। সেই আত্ম-উন্মোচনের আস্বাদ একবার যে পায় তার কাছে রূপের সঙ্কীর্ণ পরিসর গৌণ হয়ে যায়, চিত্তে জাগে আত্ম-উন্মোচনের অনন্ত তৃষা। সে তৃষা তাই 'জীবন রসের রসিক' দামিনীর রসের বা রূপের তৃষাকে ছাড়িয়েও বড় হয়ে উঠেছে।

এ আসলে আত্মসংস্কারেরই এক অনিবার্য প্রক্রিয়া। এই পথে যে ধর্মকে মানুষ অন্তরে লাভ করে সে তো মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্বের সাধনা ছাড়া আর কিছু নয়। নিজেকে শ্রেষ্ঠ মানুষ করে তুলতে না পারলে শ্রেষ্ঠ মানুষ রাজার সঙ্গে মিলন হবে কী করে—'নইলে মোদের রাজার সনে মিলবো কী স্বত্বে!' এই শ্রেষ্ঠ মানুষ হবার সাধন-ধর্মই তো রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় 'মানুষের ধর্ম'। শচীশ সেই সাধনার পথেই পা বাড়িয়েছে, মানুষের ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে জেনেছে। উপন্যাসের সমাপ্তিতে 'শ্রীবিলাস' অধ্যায়ে যখন শ্রীবিলাস বিবাহের পর শচীশকে তাদের কাছে থেকে যাওয়ার কথা বলেছে তখন কিন্তু শচীশ বলেছে, তার কাজ অন্যত্র। এই অন্যত্র কাজের মধ্যেই আছে বৃহত্তর মানবকল্যাণ বা মানবসেবার মত শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম পালনের দিকনির্দেশ। এই পথেই যে ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছানো যায় সে তো রবীন্দ্রনাথের নিজেরই বহুল সমর্থিত আধ্যাত্মিক মার্গবিশেষ। এই পথেই কিন্তু অতিক্রম করা যায় তথাকথিত ধর্মকে কেন্দ্র করে জাত-পাত- অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতার মারণবিষকে। 'চতুরঙ্গ' সেই ধর্মমোহ থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার নবতর দিকনির্দেশ।

চ. ঘরে-বাইরে :

রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসে পল্লীউন্নয়ন ভাবনার বহুমাত্রিক প্রকাশ দেখা যায়। তারই একটি বিশেষ দিক হল দেশের নারী শক্তিকে দেশের কাজে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহারের দিকটি। বিশ্বের সীমানা ভাঙার যুগে প্রগতিশীলা নারী চরিত্রের যে ছবিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘কালান্তর’ গ্রন্থে অঙ্কন করেছিলেন, তারই ছবিকে খুঁজে পাওয়া যাবে পল্লীবাসিনী বিমলা চরিত্রের মধ্যে। নিখিলেশ বিমলাকে তেমনি আধুনিকা করে গড়ে তোলার জন্য মিস গিলবিকে বিমলার সঙ্গিনী এবং শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত করেছিল।

এতে ঘরে-বাইরে যত বিষ রসনা ছিল তার সমস্ত বিষ উদ্বেল হয়ে উঠলেও নিখিলেশ কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে। কারণটা হল, বিমলার কথায়—“ আমার স্বামী বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।”[৮৫] মেয়েদের সমস্ত রকম ক্ষুদ্রতাকেই নিখিলেশ তাই বার বার নস্যাৎ করেছে। এই অধিকার ও মূল্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ নারীচরিত্রের শক্তিকে পুরুষের শক্তির সঙ্গে মেলাতে পারলেই যে আমদের দেশের শক্তি বা সভ্যতার স্বতন্ত্র উদ্গম রচিত হবে এ কথা রবীন্দ্রনাথেরও নিজের কথা। তাই তিনি তার পল্লীসংগঠন কর্মে নারী শক্তির স্বতন্ত্র বিকাশের জন্য আয়োজন রেখেছিলেন।

এ উপন্যাসেও বিমলা উনিশ শতকীয় নবজাগরণের শিক্ষায় শিক্ষিত এক নারী হিসেবে দেশের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের ডাককে উপলব্ধি করেছে, তার গুরুত্বকে বুঝেছে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন বিমলা কীভাবে ধীরে ধীরে ঘরের সীমাকে ডিঙিয়ে বাইরের বৃহত্তর দেশে পা রেখেছে। তার এই খোলস উন্মোচনকে রবীন্দ্রনাথ দুটি স্তরে ভাগ করে দেখিয়েছেন—একটি স্বদেশী যুগের প্রথম স্তর, দ্বিতীয়টি সহিংস বৈপ্লবিক আন্দোলনের দ্বিতীয় স্তর।

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন যখন প্রথম শুরু হয় তার অভিঘাত স্বাভাবিক ভাবেই সেদিন সমৃদ্ধতর নারীচরিত্রে এসে পড়েছে। বিমলা তাই জানিয়েছে—“সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিত্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবিরে লাল হয়ে উঠেছিল। এতদিন মন যে জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্মকর্ম আকাঙ্খা ও সাধনা যে সীমাটুকুর মধ্যে বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগে ছিল সেদিনও তার বেড়া ভাঙে নি বটে, কিন্তু সেই বেড়ার উপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তের ডাক শুনলুম স্পষ্ট তার মানে বুঝতে পারলুম না, কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল।”[৮৬]

এই যুগের দেশের কাজে যারা আত্মনিয়োগ করেছিল, তাদের মত ও পথ ছিল কিছু স্বতন্ত্র। নিখিলেশ এ যুগেরই একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে স্বদেশের উন্নয়নে

আত্মনিয়োগ করেছিল। তাঁর কার্যাবলী ও ভাবাদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাজ ও আদর্শের অনেক মিল দেখে কেউ কেউ নিখিলেশকে রবীন্দ্রনাথের মানস-চরিত্র রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন কর্মের প্রতিকৃতি কতকটা নিখিলেশের কার্যাবলীর মধ্যে স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। বিমলা উপন্যাসে নিখিলেশের এই পর্বের কাজের পরিচয় দিয়ে লিখেছে—

" আমার স্বামী যখন কলেজে পড়তেন তখন থেকেই তিনি দেশের প্রয়োজনের জিনিস দেশেই উৎপন্ন করবেন বলে নানারকম চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের জেলায় খেজুর গাছ অজস্র—কী করে অনেক গাছ থেকে একটি নলের সাহায্যে একসঙ্গে এক জায়গায় রস আদায় করে সেইখানেই জ্বাল দিয়ে সহজে চিনি করা যেতে পারে সেই চেষ্টায় তিনি অনেক দিন কাটালেন। শুনেছি উপায় খুব সুন্দর উদ্ভাবন হয়েছিল, কিন্তু তাতে রসের তুলনায় টাকা এত বেশি গলে পড়তে লাগল যে কারবার টিকল না। চাষের কাজে নানারকম পরীক্ষা করে তিনি যে-সব ফসল ফলিয়েছিলেন সে অতি আশ্চর্য, কিন্তু তাতে যে টাকা খরচ করেছিলেন সে আরো বেশি আশ্চর্য। তাঁর মনে হল আমাদের দেশে বড়ো বড়ো কারবার যে সম্ভবপর হয় না তার প্রধান কারণ আমাদের ব্যাঙ্ক নেই। সেই সময় তিনি আমাকে পোলিটিক্যাল ইকনমি পড়াতে লাগলেন। তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাঁর মনে হল সব প্রথমে দরকার ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয় করবার অভ্যাস ও ইচ্ছা আমাদের জনসাধারণের মনে সঞ্চার করে দেওয়া। একটা ছোটো গোছের ব্যাঙ্ক খুললেন। ব্যাঙ্কে টাকা জমাবার উৎসাহ গ্রামের লোকের খুব জেগে উঠল, কারণ সুদের হার খুব চড়া ছিল। কিন্তু যে কারণে লোকের উৎসাহ বাড়তে লাগল সেই কারণেই ঐ মোটা সুদের ছিদ্র দিয়ে ব্যাঙ্ক গেল তলিয়ে। এই-সকল কাণ্ড দেখে তাঁর পুরাতন আমলারা অত্যন্ত বিরক্ত ও উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠত, শত্রুপক্ষ ঠাট্টাবিদ্রূপ করত।"[৮৭]

নিখিলেশের এ সকল কাজের মধ্যে যে রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন সংক্রান্ত ভাবনার অনেকটাই আদর্শায়িত রূপ লাভ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় স্পষ্টতই জানিয়েছেন—" 'ঘরে বাইরে যে সময় লিখিত হইতেছিল, তাহার কিছুকাল পূর্ব হইতেই দেশমধ্যে দেশের নামে ডাকাতি করা তথাকথিত একশ্রেণীর দেশসেবকের ধর্ম হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভেও পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে জমিদাররা দেশসেবার নামে গরীব গ্রামবাসীগণের উপর যে সব অন্যায় উৎপীড়ন করেন তাহার কথা রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল। তিনি নীতির দিক দিয়া দেশ সেবায় নামেন নাই; বিলাতী কাপড় 'বয়কট' করিলেই দেশী কাপড় পাওয়া যায় না; তাই তিনি জমিদারিতে বয়ন বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। 'স্বদেশী সমাজে'র মধ্যে তিনি যে সব গঠনমূলক কর্মের পরিকল্পনা দিয়েছিলেন, নিজেই তাহার পরীক্ষা শুরু করেন। নিখিলেশ সেই আদর্শবাদী জীবনশিল্পী।

দেশ সম্বন্ধে কবির অনেক স্বপ্নই নিখিলেশের মধ্যে রূপ পাইয়াছে—কতকগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যর্থ জীবন হইতেও গৃহীত।”[৮৮]

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিদেশী পণ্য বয়কটের পূর্বে দেশীয় পণ্যের উৎপন্নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। দেশীয় শিল্পের বিকাশের জন্য তিনি বহুবিধ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। দেশীয় মৃৎশিল্প থেকে শুরু করে কৃষিজাত আখের সাহায্যে আখপেষাই শিল্পের প্রচলন করেছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে রথীন্দ্রনাথের সহায়তায় নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁতের কল থেকে ধানভাঙার মেশিন ইত্যাদির প্রচলন দ্বারা রবীন্দ্রনাথ পল্লীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়াস নেন। পল্লীর উন্নয়নের জন্য কৃষিব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠা করেন।

এ জাতীয় কিছু উদ্যোগ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে থাকলেও সে সকল পরিকল্পনার ভিতর বাস্তবতার অভাবের কারণে তা সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। ইংরেজের সাথে টক্কর দিয়ে জাহাজ চালাতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে লোকসানের মুখোমুখি হন তাতে তাঁর জাহাজ কোম্পানি উঠে যায়। কিন্তু তাঁর বা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যের মধ্যে জনহিতের আদর্শ অবশ্যই কাজ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশকে সাহিত্যের জগতে এ সকল আদর্শেরই সংযোগ-সমন্বয়ে আইডিয়ালিস্ট করে গড়ে তুলেছেন মাত্র। বিমলা এ উপন্যাসে এরই প্রতিধ্বনি করে জানিয়েছে—“ আমার স্বামীর দানের লিস্ট্ ছিল খুব লম্বা। তাঁতের কল কিংবা ধান ভানার যন্ত্র কিংবা ঐরকম একটা-কিছু যে-কেউ তৈরি করবার চেষ্টা করেছে তাকে তার শেষ নিষ্ফলতা পর্যন্ত তিনি সাহায্য করেছন। বিলাতি কোম্পানির সঙ্গে টক্কর দিয়ে পুরীযাত্রার জাহাজ চালাবার স্বদেশী কোম্পানি উঠল; তার একখানা জাহাজও ভাসে নি, কিন্তু আমার স্বামীর অনেকগুলি কোম্পানির কাগজ ডুবেছে।”[৮৯]

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন আমাদের দেশের যদি উন্নয়ন করতে হয় তাহলে দেশকে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের দেশে নিহিত সম্পদ সামগ্রী উদ্ধার করে দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের দেশের মানুষের মনের মধ্যেকার সকল সঙ্কীর্ণ বন্ধনকে ছিন্ন করে তাদেরকে নিজস্ব শক্তি বা চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হবে। নিখিলেশের ভাবনার মধ্যে অনুরূপ চেতনারই স্পষ্ট প্রতিস্থাপন চোখে পড়ে। বিমলা তাই বলেছে—“ আমার স্বামী বলতেন, দেশের খনিতে যে পণ্যদ্রব্য আছে তাকে উদ্ধার করতে না পারলে যেমন দেশের দারিদ্র্য, তেমনি দেশের চিত্তে যেখানে শক্তির রত্নখনি আছে তাকে যদি আবিষ্কার এবং স্বীকার না করা যায় তবে সে দারিদ্র্য আরো গুরুতর।”[৯০] বস্তুসম্পদের অভাব অপেক্ষা দেশের মানুষের পক্ষে মানসিক দারিদ্র্য যে আরো গুরুতর, আরো ভীষণতর এক অভিশাপ, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দেশের কাজে অগ্রণী দেশনেতাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সূত্রপাত ঘটলে পরিবর্তিত হয় দেশসেবার লক্ষ্য ও আদর্শ, মত ও পথ। বিমলার আত্মকথনে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

" এই পূর্বযুগের পরিচয় কিছু বলে রাখা গেল, নইলে নবযুগের নাট্যটা স্পষ্ট বোঝা যাবে না।

এই যুগের তুফান যেই আমার রক্তে লাগল আমি প্রথমেই স্বামীকে বললুম, বিলিতি জিনিসে তৈরি আমার সমস্ত পোশাক পুড়িয়ে ফেলব।

স্বামী বললেন, পোড়াবে কেন? যতদিন খুশি ব্যবহার না করলেই হবে।

কী তুমি বলছ 'যতদিন খুশি'! ইহজীবনে আমি কখনো—

বেশ তো ইহজীবনে তুমি নাহয় ব্যবহার করবে না। ঘটা করে নাই পোড়ালে? কেন এতে তুমি বাধা দিচ্ছ?

আমি বলছি, গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।

এই উত্তেজনাতেই গড়ে তোলবার সাহায্য হয়।

তাই যদি বল তবে বলতে হয় ঘরে আগুন না লাগলে ঘর আলো করা যায় না। আমি প্রদীপ জ্বালবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্যে ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে দুর্বলতার গোঁজামিলন।"[৯১]

নিখিলেশের মত ও পথই যে রবীন্দ্রনাথের মত ও পথ হয়ে উঠেছিল সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। উত্তেজনা বা হিংসাত্মক রাজনীতির দ্বারা যে আমাদের দেশের প্রকৃত কল্যাণ আসবে না সে কথা রবীন্দ্রনাথেরও বক্তব্য। তাই বয়কটের অঙ্গ হিসেবে দেশের ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-কলেজ বয়কট করে ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়াকে তিনি সমর্থন করেননি। দিশি কাপড় আর দিশি নুন-চিনির বিরোধ নিয়ে সেদিন বাংলাদেশের হাটে হাটে হিংসাত্মক রাজনীতির প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। আমাদের দেশের হাটবাজার গুলিকে নিতান্তই স্বদেশী করে তুলতে হবে—এই উদ্দেশ্যে বিদেশী পণ্যসামগ্রী পুড়িয়ে ফেলা বা সগুলির বিদায়ের বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রাথমিক ভাবে বয়কটকে স্বীকৃতি জানালেও তার হিংসাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক দিককে প্রত্যক্ষ করে তিনি

সে পথ থেকে সরে এসেছিলেন। বুঝেছিলেন, এতে এ দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে কি মূল্যই না চোকাতে হয়।

এ উপন্যাসে দেশোন্নয়নের এই পন্থা বা পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা আছে—যা নিখিলেশের আত্মকথনের মধ্যস্থতায় ব্যক্ত হয়েছে। যখন স্বদেশী আন্দোলনের বান প্রবল হয়ে ওঠে তখন নিখিলেশের আশেপাশের গ্রাম থেকে যে সকল শিক্ষার্থীরা কলকাতার স্কুলে-কলেজে পড়তো তাদের অনেকেই স্কুল-কলেজ ছেড়ে দেয়। তারা সন্দীপকে দলপতি করে স্বদেশী প্রচারে মেতে ওঠে। এদের অনেকেই কিন্তু নিখিলেশের অবৈতনিক বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রেন্স পাশ করে গেছে, যাদের নিখিলেশ কলকাতার পড়ার জন্য বৃত্তি পর্যন্ত প্রদান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন যজ্ঞের একটি বড় দিক ছিল পল্লীর মানুষের আত্মিক উন্নয়ন ঘটানোর জন্য একাধিক অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন। নিখিলেশের মধ্যে তারই প্রতিফলন স্পষ্টতই চোখে পড়ে। এ উপন্যাসে এবং রবীন্দ্রনাথের 'নামঞ্জুর' ছোটগল্পে শিক্ষার্থীদের স্কুল কলেজ ত্যাগ করে আন্দোলনে যোগ দেবার করুণ পরিণতি বর্ণনা করে আন্দোলনের নঞর্থক দিকটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যাইহোক, এই সকল ছাত্রের দল নিখিলেশের কাছে দাবি করে যে শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি সুতো র‍্যাপার ইত্যাদি একেবারে উঠিয়ে দিতে হবে। কিন্তু নিখিলেশ এতে আপত্তি জানায়। এর নিহিত উদ্দেশ্য না বুঝেই স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনায় লোকসানের প্রশ্ন তুলে নিখিলেশকেই মুনাফালোভী স্বার্থপর ব্যক্তি হিসেবে ইঙ্গিত করে তাকে অপমান করতে দ্বিধা করে না। অথচ নিখিলেশের প্রতিষ্ঠিত স্বদেশি স্কুলে পড়ে নিখিলেশের দেওয়া বৃত্তিতে তারা পড়াশোনা করেছে। উত্তেজনার রাজনীতি তাদের সেই চেতনা বা মুক্ত দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। তাই প্রকৃত দেশের স্বরূপ তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। পঞ্চুদের নিয়ে যে বৃহৎ ভারতবর্ষ, তার ছবি এদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

তার ছবিটিকে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই এঁকেছেন এ উপন্যাসে স্বল্প অবসরে। যে পঞ্চুর বছরে চারমাস একবেলার বেশি খাওয়ার জোটে না, যার খাবারের সিংহভাগ জুড়ে থাকে কেবল খালিপেটে জল আর বীজ-কলা, তার পক্ষে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করা ছিল অসম্ভব প্রায়। এরই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসেবে পঞ্চুর স্ত্রী যক্ষ্মায় ভুগে ভুগে মারা যায়। কিন্তু এ দেশের অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ বিধান দেয় এর জন্য পঞ্চুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সমাজ হিসেব করে বলেছে এর জন্য খরচ লাগবে তেইশ টাকা। যার স্ত্রীকে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে জমি জমা বিক্রি আর বাকি সব কিছু বন্ধক দিতে হয়েছে তার প্রতি এমন অমানবিক সামাজিক অত্যাচারের নির্দেশ তারাই দিতে পারে যারা কুসংস্কারের কূপমন্ডূকতায় নিমজ্জমান। তাই তারা দান দক্ষিণা আর ব্রাহ্মণ ভোজনের

অলজ্ঘ্য দাবি উত্থাপন করে বসে। এ সমাজকে উপেক্ষা করবে পঞ্চুর মত নিঃসহায় মানুষের সে ক্ষমতা বা সাহসই বা কোথায়।

তাই সমাজের অসঙ্গত দাবি মেটাতে গিয়ে পঞ্চু 'একেবারে অগাধ জলে পড়ল'। তার দুঃশ্চিন্তা আর যন্ত্রণাকে ভুলে থাকার জন্য কিছুদিন এক সাধুর চেলাগিরি করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে গৃহত্যাগী হতে হয়। কিন্তু শূন্য ঘরে ফেলে যায় চারটি অসহায় ছেলেমেয়েকে। ফলে তার ব্যবসাটিও বন্ধ হয়ে যায়। অসহায় সন্তানদের টানে পঞ্চুকে ঘরে ফিরতে হয় ঠিকই, কিন্তু ফিরে সে নিখিলেশের মাস্টার মশাইকে এক কঠিন প্রশ্ন জজ্ঞাসা করে বসে—" বলতে লাগল, মাস্টারবাবু, এগুলোকে দু-বেলা পেট ভরে খাওয়াব সে শক্তি নেই, আবার এদের ফেলে রেখে দৌড় মারব সে মুক্তিও নেই, এমন করে বেঁধে মার কেন? আমি কী পাপ করেছিলুম?"[৯২]

পঞ্চুর মত মানুষেরাই এ দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ। তাদের অভিজ্ঞানেই তো দেশের প্রকৃত পরিচয়। সেই দেশ ও তার মানুষ কি নির্মম মারের মুখোমুখি হয়ে চলেছে অবিরত প্রকৃত দেশপ্রেমিক দেশকর্মী নিখিলেশ ও তার মাস্টারমশাইরাই নিরাসক্ত নির্মোহ চোখে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। দেশের প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে যাদের কোন যোগ নেই, যারা কেবল উত্তেজনার তত্ত্বের উপর পালিশ চড়ায় তাদের পক্ষে দেশের এ স্বরূপ বোঝা কখনোই সম্ভব নয়। তাই কেবল তাদের মতই অবিবেচকের পক্ষেই সম্ভব বয়কটের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া, পঞ্চুদের অধিক দামে দেশী পণ্য ক্রয়ে নির্মম নিষ্ঠুর ভাবে বাধ্য করা। তাই দেশের স্বার্থের প্রশ্ন তুললে নিখিলেশের মাস্টারমশাই ছাত্রদের যে প্রত্যুত্তর দিয়েছেন সেদিনের বয়কটপন্থী রাজনীতিবিদদের তাই-ই ছিল রবীন্দ্রকৃত যোগ্য সমালোচনা—

"মাস্টারমশাই তাদের কথা চাপা দিয়ে বললেন, দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই সমস্ত মানুষই তো। তা, তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর, আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ, এরা সইবে কেন, আর এদের সইতে দেব কেন?

তারা বললে, আমরা নিজেরাও তো দিশি নুন, দিশি চিনি, দিশি কাপড় ধরেছি।

তিনি বললেন, তোমাদের মনে রাগ হয়েছে, জেদ হয়েছে, সেই নেশায় তোমরা যা করছ খুশি হয়ে করছ। তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু পয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ, তোমাদের সেই খুশিতে ওরা বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু ওদের তোমরা যা

করাতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের উপরে। ওরা প্রতিদিনই মরণ-বাঁচনের টানাটানিতে পড়ে ওদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ছে কেবলমাত্র কোনোমতে টিকে থাকবার জন্যে—ওদের কাছে দুটো পয়সার দাম কত সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না—ওদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা কোথায়? জীবনের মহলে বরাবর তোমরা এক কোঠায়, ওরা আর-এক কোঠায় কাটিয়ে এসেছে; আজ তোমাদের দায় ওদের কাঁধের উপর চাপাতে চাও, তোমাদের রাগের ঝাল ওদের দিয়ে মিটিয়ে নেবে? আমি তো একে কাপুরুষতা মনে করি। তোমরা নিজে যত দূর পর্যন্ত পার করো, মরণ পর্যন্ত—আমি বুড়োমানুষ, নেতা বলে তোমাদের নমস্কার করে পিছনে পিছনে চলতে রাজি আছি। কিন্তু ঐ গরিবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয়পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার।”[৯৩]

এ একেবারেই রবীন্দ্রনাথের কথা। ‘কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—“মাতানোর এবং খ্যাপানোর আন্দোলন এ রবীন্দ্রনাথের কোনো শ্রদ্ধা কখনো নেই—তিনি চান আত্মশোধন, তিনি চান আত্মগঠন। তাঁর বিশ্বাস, হাজার যুগের সংস্কারে যারা আচ্ছন্ন, তাদের উত্তেজনার মদিরা পান করিয়ে ছোটানো যায় বটে, কিন্তু সে উদ্যম প্রায়শঃ উপদ্রব এবং শক্তির অপব্যয় মাত্র। ইংরেজের অত্যাচারকে ঘৃণা করা যায়—কিন্তু ইংরেজকে ঘৃণা করবার অপবুদ্ধি এবং জাতিবৈর দেশকে রসাতলে নিয়ে যাবে। দেশের মানুষকে কাপড় যোগাবার শক্তি নেই, অথচ বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে দরিদ্র ব্যবসায়ীর সর্বনাশ করব এবং জনসাধারণকে উলঙ্গ করে রাখব—এই স্বাদেশিকতা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। আর বিপ্লববাদ? রক্তের পথ তাঁর কাছে চিরদিন ঘৃণ্য—ও এক বীভৎস পাপচক্র—যা এক অন্যায়ের প্রতিকার করতে গিয়ে সহস্র অন্যায়কে আহ্বান করে আনে।”[৯৪]

দেশের অধিকাংশ মানুষ যে সেদিন বয়কটের রাজনীতিকে সমর্থন করেনি তার মূলেই ছিল দেশের প্রাণের সঙ্গে এর সংযোগহীনতা। নিখিলেশ স্বদেশীদের কথা মনে রেখে কিন্তু যথাসাধ্য ত্যাগস্বীকার করেছে। দিশি মিল থেকে দিশি সুতো এনে তার হাটে রেখেছে, অন্য এলাকার হাটেও পাঠিয়েছে। কিন্তু সে সুতো কেউ কেনেনি বলে বয়কটপন্থী ছাত্ররা দাবি করেছে। নিখিলেশ স্পষ্টতই জানিয়েছে—“ সে আমার দোষ নয়, আমার হাটের দোষ নয়; তার একমাত্র কারণ সমস্ত দেশ তোমাদের ব্রত নেয় নি।”[৯৫] কারণ সেদিন যারা এ ব্রত নিয়েছিল তারা বিব্রত করবার ব্রতই নিয়েছিল। জমিদার স্বয়ং নিখিলেশকে এর জন্য কতটা বিব্রত হতে হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে মাস্টারমশাই জানিয়েছেন—

“ দিশি মিল থেকে নিখিলের সেই সুতো নিখিলকেই কিনতে হচ্ছে, নিখিলই সেই সুতোয় জোলাদের দিয়ে কাপড় বোনাচ্ছে, তাঁতের ইস্কুল খুলে বসেছে, তার পরে বাবাজির যে-রকম

ব্যবসাবুদ্ধি তাতে সেই সুতোয় গামছা যখন তৈরি হবে তখন তার দাম দাঁড়াবে কিংখাবের টুকরোর মতো, সুতরাং সে গামছা নিজেই কিনে উনি ওঁর বসবার ঘরের পর্দা খাটাবেন, সে পর্দায় ওঁর ঘরের আবরু থাকবে না; ততদিনে তোমাদের যদি ব্রত সাঙ্গ হয় তখন দিশি কারুকার্যের নমুনা দেখে তোমারাই সব চেয়ে চেঁচিয়ে হাসবে—আর, কোথাও যদি সেই রঙিন গামছার অর্ডার এবং আদর মেলে সে ইংরেজের কাছে।"[৯৬]

তাই নিছক জাতিবিদ্বেষ বা ইংরেজ বিদ্বেষের উত্তেজনার পথে যে এদেশের কল্যাণ সাধিত হবে না সেকথা রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। তিনি যাঁদের বলেছিলেন 'বড় ইংরেজ' তাঁদের সাহায্য গ্রহণে তিনি দ্বিধাহীন ছিলেন—কিন্তু কখনোই নিজের দেশের কৃষ্টি বা ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে নয়। এ কারণে অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজ আনুগত্যের হীন কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে। তাতে রবীন্দ্রনাথ কর্ণপাত করেননি। শিলাইদহ কিংবা শান্তিনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন যজ্ঞে কিন্তু ইংরেজেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। এ বিষয়ে লিওনার্ড এলম্‌হার্স্টের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এ উপন্যাসে বিমলার আত্মকথনে ধরা পড়েছে নিখিলেশের অনুরূপ মানসটি—

" এই সময়ে সকলের চোখে পড়ল আমার স্বামীর এলাকা থেকে বিলিতি নুন, বিলিতি চিনি, বিলিতি কাপড় এখনো নির্বাসিত হয় নি। এমন-কি, আমার স্বামীর আমলারা পর্যন্ত এই নিয়ে চঞ্চল এবং লজ্জিত হয়ে উঠতে লাগলো। অথচ কিছুদিন পূর্বে আমার স্বামী যখন এখানে স্বদেশী জিনিসের আমদানি করেছিলেন তখন এখানকার ছেলেবুড়ো সকলেই তা নিয়ে মনে মনে এবং প্রকাশ্যে হাসাহাসি করেছিল। দিশি জিনিসের সঙ্গে যখন আমাদের স্পর্ধার যোগ ছিল না তখন তাকে আমরা মনেপ্রাণে অবজ্ঞা করেছি। এখনো আমার স্বামী তাঁর সেই দিশি ছুরিতে দিশি পেন্সিল কাটেন, খাগড়ার কলমে লেখেন, পিতলের ঘটিতে জল খান এবং সন্ধ্যার সময়ে শমাদানে দিশি বাতি জ্বালিয়ে লেখাপড়া করেন; কিন্তু তাঁর এই অত্যন্ত সাদা ফিকে রঙের স্বদেশীতে আমরা মনের মধ্যে কোনো রস পাই নি। বরঞ্চ তখন তাঁর বসবার ঘরে আসবাবের দৈন্যে আমি বরাবর লজ্জা বোধ করে এসেছি, বিশেষত বাড়িতে যখন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা আর-কোনো সাহেব-সুবোর সমাগম হত। আমার স্বামী হেসে বলতেন, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি অত বিচলিত হচ্ছ কেন?

আমি বলতুম, ওরা যে আমাদের অসভ্যউজবুক মনে করে যাবে।

তিনি বলতেন, তা যখন মনে করবে তখন আমিও এই কথা মনে করব ওদের সভ্যতা চামড়ার উপরকার সাদা পালিশ পর্যন্ত, বিশ্বমানুষের ভিতরকার লাল রক্তধারা পর্যন্ত পৌঁছয় নি।"[৯৭]

এ উপন্যাসে অপর একটি ঘটনার মধ্যেও নিখিলেশের অনুরূপ মানসিকতার প্রতিফলন স্পষ্ট। মিস গিল্‌বির প্রতি নিখিলেশের আচরণে এর প্রমাণ মেলে। বিমলা মিস গিল্‌বিকে শিক্ষিকার দায়িত্ব থেকে ছাড়িয়ে দিতে চাইলে নিখিলেশ বলেছে—"...দেখো, মিস গিল্‌বিকে কেবলমাত্র ইংরেজ বলে ঝাপসা করে দেখতে আমি পারি নে। এতদিনের পরিচয়েও কি ঐ নামের বেড়াটা ঘুচবে না? ও যে তোমাকে ভালোবাসে।"[৯৮] নিছক জাতিবিদ্বেষের সঙ্কীর্ণতা দেশের মানুষকে নিজেদের প্রকৃত কল্যাণচেতনা থেকে কত দূরে টেনে নিয়ে যায় তার একটি পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে রেখেছেন মিস গিল্‌বিকে কেন্দ্র করে ঘটা একটি ঘটনার বর্ণনার মধ্যস্থতায়—

" মিস গিল্‌বি রয়ে গেল। একদিন গির্জেয় যাবার সময় পথের মধ্যে আমাদেরই একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছেলে তাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে অপমান করলে। আমার স্বামীই এতদিন সেই ছেলেকে পালন করেছিলেন; তিনি তাকে তাড়িয়ে দিলেন। এই নিয়ে ভারি একটা গোল উঠল। সেই ছেলে যা বললে সবাই তাই বিশ্বাস করলে। লোকে বললে, মিস গিল্‌বিই তাকে অপমান করেছে এবং তার সম্বন্ধে বানিয়ে বলেছে। আমারও কেমন মনে হল, সেটা অসম্ভব নয়। ছেলেটার মা নেই, তার খুড়ো এসে আমাকে ধরলে। আমি তার হয়ে অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোনো ফল হল না।

সেদিনিকার দিনে আমার স্বামীর এই ব্যবহার কেউ ক্ষমা করতে পারলে না। আমিও না। আমি মনে মনে তাঁকে নিন্দাই করলুম। এইবার মিস গিল্‌বি আপনিই চলে গেল। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে জল পড়ল, কিন্তু আমার মন গলল না। আহা, মিথ্যে করে ছেলেটার এমন সর্বনাশ করে গেল গো! আর, অমন ছেলে! স্বদেশীর উৎসাহে তার নাওয়া-খাওয়া ছিল না। আমার স্বামী নিজের গাড়ী করে মিস গিল্‌বিকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। সেটা আমার বড়ো বাড়াবাড়ি বোধ হল। এই কথাটা নিয়ে নানা ডালপালা দিয়ে কাগজে যখন গাল দিলে আমার মনে হল, এই শাস্তি ওর পাওনা ছিল।"[৯৯]

মিস গিল্‌বির প্রতি যে বিদ্বেষ তা কত সঙ্কীর্ণ, কতটা অমানবিক নিখিলেশ বুঝেছিল। অথচ বিশ্বের সীমানা ভাঙার যুগে চেতনার স্বাধীনতা নিতান্ত আবশ্যক ছিল। এর উপযোগিতাকে উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন যজ্ঞে পল্লীর মানুষের আত্মিক উন্নতির অন্যতম মাধ্যম হিসেবে চেতনার স্বাধীনতা আনয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ উপন্যাসেও নিখিলেশ একই ভাবে বলেছে—" মা যেমন নিজের গয়না দিয়ে তার প্রত্যেক মেয়েকে সাজিয়ে দেয়, আজ তেমনি এমন একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। আজ আমাদের খাওয়াপরা চলাফেরা ভাবাচিন্তা সমস্তই সমস্ত-পৃথিবীর যোগে। আমি তাই মনে করি এটা প্রত্যেক জাতিরই সৌভাগ্যের যুগ—এই সৌভাগ্যকে অস্বীকার করা বীরত্ব নয়।"[১০০]

আসলে নিখিলেশের এই মানসিকতার মধ্যে আছে এক ধরণের আন্তর্জাতিকতাবোধের প্রকাশ—সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধ থেকে আত্ম-অন্বেষণের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর আন্তর্জাতিকতাবোধে উত্তরণ। গোরা, শচীশ হয়ে নিখিলেশ পর্যন্ত সেই একটি ক্রমবিকাশের ধারাকে আমরা স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ করি। শঙ্খ ঘোষ জানিয়েছেন—

“......গল্পের দ্বিতীয়ভাগে হঠাৎ একটা বড়ো জায়গা পেতে থাকে পঞ্চু : ‘সে যেন বাংলার সমস্ত গরীব রায়তের প্রতিমূর্তি।’ এই পঞ্চুর মধ্য দিয়ে যেন গোরার জগতে ফিরে আসছি আমরা। গোরারই মতো নিখিলেশকে ভাবতে হয়, ‘তখন যে প্রকাণ্ড তামসিকতা একদিকে উপবাসে কৃশ, অজ্ঞানে অন্ধ, অবসাদে জীর্ণ, আর একদিকে মুমূর্ষুর রক্তশোষণে স্ফীত হয়ে আপনার অবিচলিত জড়ত্বের তলায় ধরিত্রীকে পীড়িত করে পড়ে আছে, শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে।’ কিন্তু কীভাবে ঘটবে এ লড়াই? বহু বছর জুড়ে দেশের সমস্ত কাজই যখন বাকি পড়ে আছে, তখন কোনো দ্রুত নিষ্পত্তিতে হাতে হাতে ফল পাবার আশা করা মূঢ়তা। উত্তেজনার কড়া মদ খেয়ে দেশের কাজের নেশায় মেতে ওঠাকে ঘৃণা করে নিখিলেশ, ‘বন্দেমাতরম’ ডাকের সম্মোহনের চেয়ে, দেশকে মা ভাবার চেয়ে, অনেক বেশি জরুরি তার কাছে ‘দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে’ তার সেবা করা। কিন্তু সন্দীপেরা বলে, উত্তেজনা দরকার। কেন না আজকের দিনের ফলটাই চাই, সেই ফলটাই তার। আর নিখিলেশ বলে যে তার চাই কালকের দিনের ফল, কেননা সেই ফল সকলের দেশকে তার ভিতর থেকে জাগিয়ে তুলবার যে ধৈর্যময় সাধনা চাই, ‘আত্মশক্তি’র সেই রবীন্দ্রনাথ ধ্বনিত হতে থাকেন তখন নিখিলেশের মধ্যে, সাময়িকের লোভ থেকে নিবৃত্ত হয়ে তখন সে বলে: ‘মানুষ মরণান্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু মরবে না এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় আছে; তাই আমি সব সইতে প্রস্তুত হয়েছি, জেনেশুনে বুঝেসুঝে’। এ কথার মধ্যেও দেশ আর বিমলা জড়িয়ে আছে বলেই নিখিলেশ বলতে পারে, ‘আমার মোহ ঘুচুক, আমার আবরণ কেটে যাক। ......যে দুঃখ বিশ্বের সেই তো আমার গলার হার হবে।’ বিশ্ব এখানে শুধু কথার কথা নয়, মানুষের কর্মক্ষেত্রকে একটা বড় জায়গা থেকে দেখবার জন্য মাস্টারমশায় যে নিখিলেশকে বলেছিলেন দেশেরও চেয়ে বড়ো মানুষের ইতিহাস, সেইখানেই আজ দাঁড়াতে চায় নিখিলেশ। গোরা তার ভারতবর্ষের মধ্যে মুক্তি পেয়েছিল, তার কল্পিত যে-ভারতবর্ষে সমস্ত ধর্ম এসে মিলেছে। আর নিখিলেশ যেন মুক্তি পেতে চলেছে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের মধ্যে, যে ইতিহাস তৈরি হয়ে উঠেছে ‘পৃথিবীর সমস্ত দেশকে সমস্ত জাতকে নিয়ে।’”[১০১]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালে দেখেছিলেন উগ্র হিন্দুত্ববাদী জাতি বিদ্বেষই দেশনেতাদের দেশসেবার আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ধর্মকে তাঁরা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। নরনারায়ণের সেবার নামে তাঁরা সঙ্কীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে

চলেছে। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা তাঁদের ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে দূরে এনে ফেলেছে। এই অধর্মের পথ বেয়ে অসত্যের পথ বেয়ে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাধনা চলেছে সুদূর ভবিষ্যতে একদিন যে এর মূল্য শোধ করতে হবে একথা রবীন্দ্রনাথের মত নিখিলেশও বলেছে। নিখিলেশের দেশ ভাবনার মধ্যে আইডিয়ালিজমের যে কল্পনাবৃত্তি কাজ করুক না কেন বর্তমান ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব যে কতটা তা অনুধাবন করতে আমরা সক্ষম। নিখিলেশ-বিমলা-সন্দীপের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দেশেহিতের সত্যপথের নির্দেশ দিয়ে লিখেছিলেন—

" আমি তোমাকে সত্য বলছি সন্দীপ, দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য ব'লে চালাতে চাও তখন আমার হৃদয়ে লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারি নে। আমি যদি নিজের স্বার্থসাধনের জন্যে চুরি করি তাহলে নিজের প্রতি আমার যে সত্য প্রেম তারই কি মূলে ঘা দিই নে? চুরি করতে পারি নে যে তাই। সে কি বুদ্ধি আছে ব'লে না নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে?

ভিতরে ভিতরে আমার রাগ হচ্ছিল। আমি আর থাকতে পারলুম না; আমি বলে উঠলুম, ইংরেজ ফরাসী জর্মন রুশ এমন কোন্ সভ্যদেশ আছে যার ইতিহাস নিজের দেশের জন্য চুরির ইতিহাস নয়?

সে চুরির জবাবদিহি তাদের করতে হবে, এখনো করতে হচ্ছে। ইতিহাস এখনো শেষ হয়ে যায় নি।

সন্দীপবাবু বললেন, বেশ তো আমরাও তাই করব। চোরাই মালে আগে ঘরটা বোঝাই করে তার পরে ধীরে সুস্থে দীর্ঘকাল ধরে আমরাও জবাবদিহি করব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে বললে এখনো তারা জবাবদিহি করছে সেটা কোথায়?

রোম যখন নিজের পাপের জবাবদিহি করছিল তখন তা কেউ দেখতে পায় নি। তখন তার ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। বড়ো বড়ো ডাকাত-সভ্যতারও জবাবদিহির দিন কখন আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু একটা জিনিস কি দেখতে পাচ্ছ না—ওদের পলিটিক্সের ঝুলি-ভরা মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেস্টিজ্ রক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান, এই যে-সব পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে এর ভার কি কম? আর, এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে না? দেশের উপরেও যারা ধর্মকে মানছে না, আমি বলছি, তারা দেশকেও মানছে না।"[১০২]

মানবতার ধর্মকে, সত্য ধর্মকে কলুষিত করে যে জাতির উন্নতি হতে পারে না, এ কথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি সত্য ও ধর্মের পথভ্রষ্ট

রাজনৈতিক স্বাধীনতায় আস্থা জ্ঞাপন করেননি। তাঁর দেশোন্নয়নের ভাবনায় মানবতা ও প্রগতির এক শান্তিময় সহাবস্থানকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগে যে চরমপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে তার নীতি ও আদর্শ এর বিপরীত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ তার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে তাই সন্দীপের দেশ উন্নয়নের ভাবনার অন্তর্লীন প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, আর ধর্মচেতনার বাগাড়ম্বর-সর্বস্ব উত্তেজনাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন। দেশের প্রগতিতে নারীশক্তির উপযোগিতার কথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন। কিন্তু সন্দীপ বলেছে—

" ......আজকের দিনে আমাদের মেয়েরাই আমাদের দেশকে বাঁচাবে। আজ আমাদের ধর্মকর্ম-বিচারবিবেকের দিন নয়, আজ আমাদের নির্বিচার নির্বিকার হয়ে নিষ্ঠুর হতে হবে, অন্যায় করতে হবে, আজ পাপকে রক্তচন্দন পরিয়ে দিয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করে নিতে হবে। আমাদের কবি কী বলেছে মনে নেই?—

এসো পাপ, এসো সুন্দরী!

তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে

ফিরুক সঞ্চরি।

অকল্যাণের বাজুক শঙ্খ,

ললাটে লেপিয়া দাও কলঙ্ক,

নির্লাজ কালো কলুষপঙ্ক

বুকে দাও প্রলয়ংকরী!

আজ ধিক্ থাক্ সেই ধর্মকে যা হাসতে হাসতে সর্বনাশ করতে জানে না।

এই বলে তিনি মেজের উপর দু-বার জোরে লাথি মারলেন—কার্পেট থেকে অনেকখানি নিদ্রিত ধুলো চমকে উপরে উঠে পড়ল। দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ যা-কিছুকে বড়ো বলে মেনেছে এক মুহূর্তে তিনি তাকে অপমান করে এমন গৌরবে মাথা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আবার হঠাৎ গর্জে উঠলেন, যে আগুন ঘরকে পোড়ায়, যে আগুন বাহিরকে জ্বালায় আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি সেই আগুনের সুন্দরী দেবতা, তুমি আজ আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জয় তেজ দাও, আমাদের অন্যায়কে সুন্দর করো।"[১০৩]

দেশোন্নয়নের এই মিথ্যার বেসাতি থেকে, এই উত্তেজনা থেকে রবীন্দ্রনাথের মতো নিখিলেশও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য লোকহিতকারীদের যে নিরাসক্ত নিস্পৃহ মনের প্রয়োজন, যে উদার মানবতাবোধের বৃহৎ প্রসৃতির প্রয়োজন তা রবীন্দ্রনাথ সমকালীন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের অনেকের মধ্যেই দেখতে পাননি। নিখিলেশের মতই তিনি তাদের মধ্যে দেশ সেবার নামে এক প্রকার নেশাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব যে কী হতে পারে তার নির্দেশ দিয়েছে নিখিলেশ—

"...আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার ক'রে মা ব'লে দেবী ব'লে মন্ত্র পড়ে যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়, তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি। সত্যেরও উপরে কোনো একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ। চিত্তকে মুক্ত করে দিলেই আমরা আর বল পাই নে। হয় কোনো কল্পনাকে নয় কোনো মানুষকে, নয় ভাটপাড়ার ব্যবস্থাকে আমাদের অসাড় চৈতন্যের পিঠের উপর সওয়ার করে না বসালে সে নড়তে চায় না। যতক্ষণ সহজ সত্যে আমরা স্বাদ পাই নে, যতক্ষণ এইরকম মোহে আমাদের প্রয়োজন আছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে স্বাধীনভাবে নিজের দেশকে পাবার শক্তি আমাদের হয় নি। ততক্ষণ, আমাদের অবস্থা যেমনি হোক, হয় কোনো কাল্পনিক ভূত নয় কোনো সত্যিকার ওঝা, নয় একসঙ্গে দুইয়ে মিলে আমাদের উপর উৎপাত করবেই।"[১০৪]

অথচ সেকালে দেশের কল্যাণকর্মে যারা নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন তাদের অনেকেই দেশকে এভাবে মোহমুক্ত চিত্তে সাদাভাবে দেখতে পারেননি, ত্যাগের কঠিন পথকে বেছে নিতে পারেননি। আইডিয়ার ফানুস কিংবা ধর্মের মোহযুক্ত দৃষ্টি তাদের লক্ষ্যকে ঘোলাটে করে তুলেছিল। সন্দীপ নিজে সেকথা স্বীকার করে বলেছে—"ভারতবর্ষে আমার জন্ম; সাত্ত্বিকতার বিষ রক্তের মধ্যে থেকে একেবারে মরতে চায় না। আপনাকে বঞ্চিত করার পথে চলা যে পাগলামি এ কথা মুখে যতই বলি এটাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই। এই জন্য আমাদের দেশে আজকাল অদ্ভুত ব্যাপার চলছে। ধর্মের ধুয়ো দেশের ধুয়ো দুটিকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি—ভগবদ্‌গীতা এবং বন্দেমাতরং আমাদের দুইই চাই—তাতে দুটোর কোনোটাই যে স্পষ্ট হতে পারছে না, তাতে একসঙ্গেই গড়ের বাদ্য এবং সানাই বাজানো চলছে, এ আমরা বুঝছি নে।"[১০৫]

কিন্তু সেই বোধকে ধাক্কা দিয়ে নিখিলেশকে সজাগ করে রেখেছিল দেশ সম্পর্কে তার মোহমুক্ত দৃষ্টি। পঞ্চুর জীবনচর্যার যেটুকু অংশ নিখিলেশের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে তাতে এই দেশ ও তার জনতা সম্পর্কে একটি নিরাসক্ত বোধ গড়ে

উঠেছে তার মধ্যে। পঞ্চু নিখিলেশের মাস্টারমশায়ের একজন ভক্ত। কেমন করে তার সংসার চলে তা নিখিলেশ ভালো করে জানতো। রোজ ভোরে উঠে একটা চাঙারিতে পান ও দোক্তা রঙিন সুতো আয়না চিরুনি প্রভৃতি চাষার মেয়েদের লোভনীয় জিনিস নিয়ে হাঁটুজল ডিঙিয়ে বিল পেরিয়ে সে নমঃশূদ্রদের পাড়ায় নিয়ে যেত। সেখানে তার বিনিময়ে সে কিছু ধান পেত। তাতে পয়সার চেয়ে তার কিছু বেশি লাভ থাকতো। যে দিন সকাল সকাল সে ফিরে আসতে পারতো সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাতাসাওয়ালার দোকানে বাতাসা কাটতে যেত। সেখান থেকে ফিরে বাড়ি এসে শাঁখা তৈরিতে বসতো সে। সে কাজে তার প্রায় রাত দুপুর হয়ে যেত। এমন অমানুষিক পরিশ্রম করেও বছরের মধ্যে কেবল কয়েকমাস ছেলেপুলে নিয়ে দু'বেলা দু-মুঠো খাওয়া চলে। তাও আবার খেতে বসেই সে প্রথমে এক ঘটি জল খেয়ে পেট ভরিয়ে নিত। তার খাদ্যের একটি মস্ত অংশ ছিল সস্তা দরের বীজ-কলা। বছরে অন্তত চার মাস তার এক বেলার বেশি খাওয়া জোটে না।

দেশের এই রূপই তার প্রকৃত রূপ, দেশের প্রাণকেন্দ্র পল্লীর এবং পল্লীবাসীর বাস্তব জীবনসত্য। আইডিয়া কিংবা ধর্মের মোহকে খসিয়ে ফেলে খোলাচোখে এই দেশের স্বরূপকে অন্তরে উপলব্ধি করলে তার বাস্তবতার হদিস পাওয়া যেতে পারে। প্রতিবেশী জমিদার হরিশ কুণ্ডুর প্রজা পঞ্চু ঝুড়িতে করেকয়েকটা ঝুনো নারকেল নিয়ে এসে গড় হয়ে যখন নিখিলেশকে প্রণাম করেছিল তখল নিখিলেশ ভেবেছে এ বুঝি বা বকশিসের ছলে অন্ন সংগ্রহের নিরুপায় পন্থা। কিন্তু পঞ্চু জানিয়েছে, সে টানাটানির সময় হুজুরের সরকারী বাগান থেকে কয়েকটা নারকেল চুরি করেছি তা আজ শোধ দিতে এসেছে। পঞ্চুর জীবনের বাস্তবতার মাঝে দেশের প্রতি এ হেন দায়বদ্ধতা যে বেঁচে আছে তা নিখিলেশের মনকে নিয়ে নিয়ে যায় স্বতন্ত্র এক উপলব্ধিতে—" আমিয়েল্স্ জর্নাল পড়ে আজ আমার কোনো ফল হত না, কিন্তু পঞ্চুর এই এক কথায় আমার মন খোলসা হয়ে গেল। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখ-দুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন; তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসিকান্নার পরিমাপ করি।"[১০৬]

নিখিলেশ এ কথা যতটা ভেবেছে, এ বিষয়ে তার আইডিয়া যতটা না স্ফীত হয়ে উঠেছে, ততটা সাধারণের সঙ্গে মিলতে পারেনি সে—যতটা পেরেছে তার মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথ বাবু। পঞ্চু বা তার মাসির সমস্যার সমাধানে তাই মাস্টারমশাই যতটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং যে পথের অনুসরণকারী নিখিলেশের মধ্যে সেই স্বতঃস্ফূর্ততা বা পথানুসরণের প্রবণতা তেমন চোখে পড়ে না। এই বিচ্ছিন্নতাকে রবীন্দ্রনাথ সেদিনের রাজনৈতিক কর্মী বা দেশনেতাদের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ভূদেব চৌধুরী একারণেই তাঁর 'রবীন্দ্র উপন্যাস: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—" নিখিলেশ একদিন বলেছিল, 'আমার

ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোক যত নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে।' তবু তাদের তুলে ধরবার জন্যে তাদের কাছে অবধি পৌঁছাতে পারে না সে। যাদের জন্যে প্রাণ দিতে পারে অনায়াসে, নিখিলেশ তাদের প্রাণের সঙ্গে মিলতে পারে না—ঐখানে তাঁর ট্র্যাজেডি, 'স্বদেশি' তথা স্বদেশী-উত্তর 'মডার্ণ' কালেরও। 'ঘরে বাইরে' এই অনুভবেরই বার্তাবহ। চন্দ্রনাথবাবু যে পথে পঞ্চুর বানানো মাসিকে বিদায় করতে পারেন, সে পথ এদের কারো নয়—না সন্দীপের, না নিখিলেশের—ব্যক্তিত্বমাত্রজীবী আইডিয়া-সর্বস্ব ব্যবচ্ছিন্ন মডার্ণ এলিট মানসিকতার। সন্দীপও এলিট বই কী? আগে বলেছি, সামর্থ্যে না হোক উগ্র প্রত্যাশায়।"[১০৭]

বিপুল মানুষের জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিখিলেশ দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য দানের কথা ভেবেছে। পঞ্চুকে কিছু দান করার কথা নিখিলেশের মনে উদিত হয়েছে। কিন্তু দানের দ্বারা যে এ দেশের মানুষের বিপুল পরিমাণ অভাব বা দারিদ্র্যকে দূরীভূত করা যায় না তা রবীন্দ্রনাথ নিজেও বার বার বলেছেন। তাই তিনি তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মযজ্ঞে পল্লীর মানুষকে নিজের আত্মশক্তি বা কর্মক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বার বার সওয়াল করেছেন এবং সে ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন। এ উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার ভাবনাকেই গেঁথে তুলেছেন কাহিনীর আধারে। নিখিলেশের মাস্টারমশায়ের মধ্যে অনুরূপ ভাবনার প্রতিস্থাপনকেই লক্ষ্য করা যায়। নিখিলেশ নিজেই জানিয়েছে—" আমি এক সময়ে একে কিছু দান করতে চেয়েছিলুম। মাস্টারমশায় আমাকে বললেন, তোমার দানের দ্বারা মানুষকে তুমি নষ্ট করতে পারো না। আমাদের বাংলাদেশে পঞ্চু তো একলা নয়। সমস্ত দেশের স্তনে আজ দুধ শুকিয়ে এসেছে। সেই মাতার দুধ তুমি তো অমন করে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে জোগাতে পারবে না।"[১০৮]

এ দেশের মানুষকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা নিখিলেশের মাস্টারেরও জীবনাদর্শ। তাই পঞ্চুর ফেলে যাওয়া চার চারটি ছেলেমেয়েকে পঞ্চুর অনুপস্থিতে নিজের গৃহে এনে আশ্রয় দিয়েছেন। এর পরে পঞ্চু ফিরে এসে মাস্টারের ঘরে জায়গা নিয়ে যখন আর নড়তে চাইল না তখন মাস্টারমশায়ই পঞ্চুকে ডেকে তাকে বাড়ি যাওয়ার কথা বলেন। নইলে তাদের ঘর-দুয়ার গুলি নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আসলে এর পিছনে নিহিত ছিল মাস্টারমশায়ের এক বিশেষ মানসিকতা—পরনির্ভরশীলতা নয়, পঞ্চু নিজের আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হোক। এর জন্য মাস্টারমশায় প্রাথমিক ভাবে পঞ্চুকে খানিকটা অর্থ সাহায্য করার কথাও জানান।কিন্তু এও জানান 'তুমি কাপড়ের ব্যবসা করে অল্প অল্প করে শোধ দেবে। কারণ দয়াধর্ম নয়, এর পিছনেও ছিল এক বিশেষ উদ্দেশ্য, মানুষকে সম্মান করা, তাকে ছোট না করা-" প্রথমটা পঞ্চুর মনে একটু খেদ হল; মনে করলে দয়াধর্ম বলে একটা জিনিস জগতে নেই। তার পরে টাকাটা নেবার বেলায় মাস্টারমশায় যখন হ্যান্ডনোট লিখিয়ে

নিলেন তখন ভাবলে, শোধ তো করতে হবে, এমন উপকারের মূল্য কী! মাস্টারমশায় কাউকে বাইরের দিকে দান করে ভিতরের দিকে ঋণী করতে নিতান্ত নারাজ; তিনি বলেন, মনের ইজ্জত চলে গেলে মানুষের জাত মারা যায়।

হ্যান্ডনোটে টাকা নেওয়ার পর পঞ্চু মাস্টারমশায়কে খুব বড় করে প্রণাম করতে আর পারলে না, পায়ের ধুলোটা বাদ পড়লো। মাস্টারমশায় মনে মনে হাসলেন, তিনি প্রণামটা খাটো করতে পারলেই বাঁচেন। তিনি বলেন, আমি শ্রদ্ধা করব, আমাকে শ্রদ্ধা করবে, মানুষের সঙ্গে এই সম্বন্ধই আমার খাঁটি ভক্তি আমার পাওনার অতিরিক্ত।”[১০৯]

কিন্তু পল্লীর মানুষ লোকহিতের এই নিহিত মর্মার্থ অনুধাবনে অসমর্থ ছিল। তাদের মনের সঙ্কীর্ণতা , দেশ সম্বন্ধে ধারণার অস্পষ্টতা এর জন্য দায়ী ছিল। তাই তারা সেদিন পল্লী হিতকর্মে নিয়োজিত প্রকৃত দেশকর্মীর গঠনমুখী কর্মপরিকল্পনাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। এ উপন্যাসেও পঞ্চু যখন মাস্টারমশায়ের দেওয়া অর্থকে অবলম্বন করে ব্যবসায় কিছুটা সফলতার মুখ দেখেছে তখন প্রথম কিস্তির সুদাসল শোধ দেওয়ার পর মাস্টারমশায়কে আর প্রণামটুকুও করেনি। কারণ পঞ্চু ভেবেছে ‘মাস্টারমশায়কে সে যে একদিন গুরু বলে ঠাউরেছিল, ভুল করেছিল; লোকটার কাঞ্চনের প্রতি দৃষ্টি আছে’। বোধের এই সঙ্কীর্ণতাকে দূর করার জন্য তাই রবীন্দ্রনাথের প্রধান শ্লোগান ছিল—‘give them education’। নিখিলেশের ব্যক্তিগত উদ্যোগে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের বন্দোবস্ত করার পিছনে দেশের মানুষের আত্মিক উন্নয়নের বিশেষ মানস-অভীপ্সাই কাজ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের পল্লীর উন্নয়নের জন্য দেশের জমিদার সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার কথা বলেছিলেন। তাদের ত্যাগস্বীকারের উপর দেশের তথা পল্লীর উন্নতি যে অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল সেকথা রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধে জানিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত ক’জন জমিদারই বা সেদিন দেশের স্বার্থে আত্মত্যাগের পন্থাকে অবলম্বন করেছিল! প্রতিবেশী জমিদার হরিশকুণ্ডুর মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাদের একটি ছবিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই সকল জমিদার তাদের নিজের জমিদারিতে স্বদেশী পণ্যের ক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ প্রজার উপর যে পীড়ন শোষণ চালিয়েছিলেন তারই একটি ছবিকে এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। জমিদার হরিশকুণ্ডু পঞ্চুকে একশ টাকা জরিমানা করে। তার কারণ—

“ও বিলিতি কাপড় বেচেছে। ও জমিদারকে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে বললে, পরের কাছে ধার-করা টাকায় কাপড় কখানা কিনেছে, এইগুলো বিক্রি হয়ে গেলেই ও এমন কাজ আর কখনো করবে না। জমিদার বললে সে হচ্ছে না, আমার সামনে কাপড়গুলো

পুড়িয়ে ফেল্, তবে ছাড় পাবি। ও থাকতে না পেরে হঠাৎ বলে ফেললে, আমার তো সামর্থ্য নেই, আমি গরীব; আপনার যথেষ্ট আছে, আপনি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। শুনে জমিদার লাল হয়ে উঠে বললে, হারামজাদা, কথা কইতে শিখেছ বটে—লাগাও জুতি। এই বলে একচোট অপমান তো হয়েই গেল, তারপরে এক-শো টাকা জরিমানা।-এরাই সন্দীপের পিছনে পিছনে চীৎকার করে বেড়ায়, বন্দেমাতরং! এরা দেশের সেবক!"[১১০]

এই ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পল্লী বা দেশের প্রকৃত কল্যাণের পথটিকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন। উত্তেজনা বা মতাদর্শ বা তত্ত্ব দিয়ে যে দেশের কল্যাণ সম্ভব নয়, দেশকে জানা বা বোঝা সম্ভব নয়, তা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। দেশোন্নয়নের কাজে নারী শক্তির সমবায়ের প্রয়োজনীয়তার কথা নিখিলেশ এর পূর্বেই জানিয়েছিল । সাংসারিক ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত নিখিলেশ দেশের যে বৃহৎ ক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে তার চোখের সামনে আমাদের দেশের প্রকৃত স্বরূপ এবং তারই প্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়নের ভাবী প্রতিচ্ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে —

" তার পরে মনে পড়ল, দারিদ্র্য এবং চাতুরীর ফাঁদে আটকা-পড়া পঞ্চু; সেই পঞ্চুকে যেন দেখলুম আজ হেমন্তের রৌদ্রে বাংলার সমস্ত উদাস মাঠ-বাট জুড়ে ঐ গোরুটার মতো চোখ বুজে পড়ে আছে—কিন্তু আরামে নয়, ক্লান্তিতে, ব্যাধিতে, উপবাসে। সে যেন বাংলার গরিব রায়তের প্রতিমূর্তি। দেখতে পেলুম পরম আচারনিষ্ঠ ফোঁটাকাটা স্থূলতনু হরিশ কুণ্ডু। সেও ছোটো নয়, সেও বিরাট, সে যেন বাঁশবনের তলায় বহুকালের বদ্ধ পচা দিঘির উপর তেলা সবুজ একটা অখণ্ড সরের মতো এ পার থেকে ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিষ-বুদ্‌বুদ্ উদ্‌গার করছে।

যে প্রকান্ড তামসিকতা এক দিকে উপবাসে কৃশ, অজ্ঞানে অন্ধ, অবসাদে জীর্ণ, আর-এক দিকে মুমূর্ষুর রক্তশোষণে স্ফীত হয়ে আপনার অবিচলিত জড়ত্বের তলায় ধরিত্রীকে পীড়িত করে পড়ে আছে, শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এই কাজটা মুলতুবি হয়ে পড়ে রয়েছে শত শত বৎসর ধরে। আমার মোহ ঘুচুক, আমার আবরণ কেটে যাক, আমার পৌরুষ অন্তঃপুরের স্বপ্নের জালে ব্যর্থ হয়ে জড়িয়ে পড়ে থাকে না যেন। আমরা পুরুষ, মুক্তিই আমাদের সাধনা, আইডিয়ালের ডাক শুনে সামনের দিকে ছুটে চলে যাব, দৈত্যপুরীর দেয়াল ডিঙিয়ে বন্দিনী লক্ষ্মীকে আমাদের উদ্ধার করে আনতে হবে। যে মেয়ে তার নিপুণ হাতে আমাদের সেই অভিযানের জয়পতাকা তৈরি করে দিচ্ছে সেই আমাদের সহধর্মিণী, আর ঘরের কোণে যে আমাদের মায়াজাল বুনেছে তার ছদ্মবেশ ছিন্ন করে তার মোহমুক্ত সত্যকার পরিচয় যেন আমরা পাই—তাকে আমাদের নিজেরই কামনার রসে-রঙে অপ্সরী সাজিয়ে তুলে যেন নিজের তপস্যা ভঙ্গ করতে না পাঠাই। আজ আমার

মনে হচ্ছে আমার জয় হবে; আমি সহজের রাস্তায় দাঁড়িয়েছি, সহজ চোখে সব দেখছি; আমি মুক্তি পেয়েছি, আমি মুক্তি দিলুম—যেখানে আমার কাজ সেইখানেই আমার উদ্ধার।”[১১১]

সন্দীপকে হীনরূপে চিহ্নিত করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক কর্মীর প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন বলে অনেকে মনে করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানস-অভীপ্সা যে তা ছিল না উপন্যাসে সেদিকের প্রতি স্পষ্ট দিকনির্দেশ আছে—

“.........মাস্টারমশায় একটু হেসে আমারদিকে চেয়ে বললেন, জান নিখিল? সন্দীপ অধার্মিক নয়, ও বকধার্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ; চাঁদই বটে, কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উল্টো দিকে গিয়ে পড়েছে।

আমি বললুম, সেইজন্যে চিরদিনই ওর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, কিন্তু ওর প্রতি আমার স্বভাবের আকর্ষণ আছে। ও আমার ক্ষতি করেছে, আরো করবে, কিন্তু ওকে আমি অশ্রদ্ধা করতে পারি নে।”[১১২]

নিখিলেশের আপত্তি কেবল যে পন্থা বা পদ্ধতিতে সন্দীপ ও তার দলবল আন্দোলন শুরু করেছে তার উপরেই। গরীব মানুষের কেনা বস্ত্র সামগ্রী পুড়িয়ে, হরিশ কুন্ডুর প্রজাদের বশ করে, নিখিলেশের পক্ষের আমলাদের নিজেদের দলে টেনে নিখিলেশ ও মাস্টারমশায়ের বিরুদ্ধে হীন চক্রান্ত করে সহিংস পথে যে স্বদেশী কর্মযজ্ঞের আয়োজন করে তাকে নিখিলেশ কিছুতেই সমর্থন জানায়নি। যাদের কাপড় পোড়ানোর খেলায় সন্দীপেরা মেতেছে তাদের হয়ে নালিশ করার দায়িত্ব নিয়েছে নিখিলেশ। সন্দীপেরা যে আন্দোলনে সেদিন নেমেছিল তার বাস্তবতা নিয়ে সেদিন তাদের নিজেদের মধ্যেই অনেক দ্বিধা অনেক প্রশ্ন ছিল। তাই সন্দীপকে ভাবতে হয়েছে—

“...... যার কাপড় পোড়াব তার জন্যে যদি দিশি কাপড় কিনে দিতে হয়, তার পরে আবার মামলা চলে, তা হলে তার টাকা পাই কোথায়? আর, পুড়তে পুড়তে বিলিতি কাপড়ের ব্যবসা যে গরম হয়ে উঠবে। নবাব যখন বেলোয়ারি ঝাড় ভাঙার শব্দে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ঘরে ঝাড় ভেঙে বেড়াত তখন ঝাড়ওয়ালার ব্যবসা খুব উন্নতি হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, সস্তা অথচ দিশি গরম কাপড় বাজারে নেই। শীত এসে পড়েছে, এখন বিলিতি শাল-র‍্যাপার-মেরিনো রাখব কি তাড়াব?”[১১৩]

এই দ্বিধা সত্ত্বেও গরিবের বাস্তব সমস্যাকে এরা গুরুত্ব দিতে চায়নি। যেন তেন প্রকারে এরা নিজেদের আইডিয়ালিজম্‌কেই এদের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। যুক্তি সাজিয়েছে, বিলিতি র‍্যাপার যখন ছিল না তখন চাষীর ছেলে যেমন মাথার উপর দিয়ে

দোলাই জড়িয়ে শীত কাটাত, তেমনি এখনো তারা সেভাবেই শীত কাটাবে। চক্রান্ত করে নিখিলেশের নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে বিলিতি কাপড় ও দ্রব্যসামগ্রী হাটে আনা বন্ধ করতে চেয়েছে। এর জন্য নায়েব এমনকি পুলিশ-প্রশাসনকেও ঘুষ দিয়ে অন্যায় পথে নেমেছে তারা। টাকার প্রয়োজনে অন্যায় পথে নেমেছে তারা—সন্দীপ কিংবা অমল উভয়েই। বিমলাকে অন্যায় ভাবে অর্থসংগ্রহে বাধ্য করেছে। আমাদের দেশের পরাধীনতা মুক্তির পথে বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পথে স্বদেশেরই এক শ্রেণীর সুবিধাবাজ মানুষ যে কতটা দায়ী ছিল তার একটি ছবিকে রবীন্দ্রনাথ এই অবসরে তুলে ধরেছেন উপন্যাসে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালে আর একটি জিনিসকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, দেশকে দেবীপ্রতিমার রূপে প্রত্যক্ষ করার প্রবণতা। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠে'র মধ্য দিয়ে এর প্রথম আভাস সূচিত হয়ে উঠেছিল। 'মা যা ছিলেন' আর 'মা যা হইয়াছেন'—এই বর্ণনা ছিল মূলতঃ বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের যথাক্রমে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা। আমাদের দেশে যে পূজার পথ কাটা আছে সেই পথেই আমাদের ভক্তির ধারাকে দেশের দিকে টেনে আনতে হবে—এমনটা ভেবেছে সন্দীপ। আমাদের দেশের দুর্গা-জগদ্ধাত্রীকে সে 'পোলিটিকাল দেবী' বই অন্য কোন কিছু ভাবতে পারেনি। মুসলমান শাসনকালে বাঙালি যে দেশশক্তির কাছ থেকে শত্রু জয়ের বর প্রার্থনা করেছিল এই দুই দেবী তারই দুই রকমের মূর্তি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশের বাচনিকতায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সত্যের পথকে ধর্মের মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন করলেতো দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলবে। দেবতা অপদেবতায় রূপান্তরিত হয়ে সারা দেশকে ধর্মের মোহ দ্বারা আবিষ্ট করবে।দেশের যে সীমাহীন দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অজ্ঞতার মত গভীর সমস্যাগুলি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সেগুলি দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে যাবে। নিখিলেশ সম্পর্কে সন্দীপ তাই বলেছে—"কল্পনার দিব্যদৃষ্টি নিখিলের একেবারেই অন্ধ হয়ে গেছে বলেই সে আমাকে অনায়াসে বলতে পারলে, মুসলমান-শাসনে বর্গি বলো, শিখ বলো, নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে ফল চেয়েছিল। বাঙালি তার দেবীমূর্তির হাতে অস্ত্র দিয়ে মন্ত্র পড়ে ফল কামনা করেছিল; কিন্তু দেশ দেবী নয়, তাই ফলের মধ্যে কেবল ছাগমহিষের মুণ্ডপাত হল। যেদিন কল্যাণের পথে দেশের কাজ করতে থাকব সেইদিনই যিনি দেশের চেয়ে বড়ো, যিনি সত্য দেবতা, তিনি সত্য ফল দেবেন।"[১১৪]

রবীন্দ্রনাথ এখানে 'সত্য দেবতা' অর্থে দরিদ্র নরনারায়ণের কথাই বলতে চেয়েছেন। কল্যাণের যথার্থ পথ বেয়েই এদের পূজার উপাচার নির্মিত হয়। এদের কল্যাণেই কিন্তু দেশের প্রকৃত কল্যাণ, দেশের সমৃদ্ধি। এদের আত্মশক্তির জাগরণেই দেশের প্রকৃত জাগরণ সম্ভব। কিন্তু সেদিনের রাজনৈতিক কর্মীরা রবীন্দ্রনাথের এই মত ও পথকে স্বীকার করেনি তাকে কবির আইডিয়া বলে চালাতে চেষ্টা করেছে। এমনকি দেশের এমন পরিস্থিতিতে দেশের সংবাদপত্রগুলির যে দায়বদ্ধতা ছিল তাও তারা বিস্মৃত হয়। তারা

ছোটকে বড়, বড়কে ছোট; সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলে চালাতে থাকে। এরই সার্বিক প্রতিক্রিয়ায় সেদিনের স্বদেশীরা দেশের মঙ্গলের নামে যে সন্ত্রাসবাদের আমদানি ঘটিয়েছিল তার পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশের আত্মকথনের মধ্যস্থতায়—

" আমার নামে কাগজে প্যারাগ্রাফ এবং চিঠি বেরোতে শুরু হয়েছে; শুনছি একটা ছড়া এবং ছবি বেরোবে তারও উদ্যোগ হচ্ছে। রসিকতার উৎস খুলে গেছে, সেই সঙ্গে অজস্র মিথ্যে কথার ধারাবর্ষণে সমস্ত দেশ একেবারে পুলকিত। জানে যে এই পঙ্কিল রসের হোরিখেলায় পিচকিরিটা তাদেরই হাতে; আমি ভদ্রলোক রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলেছি, আমার গায়ের আবরণখানা সাদা রাখবার উপায় নেই।

লিখেছে, আমার এলেকায় আপামর সাধারণ সকলেই স্বদেশীর জন্যে একেবারে উৎসুক হয়ে আছে, কেবল আমার ভয়েই কিছু করতে পারছে না, দুই-একজন সাহসী যারা দিশি জিনিস চালাতে চায় জমিদারি চালে আমি তাদের বিধিমতে উৎপীড়ন করছি। পুলিশের সঙ্গে আমার তলে তলে যোগ আছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমি গোপনে চিঠি-চালাচালি করছি এবং বিশ্বস্তসূত্রে খবরের কাগজ খবর পেয়েছে যে, পৈতৃক খেতাবের উপরেও স্বোপার্জিত খেতাব যোগ করে দেবার জন্যে আমার আয়োজন ব্যর্থ হবে না। লিখেছে, 'স্বনামা পুরুষো ধন্য, কিন্তু দেশের লোক বিনামার ফর্মাশ দিয়াছে, সে খবরও আমরা রাখি।' আমার নামটা স্পষ্ট করে দেয় নি, কিন্তু বাইরের অস্পষ্টতার ভিতর থেকে সেটা খুব বড়ো করে ফুটে উঠেছে।

এ দিকে মাতৃবৎসল হরিশ কুণ্ডুর গুণগান করে কাগজে চিঠির পর চিঠি বেরোচ্ছে। লিখেছে, মায়ের এমন সেবক দেশে যদি বেশি থাকত তা হলে এত দিনে ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানা-ঘরের চিমনিগুলো পর্যন্ত বন্দেমাতরমের সুরে সমস্বরে রামশিঙে ফুঁকতে থাকত।

এ দিকে আমার নামে লাল কালিতে লেখা একখানি চিঠি এসেছে, তাতে খবর দিয়েছে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ লিভারপুলের নিমকহালাল জমিয়ারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বলেছে, ভগবান পাবক এখন থেকে এই পাবনের কাজে লাগলেন; মায়ের যারা সন্তান নয় তারা যাতে মায়ের কোল জুড়ে থাকতে না পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে।"[১১৫]

যে ভয়ের শাসনের দ্বারা মানুষের ইচ্ছাকে—অর্থাৎ সে কী কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কার সঙ্গে বসে খাবে—গোড়া ঘেঁষে অস্বীকার করা হয়, তা যে মনুষ্যত্বের পরিপন্থী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশি সমাজ'-এর যে আদর্শ সেদিন ব্যক্ত করেছিলেন, তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল অনেক অধিক।

তাতে পল্লীর সাধারণ প্রজা বা বৃহত্তর জনতার স্বার্থ সংরক্ষণের বা অধিকার সংরক্ষণের যাবতীয় বন্দোবস্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন পল্লীর মানুষদের মামলা মকদ্দমায় কীভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু হয়ে যেতে হয়। তাই পল্লীর সালিশী সভার মাধ্যমে তার সমাধানের কথা বলেছিলেন, যাতে আর্থিক অপচয়কে রোধ করা যায়। তাঁর জমিদারিতে এই ব্যবস্থার পত্তনও করেছিলেন। কিন্তু স্বদেশী মারণযজ্ঞে মেতে উঠে সংবাদপত্রের বাহবা কুড়িয়েছিলেন হরিশ কুণ্ডু বা সানকিভাঙার চক্রবর্তীদের মতো এমন অধিকাংশ বাঙালি জমিদারই এই প্রস্তাব কার্যকরী করতে রাজী হয়নি। ত্যাগস্বীকারের প্রশ্নে, ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্নে তারা পিছিয়ে গেছে। এরই একটি দৃষ্টান্ত উপন্যাসে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক একটি ছাত্রের মধ্যস্থতায়—

“এফ. এ. -প্লাক্‌ড্‌ ছোকরাটি বললে, একটা ঘটনা জানি, চক্রবর্তীদের একটি কায়স্থ প্রজা ছিল। সে তার একটা হাট নিয়ে চক্রবর্তীদের কিছুতে মানছিল না। মামলা করতে করতে শেষকালে তার এমন দশা হল যে খেতে পায় না। যখন দুদিন তার ঘরে হাঁড়ি চড়ল না তখন স্ত্রীর রুপোর গয়না বেচতে বেরোল; এই তার শেষ সম্বল। জমিদারের শাসনে গ্রামে কেউ তার গয়না কিনতেও সাহস করে না। জমিদারের নায়েব বললে, আমি কিনব, পাঁচ টাকা দামে। দাম তার টাকা ত্রিশ হবে। প্রাণের দায়ে পাঁচ টাকাতেই যখন সে রাজি হল তখন তার গয়নার পুঁটলি নিয়ে নায়েব বললে, এই পাঁচ টাকা তোমার খাজনা-বাকিতে জমা করে নিলুম। এই কথা শুনে আমরা সন্দীপবাবুকে বলেছিলুম, চক্রবর্তীকে আমরা বয়কট করব। সন্দীপবাবু বললেন, এই-সমস্ত জ্যান্ত লোককেই যদি বাদ দাও তা হলে কি ঘাটের মড়া নিয়ে দেশের কাজ করবে?”[১১৬]

নিখিলেশ যে স্বদেশী ছোকরাদের কাপড়ের কলের যৌথ ব্যবসার শেয়ার কিনতে চায়নি তার কারণ তো এটাই। এতে যে অনেক গরিব মানুষকে চরম মূল্য দিতে হত সে কথা নিখিলেশের জানা ছিল। এ কারণে স্বদেশীরা নিখিলেশকে কৃপণ হিসেবী মানুষ মনে করেছে, তার কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে। উত্তেজনার বশে তারা ভুলে গেছে এই মানুষটি পল্লীর উন্নয়নের জন্য কত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে। নিখিলেশ এ কারণেই অবরুদ্ধ অভিমানে ভেবেছে—

“এরা মনে করে আমি খুব হিসাবি, আমি কৃপণ। আমার স্বদেশী কারবারের হিসাবের খাতাটা এদের খুলে দেখাতে ইচ্ছে করে। আর, সেই-যে একদিন মাতৃভূমিতে ফসলের উন্নতি করতে বসেছিলুম তার ইতিহাস এরা বুঝি জানে না! ক’বছর ধরে জাভা মরিশস থেকে আখ আনিয়ে চাষ করালুম; সরকারি কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষের পরামর্শে যত রকমের কর্ষণ বর্ষণ হতে পারে তার কিছুই বাকি রাখি নি, অবশেষে তার থেকে ফসলটা কী হল? সে আমার এলাকার চাষীদের চাপা অট্টহাস্য। আজও সেটা চাপা রয়ে গেছে। তার পরে

সরকারি কৃষিপত্রিকা তর্জমা করে যখন ওদের কাছে জাপানি সিম কিংবা বিদেশী কাপাসের চাষের কথা বলতে গেছি তখন দেখতে পেয়েছি সে পুরোনো চাপা হাসি আর চাপা থাকে না। দেশে তখন দেশসেবকদের কোনো সাড়াশব্দ ছিল না, বন্দেমাতরং মন্ত্র তখন নীরব। আর সেই যে কলের জাহাজ—দূর হোক সে-সব কথা তুলে লাভ কী? দেশহিতের যে আগুন ওরা জ্বালালে তাতে আমারই কুশপুত্তলি দগ্ধ হয়ে যদি থামে তবে তো রক্ষা।"[১১৭]

কথাগুলি যে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন উদ্যোগ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতারই প্রতিলিপিমাত্র তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পূর্বোক্ত অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি বড় দিক ছিল জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার ঊর্ধ্বে সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপন করা। নিখিলেশও তার জমিদারিতে এতদিন সেই সম্প্রীতি রক্ষার আদর্শকেই মেনে এসেছে। কিন্তু সন্দীপ ও তার স্বদেশী দল দেশ সেবার নামে ধর্মের যে মোহ জাল বিস্তার করে তাতে গভীর হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সৃষ্টি হয়। ঢাকা থেকে মৌলবী প্রচারকের আনাগোনা শুরু হয়। নিখিলেশের জমিদারিতে যেখানে মুসলমানেরাও গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতই ঘৃণা করতো, সেখানে দু-এক জায়গায় গোরু জবাই শুরু হল। এতে প্রতিবাদ উত্থিত হল সঙ্গত কারণেই। এর মূলে মুসলিমদের একটা কৃত্রিম জেদ ক্রিয়াশীল থেকেছে। হিন্দুরা যদি তাদের দেশমাতার পূজায় পশুবলি দিতে পারে তবে মুসলিমরা কেন পশুবধ করবে না—এটাই তাদের জিদ। তার ফল যে ভালো হবে না, এবং এতে যে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ভয়ঙ্কর পরিণাম রচিত হতে চলেছে তা নিখিলেশ আগে থেকেই টের পান। তাই সে তার জমিদারির হিন্দু প্রজাদের ডেকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি কিন্তু পরের ধর্মের উপর আমাদের কোন হাত নেই। সুতরাং মুসলমানকেও নিজেদের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে। তোমরা গোলমাল করো না।

কিন্তু এতদিন যে উপসর্গ নিখিলেশের জমিদারিতে ছিল না সে উপসর্গ আজই বা কেন দেখা দেবে সে প্রশ্নে নিখিলেশকেও বিব্রত হতে হতে দেখা যায়। ঝগড়ার পথ যে যথার্থ পথ নয়, শাসন করেও যে এ সমস্যার সমস্যা বাড়বে বই কমবে না তা সে স্পষ্ট করে দেয়। তা সত্ত্বেও ইংরেজী-পড়া এক হিন্দু কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে গোহত্যা যে অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকারক, এদেশে বহু আলোচিত অনুরূপ একটি তত্ত্বকে খাড়া করার চেষ্টা করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িক মন নিখিলেশের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল বলেই সে অকপটে জানায়—"এ দেশে মহিষও দুধ দেয় মহিষেও চাষ করে, কিন্তু তার কাটামুণ্ড মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন, কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।"[১১৮]

জমিদারিতে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রজাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল তার মূলে ছিল সন্দীপের কারসাজি। যে ধর্মের পথকে দেশের মুক্তির পথ বলে সে ভেবেছে তা দেশের পক্ষে কি মারাত্বক হতে পারে রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে দেখিয়েছেন। নিখিলেশ স্পষ্টতই জানিয়েছে—"এই- যে মুসলমানদের অস্ত্র করে আজ আমাদের উপরে হানা সম্ভব হচ্ছে, এই অস্ত্রই যে আমরা নিজের হাতে বানিয়েছি; ধর্ম যে এমনি করেই বিচার করেন। আমরা যা এতকাল ধরে জমিয়েছি আমাদের উপরেই তা খরচ হবে।"[১১৯] উপন্যাসে সে খরচের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যে সন্দীপ হিন্দু-মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল ক্ষিপ্ত প্রজারা তাকে 'মহামূল্য রত্নের মতো লুঠ করে নিয়ে তাদের গোরস্থানে পুঁতে রাখবার মতলব করেছে'। হরিশ কুণ্ডুর কাছারি লুঠ করেছে। মেয়েদের উপর অত্যাচার শুরু করেছে। যে প্রবল জনরোষ তারই হাতে বলি হতে হয়েছে নিরীহ প্রাণ অমলকে। বন্দুকের গুলিতে তার প্রাণ গেছে। সন্দীপের আশ্রয়দাতা নিখিলেশও এই জনরোষ থেকে বাদ পড়েনি। তার মাথায়ও বিষম চোট লাগে। তার মৃত্যুর সংবাদ এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দেননি। কিন্তু তার জীবনের চরম অনিশ্চয়তার ছবিটিকে পাঠকের মনে সঞ্চার করে দিয়েছেন। দেশ সেবার প্রকৃত পথ ও পন্থাটিকে এর দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ পাঠকের চোখে স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন।

ছ. যোগাযোগ :

'যোগাযোগ' দুই পরিবারের বিরোধী সংস্কৃতির সংঘাতের ইতিহাস হলেও এর মধ্যে স্বল্প পরিসরে ইতিহাসের সত্যকে মেনে নিয়ে পল্লীর দুই বিরোধী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সংঘাতের স্বরূপ-চিত্রকে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই গেঁথে তুলেছেন। এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়—

"১৯২৭ সালে পত্রিকায় গল্প শুরু—'আজ ৭ই আষাঢ়। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন।' বয়স হল তার বত্রিশ। লেখক শুরুতেই জানিয়ে দিতে চাইছেন, মধুসূদন কুমুদিনীর যে গল্প নিয়ে উপন্যাস তা ১৮৯৪-৯৫ সালের। মধুসূদনের বড় হয়ে ওঠা ঘটেছে অন্তত বছর পনের ধরে। সেই উন্নতির যে ইতিহাস লেখক বলেছেন তাতে সময় কিছু লাগবার কথা। তা হলে অর্থনৈতিক পটভূমি ১৮৮০ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত বিস্তৃত বলে মনে করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতি খুঁজে যে সময়টা ধরেছেন তাতে ভুল কিছু নেই। ঔপনিবেশিক শাসনের পাকে জড়ানো বঙ্গদেশে পুঁজিবাদ বিকাশে সুযোগ ছিল না। ইংরেজ বণিকদের প্রয়োজনে তাদের অনুগামী সহযোগী হিসেবে বাঙালি ব্যবসায়ী শ্রেণীর দ্বিধাকম্পিত আবির্ভাব ঊনিশের শতকের মধ্যভাগে। বাণিজ্যিক পুঁজিবাদী বলে এদের উল্লেখ করা যেতে পারে। সমগ্রত দেশের সমাজজীবনে এই নূতন ভূমিকা খুব বড় হয়ে ওঠেনি। আর সেটা সম্ভবও ছিল না।

ইংরেজ উপনিবেশ ব্যবস্থার কব্জা খুবই দৃঢ় ছিল। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের অনেকের আর্থিক অবস্থানে ফাটল ধরেছিল এই শতকের শেষ ভাগে। কিছু কিছু পুরনো বনেদি বংশে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। সময় এগিয়ে চলল। বাংলায় পুঁজিবাদের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটল না—সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিকাশ তো ঘটল। কয়লাখনি ও চটকলের ক্ষেত্রে কলকাতার যন্ত্রশিল্পে বৃটিশ শাসক কিন্তু জমিদারতন্ত্রকে জিইয়ে রাখল। সামগ্রিক সামাজিক প্রাধান্যের ক্ষেত্রে না হলেও সীমাবদ্ধ ছোটখাটো ব্যাপারে এই দুই ব্যবস্থার বিরোধ যে দেখা দিল না তা নয়।”[১২০]

রবীন্দ্রনাথ গুপ্তও অনুরূপ প্রসঙ্গে তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস’প্রবন্ধে স্পষ্টতই জানিয়েছেন—

“এই উপন্যাসেই প্রথম সামন্ত সমাজ বনাম সদ্যোত্থিত বণিকতন্ত্রের সংঘাত অঙ্কিত হল। বিষবৃক্ষের শ্রীশ বিলেতি প্লগুর ফেয়ারলি হৌসে কাজ করেন, নগেন্দ্রনাথ নিজে বৃহৎ ভূস্বামী পরিবারের প্রধান, কিন্তু নৌকাযোগে নব্য বাণিজ্যতন্ত্রের ফসল নিয়মিত ঘরে তুলে আনেন। দুটি ভিন্ন সমাজবিন্যাসের কোন সংঘর্ষ সেখানে ফোটেনি। কারণ তীব্র সংঘর্ষ জেগেছিল আরও পরে। ঘোষাল ও চাটুজ্যে দুটি বিবদমান সামন্ত পরিবার। একটি ধ্বংস হয়ে কোন মতে আশ্রয় নিলে পাটগুদামের খাজাঞ্চিখানায়, অন্যটি বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের শেষ আরতির শিখা জ্বালিয়ে রেখেছে ক্ষীণ ভাবে।”[১২১]

উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় পল্লীর বিলীয়মান জমিদার তন্ত্রের ছবি। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে পল্লীর শ্রী ও সৌন্দর্যের ক্রমাবনতির ছবি উপন্যাসে স্বাভাবিক ভাবেই ফুটেছে। ঘোষাল পরিবারের পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—“আজও তাদের সাবেক গ্রাম শেয়াকুলিতে অন্তত বিঘে দশেক আয়তনের ঘোষাল-দিঘি পানা-অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে পঙ্করুদ্ধ কণ্ঠে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে।”[১২] পল্লীর শ্রী ও স্বাস্থ্যের পক্ষে এ ছবি অনুকূল নয়। গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার অবনমনের ফলেই পল্লীর পুকুরগুলিরও এমন দশা দাঁড়িয়েছিল। এ উপন্যাসের কালপটভূমি যে উনিশ শতকের শেষ দশক তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এ সময়েই রবীন্দ্রনাথ পল্লীজীবনের মধ্যে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন এবং পল্লীজীবনকে নিতান্ত কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেন। পল্লীর এ-হেন শ্রীহীন অবস্থার কথা রবীন্দ্রনাথ একাধিক চিঠিপত্রেই ব্যক্ত করেছেন। পল্লীর পুকুরগুলির জীর্ণ দশার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি পুকুর সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

বিবাহিত জীবনে নর-নারীর জোড় না মেলার কাহিনীতে গ্রামীণ সমাজ-অর্থনীতির টানাপোড়েনকে খুঁজে বের করার প্রয়াসকে কষ্টকল্পনা বলে কেউ মনে করতে পারেন। কিন্তু উপন্যাসের দিকে তাঁরা যদি সচেতন দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে দেখবেন যে, এ উপন্যাসে কুমুদিনী- মধুসূদনের দাম্পত্য জীবনের আরম্ভটা আছে বিশের অধ্যায়ে। তার

আগে উপন্যাসের ৩৬টির মধ্যে ১৯টি অধ্যায়েই রবীন্দ্রনাথ যা শোনাতে চেয়েছেন তা অন্য কিছু। তার মধ্যেই নিহিত আছে গ্রামীণ অর্থনীতির বিবর্তনের সময়নিষ্ঠ ইতিবৃত্ত। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত জানিয়েছেন—

" ১৯২৭-২৮ সালে বাঙালির অর্থনৈতিক দুর্দশা খুব বেড়ে গেয়েছিল। শিক্ষার প্রসার হওয়ায় শিক্ষিত বেকার বাড়ছিল। বিহার ওড়িশা প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশ হয়ে যাওয়ায় সেখানে চাকরির সুযোগ কমে গেল। মন্টেগু চেম্‌সফোর্ড সংস্কার যেমন বাঙালির আর্থিক অসুবিধা ঘটিয়েছিল তেমনি আসন্ন আন্তর্জাতিক মন্দার প্রভাবও জাতিকে সমস্যায় ফেলল। রবীন্দ্রনাথ কি এই বিরূপ পরিস্থিতিতে এক সফল বাঙালি ব্যবসায়ীর উত্থানের কাহিনী শোনাতে চাইলেন? হয়তো সূচনায় এরকম একটা ভাবনার বীজ তাঁর মনে ছিল। গল্প এগোতে তাতে নানা জটিল সূত্র এসে গাঁট বাঁধতে থাকে।"[১২৩]

মামলা-মকদ্দমা পল্লীর মানুষের অর্থনৈতিক অবনমনের একটি অন্যতম কারণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই মণ্ডলী প্রথার প্রবর্তন করে পল্লীর সমস্যাগুলির প্রাথমিক সমাধানের আয়োজন করেছিলেন, যাতে পল্লীর অর্থনৈতিক সুরক্ষাটুকু বজায় থাকে। এ উপন্যাসেও দেখা যায়, দেবতার পুজো নিয়ে চাটুজ্যে জমিদারের সঙ্গে ঘোষালদের যে বিরোধ বাঁধে তা শেষপর্যন্ত মামলা অবধি গড়ায়। কিন্তু 'সে মামলা থামল ঘোষালদের সর্বনাশের কিনারায় এসে।' পল্লীর জমিদার সম্প্রদায়ের এই আর্থিক অবনমন পল্লীর উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতো অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে। শেয়াকুলি গ্রামের ঘোষাল দিঘির যে জীর্ণ ছবিকে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তা একটি প্রতীকী দৃষ্টান্ত বিশেষ।

এই পুকুরগুলির উপর পল্লীর মানুষের একদা নির্ভরশীলতার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সমাজ জীবনের অর্থনৈতিক মন্দা বা জমিদারতন্ত্রের বিপর্যয়ে আজ সেই সুযোগ থেকে পল্লীর মানুষ বঞ্চিত। উপন্যাসে মধুসূদন অনেক সাধনার পর যখন আবার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরে পায় তখন এই পানা-অবরুদ্ধ ঘোষাল দিঘি সংস্কারের ফলে কী চেহারা নিয়েছিল তা পল্লীর মানুষ স্বচক্ষে দেখেছে। তার মধ্যে মধুসূদনের আপন ইচ্ছা চরিতার্থতার যে অভিসন্ধিই কাজ করুক না কেন। অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বিপ্রদাসের জমিদারিতেও পড়ে। তার অভিঘাতে বিপ্রদাসের জমিদারির বিলীয়মান রূপকে রবীন্দ্রনাথ সহানুভূতির সঙ্গেই ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই যে জমিদারের দরাজ সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে বৈকুণ্ঠের মতো প্রজারা তাদের জীবন অতিবাহন করেছেন আজ তাঁরা মেয়ের বিবাহের টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে বিপ্রদাসের দ্বারস্থ হলে তাকে খালি হাতে ফিরে যেতে হয় কিংবা নিজের সম্পত্তি বিক্রয় করে জমিদারকে তার প্রজাতান্ত্রিক লোকধর্মকে পালন করতে হয়।

পল্লীর সমাজে তখনো জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার বেড়াজাল কত কঠিন ছিল, সমাজকে শতচ্ছিন্ন করার পক্ষে তার ক্ষমতা কী প্রবল ছিল তার ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসের প্রাথমিক পর্বে—"চাটুজ্যেরা ঘোষালদের উপর শেষ কোপটা দিলে সমাজের খাঁড়ায়। রটিয়ে দিলে এককালে ওরা ছিল ভঙ্গজ ব্রাহ্মণ, এখানে এসে সেটা চাপা দিয়েছে, কেঁচো সেজেছে কেউটে। যারা খোঁটা দিলে , টাকার জোরে তাদের গলার জোর। তাই স্মৃতিরত্ন পাড়াতেও তাদের এই অপকীর্তনের অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা ঢাকি জুটল। কলঙ্কভঞ্জনের উপযুক্ত প্রমাণ বা দক্ষিণা ঘোষালদের শক্তিতে তখন ছিল না, অগত্যা চণ্ডীমণ্ডপবিহারী সমাজের উৎপাতে এরা দ্বিতীয় বার ছাড়ল ভিটে। রজবপুরে অতি সামান্য ভাবে বাসা বাঁধলে।"[১২৪] অর্থবল না থাকার কারণে—বলা চলে অর্থনৈতিক মন্দার শিকার হয়ে অনেক জমিদারিই যে সেদিন বিলুপ্তির পথে তলিয়ে যায় তার একটি ইঙ্গিতকে রবীন্দ্রনাথ এই বর্ণনার মধ্যে গেঁথে দিয়েছেন।

বাঙালির আলস্য মধুসূদনকে স্পর্শ করতে পারেনি বলেই নিজের সর্বাধিক প্রয়াসে সে তার তুচ্ছতা ও আর্থিক অবস্থায় বদল ঘটিয়েছে একক সামর্থ্যে। উপন্যাসের "দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রায় প্রতিটি বাক্য শুধু মধুসূদনের ব্যক্তিগত উত্থানের পরম্পরা নয়, বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাবের পদক্ষেপ।"[১২৫] মধুসূদনের জীবনের শৈশব শিক্ষার পাশাপাশি চলে অবৈতনিক শিক্ষা—"মফস্বল ইস্কুলে মধুসূদনের প্রথম শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে অবৈতনিক শিক্ষা ছিল নদীর ধারে, আড়তের প্রাঙ্গণে ,পাটের গাঁটের উপর চড়ে বসে। যাচনদার, খরিদদার, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের ভিড়ের মধ্যেই তার ছুটি—যেখানে বাজারে টিনের চালাঘরে সাজানো থাকে সারবাঁধা গুড়ের কলসী, আঁটি বাঁধা তামাকের পাতা, গাঁটবাঁধা বিলিতি র‍্যাপার, কেরোসিনের টিন, সরষের ঢিবি, কলাইয়ের বস্তা, বড়ো বড়ো তৌল-দাঁড়ি আর বাটখারা, সেইখানে ঘুরে তার যেন বাগানে বেড়ানোর আনন্দ।"[১২৬]

আসলে পল্লীর সমাজ-অর্থনীতির সময়-সংশ্লিষ্ট স্পন্দনটিকে ধরতে পেরেছিল মধুসূদন। সময়ের দাবিকে সে উপেক্ষা না করে মুকুন্দলাল কিংবা বিপ্রদাসের মতো ভুল করেনি। বণিক পুঁজিপতি হিসেবে তাঁর নবীন জন্মলাভ ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা—"মধুসূদনের ভাইয়েরা গোমস্তাগিরিতে বসে গিয়েছিল। সে ছিল ভালো ছাত্র, কলেজের নাম রাখার মতো। কেরানি, ইস্কুলমাস্টার, মোক্তার বা উকিল হয়ে ভদ্রশ্রেণীতে ঠাঁই পাবার তার সম্ভাবনা ছিল। মধুসূদন সেসব অনায়াসে বাতিল করে দিল। পাঠ্য বইগুলি বিক্রি করে দিয়ে ব্যবসায়ের সূচনা প্রায় প্রতীকী ঘটনা। চাকরির নিশ্চিন্ততা, লেখাপড়ার ভদ্রতা কোনো ফাঁদে তাকে ধরা গেল না। জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম হয়েছিল রবিনসন ক্রুশোর। ইংরেজি উপন্যাসের প্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত এক উপনিবেশবাদীর। বাংলা উপন্যাসের বুর্জোয়া মনের অনেক ব্যক্তি বঙ্কিমের হাতে আবির্ভূত হয়েছিল, কিন্তু এই

প্রথম দেখলাম বাস্তব সমাজে পা ঢুকিয়ে দাঁড়ানো এক পুরোদস্তুর বণিক পুঁজিপতিকে।...”[১২৭]

'যোগাযোগ'-এ মধুসূদন যখন যৌবনে পদার্পণ করে ব্যবসা জমিয়ে বসেছে, তখন পল্লীর সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভাঙন ধরেছে, ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্গম রচিত হচ্ছে। পল্লীর সমাজজীবনেও পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার জায়গা দখল করছে কলকারখানা। সেই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ছবিটিকেও রবীন্দ্রনাথ ধরেছেন 'যোগাযোগ' উপন্যাসে—যা সমকালীন বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় ভিন্ন মাত্রায় ভিন্নসুরে। এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন—

"এই সময়ে মধুসূদনের সতর্কতায় রজবপুরের পাটের নাম দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ মধুসূদন সব-প্রথমেই নদীর ধারের পোড়ো জমি বেবাক কিনে ফেললে, তখন দর সস্তা। ইঁটের পাঁজা পোড়ালে বিস্তর, নেপাল থেকে এল বড়ো বড়ো শাল কাঠ, সিলেট থেকে চুন, কলকাতা থেকে মালগাড়ি-বোঝাই করোগেটেড লোহা। বাজারে লোক অবাক! ভাবলে , 'এই রে! হাতে কিছু জমেছিল, সেটা সইবে কেন! এবার বদহজমের পালা, কারবার মরণদশায় ঠেকল বলে!'

এবারও মধুসূদনের হিসেব ভুল হল না। দেখতে দেখতে রজবপুরে ব্যবসার একটা আওড় লাগল। তার ঘূর্ণিটানে দালালরা এসে জুটল, এল মাড়োয়ারির দল, কুলির আমদানি হল, কল বসল, চিমনি থেকে কুণ্ডলায়িত ধূমকেতু আকাশে-আকাশে কালিমা বিস্তার করলে।”[১২৮]

সময়ের এই পরিবর্তিত স্রোত কে ঠিক ধরতে পারেন নি বিপ্রদাসের পিতা মুকুন্দলাল। তার মধ্যে ছিল এক ধরণের নির্ভীক ব্যায়বাহুল্য। অর্থাৎ ধন বোঝা হয়ে মাথায় চড়েনি, পাদপীঠ হয়ে বিরাজ করেছে পায়ের তলায়। ফলে পল্লীর এই অকৃপণ ধনীরা সেদিন যেমন শাসন করেছে নিজস্ব গৌরবে তেমনি তাদের আমদরবারে গরিব মানুষেরা অকাতরে প্রবেশ করেছে ,উৎসবে অনুষ্ঠানে ব্রত পার্বণে অংশ নিয়েছে; তেমনি নানান দান ও সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে গেছে। পল্লীর ধনী সেদিন ধনকে পল্লীর জনহিতার্থেই ব্যয় করেছে, তাকে নিছক মধুসূদনের সময়কার ব্যক্তিগত মালিকানার আধারে বন্দী করে রাখেনি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"এদের শৌখিনতার আমদরবারে দান দাক্ষিণ্য, খাসদরবারে ভোগবিলাস—দু'ই খুব টানা মাপের। একদিকে আশ্রিত বাৎসল্যে যেমন অকৃপণতা, আর-একদিকে ঔদ্ধত্য দমনে তেমনি অবাধ অধৈর্য। একজন হঠাৎ-ধনী প্রতিবেশী গুরুতর অপরাধে কর্তার বাগানের মালীর ছেলের কান মলে দিয়েছিল মাত্র; এই ধনীর শিক্ষাবিধান-

বাবদ যত খরচ হয়েছে, নিজের ছেলেকে কলেজ পার করতেও এখনকার দিনে এত খরচ করে না। অথচ মালীর ছেলেটাকে অগ্রাহ্য করেননি। চাবকিয়ে তাকে শয্যাগত করেছিলেন। রাগের চোটে চাবুকের মাত্রা বেশি হয়েছিল বলে ছেলেটার উন্নতি হল। সরকারি খরচে পড়াশুনো করে সে আজ মোক্তারি করে।”[১২৯]

কিন্তু নতুন কাল এল ধনের স্বতন্ত্র মূল্য নিয়ে। ধনের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বার্থান্বেষী মানসকে প্রকট করে তুললো, মূল্যবোধকে দিল ভেঙে, সামাজিক নানা শ্রেণীর মানুষের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের যে নিবিড় জালটুকু ছিল তাকে দিল ছিন্ন করে। ধনের একত্রীকরণ যেমন ধনী-নির্ধনের পার্থক্যকে প্রকট করে তুললো তেমনি এক ধরণের অলজ্জ দাম্ভিকতা ধনের আশ্রয়েই সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে আঘাত করলো। মধুসূদন-কুমুদিনীর মানস-সংঘাতের মূলে স্বতন্ত্র অর্থনীতি-প্রসূত এই চেতনা-স্বাতন্ত্র্যই ক্রিয়াশীল থেকেছে বড় বেশি করে—পাশাপাশি ইতিহাসের সুর ও সংকটও:

“মধুসূদন ও কুমুদিনীর সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রী হলেও কাহিনীর শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত জটিল এবং পরস্পরের প্রতিবাদী থেকে গিয়েছে। তার কারণ এই দুটি মানুষের একান্ত স্বতন্ত্র চরিত্র ব্যক্তিত্ব তো বটেই, অনেকটা সামাজিক ও শ্রেণীগতও। মধুসূদন প্রতিবার মানসিক বাধা ও আঘাতের সময়ে, স্ত্রীর সঙ্গে সংঘাতের প্রতিটি ঘটনায় কুমুর পেছনে দেখতে পেয়েছে ব্যক্তিগতভাবে বিপ্রদাসকে এবং শ্রেণীগতভাবে নুরপুরের জমিদারতন্ত্রের ছায়া। ব্যক্তিমধুসূদনের আক্রমণ প্রায়ই মধুসূদন নামক পুঁজিবাদীর শ্রেণীসংগ্রামে পরিণত হয়েছে। বিপর্যস্ত জমিদারী মেজাজের মিথ্যা দম্ভ ও নিঃসম্বল বনেদিয়ানার ঢাল ভেবে ক্রোধে মধুসূদন আঘাত করেছে কুমুকে—আসলে মেরেছে বিপ্রদাসকে, জয় করতে চেয়েছে জমিদারতন্ত্রকে। আবার ঘুরিয়েও দেখা যায় । শ্রেণীস্বার্থে জমিদারী গর্বের ভগ্নস্তূপকে ধুলিস্যাৎ করতে গিয়ে সে প্রতিক্ষণ ভেঙেছে কুমুকে—যে একমাত্র নারী তার মধ্যের পুরুষকে জাগিয়েছিল। এই আত্মক্ষয়ী যুদ্ধে তার ট্র্যাজেডি, কিন্তু এর ভিতে ঐতিহাসিক নিয়তি কাজ করে চলেছে। এই শ্রেণীসংগ্রাম তাকে করতেই হবে পুরনো মৃতপ্রায় সমাজবিধান—ফিউডাল তন্ত্রকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে। যতবড় দাপুটে ও শক্তিমান বলে তাকে মনে হোক সে ইতিহাসের ক্রীড়নক বা নায়ক হিসেবে এ কাজ করতে বাধ্য।”[১৩০]

রবীন্দ্রনাথ এই নবীন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি-প্রসূত মানসের স্বরূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসে নিপুণ ভাবে—“ঘোষাল দিঘির ধারে জঙ্গল সাফ হয়ে গেল—চেনা যায় না। জমি নিখুঁতভাবে সমতল, মাঝে মাঝে সুরকি দিয়ে রাঙানো রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে আলো দেবার থাম। দিঘির পানা সব তোলা হয়েছে। ঘাটের কাছে তকতকে নতুন বিলিতি পাল-খেলাবার দুটি নৌকা, তাদের একটির গায়ে লেখা ‘মধুমতী’, আর-একটির গায়ে ‘মধুকরী’। যে তাঁবুতে রাজাবাহাদুর স্বয়ং থাকবেন তার সামনে ফ্রেমে হলদে বনাতের উপর

লাল রেশমে বোনা ‘মধুচক্র’। একটা তাঁবু অন্তঃপুরের, সেখান থেকে জল পর্যন্ত চাটাই দিয়ে ঘেরা ঘাট। ঘাটের উপরেই মস্ত নিমগাছের গায়ে কাঠের ফলকে লেখা ‘মধুসাগর’। খানিকটা জমিতে নানা আকারের চানকায় সূর্যমুখী, রজনীগন্ধা, গাঁদা, দোপাটি, ক্যানা ও পাতাবাহার, কাঠের চৌকো বাক্সে নানা রঙের বিলিতি ফুল। মাঝে একটি ছোটো বাঁধানো জলাশয়, তারই মধ্যে লোহার ঢালাই-করা নগ্ন স্ত্রী মূর্তি, মুখে শাঁখ তুলে ধরেছে, তার থেকে ফোয়ারার জল বেরোবে। এই জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েছে ‘মধুকুঞ্জ’। প্রবেশ পথে কারুকাজ-করা লোহার গেট, উপরে নিশান উড়ছে—নিশানে লেখা ‘মধুপুরী’। চারিদিকেই ‘মধু’ নামের ছাপ। নানা রঙের কাপড়ে কানাতে চাঁদোয়ায় নিশানে রঙিন ফুলে চীনালণ্ঠনে হঠাৎ-তৈরি এই মায়া পুরী দেখবার জন্যে দূর থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল।”[১৩১]

মধুসূদনের এই যে আড়ম্বর, এই যে ঐশ্বর্যের দম্ভ প্রদর্শন , তা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি-প্রসূত মূল্যবোধেরই পরোক্ষ প্রবর্তনা। চাটুজ্জে বাড়ির জীর্ণতাকে বা ক্ষয়িষ্ণু আর্থিক অবস্থাকে দলিত করে নিজের বিজয় লাভের আকাঙ্খা এর মধ্যে কাজ করেছে । ধনকে মধুসূদন ব্যক্তিগত স্বার্থেই ব্যবহার করেছে। ব্যক্তিগত মালিকানার বাইরে ধনকে সে জনহিতার্থে ব্যয় করেনি। ফলে ব্যবসায়িক স্বার্থে কিংবা প্রয়োজনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্কসূত্রে জড়িত যে মানুষগুলিকে মধুসূদন তার সঙ্গী করেছে তারা কেউ-ই মধুসূদনের সঙ্গে অন্তরের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনি—এমনকি নিজের স্ত্রীও। আসলে রবীন্দ্রনাথ “ যখন ‘যোগাযোগ’ লিখলেন তখনো ‘রক্তকরবী’-র ভাববলয়ের ছায়া যে মিলিয়ে যায় নি তা বোঝা যায়। ‘যোগাযোগ’-এও আছে এক ধনতৃষ্ণ ক্ষমতালোভী শক্তি অভিমানী পুরুষ, যে সকলকে অন্ধকারে রেখে দেয়, মানে না কারো স্বাতন্ত্র্য। অথচ ভিতরে ভিতরে সে দুর্বল ব্যক্তি। আর তার সন্নিহিত বিপরীতে রয়েছে এক অপরাজেয় নারীসত্তা, সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা যার প্রধান শক্তি। কিন্তু ‘যোগাযোগ’ তো প্রতীকে পরমা কবিতা নয়—সে উপন্যাস। বস্তু জগতের দৌরাত্ম্যকে সেখানে বস্তু জগতের মতো প্রতীয়মান করাতে হবে—শুধু শিল্পের তাগিদে নয়, জীবনের তাগিদেও বটে। তাই ‘যোগাযোগ’ রূপকের ফ্রেমে সব কথা বলতে পারে না। নির্বস্তুক নারীত্ব নয়, এর বিষয়বস্তু রক্তমাংসে গড়া এক নারী—কলকাতার ধোঁয়া যেমন নীল আকাশের শ্বাসরোধ করতে চায়, সেই নারীর শুদ্ধ সত্তাকেও তেমনি চেপে ধরতে চায় কম্‌প্রাদুর মধুসূদনের মালিকী অভিপ্রায়। সেই নারীর দেহাধীন নিয়তিও ঐ স্থূল বাস্তবতার অংশ।”[১৩২]

বিপ্রদাসের আর্থিক দুর্দশার দিনে কিন্তু তাঁর প্রজারা এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। তাদের সঙ্গে বিপ্রদাসের যে অন্তরের সম্পর্ক। তাই—“নবগোপাল প্রজাদের সঙ্গে মিলে উঠে-পড়ে লাগল। সবাই বুক ঠুকে বললে, টাকার জন্যে ভাবনা কী ? আমলা ফয়লা পাইক বরকন্দাজ সবারই গায়ে চড়ল নতুন লাল বনাতের চাদর, রঙিন ধুতি। সলুতে-

মোড়া ঝালর-ঝোলানো নিশেন-ওড়ানো এক নহবত খানা উঠল, সাত ক্রোশ তফাত থেকে তার চুড়ো দেখা যায়। দুই শরিকে মিলে তাদের চার হাতি বের করলে, সাজ চড়ল তাদের পিঠে, যখন তখন বিনা কারণে ঘোষাল দিঘির সামনের রাস্তায় শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে তারা টহলিয়ে বেড়ায়, গলায় ঢংঢং করে ঘন্টা বাজতে থাকে। আর যাই হোক, পাটের বস্তা থেকে হাতি বের হয় না, এই বলে সকলেই দুই পা চাপড়ে হো হো করে হেসে নিলে।”[১৩৩]

রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর জমিদারিতে পক্ষী হত্যা নিষেধ করেছিলেন, বিপ্রদাসও তার জমিদারীতে পক্ষী নিধন নিষেধ করে তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। পাখিদের সংরক্ষণের জন্য বিপ্রদাস ম্যাজিস্ট্রেটকে পর্যন্ত ঠেকিয়েছিলেন। কিন্তু মধুসূদন সঙ্গে কতকগুলি সাহেবকে নিয়ে বিপ্রদাসের কোনরকম অনুমতি ছাড়াই পীরপুরের চর কিংবা চন্দন দহের বিলে ‘রাক্ষুসে ওজনের জীবহত্যা’য় নিয়োজিত হয়েছে শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। নবগোপাল জানিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট তবু বিপ্রদাসের কথায় ভদ্রভাবে চলে গেছিল। ‘কিন্তু এরা গো-মৃগ-দ্বিজ কাউকে মানবার মতো মানুষ নয়।’[১৩৪] এই বেপরোয়া মনোভাব ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধেরই ফলপরিণাম, ভোগবাদী বা প্রয়োজনবাদী মানসিকতারই বহির্প্রকাশমাত্র। এই মোটা মনের সঙ্গে কুমুর সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মনের স্বভাবতই মিল হয়নি। তাই তাদের জীবনবীণার সরু মোটা দুটি তার জড়িয়ে গেছিল।

রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি বিশেষ দিক ছিল নারী-স্বাধীনতা বা নারীশক্তির জাগরণ। এই নারীরা পল্লীর আর্থ-সামাজিক অবস্থায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কতটা নির্যাতিত হয় তার ছবি আছে ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে। বিপ্রদাসের জমিদারির অন্তর্গত প্রজা বৈকুণ্ঠের মেয়ের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তাই-ই ছিল তখনকার পল্লীবাংলার সাধারণ ছবি—“কয়েক বৎসর হল সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। তাদের পণের বিশেষ কোন আবশ্যক ছিল না বলেই বরের পণও ছিল বেশি। বারোশো টাকায় রফা হয়, তাছাড়া আশি ভরি সোনার গয়না। একমাত্র আদরের মেয়ে বলেই মরিয়া হয়ে সে রাজি হয়েছিল। একসঙ্গে সব টাকা সংগ্রহ করতে পারেনি, তাই মেয়েকে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে ওরা বাপের রক্ত শুষেছে। সম্বল সবই ফুরোল তবু এখনো আড়াইশো টাকা বাকি। এবারে মেয়েটির অপমানের শেষ নেই। অত্যন্ত অসহ্য হওয়াতে বাপের বাড়ি পালিয়ে এসেছিল। তাতে করে জেলের কয়েদির জেলের নিয়ম ভঙ্গ করা হল, অপরাধ বেড়েই গেল। এখন ঐ আড়াইশো টাকা ফেলে দিয়ে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলে বাপ মরবার কথাটা ভাববার সময় পায়।”[১৩৫]

জমিদার রবীন্দ্রনাথ জমিদার বিপ্রদাসের মান রেখেছেন। বিপ্রদাস নিজের হাতের আংটি বিক্রয় করে বৈকুণ্ঠের মেয়ের বিয়ের টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন।

বেনেভোলেন্ট জমিদার হলে এমনটা হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালের জমিদারদের ছবিটাকে ঠিক এভাবে দেখেননি—বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁর স্ব-কৃত বর্ণনা রয়েছে। আসলে রবীন্দ্রনাথ এর মধ্য দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির পালাবদলের বা পটপরিবর্তনের ঐতিহাসিক পদধ্বনিকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন—"মূল ঘটনার বত্রিশ-তেত্রিশ বছর পর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ঘোষালেরা উৎসব করছে। অন্যদিকে চাটুজ্জে পরিবারের জমিদারির উপরে যে শেষ পর্দা নামছে তখনিই তা স্পষ্ট। আর্থিক ভাবে বিপর্যস্ত অবিবাহিত বিপ্রদাসের সঙ্গে বংশের সমাপ্তি, অনুজ বিলেত থেকে ফিরলেও ব্যারিস্টার হয়ে আসছে, জমিদারি বাঁচানোর দায় নিয়ে নয়। এটা দুটি পরিবারের বাড়া-কমা শুধু নয়, এর মধ্যে ইতিহাসের বিধান পড়া যাচ্ছে। ঔপন্যাসিক যাদেরই সমর্থন করুন, বনেদিয়ানা চলে যাওয়ায় যতই তাঁর কষ্ট হোক—এই সত্যের দিকে পেছনে ফিরে থাকতে পারেননি।"[১৩৬]

এ সমাজ নারীর আত্মসম্মান বা স্বাধিকারের কথা ভাবেনি। অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার শিকার হয়ে আড়কাঠিদের কথায় তারা আসামের চা-বাগানে চালান হয়ে যেত। বিয়ের পর মধুসূদনের বাড়ি ফেরার পথে কুমু যখন আড়কাঠিদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া এমনি একটি অসহায় মেয়েকে বাড়ি ফেরার জন্য দশটি টাকা সাহায্য করেছে তখন পল্লীজীবনের গতানুগতিকতায় অভ্যস্ত পল্লীবাসিনীদের ব্যঙ্গ ও তিরস্কারের শিকার হতে হয়েছে—"দেখে একজন মেয়ে বলে উঠল, "আমাদের বউয়ের দরাজ হাত দেখি!" আর-একজন বললে, "দরাজ নয় তো দরাজা, লক্ষ্মীকে বিদায় করবার।" আর-একজন বললে, "টাকা ওড়াতে শিখেছে, রাখতে শিখলে কাজে লাগত।" এটাকে এরা দেমাক বলে ঠিক করলে—বাবুরা যাকে এক পয়সা দিলে না, ইনি তাকে অমনি ঝনাৎ করে টাকা ফেলে দেন, এত কিসের গুমোর! এদের মনে হল এও বুঝি সেই চাটুজ্জে-ঘোষালদের চিরকেলে রেষারেষির অঙ্গ।"[১৩৭]

রবীন্দ্রনাথ এখানে নারীর দুই ভিন্ন মানসিকতার যে দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন সে আসলে দুই ভিন্ন চেতনারই সংঘাত বই আর কিছু নয়। দাদার কাছে যে শিক্ষা দীক্ষা, গ্রন্থপাঠ বা কলারুচির চর্চা করেছিল কুমু তার সেই চেতনার প্রসৃতি বা বোধ ছিল না পল্লীর অপরাপর নারীর মধ্যে। আসলে "কুমুতে ব্যক্তিস্বাতিন্ত্র্যের যে বৈশিষ্ট্য তা প্রেমকে আশ্রয় করে মুক্তি খোঁজেনি। নারী নারীত্বেই স্বাধীন প্রতিষ্ঠা চেয়েছে। এটা একেবারে নতুন চেতনা, একেবারে বিংশ শতকের।"[১৩৮] ফলে কুমুর ভাবনার সঙ্গে পল্লীর অপরাপর নারীর ভাবনার পার্থক্যটিকে রবীন্দ্রনাথ চিনিয়ে দিয়েছেন। তারা তাঁদের চেতনার সেই সঙ্কীর্ণ পরিধি থেকেই কুমুকে পূর্বোক্ত কথাগুলি অকপটে বলে যেতে পেরেছে, তাদের রুচিবোধে বাধেনি—যেমনটা বাধেনি মধুসূদনের নিজেরও। একারণেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীজীবনে, বিশেষত নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন, যাতে করে তাদের চেতনার স্বাধীনতাও বিস্তৃতি ঘটতে পারে।

এ উপন্যাসে নারীস্বাধীনতা নিয়ে বিপ্রদাসের যে ভাবনা তাকে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা হিসেবেই ভাবা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—"নারীমুক্তি বিষয়ে তার নবীন বোধ সাম্প্রতিক কালের ইংরেজি শিক্ষার ভূমিতে জন্মানো। সতীত্বের নাম করে মেয়েদের উপরে অসম্মানের বোঝা চাপানো—তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শোনা গেল বিপ্রদাসের কণ্ঠে। বইয়ের একটি গোটা অধ্যায় (৫০নং) এই কাজেই লেগেছে। অন্যত্রও আছে। লাঞ্ছিত বোন কুমুর সূত্র ধরে কথা উঠলেও গোটা নারী জাতের অবস্থাও ভাগ্য ছিল তার বিবেচ্য। মেয়েদের সম্বন্ধে ঐ মনোভাবটা বিশেষ করে মধ্যযুগের তাতে অন্য স্তরের মানুষজন থাকলেও সমাজপ্রধান হিসেবে জমিদারদের ভূমিকাটাই ছিল বড়। বিপ্রদাসের ভাবনার ধারা একেবারে বিপরীত। বলা যায় মানবমুক্তির যে ধারণা বুর্জোয়া সভ্যতার, তার অংশ হিসেবে নারীর প্রতি সম্মাননা অঙ্কুরিত। জমিদার বিপ্রদাস এখানে যে চিন্তার দায় বহন করেছে তা মধুসূদনের কৃত্য ছিল। শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকে নারী প্রসঙ্গে চিন্তার ক্ষেত্রে এরা স্থান বদল করে নিয়েছে।"[১৩৯]

এ উপন্যাসে কুমুর যে 'search for identity', বাড়ির বড় বউয়ের পরিচয় ছাড়িয়ে কুমু হয়ে ওঠার প্রয়াস তার মূলেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ বিশেষ মানস-অভীপ্সা কাজ করেছে। তবে অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'যোগাযোগ'-এ কুমুর জীবনের শেষ পরিণামের প্রতি সুবিচার করে উঠতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ-যতটা করেছেন তাঁর ছোটগল্পসমূহে। সমালোচক তাই বলেছেন—" লেখক তত্ত্বকথা বলে মাতৃত্বের আবরণ দিয়ে এই আত্মসমর্পণকে গৌরব দিতে গিয়ে আসলে পূজা করেছেন কুমুর ফিউডাল ধ্যানে প্রত্যাবর্তনকে। ছোটগল্প 'স্ত্রীরপত্র' কিংবা 'পয়লা নম্বর' এর নায়িকারা স্বাধিকারের ভাবনায় স্বামীগৃহ ছেড়েছিল। লেখক জোর করে তাদের গর্ভবতী করে তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার খাতিরে পতি পরম গুরুতে সমর্পণ করেন নি।"[১৪০]

জ. চার অধ্যায় :

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' 'দুইবোন' 'মালঞ্চ' উপন্যাসে পল্লীভাবনার তেমন কোন প্রকাশ নেই। 'চার অধ্যায়ে' পল্লীউন্নয়ন তথা দেশোন্নয়ন ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্নে। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম বিশেষ দিক ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু নগরে-গ্রামে সেদিন যে সহিংস পথে বৈপ্লবিক কর্মপ্রণালী শুরু হয়েছিল তার মত ও পথকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেননি। সেদিন সহিংস বিপ্লবের পথকে বেছে নিয়েছিল যে যুবসমাজ, তাদের আন্দোলনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এলার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—" হাঁ তারাই, ছুটল মৃত্যুদূতের পিছন পিছন মরিয়া হয়ে, তারা প্রায় সবাই আমারই মতো বাঙাল। ওরাই যদি মরতে ছোটে আমি চাই নে ঘরের কোণে বেঁচে থাকতে। কিন্তু দেখুন মাস্টারমশায়, সত্যি

কথা বলব। যতই দিন যাচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্যটা উদ্দেশ্য না হয়ে নেশা হয়ে উঠেছে। আমাদের কাজের পদ্ধতি চলেছে যেন নিজের বেতালা ঝোঁকে বিচারশক্তির বাইরে। ভালো লাগছে না। অমন সব ছেলেদের কোন্ অন্ধশক্তির কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে! আমার বুক ফেটে যায়।"[১৪১] 'কালান্তর' গ্রন্থের 'ছোট ও বড়ো' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—" ...দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিশের গুপ্ত দলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া—এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি। এ-যে পাপকে হীনতাকে রাজ পেয়াদার তকমা পরাইয়া দেওয়া। এ যেন রাতদুপুরে কাঁচা ফসলের খেতে মহিষের পাল ছাড়িয়া দেওয়া।"[১৪২]

দেশের কাজে নারীশক্তির যোগের কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন। কিন্তু যে উপায়ে সহিংস বিপ্লবপন্থীরা সেদিন নারীকে দেশের কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছে তার একটি নমুনা রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত করে তুলেছেন এ উপন্যাসে ইন্দ্রনাথের বক্তব্যের মধ্যস্থতায়। এলাকে সে বলেছে—" তোমার কাছ থেকে কাজ চাই নে, কাজের কথা সব জানাইও নে তোমাকে। কেমন করে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেটুকু বাদ দিয়ে কেবল শুখো মাইনেয় কাজ করাতে গেলে পুরো কাজ পাব না। আমরা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী নই। যেখানে কাঞ্চনের প্রভাব সেখানে কাঞ্চনকে অবজ্ঞা করি নে, যেখানে কামিনীর প্রভাব সেখানে কামিনীকে বেদীতে বসিয়েছি।"[১৪৩]

কামিনীর টানেই হোক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যে সেদিন অনেকে সহিংস বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে এসে ভীড় জমিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন উপন্যাসে। এই তথ্যটি ইতিহাসে দুর্লভ নয়। অতীন্দ্র চরিত্রটি তারই ফ্রেমে আঁকা। অতীন্দ্র পূর্বে একটি আশ্রমে যুক্ত ছিল। সেখানে তাঁর বহুসংখ্যক নানারঙা জামা ছিল। এমন সময়ে দেশে স্বদেশী বন্যার বান ডেকে যায়। এই বন্যার প্রবল বেগের মতই এলা অতীনের মনকে দখল করে বসে। এলা তার বক্তৃতায় জানিয়েছিল দেশের দুর্দিনে বহু নরনারীর লজ্জারক্ষার মত কাপড় জুটছে না। তাই আবশ্যকের অতিরিক্ত কাপড় যার আছে লজ্জা তারই। অতীন তাই তার সব জামা এলাকে দান করেছিল। কিন্তু দেশের প্রতি সমর্পিত হয়ে নয়, এলার টানেই।

এলার মত যারা সেদিন এই আন্দোলনে এসে ভীড় জমিয়েছিল তাদের অনেকেই এই আন্দোলনের মূল নীতির প্রতি একনিষ্ঠ ছিল না। এলার প্রতি অতীনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি পরিস্ফুট করে তুলেছেন—" তুমি বক্তৃতায় বললে, যে অশ্রুপ্লাবিত দুর্দিনে (মনে আছে অশ্রুপ্লাবিত বিশেষণটা ?) বহু নরনারীর লজ্জা রক্ষার মতো কাপড় জুটছে না, সে সময়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত কাপড় যার আছে লজ্জা তারই।

বেশ গুছিয়ে বলেছিলে। তখনো তোমার সম্বন্ধে প্রকাশ্যে হাসতে সাহস ছিল না। মনে মনে হেসেছিলুম। নিশ্চিত জানতুম আবশ্যকের বেশি জামা ছিল তোমার বাক্সে। ......সেদিন দেশহিতৈষিণীদের মধ্যে রেষারেষি চলছিল—কে কত দান সংগ্রহ করতে পারে। এনে দিলুম আমার কাপড়ের তোরঙ্গ তোমার চরণতলে। হাততালি দিয়ে উঠলে খুশিতে।”[১৪৪]

এলার কাছে ‘খদ্দরপ্রচার—ও একটা ছুতো’, তা অতীনও বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিল। জীবনের অনেকখানি পথ হেঁটে সে এলার কাছে স্পষ্টতই স্বীকার করেছে—“ সেদিন যে-পরিবেশের মধ্যে আমার কাছে দেখা দিয়েছিলে সে তো হায়ার ম্যাথামেটিক্স্ নয়, লজিক্ নয়। সেটা যাকে বলে মোহ। শংকরাচার্যের মতো মহামল্লও যার উপর মুদ্গরপাত করে একটু টোল খাওয়াতে পারেন নি। তখন বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে যাকে বলে কনে-দেখা মেঘ। গঙ্গার জল লাল আভায় টলটল করছে। ঐ ছিপছিপে ক্ষিপ্রগমন শরীরটি সেই রাঙা আলোর ভূমিকায় চিরদিন আঁকা হয়ে গেল আমার মনে।”[১৪৫] আর তাই অতীনের স্বদেশী দান মাত্রায় ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। এর গভীরে ছিল এলার মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়াস মাত্র। এলাও স্বীকার করেছে অতীনের কাছে—“ওগো, কতবার বলেছি—অনেকক্ষণ ধরে ডেকের কোণে বসে তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম আর-কেউ সেটা লক্ষ্য করছে কি না। জীবনে সেই আমার সব-চেয়ে আশ্চর্য একচমকের চিরপরিচয়। ......তখনই মনে মনে পণ করলুম, এই দুর্লভ মানুষটিকে টেনে আনতে হবে, কেবল আমার নিজের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে।”[১৪৬]

নারী-পুরুষকে তাদের স্বভাবের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিছক কতকগুলি ছাঁচে বাঁধা রাস্তায় মানুষকে কলের পুতুল বানিয়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিল এই শ্রেণীর সহিংস বিপ্লবীরা। তাতে জীবধর্ম যেমন লঙ্ঘিত হয়েছিল, আত্মশক্তির বিকাশও লঙ্ঘিত হয়েছিল। অথচ এই উল্লঙ্ঘন যখন স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটেছে তখন নারী-পুরুষকে তাদের দলের থেকে আবর্জনার মত ছেঁটে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। এভাবে যে স্বদেশী কর্তব্যের রথকে সেদিন চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তাকে সমর্থন করতে পারেননি। তাই অতীনের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন— “ হাঁ, তোমাদের স্বদেশী কর্তব্যের জগন্নাথের রথ। মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চোখ বুজে—এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল চিরজন্মের মতো পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উল্‌টোরথের যাত্রায়। ফিরল রথ। যাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না, পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেললে পথের ধুলোর গাদায়। আপন শক্তির ’পরে বিশ্বাসকেই গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারি পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হল। সর্দারের দড়ির টানে সবাই যখন একই নাচ নাচতে

শুরু করলে, আশ্চর্য হয়ে ভাবলে—একেই বলে শক্তির নাচ। নাচনওয়ালা যেই একটু আলগা দেয়, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ-পুতুল।"[১৪৭] দলের যারা এমনি করে ঝরে পড়ে ইন্দ্রনাথ তাদের কীভাবে ঝেঁটিয়ে ফেলে পুলিশের পাঁশতলায় সেকথা অতীন নিজেই জানিয়েছে।

স্বদেশের মুক্তি বা উন্নয়নের এই পথ ও পন্থার বিরুদ্ধেই অতীনের তথা রবীন্দ্রনাথের আপত্তি। মানুষের আত্মশক্তিকে তার বৈচিত্র্যময় পথে বিকশিত করতে না দিয়ে তাদের কেবল একটি সঙ্কীর্ণ মত ও পথের যান্ত্রিক জাঁতাকলে পিষে মারাকে দেশোন্নয়নের যথার্থ পথ বলে মনে করেননি রবীন্দ্রনাথ। অতীন তাই বলেছে—" নির্বিচারে সবারই একই কর্তব্য, গুরুমশায় কানে ধরে এই কথাটা বলতেই এত কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছে! তোমাকে মুখের উপরই বলছি ওদের যে-পাড়ায় অহংকার করে নম্রতা করতে যাও সেখানে তোমারও জায়গা নেই।"[১৪৮] নারীর মাধুর্যের দান আর পুরুষের প্রেম বা হৃদয়বৃত্তি, তাদের বিচিত্র প্রবর্তনাকে বাদ দিয়ে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশের পথই বা কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, মানুষকে তার স্বভাবের পথে বেড়ে উঠতে দিতে হবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মানুষের যে স্বকীয় প্রতিভা তার বিকাশের বন্দোবস্ত করতে হবে, তাকে সেই জীবনভূমিতেই প্রোথিত করতে হবে। কিন্তু সহিংসপন্থীদের মত ও পথ ছিল সম্পূর্ণ এর বিপরীত। মানুষের নিজস্বতা বা স্বাতন্ত্র্যকে, তাদের বাস্তবকে মুছে দিয়ে কৃত্রিম একটা ছাঁচে গড়ে তোলা। অতীন যে অভিজাত পরিবারের জীবনধারায় অভ্যস্ত তার পক্ষে তার জীবনের অনুকূল বহু কাজ ছিল যাতে করে দেশের হিত সাধনা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তার সেই জীবনধারায় বিকৃতি এনে তাকে ছাঁচে ঢালতে চাওয়ায় দেশের হিতসাধনাও হয়ে দাঁড়ায় কৃত্রিম, বাস্তবের সংস্পর্শশূন্য।

অনেকখানি মিথ্যে তাই অতীনকে ঘিরে ছিল। তাকে বাসা নিতে হয়েছিল কুলি-বস্তিতে। এর মূলে ছিল তার বংশের আভিজাত্যকে ধূলিসাৎ করবার দলীয় অভিপ্রায়। একে অতীন অভিহিত করেছে 'ডেমোক্রাটিক্ পিক্‌নিক' নামে। তাতে সে মজা পেয়েছে। জানিয়েছে—" গাড়োয়ান পাড়াতে ঘুরলুম। দাদা-খুড়োর সম্পর্ক পাতিয়ে চললুম বহুবিধ মোষের গোয়ালঘরের পাশে পাশে। কিন্তু তাদেরও বুঝতে বাকি ছিল না, আমরাও নয় যে এই সম্পর্কের ছাপগুলো ধোপ সইবে না। নিশ্চয় এমন মহৎ লোক আছেন সব যন্ত্রেই যাঁদের সুর বাজে, এমন-কি, তুলো-ধোনা যন্ত্রেও। আমরা নকল করতে গেলে সুর মেলে না। দেখো নি তোমাদের পাড়ার খৃষ্টশিষ্যকে ব্রাদার বলে যাকে-তাকে বুকে চেপে ধরা তার অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এতে খৃষ্টকে ব্যঙ্গ করা হয়।"[১৪৯]

জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করতে না পারলে যে কৃত্রিম হয় জীবনের গানের পসরা একথা রবীন্দ্রনাথের মত অতীনও বুঝেছিল। অতীন তাই বলেছে—"গোড়াতেই জানা উচিত ছিল মানুষ বেশিক্ষণ পুতুল-নাচ নাচতে পারে না। মানুষের স্বভাবকে হয়তো সংস্কার করতে পার, তাতে সময় লাগে। স্বভাবকে মেরে ফেলে মানুষকে পুতুল বানালে কাজ সহজ হয় মনে করা ভুল। মানুষকে আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব মনে করলেই সত্য মনে করা হয়। আমাকে সেই জীব বলে শ্রদ্ধা যদি করতে তা হলে আমাকে দলে তোমার টানতে না, বুকে টানতে।"[১৫০]

অতীন একসময় এলার প্রতি প্রেমকে দেশহিতের পিছনে প্রেরণাশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু এলাদের দেশের কাজে কীভাবে ইন্দ্রনাথেরা কামিনীর বেদীতে বসিয়ে ব্যবহার করে সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অতীন একদা মনে করেছিল দান্তে বিয়াত্রিচে যেন নতুন করে জন্ম নিল তাদের মাঝে। সেই ঐতিহাসিক প্রেরণা তার মনের ভিতর কাজ করেছে, দান্তের মতোই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আবর্তের মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল অতীন। কিন্তু যতই গভীরে গেছে ততই বুঝেছে—" কিন্তু তার সত্য কোথায়, বীর্য কোথায়, গৌরব কোথায়, দেখতে দেখতে অনিবার্য বেগে যে পাঁকের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে এল সেই মুখোশপরা চুরিডাকাতি-খুনোখুনির অন্ধকারে ইতিহাসের আলোকস্তম্ভ কখনো উঠবে না। আত্মার সর্বনাশ ঘটিয়ে অবশেষে আজ সে দেখছে কোনো যথার্থ ফল নেই এতে, নিঃসংশয় পরাভব সামনে। পরাভবেরও মূল্য আছে কিন্তু আত্মার পরাভবের নয়, যে পরাভব টেনে আনল গোপনচারী বীভৎস বিভীষিকায়, যার অর্থ নেই, যার অন্ত নেই।"[১৫১]

এই বীভৎস বিভীষিকার কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছে অতীন, যা তার জীবনের শোচনীয় পরাভবের সঙ্গে জড়িত মিশ্রিত হয়ে গেছে। এলার কাছে স্মৃতিচারিণায় জানিয়েছে, তার দল একদিন অনাথা বিধবার সর্বস্ব লুঠ করে এনেছে। বুড়ির গ্রামসম্পর্কে পরিচিত মন্মথ ছিল অতীনদের দলের অন্যতম সদস্য । খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে সে-ই এনেছে অতীনদের দলকে। ছদ্মবেশের মধ্যেও বিধবা তাকে চিনতে পেরে বলে উঠেছিল, 'মনু, বাবা তুই এমন কাজ করতে পারলি?' চেনাজানার ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় তারা বুড়িকে আর বাঁচতে দিলে না। অতীন সেই বীভিষিকাময় রাজনীতির পরিচয় দিয়ে জানিয়েছে—"যাকে বলি দেশের প্রয়োজন সেই আত্মধর্মনাশের প্রয়োজনে টাকাটা এই হাত দিয়েই পৌঁচেছে যথাস্থানে। আমরা উপবাস ভেঙেছি সেই টাকাতেই। এতদিন পরে যথার্থ দাগি হয়েছি চোরের কলঙ্কে, চোরাই মাল ছুঁয়েছি, ভোগ করেছি। চোর অতীন্দ্রের নাম বটু ফাঁস করে দিয়েছে। পাছে প্রমাণাভাবে শাস্তি না পাই বা অল্প শাস্তি পাই সেই জন্য পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্টের মারফত সে-মকদ্দমা ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়ের না হয়ে

যাতে বাঙালি জয়ন্ত হাজরার এজলাসে ওঠে কমিশনরের কাছ থেকে সেই হুকুম আনাবে বলে মন্ত্রণা করে রেখেছে। সে নিশ্চিত জানে কাল ধরা পড়বই।”[১৫২]

এলার পরিণামের মূলেও নিহিত রয়েছে রাজনীতির নামে সঙ্কীর্ণ স্বার্থদ্বন্দ্বের প্রেরণা, হীন চক্রান্তের গোপন অভীপ্সা। এলাকে তারই সহকর্মী বটু চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে পুলিশ তাকে ধরবে। কিন্তু সে এও লিখেছে যে, এলাকে সে বাঁচাতে পারে যদি এলার মত সুন্দরী তাকে বিবাহে রাজী হয়। অতীনের সম্মতি পেলেই সে পুলিশের সঙ্গে রফা করে অতীনকে কুমিরের গর্তে আশ্রয় দেবার পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করবে। তাই পুলিশকে সঙ্গে নিয়েই সে আসবে বলে জানিয়েছে। এমনি ঘৃণ্য হিংস্র চক্রান্তকেই সেদিন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পথ বলে একশ্রেণীর মানুষ গ্রহণ করেছিল। এলা-অতীনকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণে গত্যন্তরহীন করে তোলা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে এই ধরণের রাজনৈতিক পন্থার নিরর্থকতাকে রবীন্দ্রনাথ চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন।

একে রবীন্দ্রনাথ পেট্রিয়টিজম বলে মানেননি। যে পেট্রিয়টিজ্‌মের বিষবাষ্পের মধ্যে পৌরুষকে রক্ষার কোন উপায় নেই, তার দ্বারা যে পৃথিবীতে কোনো বড়ো কাজ করা সম্ভব নয়, তা মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ অতীনের বাচনিকতায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এ কথা ঠিক যে এমন আত্মঘাত পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রয়েছে। ন্যাশন্যালিজ্‌মের নাম করে সে সকল রাষ্ট্র সারা বিশ্বে আজ নির্মম নিষ্ঠুরতার আমদানি করছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় অতীনের মধ্য দিয়ে জানিয়েছেন—“দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিস্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে—এই কথা সত্য ভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ উদ্ধার চেষ্টার চেয়ে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা।”[১৫৩]

অথচ এর বাইরে দেশোন্নয়নের সহজ এক মানবিক পথ খোলা রয়েছে চিরকাল। সে পথ সাধনার পথ, সে পথ ত্যাগের পথ। সে পথ সচরাচর কেউ মাড়ায় না । তার একটি আভাসকে এ উপন্যাসেও চিহ্নিত করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘রাষ্ট্রবিপ্লবী রোম্যান্সে’র শেষ বা চূড়ান্ত পরিণাম হিসেবে যখন অতীনকে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, তখন সে আশ্রয় নেয় যে পল্লীর মধ্যে সেখানকার মানুষদের নিত্য প্রয়োজনে অতীনের ন্যায় শিক্ষিত যুবশক্তির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। “ কিছুদূরে পাটকলের মজুরদের বস্‌তি, তারা আমাকে মাস্টারবাবু বলে ডাকে। চিঠি পড়িয়ে নেয়, ঠিকানা লিখিয়ে নেয়, বুঝিয়ে নেয় দেনাপাওনার রসিদ ঠিক হল কি না। এদের কোনো কোনো সন্তানবৎসলার শখ, ছেলেকে একদিন মজুরশ্রেণী থেকে হুজুরশ্রেণীতে ওঠাবে। আমার সাহায্য চায়, ফলফুলুরি দেয় এনে, কারও বা ঘরে গোরু আছে দুধ জুগিয়ে থাকে।”[১৫৪]

এ কাজে অতীন নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সক্ষম হত। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মযজ্ঞে পল্লীকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার যে বিশেষ উদ্যোগ ছিল সে কাজে নিজেকে সঁপে দিয়ে অতীন জীবনের স্বতন্ত্র সার্থকতা পেতে পারতো। গ্রাম ও শহরকে এক সূত্রে বেঁধে পল্লীর অর্থনৈতিক অবস্থাকে মজবুত করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারতো। হয়তো এ কাজে সফলতা এত সহজে আসতো না, হয়তো ব্যর্থতা বার বার তাকে ঘিরে ধরতো, কিন্তু তাতে জীবনের কোন অন্ধকার গলিতে নিষ্ঠুরভাবে হারিয়ে যাবার ভয় ছিল না। যে সঙ্কীর্ণ রাজনীতির পথকে অতীন বেছে নিয়েছিল সে পথ থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় আর অবশিষ্ট ছিল না।

এক মারোয়াড়ির জীবনধারার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন অতীনের জীবনধারার একটি বিপরীত প্রবণতাকে চিহ্নিত করে দিতে চেয়েছেন, যার মধ্যে তার জীবন অন্য সার্থকতা পেতে পারতো । অতীন জানিয়েছে এলাকে—"এই পোড়ো দালানটা ওর দুজন ভাইপোর ট্রেনিং অ্যাকাডেমি । তারা ভোরবেলায় ছাতু খেয়ে কাজ করতে আসে, বস্তির মেয়েদের জন্যে সস্তাদামের কাপড় রঙায়, বেচে মূলধনের সুদ দেয়, আসলেরও কিছু কিছু শোধ করে। ঐ যে মাটির গামলাগুলো দেখছ, ও আমি আমার যজ্ঞের রান্নায় ব্যবহার করি নে; ওগুলোতে রঙ গোলা হয়। কাপড়গুলো তুলে রেখে যায় ঐ বাক্সের ভিতর, তা ছাড়া ওতে আছে বস্তির মেয়েদের প্রসাধনযোগ্য নানা জিনিস—বেলোয়ারি চুড়ি, চিরুনি, ছোটো আয়না, পিতলের বাজু। রক্ষা করবার ভার আমার উপর আর প্রেতাত্মার উপর। বেলা তিনটের সময় সওদা করতে বেরোয়, এখানে আর ফেরে না। কলকাতায় মাড়োয়ারি জানি নে কিসের দালালি করে। আমার ইংরেজি জানার লোভে আমাকে অংশীদার করতে চেয়েছিল, জীবের প্রতি দয়া করে রাজি হয় নি।"[১৫৫]

সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষুদিরাম বাঘাযতীনের মতো অনেক আদর্শ বীর সেদিন দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন—একথা ঐতিহাসিক সত্য। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু সন্ত্রসবাদী বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে 'চার অধ্যায়' লিখেছিলেন একারণে অনেকেই এ উপন্যাসের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। এই রবীন্দ্রসৃষ্টিকে কেউ কেউ বিপ্লবীদের প্রতি অশ্রদ্ধা-প্রকাশ বলেও মন্তব্য করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেওয়া সকল সদস্যকেই হীন বলে মন্তব্য করেননি বা তাঁদের উদ্দেশ্য অসৎ বলে চিহ্নিত করেননি। বীর যোদ্ধাদের প্রতি তিনি এ উপন্যাসে যথাস্থানে শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। কিন্তু আন্দোলনের সিংহভাগ জুড়ে থাকা যে খুন-জখমের বীভৎস পাশবিকতা, তরুণ যুবশক্তির অপচয় –যা দেশের গঠনমূলক কাজে এলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হতে পারতো—তাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, আমাদের মধ্যেকার খোলাচোখের মানুষেরা তাদের মুক্ত দৃষ্টি দিয়েই

উপলব্ধি করেছেন 'চার অধ্যায়ে'র বাস্তব প্রাসঙ্গিকতাকে। ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'রবীন্দ্রউপন্যাস: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে' গ্রন্থে তাই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন—

"......অসাধারণ পণ্ডিত ইন্দ্রনাথ; দুঃসাধ্যসাধক তার প্রতিভা। কিন্তু কার্যকারণের, অথবা ভাগ্যেরো, চাপে যদি সেই অপূর্বনির্মাণ বস্তু-ক্ষমতা তার সহজ সাফল্যের পথ খুঁজে পেত, তাহলে ইন্দ্রনাথ এ-পথে কী আসতেন? বিপরীত প্রশ্নটি হতে পারে, জোড় মিলল না বলেই ঐ জোড়-ভাঙা আগুন নিয়ে খেলায় মাতলেন না কী তিনি?

অর্থাৎ, জোড় মেলানোর সমস্যাকে কেবল অন্ত-এলার নয়—ইন্দ্রনাথেরও, আসলে সবাইকারই। স্ববিরোধ আর আত্মখণ্ডনে ছাওয়া আধুনিক জীবনের আরো একটি ইতিহাস-ধৃত দীপ্ত চোরাগলি ঐ ইন্দ্রনাথের দেখানো পথ—প্রবেশের দ্বার আছে, মানবাত্মার নির্গমনের নয়। তথ্য-সন্ধানীর বিচার এবং গণনা একালেও মিলছুট হবে—ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের ধারায় সন্ত্রাস মূলক বিপ্লবের দান কতটুকু, কিংবা কতটুকু ঐ গণজাগরণমূলক প্রকাশ্য আন্দোলনের। তা নয়ত, 'শঠে শাঠ্য-সমাচরণ'-এর রাজনৈতিক পাশা খেলায় অনেক মহাপ্রাণ বলি যেমন হয়েছে—তেমনি কতটা নির্জিত হয়েছে মানবধর্ম-মানুষের আত্মার ধন! কিন্তু এ-কথা মানতেই হবে, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট এর পরে ঐ যুগ-যুগব্যাপী জীবনমন্থক উত্তাল আলোড়ন ইতিহাসের ভগ্নস্তূপে আসন নিয়েছে; পরবর্তীকালের দরবারে কোনো 'বাণী'র আশ্রয়ই রেখে যেতে পারেনি সে আমাদের জন্যে। আগের কথা ছেড়ে দিলেও বিশশতকের প্রথম ৪৭ বছরের অসাধ্যসাধন, পরবর্তী প্রতিদিন, মাস-বছরে কত নিরর্থ হয়ে আজ বিলুপ্ত-বিস্মৃত হয়ে পড়েছে—রিক্‌থ রেখে যেতে পায়নি উত্তরসুরীদের জন্য একবিন্দু। আমাদের কালের এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে দাঁড় করিয়ে 'চার অধ্যায়'-এর জীবনবাণীর ঐতিহাসিক মূল্য আবার যাচাই করবার মতো।"[১৫৬]

খ. রবীন্দ্র-ছোটগল্পে পল্লীপ্রসঙ্গ :

কলকাতার জন-কোলাহলের বাইরে গিয়ে শিলাইদহ-সাহজাদপুরের পল্লী-পটভূমির মাঝে বসে রবীন্দ্রনাথ পল্লীকে তার যথার্থ স্বরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। দেখেছেন শোষণ-পীড়ন, অস্বাস্থ্য-অশিক্ষা, জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা, অভাব-দারিদ্র্যে ক্ষীণ শতচ্ছিন্ন গ্রাম্য জীবনের ছবি। ভারতবর্ষের মতো দেশের পক্ষে সেই ছবিই ছিল দেশের প্রাণকেন্দ্রের যথার্থ ছবি। তাই এই পল্লীবাংলাকে দূরে রেখে, তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, নগরকেন্দ্রিক নিছক রাজানৈতিক প্রচার, সভা-সমিতি্র দ্বারা যে আমাদের দেশের যথার্থ হিত হতে পারে

না— এই মৌল সত্যটুকু রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছিল। তাই পল্লীর যথার্থ মঙ্গলের জন্য রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রাণপাত করে গেছেন, তার জন্য নানা পরিকল্পনাকে গেঁথে তুলেছেন, তার সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছেন। তাঁর সেই ভাবনা-চিন্তার নানা অনুষঙ্গ সমসাময়িক নানা গল্পের আধারে রূপ লাভ করেছে। গল্পের আধারে বিধৃত সেই পল্লীচিত্রকে কালানুক্রমিক নিম্নোক্ত বিন্যাস দেওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গল্পরচনা 'ঘাটের কথা'। ১২৯১-এর কার্তিক মাসে গল্পটি রচিত হয়। এ গল্পের সমকালীন পল্লীচিত্রে দেখা মেলে কুসুম নাম্নী একটি মেয়ের। সামাজিক বাল্যবিবাহ প্রথার শিকার সে। পল্লীসমাজে নারীরা সে সময় কতটা অসহায়, কতটা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মুখাপেক্ষী তার পরিচয় আছে এ গল্পে কুসুমের জীবনচিত্রে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"কুসুম বিধবা হইয়াছে। শুনিলাম তাহার স্বামী বিদেশে চাকরি করিত; দুই-একদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎই হয় নাই। পত্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বৎসর বয়সে মাথার সিঁদুর মুছিয়া গায়ের গহনা ফেলিয়া আবার তাহার দেশে সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে।"[১৫৭]

পত্রযোগে যে সংবাদ কুসুম শুনেছিল তার মধ্যে সত্য ছিল না। সত্য প্রকাশ পায় বেশ কয়েক বছর পরে যখন সন্ন্যাসীপ্রতিম তার স্বামীদেবতাটি তাদেরই গ্রামের ভাঙা শিবমন্দিরে এসে আশ্রয় নেন। পল্লীর মানুষের মনে যে সন্দেহই থাক না কেন কুসুম কিন্তু প্রথম দর্শনেই চিনেছিল তার স্বামীদেবতাটিকে। কুসুমের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সন্ন্যাসীর ভাব-অভিব্যক্তির যে ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তাতে বোঝা যায় তার স্বামীও তাকে বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিল। আর তাই, কুসুম ঘরে ফিরে যাওয়ার পর –"সে-রাত্রে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার সোপানে বসিয়া ছিলেন। অবশেষে যখন পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে আসিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।"[১৫৮] সন্ন্যাসীর এই মানসিক অস্থিরতা যে কুসুমের সঙ্গে সাক্ষাতের কারণেই তার ইঙ্গিত দিতে রবীন্দ্রনাথ ভোলেননি।

এই অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পল্লীজীবনের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আচার-সংস্কারের একটি ছবিকে ফুটিয়ে তুলেছেন—"নারী সমাজে অল্পকালের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল । তাঁহার কাছে পুরুষও বিস্তর আসিত। কোনোদিন ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোনোদিন মন্দিরে বসিয়া নানা শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন করিতেন। তাঁহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত, কেহ মন্ত্র লইতে আসিত। কেহ রোগের ঔষধ জানিতে আসিত।"[১৫৯] পল্লীর শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সচেতনতার নিদারুণ অভাবের দিনে একজন আত্মশক্তিতে বলিয়ান মানুষের ভূমিকা কতটা গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল এই দৃষ্টান্তটি তারই পরিচয় বহন করে। অবশ্য একথা ঠিক যে নানা গুণের অধিকারী হয়েও সন্ন্যাসী কুসুমকে জীবনে গ্রহণ করার সাহস দেখাতে

পারেনি। তাই কুসুমকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়। কেননা রবীন্দ্রসাহিত্যে তখনো 'সবুজপত্র' পর্বের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপরায়ণা নারীচরিত্রের আবির্ভাব ঘটেনি।

নারীর স্বাধিকারের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ সওয়াল করেছেন এবং তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর একটি বিশেষ দিকই ছিল নারীর স্বাধিকার রক্ষা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের পণ্য হিসেবে পরিগণিত হওয়াকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার জানিয়েছেন তাই তাঁর একাধিক গল্পে। 'দেনাপাওনা' অনুরূপ একটি গল্প। এ গল্পে রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে রামসুন্দরের একমাত্র কন্যার বিবাহ ঠিক হয় মোটা পণের বিনিময়ে—"বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল।"[১৬০] রামসুন্দর ভালো পাত্র হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে এ প্রস্তাবে সম্মত হলেও পরে বিবাহের নির্দিষ্ট দিনে সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে উঠতে পারলেন না। 'বাঁধা দিয়া বিক্রয় করিয়া, অনেক চেষ্টাতেও হাজার ছয়-সাত বাকি রহিল।'[১৬১] ফলে বিবাহ সভায় এ নিয়ে তুমুল গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়।

রায়বাহাদুর স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দেন " টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।"[১৬২] কিন্তু রায়বাহাদুরের শিক্ষিত ছেলে স্পষ্ট বাক্যে জানান—" কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।"[১৬৩] রবীন্দ্রনাথ এর দ্বারা স্বল্প অবসরে হলেও পল্লীর মানুষের মধ্যে নীতি বা শাস্ত্র শিক্ষার ঊর্ধ্বে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ইতিবাচক দিকটিকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। লেখক তাই জানিয়েছেন—" বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদূর হতোদ্যম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষন্ন নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।"[১৬৪]

রায়বাহাদুরের শিক্ষিত ছেলের হস্তক্ষেপে বিবাহপর্বের ইতি ঘটে ঠিকই কিন্তু এরপর নিরুপমার শ্বশুর বাড়িতে নিরুপমার উপর শুরু হয় অকথ্য মানসিন নির্যাতন। পণের মূল্যেই এক নারীর যা কিছু সামাজিক মূল্য এই বিষয়টাকে নিরুপমা নিজেও মেনে নিতে পারে না। পিতা রামসুন্দর মেয়ের কল্যাণের কথা ভেবে নিজের বসতবাড়ী বিক্রি করে, ছেলেদের পথে বসিয়ে, পণের অর্থ নিয়ে রায়বাহাদুরের বাড়ি উপস্থিত হন। তখন নিরুপমার মধ্যে জেগে ওঠে নারীর স্বাধিকার বোধ বা নারী-স্বাতন্ত্র্যচেতনা। পিতার সঙ্গে নিরুপমার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিরুপমার নারীত্বের জাগরণকে চিহ্নিত করেছেন, তার স্বাধিকার চেতনার উদ্গমকে দেখিয়েছেন—

" নিরুপমা সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কহিল, " বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তা হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁইয়ে বললুম।"

রামসুন্দর বলিলেন, " ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর এ টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি তা হলে তোর বাপের অপমান আর তোরও অপমান।"

নিরু কহিল, " টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তা ছাড়া আমার স্বামী তো এ টাকা চান না।"[১৬৫]

এই অধিকার চেতনা থেকে নিরুপমা সরে আসেনি। সে 'সবুজপত্র' পর্বের মৃণালদের মতো প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের পথকে হয়তো বেছে নেয়নি, কিন্তু আত্মক্ষয়ের দ্বারা নিঃশব্দ বিপ্লবের পন্থাকে সে বেছে নিয়েছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সঙ্কীর্ণ সামাজিক সংস্কার, পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা বিরোধিতা করেছে। নারীত্বের স্বতন্ত্র মর্যাদাকে ঘোষণা করেছে। এ গল্পের সমাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ সমাজের লোলুপ পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতাকে জানান দিয়েছেন একটি মাত্র মর্মস্পর্শী বাক্যবন্ধে—" এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।"[১৬৬] কিন্তু রায়বাহাদুরের যে শিক্ষিত সন্তান বিবাহ সভায় পণের বিরুদ্ধে বেঁকে বসে মানবিকতার পরিচয় রেখেছিলেন তিনি যখন নিজের স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনবেন তখন তিনি রায়বাহাদুরের স্ত্রীর দ্বারা দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগে সম্মতি জানাবেন নাকি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধতায় নামবেন, সে প্রশ্নটি অবশ্য গল্পে রবীন্দ্রনাথ উহ্য রেখে দিয়েছেন। জ্যোতির্ময় ঘোষ মন্তব্য করেছেন—"দেনাপাওনা গল্পে পণ প্রথায় জর্জরিত বধূ ও বধূর পিতার দুঃসহ দুঃখ ও আমাদের বাস্তব চিত্র সমাজ বিবেকের 'পরে শিক্ষনীয় চাবুক হেনেছে। বধূ-নির্যাতন ও কার্যত বধূহত্যার নির্মম চিত্র অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথ।"[১৬৭]

রবীন্দ্রনাথ প্রায় ১৮৯০-এর পর থেকে পল্লীর মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। পল্লীর ভিতরে প্রবেশ করে তার প্রকৃত রূপটিকে দেখে সেই সময়ের তার নানা অভিজ্ঞতার কথা চিঠিপত্রে ব্যক্ত করেছেন। গল্পটি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে রচনা করেছেন ছিন্নপত্রাবলীর ৬২ ও ১৭ সংখ্যক পত্রে উল্লেখ আছে। পল্লীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় অপ্রতুলতা, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের অনুরূপ স্পষ্ট বর্ণনা আছে 'পোস্টমাস্টার' গল্পে। এ গল্পের শুরুতেই লেখক তাই জানিয়েছেন—

" প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্টাপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসৎ প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।"[১৬৮]

একারণেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীর উন্নয়নের অন্যতম পন্থা হিসেবে আগাছা ও পথঘাট পরিষ্কার করে পল্লীর পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এখানে যে পানাপুকুরের উল্লেখ রয়েছে, তা ছিল তৎকালীন পল্লীগুলির ম্যালেরিয়ার প্রধান উৎপত্তিস্থল। এ গল্পের ছবিতে পোস্টমাস্টারকে তাই মশক বিতাড়নে ব্যস্ত থাকতেও দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথ একারণেই পল্লীর পুকুর গুলির সংস্কারের দ্বারা তার পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দারিদ্র্যপীড়িত পল্লীর কুটিরগুলির জীর্ণ দশার বর্ণনা আছে এ গল্পে। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়—

" পোস্টমাস্টারের ঘরখানির বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

'মিট্‌মিট্‌ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপ্‌টপ্‌ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।' বর্ষায় পল্লিগ্রামের জীর্ণঘরের একখানি অনবদ্য চিত্র!"[১৬৯]

গল্পের উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে অপর যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হল গ্রাম ও শহরের পার্থক্যের দিকটি। শহরাঞ্চলের পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পল্লীর অপেক্ষা যে অনেক গুণেই স্বাস্থ্যকর ছিল তার প্রধান কারণ বহুদিন ধরে আমাদের দেশের পল্লী উপেক্ষিতা থেকেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'উপেক্ষিতা পল্লী' প্রবন্ধের মধ্যে এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। এই অশিক্ষা দারিদ্র্য পল্লীর মানুষগুলিকে যেভাবে গড়ে তুলেছিল তার সঙ্গে স্বভাবতই শহুরে রুচিশীল সাহিত্যানুরাগী মনের বিস্তর পার্থক্য গড়ে উঠেছিল। শহরের মানুষ পল্লীর প্রতিবন্ধকতার কথা না ভেবেই কিন্তু পল্লীর মানুষের প্রতি উন্নাসিক মানসিকতার স্বাক্ষর রেখেছে। পোস্টমাস্টার তাই পল্লীর কোন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে, নায়েব গোমস্তার থেকে সে নিজেকে ভদ্রজনোচিত দূরত্বে সরিয়ে রেখেছে।

এই বিচ্ছিন্নতাই আমাদের দেশের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিচ্ছিন্নতার মাত্রা এত গভীর যে 'পোস্টমাস্টার' এ পরিবেশে এসে নিজেকে জল থেকে তোলা মাছের মতই অসহায় বোধ করেছে| গ্রাম শহরের এই পার্থক্য আমাদের দেশকে কতটা আত্মবিচ্ছিন্ন করে তুলেছে, কতটা স্বতন্ত্র মানসিকতার জন্ম দিয়েছে তার পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে—"বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড় সুখে কাটিয়া যায়—কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোন দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখা-পল্লব সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয় এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।"[১৭০]

পোস্টমাস্টার এবং রতনের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা তার মূলে যে গ্রাম ও শহুরে মানসিকতার একটি দ্বন্দ্ব কাজ করেছে, তা কোন কোন সমালোচক নির্দেশ করেছেন। 'পৃথিবীতে কে কাহার'—এ তত্ত্ব পোস্টমাস্টারের মনে উদিত হলেও রতনের মনে এমন কোন তথ্যের উদয় ঘটেনি। তার মন কিন্তু পোস্টমাস্টারের গৃহের চতুর্পার্শ্বে তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় অধীর হয়ে ফিরেছে। এ আসলে দুই স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্ধিত দুই স্বতন্ত্র মানসিকতারই ফলপরিণাম। শহুরে মানুষের যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা পোস্টমাস্টারের জীবনের গভীরে ক্রিয়াশীল থেকে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

পল্লীর মামলা-মকদ্দমার প্রাথমিক নিরসন যাতে পল্লীর মধ্যেই আলাপ-আলোচনা দ্বারা মিটিয়ে নেওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীতে তারই আয়োজন রেখেছিলেন। এর দ্বারা আইনি জটিলতা ও আর্থিক ক্ষতির দিকটিকে এড়ানো সম্ভব হত। কিন্তু এর বিপরীতে পল্লীর সাধারণ গৃহস্থের কাছে মামলা মকদ্দমা কী ভয়ঙ্কর বিপদ ও বিপর্যয় ডেকে আনতো তার পরিচয় পাই 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পে। এ গল্পে রামকানাইয়ের ভাই গুরুচরণ মৃত্যুকালে তার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রী বরদাসুন্দরী দেবীকে উইল করে যান। কিন্তু রামকানাইয়ের 'বড়ো আশা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠামহাশয়ের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগন্ন ছিলেন তথাপি এই আশায় নবদ্বীপের মা নবদ্বীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই—এবং সকাল-সকাল বিবাহ দিয়েছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই|'[১৭১] রামকানাই দাদার সিদ্ধান্তকে মেনে নিলেও নবদ্বীপ ও তার মায়ের

পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলস্বরূপ নবদ্বীপ ও বরদাসুন্দরী পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যে উইল জালের অভিযোগ করে আদালতে যায়। কিন্তু আদালতের বিচারপর্বের শেষে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি নবদ্বীপকে যেভাবে মিথ্যা মামলার দায়ে কারাবরুদ্ধ হতে হয়েছে, সত্যের পথ অবলম্বন করতে গিয়ে পুত্রের বিপর্যয়ে রামকানাইয়ের যে নির্মম মৃত্যু ঘটেছে তার দ্বারা এই আয়োজনের অনাবশ্যকতার দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন সচেতন ভাবেই।

'ব্যবধান' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ বিষয়টিকে চড়া রঙে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পের মামাতো পিসতুতো ভাই বনমালী ও হিমাংশুদের বাড়ির মাঝের নালার অধিকারকে কেন্দ্র করে যে বিরোধের বাতাবরণ গড়ে ওঠে তা শেষ পর্যন্ত মামলা পর্যন্ত গড়ায়। এর ফলশ্রুতিতে দুই পরিবারকে যে বিপুল আর্থিক ক্ষতির সামনাসামনি হতে হয় তার নেতিবাচক দিকটিকে রবীন্দ্রনাথ উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া এর বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

"ইতিমধ্যে এক গোল বাধিল। বনমালীদের বাগান এবং হিমাংশুদের বাড়ির মাঝখানে জল যাইবার একটি নালা আছে। সেই নালার এক জায়গায় একটি পাতিনেবুর গাছ জন্মিয়াছে। সেই গাছে যখন ফল ধরে তখন বনমালীদের চাকর তাহা পাড়িতে চেষ্টা করে এবং হিমাংশুদের চাকর তাহা নিবারণ করে এবং উভয় পক্ষে যে গালাগালি বর্ষিত হয়, তাহাতে যদি কিছুমাত্র বস্তু থাকিত তাহা হইলে সমস্ত নালা ভরাট হইয়া যাইত।

মাঝে হইতে বনমালীর বাপ হরচন্দ্র এবং হিমাংশুমালীর বাপ গোকুলচন্দ্রের মধ্যে তাহাই লইয়া ঘোর বিবাদ বাধিয়া গেল। দুই পক্ষে নালার দখল লইয়া আদালতে হাজির।

উকিল-ব্যারিস্টারদের মধ্যে যতগুলি মহারথী ছিল, সকলেই অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ বাকযুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের যে টাকাটা খরচ হইয়া গেল, ভাদ্রের প্লাবনেও উক্ত নালা দিয়া এত জল কখনো বহে নাই।" [১৭২]

'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্পে দেখা যায় পল্লীর মানুষের শহর-নির্ভরতার ছবিটিকে। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানকে জনসমক্ষে আনার তাগিদে তারাপ্রসন্ন যে পুস্তক প্রকাশনার বন্দোবস্ত করে তার জন্য তাকে শহরে গিয়ে যাবতীয় বন্দোবস্ত করতে হয়। পল্লীর মধ্যে এ জাতীয় আয়োজন ছিল না। শিক্ষার অপ্রতুলতা পল্লীর মানুষকে কতটা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে তার পরিচয় আছে তারাপ্রসন্ন-গৃহিণীর আচরণে। নিজের স্বামীকে কলকাতায় প্রেরণ করার পূর্বে তাকে যেভাবে নানাপ্রকার মাথার দিব্যি ও মাদুলিতাগায় আচ্ছন্ন করেছে, পরবর্তী সময়েও স্বামীকে স্বপ্নলব্ধ ঔষধ ও মাদুলি সম্বন্ধে যে সকল অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছে,তাতে তার অনুরূপ মানসিকতার পরিচয় মেলে।

পল্লীর শিক্ষাদীক্ষার যা অবস্থা তাতে তারাপ্রসন্নের সাহিত্যকৃতিকে বোঝার মতো সক্ষমতা পল্লীর অধিকাংশ লোকের ছিল না। তারাপ্রসন্নের নিজের চেতনার সঙ্কীর্ণতা সে দিকের প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত দেয়।

শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও যে কত দুর্বল ছিল তার পরিচয় মেলে এ গল্পে তারাপ্রসন্নের স্ত্রীর সন্তান প্রসবের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সন্তান প্রসবের জন্য পল্লীর অশিক্ষিত পটু ধাত্রীমাতারাই ছিল একমাত্র সম্বল। তারা তাই তারাপ্রসন্নের স্ত্রীর প্রসব সমস্যার সমাধানে অসমর্থ হয়। তারাপ্রসন্নকে অনেক ধার দেনা করে শহর থেকে শিক্ষিত দাই আনাতে হয়। কিন্তু তাতে এতটাই সময়ের অপচয় ঘটে যে তারাপ্রসন্নের সন্তানকে বাঁচানো গেলেও স্ত্রীকে বাঁচানো অসম্ভব হয়। কেবলমাত্র কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার অপবাদ থেকে মুক্তি নিয়ে তার মৃত্যু ঘটে। পল্লীসমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার, নারীর স্বাধিকার বা মর্যাদার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর বিবিধ কর্মসূচিকে সাজিয়ে তুলেছিলেন, তার মূলেও ছিল সামাজিক এই বিভেদ নীতিকে দূরীভূত করার ঐকান্তিক প্রয়াস।

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পেও রাইচরণের শহরনির্ভরতার ছবি স্পষ্ট। যশোহর জেলা থেকে জীবন-জীবিকার প্রশ্নে তাকে কলকাতার বাবুদের বাড়িতে কাজ নিতে হয়। সামাজিক জাত-পাত অস্পৃশ্যতার বেড়াজাল সেদিনের কলকাতার মতো শহরেও ছিল, আজো আছে। রাইচরণ জাতিতে কায়স্থ বলেই কায়স্থ প্রভুর বাড়িতে কাজটুকু জোটাতে পারেছিল। অনুকূল বাবুর স্ত্রী সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সন্তানকামনায় যেভাবে বহুমূল্য শিকড় ও আশীর্বাদ কিনেছেন তার মধ্যেও অন্ধ সংস্কার ও বিশ্বাসের পরিচয় আছে। পল্লীর মানুষ হিসেবে রাইচরণ নিজে যেভাবে নিজের সন্তান ফেল্‌নাকে অনুকূল বাবুর মৃত সন্তানের পুনরাবির্ভূত রূপ হিসেবে কল্পনা করেছে, তার মধ্যেই পল্লীর অশিক্ষিতপটু মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের পরিচয় মেলে—

" এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমত, সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টল্‌মল্ করিয়া চলে এবং পিসিকে পিসি বলে। যে সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে।"[১৭৩]

বাংলার সবুজ করুণ ডাঙার কথা জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় বার বার বলেছেন। কিন্তু সে কথা রবীন্দ্রনাথের গল্পের আধারে ধরা পড়েছে এর বহু পূর্বেই। নদীমাতৃক বাংলাদেশের পল্লীগুলি বার বার প্লাবনে ভেসেছে, কোথাও বা নদীর গ্রাসে তলিয়ে গেছে। সে ধারা আজো বর্তমান। এই বিপর্যয়ে পল্লীর সমাজ-অর্থনীতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

পল্লীর এই বিপর্যস্ত অর্থনীতি এখানকার মানুষকে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল করে তোলে। রাইচরণকে তাই তার পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় নিজের অবশিষ্ট জোতজমি বিক্রয় করে। রবীন্দ্রনাথ একাধিক বাঁধ নির্মাণের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। নদীবাঁধের ভাঙন বা প্লাবনে বিপর্যস্ত পল্লীজীবনের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্পের আধারেও—"বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুত বেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্র গতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।"[১৭৪]

'সম্পত্তি-সমর্পণ' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের মধ্যেকার সনাতন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের যে বোঝা চেপে বসেছে তার এক ভয়াবহ পরিণামকে চিহ্নিত করে সমাজ-প্রগতির স্বপক্ষে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনাকে যুক্তি দিয়ে বুঝে নেবার পক্ষে সওয়াল করেছেন। তাঁর এই বিশেষ মানসিকতার বাহক হয়ে উঠেছে এ গল্পের বৃন্দাবন চরিত্র। এ গল্পে বৃন্দাবন ও পিতা যজ্ঞনাথের যে দ্বন্দ্ব তাকে দুই কালের দুই বিশেষ মানসিকতার দ্বন্দ্ব হিসেবেই ধরতে হবে। এ সংঘাত আসলে দুই স্বতন্ত্র আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে বেড়ে ওঠা দুই প্রজন্মের স্বতন্ত্র মানস কাঠামোর দ্বন্দ্ব বিশেষ।

বৃন্দাবন এ গল্পে নতুন কালের সমাজ-প্রতিভূ। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে আমাদের দেশের পল্লীগুলির ভিতরেও ভাঙনের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সে ভাঙন কেবল গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভাঙনমাত্র নয়, সে ভাঙন লেগেছিল মনের একুল-ওকুল জুড়ে। শিক্ষিত বৃন্দাবনের মনও তাই নতুন কালের চেতনা ও শিক্ষার স্পর্শে লালিত হয়ে উঠেছিল। অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কারের হাতে জীবনকে ছেড়ে না দিয়ে তার উপর নিজের অঙ্কুশ দৃঢ় করার চেষ্টা করেছে সে।

এ নিয়েই পিতা পুত্রের দুই স্বতন্ত্র মানসিকতার বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নতুন কালের ভোগবাদী চেতনা বৃন্দাবনকে যে পথে চালিত করেছে তাতে দেখা গেছে "শীতগ্রীষ্ম-ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর পার্থিব সমাজের অনুকরণে কাপড়ের বহর এবং আহারের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে।" যজ্ঞনাথ পুত্রের এই বিশেষ মানস-প্রবণতায় বাধ সাধতে চেয়েছে। বৃন্দাবনের স্ত্রীর গুরুতর পীড়ার সময় কবিরাজ বহুব্যয়সাধ্য এক ঔষধের ব্যবস্থা করায় যজ্ঞনাথ তাতে কবিরাজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় বেয়ে তাকে বিদায় করে দেয়। বৃন্দাবন বাপের হাতে-পায়ে ধরে রাগারাগি করেও তাকে টলাতে পারলো না। এই রক্ষণশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি দাঁড়ায় বৃন্দাবনের স্ত্রীর মৃত্যুতে। এমন কুসংস্কার ও বিশ্বাস বা গ্রাম্য মানসিকতার বলি হয়ে কত মানুষকেই রবীন্দ্রনাথ অকাতরে

প্রাণ দিতে দেখেছেন। বৃন্দাবনের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাই যজ্ঞনাথের সংস্কারাচ্ছন্ন মন বলতে পেরেছে—" ... 'কেন, ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না? দামি ঔষধ খাইলেই যদি বাঁচিত তবে রাজা-বাদশারা মরে কোন্ দুঃখে! যেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে, তোর দিদিমা মরিয়াছে, তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশি ধুম করিয়া মরিবে।'"[১৭৫]

বৃন্দাবনের মা-দিদিমারা বাস্তবিকই মরার সময় ঔষধ খাননি। এটাই ছিল বৃন্দাবনের বাড়ির সনাতন প্রথা। কিন্তু সনাতন প্রথাকে নতুন কাল কখনো সমীহ করে চলে না। পরিবর্তিত সমাজ-অর্থনীতি-প্রসূত মূল্যবোধ তাকে আঘাত দেয়। পল্লীর অধিকাংশ মানুষ এই পরিবর্তিত মূল্যচেতনা থেকে কত দূরবর্তী ছিল, কুসংস্কারের ভূত তাদের কাঁধে কি ভীষণ ভাবে চেপে বসেছিল, তার বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—" কিন্তু আধুনিক লোকেরা প্রাচীন নিয়মে মরিতেও চায় না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এ দেশে ইংরেজের নতুন সমাগম হইয়াছে, কিন্তু সে সময়েও তখনকার সে সময়ের লোক তখনকার একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিক করিয়া তামাক টানিত।"[১৭৬]

পল্লীর সে কালের মানুষ পিতৃতান্ত্রিকতার বশবর্তী হয়ে তাই যজ্ঞনাথকে বলেছে 'সামান্য একটা বউয়ের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল এ কালেই সম্ভব'। এ সমাজ নারীর স্বাধিকার বা সম্মান নিয়ে আদৌ ভাবিত নয়। কিন্তু 'নব্য বৃন্দাবন' এ যুক্তির উপর যে আদৌ আস্থা রাখতো না এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট উচ্চারণ রেখেছেন—" বিশেষত তাহারা খুব একটা যুক্তি দেখাইল; বলিল, একটা বউ গেলে অনতিবিলম্বে আর-একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না। যুক্তি খুব পাকা সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, বৃন্দাবনের মতো ছেলে এ যুক্তি শুনিলে অনুতপ্ত না হইয়া বরং কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইত।"[১৭৭]

এ গল্পে যজ্ঞেশ্বরের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের নির্মম পরিণতি চিত্রিত হয়েছে মাটির নীচে নিজের দৌহিত্র নিতাইকে যেভাবে যক্ষের দায়িত্ব সমর্পণ করে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, তার মধ্য দিয়ে। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর যখন জেনেছে যে, সে তার নিজের নাতিকেই নিজ হাতে হত্যা করেছে, সেই অপরাধবোধ তাকে অন্তরে দগ্ধ করেছে অনিবার। এরই চূড়ান্ত পরিণামে যজ্ঞেশ্বর নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়েছে। যজ্ঞেশ্বরের করুণ পরিণতির মূলে যে সঙ্কীর্ণ চেতনাপ্রসূত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস কাজ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই গল্পটির কেন্দ্রীয় ভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—" দেশে তন্ত্রধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক অভিচারে বিশ্বাস, দৈবানুগ্রহমূলক সম্পদলাভ সাধারণ গৃহস্থের অস্থিমজ্জাগত প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে ও এই সাধনা প্রক্রিয়ায় নৃশংশতা তাহাদের অন্ধ মোহের নিকট বিলুপ্ত হইয়াছে। ......"[১৭৮]

'ত্যাগ' গল্পেও পল্লীর সমাজ জীবনে জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার গভীর বেড়াজাল মানুষকে কতটা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, কতটা জীবনের গভীর বিপর্যয় ডেকে আনছিল তার পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এ গল্পে কালাপানি পেরোনোর মর্মান্তিক শাস্তির কথা যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি কুসুমের পিতা প্যারিশঙ্কর হেমন্তদের জাতিনাশ করে নিজের প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করেছেন। হেমন্তকে তিনি তাই বলেছেন— " আমার জামাতা নবকান্ত আমার কন্যার গহনা চুরি করিয়া যখন পালাইয়া বিলাতে গেল, তখন তুমি শিশু ছিলে।" তাহার পড় পাঁচ বৎসর বাদে সে যখন বারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল তখন পাড়ায় যে একটা গোলমাল বাধিল তোমার বোধ করি কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে। কিংবা তুমি না জানিতেও পার, তুমি তখন কলিকাতার স্কুলে পড়িতে। তোমার বাপ গ্রামের দলপতি হইয়া বলিলেন—মেয়েকে যদি স্বামীগৃহে পাঠানো অভিপ্রায় থাকে তবে সে মেয়েকে আর ঘরে লইতে পারিবে না। আমি তাঁহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলাম, দাদা, এ যাত্রা তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি ছেলেটিকে গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি, তোমরা তাহাকে জাতে তুলিয়া লও। তোমার বাপ কিছুতেই রাজি হিলেন না, আমিও আমার একমাত্র মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। জাত ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া ঘর করিলাম। এখানে আসিয়াও আপদ মিটিল না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের যখন বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি তোমার বাপ কন্যাকর্তাদের উত্তেজিত করিয়া সে বিবাহ ভাঙিয়া দিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি ইহার প্রতিশোধ না লই তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে নহি।"[১৭৯]

প্রতিশোধের এই বৃত্তান্তটি বাহ্যিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গল্পটির নিহিত স্তরে শায়িত রেখেছেন সামাজিক কুসংস্কার মুক্তির প্রয়োজনীতর দিকটিকে। সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে তাই জানিয়েছেন—" 'ত্যাগে'র বক্তব্যও সংস্কারমুক্তি। প্রতিহিংসাকামী প্যারিশংকরের চক্রান্তে ব্রাহ্মণসন্তান হেমন্ত, নিজের অজ্ঞাতেই কায়স্থ কন্যা বালবিধবা কুসুমকে বিয়ে করেছিল। একদিকে কুসুমের প্রতি ভালোবাসা, অন্যদিকে সমাজ ও সংসার এই দ্বন্দ্বে হৃদয়েরই জয়লাভ ঘটলো—কুসুমকে হেমন্ত ত্যাগ করল না, পরিবার এবং সমাজকে ছেড়ে সে বেরিয়ে চলে গেল। মানবসত্যের এবং ধর্মতন্ত্রের সংঘাতে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই প্রথমটিকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন, এই ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটে না।"[১৮০] তাঁর পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনায়ও যে সমাজ গঠনের পরিকল্পনা করেছেন তা হল জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার ভেদাভেদ মুক্ত উদার মানবসমাজ।

'একরাত্রি' গল্পে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন দেশোন্নয়ন ভাবনার প্রকাশ আছে। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শিক্ষার যে তেমন সুযোগ বা অবকাশ ছিল না, পল্লী যে শিক্ষা বা অর্থনৈতিক দিক থেকে শহর-নির্ভর হয়ে উঠছিল তার ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ

তাঁর একাধিক গল্প-প্রবন্ধে। বিদেশী সরকারের অধীনে সামান্য কেরানীর কাজ না করে দেশীয় ব্যবস্থাপনায় দেশীয় কর্মসংস্থানের উপর জোর দেওয়ার কথাও বার বার বলেছেন। এতে আমাদের দেশ তার নিজের আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। সর্বোপরি আমাদের দেশকে আত্মশক্তিতে বলবান হতে গেলে যে আমাদের মধ্যেকার শূদ্রত্ব বা নীচ গুণাবলীকে কাটিয়ে উঠতে হবে সে কথা রবীন্দ্রনাথ বহুদিন যাবৎ বলে আসছিলেন। দেশীয় লোকেদের মধ্যে ঠিক এর বিপরীত প্রবণতার জায়গাগুলোকে ব্যাঙ্গবিদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে লিখেছেন—

" ...আমাদের পাড়ার নীলরতন যেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখাপড়া শিখিয়া কালেক্টার সাহেবের নাজির হইয়াছে, আমারও জীবনের লক্ষ্য সেইরূপ অত্যুচ্চ ছিল— কালেক্টারের নাজির না হইতে পারি তো জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হইব, ইহা আমি মনে মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।

সর্বদাই দেখিতাম, আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন—নানা উপলক্ষে মাছটা তরকারিটা টাকাটা সিকেটা লইয়া যে তাহাদের পূজার্চনা করিতে হইত তাহাও শিশুকাল হইতে আমার জানা ছিল, এইজন্য আদালতে ছোটো কর্মচারী এমন-কি, পেয়াদাগুলাকে পর্যন্ত হৃদয়ের মধ্যে খুব একটা সম্ভ্রমের আসন দিয়াছিলাম। ইঁহারা আমাদের বাংলাদেশের পূজ্য দেবতা। তেত্রিশ কোটির ছোটো ছোটো নূতন সংস্করণ। বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইঁহাদের প্রতি লোকের আন্তরিক নির্ভর ঢের বেশি—সুতরাং পূর্বে গণেশের যাহা-কিছু পাওনা ছিল, আজকাল ইঁহারাই তাহা সমস্ত পাইয়া থাকেন।"[১৮১]

আত্মপরিশুদ্ধির দ্বারা আত্মচেতনার বিস্তার—এই পথেই যে জাতির তথা দেশের মুক্তি আসবে সে কথা রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর সমকালে দেখেছিলেন দেশের মুক্তির জন্য যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা জনসচেতনতা আনার আয়োজন চলছিল সে কেবল লক্ষ্যহীন কতকগুলি শহুরে রাজনৈতিক সভা-সমিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দেশের বৃহত্তর অংশ পল্লী, এমনকি শহুরে মানুষের বৃহদংশ থেকে তা ছিল বিচ্ছিন্ন। এই আবেগসর্বস্ব কর্মপদ্ধতির নিরর্থকতা নির্দেশ করে ব্যাঙ্গাত্মক পরিভাষায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

" ইহার উপরে আবার সভাসমিতিতেও যোগ দিতাম। দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণবিসর্জন করা যে আশু আবশ্যক, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কী করিয়া উক্ত দুঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্ত দেখাইত না।

কিন্তু তাহা বলিয়া উৎসাহের কোনো ত্রুটি ছিল না। আমরা পাড়াগেঁয়ে ছেলে, কলিকাতার ইঁচড়ে-পাকা ছেলের মতো সকল জিনিসকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই, সুতরাং আমাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। আমাদের সভার কর্তৃপক্ষীয়েরা বক্তৃতা দিতেন, আর আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না-খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টো টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভা-স্থলে গিয়া বেঞ্চি চৌকি সাজাইতাম, দলপতির নামে কেহ একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। শহরের ছেলেরা এই-সব লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে বাঙাল বলিত।”[১৮২]

কিন্তু শহরের বাইরে দেশের প্রাণকেন্দ্র যে বৃহত্তর পল্লী অঞ্চল সেখানকার রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে এ সকল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কোন যোগ ছিল না। পল্লীঅঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন শোষণ-পীড়নের মধ্য দিয়ে, জীবনের বিপুল বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কীভাবে বয়ে চলেছে তার পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ‘শাস্তি’ গল্পে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার ‘কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে জানিয়েছেন—“ রবীন্দ্রনাথের সহিত গ্রাম্য সমাজের নিম্নতম স্তরের পরিচয়ও যে কত ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহার আশ্চর্য প্রমাণ মিলে ‘শাস্তি’ নামে একটি অভিমানবহ্নিগর্ভ নিদারুণ ট্র্যাজেডির গল্পে।”[১৮৩] এ গল্পের শুরুতে আছে সমকালীন জমিদারি শোষণ ও অত্যাচারের ছবি, তারই আনুষঙ্গিক সাধারণ প্রজার দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়জনিত কারণে পারিবারিক অশান্তির ছবি —“ দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চেঁচামেচি চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্য কলরবের ন্যায় এই কলহ-কোলাহলও পাড়াসুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিবমাত্র লোকে পরস্পরকে বলে—“ঐ রে, বাধিয়া গিয়াছে”, অর্থাৎ যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেমনটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোনোরূপ ব্যত্যয় হয় নাই।”[১৮৪]

দুখিরাম বা ছিদামকে জমিদারের গৃহে জন খাটতে হয় বলে অর্থাৎ প্রায় বিনা মজুরিতে শ্রম দিতে হয় বলে তাদের দিনের অন্নটুকুও জোটে না। অথচ এর বিরুদ্ধে তাদের করারও কিছু থাকে না। প্রবল জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই করা তাদের কাছে জলে বাস করে কুমিরের সাথে লড়াইয়ের সামিল। ফলে শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক শোষণ ও পীড়নের নির্মমতা তাদের জীবনের অনিবার্য ভবিতব্যতা হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ তার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন— “ দুখিরাম ও ছিদাম সেদিন জমিদারে কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ওপারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের ক্ষেতে, কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবদস্তি করিয়া

ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিত জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে—উচিতমত পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।”[১৮৫]

জমিদার যেখানে কেবল নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থতায় সচেষ্ট থাকে সেখানে প্রজাহিত বা দেশের উন্নয়ন কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। পল্লীর মানুষেরা যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতো তারও একটা পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে। যে দিন দুখিরাম ও ছিদাম রুই জন খেটে বাড়ি ফিরে আসে সেদিন তাদের বাড়ির পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— “ বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনো চারি দিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের ক্ষেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্‌বর্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।”[১৮৬]

পল্লীর এমন পরিবেশের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক চিঠিতেই উল্লেখ করেছেন—পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তার একাধিক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই পরিবেশ পল্লীর মানুষের কত বড় অস্বাস্থ্যের কারণ ছিল তখনকার দিনের গ্রামে গ্রামে কলেরা ও ম্যালেরিয়ার মড়কের ছবিই তার পরিচয় বহন করে। পথঘাটের দুরবস্থার ছবিটিও এ গল্পে স্পষ্ট। ছিদাম ও দুখিরাম তাই সারাদিন জন খেটে বাড়ি ফেরে “পথের কাদা এবং জল ভাঙিয়া”। পল্লীর মধ্যে যাতায়াতের তখনো যথোপযুক্ত রাস্তা বা পথঘাট নির্মিত হয়নি। ফলে নদীই ছিল বাংলাদেশের পল্লীগুলিতে যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন। তাছাড়া সম্বৎসরের বর্ষায় পল্লীর নদীবাঁধ গুলিতে ভাঙন দেখা দেওয়ায় পল্লীগুলি প্রায়শই জলমগ্ন হয়ে পড়তো। এতে যেমন জীবনের নানা বিপর্যয় নেমে আসতো তেমনি কৃষকের একমাত্র অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শস্যক্ষেত্রের ব্যাপক ক্ষতি দেখা দিত। এ গল্পে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“ অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ংকর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন-কি ভাঙনের ধারে দুই-চারিটা আম-কাঁঠালগাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা-কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।”[১৮৭]

রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীতে পল্লীর আগাছা ও পথঘাটের সংস্কার করে তার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শ্রীটুকু ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যেখানে জীবনের স্বাস্থ্য ও শ্রী নেই, সেখানে জীবনের উন্নয়ন ঘটানো অসম্ভব। একাধিক বাঁধ নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি পল্লীকে বর্ষার প্লাবন থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আত্মিক উন্নয়নেরও সমূহ প্রয়াস নিয়েছিলেন। সে উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা ছিল পল্লীসমাজ ও তার পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা। 'শাস্তি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ এই দুটি দিককে অত্যন্ত সুচারু ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দারিদ্র্য, অনাহার, শারীরিক আর মানসিক পীড়নের জায়গা থেকে আকস্মিক উত্তেজনায় দুখিরাম তার স্ত্রীর মাথায় রামদা দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করলেও ছিদাম নিজের ভাইকে রক্ষা করার জন্য দোষ চাপিয়েছে চন্দরার ঘাড়ে। চন্দরাকে পরে মুক্ত করার যে অভিপ্রায়ই থাকুক না কেন, এ কাজের পিছনে তার কিন্তু যুক্তি ছিল— "...বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।"[১৮৮]

এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-মানসিকতা আমাদের দেশের নারীকে বহুকাল যাবৎ তার সম্মান ও মর্যাদা দেয়নি। নারীর শক্তি ও সামর্থ্যকে সমাজকল্যাণে নিয়োজিত করার প্রয়োজন মনে করেনি। তাই সমাজ নানা কারণে নারীকে পণ্যে পরিণত করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। নারীর উপর সামাজিক কলঙ্ক লেপন করে পুরুষ তার বহু অসম্মান করেছে। এ গল্পেও নির্দোষ চন্দরাকে আসামী হিসেবে নির্বাচন করে পুলিশ যখন সমস্ত গ্রাম্য সমাজের মাঝখান দিয়ে নিয়ে গেছে তখন সেই চন্দরার পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—" বন্দিনী হইয়া চন্দরা, একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রাম্যবধূ, চিরপরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথতলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোস্টাপিস এবং ইস্কুলঘরের পার্শ্ব দিয়া, সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মতো গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। একপাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা, তাহার সইসাঙাতরা কেহ কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া , কেহ দ্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া পুলিস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া লজ্জায় ঘৃণায় ভয়ে কন্টকিত হইয়া উঠিল।"[১৮৯]

রবীন্দ্রনাথ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর এই অবমাননা দূর করার লক্ষ্যে তাঁর দেশোন্নয়ন কর্মসূচীতে তাদের স্বাধিকার ও সম্মান সংরক্ষণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে নারীরা তাই ক্রমে ক্রমে অবলা নারী থেকে সবলা নারী হয়ে ওঠার পথে যাত্রা করেছে। আপন অধিকার ও মর্যাদা দাবি করেছে। 'শাস্তি' গল্পের চন্দরাও ঠিক একারণেই তার স্বাভিমানের জায়গা থেকে ছিদামের আরোপিত মিথ্যা দোষারোপকে স্বীকার করে

নিয়ে, ছিদামকে—বলা চলে সমস্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজকেই বড় শাস্তি দিয়ে গেছে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে। যে সঙ্কীর্ণ পল্লীসমাজ সত্য না জেনে লজ্জা ও ঘৃণার চোখে চন্দরাকে দেখেছে, সেই সমাজ যখন একদিন প্রকৃত সত্য জানবে সেদিন তা তাদের কাছে এক বড় শাস্তি হয়ে নেমে আসবে। যে পুরুষশাসিত সমাজের উপর একদিন চন্দরাকে সঁপে দিয়েছিল চন্দরার পিতা সেই সমাজের চরিত্রপ্রকৃতিকে তাই তীব্র ব্যঙ্গবিদ্ধ করে গল্পের অন্তিমে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“ যেদিন একরত্তি বয়সে একটি কালোকোলো ছোটোখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে আসিল, সেদিন রাত্রে শুভলগ্নের সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত। তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, যাহা হউক আমার মেয়েটির একটি সদ্‌গতি করিয়া গেলাম।”[১৯০]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর উন্নয়নের জন্য দেশীয় জমিদারদের প্রজাদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো কতিপয় জমিদার সেদিন সে দায়িত্ব পালনও করেছিলেন। জমিদারের এই প্রজাহিতৈষী মানসিকতার পরিচয় মেলে ‘সমস্যাপূরণ’ গল্পে। প্রজাদের প্রতি জমিদারের সদ্ভাব ও সহানুভূতির কারণেই এ গল্পের ঝিঁকড়াকোটার জমিদার কৃষ্ণগোপাল সরকার প্রজাদের কাছে দেবতার মর্যাদা পেয়েছিলেন। তাই—

“ ঝিঁকড়াকোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার জেষ্ঠ্যপুত্রের প্রতি জমিদারি এবং সংসারের ভার দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। দেশের যত অনাথ দরিদ্র লোক তাঁহার জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন বদান্যতা, এমন ধর্মনিষ্ঠতা কলিযুগে দেখা যায় না, এই কথা সকলেই বলিতে লাগিল।

তাঁহার পুত্র বিপিনবিহারী আজকালকার একজন সুশিক্ষিত বি. এ.। দাড়ি রাখেন, চশমা পরেন, কাহারও সহিত বড়ো একটা মিশেন না। অতিশয় সচ্চরিত্র—এমন-কি, তামাকটি পর্যন্ত খান না, তাস পর্যন্ত খেলেন না। অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো চেহারা, কিন্তু লোকটা ভারি কড়াক্কড়।......

বিপিনবিহারী কাজ লইয়াই দেখিলেন তাঁহার বাপ বিস্তর ব্রাহ্মণকে জমি বিনা খাজনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং খাজনা যে কত লোককে কমি দিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। তাঁহার কাছে কেহ একটা-কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—সেটা তাঁহার একটা দুর্বলতা ছিল।”’’[১৯১]

কৃষ্ণগোপাল এবং বিপিনবিহারীর মধ্যে সময়ের ব্যবধান জমিদারি ব্যবস্থায় কিছু নতুন পরিবর্তন এনেছিল। প্রজাস্বার্থ রক্ষার জন্য নতুন নতুন আইন প্রণীত হওয়ায় প্রজা ও জমিদারের মধ্যেকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বতন্ত্র

রাজনৈতিক বা সামাজিক সমীকরণ গড়ে উঠতে থাকে। তারই পরিচয় আছে এ গল্পে—" পূর্বে যেমন দান করা যাইত তেমনি পাওনা নানাপ্রকারের ছিল। তখন জমিদার এবং প্রজা উভয় পক্ষের মধ্যেই দান-প্রতিদান ছিল। সম্প্রতি নূতন নূতন আইন হইয়া ন্যায্য খাজনা ছাড়া অন্য পাঁচরকম পাওনা একেবারে বন্ধ হইয়াছে এবং কেবলমাত্র খাজনা আদায় করা ছাড়া জমিদারের অন্যান্য গৌরবজনক অধিকারও উঠিয়া গিয়াছে—অতএব এখনকার দিনে যদি আমি আমার ন্যায্য পাওনার দিকে কঠিন দৃষ্টি না রাখি তবে আর থাকে কী। এখন প্রজাও আমাকে অতিরিক্ত কিছু দিবে না, আমিও তাহাকে অতিরিক্ত কিছু দিব না—এখন আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র দেনাপাওনার সম্পর্ক। দানখয়রাত করিতে গেলে ফতুর হইতে হইবে, বিষয় রক্ষা এবং কুলসম্ভ্রম রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে।"[১৯২]

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়োক্ত এই বিশেষ জমিদারি মানসিকতার মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্য সমকালীন জমিদার সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, অহংচেতনা আর কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করে দরিদ্র অবহেলিত প্রজার পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রজাদের সুখ-দুখের শরিক হয়ে তাদের পাশে থেকে তাদেরই একজন হয়ে ওঠার পথনির্দেশ দিয়েছিলেন। তাতেই যে এদেশের পল্লীর নিরন্ন প্রজাদের তথা দেশের কল্যাণ সম্ভব একথা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিমত ছিল। প্রজাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা হিসেবে ভাবতে পারাটাই তো হিতকারী জমিদারের একমাত্র খতিয়ান হওয়া উচিত।

কিন্তু এ গল্পের নবীন জমিদার বিপিনবিহারীর মধ্যে অনুরূপ মানসিকতার প্রতিস্থাপন চোখে পড়ে না। বরং অহংচালিত হয়ে তিনি সামান্য প্রজা অছিমদ্দির বিরুদ্ধে মামলা মকদ্দমায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সে মামলা ফৌজদারি হয়ে দেওয়ানি আদালত, দেওয়ানি আদালত হইতে জেলা আদালত ও হাইকোর্ট পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। এতে সাধারণ প্রজা অছিমদ্দিসহ বিপিনবিহারীকে সামাজিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়। এর কোন আবশ্যকতা গড়ে উঠতো না যদি তারা পরস্পর নমনীয় ও সহানুভূতিশীল হয়ে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে পারতেন। এই মামলা-মকদ্দমার নিরর্থকতা বা আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে সাধারণ গরিব প্রজাদের বাঁচিয়ে পল্লীর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর জন্যই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলী প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। মামলা চালাতে গিয়ে অছিমদ্দি যেভাবে দেনার দায়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছে তার করুণ পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে। এই অবসরে পল্লীর আর্থ-সামাজিক অবস্থারও একটি বিশ্বস্ত ছবিকে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার—

" সেদিন সোমবার, হাটের দিন। ছোটো একটা নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কতক নৌকায় এবং কতক ডাঙায় কেনাবেচা চলিতেছে, কলরবের অন্ত নাই। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এই আষাঢ় মাসে কাঁঠালের আমদানিই সবচেয়ে

বেশি, ইলিশ মাছও যথেষ্ট। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অনেক বিক্রেতা বৃষ্টির আশঙ্কায় বাঁশ পুতিয়া তাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।

অছিমদ্দিও হাট করিতে আসিয়াছে—কিন্তু তাহার হাতে একটি পয়সাও নাই, এবং তাহাকে আজকাল কেহ ধারেও বিক্রয় করে না। সে একটি কাটারি এবং একটি পিতলের থালা হাতে করিয়া আসিয়াছে, বন্ধক রাখিয়া ধার করিবে।"[১৯৩]

এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়, এই সীমাহীন দারিদ্র্য, এই প্রবঞ্চনাই তো মানুষকে অপরাধপ্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়, নৈতিক জীবনে চূড়ান্ত পতন ডেকে আনে। এ গল্পে হাটের মধ্যে অছিমদ্দির কাটারি তুলে বিপিনবিহারীর দিকে তেড়ে যাওয়ার মধ্যে যে অপরাধ প্রবণতা তার মূলে কিন্তু অনুরূপ আর্থ-সামাজিক অবস্থাই দায়ী—যার মূলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিপিনবিহারী বা তাঁর পিতা কৃষ্ণগোপালের মত জমিদারেরা। কৃষ্ণগোপালেরই সন্তান হওয়া সত্ত্বেও অছিমুদ্দি আর বিপিনের মধ্যে যে বিভেদ এটাই সম্ভবত অছিমদ্দির ক্ষোভের বড় কারণ ছিল। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিহিত রেখে গেছেন এক ঐতিহাসিক সামাজিক সত্যকে—

" জমিদারের সঙ্গে অসম মামলায় প্রজা কিভাবে সর্বস্বান্ত হয় দু-চার কথায় সে ছবি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্রুদ্ধ লাঞ্ছিত অছিম জমিদারকে দা নিয়ে তাড়া করেছে। তোরাপ হানিফের বংশে তার জন্ম। দীনবন্ধু-মধুসূদনের মতো রবীন্দ্রনাথও একে চিনতে ভুল করেন নি। শরৎচন্দ্রের গফুর প্রাত্যহিক সরল অভিজ্ঞতা। অছিমুদ্দি-তোরাপেরা ক্বচিৎ ফেটে ফুটে বেরোয়। এখানে বাস্তবতা অভিজ্ঞতার সীমা ছাড়িয়ে ইতিহাস-সত্যের মুখোমুখি—যার অন্য নাম শ্রেণীসংগ্রাম।"[১৯৪]

সাধারন নিরন্ন প্রজারা তো এভাবেই এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের হাতে চিরকাল স্বার্থের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। তাই সাধারণ কৃষক বা প্রজার সমস্যাকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । মানসিক স্থৈর্যটুকু হারানোর জন্য অছিমদ্দিকেই পুলিশের হাতে সঁপে দেওয়া হয়। এর ফলে এক নিরন্ন কৃষক পরিবারে কি নিঃসীম শূন্যতা, কি বিপর্যয় নেমে আসে তার কোন টের পায় না জমিদারের মতো আর্থিক দিক থেকে সক্ষম মানুষেরা। সেই বৈপরীত্যময় ছবিটিকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে গল্পে চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথ জমিদার সম্প্রদায়ের সামনে একটি আলোকনির্দেশিকা তুলে ধরতে চেয়েছেন—

"বিপিনের অন্তঃপুরের মেয়েরা আজিকার ঘটনা শুনিয়া কন্টকিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন, মাগো, কোথাকার বজ্জাত হারামজাদা বেটা। তাহার উচিত শাস্তির সম্ভাবনায় তাঁহারা অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

এ দিকে সেই সন্ধ্যাবেলায় বিধবার অন্নহীন পুত্রহীন গৃহ মৃত্যুর অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা সকলেই ভুলিয়া গেল, আহারাদি করিল, শয়ন করিল, নিদ্রা দিল—কেবল একটি বৃদ্ধার কাছে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে এইটেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিল, অথচ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটিরপ্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশ্বাস ভীত হৃদয়।"[১৯৫]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাংলার অসহায়া নারীদের স্বাধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণের দ্বারা তাঁদের আত্মিক অন্নয়নের বন্দোবস্ত করেছিলেন। এই পথ ধরেই তিনি পল্লীর অবলা নারীদের সবলা করে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন। 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পের জয়কালী চরিত্রটিকে ঠিক অনুরূপ চরিত্রপ্রকৃতির আদলে গড়ে তুলেছিলেন। তার পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

" সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে জয়কালী অধিক কথা কহিতেন না কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন-কি, নীরবে অতি বড়ো প্রবল মুখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।

জয়কালী দীর্ঘাকার দৃঢ়শরীর তীক্ষ্ণনাসা প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামী বর্তমানে তাঁহাদের দেবোত্তর সম্পত্তি নষ্ট হইবার জো হইয়াছিল। বিধবা তাঁহারসমস্ত বাকি বকেয়া আদায়, সীমাসরহদ্দ স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাঁহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।"[১৯৬]

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বিপদে-আপদে তাঁর হস্ত প্রসারিত ছিল। সর্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় অতি সহজেই অধিকার করতে পারতেন। যেখানেই তিনি উপস্থিত থাকতেন সেখানেই তিনি সকলের মধ্যমণি হয়ে উঠতেন। বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় তিনি পল্লীর মাথার উপর উদ্যত ছিলেন। এ-হেন জয়কালীর কাছে তাঁর ঠাকুরবাড়িটি সর্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। তার পরিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হলে বিধবা জয়কালী তা সহ্য করতে পারতেন না। অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারতো না।

এই পবিত্রতা জয়কালীর কেবল বাইরের নয়, অন্তরের সামগ্রী ছিল বলে মানবিকতার উপর আচারসর্বস্বতাকে বোঝা হয়ে চেপে বসতে দেননি। তাই পল্লীবাসী ডোমেদের দ্বারা তাড়িত হয়ে একটি মলিন শূকর যেদিন জয়কালীর যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে একদা আশ্রয় গ্রহণ করে, সেদিন জয়কালী নিছক আচার-সর্বস্বতার ঊর্ধ্বে

হৃদয়ের উদারতা ও মানবিকতাবোধের পরিচয়কে পল্লীবাসীর সামনে এক আশ্চর্য জীবন-অভিজ্ঞান রূপে স্থাপন করেন—

" অনতিকাল পরেই সুরাপানে-উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, " যা বেটারা, ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস নে।"

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরানী যে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন, ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।"[১৯৭]

জয়কালীর মানসিক ঔদার্য বা বোধের যে বিস্তৃতি, পল্লীর সমাজে তারই প্রসার আনতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ কারণেই জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার-অর্থহীন আচারসর্বস্বতার ঊর্ধ্বে এক প্রগতিশীল মানবিক চেতনাসম্পন্ন পল্লীসমাজ গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শৈশব থেকেই ঠাকুরবাড়ির স্বদেশী আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেশ ও জাতি সম্পর্কে এক গভীর ভালোবাসার জন্ম দিয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমপর্বে রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তারই প্রভাব-প্রেরণায় ও পল্লীবাসের সূত্রে বুঝেছিলেন জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার ভেদাভেদে শতচ্ছিন্ন জাতিকে, 'প্রভুর পদে সোহাগমদে দোদুল কলেবর' আত্মসম্মানহীন দেশদ্রোহী জাতিকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা ভিন্ন দেশের প্রকৃত কল্যাণ আসতে পারে না। কিন্তু দেশোন্নয়নের যে মত ও পথের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, সমকালীন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে তা গ্রহণীয় হয়নি। ফলে জীবনের যে মেঘ ও রৌদ্র ব্যক্তি-দেশ-জাতির উপর ছায়াবিস্তার করেছিল, 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে একটি প্রেমের আখ্যান সহযোগে তাকেই গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

গল্পের শুরু প্রকৃতিতে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা দিয়ে। প্রকৃতির এই খেলা অচিরে গল্পে জীবনপ্রবাহের সাথে মিশে গেছে। বাংলা দেশের এক ক্ষুদ্র গ্রামে ঠিক সেই সময় ক্ষুদ্র এক জীবননাট্যেও এমনি আলো আঁধারের খেলা চলছিল। গ্রামের একটি ঘরে কালোজাম খেতে খেতে গিরিবালা নাম্নী মেয়েটি শশিভূষণ নামের ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন

যুবার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল-"...অনেকক্ষণ নিষ্ফল আনাগোনার পর নীরব উপেক্ষার পরিবর্তে কালোজামের আঁটি ব্যবহার করিতে হইল। অন্ধের নিকট অভিমানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এতই দুরূহ।"[১৯৮]

গল্পটির রাজনৈতিক প্রতিভাস রচনার শুরু এখান থেকেই। রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শাসনে থাকা গ্রামীণ জমিদার,পত্তনীদার,তালুকদারেরা কেমন ভাবে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের নিজস্ব দৃষ্টিপ্রদীপ হয়ে ওঠে। জীবন ও সময় সম্পর্কে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কাছেও সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের এটি একটি বার্তা। অন্ধ শাসকের কাছে দেশীয় মানুষ তথা রাজনৈতিক নেতাদের আবেদন নিবেদন নীতি আপন অস্তিত্ব রক্ষার পরিপূরক নয়।

শশিভূষণ ইনটার্ণি, 'স্বদেশী' বা বিপ্লবী নয়। কংগ্রেসের ওয়ার্কারও নয়। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের একটি ক্ষুদ্র বোড়ে মাত্র, অথচ প্রতিবাদী। 'ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত' ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পূর্ণ আলোয় আলোকিত, বঙ্গীয় খণ্ড রেনেসাঁর বিবেকী মানুষ । তাই অসাম্য অন্যায়কে তার সামন্ততান্ত্রিক রক্ত মেনে নিতে পারে না। পারে না বলেই অবাধ্য প্রজাকে মামলা রুজু করে বশ করিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবে তিনি রাজী হন নি। আবার সাহেব ও তার মেথর কৃতৃক অপমানিত হরকুমারের বাড়িতে গিয়ে যে তাঁকে মানহানির মামলা করার কথা বলেন এবং তাঁর উকিল হয়ে লড়বেন বলেও জানান—সেও কতকটা নব্য মূল্যবোধের আদর্শে চালিত হয়ে।

হরকুমার এতে শেষপর্যন্ত রাজি হলেও পরে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের চাপের সামনে আত্মরক্ষার স্বার্থে অকপটে জানিয়ে দেন তাঁর ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও শশিভূষণই তাকে জোর করে মামলা করিয়েছেন। শশিভূষণ নিজে ম্যাজিস্ট্রেটের মামলা মিটিয়ে নেবার পরামর্শকে অগ্রাহ্য করায় যেমন ম্যাজিস্ট্রেটের বিরাগভাজন হন, তেমনি জমিদারও শশিভূষণের উপর ক্রুদ্ধ হন। বিপরীত ক্রমে হরকুমার তাঁদের জেলার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন । একখানা মলিন চাপকান ও তৈলাক্ত পাগড়ি পরে হরকুমার প্রায়ই জেলায় গিয়ে সাহেব-সুবোদের নিয়মিত সেলাম করতে লাগলেন।

আসলে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন ভারতবাসীর নিজেদের মধ্যেই জাত-পাতের প্রাচীরপ্রমাণ বিভেদ। নিজেদের মধ্যেই আত্মকলহে এরা মেতে থাকে। পরস্পরের মধ্যে এদের কোন ঐক্য নেই। ব্যক্তিস্বার্থে এরা অন্যের ক্ষতিসাধনে দ্বিধাহীন, আত্মসম্মান বিক্রয়ে গ্লানিহীন। হরকুমার কিংবা সাহেবের মেথরের মধ্যেকার কলহ ও তার পরিণাম সে দিকের নির্দেশ দেয়। মহৎ বা বৃহৎ কোন জীবনচেতনা এদের মর্মমূলকে নাড়া দেয়নি। গল্পে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ তাই তার ইঙ্গিত দিয়ে জানিয়েছেন—" গ্রামের মধ্যে

আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা করিত কেবল শশিভূষণ এবং গিরিবালা।"[১৯৯]

এই আত্মবিচ্ছিন্ন বাঙালির পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা কতটা দূর অস্ত তা রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই অনুভব করেছিলেন। যে কংগ্রেস সেদিন আমাদের দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিল, আমাদের দেশেরই একটি সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী সেই কংগ্রেসের বিরোধিতা করে। ইংরেজের কাছে তারাই দেশের গোপন সব তথ্যাদি সরবরাহ করে দেশদ্রোহিতার ভূমিকা নেয়। হরকুমার চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেই বিশেষ দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তারই আভাস দিয়ে এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"অবশেষে নায়েবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শশী কন্‌গ্রেসে যোগ দিয়াছে কি না। নায়েব অম্লান মুখে বলিলেন, হাঁ।

সাহেব তাঁহার সাহেবি বুদ্ধিতে স্পষ্টতই বুঝিতে পারিলেন, এ সমস্তই কন্‌গ্রেসের চাল। একটা পাকচক্র বাধাইয়া অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিয়া গবর্মেন্টের সহিত খিটিমিটি করিবার জন্য কন্‌গ্রেসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেলাগণ লুক্কায়িতভাবে চতুর্দিকে অবসর অনুসন্ধান করিতেছে। এই- সকল ক্ষুদ্র কন্টকগণকে একদমে দলন করিয়া ফেলিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে অধিকতর সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বলিয়া সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্মেন্টকে অত্যন্ত দুর্বল গবর্মেন্ট বলিয়া মনে মনে ধিক্‌কার দিলেন। কিন্তু, কন্‌গ্রেসওয়ালা শশিভূষণের নাম ম্যাজিস্ট্রেটের মনে রহিল।"[২০০]

গল্পের শেষে শশিভূষোণের যে জীবন-পরিণাম তার জন্য এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তৎকালীন দেশনেতাদের রাজনৈতিক আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ তাই মেনে নিতে পারেননি। প্রতিটি ভারতীয়কে যে 'আত্মশক্তি'তে প্রতিষ্ঠিত করা আশু জরুরী, এই পথে আত্মসম্মানবোধ ও প্রতিরোধী মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করাটা যে জরুরী, তার উপরই রবীন্দ্রনাথ অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

কিন্তু দেশের কাজে, 'লোকহিত' ব্রতে যারা সেদিন শশিভূষণের মতো স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশের কাছে লোকহিত এক আইডিয়ার ফানুসমাত্রে পরিণত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অনেক পরে 'লোকহিত' প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন –" যে বড়ো সে ছোটর অপকার খুব সহজে করিতে পারে কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড় হইলে চলিবে না, ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে।"[২০১] এই জীবনে জীবন যোগ করার কাজে কজন স্বদেশী সেদিন সফল হয়েছিলেন? নব্যশিক্ষিত শশিভূষণের কাছে দেশ ও তার প্রজার অপমান বেদনা দূর করার মধ্যে রেনেসাঁ-সঞ্জাত আদর্শবোধ কাজ করেছে ঠিকই। কিন্তু 'লোক' বলতে যাদের বোঝায়

তাদের কতটাই বা কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছেন! তিনি তো সাধারণের সঙ্গে মিশতেই পারেন না। এর ফলে পল্লীর মানুষ তাঁকে আপন ভেবে তাঁর উপকার নেওয়া তো দূরের কথা , তাঁকে নানাভাবে ভুল বুঝেছে, অবিশ্বাস করেছে—

"শশিভূষণ এম. এ. পাস করিয়া আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কিছুতেই কোনো কর্মে ভিড়িলেন না। লোকের সঙ্গে মেশা বা সভাস্থলে দুটো কথা বলা, সেও তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠে না। চোখে কম দেখেন বলিয়া চেনা লোককে চিনিতে পারেন না এবং সেই কারণেই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হয়, লোকে সেটাকে ঔদ্ধত্য বলিয়া বিবেচনা করে।

কলিকাতায় জনসমুদ্রের মধ্যে আপন মনে একলা থাকা শোভা পায় কিন্তু পল্লীগ্রামে সেটা বিশেষ স্পর্ধার মতো দেখিতে হয়। শশিভূষণের বাপ যখন বিস্তর চেষ্টায় পরাস্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার অকর্মণ্য পুত্রটিকে পল্লীতে তাঁহাদের সামান্য বিষয়রক্ষাকার্যে নিয়োগ করিলেন তখন শশিভূষণকে পল্লীবাসীদের নিকট হইতে বিস্তর উৎপীড়ন উপহাস এবং লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। লাঞ্ছনার আরো একটা কারণ ছিল; শান্তিপ্রিয় শশিভূষণ বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাগণ তাঁহার এই অনিচ্ছাকে দুঃসহ অহঙ্কার বলিয়া কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

শশিভূষণের উপর যতই উপদ্রব হইতে লাগিল শশিভূষণ ততই আপন বিবরের মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। একটি কোণের ঘরে তক্তপোষের উপর কতকগুলি বাঁধানো ইংরেজি বই লইয়া বসিয়া থাকিতেন; যখন যেটা ইচ্ছা হইত পাঠ করিতেন, এই তো ছিল তার কাজ......

..............মানুষের মধ্যে তাঁহার সম্পর্ক ছিল কেবল গিরিবালার সহিত।"[২০২]

দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার মতো এসব তাঁর স্বভাবে ও জীবনে বর্তেছে। লোকসাধারণের জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করার ব্যর্থতার কারণেই গ্রামের লোকসাধারণ তাঁর এই প্রবণতাকে ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার বলে ভেবেছে।

শশিভূষণ তাই গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে শহর অভিমুখে রওনা দিয়েছেন নৌকায় চেপে। পল্লীর সমাজবাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। কিন্তু তার আশু আবশ্যকতার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। পল্লীর মানুষের কাছে না পৌঁছলে যে তাদের যথার্থ হিত করা অসম্ভব সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজের ব্যক্তিজীবন অভিজ্ঞতার সূত্রে বুঝলেও তাঁর সৃষ্ট চরিত্র শহুরে শশিভূষণ তা

বোঝেননি। ফলে পল্লীর মানুষ তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। যার ফলশ্রুতিতে গ্রাম ছেড়ে তা্ঁকে শহরমুখী হতে হয়েছে।

কিন্তু যাত্রাপথে শশিভূষণ দেখেছেন, মহাজনী নৌকা স্টিমারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেই তার গতিকে পরাস্ত করে এগিয়ে গেছে অমনি ম্যনেজার সাহেবের বন্দুকের নল তার পালকে কীভাবে ফালা ফালা করে দিয়েছে। নৌকা ডুবে জীবন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় অনেক মানুষকে। আসলে ম্যানেজার সাহেবের বিশ্বাস ছিল যে, এটুকু রসিকতা করার জন্য সে কোনরকম শাস্তির দায়িক নয়, এবং ধারণা ছিল যে যাদের নৌকা গেল এবং যাদের প্রাণসংশয় হল তারা মানুষের মধ্যেই গণ্য হতে পারে না। তারা শুধুমাত্র 'নেটিভ' পরিচয়ে পরিচিত হবার যোগ্যতা রাখে।

এই অপমান, এই অমানবিকতাবোধ, এই ঔদ্ধত্যের কোন প্রতিকার ছিল না। ভীতু আত্মমর্যাদাহীন ভারতীয়রা সেদিন ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়িয়ে পলায়নপর হয়েছে। কখনো বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও স্বদেশীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে আসলে তাদের পক্ষে ইংরেজের পক্ষপাতমূলক বিচার ব্যবস্থায় লড়াই করা সম্ভব ছিল না। তার জন্য যে আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হত, তার ব্যয়ভারও বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই বিকল্প যে পন্থা খোলা ছিল সে আসলে সংঘাতের দ্বারা শক্তির অপচয় নয়, আত্মশক্তির উজ্জীবনের দ্বারা নিজেদের প্রস্তুত করে তোলা। এ পথকে সেদিনের কংগ্রেসও যথাযথ বলে মানেনি।

তাই শশিভূষণও একক প্রতিরোধে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। ইংরেজ সরকারের পক্ষপাতমূলক বিচারব্যবস্থা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেও সেই একক প্রতিরোধ কোন গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জেলার পুলিশ সুপার বাহাদুরের বোট যেভাবে মাঝিদের ন্যায্য খাজনা দিয়ে পাতা জালকে কেটে তছনছ করে দিয়েছে, সেই প্রবল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে একক ভাবে সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে তাই শশিভূষণের পাঁচ বছরের কারাদণ্ডই শিরোধার্য করেছেন মহামান্য ইংরেজ বিচারক। জেল থেকে মুক্তির পর শশিভূষণে অসহায় পরিণতি প্রতিবাদের পন্থার নিরর্থকতাকেই তুলে ধরে।

তবু এ গল্পের উপসংহার নিয়ে মতানৈক্য আছে। প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—"...এ ক্ষেত্রে ভাবালুতা দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা।"[২০৩] মন্তব্যটির কিছু নিহিত তাৎপর্য অবশ্যই আছে। সাধারণ মানুষের জীবনধারার সঙ্গে শশিভূষণের নিজের জীবনের এক অনন্বয়ী যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গল্পটির সমাপ্তি। পাঠকের মনে প্রশ্ন থকেই গেছিল, এই অবস্থার উপশমের বা সমাধানের পথ

তাহলে কী? এই উচ্চকিত প্রশ্নের সমাধানের কোন বিলিবন্দোবস্ত না থাকায় রবীন্দ্রনাথ পাঠককে সমাধানহীন প্রশ্নের মুখে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ গল্পের রচনাকাল ১৮৯৪। আর 'গোরা'র রচনাকাল ১৯০৭। এই ১৩-১৪ বছরের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনার স্রোত অনেকদূর বয়ে গেছে। তাই শশিভূষণ যে বোধে গিয়ে পৌঁছতে পারেননি, যে আড়ষ্ট অভিজ্ঞতার মধ্যে এ গল্পের সমাপ্তি, রবীন্দ্রনাথ তার যথাযথ উপসংহার রচনা করেছেন গোরা চরিত্রের জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। সমালোচক লিখেছেন—

"...... একটা সামাজিক-রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' লিখেছিলেন। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের অনন্বয়ের যে যন্ত্রণা শশিভূষণের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, 'গোরা' উপন্যাসে উপযুক্ততর পটপরিবেশের সংযোগে তা আরো তাৎপর্যসঞ্চারী হয়েছে।

মাঝখানে স্বদেশী যুগের নানা আবেগ তাঁকে মথিত করেছে, নানা জিজ্ঞাসা তাঁকে বিদ্ধ করেছে। সুতরাং 'মেঘ ও রৌদ্র' এর উপসংহারী অমীমাংসা থেকে এবার তিনি মুক্ত। 'গোরা'র উপসংহারে গোরা যেখানে পৌঁছিল—সেটাই ঠিক জায়গা।"[২০৪]

পল্লীর আত্মিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশেষ করে নারী-শিক্ষার উপর রবীন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কারণ পল্লীসমাজে শুধু নয়, বঙ্গসমাজে নারী ছিল অবহেলিত। সমাজ কল্যাণে তাদের শক্তিকে ব্যবহারের প্রয়োজন মনে করেনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। পুরুষের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের বঞ্চনার ছবিকে রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন এ গল্পে—

" গিরিবালার ভাইরা ইস্কুলে যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া মূঢ় ভগ্নীটিকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিত, পৃথিবীর আকার কিরূপ; কোনোদিন বা প্রশ্ন করিত, সূর্য বড়ো না পৃথিবী বড়ো—সে যখন ভুল বলিত তখন তাহার প্রতি বিপুল অবজ্ঞা দেখাইয়া ভ্রম সংশোধন করিত। সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ, এ মতটা যদি গিরিবালার নিকট প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইত এবং সেই সন্দেহ যদি সে সাহস করিয়া প্রকাশ করিত, তবে তাহার ভাইরা তাহাকে দ্বিগুণ উপেক্ষাভরে কহিত, " ইস্! আমাদের বইয়ে লেখা আছে আর তুই—"

ছাপার বইয়ে এমন কথা লেখা আছে শুনিয়া গিরিবালা সম্পূর্ণ নিরুত্তর হইয়া যাইত, দ্বিতীয় আর-কোনো প্রমাণ তাহার নিকট আবশ্যক বোধ হইত না।

কিন্তু তাহার মনে মনে বড়ো ইচ্ছা করিত, সেও দাদাদের মতো বই লইয়া পড়ে। কোনো-কোনোদিন সে আপন ঘরে বসিয়া কোনো-একটা বই খুলিয়া বিড় বিড় করিয়া

পড়ার ভান করিত এবং অনর্গল পাতা উলটাইয়া যাইত। ছাপার কালো কালো ছোটো ছোটো অপরিচিত অক্ষরগুলি কী যেন মহারহস্যশালার সিংহদ্বারে দলে দলে সার বাঁধিয়া স্কন্ধের উপরে ইকার ঐকার রেফ উঁচাইয়া পাহারা দিত, গিরিবালার কোনো প্রশ্নের কোনোই উত্তর করিত না। কথামালা তাহার ব্যাঘ্র শৃগাল অশ্ব গর্দভের একটি কথাও কৌতূহলকাতর বালিকার নিকট ফাঁস করিত না এবং আখ্যানমঞ্জরী তাহার সমস্ত আখ্যানগুলি লইয়া মৌনব্রতের মতো নীরবে চাহিয়া থাকিত।"[২০৫]

বাংলার পল্লীগুলির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, তার পথঘাটের দুরবস্থার যে ছবি রবীন্দ্রনাথ নিজের চোখে দেখেছিলেন তার ছবিও আছে এ গল্পে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদের কীভাবে আপন স্বার্থে ব্যবহার করে অধিকারের বৈষম্য গড়ে তুলেছিল তারও ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ—যা তাঁর চিঠিপত্রের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় অনেকটাই| শশিভূষণ গ্রাম থেকে কলকাতায় যাত্রাকালে পল্লীর যে ছবিকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে এর পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

" যাত্রার আরম্ভকালে স্নানচিক্কন বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাস্যময় ছিল, অনতিবিলম্বেই মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন যে দিকে দৃষ্টি পড়ে সেই দিকই বিষণ্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। বন্যার সময়ে গোরুগুলি যেমন জলবেষ্টিত মলিন পঙ্কিল সংকীর্ণ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণের মধ্যে ভিড় করিয়া করুণনেত্রে সহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া শ্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজিতে থাকে , বাংলাদেশ আপনার কর্দমপিচ্ছিল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে মূক বিষন্নমুখে সেইরূপ পীড়িতভাবে অবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাষিরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে; স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতল বায়ুতে সংকুচিত হইয়া কুটির হইতে কুটিরান্তরে গৃহকার্যে যাতায়াত করতেছে ও পিছল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্তবস্ত্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ পুরুষেরা দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, নিতান্ত কাজের দায় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া জুতা-হস্তে ছাতি-মাথায় বাহির হইতেছে—অবলা রমণীর মস্তকে ছাতি এই রৌদ্রদগ্ধ বর্ষাপ্লাবিত বঙ্গদেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।"[২০৬]

'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে গ্রাম-শহরের পার্থক্যটুকুকে রবীন্দ্রনাথ চড়া রঙে এঁকেছেন— "কলিকাতার ধনীগৃহে এবং পল্লীগ্রামের গৃহস্থঘরে বিস্তর প্রভেদ"| এই প্রভেদ অর্থনৈতিক বুনিয়াদী ব্যবস্থায়, সামাজিক পরিকাঠামোয়ও বটে। পল্লীসমাজ যে আত্মশক্তিতে পরিপূর্ণ নয়, তার নিদারুণ দারিদ্র্য যে শহরের মুখ চেয়ে থাকে তার পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে বলেছেন—" অনাথবন্ধুর দুইটি ছোটো এবং একটি বড়ো ভাই ছিল। বড়ো ভাই বিদেশে চাকরি করিয়া যে গুটিপঞ্চাশ টাকা উপার্জন করিতেন, তাহাতেই তাহাদের সংসার চলিত এবং ছোটো দুটি ভাইয়ের বিদ্যাশিক্ষা হইত।"[২০৭]

অনাথবন্ধু নিজে গ্রামে লাইব্রেরী স্থাপন করে, ছাত্রদের সভাপতি হয়ে বাংলা ও ইংরেজি কাগজের সঙ্গে যুক্ত করে পল্লীর যে উন্নয়ন আনতে চেয়েছেন তাতে বাস্তবতা বোধের নিতান্ত অভাব ছিল। কেবল উচ্চাকাঙ্খার পিছনে লাগামহীন ভাবে দৌড়ে অবশেষে তাকে ক্ষান্ত হতে হয়েছে। বিলাত থেকে ফিরে এলেও এ দেশের সমাজ তাকে স্থান দেয়নি কালাপানি পেরোনোর জন্য। পল্লীর সমাজের এই কুসংস্কারের নিরর্থকতার দিকটিকে রবীন্দ্রনাথ গল্পে দেখিয়েছেন।

সমাজ অনাথবন্ধুকে বিধান দিয়েছিল সে প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে উঠলে শ্বশুরের অংশের যাবতীয় সম্পত্তির মালিকানা পাবে । সেই মতো প্রায়শ্চিত্ত পর্বের যখন পরিসমাপ্তি ঘটেছে ঠিক তখনি-ই জানা গেছে সে দ্বিতীয়া স্ত্রী হিসেবে এক মেমকে বিবাহ করেছে। চারিত্রিক পরিশুদ্ধতা ছাড়া আচারের দ্বারা পল্লীসমাজ যে মানুষের অন্তরকে ত্রুটিমুক্ত করতে পারবে না সেই সত্যটুকুকেই এই গল্পের মাধ্যমে বাইরে আনতে চেয়েছেন গল্পকার। একইসঙ্গে এদেশের নারীর এক বিশেষ মানসিকতার সচেতন সংশোধন আনতে চেয়েছেন গল্পকার—

" আসলে তীক্ষ্ণদৃষ্টি লেখক সমাজব্যাধির মূল সত্য ধরেছেন চরিত্র-ব্যক্তিত্বের মধ্যে নেমে। লাঞ্ছিতা বাঙালী বধূর এই নির্বিচার স্বামীপ্রেম, যা 'অহো বাঙালি নারীর অসাধারণ সতীত্ব' বলে স্তুতি পেয়ে আসছে, তাকে ব্যঙ্গবাণবিদ্ধ করার সচেতন চেষ্টা। ব্যাধি শুধু পুরুষের অন্যায় অত্যাচারে নয়, নারীর মানস আত্মসমর্পণেও, অশ্রদ্ধেয়ের প্রতি ভক্তিবিহ্বলতায়। লেখক এই দুঃখী মেয়েটিকেও মাঝে মাঝেই তাই বিদ্রূপের ভাষার অধিকারে আনতে কুণ্ঠিত হননি। এবং গল্পের শেষ ভাগে অনাথবন্ধুর মেম বৌকে হাজির করে বিন্ধ্যের উক্ত মনোভাবকে বজ্রাহত করেছেন।"[২০৮]

'দিদি' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ পল্লীর বাস্তব একটি দিককে তুলে ধরেছেন। জমির উপর প্রজার স্থায়ী অধিকারের কথা রবীন্দ্রনাথ চিন্তাভাবনার মধ্যে রেখেছিলেন। তা না হলে নানা কারণে জমি বেদখল হবার সম্ভাবনা ছিল। এ গল্পেও দেখা যায় যে, জয়গোপালের অসুস্থতার কারণে তাঁর পিসতুতো ভাই উপেনকে তিনি বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাই তাঁকে ঠকিয়ে জমির খাজনা বাকি রেখে অবশেষে মহাল হাসিলপুর নিজেই কিনে নেয়। খাজনা বাকি পড়লেই জমির স্বত্বের এই অনায়াস হস্তান্তর সাধারণ প্রজার পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠতো। জয়গোপাল নিজেও স্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এইভাবেই দ্বারিগ্রামে শশীর পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত ভাই নীলমণির নামাঙ্কিত জোতজমি আত্মসাৎ করে জমিদারের সঙ্গে যোগসাজসে— " ...দ্বারিগ্রামে তাহাদের যে বড়ো জোত ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানারূপে যাহার আয় প্রায় বার্ষিক দেড়হাজার টাকা হইবে, সেই জোতটি জমিদারের সহিত যোগ করিয়া

জয়গোপাল নিজের নামে খারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সমস্তই তাহাদের, তাহার ভাইয়ের নহে।"[২০৯]

এ গল্পে পল্লীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থারও চকিত উদ্ভাসন আছে। নীলমণি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে মতিলাল নামের একজন নেটিভ ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এর পিছনে জয়গোপালের বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করেছিল ঠিকই। কিন্তু একথাও গল্পে স্পষ্ট যে পল্লীর মধ্যে এমন কোন যোগ্য ডাক্তার ছিলেন না যিনি কিনা নীলমণির চিকিৎসা করতে পারেন। অনেক পল্লীগ্রামে মানুষকে আজো হাতুড়ে গ্রামীণডক্তারদের উপরেই জীবনের ভার সঁপে দিয়ে নিরুপায় জীবন অতিবাহন করতে হয়। নতুবা শহরের ডাক্তারের অপেক্ষায় সারাদিন মুখ চেয়ে বসে থাকা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। গুরুতর অসুস্থ রোগীদের জন্য কয়টি গ্রামেই বা হাসপাতালের বন্দোবস্ত ছিল। তাই পল্লীর মানুষদের জীবনের চরম সঙ্কটে শহুরে ডাক্তারের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও শশীর মত অবস্থাপন্ন দু'একজন লোকের পক্ষেই সে সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হত।

পিতৃতান্ত্রিক পল্লীসমাজ সেদিনও নারীকে, তাঁর অধিকার ও সম্মানের স্বার্থে লড়াইকে সম্মানের চোখে দেখতে পারেনি। তাকে পণ্যজ্ঞানে অবহেলা করেছে এবং তাঁর প্রতি চূড়ান্ত অন্যায় করেছে। গল্পের শুরুতেই আছে এমনি একটি দিকনির্দেশ—

" পল্লীবাসিনী কোনো-এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারকারী স্বামীর দুষ্কৃতিসকল সবিস্তারে বর্ণনাপূর্বক প্রতিবেশিনী তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল, "এমন স্বামীর মুখে আগুন।"

শুনিয়া জয়গোপাল বাবুর স্ত্রী শশী অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিলেন—স্বামীজাতির মুখে চুরুটের আগুন ছাড়া অন্য কোনোপ্রকার আগুন কোনো অবস্থাতেই কামনা করা স্ত্রীজাতিকে শোভা পায় না।

অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সংকোচ প্রকাশ করাতে কঠিনহৃদয় তারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিল, "এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাতজন্ম বিধবা হওয়া ভালো।" এই বলিয়া সে সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল।"[২১০]

শশী তার স্বামী-আনুগত্যের জায়গা থেকে দীর্ঘকাল নীলমণিকে নিয়ে শহরবাসের পর জয়গোপালের গৃহেই ফিরে গেছে। তাঁর মধ্যে স্বামীর প্রতি কোনপ্রকার ঔদ্ধত্যের প্রকাশ দেখা যায় নি। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে শশীর কারণে অপদস্থ হবার ক্ষোভ ও জ্বালায় জয়গোপাল স্ত্রীকে অর্থাৎ শশীকে নিঃশব্দে হত্যা করেছে। হত্যার কোনপ্রকার প্রমাণ যাতে না থাকে তার জন্য পরিকল্পনা মাফিক যাবতীয় বন্দোবস্তও

করেছে। এর মধ্য দিয়ে পল্লীর সমাজ-মানসিকতাকে চিনিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানস-অভীপ্সাকে চিনিয়ে দিয়েছেন—

" কিন্তু, এ মিলন অধিকদিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসীগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সমন্ধে কোনো কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতিবেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, সকলে 'চুপ চুপ' করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিত।"[২১১]

'মানভঞ্জন' গল্পেও গিরিবালার যে ক্রমোত্থানের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্য দিয়ে অনুরূপ অভীপ্সাটিকে চিহ্নিত করে দিতে চেয়েছেন। 'অধ্যাপক' গল্পের কিরণবালার শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যুৎপত্তি, প্রগতিশীল চেতনা ও মননশীলতার যে উৎসার তার মূলেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট। 'ঠাকুরদা' গল্পেও দেখি গল্পকথক পল্লীবালা কুসুমকে তার পারিবারিক অর্থনৈতিক ক্লিষ্টতার কারণে বিবাহ ব্যাপারে পুরুষের মুখাপেক্ষী বলে ভেবেছিল। কিন্তু একদিন তিনিও বুঝলেন—"এতদিন আমি কুসুমকে কোনো অবিবাহিত পাত্রের প্রসন্ন দৃষ্টিপাতের প্রতীক্ষায় সংরক্ষিত পণ্যপদার্থের মতো দেখিতাম; ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বলিয়া ও পড়িয়া আছে, দৈবাৎ যাহার পছন্দ হইবে ও তাহারই হইবে। আজ দেখিলাম, এই গৃহকোণে ঐ বালিকা-মূর্তির অন্তরালে একটি মানব হৃদয় আছে। তাহার নিজের সুখদুঃখ অনুরাগবিরাগ লইয়া একটি অন্তঃকরণ এক দিকে অজ্ঞেয় অতীত আর-এক দিকে অভাবনীয় ভবিষ্যৎ-নামক দুই অনন্ত রহস্যরাজ্যের দিকে পূর্বে পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। যে মানুষের মধ্যে হৃদয় আছে সে কি কেবল পণের টাকা এবং নাক-চোখের পরিমাণ মাপিয়া পছন্দ করিয়া লইবার যোগ্য।"[২১২]

'অতিথি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ তারাপদর বন্ধন অসহিষ্ণু স্বভাবের পরিচয় দান প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন, পূর্বে আমাদের দেশের নিরানন্দ পল্লীগুলির আনন্দের আধার ছিল গ্রাম্য মেলাগুলি। এই মেলাগুলি পল্লীর নিস্তেজ জীবনে প্রাণের সজীবতা বয়ে আনতো। এ গল্পে তার বর্ণনা দিয়ে লেখক বলেছেন—" জৈষ্ঠ্যমাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ় মাসের অবসান পর্যন্ত এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে পর্যায়ক্রমে বারোয়ারি মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে দুই-তিন দল যাত্রা পাঁচালি কবি নর্তকী এবং নানাবিধ দোকান নৌকাযোগে ছোটো ছোটো নদী-উপনদী দিয়া এক মেলা অন্তে অন্য মেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। গত বৎসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র জিমন্যাস্টিকের দল এই পর্যটনশীল মেলার আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমত নৌকারোহী দোকানির সহিত মিশিয়া মেলার পানের খিলি

বিক্রয়ের ভার লইয়াছিল। পরে তাহার স্বাভাবিক কৌতূহলবশত এই জিম্‌ন্যাস্টিকের ছেলেদের আশ্চর্য ব্যায়ামনৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়াছিল।"[২১৩]

রবীন্দ্রনাথের এ বর্ণনা তাঁর অভিজ্ঞতারই ফসল। শিলাইদহ-পতিসর পর্বে রবীন্দ্রনাথ নিজেই পল্লীর নিরানন্দ মানুষের জীবনে আনন্দের সঞ্চারের জন্য একাধিক মেলার বন্দোবস্ত করেছিলেন। কলকাতা থেকে জিমন্যাস্টিকের দল, যাত্রার দল নিয়ে এসে পল্লীর মধ্যে আনন্দের বাতাবরণ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত জমিদারদের একাংশ পল্লীর হিতার্থে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। এ গল্পে তারই প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র। এরই হুবহু বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ গল্পের অন্যত্র বলেছেন—" এই সময়ে কুড়ুলকাটার নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা হইবে। জ্যোৎস্নাসন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল, কোনো নৌকা নাগরদোলা, কোনো নৌকা যাত্রার দল, কোনো নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা অভিমুখে চলিয়াছে; কলিকাতার কন্‌সর্টের দল বিপুলশব্দে দ্রুততালের বাজনা জুড়িয়া দিয়াছে; যাত্রার দল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চীৎকার উঠিতেছে; পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সংগীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে—উদ্দীপনার সীমা নাই।"[২১৪]

জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা কীভাবে মানুষের মুক্তবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, মানবিক চেতনাকে আড়াল করে তার পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'পুত্রযজ্ঞ' গল্পে। এ গল্পে একশত পরিপুষ্ট ব্রাহ্মণ ও তিনজন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসীকে বৈদ্যনাথ পুত্রপ্রাপ্তির আশায় মহাসমারোহে ভোজ দান করেছে। শিকড়, মাদুলি, জলপড়া, সন্ন্যাসী-অবধূতের সাহায্যগ্রহণের পাশাপাশি 'কালীঘাটে যত ছাগশিশু মরিল তাহার অস্থিস্তূপে তৈমুরলঙ্গের কঙ্কালজয়স্তম্ভ ধিক্‌কৃত হইতে পারিত'।[২১৫] কিন্তু বুভুক্ষু মানুষের দল দ্বারে এসে উপস্থিত হলেও তাদের বিতাড়িত করার জন্য দ্বারী নিযুক্ত করেছে। এই বিতাড়িত বুভুক্ষু মানুষের সেবাই তো প্রকৃত দরিদ্রনারায়ণের সেবা। সে সেবা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্ধ-বিশ্বাসের স্তূপে বৈদ্যনাথ এমনিই নিজের চোখ দুটিকে নিমজ্জিত রেখেছিল যে নিজের স্ত্রী-পুত্রকেও চিনতে পারেনি, তাদেরও বিতাড়িত করে। ফলে অন্ধ আচার-সংস্কারের অনুবর্তনে তার পুত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে গেছে।

'রাজটীকা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের আনুগত্য লাভে লালায়িত এদেশীয় একশ্রেণীর আত্মসম্মানহীন মানুষকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন। 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'মুখুজ্জে বনাম বাড়ুজ্জে' এবং 'কোট বা চাপকান' প্রবন্ধে অনুরূপ মানসিকতার প্রকাশ আছে। এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, আমাদের দেশের যথার্থ কল্যাণ করতে হলে এদেশের সাধারণ মানুষকে সর্বাগ্রে সম্মান দেখানো অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু ইংরেজরা এদেশের

জনসাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত হীন আচরণ করতো। তাদের সেই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ অপেক্ষা এদেশীয় এক শ্রেণির মানুষ নিজের ইংরেজ ঘনিষ্ঠতা বা ইংরেজের প্রসাদলাভের গৌরব অনুভবেই নিজেদের জীবন ধন্য বলে মনে করতো। এই ধরণের আচরণ আমাদের দেশের পক্ষেই ছিল অত্যন্ত অপমানজনক। আমাদের জাতীয় চেতনার পরিপুষ্টির অন্তরায় ছিল তা। 'রাজটীকা' গল্পের প্রমথনাথ চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই বিশেষ দিকের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বিলাতফেরত প্রমথনাথ যখন সস্ত্রীক ইংরেজের চা ডিনার খেলা এবং হাস্যকৌতুকে কিঞ্চিৎ ভাগ পেতে লাগলেন তখন " সৌভাগ্যমদমত্ততায় ক্রমশই তাঁহার শিরা-উপশিরাগুলি অল্প অল্প রীরী করিতে শুরু করিল"। এমন সময় দেশের নতুন রেলপথ খোলা নিয়ে রেলকোম্পানির নিমন্ত্রণে ছোটলাটের সঙ্গে দেশের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রমথনাথও যাত্রা করেন। কিন্তু এই যাত্রা, এই ইংরেজ-আনুগত্য যে প্রমথনাথের পক্ষে কি অবমাননাকর হয়ে ওঠে তার বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—" ফিরিবার সময় একটা ইংরেজ দারোগা দেশীয় বড়লোকদিগকে কোনো-এক বিশেষ গাড়ি হইতে অত্যন্ত অপমানিত করিয়া নামাইয়া দিল। ইংরেজ বেশধারী প্রমথনাথও মানে মানে নামিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া দারোগা কহিল, " আপনি উঠিতেছেন কেন, আপনি বসুন-না।"

এই বিশেষ সম্মানে প্রমথনাথ প্রথমটা একটু স্ফীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু, যখন গাড়ি ছাড়িয়া দিল, যখন তৃণহীন কর্ষণধূসর পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তসীমা হইতে ম্লান সূর্যাস্ত-আভা সকরুণরক্তিম লজ্জার মতো সমস্ত দেশের উপর যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং যখন তিনি একাকী বসিয়া বাতায়নপথ হইতে অনিমেষনয়নে বনান্তরালবাসিনী কুণ্ঠিতা বঙ্গভূমির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তখন ধিক্কারে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং দুই চক্ষু দিয়া অগ্নিজ্বালাময়ী অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।"[২১৬]

প্রমথনাথ বুঝেছিলেন, "সম্মান আমাকে নহে, আমার স্কন্ধের বোঝাগুলোকে"। তাই বাড়ি ফিরে প্রমথনাথ ছেলেপুলে সকলকে ডেকে হোমাগ্নি জ্বালিয়ে নিজের বিলিতি বেশভূষাগুলিকে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। দৈবদুর্যোগে এই পরিবারেরই মধ্যমা ভগ্নীটিকে বিবাহ করেন নবেন্দুশেখর। তাঁর মধ্যেও ছিল ইংরেজের কাছ থেকে খেতাব লাভের লালসা, ইংরেজ অনুকরণের মনোবৃত্তি। সে কারণে ইংরেজ সমাজে তার যাতায়াত ছিল, এমনকি তিনি ইংরেজের সমাজে প্রবেশ করতে পারেন, এমন খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ইংরেজের মনস্তুষ্টির জন্য নবেন্দু ইংরেজের বিশেষ একটি শখের শহরে এক ব্যায়সাধ্য ঘোড়দৌড়স্থানও নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্যালীমহলের চাপে পড়ে, তাদের শ্রদ্ধা স্নেহ স্বদেশিয়ানায় এই ইংরেজ তোষণ সাময়িক কালের জন্য অবদমিত হয়।

এই অবসরে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন দেশোন্নয়ন সংক্রান্ত কংগ্রেসের কার্যাবলীর ত্রুটির দিকটিকেও তুলে ধরেছেন। জ্যেষ্ঠা শ্যালী লাবণ্যের স্বামী নীলরতনবাবু ছিলেন কংগ্রেসের সদস্য। তাঁর এবং পরিবারের অন্যান্যদের স্বদেশীয়ানার টানে পড়ে নবেন্দু ইংরেজ ঘনিষ্ট হয়েও কংগ্রেসকে হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে বসেন। যদিও খবরটিকে শেষ পর্যন্ত গোপন রাখা যায়নি। ফলে নবেন্দুবাবুর নতুন করে কংগ্রেস-ঘনিষ্ঠতা নিয়ে সংবাদ পত্রে বিতর্ক শুরু হয়। এই বিতর্কের সূত্রে নবেন্দু কংগ্রেসের একজন অধিনায়ক হয়ে ওঠে প্রায়—

" কলিকাতায় পদার্পণ করিবামাত্র কন্‌গ্রেসের দলবল নবেন্দুকে চতুর্দিকে ঘিরিয়া একটা প্রকাণ্ড তাণ্ডব শুরু করিয়া দিল। সম্মান সমাদর স্তুতিবাদের সীমা রহিল না। সকলেই বলিল, " আপনাদের মতো নায়কগণ দেশের কাজে যোগ না দিলে দেশের উপায় নাই।" কথাটার যাথার্থ্য নবেন্দু অস্বীকার করিতে পারিলেন না , এবং গোলমালে হঠাৎ কখন্ দেশের একজন অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন। কন্‌গ্রেস-সভায় যখন পদার্পণ করিলেন তখন সকলে মিলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজাতীয় বিলাতী তারস্বরে 'হিপ্ হিপ্ হুরে' শব্দে তাহাকে উৎকট অভিবাদন করিল। আমাদের মাতৃভূমির কর্ণমূল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।"[২১৭]

এ লজ্জার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের কংগ্রেসের আবেগসর্বস্ব অন্তসারশূন্য পথাবলম্বনের দিকটিকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন। যাঁরা দেশ সম্বন্ধে ভাবেন না, দেশের ধারণা যাদের কাছে স্পষ্ট নয়, যারা রায়বাহাদূর খেতাব লাভের জন্য ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আত্মসম্মান বিকিয়ে দিতে সামান্য সঙ্কোচ করেন না, এমন তাদের প্রদত্ত গালিগালাজকেও নির্বিচারে হজম করে, তারা যদি শুধুমাত্র অর্থের জোরে দেশের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়, তাহলে আমাদের দেশের উন্নয়ন বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি যে বিশ বাঁও জলে সে কথাটিকেই স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। অথচ যারা প্রকৃত পক্ষে দেশকে ভালোবাসেন, দেশের সেবায় নিঃশব্দে কাজ করে যান, তারা কংগ্রেসে সে স্থান পেতে ব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথ নবেন্দুর বিপরীতে তাই লাবণ্যের স্বামী নীলরতনের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের নিজস্ব অভিজ্ঞানটিকেই প্রকট করে তুলেছেন এ গল্পে—"লাবণ্যর স্বামী নীলরতনবাবু আদালতে বড়ো উকিল হইয়াও সাহেবসুবাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না বলিয়া অনেক কথা উঠিত। তিনি বলিতেন, "কাজ কী, ভাই! যদি পালটা ভদ্রতা না করে তবে আমি যাহা দিলাম তাহা তো কোনোমতেই ফিরাইয়া পাইব না। মরুভূমির বালি ফুটফুটে সাদা বলিয়াই কি তাহাতে বীজ বুনিয়া কোনো সুখ আছে! ফসল ফিরিয়া পাইলে কালো জমিতেও বীজ বোনা যায়।"[২১৮]

পল্লীর মানুষের দারিদ্র্য, চিকিৎসকের নিতান্ত অপ্রতুলতার কারণে মানুষের শোচনীয় অবস্থার ছবি আছে 'দৃষ্টিদান' গল্পে। 'দুর্বুদ্ধি' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ একই ছবি

এঁকেছেন। পাশাপাশি এও দেখিয়েছেন, প্রশাসনিক দূষণ কীভাবে পল্লীর মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। আইন বা প্রশাসনের সাহায্যগ্রহণ সাধারণ মানুষের পক্ষে অধিকাংশ সময়েই সম্ভব হত না। যদি বা হত, তার জন্য কি চরম মূল্য চোকাতে হত রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে তার ছবি এঁকেছেন—“আমি পাড়াগেঁয়ে নেটিভ ডাক্তার, পুলিসের থানার সম্মুখে আমার বাড়ি। যমরাজের সহিত আমার যে পরিমাণ আনুগত্য ছিল দারোগাবাবুদের সহিত তাহা অপেক্ষা কম ছিল না, সুতরাং নর ও নারায়ণের দ্বারা মানুষের যত বিবিধ রকমের পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার সুগোচর ছিল। যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয়ের দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যস্থতায় দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল।”[২১৯]

রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই পল্লীর সাধারণ প্রজাদের জন্য মণ্ডলী প্রথার প্রচলন করেছিলেন। এই প্রথার দ্বারা সাধারণ প্রজারা ভীষণভাব উপকৃত হয়। কিন্তু এ গল্পে দেখা যায় তুলসীপাড়ার হরিনাথ মজুমদার তাঁর বিধবা কন্যাটিকে হারালেও শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়ে বেনামিতে পুলিশের কাছে পত্র লেখে। পুলিশ তাই তাঁর বিধবা মেয়ের মৃতদেহ নিয়ে টানাটানি করতে উদ্যত হয়। নিরুপায় হরিনাথ তাই পুলিশের বন্ধু হিসেবে পরিচিত এ গল্পের ডাক্তারকে গিয়ে ধরে বসে। কিন্তু এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ডাক্তার এবং পুলিস উভয়েই হরিনাথের কাছ থেকে অর্থ শোষণ করে। পল্লীর মানুষের এই হীন দলাদলি তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথেও কতখানি অন্তরায় ছিল স্বল্প পরিসরে তার ছবিটিও ফুটে উঠেছে গল্পে। রবীন্দ্রনাথ তাই পল্লীর মানুষকে এই সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে মত পোষণ করেছিলেন।

পল্লীর অনুন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণে শুধু হরিনাথের কন্যা নয়, অধিকাংশ অসুস্থ মানুষকেই প্রাণ হারাতে হত। নেটিভ ডাক্তারের মেয়ে শশী ঠিক এভাবেই মারা যায়। গল্পে বর্ণিত সাপে কাটা চাষার মেয়েটির মৃত্যুও অনুরূপ ঘটনারই অনুবর্তন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ চিকিৎসার কিংবা আইনের সুবিধাগ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজে ধনী নির্ধনের মধ্যেকার ফারাকটুকুকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন—

“তখন পুরা বর্ষায় পল্লী ভাসিয়া গেছে। ধানের ক্ষেত এবং গৃহের অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া নৌকায় করিয়া ফিরিতে হয়। ভোররাত্রি হইতে বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, এখনো বিরাম নাই।

জমিদারের কাছারিবাড়ি হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে। বাবুদের পান্সির মাঝি সামান্য বিলম্বটুকু সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ধত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে। ......

নৌকায় উঠিবার সময় দেখি, থানার ঘাটে ডোঙা বাঁধা, একজন চাষী কৌপীন পরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী রে।" উত্তরে শুনিলাম গতরাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে, থানার রিপোর্ট করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দূর গ্রাম হইতে বহিয়া আনিয়াছে। দেখিলাম, সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্রবস্ত্র খুলিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারি কাছারির অসহিষ্ণু মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তখনো সেই লোকটা বুকের কাছে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে; দারোগাবাবুর দর্শন মেলে নাই। আমি তাহাকে আমার রন্ধন-অন্নের এক অংশ পাঠাইয়া দিলাম। সে তাহা ছুঁইল না।

তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া কাছারির রোগীর তাগিদে পুনর্বার বাহির হইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনো লোকটা একেবারে অভিভূতের মতো বসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে, এই নদী, ঐ গ্রাম, ঐ থানা, এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পঙ্কিল পৃথিবীটা স্বপ্নের মতো। বারংবার প্রশ্নের দ্বারা জানিলাম, একবার একজন কন্‌স্টেবল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ট্যাঁকে কিছু আছে কি না। সে উত্তর করিয়াছিল, সে নিতান্তই গরিব, তাহার কিছু নাই। কন্‌স্টেবল বলিয়া গেছে, "থাক বেটা, তবে এখন বসিয়া থাক্।"[২২০]

গল্পের পূর্বোক্ত অংশে পল্লীর আর্থ-সামাজিক ছবিটা বাস্তব রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে। রাস্তাঘাটের অপ্রতুলতার কারণে, বাঁধ নির্মাণের অভাবে বর্ষায় পল্লীর চেহারাটা ঠিক কেমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায় তার একটি ছবিটি ধরা পড়েছে পূর্বোক্ত বর্ণনায়। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন জমিদারের মতো ধনীর আশু প্রয়োজনের কাছে গরিব সাধারণ মানুষের জীবনের বিপর্যয় কীভাবে গৌণ হয়ে যায়। এ গল্পে বর্ণিত চাষাটির আর্থিক দারিদ্র্যের ছবিটিকে রবীন্দ্রনাথ কলমের এক আঁচড়েই ফুটিয়ে তুলেছেন। যে মানুষকে কৌপীন মাত্র পরিধান করে রোদে পুড়ে জলে ভিজে জীবন কাটাতে হয় তার পক্ষে মৃত মানুষকে ঢাকা দেওয়ার মতো বস্ত্রখণ্ড সংগ্রহ করাটাই যে কত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই নিজের গাত্রবস্ত্রটিকেই খুলেই মৃতদেহটুকুকে ঢাকা দিয়েছে। এমন মানুষও যে সমাজের সুবিধাভোগী প্রশাসন বা জমিদারের কর্মচারীদের দ্বারা নির্মমভাবে শোষিত হতে হত তার পরিচয়টিকে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে তুলেছেন কনস্টেবল বা ডাক্তারের আচরণে। ডাক্তার নিজেই স্বীকার করেছেন—"এমন দৃশ্য পূর্বেও অনেকবার দেখিয়াছি, কখনো কিছুই মনে হয় নাই।" এদিনও ডাক্তার এই দরিদ্র অভুক্ত কন্যা হারানোর বেদনায় বেদনার্ত চাষাটিকে সারাদিন বসিয়ে রেখে কাছারির রোগী দেখতে বেরিয়ে গেছেন।

ধনী নির্ধনের এই ব্যবধানটিকে রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই হ্রাস ঘটাতে চেয়েছিলেন, প্রশাসনিক বা আইনী জটিলতার বাইরে পল্লীর সাধারণ সমস্যাগুলোকে মণ্ডলী ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান চেয়েছিলেন। বিশেষ করে আমাদের দেশের জমিদার সম্প্রদায়ের কাছে, দেশীয় মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন যাতে করে তাঁরা পল্লীর এই অসহায় দরিদ্র মানুষগুলির পাশে এসে দাঁড়ান। তাতেই যে আমাদের দেশের পল্লীর যথার্থ হিত, দেশের যথার্থ হিত নিহিত ছিল, তা রবীন্দ্রনাথ বার বার একাধিক চিঠিপত্রে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সে কথায় সাড়া দিয়ে কজন মানুষই বা এগিয়ে এসেছেন। পুলিশ-প্রশাসন এবং জমিদারের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ছাড়া একক চেষ্টায় সমস্যার নিরসন করাটা যে কত কঠিন ছিল তার দৃষ্টান্ত এ গল্পের দারোগার জীবন-পরিণাম। আতুর চাষাটির জন্য দারোগাকে ডাক্তার তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু সে অপমান ও স্বার্থে আঘাতকে মেনে নিতে পারেনি দারোগা। তাই " অনতিকাল পরে দারোগার পায়ে ধরিয়াছি, তাঁহার মহদাশয়তার উল্লেখ করিয়া অনেক স্তুতি এবং নিজের বুদ্ধিভ্রংশ লইয়া অনেক আত্মধিক্কার প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু শেষটা ভিটা ছাড়িতে হইল।"[২২১]

পল্লীর পথঘাট এবং যাতায়াত ব্যবস্থার দুরবস্থার ছবিটি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছে তাঁর ' যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' গল্পে। এ গল্পে সম্ভ্রান্ত জমিদার গৌরসুন্দরের সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরের কন্যা কল্পার বিবাহের বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু বিবাহের দুদিন আগে থেকে শুরু হয় প্রচণ্ড বর্ষণ। বিবাহের দিন বরযাত্রীর পল্লীপথে যাত্রার বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

" গৌরসুন্দর পূর্ব হইতে গুটিকতক হাতি ও পালকি স্টেশনে হাজির রাখিয়াছিলেন। আশেপাশের গ্রাম হইতে যজ্ঞেশ্বর ছইওয়ালা গোরুর গাড়ির যোগাড় করিতে লাগিলেন। দুর্দিনে গাড়োয়ানরা নড়িতে চায় না, হাতে পায়ে ধরিয়া দ্বিগুণ মূল্য কবুল করিয়া যজ্ঞেশ্বর তাহাদের রাজি করিলেন। বরযাত্রের মধ্যে যাহাদিগকে গোরুর গাড়িতে চড়িতে হইল তাহারা চটিয়া আগুন হইল।

গ্রামের পথে জল দাঁড়াইয়া গেছে। হাতির পা বসিয়া যায়, গাড়ির চাকা ঠেলিয়া তোলা দায় হইল। তখনো বৃষ্টির বিরাম নাই। বরযাত্রীগণ ভিজিয়া কাদা মাখিয়া বিধিবিড়ম্বনার প্রতিশোধ কন্যাকর্তার উপর তুলিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল। হতভাগ্য যজ্ঞেশ্বরকে এই অসাময়িক বৃষ্টির জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।"[২২২]

বাংলার অধিকাংশ পল্লীর যাতায়াত ব্যবস্থাই এমন ছিল। পল্লীগুলি কোন দিক থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। দারিদ্র্য অনাহার তার নিত্য সঙ্গী ছিল। ফলে গ্রামগুলিতে হঠাৎ করে বরযাত্রীর মত সম্মিলিত জনতার খাদ্যের সংস্থান করাও মুশকিল ছিল। এ গল্পেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—" দ্রব্যসামগ্রী কতক পাবনা হইতে পথের মধ্যে কতক বা ভগ্নপ্রায়

পাকশালায় উনান নিবিয়া একাকার হইয়া গেছে। সহসা উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে বুড়োশিবতলা এমন গ্রামই নহে।"[২২৩] নিরুপায় হয়ে অবশেষে পাত্রের হস্তক্ষেপে এ গ্রামের গোয়ালারা সম্মিলিতভাবে কেবল মিষ্টান্ন দিয়ে বরযাত্রীদের সন্তুষ্ট করতে সমর্থ হয়।

'উলুখড়ের বিপদ' গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন আমাদের দেশের ত্রুটিপূর্ণ বা পক্ষপাতমূলক বিচারব্যবস্থার দিকটিকে। এতে আমাদের দেশের সাধারণ প্রজাদের যে ক্ষতির মুখোমুখি হতে হত সে দিকে নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশের অবৈধ সাহায্য নিয়ে এ গল্পে গিরিশ বসু যেভাবে ভট্টাচার্যকে বা ঝি প্যারীকে বিপদে ফেলেছে তাতে আইনি পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট। এই আইনী পক্ষপাতিত্বের শিকার গ্রামের প্রজারাও। গিরিশ বসু গ্রামের প্রজাদের উপর মাত্রাতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করায় প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। হরিহর ভট্টাচার্যের দেবোত্তর সম্পত্তিকেও আত্মসাৎ করার বন্দোবস্ত করে অর্থ আর ক্ষমতার জোরে।

মুন্সেফ নবগোপালবাবু নিম্ন আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা হরিহরকে রক্ষা করলেও উচ্চ আদালতে আপিল করে গিরিশ বসু তার সমস্ত সম্পত্তির দখল নেন। কেননা-" সম্প্রতি যিনি নূতন অ্যাডিশনাল জজ হইয়া আসিয়াছেন তিনি মুন্সেফ থাকা কালে মুন্সেফ নবগোপালবাবুর সহিত তাঁহার ভারি খিটিমিটি বাধিয়াছিল। তখন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই ; আজ জজের আসনে বসিয়া নবগোপালবাবুর রায় পাইবামাত্র উলটাইয়া দিতেছেন; ......।"[২২৪] আপিলের দ্বারা ফল লাভের সম্ভাবনাকেও অবশিষ্ট রাখেননি জজসাহেব। কেননা তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীকেই বিশ্বাস করে গেছেন। আর হাইকোর্টে যেহেতু সাক্ষীর বিচার হয় না তাই এই রায়ের নড়চড় হবার কোন সম্ভাবনা নেই। পল্লীর বিশেষ শ্রেণীর লোকেদের এই শোষণ পীড়নের কারণেই বহু মানুষই সেদিন নিজের ভিটা ছেড়ে অনির্দেশ্য জীবনের পথকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এ গল্পটি তাই পল্লীর 'সমাজ-বাস্তবতার অভ্রান্ত নিদর্শন'।[২২৫] 'রাসমণির ছেলে' গল্পেও ভবানীচরণ ও তারাপদর মধ্যেকার নিরর্থক মামলা-মকদ্দমা ভবানীচরণকে ইতিবাচক ফলের বিনিময়ে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে।

'পণরক্ষা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ পল্লী-অর্থনীতির এক বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁত শিল্পই একদিন আমাদের দেশের পল্লীগুলির অর্থনৈতিক পরিপুষ্টির কারণ হয়ে উঠেছিল। সেদিন পল্লীর সম্পন্ন তাঁতিরা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও সাধারণের জন্য তাদের দানসত্রকে উন্মুক্ত রেখেছিলেন। ফলে পল্লীর মধ্যে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান থাকলেও তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের জালটুকু নিবিড় ছিল। সেই নিবিড় জালটুকু ছিঁড়তে শুরু করে বিদেশের লোহার কলে তৈরি বস্ত্রসামগ্রী এদেশে আমদানী হবার ফলে পল্লীর অর্থনৈতিক অবস্থাটি যখন ভেঙে পড়ে। তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে যে

ব্যক্তিগত মালকানার সৃষ্টি হয়, তা পল্লীর মানুষের সহজ সম্পর্কের জালটিকে ছিঁড়ে দিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তার ইঙ্গিত দিয়ে এ গল্পে বলেছেন—

" তাঁতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈতৃক ব্যবসায়। এই ব্যবসা করিয়াই বংশীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ অভিরাম বসাক গ্রামে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে আজও সেখানে রাধানাথের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। কিন্তু সমুদ্রপার হইতে এক কল-দৈত্য আসিয়া বেচারা তাঁতের উপর অগ্নিবাণ হানিল এবং তাঁতির ঘরে ক্ষুধাসুরকে বসাইয়া দিয়া বাষ্পফুৎকারে মুহুর্মুহু জয়শৃঙ্গ বাজাইতে লাগিল।

তবু তাঁতের কঠিন প্রাণ মরিতে চায় না—ঠুক্‌ঠাক্ ঠুক্‌ঠাক্ করিয়া সুতা দাঁতে লইয়া মাকু এখনো চলাচল করিতেছে—কিন্তু তাহার সাবেক চালচলন চঞ্চলা লক্ষ্মীর মনঃপূত হইতেছে না, লোহার দৈত্যটা কলে-বলে-কৌশলে তাঁহাকে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছে।"[২২৬]

বয়কট আন্দোলন সেদিনের গ্রামীণ অর্থনীতির উপর সাময়িক কালের জন্য হলেও প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু সে প্রভাবের দিকটি ইতিবাচক কি নেতিবাচক তার স্পষ্ট দিকনির্দেশ আছে এ গল্পে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—" বিশেষত সেই বছরেই বয়কটের কল্যাণে হঠাৎ তাঁতের কাপড়ের দর এবং আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাঁতিদের মধ্যে যাহারা অন্য কাজে ছিল তাহারা প্রায় সকলে তাঁতে ফিরিল। নিয়তচঞ্চল মাকুগুলা ইঁদুর-বাহনের মতো সিদ্ধিদাতা গণনায়ককে বাংলাদেশের তাঁতির ঘরে দিন রাত কাঁধে করিয়া দৌড়াইতে লাগিল।"[২২৭] কিন্তু যে বয়কট আন্দোলন মূলত; ছিল শহরকেন্দ্রিক, শহরে কিন্তু বয়কটের বিকল্প কোন দেশীয় সামগ্রী পাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। তাই কলকাতার কলেজের ছাত্ররা তাদের স্বদেশী দোকান চালানোর জন্য পল্লীর মধ্য থেকে যেভাবে তাঁতের সামগ্রী সংগ্রহ করতো তার পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে। বংশীর ছেলে রসিকের সঙ্গে কলকাতার কলেজে পড়া সুবোধ নামের যে ছেলেটির পরিচয় হয় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—" এ ছেলেটি কলিকাতার কলেজের ছাত্র। ছাত্রেরা যে স্বদেশী কাপড়ের দোকান খুলিয়াছে তাহারই জন্য দেশি কাপড় সংগ্রহ করিতে সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে। নাম সুবোধ, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাহার কোনো সংকোচ নাই, বাধা নাই—সমস্তদিন হাটে ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলায় চিঁড়া ভিজাইয়া খাইতেছে।"[২২৮]

কিন্তু এই পথ যে দেশোন্নয়নের প্রকৃত পথ নয়, তা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন। কেননা পল্লীর বস্ত্রের উপর যে প্রবল চাহিদার সৃষ্টি হয় তার ফলে পল্লীর বস্ত্রসঙ্কট দেখা দেয়। ফলে আন্দোলন গ্রাম-শহর জুড়ে সার্বিক রূপ না নেবার ফলে, বিশেষত মানুষ আপন ক্ষতি স্বীকার করে বেশি দামের দেশি তাঁতের কাপড় কিনতে না

চাওয়ায় বয়কট আন্দোলন একদা স্তব্ধ হয়ে যায়। বলপূর্বক বয়কটের নেতিবাচক দিকটিকে রবীন্দ্রনাথ আরো বিস্তৃত ভাবে তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে দেখিয়েছেন। এ গল্পেও রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

" রসিক তাঁতের স্কুলের শিক্ষক হইয়া কলিকাতায় আসিল। এতদিন পরে বাসা খরচ বাদে সে সামান্য কিছু জমাইতে পারিল, কিন্তু বাইসিক্‌ল-চক্রের লক্ষ্য ভেদ করিতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে। আর বধূর বরমাল্যের তো কথাই নাই। ইতিমধ্যে তাঁতের স্কুলটা গোড়ায় যেমন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তেমনি হঠাৎ নিবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কমিটির বাবুরা যতক্ষণ কমিটি করিতে থাকেন অতি চমৎকার হয়, কিন্তু কাজ করিতে নামিলেই গণ্ডগোল বাধে। তাঁহারা নানা দিগ্‌দেশ হইতে নানা প্রকারের তাঁত আনাইয়া শেষকালে এমন একটা অপরূপ জঞ্জাল বুনিয়া তুলিলেন যে সমস্ত ব্যাপারটা লইয়া যে কোন্‌ আবর্জনাকুণ্ডে ফেলা যাইতে পারে তাহা কমিটির পর কমিটি করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।"[২২৯]

'হালদারগোষ্ঠী' গল্পে রবীন্দ্রনাথ পল্লী-অর্থনীতি কীভাবে মৎসশিকারের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল তার টুকরো ছবি এঁকেছেন। এ ক্ষেত্রে জমিদারের বিশেষ সহায়তা যে প্রজাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বড় নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতো তার পরিচয়টুকুকেও লিপিবদ্ধ করেছেন—"সুখদা মধুকৈবর্তের স্ত্রী, মনোহরলালের প্রজা। সে একদিন অন্তঃপুরে আসিয়া কিরণলেখার পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ব্যাপারটা এই—বছর কয়েক পূর্বে নদীতে বেড়াজাল ফেলিবার আয়োজন- উপলক্ষে অন্যান্য বারের মতো জেলেরা মিলিয়া এক যোগে খৎ লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে হাজার টাকা ধার লইয়াছিল। ভালোমত মাছ পড়িলে সুদে আসলে টাকা শোধ করিয়া দিবার কোন অসুবিধা ঘটে না; এইজন্য উচ্চ সুদের হারে টাকা লইতে ইহারা চিন্তামাত্র করে না। সে বৎসর তেমন মাছ পড়িল না এবং ঘটনাক্রমে উপরি উপরি তিন বৎসর নদীর বাঁকে মাছ এত কম আসিল যে, জেলেদের খরচ পোষাইল না, অধিকন্তু তাহারা ঋণের জালে বিপরীত রকম জড়াইয়া পড়িল। যে-সকল জেলে ভিন্ন এলেকার, তাহাদের আর দেখা পাওয়া যায় না; কিন্তু, মধুকৈবর্ত ভিটাবাড়ির প্রজা, তাহার পলাইবার জো নাই বলিয়া সমস্ত দেনার দায় তাহার উপরেই চাপিয়াছে। সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার অনুরোধ লইয়া সে কিরণের শরণাপন্ন হইয়াছে।"[২৩০]

এর পাশাপাশি, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে চেতনার স্বাধীনতা মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম দিয়েছিল তা সমাজ-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিন্যাসে কী পরিবর্তন আনছে তার ছবিকেও চিহ্নিত করেছেন গল্পকার। পাশাপাশি জমিদার রবীন্দ্রনাথ নবীন

কালচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে জমিদারি ব্যবস্থার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে ইতিহাসের দাবি মেনে চিহ্নিত করেছেন—

" ফিউডাল জমিদারী ব্যবস্থার দুই শত্রু—পীড়িত প্রজাশক্তি এবং অবদমিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ঘটনাচক্রে এখানে মিলেছে। সমাজতান্ত্রিকের দৃষ্টিতে এই ঐক্য শুধু ঘটনাচক্রে নয়, ইতিহাসের অমোঘ বিধানেও। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ বাংলার মাটিতে এ গল্প ফলিয়েছিলেন—ইতিহাস চেতনার গভীরে প্রবেশ না ঘটলে তা সম্ভব হত না। ......

আসলে এককবিদ্রোহী এক ইনডিভিজুয়াল বনোয়ারী—যে বিপ্লব যুগান্তর আনে তার পরিচয় সে জানে না। সে নিজেই শুধু এই সোনার খাঁচাকে পায়ে মাড়িয়ে চলে যেতে পারে। হালদারগোষ্ঠীর পরশ্রমজীবী অস্তিত্ব ছুঁড়ে ফেলে—'সে চাকরি খুঁজিতে বাহির হইল।'

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শ্রমজীবী মনুষ্যত্বে মুক্তি খুঁজল—নিদর্শন মিলল, গল্পকারের ঐতিহাসিক দৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ ও অভ্রান্ত।"[২৩১]

'হৈমন্তী' গল্পে গল্পকার নারীকে পণ্য হিসেবে পরিগণিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করেছেন। সমাজে নারী যে বিশেষ শক্তি, নারী-পুরুষের সম্মিলিত শক্তিই যে সমাজ-প্রগতির নতুন দিকনির্দেশিকা আনতে পারে রবীন্দ্রনাথ সেকথা বার বার বলেছেন। এ গল্পের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই সামাজিক বার্তাটিকে ঘোষণা কতে চেয়েছেন। এ গল্পের কথক নায়িকা হৈমন্তীর বর নিজেই। তিনি এফ. এ. পাশ করে বৃত্তিলাভ করেছেন। সুতরাং বর হিসেবে অনুরূপ পাত্র দুর্মূল্য বলেই বিলম্ব না করে 'কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল।' তবু বরপক্ষের আগ্রহ যে কিছু অধিক হয়ে উঠেছিল তার কারণ পাত্রীর বয়স সতেরো, যা পাত্রের বয়সের তুলনায় মাত্র দুই বৎসর কম। সেকারণে অবশ্য কন্যাপণ কিছু অধিক পরিমাণেই জুটেছিল। বক্তার পিতা 'উগ্রভাবে সমাজের অনুরাগী' হলেও হৈমন্তীকে যে পাত্রী হিসেবে মেনে নিলেন সে কেবল পণের আধিক্যে এবং একমাত্র কন্যাসন্তানের পিতার সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তিকে অধিগত করার অভিপ্রায়ে।

হৈমন্তী মা-মরা মেয়ে। তাই পিতার কাছে প্রচুর স্বাধীনতার মধ্যে বড় হলেও পিতা তাকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলেছেন। সত্যের আদর্শবোধ তার গভীরে। কোনপ্রকার চটুল কৃত্রিমতা তার মনে নেই। বিবাহের পর বিদায়কালে চিন্তান্বিত গৌরীশঙ্করকে বরের পিতা আশ্বস্ত করেন—"......মনে কোনো চিন্তা রাখিয়ো না, তোমার মেয়েটি যেমন বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছে , এখানে তেমনি বাপ-মা উভয়কেই পাইল।"[২৩২]

কিন্তু বিবাহের পর শ্বশুর-শাশুড়ীর পিতা-মাতাসুলভ চেহারা বদলে যায়। হৈমন্তীর শ্বশুর জানতে পারেন যে বিবাহে গৌরীশঙ্করের প্রদত্ত পনেরো হাজার টাকার পাঁচ হাজার টাকা ধার করেই সংগ্রহ করা—যার সুদ খুব সামান্য নয়। তার লক্ষ টাকার সম্পত্তির কথাও গুজবমাত্র। এমনকি গৌরীশঙ্কর রাজার প্রধানমন্ত্রীগোছের কেউ নয়, সেখানকার শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ। সুতরাং বরের পিতার রাজমন্ত্রীগোছের কিছু হবার সম্ভাবনাও অন্তর্হিত হয়। তাই গৌরীশঙ্করের সমাদর বেয়াই বাড়িতে এরপর থেকে কমে যায়।

গৌরীশঙ্করের দর কমায় কন্যা হৈমন্তীর দরও কমে যায়। তার উপর শুরু হয় মানসিক নির্যাতন। পূর্বে শ্বশুর বাড়ির কোন কাজেই যেখানে হাত দিতে দেওয়া হত না বধূকে, এখন বধূর ডাক পড়ল দেবতার পূজা সাজিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু এর পিছনে নিহিত ছিল হৈমন্তীর অনভিজ্ঞতাকে অপমান করার উদ্দেশ্য। তাই হৈমন্তী যখন জিজ্ঞাসা করল, " মা, বলিয়া দাও কী করিতে হইবে' তখন তাকে শুনতে হল –"এ কোন নাস্তিকের ঘরের মেয়ে। এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরী নেই।"[২৩৩] শুধু এখানেই শেষ নয়, হৈমন্তীর ত্রুটিকে কেন্দ্র করে তার পিতাকেও ব্যঙ্গবিদ্ধ করা শুরু হয়। নানা পরিস্থিতি তৈরি করে হৈমন্তীর সঙ্গে তার পিতার যোগাযোগ টুকুকেও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অনুরূপ অবস্থায় মানসিক পীড়নের শিকার হৈমন্তীর শরীর কৃশ হয়ে পড়লে পর তার স্বামী বউকে বাপের বাড়ি পাঠানোর জন্য বাপের কাছে দরবার করেও ব্যর্থ হলেন। অতঃপর বনমালীবাবুর মারফৎ চিঠি পেয়ে হৈমন্তীর পিতা স্বয়ং উপস্থিত হন। কন্যার অবস্থা দেখে তাঁর বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়। এ বাড়িতে পূর্বের সমাদর তো পেলেনই না , বরং তিনি একটি উপদ্রব হিসেবেই চিহ্নিত হলেন। কেউ তাঁর সঙ্গে ঠিকমত কথাও বললেন না। এমনকি কন্যাকে কয়েকদিনের জন্য সঙ্গে নিয়ে যাবার আবেদনও বেয়াই-এর কাছে অগ্রাহ্য হল। তিনি বড় ডাক্তার ডেকে হৈমন্তীকে পরীক্ষা করালেন। তিনি জানালেন , বায়ু পরিবর্তন না হলে হৈমন্তীর বড় ধরণের 'ব্যামো'র সম্ভাবনা প্রকট। কিন্তু এটিও ডাক্তারকে পয়সা দিয়ে ব্যবস্থা করা গৌরীশঙ্করী চাল বলে সমালোচিত হল। স্বামীদেবতাটি হৈমকে নিয়ে যাবেন বলে পিতার বিরুদ্ধে মত দিলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সংস্কার ও বিরোধের কাছে তা বিলীন হয়ে যায়। তাই তিনি বলেন—" যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যেও যে আমি ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমি যে তাদের মধ্যে একজন।"[২৩৪]

তাই নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তাঁকেও দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী লিখতে হল। হৈমন্তীর মুখের স্নিগ্ধ হাসি চিরতরে এরপরে মিলিয়ে যায়। তার মৃত্যু কিংবা স্বামী

কর্তৃক প্রত্যাখানের কোন ছবি এ গল্পে নেই। কিন্তু কথকের বর্ণনা—" শুনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, ইহাও সম্ভব হইতে পারে।"[২৩৫] এর থেকে হৈমন্তীর জীবনপরিণাম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। সামজিক পণপ্রথার বীভৎসতা, নিষ্ঠুর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-মানসিকতা, সমাজে নারীর মূল্যহীনতা, নারীত্বের পবিত্রতা ও মর্যাদাবোধ রক্ষায় নারীর যে অসম্ভব মূল্যপ্রদান—এর বিরুদ্ধে সামগ্রিক ভাবেই প্রতিবাদী মানসিকতাকে উচ্চকিত করে তুলতে চেয়েছেন লেখক |

'স্ত্রীর পত্র' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ নারীর সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সওয়াল করেছেন। একইসঙ্গে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এ গল্পে গ্রাম ও শহুরে মানসিকতার দ্বন্দ্বকে গল্পের অন্তর্লীন প্রবাহের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ মৃণালের বাচনিকতায় জানিয়েছেন— " যেদিন তোমাদের দূর সম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে দেখতে এলেন, তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলা শেয়াল ডাকে। স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ স্যাক্‌রা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পালকি করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি। তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রান্না—সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজ বউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট করে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন? বাংলা দেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না—তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।"[২৩৬]

মৃণালকে যে ২৮ নং মাখন বড়াল লেনের শহুরে পরিবার পুত্রবধূ হিসেবে নির্বাচন করেছিল, তার মূলে ছিল পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা—নারীর রূপই এখানে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় যেন, নারীর গুণ বা মর্যাদা বা সম্মান নয়। বড় বউয়ের রূপের ঘাটতি পুষিয়ে নিতে হবে ছোট বউকে দিয়ে—এই বিশেষ শহুরে মানসিকতা এর মধ্যে কাজ করেছে ঠিকই, কিন্তু পল্লীসংস্কারে লালিতা এক নারী শহুরে পরিবারে নিছক পটের বিবির মূল্যে কতটা নিজের আত্মস্ফূর্তি লাভ করবে সে ভাবনাকে কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় নি। গ্রাম ও শহুরে মানসিকতার সংঘাতের সম্ভাবনাকে তারা ভাবনার মধ্যেই আনেনি। কেননা নারীকে নিছক পণ্যের ঊর্ধ্বে মূল্য দেবার মানসিকতা এর মধ্যে কাজ করেনি। তার খোঁজটুকুও নেবার তারা কোন প্রয়োজন মনে করেনি। মৃণাল তাই অভিমান করে বলেছে—" আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের

মেজোবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।"[২৩৭]

বিন্দুর জীবনের নির্মম পরিণতি মৃণালকে গভীর আঘাত করেছে। বিন্দুর প্রতি সামান্য সহানুভূতি তো দূরের কথা, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তাকে মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরার ফ্যাশান হিসেবে চালাতে চেয়েছে। মৃণালের অমলিন পল্লীসংস্কার, মূল্যবোধের অবশেষ তার মধ্যেকার প্রসুপ্ত নারীত্বচেতনাকে জাগিয়ে তুলেছে। তাই মৃণাল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, পরিবার, স্বামীর তথাকথিত কাঠামোর বাইরে এসে নারীত্বের অপমানের প্রতিবাদ করতে চেয়েছে, আপন স্বাধীন সত্তার স্বতন্ত্র সার্থকতাকে বুঝে নিতে চেয়েছে— "কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে সতীসাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল; জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচবোধ হয় নি, সেই জন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয় নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেল কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন। তোমাদের এই-সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না।"[২৩৮]

তাই ২৮ নং মাখন বড়াল লেনের গলি ছেড়ে বেরিয়ে এসে পরিবার, সমাজ, স্বামীত্বের তথাগত নস্টালজিয়াকে দূরে সরিয়ে 'মেজ বউ'-এর তকমা ছেড়ে নিজস্ব মৃণাল পরিচয়ে মুক্তি লাভ করেছে সে। 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীও ঠিক এভাবেই তাকে বিবাহ করার প্রস্তাবকে দূরে সরিয়ে আপন নারীত্বের মর্যাদা, স্বাতন্ত্র্য ও শক্তিকে জানান দিতে পেরেছে। 'পয়লা নম্বর'-এর অনিলার মধ্যেও অনুরূপ মানসিকতার প্রতিস্থাপন লক্ষ্য করা যায়।

'নামঞ্জুর' গল্পে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন কংগ্রেসের অসহযোগ বা বয়কট আন্দোলনের দ্বারা দেশহিতের অন্তসারশূন্যতার দিকটিকে প্রকট করে তুলেছেন। এর মধ্য দিয়ে দেশ সেবার একটি পথনির্দেশ দেবার প্রয়াস নিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গের সময় বিদ্রোহীর ভূমিকা নেওয়া গল্পকথক জেল থেকে বেরিয়ে মাসির কাছে গিয়ে আশ্রয় পান। তাঁর ছিল বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির স্বচ্ছলতা। পাত্র হিসেবে তিনি যে কন্যার পিতার বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার প্রলোভনকে এড়াতে পারলেন সে কেবল 'স্বদেশসেবার সংকল্পের' কারণেই। গোপনে সে কাজ চললেও স্বদেশী সে কাজে একদিন কথক জড়িয়ে পড়লেন অপ্রত্যক্ষ অগোচর থেকে উঠে এসে—

" সেদিন পুজোর বাজারে ছিল খদ্দরের পিকেটিং। নিতান্ত কেবল দর্শকের মতন গিয়েছিলেম—আমার উৎসাহের তাপমাত্রা ৯৮ অঙ্কেরও নীচে ছিল, নাড়িতে বেশি বেগ ছিল না। সেদিন যে আমার কোনো আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে সে-খবর আমার কুষ্ঠির নক্ষত্র ছাড়া আর-সবার কাছে ছিল অগোচর। এমন সময় খদ্দর প্রচারকারিণী কোনো বাঙালি মহিলাকে পুলিশ-সার্জেন্ট দিলে ধাক্কা। মহূর্তের মধ্যেই আমার অহিংস অসহযোগের ভাবখানা প্রবল দুঃসহযোগে পরিণত হল। সুতরাং অনতিবিলম্বে থানায় হল আমার গতি। তার পরে যথানিয়মে হাজতের লালায়িত কবলের থেকে জেলখানার অন্ধকার জঠরদেশে অবতরণ করা গেল।"[২৩৯]

আবেগ বা উত্তেজনার দ্বারা চালিত এই আন্দোলনের পথ বেয়ে যে দেশের গঠনমূলক কোনো কাজ করা অসম্ভব সে কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন। এই বিশেষ মানসিকতার পরিচয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গল্পকথকের জেল থেকে ছাড়া পাবার পরবর্তী ভাবনার সূত্রে—"মেয়াদ পুরো হবার কিছু পূর্বেই ছুটি পাওয়া গেল। চারিদিকে খুব হাততালি। মনে হল যেন বাংলাদেশের হাওয়ায় বাজতে লাগল, 'এনকোর! এক্সেলেন্ট্!' মনটা খারাপ হল। ভাবলেম, যে ভুগল সেই কেবল ভুগল। আর, মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, রস পেলে দশে মিলে। সেও বেশিক্ষণ নয়; নাট্যমঞ্চের পর্দা পড়ে যায়, আলো নেভে, তার পরে ভোলবার পালা। কেবল বেড়ি-হাতকড়ার দাগ যার হাড়ে গিয়ে লেগেছে তারই চিরদিনের মনে থাকে।"[২৪০]

গল্পকথকের অবর্তমানে তার পিসির পালিতা মেয়ে অমিয়ার দেশাত্মবোধ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি প্রবল হয়ে ওঠে। অসযোগের প্রবল আবেগে আজ সে কলেজত্যাগিনী। ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে বক্তৃতা করে, তাতে তার হৃৎকম্প হয় না। অনাথাসদনের চাঁদার জন্যে অপরিচিত লোকের বাড়িতে গিয়েও সে ঝুলি ফিরিয়ে বেড়ায়। তার এই অধ্যাবসায়ের জন্য অনিল তাকে দেবী বলে ভক্তি করে থাকে। শুধু অনিল নয়, স্কুল ছেড়ে আসা অনেক উৎসাহী যুবক গল্পকথকের বাড়ির একতলায় জড়ো হয় চা এবং ইন্সপিরেশন গ্রহণ করার জন্য। তারা সকলেই অমিয়াকে 'যুগলক্ষ্মী' বলে সম্বোধন করে থাকে।

নিজেকে এই সম্বোধনের যথোপযোগী করে তোলার জন্য অমিয়ার কি প্রাণান্তকর প্রয়াস! তার নিজের খাওয়া-শোওয়ার মধ্যে সময় না-পাওয়াটা সমারোহ করেই ঘটে। তার এই ত্যাগস্বীকারের তালিকায় বিপ্লবী দাদাও পড়ে গেছেন। তার অসুস্থতা, অস্বাস্থ্য তার কাছে কেন, অসহযোগীদের কাছে আজ আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। অসহযোগ আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়ে একদা জেল খাটা গল্পকথক সমাজে এবং নিজের

পরিবারে কতটা অবাঞ্ছিত স্থান লাভ করেছেন একটি অনবদ্য উপমার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে তুলে ধরেছেন—

" হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেদিন কোথা থেকে একটা ন্যাঙলা কুকুর আমার বারান্দার কোণে আশ্রয় খুঁজছিল। গায়ের রোঁয়া উঠে গেছে, জীর্ণ চামড়ার তলায় কঙ্কালের আব্রু নেই— আধমরা তার অবস্থা। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেম। আজ ভাবছিলেম, এতটা বেশি ঝাঁঝের সঙ্গে তাকে তাড়ালেম কেন। বেগানা কুকুর বলে নয়, ওর সর্বাঙ্গে মরণদশা দেখা দিয়েছে বলে। প্রাণের সংগীতসভায় ওর অস্তিত্বটা বেসুরো, ওর রুগ্‌ণতা বেয়াদপি। ওর সঙ্গে নিজের তুলনা মনে এল। চারিদিকের চলমান প্রাণের ধারার মধ্যে আমার অস্বাস্থ্য একটা স্থাবর পদার্থ, স্রোতের বাধা।"[২৪১]

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন দেশের কাজে প্রকৃত সেবার জন্য যে দুঃখস্বীকার, যে ত্যাগসাধনা তা সমকালীন অসহযোগীদের মধ্যে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন সেদিনের অসহযোগ মঞ্চে যারা এসে যোগ দিয়েছিল তাদের অনেকেই আবেগতাড়িত নতুবা বিশেষ উদ্দেশ্যচালিত। দেশের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ, দুঃখস্বীকারে অকপট –এমন দেশপ্রেমী খুব কমই ছিল। এ গল্পে অমিয়া তাই গল্পকথকের পিসিমার শ্বশুরবাড়ির গ্রামসম্পর্কের মেয়ে হরিমতিকে নিজের অনাথাসদনের কাজে যুক্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে গল্পকথক তাই বলেছে—"...তুমি চলবে নিজের শখ-অনুসারে, আর আশ্রয়হীনারা চলবে তোমার হুকুম-অনুসারে। তুমি হবে অনাথাসদনের সেক্রেটারি, আর ওরা হবে অনাথাসদনের সেবাকারিণী। তার চেয়ে নিজেই লাগো সেবার কাজে; বুঝতে পারবে, সে কাজ তোমার অসাধ্য। অনাথাদের অতিষ্ঠ করা সহজ, সেবা করা সহজ নয়। দাবি নিজের উপরে করো, অন্যের উপরে করো না।"[২৪২]

এই গভীর ত্যাগ স্বীকার ছাড়া নিছক আবেগ চালিত হয়ে যে দেশের প্রকৃত কল্যাণ করা অসম্ভব তা রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন। পাশাপাশি দেখিয়েছেন, দেশের কল্যাণে যারা নিজেদের এভাবে যুক্ত করেছিলেন, তারা রাজনৈতিক দিক থেকে আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন না। যে অনিলরা নীচ বর্ণের মানুষ সম্পর্কে শ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকে, ভারতবর্ষের কল্যাণে আত্মনিবেদিত সেই অনিলদের দেশের এই নিম্নবর্ণের অধিকাংশ মানুষকে নিয়েই কাজ করতে হবে, তাঁদের পথে নিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার। তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা না থাকলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন অসম্ভব। অমিয়ার জন্মপরিচয় লাভের পর যে অনিল শুধুমাত্র হীনবর্ণের বলে অমিয়াকে বিবাহের নিজস্ব সিদ্ধান্ত থেকে সরে গেছে, সে নিজেই বা কীভাবে নিম্নবর্ণের মানুষকে শ্রদ্ধা করে তাদের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করব ! গল্পের সমাপ্তিতে অনিল ও অমিয়ার বিবাহপ্রস্তাব নামঞ্জুরের

দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে সেই আয়রণি৷ অনিলের বিবাহপ্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে গল্পকথক জানিয়েছেন—

" তখন অমিয়ার জন্মবৃত্তান্ত তাকে বলতে হল। সহজে বলতেম না; কিন্তু জানতেম, হীনবর্ণের 'পরে অনিল শ্রদ্ধাপূর্ণ করুণা প্রকাশ করে থাকে৷ আমি তাকে বললেম, " পূর্বপুরুষের কলঙ্ক জন্মের দ্বারাই স্খলিত হয়ে যায়, এ তো তোমরা অমিয়ার জীবনেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ। সে পদ্ম, তাতে পঙ্কের চিহ্ন নেই।"

নববঙ্গে ভাইফোঁটার সভা তার পরে আর জমল না। ফোঁটা রয়েছে তৈরি, কপাল মেরেছে দৌড়। আর শুনেছি, অনিল কলকাতা ছেড়ে কুমিল্লায় স্বরাজ প্রচারের কী-একটা কাজ নিয়েছে।

অমিয়া কলেজে ভর্তি হবার উদ্যোগে আছে। ইতিমধ্যে পিসিমা তীর্থ থেকে ফিরে আসার পর শুশ্রূষার সাত-পাক বেড়ি থেকে আমার পা দুটো খালাস পেয়েছে।"[২৪৩]

'সংস্কার' গল্পে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের খদ্দর আন্দোলনের দ্বারা বর্ণবৈষম্যকে মুছে দেবার প্রয়াসকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন। এর দ্বারা যে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়, তা তিনি চিঠিপত্রে স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন। তাতে করে কেবল কাপড় দিয়ে বর্ণ-বৈষম্য ঢাকা দেওয়ার মতো বাহ্যিক প্রক্রিয়ার উপর নয়, অন্তরের দিক থেকে তাকে সত্য করে তোলার উপর জোর দিয়েছিলেন। এ গল্পের কথক তাঁর স্ত্রী কলিকার আচরণের মধ্য দিয়েই খদ্দর আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতার দিকটিকে উদ্ঘাটিত করেছেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গল্পকথক গণ্ডগোলের আঁচ পেয়ে ভেবেছিলেন কোন গাঁটকাটার শাসন চলছে বুঝি। কিন্তু তিনি জানিয়েছেন—

" মোটরের শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে উত্তেজিত জনতার কেন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখি, আমাদের পাড়ার বুড়ো সরকারি মেথরটাকে বেদম মারছে৷ একটু আগেই রাস্তার কলতলায় স্নান সেরে সাফ কাপড় পরে ডান হাতে এক বালতি জল ও বগলে ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে সে যাচ্ছিল। গায়ে চেক-কাটা মেরজাই, আঁচড়ানো চুল ভিজে; বাঁ হাত ধরে সঙ্গে চলছিল আট-নয় বছরের এক নাতি। দুজনকেই দেখতে সুশ্রী, সুঠাম দেহ। সেই ভীড়ে কারও সঙ্গে বা কিছুর সঙ্গে তাদের ঠেকাঠেকি হয়ে থাকবে। তার থেকেই এই নিরন্তর মারের সৃষ্টি। নাতিটা কাঁদছে আর সকলকে অনুনয় করছে, "দাদাকে মেরো না।" বুড়োটা হাত জোড় করে বলছে, " দেখতে পাই নি, কসুর মাফ করো।" অহিংসাব্রত পুণ্যার্থীদের রাগ চড়ে উঠছে। বুড়োর ভীত চোখ দিয়ে জল পড়ছে, দাড়ি দিয়ে রক্ত।"[২৪৪]

গল্পকথক তাঁর গাড়িতে করে বুড়োটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার কথা বললেও খদ্দর আন্দোলনের অন্যতম সদস্যা স্ত্রী কলিকা দেবী তাতে চরম আপত্তি জানায়। তাঁর যুক্তি হাড়িডোম হলেও কথা ছিল, একজন মেথরকে তিনি কিছুতেই গাড়িতে তুলবেন না। গল্পকথক সে চেষ্টা করলে তিনি গাড়ি থেকে নেমে যাবেন। গল্পকথক কিন্তু একথাও জানিয়েছেন যে, "দেখছ-না, স্নান করে ধোপ-দেওয়া কাপড় পরেছে? এদের অনেকের চেয়েও পরিষ্কার।" কিন্তু মেথর বলেই কলিকা বৃদ্ধটিকে কিছুতেই উদ্ধার করতে দেননি। সংস্কারকে এভাবেই আমাদের দেশের মানুষ বাইরের সামগ্রী করে তুলে দেশের যে মহা সর্বনাশ করে চলেছে তার থেকে মুক্তির কথা রবীন্দ্রনাথ আমাদের বার বার বলেছেন। আত্মসংস্কার বা আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথের যে সওয়াল তার পিছনে ক্রিয়াশীল থেকেছে অনুরূপ যুক্তিপ্রবণতা।

'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'শেষকথা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেশোন্নয়নের অন্যতম পন্থা হিসেবে রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের ক্ষেত্রে সহিংস বিপ্লবী আন্দোলনের নিরর্থকতার দিকটিকে উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। পাশাপাশি যে পথে প্রকৃত অর্থে দেশের উন্নয়ন আসবে সে দিকের নির্দেশ দিয়েছেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই। নবীনমাধবের বাচনিকতায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

" আমি বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাকর্ষশক্তি আন্দামানতীরের খুব কাছাকাছি টান মেরেছিল। নানা বাঁকা পথে সি. আই. ডি.-র ফাঁস এড়িয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলুম আফগানিস্তান পর্যন্ত। অবশেষে পৌঁচেছি আমেরিকার খালাসির কাজ নিয়ে। পূর্ববঙ্গীয় জেদ ছিল মজ্জায়, একদিনও ভুলি নি যে, ভারতবর্ষের হাতপায়ের শিকলে উখো ঘষতে হবে দিনরাত যতদিন বেঁচে থাকি। কিন্তু বিদেশে কিছুদিন থাকতেই একটা কথা নিশ্চিত বুঝেছিলুম, আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুরু করেছিলুম, সে যেন আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো, তাতে নিজের পোড়াকপাল পুড়িয়েছি অনেকবার, দাগ পড়েনি ব্রিটিশ রাজতক্তে। আগুনের উপর পতঙ্গের অন্ধ আসক্তি। যখন সদর্পে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলুম তখন বুঝতে পারি নি, সেটাতে ইতিহাসের যজ্ঞানল জ্বালানো হচ্ছে না, জ্বালাচ্ছি নিজেদের খুব ছোটো ছোটো চিতানল। ......তখন ঠিক করলুম, ন্যাশনাল দুর্গের গোড়া পাকা করতে হবে।"[২৪৫]

ন্যাশন্যাল দুর্গের ভিত পাকা করার জন্য নবীনমাধব দেশকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠার পথই অনুসন্ধান করতে চেয়েছে। বুঝেছে—" অধীর হয়ে ফল নেই, গোড়া থেকেই কাজ শুরু করতে হবে—পথ দীর্ঘ, সাধনা কঠিন।" প্রাথমিক ভাবে যন্ত্রবিদ্যায় দীক্ষা নিয়ে যন্ত্র দিয়ে যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার কথা ভেবেছে। কিন্তু অচিরেই বুঝেছে যন্ত্রবিদ্যার খুব গোড়ায় যাওয়া চাই, যন্ত্রের মালমসলা-সংগ্রহ শিখতে হবে। তাই সে খনিজবিদ্যা শিখে

ভারতবর্ষের অন্তর্ভাণ্ডারের সম্পদ উদ্ঘাটনের দ্বারা দেশকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে আবেগ ও ভক্তির চোরাবালিকে পাশ কাটিয়ে দেশের প্রকৃত উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছে—

" ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়। সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাথরের প্রাচীরে। মায়ের আঁচলধরা বুড়ো খোঁকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধ্বনিতে মন্তর পড়বো না, আর দেশের দরিদ্রকে অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্র বলেই মানবো, 'দরিদ্রনারায়ণ' বুলি দিয়ে তার নামে মন্তর বানাব না। প্রথম বয়সে এরকম বচনের পুতুলগড়া খেলা অনেক খেলেছি—কবিদের কুমোরবাড়িতে স্বদেশের যে রাংতা-লাগানো প্রতিমা গড়া হয়, তারই সামনে বসে বসে অনেক চোখের জল ফেলেছি। কিন্তু আর নয়, এই জাগ্রত বুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি। এবার গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই বিজ্ঞানী বাঙাল কোদাল নিয়ে কুড়ুল নিয়ে হাতুড়ি নিয়ে দেশের গুপ্তধনের তল্লাসে, এই কাজটাকে কবির গদ্‌গদকণ্ঠের চেলারা দেশমাতৃকার পূজা বলে চিনতেই পারবে না।"[২৪৬] ছোটনাগপুরের অরণ্যপ্রদেশের আবিল হাওয়া নবীনমাধবকে সাময়িক কালের জন্য তার কর্তব্যকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেও অবশেষে আবার সে তার পূর্বোক্ত সাধনার ক্ষেত্রে ফিরে এসেছে এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী বা দেশ গঠনের কাজে নারী শক্তির যে যোগ চেয়েছিলেন, স্ত্রী স্বাধীনতার যে আয়োজন রেখেছিলেন, তারই প্রতিফলন আছে 'বদনাম' গল্পে। 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে স্ত্রী স্বাধীনতা প্রসঙ্গে শ্রীমতী রানী চন্দের সঙ্গে আলাপচারিতায় গল্পটির উৎস ও রচনা সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে—" সমস্যাটা হচ্ছে অর্থনৈতিক; তোমাদের উপার্জন করতে দেওয়া হয়নি। পুরুষরা নিয়েছে সেই ভার। তারা উপার্জন করে আনবে। তোমরা থাকবে পরম নিশ্চিন্তে, ঘরকন্না করবে, গোবর ছিঁটোবে, ইতুপূজো করবে; মূঢ়তার চূড়ান্ত করে সংসারে তলিয়ে যাবে। মনে যাই থাক্, বাইরের এই যে বাধ্যবাধকতা— এই তোমাদের বাধা হয়ে থাকে। অথচ ঠিক সময়ে লুচি ভেজে আনছো—কোন্ লুচি যে ভাজছো সে খবর কেউ জানে না; জানবার প্রয়োজনও মনে করে না। প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু পারবেন কেন। তারপরে আমি যখনই সুবিধে পেয়েছি—বলেছি। এবারেও সুবিধে পেলুম, ছাড়বো কেন, 'সদু'র মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।"[২৪৭]

এ গল্পের সৌদামিনী পুলিশ ইন্সপেক্টর বিজয়বাবুর স্ত্রী হয়েও বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পুলিশকে কাজে লাগিয়ে সেদিন আমাদের দেশের বিপ্লবীকে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল ইংরেজ প্রশাসন। ব্যাপক ধরপাকড়ের মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন। তারই ছায়াপাত আছে এ গল্পে। পুলিশকে ফাঁকি

দিয়ে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন বিপ্লবী নেতা অনিল মিত্র। তাঁর কর্মসঙ্গিনী হিসেবে যোগ দেয় সৌদামিনী। স্বামী বিজয়বাবুকে তাই তিনি স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন–" দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরে আর যাঁরা মানুষের মতো মানুষ তাঁদের হাতে হাতকড়ি পড়ছে, আমরা রেঁধে বেড়ে বাসন মেজে করছি সতীসাধ্বীগিরি! আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা-কিছু করতে পারি তা হলে আমাদের রক্ষা, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম। আমাদের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দেখো তো দেখবে –হয়তো আছে কোথাও কিছু কলঙ্কের চিহ্ন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আছে জ্বলন্ত আগুনের দাগা। নিছক আরামের খেলার দাগ নয়। মেরেছি, কিন্তু মরেছি তার অনেক আগে। সংসারে মেয়েরা দুঃখের কারবার করতেই এসেছে। সেই দুঃখ কেবল আমি ঘরকন্নার কাজে ফুঁকে দিতে পারব না। আমি চাই সেই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আঁস্তাকুড়। লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী, বলবে দজ্জাল মেয়ে।"[২৪৮]

নারীর এই যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী রূপ, তার নিহিত শক্তির এই যে উপলব্ধি, দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার এই যে ত্যাগ সাধনা, নারীত্বের স্বতন্ত্র সার্থকতার এই যে অনুসন্ধান তা রবীন্দ্রনাথের কাছেও কাম্য ছিল। স্বামীর প্রতি সংসারের প্রতি ভালোবাসা ও কর্তব্যে কোনপ্রকার ফাঁক না রেখেই যে তারা দেশের কাজে নিজেদের প্রবল শক্তিসঞ্চার করতে পারে সে কথাকেই রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে ব্যক্ত করেছেন। নারী-পুরুষের সাধনার এই স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের স্বীকৃতির কথা 'তিনসঙ্গী' রচনার সময় থেকেই বলে আসছিলেন। ব্যক্তিহত্যা, সন্ত্রাসবাদ, জাতিবৈরিতাকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন না করলেও এ গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমিকদের আত্মদানের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার স্বাক্ষরটুকুকে রেখে গেছেন।

'লিপিকা' গ্রন্থের বেশ কয়েকটি কথিকায় রবীন্দ্রনাথের দেশোন্নয়ন ভাবনার প্রকাশ আছে। 'বিদূষক' কথিকাটি তারই অন্যতম দৃষ্টান্ত। যে কোন দেশের স্বাস্থ্যকর অবস্থার দিকনির্দেশক হল সে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক মত প্রকাশের অধিকার। কিন্তু রাষ্ট্রতান্ত্রিক সন্ত্রাস ও পীড়ন যখন সেই মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চায় বলপ্রয়োগের দ্বারা তখন নেমে আসে সন্ত্রাসের শাসন। এ জাতীয় শাসন দেশের তথা জাতির সার্বিক উন্নতির অন্তরায়। 'বিদূষক' গল্পে কাঞ্চীর রাজার যে জয় সে আসলে শক্তির আর দম্ভের জয়। তার মধ্যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। তাই জয়ের আনন্দে অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে বলেশ্বরীর মন্দির রক্তে ভাসিয়ে দিতে তাঁর মনে কোন দ্বিধা জাগেনি। ছেলেদের 'যুদ্ধ-যুদ্ধ' খেলায় কাঞ্চীর রাজার যে হারের গূঢ়ার্থ ব্যক্ত হয়েছে সে আসলে মানবতা বা মনুষ্যত্বের সাধনা কিংবা সুশাসন বা শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার হারের দিকটি। কেননা একজন রাজর্ষির শ্রেষ্ঠ গুণ বা উদ্দেশ্য তাই হওয়া উচিত। গল্পের শেষে বিদূষকের

ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী উচ্চারণ রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ—"বিদূষক বললে, " আমি মারতেও পারি নে, কাটতেও পারি নে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভুলে যাব।"[২৪৯]

দেশোন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক শোষণ, সঙ্কীর্ণতা, প্রগতিবিরোধী অন্ধসংস্কার কীভাবে প্রতিবন্ধকতার পাহাড় হয়ে উঠতে পারে তার স্বাক্ষর রেখেছেন 'লিপিকা'র 'কর্তার ভূত' গল্পে। এ গল্পে বুড়োকর্তার ভূত আসলে আমাদের মধ্যেকার কুসংস্কারের ভূত। এই কুসংস্কার আমাদের দেশের মানুষকে আবহমান কাল ধরে নানা অন্ধ রীতি-আচার-বিশ্বাসের নিগড়ে বেঁধে মানুষের সব শক্তিকে নিঃশেষ করে দিতে বসেছে। তাই ভূতের দেশের 'জেলখানায় যে ঘানি নিরন্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে এক ছটাক তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে, বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মানুষের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।"[২৫০]

কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের জড়তা আমাদেরকে ক্রমে জগতের বহমান স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কেননা—

" যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে

সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে

যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়

পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।"[২৫১]

কিন্তু ইতিহাসের স্রোত থেমে থাকে না। এই জীর্ণ জাতি দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে অপেক্ষাকৃত শক্তিবান জাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়। কেননা পৃথিবীতে যোগ্যতমেরই উদ্‌বর্তন ঘটে। শক্তিহীন ও জীর্ণ জাতিকে বহুমূল্যে এর ঋণ চোকাতে হয়। তাই এ গল্পেও দেখা যায়—

" ...খিড়কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভূতের পেয়াদা; ঘরে গেরস্তর টেঁকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। এক দিক থেকে এ হাঁকে, "খাজনা দাও।" আর-এক দিক থেকে ও হাঁকে, "খাজনা দাও।"

এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে ' খাজনা দেব কিসে'।"[২৫২]

একদিকে জীর্ণতাকে আকড়ে ধরার কারণে মূল্য চোকানোর দায়বদ্ধতা, অন্যদিকে সদর দরজায় বিশ্বের প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার যে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে তার নবীনতাকে স্বীকার করার তাগিদ ভূতের দেশের মানুষকে ধন্ধে ফেলে দেয়। একদিকে

রাষ্ট্রনৈতিক শাসন ও শোষণ আর একদিকে বিশ্বায়নের অপ্রতিরোধ্য স্রোত—এর মাঝে পড়ে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। ভূতের দেশের শিরোমণি-চূড়ামণিদের প্রতি শতাব্দীলালিত বিশ্বাসের বাঁধ কিছুতেই ভাঙতে চায় না। সচেতন জীবনবোধ তাদের নাড়া দেয় না। তাই দেশের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চতুর্দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী বিলাসী বুলবুলির দল এদেশ লুণ্ঠন করেছে। বর্গীর আক্রমণে দেশ ছিন্নভিন্ন হয়েছে। মানুষকে তার মূল্য চোকাতে হয়েছে আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে। সমস্যার সমাধানে অপারগ ভূতের দেশের মাসিপিসি ধর্মের আফিম খাইয়ে তার উপরে বিশ্বাস রাখার পরামর্শে সমস্যাকে পাশ কাটাতে চেয়েছে। বুলবুলির ঝাঁক বা বর্গির দলকে কৃষ্ণনাম শোনানোর রূপকের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ এই বিশেষ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন।

কিন্তু অন্ধ হলে তো আর প্রলয় বন্ধ থাকে না। বিশ্বের পরিবর্তমানতার স্রোত এসে যখন আছড়ে পড়ে তখন আর তাকে সামাল দেওয়া যায় না। প্রগতিকে রুখে দিয়ে কেউ যদি ভাবে মান্ধাতার আমলের লাঠি দিয়ে আধুনিকতম বন্দুকের সঙ্গে মোকাবিলা করবো, তা আত্মনাশেরই নামান্তর বলে ধরে নিতে হবে। এমন জাতের বিনাশ যে অবধারিত তা 'কর্তার ভূত' গল্পটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাই কুসংস্কারের ভূত ঘাড় থেকে নামিয়ে বিশ্বচেতনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রগতিচেতনাকে দেশে পরিবাহিত করতে না পারলে বিশ্বায়নের স্রোত থেকে যে কোন দেশ ও জাতি যে আত্মরক্ষা করতে পারবে না—এই সাবধান বাণীটিকে ভারবর্ষীয়দের মত অন্ধ সংস্কার আর বিশ্বাসের কূপমন্ডূকতায় ডুবে থাকা জাতিকে শুনিয়েছেন রূপকের মধ্যস্থতায়।

'তোতাকাহিনী' গল্পটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির পরিপ্রেক্ষিতে একটি পথনির্দেশ দেবার প্রয়াস নিয়েছেন। আমাদের দেশের আমলাতান্ত্রিক পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির দিকটিকে তুলে ধরেছেন। এই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা অপেক্ষা শিক্ষার ব্যয় ও আড়ম্বরটাই ছিল অধিক। ফলে শিক্ষার্থীর উন্নতি অপেক্ষা মধ্যবর্তী সুযোগসন্ধানী ব্যক্তিরাই তার দ্বারা বেশি উপকৃত হয়ে চলেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের খবরদারিটাই আজকের দিনেও প্রধান হয়ে উঠেছে। রূপকের মধ্যস্থতায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

" অনেক দামের খাঁচাটার জন্যে ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, "উন্নতি হইতেছে।"

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরো বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠাবালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।"[২৫৩]

দেশের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অযোগ্য ব্যক্তিদের সরানো না গেলে শিক্ষাব্যবস্থার হাল কী হতে পারে তার একটি ব্যাঙ্গাত্বক ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিতদের এবং পুঁথিলেখকদিগের মধ্যস্থতায়। তাছাড়া দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আনন্দের আয়োজন অপেক্ষা শিক্ষার নিয়ম বা কায়দাটাকে এত বেশি করে বড় করে তোলা হয়েছে যে তাতে শিক্ষার্থীদের চাপা পড়ার উপক্রম হয়েছে। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অনাড়ম্বর প্রাচীনভারতীয় শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন—যাতে প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, তার মাঝে বসেই প্রকৃতির উদার পরিমণ্ডলে শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। গল্পে তারই রূপকধর্মী বর্ণনা আছে—" তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝট্‌পট্‌ করে। এমন-কি, এক-একদিন দেখা যায় সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।"[২৫৪]

মুখস্থ সর্বস্ব কৃত্রিম পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষার তুলনায় রবীন্দ্রনাথ হাতে কলমে কাজের দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় আগ্রহ ও আনন্দের আয়োজন রাখতে চেয়েছিলেন। আনন্দের এবং আগ্রহের স্পর্শবঞ্চিত আমলাতান্ত্রিক পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষা কীভাবে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের প্রাণের সব রসকে নিংড়ে নিয়ে তাদের আত্মিক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে তার রূপকায়িত বর্ণনা আছে এ গল্পের আধারে—

"...পণ্ডিতকে বলিলেন (রাজা), " পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।"

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়।"[২৫৫]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি চেতনার স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। চেতনাকে সর্বপ্রকার আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত রাখতে না পারলে বিশ্বের পরিবর্তমানতার স্রোত বা নতুন কালের দাবি বা স্পন্দনকে ঠিক অনুভব করা যায় না। এই বিশেষ দিকের রূপকাশ্রিত প্রকাশ আছে 'নতুন পুতুল' গল্পের নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনায়। কালের সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তিত করতে না পারার জন্য যেখানে

সুভদ্রার পিতার পুতুল কেউ কিনছিল না কিষণলাল শুধুমাত্র তার একটুখানি সাজ ফিরিয়ে দিয়েই তাকে আবার একালের মানুষের চাহিদার সঙ্গে যথোপযোগী করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীতে যে জাত-পাত-অস্পৃশ্যতাবিরোধী মানসিকতার প্রবর্তন চেয়েছিলেন 'মুসলমানীর গল্প'-এর মধ্যে তার প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ গল্পে হবির খাঁ হিন্দুরমণী কমলাকে ডাকাতের হাত থেকে শুধু রক্ষাই করেনি, জানিয়েছে—'যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে'। হবির খাঁ তার দেওয়া কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। কমলাকে নিজের ঘরে স্থান দিয়ে তাঁর ধর্মরক্ষার যাবতীয় বন্দোবস্ত করেছে। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজের অন্ধ রক্ষণশীলতার দিকটিকে ফুটিয়ে তুলে তার অমানবিকতা ও নিরর্থকতার দিকটিকে চিনিয়ে দিয়েছেন। ডাকাতের দ্বারা অপহৃত হলেও, নিজের কোন অপরাধ না থাকলেও নিছক বেজাতের ঘর থেকে ঘুরে আসার জন্য সমাজ কমলাকে ঠাঁই দেয়নি। তাই সে সমাজ, ধর্মকে কমলা ঘৃণাভরে ত্যাগ করেছে। রবীন্দ্রনাথ যে মানুষের ধর্মের কথা বহুমুখে বলেছেন, তাই-ই তার কাছে জীবনের শিরোধার্য বলে বিবেচিত হয়েছে। হবির খাঁ-কে তাই সে স্পষ্টতই জানিয়েছে—

"...... বাবা, আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, অবজ্ঞার আস্তাকুঁড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি তো দেবতার প্রসন্নতা কোনোদিন দেখতে পেলুম না। সেখানকার দেবতা আমাকে প্রতিদিন অপমানিত করেছে সে কথা আজও আমি ভুলতে পারি নে। আমি প্রথম ভালোবাসা পেলুম, বাপজান, তোমার ঘরে। জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনের মূল্য আছে। যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পুজো করি, তিনিই আমার দেবতা—তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন।"[২৫৬] এই ধর্মবোধই কিন্তু কমলাকে প্রেরণা দিয়েছিল তার নিজের কাকার বোনকে ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার করে হিন্দুর সঙ্কীর্ণ ধর্মভাবনাকে নাড়িয়ে দেওয়া। জ্যোতির্ময় ঘোষ তাই এ গল্পটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— "কবিতা ও প্রবন্ধ তথা সমগ্র সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রদায়িক ধর্মের ঊর্ধ্বশায়ী এক উদার বলেই নয়, ধর্মপ্রসঙ্গে গতিশীল, অগ্রসর পদক্ষেপের বিচারেও অবিস্মরণীয়। জীবনপ্রান্তে উপনীত রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রকার ধর্মীয় সংস্কার মুক্তির পথে অগ্রগতি আমাদের কাছে একটি নতুন অধ্যায়ের উন্মোচন রূপেও প্রতিভাত হয়।"[২৫৭]

রবীন্দ্রনাথের 'সে' তাঁর শেষ বয়সের ছোটগল্পের ধারায় কিছু স্বতন্ত্র গোছের রচনা। গ্রন্থের ষোলটি গল্পের মধ্যে বেশকয়েকটিতেই রবীন্দ্রনাথের পল্লী তথা দেশোন্নয়ন ভাবনার নানা অভিক্ষেপ ছড়িয়ে আছে। ব্যঙ্গের তীর্যকতায়, বুদ্ধির ধারে রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থের

গল্পগুলিতে সমালোচক বা পথনির্দেশকের ভূমিকা নিয়েছেন। এ গল্পের শুরুর কাহিনীটিতে 'সে'-এর স্বভাব চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। এই 'সে' কে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। ফলে গল্পে 'সে' নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে—'যে একটা মানুষ অথবা বহুমানুষের একটি মিশ্র রূপ'।[২৫৮] তাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ সমাজসমালোচনার বহুমাত্রিক অবকাশ খুঁজে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই 'সে'র বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন— " পুপুদিদিমণিকে ধারা বেয়ে যে গল্প বলে যাচ্ছি সেই গল্পের মূল অবলম্বন হচ্ছে একটি সর্বনামধারী, সে কেবলমাত্র বাক্য দিয়ে তৈরি। সেইজন্য একে নিয়ে যা-তা করা সম্ভব, কোনোখানে এসে কোনো প্রশ্নের হোঁচোট খাবার আশঙ্ক নেই। কিন্তু অনাসৃষ্টির চাক্ষুষ প্রমাণ দেবার জন্যে একজন শরীরধারী জোগাড় করতে হয়েছে। সাহিত্যের মামলায় কেস্‌টা যখনই বড়ো বেশি বেসামাল হয়ে পড়ে তখনই এ লোকটা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। কিছুই বাধে না।"[২৫৯]

আর সে কারণেই কথক রবীন্দ্রনাথ জানান—" আমার মতো মোক্তারের ইশারা পেলেই সে অম্লান মুখে বলতে পারে যে, কাঁচড়াপাড়ার কুম্ভমেলায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে কুমীরে ধরেছিল তার টিকির ডগা। সেটা গেল তলিয়ে, বোটা-ছেড়া মানবদেহের বাকি অংশটুকু উঠে এসেছে ডাঙায়; আরো একটু চোখ টিপে দিলে সে নির্লজ্জ হয়ে বলতে পারে, মানোয়ারী জাহাজের ডুবুরি গোরা সাত মাস পাঁক ঘেঁটে গোটা পাঁচ-ছয় চুল ছাড়া বাকি টিকিটা উদ্ধার করে এনেছে, বকশিস পেয়েছে এককালীন সোয়া তিন টাকা। পুপুদিদি তবু যদি বলে 'তার পরে' তা হলে তখনই শুরু করবে, নীলরতন ডাক্তারের পায়ে ধরে বললে, দোহাই ডাক্তারবাবু , ওষুধ দিয়ে টিকিটা জোড়া লাগিয়ে দাও, নইলে তেলোর কাছে প্রসাদী ফুল বাঁধতে পারছি না। তিনি সন্ন্যাসীদত্ত বজ্রজটী মলম লাগিয়ে দিতেই টিকিটা একেবারে মরিয়া হয়ে বেড়ে চলেছে, অফুরান একটা কেঁচোর মতো। পাগড়ি পরলে পাগড়িটা বেলুনের মতো ফেঁপে উঠতে থাকে, মাথার বালিষটা উপরে চুড়ো তৈরি হতে থাকে দৈত্যপুরীর ব্যাঙের ছাতার মতো। বাঁধা মাইনে দিয়ে নাপিত রাখতে হল। প্রহরে প্রহরে তাকে দিয়ে ব্রহ্মতালু চাঁচিয়ে নিতে হচ্ছে।"[২৬০]

'সে'র স্বভাবচরিত্র বর্ণনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আসলে আমাদের দেশের হিন্দু ধর্মের ক্রমবর্ধমান রক্ষণশীলতা ও আচারসর্বস্বতাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন। এই রক্ষণশীল ধর্মাচরণ সেদিন এদেশের সমাজজীবনে জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার যে বিপুল বেড়াজাল রচনা করেছিল তার কম মূল্য দিতে হয়নি এদেশের মানুষকে। এই পথে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের শক্তির কি অপচয় ঘটছে, কি অসম্ভব মূল্য চোকাতে হচ্ছে এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কর্তার ভূতে'র মতো একাধিক গল্পেই ব্যক্ত করেছেন। এ গল্পেও রবীন্দ্রনাথ সেই অনাবশ্যক মূল্যপ্রদানের অসারতাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন 'সে'-এর বজ্রজটী মলম

লাগাবার পরবর্তী অবস্থার বর্ণনার মধ্য দিয়ে। আচারসর্বস্ব ধর্মাচরণ সেখানে 'সে'-এর দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক বহমানতাকে নষ্ট করে দিয়ে বাধার সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশ বা পল্লীসংগঠন কর্মসূচীতে এই ধর্মীয় তথা জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার বেড়াজাল বা বোঝাকে সমূলে উৎপাটিত করতে চেয়েছিলেন।

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্পে বর্ণিত হয়েছে হুঁহাউ দ্বীপের গবেষণার ইতিহাস। এ গল্পটিও অদ্ভুত রূপকধর্মী। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের উন্নয়নে মহাত্মাগান্ধীর মতো যন্ত্রকে বা পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনার ঋণগ্রহণকে কখনোই অস্পৃশ্য বলে মনে করেননি। কিন্তু একথাও ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশ বা যন্ত্রসভ্যতার সমৃদ্ধির স্বার্থে প্রাণহীন জীবনযান্ত্রিকতার অনুবর্তন চাননি। যন্ত্রকে বা বিজ্ঞানকে রবীন্দ্রনাথ যে মানবকল্যাণের অনুকূলে ব্যবহার করার স্বপক্ষে সর্বদা মত দিয়ে এসেছেন, একথা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতেই আলোচিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ সারা পৃথিবীতে যে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজা উড়িয়েছিল, মানুষের লোভ আর আদিম প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারকে স্পষ্ট করে তুলেছিল তা রবীন্দ্রনাথ নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ সেদিন মানুষকে যেন ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সভ্যতার আদিম প্রহরে, প্রগতির বিপরীত মেরুতে।

এ গল্পেও হুঁহাউ দ্বীপের বৈজ্ঞানিকেরা যে কঠিন পরীক্ষা বা গবেষণায় মেতেছেন তা 'চাষবাস'-এর মতো জীবনের কোনো গঠনমূলক বিষয়ে নয়। 'সে'এর সঙ্গে গল্পকথকের নিম্নোক্ত আলোচনা সে বিষয়ের স্পষ্ট আভাস দেয়—

" একটুখানি বুঝিয়ে বলো -কী করছেন তাঁরা। হাল নিয়মে চাষবাস করছেন?

একেবারে উলটো, চাষের সম্পর্ক নেই।

আহারের কী ব্যবস্থা।

একেবারেই বন্ধ।

প্রাণটা?

সেই চিন্তাটাই সব চেয়ে তুচ্ছ। পাকযন্ত্রের বিরুদ্ধে ওঁদের সত্যাগ্রহ। বলছেন, ঐ জঠরযন্ত্রটার মতো প্যাঁচাও জিনিস আর নেই। যত রোগ, যত যুদ্ধবিগ্রহ, যত চুরি-ডাকাতির মূল কারণ তার নাড়ীতে নাড়ীতে।

দাদা, কথাটা সত্য হলেও হজম করা শক্ত।

তোমার পক্ষে শক্ত। কিন্তু, ওরা হলেন বৈজ্ঞানিক। পাকযন্ত্রটা উপড়ে ফেলেছেন, পেট গেছে চুপসে, আহার বন্ধ, নস্য নিচ্ছেন কেবল। নাক দিয়ে পোষ্টাই নিচ্ছেন হাওয়ায় শুষে। কিছু পৌঁচচ্ছে ভিতরে, কিছু হাঁচতে হাঁচতে বেরিয়ে যাচ্ছে। দুই কাজ একসঙ্গে চলছে, দেহটা সাফও হচ্ছে, ভর্তিও হচ্ছে। ......"[২৬১]

এই গবেষণায় প্রাণের দাবি উপেক্ষিত। পাকযন্ত্রের মতো প্রকৃতিদত্ত যন্ত্রকে বা সিস্টেমটাকেই উপেক্ষা করে প্রাণের আনন্দ বর্জিত নিছক যান্ত্রিকতার উপর জীবনের নির্ভরতা এক অর্থে আত্মিক মৃত্যুর নামান্তর। বিজ্ঞানকে এ ভূমিকায় দেখতে চাননি রবীন্দ্রনাথ। এই পথে বিজ্ঞান পরিচালিত হলে তা যে একদিন পৃথিবীর প্রাণের অস্তিত্বকে লোপাট করে তাকে মহাশ্মশানে পরিণত করবে এমন আশঙ্কা রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধ-কবিতার আধারেই প্রকাশ পেয়েছে। এ গল্পেও রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে রূপকের আড়ালে তেমন কথাই বলতে চেয়েছেন—"পাকযন্ত্র, কসাইখানা, দুটোই সংসার থেকে লোপ করা চাই। পেটের দায়, বিল-চোকানোর ল্যাঠা একসঙ্গে মেটাবেন। চিরকালের মতো জগতে শান্তিস্থাপনার উপায় চিন্তা করছেন।"[২৬২]

প্রাণকে তার সহজ স্বাভাবিকতা ও স্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত করে, আনন্দের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে যে নীরস যান্ত্রিকতার আধারে পুরে দিচ্ছে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বা যন্ত্রবাদীরা, এবং তার ফলে জীবনের যে অপহ্নব সূচিত হচ্ছে তা জীবনবিরোধী। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ এর পূর্বে 'মুক্তধারা' কিংবা 'রক্তকরবী' নাটকেও কতকটা অনুরূপ ভাবনারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ গল্পেও রূপকের আধারে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"...জীবলোকে উদ্ভিদের সবুজ অংশটাই প্রাণের গোড়াকার পদার্থ, সেটা তো জান? ......

দ্বৈপায়ন পন্ডিতের দল ঘাসের থেকে সবুজ সার বের করে নিয়ে সূর্যের বেগ্‌নি-পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠুসছেন। সকালবেলায় ডান নাকে; মধ্যাহ্নে বাঁ নাকে; সায়াহ্নে দুই নাকে একসঙ্গে, সেইটাই বড়ো ভোজ। ওঁদের সমবেত হাঁচির শব্দে চমকে উঠে পশুপক্ষীরা সাঁতরিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেছে।"[২৬৩]

জীবনের এই যান্ত্রিকতা যে বিকৃতি বা অপহ্নব আনে তাই-ই 'হাঁচি'র রূপকে গল্পে বিধৃত। এই বিকৃতিই বিশ শতকের তিন ও চারের দশকে নাৎসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। মানুষকে পৌঁছে দিয়েছিল আদিম সভ্যতার কোন এক লগ্নে। প্রাণের আনন্দ বর্জিত জীবনযান্ত্রিকতার যে গবেষণায় হুঁহাউ দ্বীপের বৈজ্ঞানিকেরা মেতেছেন, তাঁদের বক্তব্যেও আছে পৃথিবীর সেই আদিম সভ্যতার মাঝে নিয়ে যাবার ঐকান্তিক প্রয়াস—"ওঁরা বলছেন, প্রকৃতির মূল মতলবটা শিশুদের কাছ থেকে শিখে

নিতে হবে। সেই দ্বীপের সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ে শিলালিপিতে অধ্যাপক খুদে রেখেছেন— সবাই মিলে হামাগুড়ি দাও, ফিরে এসো চতুষ্পদী চালে, যদি দীর্ঘকাল ধরণীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে চাও।”[২৬৪]

তিন ও চারের দশকে সারা বিশ্ব জুড়ে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশক্তিতে বলিয়ান পাশ্চাত্যের যে দেশগুলি সারা বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদের বিষবাষ্পকে জাগিয়ে তুলেছিল, ‘শান্তির ললিত বাণী’ ডুবে গিয়ে আদিম পাশবিকতার স্বতন্ত্র ভাষা-ভঙ্গি জেগে উঠেছিল তার ইঙ্গিত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে—যা ‘পত্রপুট’ কাব্যের ‘আফ্রিকা’র মতো একাধিক কবিতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন। এ গল্পেও রবীন্দ্রনাথ হুঁহাউ দ্বীপের বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা উদ্ভাবিত মানবতা ও শান্তির পরিপন্থী আদিম যুগের সেই ভাষাভঙ্গীর ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাঁদের সেই উগ্রজাতীয়তাবাদী সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধেও ইঙ্গিত দিতে ভোলেননি। লিখেছেন—“অত্যাশ্চর্য ইশারার ভাষা উদ্‌ভাবিত। —কখনো ঢেঁকি কোটার ভঙ্গিতে, কখনো হাতপাখা-চালানোর চালে, কখনো ঝোড়ো সুপুরিগাছের নকলে ডাইনে বাঁয়ে উপরে নীচে ঘাড় দুলিয়ে বাঁকিয়ে নাড়িয়ে কাঁপিয়ে হেলিয়ে ঝাঁকিয়ে। এমন-কি, সেই ভাষার সঙ্গে ভুরু-বাঁকানি চোখ-টেপানি যোগ করে ওঁদের কবিতার কাজ চলে। দেখা গেছে, তাতে দর্শকের চোখে জল আসে, নস্যির জায়গাটা বন্ধ হয়ে পড়ে।”[২৬৫]

এই যে প্রাণের আরাম-বর্জিত বুদ্ধিসর্বস্ব যন্ত্রবাদ বা সভ্যতার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি তার বিরোধিতা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শান্তিনিকেতনের জ্ঞানচর্চা বা পল্লীসংগঠনে মানবকল্যাণের অনুকূলে যন্ত্রকে ব্যবহারের যে প্রয়াস তার মূলেও এই বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অনুভব সক্রিয় ছিল। এ গল্পের শেষে ‘সে’ তাই চাণক্য পণ্ডিতের থেকে সরে এসে নয়া-চাণক্যের নীতি বর্ণনা করে বলেছেন—“ নয়া-চাণক্য জগতের হিতের জন্যে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটাও তোমার জানা দরকার দাদা, ছন্দ মিলিয়েই লেখা: তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি যখন পণ্ডিত চুপায়তে।—আমার শেষ পরামর্শ এই, বৈজ্ঞানিক রসিকতা ছেড়ে দিয়ে ছেলেমানুষি করো যতটা পার।”[২৬৬] এই ছেলেমানুষির মধ্যেই আছে প্রাণের জটিলতাহীন সহজ মুক্তির আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মযজ্ঞে যে বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হল আত্মশক্তির উপর এদেশের মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করা। মানুষের মধ্যেকার আত্মমর্যাদাবোধকে জাগিয়ে তুলে তাদের মধ্যেকার বহুকালাগত হীনমন্যতার বোধকে দূর করা। এ কারণেই তিনি চেতনার স্বাধীনতার স্বপক্ষে সওয়াল করেন, অন্ধ পরানুকরণকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেন ক্ষুরধার বাক্যবাণে। ‘সে’ গ্রন্থের তৃতীয় গল্প শিবা-শোধন-সমিতির রিপোর্টে ব্যঙ্গের আধারে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ভাবনারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

স্বদেশী যুগে কিংবা তার আগে-পরে এদেশের একশ্রেণীর মানুষ স্বজাতির সংস্কৃতি-সভ্যতাকে অবহেলা করে ইংরেজের সমকক্ষ হবার তাগিদে তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করাকে শ্রেয় বলে মনে করেছিল। নিজত্বকে কিংবা এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিকে ত্যাগের করুণ পরিণাম বর্ণিত হয়েছে শিবা-শোধন-সমিতির রিপোর্টে। এক শেয়ালের মধ্য দিয়ে এই বিশেষ অপহ্নবকে চিহ্নিত করেছেন গল্পকার। শেয়ালের ইচ্ছা জাগে যে, সে গল্পকথকের হাতে মানুষ হবে, তাঁর জাতে উঠবে। এমন ইচ্ছা কেন হল কথক তার কারণ জানতে চাইলে শেয়াল জানায়—“যদি মানুষ হতে পারি তা হলে শেয়াল সমাজে আমার নাম হবে, আমাকে পুজো করবে ওরা।”[২৬৭] সেকালে একশ্রেণীর দেশীয় মানুষ নিজেদের ইংরেজ-সমাজে উত্তরণের দ্বারা নিজের অনুরূপ ইচ্ছেকেই চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। যাইহোক শেয়ালের এই ইচ্ছাকে কথক তাঁর বন্ধুদের জানান। তারা একে ‘কাজের মতো কাজ’ মনে করে শেয়ালের ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দিতে শিবা-শোধন-সমিটি গঠন করেন। ইংরেজ আমলে আমাদের দেশেও এমন সংঘ গজিয়ে উঠেছিল। লক্ষণীয় এই সমিতির সভাপতির ব্যঙ্গাত্মক নামটি, যার মধ্যে ইংরেজঘেঁষা গন্ধকে কথক সচেতন ভাবেই গেঁথে দিয়েছেন—গৌর গোঁসাই।

যাইহোক, শিবা-শোধন-সমিতি শেয়ালকে পরামর্শ দেয় তাদের সমাজভুক্ত হতে হলে তার শেয়ালত্বকে বিসর্জন দিতে হবে—অর্থাৎ নিজত্বকে ত্যাগ করতে হবে। তাই ‘প্রথমে নাম বদলাতে হবে, তার পরে রূপ’। শেয়ালের নিজের জ্ঞাতিরা তাকে হৌহৌ নামে ডাকতো। কিন্তু এখন তার নাম পালটে রাখা হয় শিবুরাম। পরে তার চেহারায় পরিবর্তন আনার জন্য তাকে চতুষ্পদের পরিবর্তে দ্বিপদে হাঁটানো অভ্যাস করানো হয়। তার থাবাগুলো ঢাকতে পরানো হয় জুতো মোজা দস্তানা। আয়নায় নিজেকে দেখে তাতেও শেয়াল গোঁসাইদের চেহারার সঙ্গে নিজের অনেক অমিল খুঁজে পেল। তখন গৌর গোঁসাই তাকে বললো—“শিবু, সোজা হলেই কি হল। মানুষ হওয়া এত সোজা নয়। বলি লেজটা যাবে কোথায়। ওটার মায়া কি ত্যাগ করতে পার।”[২৬৮]

এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ গেঁথে দিয়েছেন তীক্ষ্ণ সামাজিক ব্যঙ্গকে। সেদিন যারা স্বদেশ ও তার সমাজকে ত্যাগ করে ইংরেজের সমাজে আশ্রয়লাভে প্রত্যাশী হয়ে উঠেছিল, তারা এদেশীয় মানুষকে কতটা ঘৃণার চোখে দেখতো তাকেই কলমের এক আঁচড়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। যাইহোক শেয়ালপাড়ার দশ-বিশ গাঁয়ে হৌহৌ-এর যে লেজ ছিল বিখ্যাত একেবারে গোড়া ঘেঁষে সেটাকে বাদ দিতে হল। তাতেও তার চেহারা মানুষের মত হল না। কেননা তাতে মানুষের সঙ্গে তার ‘বর্ণভেদ’ ঘোচে না। ইংরেজের সঙ্গে নেটিভদের এই পার্থক্যও তো কিছুতে ঘোচার নয়। যাইহোক হৌহৌ-কে অবশেষে গোঁসাই পরামর্শ দেয়—‘রঙ মিলিয়ে সবর্ণ হতে চাও যদি, তবে রোঁয়া ঘুচিয়ে ফেলো’। ফলস্বরূপ তিনি নাপিত এসে পাঁচদিনের প্রচেষ্টায় খুর বুলিয়ে বুলিয়ে তার লোমগুলো তুলে ফেললো। কিন্তু তাতে ‘রূপ

যেটা ফুটে উঠল তা দেখে সভ্যরা সবাই চুপ করে গেল।' এই চুপ করে যাওয়ার মধ্যেই আছে হৌহৌ-এর করুণ পরিণতির আভাস। এই পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েও সেদিনের বনিক ইংরেজ স্বদেশী একশ্রেণীর মানুষের আহাম্মুকির সুযোগটুকু গ্রহণ করতো। তাদের স্বভাবের সেই হিংস্রতাকে ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ তাই শেয়াল-সমাজের মোড়লের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—" বাঘ-ভাল্লুককে ভয় কিসের? ভয় ঐ মানুষ জানোয়ারটাকে, হয়তো তাদের ফাঁদে পড়েছে।"[২৬৯]

কিন্তু নাম ভাঁড়িয়ে, রূপ বদলে তো আর স্বভাবকে বদলানো যায় না। তাই রাত্রে শেয়ালের দল যখন হুক্কা হুয়া স্বরে ডেকে উঠলো তখন হৌহৌ প্রাথমিক ভাবে নিজেকে সভাপতিদের চাপে সংযত করলেও অবশেষে নিজের স্বরেই ডেকে উঠলো। এক দৌড়ে বাইরে এলেও শেয়ালের দল তাকে দেখে স্তম্ভিত হল, তারা হৌহৌ-কে ত্যাগ করে পলায়ন করলো। এভাবে সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকীত্বের মধ্যে হৌহৌ-কে কাটাতে হয়। আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে, একক ও বিচ্ছিন্নভাবে, কেবল বাহ্যিক পরিবর্তন এনে যে জাতির হীনমন্যতা বা অন্তর্গত দুর্বলতাকে কাটানো সম্ভব নয় তা রবীন্দ্রনাথ আজীবন বলে এসেছেন। হৌহৌ এর অন্তিম নিঃসঙ্গ অনুতপ্ত সমাজচ্যুত জীবন-পরিণামের ছবি এঁকে রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে সেই দিকের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন—

"শেষ খবর পাওয়া গেছে। শিবুরাম সারারাত হেঁকে হেঁকে বেড়াচ্ছে, আমার লেজ কই, আমার লেজ কই।

গোঁসাইয়ের শোবার ঘরের সামনে রোয়াকে বসে ঊর্ধ্ব দিকে মুখ তুলে প্রহরে প্রহরে কোকিয়ে উঠে বলে, আমার লেজ ফিরে দাও।

গোঁসাই দরজা খুলতে সাহস করে না—ভয় পায়, পাছে তাকে খ্যাপা শেয়ালে কামড়ায়।

শেয়ালকাঁটার বনে যেখানে শিবুরামের বাড়ি সেখানে ওর যাওয়া বন্ধ। জ্ঞাতিরা ওকে দূর থেকে দেখলে হয় পালায় নয় খেঁকিয়ে কামড়াতে আসে। ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপেই থাকে, সেখানে একজোড়া প্যাঁচা ছাড়া আর অন্য প্রাণী নেই। খাঁদু, গোবর, বেঁচি, ঢেঁড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো ডানপিটে ছেলেরাও ভূতের ভয়ে সেখানকার জঙ্গল থেকে করমচা পাড়তে যায় না।

শেয়ালি ভাষায় শেয়াল একটা ছড়া লিখেছে, তার আরম্ভটা এইরকম—

ওরে লেজ, হারা লেজ, চক্ষে দেখি ধুঁয়া।

বক্ষ মোর গেল ফেটে হুক্কা হুয়া হুয়া।।"[২৭০]

ক্ষেত্র গুপ্ত হৌহৌ-এর কাহিনী সম্পর্কে স্পষ্টতই জানিয়েছেন—" শিবুরাম যার আসল নাম হৌহৌ—এর কাহিনীতে নীতি দেখা দিয়েছে রূপকাশ্রয়ী ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে। শেয়াল হৌহৌ-এর মানুষ হবার ব্যর্থ ও করুণ চেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজের স্বভাব, স্বজাতি, সমাজ ত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণের ভয়াবহতা দেখানো হয়েছে। এই চিরকালীন নীতিটি বিশেষভাবে গল্পকারের কালকেও বিদ্ধ করেছে পরাধীন জাতির হীনমন্যতা ও সাম্রাজ্যবাদীদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রয়াসের ব্যঞ্জনায়।"[২৭১]

আমাদের দেশের তথা পল্লীসমাজের অন্ধ ধর্মবিশ্বাস, কুসংস্কার, অলৌকিকের কুহকে আচ্ছন্নতা যে আত্মমুক্তির পথে কতটা অন্তরায় তাকে রবীন্দ্রনাথ 'সে' গ্রন্থের চতুর্থ গল্প 'গেছো বাবা' র মধ্যে রূপায়িত করে তুলেছেন। আত্মোন্নতির জন্য আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছেড়ে অলৌকিকের কাছে নিরুপায় আত্মসমর্পণ, ধর্মীয় গোঁড়ামির কাছে নিজেকে অসহায় ভাবে সঁপে দেওয়ার বিরুদ্ধে নিজে আজীবন সংগ্রাম চালিয়েছেন। এ গল্পে মানুষের এই প্রচেষ্টা থেকে সরে যাওয়ার উপর তীব্র ব্যঙ্গের কটাক্ষ হেনে তাদের মধ্যে চেতনা-সংস্কার আনতে চেয়েছেন।

আমাদের দেশের ধর্মব্যবসায়ীরা মানুষের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে তাদের কতটা প্রতারিত করে তারই রূপক এ গল্পের ধোকড় গাঁয়ের ভেকু সর্দার। সে পাশাপাশি গাঁয়ে রটিয়ে দেয় গেছোবাবার কৃপা লাভের কাহিনী। সে কাহিনীটিও তদ্রূপ অলৌকিক। গেছো বাবা নাকি যখন ডুমুর গাছে চড়ে বসে পা দোলাচ্ছিলেন তখন তামাক তৈরির জন্য এক হাঁড়ি চিটে গুড় নিয়ে ভেকু তার তলা দিয়ে যাচ্ছিল। বাবার পায়ে ঠেকে তার হাঁড়ি টলে যায় এবং চিটে গুড়ে তার মুখ ঢাকা পড়ে। গেছো বাবার দয়ার শরীর। তখন তাই গেছো বাবা বলন যে, ভেকু যেন তার মনের কী কামনা খুলে বলে। ভেকু বাবাকে জানায় একখানা ট্যানার প্রয়োজনীয়তার কথা। তখন গেছো বাবা গাছ থেকে একখানা গামছা ফেলে দেন। এরপরে গেছোবাবা নাকি অদৃশ্য হয়ে যান। চতুর ভেকু কিন্তু এও জানাতে ভোলে না যে গেছো বাবার কাছে যা চাইবে তা কেবল একবার। তারপর কেঁদে আকাশ ফাটালেও তাঁর সাড়া মেলে না। কেননা সেক্ষেত্রে ভেকুর কৃপালাভ পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ভেকু এই গামছাটিকে কাজে লাগিয়ে পল্লীর মানুষের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসকে উপজীব্য করে ধর্মব্যবসার কাজে নেমে পড়ে। তার ইতিবৃত্ত জানিয়ে উধো বলেছে—" হোঁদলপাড়ার মেলায় ভেকু সেদিন বাবার গামছা পেতে বসল। হাজারে হাজারে লোক এসে জুটল। বাবার নামে টাকাটা সিকেটা আলুটা মুলোটা চার দিক থেকে গামছার উপর পড়তে লাগল। মেয়েরা কেউ বা এসে বলে, ও ভেকুদাদা, আমার ছেলেটার মাথায় বাবার গামছা একটু ঠেকিয়ে দে, আজ তিনমাস ধরে জ্বরে ভুগছে। ওর নিয়ম হচ্ছে নৈবিদ্যি চাই পাঁচ

সিকে, পাঁচটা সুপুরি, পাঁচ কুন্‌কে চাল, পাঁচ ছটাক ঘি।”[২৭২] গামছা দিয়েই তাই ভেকুর দিব্যি দিন চলে যায়। গামছার উপার্জন দিয়ে রথতলার কাছে সে বিরাট এক আটচালাও বানিয়ে নেয়।

পঞ্চু উধোকে জিজ্ঞেস করে, লোকে ‘নৈবেদ্য তো দিচ্ছে, ফল পাচ্ছে কিছু?’ উত্তরে উধো কিন্তু জানিয়েছে—“পাচ্ছে বৈকি। গাজন পাল গামছা ভরে পনেরো দিন ধরে ধান ঢেলেছে; তার পরে ঐ গামছার কোণে দড়ি লাগিয়ে একটা পাঁঠাও দিলে বেঁধে, ঐ পাঁঠার ডাকে চার দিক থেকে লোক এসে জমল। কী বলব, ভাই, মাস এগারো পরেই গাজনের চাকরি জুটে গেল। আমাদের রাজবাড়ির কতোয়ালের সিদ্ধি ঘোঁটে, তার দাঁড়ি চুম্‌রিয়ে দেয়।”[২৭৩] অন্ধ ধর্মবিশ্বাস যেহেতু মানুষের চেতনার পরিধিকে ছোট করে দেয়, তাই বৃহৎ দৃষ্টি দিয়ে তার মধ্যেকার ভণ্ডামিকে ধরা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিশেষ করে পল্লীজীবনে মানুষের অর্থনৈতিক সঙ্কট যেখানে অত্যন্ত প্রবল, যেখানে মানুষ নিতান্ত নিরুপায়, সন্তানের সামান্য জ্বরটুকুও সারানোর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় না, তিনমাস ধরে চলে তার ভোগান্তি, সেখানে শিক্ষার সংস্পর্শ-বঞ্চিত মানুষের অন্ধ ধর্মীয় সংস্কারে আস্থাশীল হয়ে ওঠাটা খুব স্বাভাবিক। ফলে কাকতালীয় ভাবে ঘটা নানা ঘটনাকে তারা গেঁথে তোলে নানা অলৌকিকের ছাঁচে। গাজনের চাকরি পাওয়ার বিষয়টিকে ঠিক অনুরূপ ছাঁচে গেঁথে তোলে পল্লীর মানুষ। নতুবা গাজন পাল যে কাজটা পায়, মর্যাদা বা গুণমানের বিচারে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে জোগাড় করা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। আর ভেকু যে অলৌকিক গামছাটুকু ব্যবহার করে, খোলা দৃষ্টি নিয়ে দেখলে দেখা যেত তা ‘হট্টগঞ্জের তাঁতে দেড়গজ ওসারের যে গামছা বুনুনি হয়, চাঁপার বরণ জমি, লাল পাড়, এক্কেবারে বেমালুম তাই।”[২৭৪]

এই অন্ধ ধর্মবিশ্বাস যেহেতু প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, তাই গেছো বাবার বাস্তব অস্তিত্ব নিয়েও কেউ প্রশ্ন তোলে না। ভেকুও তাকে তাই দেখতে পায় না, কেননা সে সময় তার চোখ নাকি চিটে গুড়ে ঢাকা পড়েছিল। এই অন্ধ অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাসের পিছনে ভারতবর্ষের মত পল্লীপ্রধান দেশের মানুষ চরম মূল্য প্রদান করে চলেছে। এতে তাঁর কোনো প্রকার আত্মিক বা বৈষয়িক উন্নতি অপেক্ষা অবনমনই যে বেড়ে চলে তার একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে। গেছোবাবাকে পাবার উপায় বাতলে ভেকু বলেছিল যে, গাছে চড়লেই বাবার প্রকৃত চেহারা ধরা পড়ে। নীচে থাকলে তাকে চেনবার জো নেই। তাই উধো তার অন্ধ সংস্কার থেকে যে ব্যবস্থা নেয় তার পরিণাম বর্ণনা করে সে নিজেই পঞ্চুকে জানায়—“গাছে চড়িয়ে চড়িয়ে মানুষকে পরখ করব কী করে, ভাই। আমি এক বুদ্ধি করেছি, আমার আমড়া গাছ আমড়ায় ভরে গেছে, যাকে দেখছি তাকেই বলছি, আমড়া পেড়ে নাও—গাছটা প্রায় খালি হয়ে এল, ডালগুলোও ভেঙেছে।”[২৭৫] গেছো

বাবাকে পাবার অন্ধ আবেগে উধো ও পঞ্চু তাদের স্বাভাবিক বাস্তব বিচার বুদ্ধিও হারিয়েছে। তাই চালতা গাছে বসে থাকা মর্কটকেই গেছোবাবার ছদ্মাবরণ বলে ভেবেছে। নিজেদের বিশ্বাস-সংস্কার অনুসারে তার এমন রূপে আবির্ভাবের একটা যুক্তিও গড়ে তুলেছে—"ঘোর কলি যে! বাবা বাবা ঐ কপিরূপ ধরেছেন আমাদের ভোলাবার জন্যে।"[২৭৬] এর মধ্যে যে তীব্র ব্যঙ্গের চাবুক আছে তার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ মানুষের সমাজচেতনাকে জাগ্রত করার প্রয়াস নিয়েছেন।

'সে'-এর পঞ্চম গল্পে 'সে'-র কনে দেখাকে কেন্দ্র করে জ্যোতিষ বিচারের প্রতি কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ বর্ষিত। ষষ্ঠ গল্পে স্মৃতিরত্নমশায়কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা ভাবনার পাশাপাশি স্বদেশচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অসম্ভব গল্পের নমুনা দিতে গিয়ে 'সে' বলেছে—"স্মৃতিরত্নমশায় মোহনবাগানের গোল-কীপারি করে ক্যাল্‌কাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে খিদে গেল না, উল্‌টো হল, পেট চোঁ-চোঁ করতে লাগল।"[২৭৭] মোহনবাগান-ক্যালকাটার ফুটবলের প্রতিযোগিতা এক সময়ে আমাদের কাছে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম বা আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের মত ও পথ থেকে রবীন্দ্রনাথ একসময় সরে আসেন। সেক্ষেত্রে ক্যালকাটার কাছে পাঁচ গোল খেয়ে পেট চোঁ-চোঁ করার মধ্যে সূক্ষ্ম রাজনৈতিক ব্যঙ্গ আছে বলে ভাবা যেতে পারে। আত্মশক্তির উদ্বোধনের দ্বারা দেশকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংগঠনকেই আমাদের দেশের যথার্থ পথ বলে মনে করেছিলেন।

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের চোখে যে বিষয়টি খুব বড় করে চোখে পড়েছিল তা হল হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ—তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাত। সেদিনের পত্র-পত্রিকাগুলি তার খবর বেশ ফলাও করে ছেপেছিল। তর্করত্নমশায়ের মনুমেন্ট চাটা নিয়ে বদরুদ্দিনের সঙ্গে বিরোধ এবং বদরুদ্দিনের 'তোবা তোবা' রব তুলে মনুমেন্টের গায়ে থুতু ফেলে স্টেট্‌স্‌ম্যান আপিসে দৌড়ে যাওয়ার মধ্যে তারই ইঙ্গিত স্পষ্ট। সেনেটে দেশীয় প্রতিনিধি পাঠানোর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ একদা সওয়াল করেছিলেন যাতে করে অন্তত আমাদের দেশের দাবি-দাওয়া গুলো সম্পর্কে, অভাব সম্পর্কে ইংরেজকে সচেতন করা যায় । কিন্তু পরে তিনি এই ব্যবস্থার নির্থকতার দিকটি উপলব্ধি করেছিলেন ইংরেজদের একক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারের প্রশ্নে। এ গল্পে সেনেটে বসে বদরুদ্দিনের জুতো সেলাই করার মধ্যে সেই রাজনৈতিক ব্যঙ্গের প্রকাশ স্পষ্ট। শিক্ষায়-দীক্ষায় অনুন্নত জাতির পক্ষে সেনেটে সদস্য প্রেরণের নিরর্থকতার দিকটিকে রবীন্দ্রনাথ এর মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করে দিতে চেয়েছেন। আর 'গঙ্গাজলে পাঁড়েজীর ডাণ্ডা শোধন করায় রূঢ় রক্ষণশীলতা তিরস্কৃত'[২৭৮] হয়েছে। কেননা পাঁড়েজীর

ডাণ্ডা পণ্ডিত দাঁতের মাজন হিসেবে ব্যবহার করলে অশুদ্ধ হয় না কিন্তু নাকি কাঠি দিয়ে হাঁচির কাজে লাগলেই কেবল তা দূষিত হয়ে ওঠে। এই যুক্তিহীন আচারসর্বস্ব রক্ষণশীলতাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গবিদ্ধ করে চেতনাসংস্কার আনতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন যজ্ঞে চেয়েছিলেন ধনী-নির্ধনের ব্যবধানকে যথাসম্ভব কমিয়ে এনে সামাজিক সাম্য রক্ষা করতে, শোষণহীন শ্রেণীবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। ধনের সুষম বন্টনের উপরও তিনি জোর দিয়েছিলেন। 'সে'-এর সপ্তম কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ ভাবনার প্রকাশ আছে। এখানে রূপকের আধারে শ্রেণীশোষণ বা শ্রেণীবৈষম্যের দিকটিকে 'সে' তুলে ধরেছে। তাসমানিয়াতে কোজুমাচুকের বাড়িতে যে তাস খেলার নেমন্তন্নের কথা বলা হয়েছে তা আসলে দেখা-বিন্তি তাস খেলার আসর। অর্থাৎ দেখে দেখেই পূর্ব-পরিকল্পনা মতোই তাসের দখলদারি নেওয়া যেত। এ জাতীয় সুচিহ্নিত পরিকল্পিত দখলাদারি সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপর প্রয়োগ করে থাকে—যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমিদার প্রজাদের উপর প্রয়োগ করে থাকে। সে জন্য সমাজে নিম্নস্তরের অবহেলিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে উচ্চস্তরের মানুষের এক বৈষম্য গড়ে ওঠে। এর থেকে যে বন্ধন-অসহিষ্ণু ক্ষোভের জন্ম হয় তারই আভাস আছে এ গল্পে শেয়াল ও কাকের আচরণের রূপকে। রবীন্দ্রনাথ শব্দের অব্যর্থ লক্ষ্যে কথার মোচড়ে তাকে সুচিহ্নিত করে দিয়েছেন।

তাই কোজুমাচুকের বাড়িতে তার মেয়ে পাম্‌কুনির উৎকৃষ্ট রান্নার গন্ধ যখন সাতপাড়া পেরিয়ে গেল তখন—"গন্ধে শেয়ালগুলো পর্যন্ত দিনের বেলা হাঁক ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানি নে। কাকগুলো মরিয়া হয়ে পাখা ঝাপাটায় তিন ঘন্টা ধরে।"[২৭৯] একদিকে খাদ্যের প্রাচুর্য আর একদিকে অন্নহীন মানুষের দল—এই আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের প্রতি তাই শেয়াল ও কাকের বিক্ষোভ তাই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোজুমাচুকের বাড়িতে দেখা-বিন্তি জাতীয় তাস খেলার এই আয়োজন উদ্দেশ্যহীন নয়। তার গূঢ়ার্থ পূর্বেই আলোচনা করেছি। সেকারণে সাধারণের জন্য আয়োজন থাকে যে 'ইক্‌টিকুটির ভিক্‌টিমাই'-এর মত খাবার তা সে দেশের পোষা হাতি ও গাণ্ডিসাঙ্‌ড়ুং নামক জন্তুর উচ্ছিষ্ট মাত্র। তাদের পদদলনে এবং লেহনে খাবারগুলি কতকটা নরম হয়ে পড়ে|

এই উচ্ছিষ্ট যাদের পাওনা হয়ে ওঠে তাদের কথা বলতে গিয়ে 'সে' বলেছে—"তারপরে তিনশো লোকের পাতের সামনে দমাদ্দম হামানদিস্তার শব্দ উঠতে লাগলো। ওরা বলে, এই ভীষণ শব্দ শুনলেই ওদের জিবে জল আসে; দূর পাড়া থেকে শুনতে পেয়ে ভিখারী আসে দলে দলে| খেতে খেতে যাদের দাঁত ভেঙে যায় তারা সেই ভাঙা দাঁত দান করে যায় বাড়ির কর্তাকে। তিনি সেই ভাঙা দাঁত ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন জমা করে রাখতে, উইল করে দিয়ে যান ছেলেদের। যার তবিলে যত দাঁত তার তত নাম। অনেকে লুকিয়ে

অন্যের সঞ্চিত দাঁত কিনে নিয়ে নিজের বলে চালিয়ে দেয়। এই নিয়ে বড়ো বড়ো মকদ্দমা হয়ে গেছে। হাজারদাঁতিরা পঞ্চাশদাঁতির ঘরে মেয়ে দেয় না। একজন সামান্য পনেরোদাঁতি ওদের কেট্‌কু নাড়ু খেতে গিয়ে হঠাৎ দম আট্‌কিয়ে মারা গেল, হাজারদাঁতির পাড়ায় তাকে পোড়াবার লোক পাওয়াই গেল না। তাকে লুকিয়ে ভাসিয়ে দিলে চৌচঙ্গী নদীর জলে। তাই নিয়ে নদীর দুই ধারের লোকেরা খেসারতের দাবি করে নালিশ করেছিল, লড়েছিল প্রিভিকৌন্সিল পর্যন্ত।”[২৮০]

বর্ণনার এই অংশটি অত্যন্ত তাৎপর্যময়। কোজুমাচুকের বাড়িতে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা প্রায় তিনশো। এরা সুবিধাভোগীর দল। এদের পাতের সামনে হামানদিস্তার পেষণের শব্দটুকু না উঠলে জিবে জল আসে না। কেননা কর্তাব্যক্তির শোষণ-পীড়ন-মুনাফালাভের ভাগ পায় এরা। হামানদিস্তার শব্দ শ্রেণীশোষণের রূপক। বাকি মানুষেরা দূর গাঁ থেকে আসে এই হামানদিস্তার শব্দ শুনেই। তারা তথাকথিত ভিখারীর দল, যারা শোষণের কঠিন নিগড়কে কিছুতেই এড়াতে পারে না।তাদের সক্ষমতা বা প্রতিরোধের দাঁত যত ভাঙে ততই কোজুমাচুকের ন্যায় কর্তাব্যক্তিদের মুনাফার বহর ফুলে ফেঁপে ওঠে। এই শোষিত অর্থমূল্যে বা ধনের গৌরবেই নির্দিষ্ট হয় গৃহকর্তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা। কাঞ্চনকৌলীন্যই সামাজিক কৌলীন্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়।

হাজারদাঁতিরা একারণেই পঞ্চাশদাঁতির ঘরে মেয়ে দেয় না। আবার পনেরোদাঁতিদের মতো নিম্নস্তরের মানুষ হাজারদাঁতিদের পাড়ায় অস্পৃশ্য, অবহেলিত। এরা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলেই পনেরোদাঁতি কেট্‌কু নাড়ু খেতে গিয়ে প্রাণ হারায়। তাদের মৃত্যুতে পোড়াবার লোক পাওয়া যায় না। তাই লুকিয়ে তাদের নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। কিন্তু এই নিয়ে বাধে শ্রেণীগত বিরোধ। সে বিরোধ গড়ায় প্রিভিকৌন্সিল পর্যন্ত। পরিণাম সহজেই অনুমেয়। ছল-বল-কৌশলে প্রাপ্ত ধনকে হাজার দাঁতিরা এভাবেই পুরুষানুক্রমে সুরক্ষিত করে যায় উইল করে। কখনো বা তারা গরীবের ধন চক্রান্ত করেও কেড়ে নেয়, নিজের বলে চালায়। সেই নিয়ে তো মকদ্দমার শেষ নেই। এই জাতিগত, শ্রেণিগত বৈষম্য ও ধনের অসাম্য দূর করার লক্ষ্যেই রবীন্দ্রনাথ দেশোন্নয়নের স্বতন্ত্র প্রণালীকে তাঁর পল্লীসংগঠন পরিকল্পনার দ্বারা সফল করে তুলতে চেয়েছিলেন। এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ সামাজিক বিষয়গুলির উপর ব্যঙ্গের তীর্যক আলোকপাত করেছেন। ক্ষেত্র গুপ্ত জানিয়েছেন—“গল্পের দ্বিতীয়াংশে বাইরেটা অদ্ভুত, ভিতরটা সমাজ-ব্যঙ্গ। হাজার-দাঁতি পঞ্চাশ-দাঁতিদের কথার মধ্য দিয়ে সামাজিক-আর্থিক শ্রেণীভেদ ও বংশগত কৌলীন্য আহত হয়েছে।”[২৮১]

‘সে’-এর অষ্টম কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের অস্পৃশ্যতা, জাত-পাত, ধর্মীয় ভণ্ডামিকে ব্যঙ্গ করে সামাজিক প্রগতির দিকনির্দেশ দিতে চেয়েছেন। এ

কাহিনীতে অস্পৃশ্যতার দুটি স্বতন্ত্র দিকের নির্দেশ আছে। পুপে বলেছে, 'বাঘরা কখ্খনো নাপিতকে খায় না'। বাঘ এখানে রূপকার্থে ব্যবহৃত, সমাজের পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের কৌলীন্যকে তার মধ্য দিয়ে গল্পকার তুলে ধরতে চেয়েছেন। নাপিতের মধ্য দিয়ে সমাজে অস্পৃশ্য নিম্নস্তরের মানুষের কথা বলা হয়েছে। সমাজের এই কুলিন সম্প্রদায় যে নিম্নশ্রেণীর মানুষকে অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করে তারই ইঙ্গিত আছে এখানে।

এই অস্পৃশ্যতার আর একটি দিক ছিল ইংরেজের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা। এই জাতীয় মনোভাবকে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের চাবুক হেনে উদার স্বাধীন মানবিক চেতনা-বিকাশের প্রয়াস নিয়েছেন। পুপে বলেছিল বাঘ নাপিতের মাংস খায় না। কিন্তু পুপেকে কথক যখন জানান যে বাঘকে চৌরঙ্গিতে সাহেব-নাপিতের দোকানে নিয়ে যাওয়ার কথা, তখন পুপে বলে যে—'হাঁ হাঁ, ভারি মজা হবে। সাহেবের মাংস নিশ্চয়ই খাবে না, ঘেন্না করবে।'[২৮২] এর মধ্যেই আছে ইংরেজের প্রতি অস্পৃশ্য মনোভাবের পরিচয়। গঙ্গার পশ্চিম পারের চাষি-কৈবর্তকে খাওয়া বাঘেদের শাস্ত্রে বারণ এবং পুব পাড়ের জেলে-কৈবর্তদের খাওয়া তাদের শাস্ত্রে বিশুদ্ধ রীতি—এই বর্ণনার মধ্য দিয়েও অনুরূপ মনোভাবের প্রকাশ আছে। একই সঙ্গে শাস্ত্রধর্মের অনাচারের প্রতিও ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে।

আসলে আমাদের দেশের তথাকথিত ভদ্র বা স্পৃশ্য সম্প্রদায় পবিত্রতার নামে যে অস্পৃশ্যতাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলে তা আমাদের দেশের ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে কতটা ভয়ঙ্কর ও হিংস্র হতে পারে , সমাজের বুক থেকে তা ঠিক কতটা রক্তশোষণ করে চলেছে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পল্লীজীবনের মাঝে বাস করে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাসূত্রে রবীন্দ্রনাথ তা বেশ ভালো করেই জেনেছিলেন। তাই এ গল্পের একস্থলে রূপকের ছলে তিনি লিখছেন—

" একবার একটা বাঘ ঢুকেছিল পাগড়িওয়ালার ঘরে, সেখানে ম্যাজেন্টা গোলা ছিল গামলায়। রক্ত মনে করে মহা খুশি হয়ে মুখ ডুবোলে তার মধ্যে। সে একেবারে পাকা রঙ। বাঘের দাঁড়ি গোঁফ, তার দুই গাল, লাল টক্টকে হয়ে উঠল। নিবিড় বনে যেখানে বাঘেদের পুরুতপাড়া মোষমারা গ্রামে, সেইখানে আসতেই ওদের আঁচাড়ি শিরোমণি বলে উঠল, এ কী কাণ্ড! তোমার সমস্ত মুখ লাল কেন। ও লজ্জায় পড়ে মিথ্যে করে বললে, গণ্ডার মেরে তার রক্ত খেয়ে এসেছি। ধরা পড়ে গেল মিথ্যে। পণ্ডিতজি বললে, নখে তো রক্তের চিহ্ন দেখি নে; মুখ শুঁকে বললে, মুখে তো রক্তের গন্ধ নেই। সবাই বলে উঠল, ছি ছি! এ তো রক্তও নয়, পিত্তও নয়, মগজও নয়, মজ্জাও নয়—নিশ্চয় মানুষের পাড়ায় গিয়ে এমন একটা রক্ত খেয়েছে যা নিরামিষ রক্ত, যা অশুচি। পঞ্চায়েত বসে গেল। কামড়-বিশারদ মশায় হুঙ্কার দিয়ে বললে, প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। করতেই হল।"[২৮৩] সে

প্রায়শ্চিত্তের অর্থহীন বিড়ম্বনা ও যন্ত্রণার হদিশ পাওয়া যায় হাঁকবিদ্যা বাচস্পতির নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তের বিধানের মধ্যে।

'বাঘেদের পুরুতপাড়া'—এই বিশেষ শব্দ-অভিব্যঞ্জনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সামাজিক শ্রেণিনির্দেশ করেছেন। সে পাড়ার পঞ্চায়েতে একথা স্পষ্টতই সর্বসম্মতিক্রমে উচ্চারিত হয়েছে যে নিরামিষ রক্ত তাদের কাছে অশুচি। সুতরাং তাদের ধর্মব্যবসার মূলে যে অনেক আমিষ রক্তের আয়োজন সমাজের গভীরে প্রস্তুত করা আছে ভ্রান্ত নিয়ম-নিগড়ের আধারে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে এই অংশে। এই রক্ষণশীল সমাজে এই প্রাণবিদারক ভ্রান্ত নিয়মাচারকে মেনে চলতে বাধ্য করা হয় মানুষকে। বাঘ যে পঞ্চায়েতের বিধানকে মেনে নেয় তার কারণ সে পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের বাপ, তাদের বিয়ের বয়স হয়েছে। সামাজিক দিক থেকে অবরোধের সম্মুখীন হলে 'পেটের নীচে লেজ গুটিয়ে সাত গণ্ডা মোষ পণ দিতে চাইলেও বর জুটবে না'। আর মরলে পুরুতও জুটবে না। বাংলার পল্লীসমাজ সেদিন এমনি সঙ্কীর্ণ আচার-সংস্কার, জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার বেড়াজালে নিজেদের সব শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়ে চলছিল। 'কর্তার ভূত'-এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়েছেন।

এই রকম সমাজে যারা বেঁচে আছে তারা বেঁচে থেকেও মৃত। সেই রকম বাঁচার ভয়াবহ যন্ত্রণার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজ সমাজের সঙ্গে এই পার্থক্যটুকু রবীন্দ্রনাথ সেদিন স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে ইংরেজের সভ্যতা সংস্কৃতির সবকিছুকেই নিছক বিদ্বেষের বশে আবিল করে দেখেননি। এ গল্পের একস্থানে পুপু ও কথকের কথোপকথনের মধ্যে সেই বিশেষ দিকটি ফুটে উঠেছে—

" শোনো একবার। বাঘের ভূত যে না খেয়ে মরবে।

সে তো মরেইছে, আবার মরবে কী করে।

সেই তো আরো বিপদ। না খেয়ে মরা ভালো, কিন্তু মরে না খেয়ে বেঁচে থাকা যে বিষম দুর্গ্রহ।

পুপুদিদিকে ভাবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ বাদে ভুরু কুঁচকিয়ে বললে, ইংরেজের ভূত তা হলে খেতে পায় কী করে।

তারা বেঁচে থাকতে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাত জন্ম অমনি চলে যায়। আমরা যা খাই তাতে, বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ-চোঁ করতে থাকে।"[২৮৪]

অথচ এই অন্ধ ধর্মাচার ও অস্পৃশ্যতার কারণে আমাদের জীবনে কম মূল্য দিতে হয় না। এক বিশেষ শ্রেণির মানুষের বাঘের সমান ক্ষমতা কায়েম করার অভিপ্রায়েই ধর্মকে তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে—যেমনটা করেছে 'রক্তকরবী'র রাজা। আর আমাদের সমাজের মানুষের অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস, উদার মুক্ত চেতনার অভাব, যুক্তি ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব তাকে শক্ত ভিত্তি দান করে। রবীন্দ্রনাথ রূপকের আধারে তীব্র চাঁচাছোলা ভাষায় এই সামাজিক ব্যাধিকে আক্রমণ করে ব্যাধিমুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন। গল্পের নিম্নোক্ত অংশটি তারই পরিচয়বাহী—

" দাদামশায়, বাঘেরা তা হলে খুব ধার্মিক?

ধার্মিক না হলে কি এত নিয়ম বাঁচিয়ে চলে। সেইজন্যেই তো শেয়ালরা ওদের ভারি ভক্তি করে। বাঘের এঁটো প্রসাদ পেলে ওরা বর্তিয়ে যায়। মাঘের ত্রয়োদশীতে যদি মঙ্গলবার পড়ে তা হলে সেদিন ভোর রাত্তিরে ঠিক দেড় প্রহর থাকতে বুড়ো বাঘের পা চেটে আসা শেয়ালের ভারি পুণ্যকর্ম। কত শেয়াল প্রাণ দিয়েছে এই পুণ্যের জন্যে।

পুপুর খটকা লাগল। বললে, বাঘরা এতই যদি ধার্মিক হবে তা হলে জীবহত্যে করে কাঁচা মাংস খায় কী করে।

সে বুঝি যে-সে মাংস। ও-যে মন্ত্র দিয়ে শোধন করা।

কিরকম মন্ত্র।

ওদের সনাতন হালুম-মন্ত্র। সেই মন্ত্র পড়ে তবে ওরা হত্যা করে। তাকে কি হত্যা বলে।"[২৮৫]

গল্পের শেষাংশে পুঁটু ও বাঘের যে ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে 'সে'-এর রচিত ছড়ায় তাতে সামাজিক শ্রেণীভেদ, তাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার হেরফের, অর্থনৈতিক অসাম্য ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গের আঘাত হেনেছেন রবীন্দ্রনাথ। সামাজিক সচেতনতা আনাই রবীন্দ্রনাথের মূল উদ্দেশ্য—

" ঢেঁকিশালে পুঁটু ধান ভানে,

বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে।

ফুলিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ

বলে, চাই গ্লিসারিন সোপ।

পুঁটু বলে, ও কথাটা কী যে

জন্মেও জানি নে তা নিজে

ইংরেজি-টিংরেজি কিছু

শিখি নি তো, জাতে আমি নিচু।......

পুঁটু বলে, আমি কালো কৃষ্টি

কখনো মাখি নি ও জিনিসটি।

কথা শুনে পায় মোর হাসি,

নেই মেম সাহেবের মাসি।

বাঘ বলে, নেই তোর লজ্জা?

খাব তোর হাড় মাস মজ্জা।

পায়ে ধরি করিয়ো না রাগ!পুঁটু বলে, ছি ছি ওরে বাপ,

মুখেও আনিলে হবে পাপ।

জান না কি আমি অস্পৃশ্য,

মহাত্মাগাঁধিজির শিষ্য।

আমার মাংস যদি খাও

জাত যাবে জান না কি তাও।

ছুঁস নে ছুঁস নে, বলে বাঘ,

আরে ছি ছি, আরে রাম রাম,

বাঘনাপাড়ায় বদনাম

রটে যাবে ; ঘরে মেয়ে ঠাসা,

ঘুচে যাবে বিবাহের আশা

দেবী বাগা চণ্ডী র কোপে।

কাজ নেই গ্লিসারিন সোপে।"[২৮৬]

এই অস্পৃশ্যতা, ভেদাভেদের বিরুদ্ধে যে আমাদের দেশের প্রগতিশীল উচ্চসম্প্রদায়েরই এক শ্রেণীর মানুষ জেগে উঠছে , এই নিয়ে যে নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্ব বাধছে, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সচেতন। রূপকের মধ্যস্থতায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

" আধুনিক বাঘেদের মধ্যে ভারি একটা কাণ্ড চলছে—যাকে বলে প্রগতি, প্রচেষ্টা। ওদের প্রগতিওয়ালা প্রচারকেরা বাঘ-সমাজে বলে বেড়াচ্ছে যে, অস্পৃশ্য বলে খাদ্য বিচার করা পবিত্র জন্তু-আত্মার প্রতি অবমাননা। ওরা বলছে, আজ থেকে আমরা যাকে পাব তাকেই খাব; বাঁ থাবা দিয়ে খাব ডান থাবা দিয়ে খাব, পিছনের থাবা দিয়েও খাব; হালুম মন্ত্র পড়েও খাব, না পড়েও খাব—এমন-কি, বৃহস্পতিবারেও আমরা আঁচড়ে খাব, শনিবারেও আমরা কামড়ে খাব। এত ঔদার্য। এই বাঘেরা যুক্তিবাদী এবং সর্বজীবে এদের সম্মানবোধ অত্যন্ত ফলাও। এমন-কি, এরা পশ্চিম-পারের চাষী কৈবর্তদেরও খেতে চায়, এতই এদের উদার মন। ঘোরতর দলাদলি বেধে গেছে। প্রাচীনরা নব্য সম্প্রদায়কে নাম দিয়েছে চাষী-কৈবর্ত-খেগো, এই নিয়ে মহা হাসাহাসি পড়েছে।"[২৮৭]

এই সামাজিক দ্বন্দ্ব যে আমাদের দেশের পক্ষে স্বাস্থ্যকর সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই নিজের মত পোষণ করেছেন। পাশাপাশি এ দেশের মানুষের জীবনে ব্যাঘ্রসম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যে শাসন-ত্রাসন, তার প্রতিকার চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সামাজিক প্রগতি কিংবা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রাজনৈতিক শোষণ-পীড়নের অবসানের জন্যই যে রবীন্দ্রনাথের সওয়াল ও পক্ষপাত, তার আরো স্পষ্ট ইঙ্গিতময় পরিচয় আছে বটুর সুন্দরবনের কেঁদো বাঘকে বন্দী করে যমের মুখে ঠেলে দেওয়ার মধ্যে।

'সে'এর নবম পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী-উন্নয়ন বা দেশোন্নয়ন ভাবনার একটি বিশেষ দিকের প্রকাশ দেখিয়েছেন। আলস্য ও অন্ধ ধর্মাচার দূর করে পল্লী তথা দেশের মানুষকে রবীন্দ্রনাথ কর্মের পথ অবলম্বন করার কথা জানিয়েছিলেন। 'চিত্রা-সোনারতরী'র সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ দেশের মূঢ় ম্লান মূকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের

আত্মোন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করার কথা বার বার বলেছেন। বিদেশী শাসকের কৃপা বা ভ্রান্ত রাজনীতির পথে যে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় একথা রবীন্দ্রনাথ বহুদিন যাবৎ বলে এসেছেন। আত্মশক্তিতে দেশের মানুষকে প্রতিষ্ঠিত না করলে যে দেশের মানুষের কল্যাণ আসতে পারে না সেটিও বহুল আলোচিত রাজনৈতিক মত। নিজে এর জন্য পল্লীর মাঝে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং পল্লীবাসী তথা দেশবাসীর উন্নয়নের নানা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের পথে নেমেছিলেন। কিন্তু দেশের একশ্রেণীর লোক দান বা সাহায্যকেই দারিদ্র্যমুক্তির পন্থা বলে মনে করেছিল। শুধু তাই নয় দেশের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা না থাকলেও দেশনেতার প্রকৃত যোগ্যতা না থাকলেও 'রাজটীকা' গল্পের নবেন্দুশেখরের মতই কেবল আর্থিক অনুদানের খাতিরেই সেদিন অনেকেই কংগ্রেসের নেতা হয়ে উঠেছিল। তাদের সেই অযোগ্যতা ও ভ্রান্ত দেশোন্নয়ন প্রণালীকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে।

নবম পরিচ্ছেদে গল্পকথক জানিয়েছেন 'সে'-এর উদ্ভট গল্পের জগৎ থেকে কিছুদিন ছুটি নিয়ে তাকে দাঁড়াতে হয়েছিল বাস্তবের মাটিতে—" কুঁড়েমির স্বর্গ সকল স্বর্গের উপরে। সেখানে যে ইন্দ্র বসে অমৃত খাচ্ছেন হাজার চক্ষু আধখানা বুজে, তিনি হলেন গল্পের দেবতা। আমি তাঁর ভক্ত; কিন্তু তাঁর সভায় আজকাল ঢুকতেই পারি নে। আমার ভাগে গল্পের প্রসাদ অনেকদিন থেকে বন্ধ।"[২৮৮] নাতনি পুপু এর কারণ জানতে চাইলে কথক জানিয়েছেন তার 'পথ ভুল হয়ে গিয়েছিল'। কী করে পথ ভুল হল তারই বিবরণে এ গল্পের মূল শরীর গঠিত। অর্থাৎ কুঁড়েমির জগৎ থেকে ছুটি নিয়ে যে 'কাজের স্বর্গে' গিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন কথক সেখানে তার চলার পথ ভুল হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ দেশোন্নয়নের জন্য অবলম্বিত রাজনৈতিক মত ও পথের ভ্রান্তির সূত্রটিকে স্পষ্টতই গেঁথে দিয়েছেন।

কথক জানিয়েছেন—" অমরাবতীর যে সুরধুনীর এক পারে ইন্দ্রলোক, তারই ভাঁটিতে আছে আর-এক স্বর্গ। কারখানাঘরের কালো ধোঁয়ার পতাকা উড়ছে সেখানকার আকাশে। সেটা হল কাজের স্বর্গ। সেখানে হাফপ্যান্ট পরা দেবতা বিশ্বকর্মা।"[২৮৯] এই বিশ্বকর্মার দল যথার্থ অর্থেই সাধারণ কর্মী মানুষ। তাদের জন্যেই কথক পূজার ডালি নিয়ে চলেছিলেন পথে। কিন্তু কালো ধোঁয়ায় ঢাকা সে কর্মজগতে তাই কথকের শিউলিফুলের পূজার ডালি এক বাইক-চড়া পাণ্ডার ধাক্কায় তছনছ। হয়ে যায়। কথক পাণ্ডাটিকে বলেন- 'মন্দিরে পুজো দিতে যাব, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি নে।' কিন্তু পাণ্ডাটি জানায়—'তোমরা বুঝি মেঘের-দিকে-তাকানো রাস্তা-খোঁজার দল! চলো, পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।"[২৯০] সাধারণ কর্মী মানুষের পূজা করতে হলে তাদের জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করাটা জরুরী। তাদের সেবা ফুল দিয়ে হয় না, সেবার সার্থকতা লক্ষ্যহীন পথ বেয়ে আসে না।

দেশসেবকদের পল্লীসেবায় সেদিনের যে ব্যর্থতা, রাস্তা খুঁজে না পাওয়ার তীর্যক ব্যঙ্গে তাকেই ধরতে চেয়েছেন লেখক। আর 'মেঘের-দিকে-হাঁ-করে-তাকানো রাস্তা খোঁজার দল' কথাটির মধ্যে অধ্যাত্মমার্গীদের প্রতি ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্তু সে পথেও দেশের মানুষের মুক্তি আসতে পারে না। কিন্তু অনেক রাজনৈতিক পাণ্ডাদের কাছে সেদিন মনে হয়েছিল দান বা সংগৃহীত অর্থ- তহবিল দ্বারা দেশের মানুষের বিরাট পরিমাণ অভাবকে পূরণ করে তাদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এই অবলম্বিত পথটিই ছিল ভুল। তারই ইঙ্গিত আছে এ গল্পে কথকের বিশ্বকর্মার মন্দিরে পাঁচসিকে দক্ষিণা দেওয়ার মধ্যে এবং পাণ্ডার দ্বারা নোটবইয়ে তার হিসেব টুকে নেওয়ার মধ্যে।

কিন্তু এইভাবে যে বিশ্বকর্মার পূজা সেদিন শুরু হয় তা এদেশের মানুষকে নিষ্কর্মা করে অন্যের মুখাপেক্ষী করে তুলেছিল। অন্যের দানগ্রহণ বা ভিক্ষাবৃত্তির প্রবণতা তাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। তাই মন্দিরে দক্ষিণা দেওয়ার পর দিনই কথককে অনাথতারিনী সভার সভ্যদের দ্বারা অত্যাচারিত হতে হয়েছে। তাদের নাচ আর গানের বর্ণনার মধ্যেই আছে তাদের কর্মপরিকল্পনার প্রতি তীক্ষ্ণ শ্লেষ—

" যত পেটে ধরে তার চেয়ে ভর পেটে,

টাকা পয়সার পকেট পড়ছে ফেটে—

হিসেব খতিয়ে দেখলে বুঝতে পার

অনাথজনের কত ধার তুমি ধার'

তারো, গরিবেরে তারো,

তারো, তারো, তারো।

'তারো তারো' করতে করতে ভীষণ চাঁটি পড়তে লাগল খোলে। ......সঙ্গে সঙ্গে বাজল কাঁসর; 'তারো তারো তারো' করে নাচ জুড়ে দিলে ছেলেগুলো। অসহ্য হয়ে এল। দেরাজ খুলে থলিটা বের করলেম! সাত দিনের না-কামানো-দাড়ি-ওয়ালা ওদের সর্দার উৎসাহিত হয়ে চাদর পেতে ধরলে। থলি ঝাড়তে বেরোল এক টাকা, ন আনা, তিন পয়সা। মাসের দু দিন বাকি, দর্জির দেনার জন্যে টানাটানি করে ঐটুকু রেখেছিলেম।

গান ছেড়ে গাল শুরু করলে। বললে, অগাধ টাকা, চিরটা দিন পায়ের উপর পা দিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে আছ; ভুলেছ, যেদিন মরবে সেদিন তোমার মতো লক্ষপতির যে দর আর আমাদের ছেঁড়া-ট্যানা-পরা ভিখিরিরও সেই দর।"[২৯১]

এই পথ বেয়েই একদিন ভারতীয় রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদী অরাজকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল—যাকে কেউ কেউ রাজনৈতিক ডাকাতি বলেও চিহ্নিত করেছেন। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সে ছবিকে চড়া রঙে এঁকে দেখিয়েছেন। মানুষকে নিজের শক্তি বা সামর্থ্যের উপর দাঁড়াবার সক্ষমতা অর্জন থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা দেশসেবার যে ভ্রান্ত আদর্শ গৃহীত হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে কলম ধরার নিতান্ত তাগিদ দেখা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। তাই 'সে'র গল্পের জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এই ভুল পথের গল্প বলেছেন নাতনি পুপুকে।

কিন্তু নিছক অর্থ-দানের বিনিময়ে সেদিন যারা কংগেসের নেতা সেজে বসেছিল তাদের সেই যোগ্যতাহীন নেতৃত্বকে এবং তাদের সভাসমিতি বা কর্মপ্রণালীর নির্থকতাকে তীক্ষ্ণশ্লেষে বিদ্ধ করেছেন গল্পকার গল্পের পরবর্তী অংশে—

" এ কথাগুলো পুরোনো ঠেকল, কিন্তু ঐ লক্ষপতি বিশেষণটাতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

এই হল শুরু। তার পরে ইতিমধ্যে পঁচিশটা সভার সভ্য হয়েছি। বাংলাদেশের সরকারি সভাপতি হয়ে দাঁড়ালেম। আদি ভারতীয় সংগীতসভা, কচুরিপানা-ধ্বংসন সভা, মৃতসৎকার সভা, সাহিত্যশোধন সভা, তিন চণ্ডীদাসের সমন্বয় সভা, ইক্ষুছিবড়ের পণ্যপরিণতিসভা, খন্যানে খনার লুপ্তভিটা-সংস্কারসভা, পিঁজরাপোলের উন্নতিসাধিনীসভা, ক্ষৌরব্যয়নিবারিণী-দাঁড়ি-গোঁফ-রক্ষণী সভা—ইত্যাদি সভার বিশিষ্ট সভ্য হয়েছি। অনুরোধ আসছে, ধনুষ্টঙ্কারতত্ত্ব বইখানির ভূমিকা লিখতে, নব্যগণিতপাঠের অভিমত দিতে, ভুবনডাঙায় ভবভূতির জন্মস্থাননির্ণয় পুস্তিকার গ্রন্থকারকে আশীর্বাদ পাঠাতে, রাওয়ালপিণ্ডির ফরেস্ট অফিসারের কন্যার নামকরণ করতে, দাড়িকামানো সাবানের প্রশংসা জানাতে, পাগলামির ওষুধ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রচার করতে।"[২৯২]

এ গ্রন্থের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে মাস্টারমশাইকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। দেশোন্নয়নে তিনি যে শিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন, শান্তিনিকেতনে তিনি যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, অনুরূপ ভাবনার প্রকাশ আছে এ গল্পে। এ গল্পে কথক জানিয়েছেন, তাঁদের মাস্টারমশাই ছিলেন তাদের বন্ধু। তিনি ছাত্রদের উপর অযথা চাপ সৃষ্টিতে পক্ষপাতী ছিলেন না। মাস্টারমশাইয়ের নির্দিষ্ট পথে ছাত্রদের তিনি চালনা করতেন না। বরং প্রতিটি ছাত্রদের মধ্যেকার স্বতন্ত্র সম্ভাবনাকে

বিকশিত করে তোলার জন্য পথাবলম্বন করতেন। 'সমঝদার বন্ধু' ছাত্র কথকের সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের কথোপকথনের নিম্নোক্ত অংশটি সেই পরিচয়কেই পরিবহন করে—

" ......ছাত্ররাই যদি আমার চোখ জুড়ে বসে তা হলে ক্লাসের আত্মপুরুষটা আড়ালে পড়ে যে।

'পড়ো বাবা আত্মারাম' এই বুঝি তোমার বুলি?

পড়াচ্ছি কই। আমার আত্মারামকেই টহল দেওয়াচ্ছি।

তোমার প্রণালীটি কিরকম।

গঙ্গাধারার বহে যাবার প্রণালী যেরকম। ডাইনে বাঁয়ে কোথাও ফসল, কোথাও শ্মশান, কোথাও শহর। এই নিয়ে গঙ্গামায়ীকে পদে পদে বিচার করতে যদি হত তা হলে আজ পর্যন্ত সগরসন্তানদের উদ্ধার হত না। যাদের যতটা হবার তাই হয়, বিধাতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তার চেয়ে বেশি হওয়াতে গেলেই চলা বন্ধ। আমার পড়ানো চলে মেঘের মতো শূন্য দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা খেতে, ফসল ফলে খেত-অনুসারে। অসম্ভবকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করে সময় নষ্ট করি নে বলে হেড্‌মাস্টার হন ক্ষাপা। ঐ হেড্‌মাস্টারটিকেও অত্যন্ত সত্য বলে গণ্য করলে অত্যন্ত ভুল করা হয়।"[২৯৩]

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া যান ১৯৩০-এ। সেখানকার শিক্ষাপ্রণালী তাকে মুগ্ধ করেছিল এই কারণে যে সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্ররাই ছিল সর্বেসর্বা। নিজেদের কৃতিত্বের বিচার থেকে শুরু করে নিজেদের যাবতীয় দোষ-ত্রুটির মূল্যায়ন বা বিচার করতো ছাত্ররাই। এই জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা তাই যেমন নিজেদের কৃতিত্বকে যথাযথ করে সুচিহ্নিত করার জন্য নিজের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকতো তামনি আনন্দের সঙ্গে পড়তে পড়তে নিজেদের স্বভাবের পথেই তারা তাদের প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজে পেত। বাঁধা পথ থেকে বেরিয়ে স্বাধীন শিক্ষার অবকাশ ছিল এতে। এতে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটতো। আমাদের দেশের শিক্ষায় যে দীর্ঘদিন ধরে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল, শিক্ষাকে বাহন না করে বহন করে নিয়ে চলার যে গত্যন্তরহীনতা রবীন্দ্রনাথকে 'অসন্তোষের কারণ'-এর মতো প্রবন্ধ রচনায় প্ররোচিত করেছিল, এই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় তার কোন অবকাশ ছিল না। লোকজীবনের সঙ্গে, পল্লীর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের নিবিড় ঘনিষ্টতার দ্বারা শিক্ষাকে বাস্তব জীবনানুকূল করে তোলার প্রয়াস ছিল এই শিক্ষায়। এই জাতীয় শিখাব্যবস্থাকেই আমাদের দেশের শিক্ষার মানোন্নয়নের চাবিকাঠি বলে নির্দেশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ গল্পের মাস্টারমশাই অনুরূপ শিক্ষারীতিরই অনুসরণ করেছেন। কথকের সঙ্গে পুপুর কথোপকথনের নিম্নোক্ত অংশই তার সাক্ষ্য বহন করে—

" পুপে বললে, মাস্টারমশায়ের ব্যবস্থা ছিল মজার রকমের। তিনি বলতেন, তোমাদের নিজের খবর নিজেই রাখবে; তোমাদের খবরদারি করবার কাজ আমার নয়। প্রতিদিনের পড়ার ফল নিজেরাই রাখতুম; মার্কা দেবার নিয়ম জানা ছিল।

তার ফল কী হল।

মার্কা বরঞ্চ কম করেই দিতুম।

কখনো কি ঠকাতে না।

বাইরের কেউ মার্কা দেবার থাকলে তাকে ঠকাবার লোভ হতে পারত। নিজেকে ঠকানো বোকামি। বিশেষত তিনি তো দেখতেন না।

তার পরে?

তার পরে প্রত্যেক তিন মাস অন্তর নিজেরাই হিসেব করে জানতুম উঠছি কি নাবছি।

তোমাদের কি সত্যযুগের হাইস্কুল, অত্যন্ত হাই? ফাঁকি দেবার লোকই বুঝি ছিল না?

মাস্টারমশাই ছিলেন অবিচলিত। তিনি বলতেন, সংসারে একদল লোক ফাঁকি দেবেই। কিন্তু, নিজের দায় যাদের নিজের হাতে, ওরই মধ্যে তারাই কম ফাঁকি দেয়। আমাদের শাস্তিও ছিল ঐ জাতের। বাইরে থেকে না। একদিন হাজিরি নাম-ডাক উপলক্ষে প্রিয়সখীর পার্সেন্টেজ বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলে ফেলেছিলুম। তিনি বললেন, অশুচি হয়েছ, প্রায়শ্চিত্ত কোরো। তিনি জানতেও চাইতেন না করেছি কিনা।

প্রায়শ্চিত্ত কি করেছিলে।

নিশ্চয়ই করেছিলুম।"[২৯৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাচিন্তায় এভাবেই বৌদ্ধিক শিক্ষার সঙ্গে নৈতিক ও ব্যবহারিক শিক্ষাকেও একসঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার আয়োজন রাখতে চেয়েছিলেন। কেননা এর দ্বারা আদর্শ মানববিশ্ব স্থাপনার উদ্দেশ্যটুকুও সফল হবে। সহজ অভিজ্ঞতার দ্বারা ইচ্ছার সংস্কারমুক্তির পথে হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ব্যাপ্তি চেয়েছিলেন। গল্পে মাস্টারমশাই-কানাই সংবাদে সেই সত্যই বিচিত্রভাবে ধরা আছে।

সমালোচক তাই বলেছেন—“ ...কাঁকড়া, চিংড়ি, পিড়িংশাক, সজনে ডাঁটা, চিচিঙ্গে নিয়ে রুচির বৈপ্লবিক প্রসারের আয়োজন। তাঁর ভাষায়—নাকি এমনি করে ভোজের ব্যাপারে নিজের ইচ্ছার সঙ্কীর্ণতা ঘুচে যায়—ঘটে অধিকারব্যাপ্তি। শুধু খাদ্যের ক্ষেত্রে নয়, এ বোধ জীবনের মূলে।”[২৯৫]

‘গল্পসল্প’ গ্রন্থের বেশ কয়েকটি গল্পেও ধরা আছে রবীন্দ্রনাথের দেশ তথা পল্লীউন্নয়ন ভাবনার নির্যাস। অনুরূপ একটি গল্প হল ‘ধ্বংস’। এ গল্পে বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে বিশ্বের পল্লীগুলি কীভাবে তার শিল্প, শ্রী, শান্তি হারিয়ে ক্ষয়িষ্ণুতার গভীরে তলিয়ে যাচ্ছিল তার ছবিকে এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ মানবসভ্যতার অনুকূলে যন্ত্রের ব্যবহারের কথা বলেছিলে। কিন্তু বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যন্ত্রসভ্যতার সে বিকাশকে নিজেদের লোভ, স্বার্থ আর হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থতার কাজে ব্যবহার করে দেশের শিল্প-সংস্কৃতি-অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তুলছিল তার ছবি আছে এ গল্পে। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় পল্লীগুলির পারিবারিক জীবনের সুখ ও শান্তির বাতাবরণ তাতে ভেঙে পড়েছিল।

প্যারিস শহর থেকে অল্প দূরে বাবা পিয়ের শোপ্যাঁ এবং মেয়ে ক্যামিল গাছপালার বাগান নিয়ে সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। “ চেস্টনাট গাছের তলায় ওদের ছোট্ট এই ঘরটি সেবায় শান্তিতে ছিল মধুমাখা। ওদের বাগানের ছায়ায় চা খেতে খেতে পাড়ার লোক সে কথা জানিয়ে যেত। ওরা জবাবে বলত, অনেক দামের আমাদের এই বাসা, রাজার মণিমাণিক্য দিয়ে তৈরি নয়, তৈরি হয়েছে দুটি প্রাণীর ভালোবাসা দিয়ে, আর-কোথাও এ পাওয়া যাবে না।”[২৯৬]

কিন্তু জার্মানীর সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধলে রাষ্ট্রীয় শক্তি পিয়েরকে জোর করে যুদ্ধে টেনে নিয়ে যায়। ভেঙে যায় পারিবারিক জীবনের শান্তি। সেই ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় তাদের পল্লীগৃহটিও একসময় যুদ্ধের গোলায় ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। প্রাণ হারায় ক্যামিলা। ভেঙে যায় জ্যাক-ক্যামিলার প্রেমের জগৎটিও। পল্লীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোটিও তাতে ভেঙে পড়ে। যন্ত্রসভ্যতার এই জাতীয় বিকাশের বিরোধিতা করে পল্লীসংগঠক রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদ বা মানবতাবিরোধী প্রগতিকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করে লিখেছেন—

“ সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসাব করে । লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল পঁচিশ মেইল তফাত থেকে। একে বলে কালের উন্নতি।

সভ্যতার কত যে জোর, আর-এক দেশে আর-একবার তার পরীক্ষা হয়েছে। তার প্রমাণ রয়ে গেছে ধুলার মধ্যে, আর-কোথাও নয়। সে চীনদেশে। তাকে লড়তে

হয়েছিল বড়ো দুই সভ্য জাতের সঙ্গে। পিকিন শহরে ছিল আশ্চর্য এক রাজবাড়ি। তার মধ্যে ছিল বহু-কালের জড়ো করা মন-মাতানো শিল্পের কাজ। মানুষের হাতের তেমন গুণপনা আর-কখনো হয় নি, হবেও না। যুদ্ধে চীনের হার হল; হার হবার কথা, কেননা মার-জখমের কার্‌দানিতে সভ্যতার অদ্ভুত বাহাদুরি। কিন্তু হায় রে আশ্চর্য শিল্প, অনেক কালের গুণীদের ধ্যানের ধন, সভ্যতার অল্পকালের আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়েমিড়ে গেল কোথায়। পিকিনে একদিন গিয়েছিলুম বেড়াতে, নিজের চোখে দেখে এসেছি। বেশি কিছু বলতে মন যায় না।"[২৯৭]

'ম্যানেজারবাবু' গল্পের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গেঁথে তুলেছেন পল্লীর জমিদার ও প্রজার সম্পর্কের এক খতিয়ান। এ গল্পের শুরুতেই আছে জমিদারের সেরেস্তায় 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানের বর্ণনা—"সেদিন ছিল যাকে বলে জমিদারি সেরেস্তার 'পুণ্যাহ', খাজনা-আদায়ের প্রথম দিন। কাজটা নিতান্তই বিষয়-কাজ। কিন্তু, জমিদারি মহলে সেটা হয়ে উঠেছে একটা পার্বণ। সবাই খুশি—যে খাজনা দেয় সেও, আর যে খাজনা বাক্সতে ভর্তি করে সেও। এর মধ্যে হিসেব মিলিয়ে দেখবার গন্ধ ছিল না। যে যা দিতে পারে তাই দেয়, প্রাপ্য নিয়ে কোন তক্‌রার করা হয় না। খুব ধুমধাম, পাড়াগেঁয়ে সানাই অত্যন্ত বেসুরে আকাশ মাতিয়ে তোলে। নতুন কাপড় পরে প্রজারা কাছারিতে সেলাম দিতে আসে।"[২৯৮] রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্ব নেবার পর এই জাতীয় অনুষ্ঠানকে নিছক জমিদারী স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত উদ্ভাবিত একটি অনুষ্ঠান হিসেবে না দেখে তাকে রাজা-প্রজার মিলনের একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠান করে তুলতে চেয়েছিলেন। তারই আভাস আছে এ গল্পের সূচনার 'পুণ্যাহ'এর বর্ণনার মধ্যে।

পাশপাশি রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, জমিদার বা তার কর্মচারীরা নিজেদের শক্তির প্রকৃত আধার সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে প্রজাদের প্রতি কি নৃশংস আচরণ করতো। এ গল্পের নায়েব মিশির সর্দারকে জসীম মণ্ডলের জমির ফসল রক্ষার জন্য একা মিশির সর্দারকে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য নিজের অহং চেতনাকে চরিতার্থ করা এবং প্রতিবেশী জমিদারের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করা। এই অবসরে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন জমিদার সম্প্রদায়ের এই পারস্পরিক বিরোধ বা ক্ষমতার কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে সাধারণ প্রজাকে কীভাবে পাশাপাশি দুই জমিদারের খাতায় প্রজা হিসেবে নাম লিখিয়ে রাখতে হয়। জসীম মণ্ডলের জমির সীমানা নিয়ে গণ্ডগোলের প্রশ্নে বিষয়টিকে গল্পে তুলে ধরেছেন গল্পকার। যাইহোক জসীমের ক্ষেতের ফসল রক্ষা করতে গিয়ে ধর্মরক্ষার জন্য মিশির বীরের মত প্রাণ দেয়। তখন দুধে স্নান করা অহংচেতনাসম্পন্ন নায়েবের মনোভাবটিকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—" তার দুধের স্নানের খ্যাতি—এ তো যে-সে লোকের

কর্ম নয়। কিন্তু, নিমক খেয়েছে যখন তখন প্রাণ দেওয়া—এটা এতই কী আশ্চর্য। এমন তো ঘটেই থাকে। কিন্তু ,দুধে স্নান!”[২৯৯]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোভাবটিকে এই শ্লেষাত্মক উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। রাজা-প্রজার এ সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের কাছে কাম্য ছিল না। প্রজাই যে জমিদারের ক্ষমতা ও শক্তির মূল—এই চেতনাটিকে জমিদার সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দিতে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর প্রজাদের সম্মান ও মর্যাদা সংরক্ষণের কথা বলেছেন। গল্পের শেষাংশের কবিতাটি অনুরূপ চেতনারই বাহক হয়ে উঠেছে—

‘ তুমি ভাবো এই-যে বোঁটা
কিছুই বুঝি নয়কো ওটা,
ফুলের গুমোর সবার চেয়ে বড়ো—
বিমুখ হয়ে আজ যদি ও
আলগা করে বাঁধন স্বীয়
তখনি ফুল হয় যে পড়ো পড়ো।
বোঁটাই ওকে হাওয়ায় নাচায়,
অপমানের থেকে বাঁচায়,
ধরে রাখে সূর্যালোকের ভোজে;
বুক ফুলিয়ে দেয় না দেখা,
গোপনে রয় একা একা,
নিচু হয়ে সবার উপর ও যে।
বনের ও তো আদুরে নয়, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়,
গায়েতে ওর নাইকো অলংকার ;
রস জোগায় সে চুপে চুপে,

থাকে নিজে নীরস রূপে,
আপন জোরে বহে আপন ভার।
কাঁটা যখন উঁচিয়ে থাকে
অহিংস্র কেউ কয় না তাকে—
যতই কিন্তু করুক-না বদনাম,
পশুর কামড় থেকে যারে
বাঁচিয়ে রাখে বারে বারে
সেই তো জানে কাঁটার কত দাম।”[৩০০]

'বড়খবর' গল্পের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় অনুরূপ ভাবেরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন যা তার 'কালের যাত্রা' নাটকেও প্রকাশ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ দেশের শ্রমজীবী মানুষের শক্তির কথা বারে বারে বলেছেন। তাদের মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতা, বিভেদ বা সংঘশক্তির অভাবই যে তাদের দুরবস্থার কারণ বা তাদের শোষিত হওয়ার কারণ তাও তিনি জানিয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের এই সাধারণ মানুষের মধ্যেকার শক্তিকে জাগিয়ে তোলার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাদের সংঘশক্তিই যে দেশের ধারক ও বাহক শক্তি, তাদের হাত ধিরেই যে একদিন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে তার কথা একাধিক নাটক-গল্প-উপন্যাসেই বলেছেন। এ গল্পেও রূপকের ছলে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ কথাই বলেছেন—

“ মহাজনি নৌকোয় ঘোরতর ঝগড়া চলছে পালে আর দাঁড়ে। দাঁড়ের দল ঠক্‌ঠক্‌ করতে করতে মাঝির বিচারসভায় এসে এসে উপস্থিত, বললে, এ তো আর সহ্য হয় না। ঐ যে তোমার অহংকেরে পাল, বুক ফুলিয়ে বলে আমাদের ছোটোলোক। কেননা, আমরা দিনে রাতে নীচের পাটাতনে বাঁধা থেকে জল ঠেলে ঠেলে চলি। আর উনি চলেন খেয়ালে, কারও হাতের ঠেলার তোয়াক্কা রাখেন না। সেইজন্যেই উনি হলেন বড়োলোক। তুমি ঠিক করে দাও কার কদর বেশি। আমারা যদি ছোটোলোক হই তবে জোট বেঁধে কাজে ইস্তফা দেব, দেখি তুমি নৌকা চালাও কী করে।”[৩০১]

এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে এনে ধনের সুষম বন্টনের উপর জোর দিয়েছিলেন, সমবায়ের মূল্যমানতার উপর জোর দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের নাটক-গল্পে সামাজিক মূল্যমানতার প্রশ্নে শ্রমজীবী মানুষের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে গেছে। সারা পৃথিবীর সমাজ-অর্থনীতির পরিবর্তমানতার প্রশ্নে , বিপ্লব-বিদ্রোহের সংগঠক হিসেবে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের যে উজ্জীবন রচিত হয়ে চলছিল তার সাড়া রবীন্দ্রচিত্তকেও স্পর্শ করেছিল। এদের হাত ধরেই যে একদিন আমাদের দেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে—একথা রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করেছিলেন। এই বড়খবরটিকেই রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন এ গল্পের সংহত পরিসরে—" কিন্তু লক্ষণ ভালো নয়।। দাঁড়গুলোর মজবুত হাড়, এখন কাত হয়ে আছে, কোন্ দিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে, লাগাবে ঝাপটা, চৌচির হয়ে যাবে পালের গুমর। ধরা পড়বে দাঁড়েই চালায় নৌকো—ঝড় হোক, ঝাপটা হোক, উজান হোক, ভাঁটা হোক।"[৩০২]

উৎস নির্দেশ :

১. বউ-ঠাকুরানির হাট। রবীন্দ্ররচনাবলী **১**ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২০। পৃ: ৬৩২।

২. উদ্ধৃতি সংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্ররচনাভিধান, ৭ম খণ্ড। দীপ প্রকাশন। ২০০৭। পৃ: ৪৬-৪৯।

৩. রাজর্ষি। রবীন্দ্ররচনাবলী **১**ম খণ্ড।পূর্বোক্ত। পৃ: ৭০৭।

৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৭১৫।

৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৭১৭।

৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৭১৯-২০।

৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৩৩-৩৪।

৮. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। রাতের তারা দিনের রবি। সম্পাদনা : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। আনন্দ। ১৪০৬। পৃ: ৭০—৭১।

৯. রাজর্ষি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৫৩।

১০. রাজর্ষি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৫৬।

১১. রাজর্ষি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৭০।

১২. রাজর্ষি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৭১।

১৩. তদেব।

১৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪০১। পৃ: ২২৩।

১৫. রাজর্ষি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৭৬।

১৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৮১।

১৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৮৩।

১৮. গ্রামে। ছবি ও গান। রবীন্দ্ররচনাবলী ১ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৯৭।

১৯. চোখের বালি। রবীন্দ্ররচনাবলী ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২০। পৃ: ৪৬৭।

২০. তদেব।

২১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫১৬।

২২. তদেব।

২৩. গোরা। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১ । পৃ: ৩৮৪ ।

২৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৭-৮৮।

২৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৮।

২৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯২।

২৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯১।

২৮. নেপাল মজুমদার। ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ১ম খণ্ড।
দেজ। ১৯৯৫। পৃ: ৩২৩।

২৯. গোরা। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৮।

৩০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০৫-০৬।

৩১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০৬।

৩২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০৯-১০।

৩৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪১৫।

৩৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৪৬।

৩৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪১৬।

৩৬. পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪৩০।

৩৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩০-৩১।

৩৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩৭।

৩৯. তদেব।

৪০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩৭-৩৮।

৪১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮১।

৪২. উদ্ধৃতি সংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র রচনাভিধান,৭ম খণ্ড।পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬৯।

৪৩. গোরা। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৩৯।

৪৪. তদেব।

৪৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৩৮।

৪৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৫০।

৪৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৬৩-৬৪।

৪৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৪০।

৪৯. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। গোরা উপন্যাসের দেশ, কাল। রবীন্দ্রনাথ : সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে। আনন্দ। ১৪০০। পৃ : ১৪৯-১৫০।

৫০. গোরা। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩৮।

৫১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮১।

৫২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩৯।

৫৩. পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪৪২।

৫৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৫৮-৫৯।

৫৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৫৪।

৫৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮০।

৫৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮৩।

৫৮. পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪৮৩-৮৪।

৫৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৫৯।

৬০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৭২।

৬১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৬০৭।

৬২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৬১০-৬১১।

৬৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮২।

৬৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৫৮।

৬৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮৫।

৬৬. তদেব।

৬৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮৩।

৬৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮৮।

৬৯. তদেব।

৭০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮৯।

৭১. চতুরঙ্গ। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৪২৬।

৭২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪২৮-৪২৯।

৭৩. বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। জ্যাঠামশায়। রবিতীর্থে । মূলগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। ১৯৯১। পৃ: ২৫৪-৫৫।

৭৪. চতুরঙ্গ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪২৯।

৭৫. তদেব।

৭৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩০।

৭৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩৬।

৭৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৫৭।

৭৯. বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। জ্যাঠামশায়। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৫৮-৫৯।

৮০. গোরা। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৫৮।

৮১. তদেব।

৮২. বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। চতুরঙ্গের রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৬২।

৮৩. গোরা। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৫৮।

৮৪. বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। চতুরঙ্গের রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৬৩।

৮৫. ঘরে বাইরে। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৪৭৫।

৮৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮০-৮১।

৮৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮১ ।

৮৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪০৬। পৃ: ৫৪৮।

৮৯. ঘরে বাইরে। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮১ ।

৯০. তদেব।

৯১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮১-৮২ ।

৯২.পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৩১ ।

৯৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৩২-৩৩ ।

৯৪. উদ্ধৃতি সংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র রচনাভিধান,৮ম খণ্ড। দীপ প্রকাশন। ২০১১।
পৃ: ৭৮।

৯৫. ঘরে বাইরে। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৩৩ ।

৯৬. তদেব।

৯৭. পূর্বোক্ত। পৃ; ৫২৮-২৯ ।

৯৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮২।

৯৯. তদেব।

১০০. তদেব।

১০১. শঙ্খ ঘোষ। আমি। নির্মাণ আর সৃষ্টি। শঙ্খ ঘোষের গদ্য সংগ্রহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড। দেজ।
২০০২। পৃ: ২৫৮-৬০।

১০২. ঘরে বাইরে। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮৭-৮৮।

১০৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮৮-৮৯।

১০৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৯১।

১০৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫১৮।

১০৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫২৩।

১০৭. উদ্ধৃতি সংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র রচনাভিধান,৮ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১০৮।

১০৮. ঘরে বাইরে। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫২৪।

১০৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৩২।

১১০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৩২।

১১১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৩৭-৩৮।

১১২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৩৫।

১১৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৪০।

১১৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৪৬।

১১৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৪৮-৪৯।

১১৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৪৯-৫০।

১১৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৬৯-৭০।

১১৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৬৯।

১১৯. তদেব।

১২০. ক্ষেত্র গুপ্ত। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড। গ্রন্থনিলয়। ২০০৮। পৃ: ৩৭৩।

১২১. উদ্ধৃতি সংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র রচনাভিধান,৮ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৮৮।

১২২. যোগাযোগ। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৩২৩।

১২৩. ক্ষেত্রগুপ্ত। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ২য় খন্ড। গ্রন্থনিলয়।২০০৮। পৃ: ৩৭৩-৭৪।

১২৪. যোগাযোগ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২৩।

১২৫. ক্ষেত্র গুপ্ত। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭৪।

১২৬. যোগাযোগ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২৪।

১২৭. ক্ষেত্র গুপ্ত। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড।পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭৪।

১২৮. যোগাযোগ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২৫।

১২৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২৮।

১৩০. ক্ষেত্র গুপ্ত। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭৬।

১৩১. যোগাযোগ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪১-৪২।

১৩২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। রাতের তারা দিনের রবি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৭।

১৩৩. যোগাযোগ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪২।

১৩৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪৩।

১৩৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪৯।

১৩৬. ক্ষেত্রগুপ্ত। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮২।

১৩৭. যোগাযোগ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৫০।

১৩৮. ক্ষেত্রগুপ্ত। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭৩।

১৩৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮০-৮১।

১৪০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮২।

১৪১. চার অধ্যায়। রবীন্দ্র রচনাবলী,৭ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৩৮২।

১৪২. ছোটো ও বড়ো। কালান্তর, পরিশিষ্ট। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৫৬৪।

১৪৩. চার অধ্যায়। রবীন্দ্র রচনাবলী,৭ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৪।

১৪৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯১-৯২।

১৪৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০৮।

১৪৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৩।

১৪৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৮।

১৪৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০৯।

১৪৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০৮।

১৫০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৮-৯৯।

১৫১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০৪।

১৫২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪১৭।

১৫৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪১০।

১৫৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০৫।

১৫৫. তদেব।

১৫৬. উদ্ধৃতি সংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র রচনাভিধান, ৮ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৭৬।

১৫৭. ঘাটের কথা। গল্পগুচ্ছ। রবীন্দ্র রচনাবলী,৭ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪২৩।

১৫৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪২৫।

১৫৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪২৪।

১৬০. দেনা পাওনা। গল্পগুচ্ছ। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৮ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৪৯৫।

১৬১. তদেব।

১৬২. তদেব।

১৬৩. তদেব।

১৬৪. তদেব।

১৬৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৯৭-৯৮।

১৬৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৯৮।

১৬৭. জ্যোতির্ময় ঘোষ। কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ : তাঁর গল্প। দেজ পাবলিশিং। ২০০৯। পৃ: ৮৩।

১৬৮. পোস্টমাস্টার। গল্পগুচ্ছ। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৮ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৯৯।

১৬৯. বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীচিত্র। রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৬৪।

১৭০. পোস্টমাস্টার। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৯৯।

১৭১. রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫০৪।

১৭২. ব্যবধান। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫০৯।

১৭৩. খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫১৬-১৭।

১৭৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫১৫।

১৭৫. সম্পত্তি সমর্পণ। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫১৫।

১৭৬. তদেব।

১৭৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫২০।

১৭৮. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষা, ১ম খণ্ড। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ১৪০০। পৃ: ৩৩০-৩১।

১৭৯. ত্যাগ। গল্পগুচ্ছ। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৩০৪-৩০৫।

১৮০. উদ্ধৃতি সংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র রচনাভিধান, ৬ষ্ঠ খণ্ড। দীপ প্রকাশন। ২০০৬। পৃ: ১১৫।

১৮১. একরাত্রি। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩০৭।

১৮২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩০৮।

১৮৩. উদ্ধৃতি সংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র রচনাভিধান, ষষ্ঠ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৮১।

১৮৪. শাস্তি। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭৭।

১৮৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭৮।

১৮৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭৭।

১৮৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭৭-৭৮।

১৮৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭৯।

১৮৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮২।

১৯০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৩।

১৯১. সমস্যাপূরণ। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০০।

১৯২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৮।

১৯৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৯-৪০০।

১৯৪. ক্ষেত্রগুপ্ত। রবীন্দ্রগল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ। গ্রন্থনিলয়। ২০০২। পৃ: ৬১।

১৯৫. সমস্যাপূরণ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০০।

১৯৬. অনধিকার প্রবেশ। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ২৮৯।

১৯৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৯২।

১৯৮. মেঘ ও রৌদ্র। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৯২।

১৯৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৯৪।

২০০. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৯৯।

২০১. লোকহিত। কালান্তর। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৫৪৮।

২০২. মেঘ ও রৌদ্র। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৯৫।

২০৩. উদ্ধৃতি সংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র রচনাভিধান, ৬ষ্ঠ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২০৭।

২০৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রোপন্যাস : সময়ের চাকায়। দেশ, সাহিত্যসংখ্যা। ১৩৯৮ । পৃ: ১৪৪।

২০৫. মেঘ ও রৌদ্র। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৯৫।

২০৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩০৫।

২০৭. প্রায়শ্চিত্ত। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩১১।

২০৮. ক্ষেত্র গুপ্ত। রবীন্দ্রগল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। গ্রন্থনিলয়। ২০০২। পৃ: ৭৫-৭৬।

২০৯. দিদি। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪১।

২১০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৩৬।

২১১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪৩।

২১২. ঠাকুরদা। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৫৫।

২১৩. অতিথি। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭৫।

২১৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৩।

২১৫. পুত্রযজ্ঞ। গল্পগুচ্ছ। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৩১৩।

২১৬. রাজটীকা। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৩২।

২১৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৩৮।

২১৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৩৪।

২১৯. দুর্বুদ্ধি। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬৫-৬৬।

২২০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬৭-৬৮।

২২১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬৮।

২২২. যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭৬।

২২৩. তদেব।

২২৪. উলুখরের বিপদ। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭৮।

২২৫. ক্ষেত্রগুপ্ত। রবীন্দ্রগল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৩০।

২২৬. পণরক্ষা। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫০৮।

২২৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫১২।

২২৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫১৬।

২২৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫১৭।

২৩০. হালদারগোষ্ঠী। গল্পগুচ্ছ। রবীন্দ্ররচনাবলী ১২শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ।১৪১৭। পৃ: ৩০২।

২৩১. ক্ষেত্রগুপ্ত। রবীন্দ্রগল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৫৪-১৫৫।

২৩২. হৈমন্তী। গল্পগুচ্ছ।পূর্বোক্ত। পৃ: ৩১৪।

২৩৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩১৭।

২৩৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২০।

২৩৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২১।

২৩৬. স্ত্রীর পত্র। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২৯-৩৩০।

২৩৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৩০।

২৩৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৩৬।

২৩৯. নামঞ্জুর। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৬।

২৪০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৬-৩৯৭।

২৪১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৯।

২৪২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০১।

২৪৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০২।

২৪৪. সংস্কার। গল্পগুচ্ছ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০৫।

২৪৫. শেষকথা। তিনসঙ্গী। গল্পগুচ্ছ। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ ২৫৫।

২৪৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৫৬।

২৪৭. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র রচনাভিধান, ৬ষ্ঠ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৯৬।

২৪৮. বদনাম। গল্পগুচ্ছ। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৬৪।

২৪৯. বিদূষক। লিপিকা। গল্পগুচ্ছ। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৩৪৩।

২৫০. কর্তার ভূত। লিপিকা। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪৬।

২৫১. দুই উপমা। চৈতালি। রবীন্দ্ররচনাবলী ৩য় খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ২৮।

২৫২. কর্তার ভূত। লিপিকা। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪৭।

২৫৩. তোতাকাহিনী। লিপিকা। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪৮।

২৫৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪৯।

২৫৫. তদেব।

২৫৬. মুসলমানীর গল্প। গল্পগুচ্ছ। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৯।

২৫৭. জ্যোতির্ময় ঘোষ। কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ: তাঁর গল্প। দে'জ পাবলিশিং। ২০০৯। পৃ: ১৬৯।

২৫৮. ক্ষেত্রগুপ্ত। রবীন্দ্রগল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯৮।

২৫৯. সে। গল্পগুচ্ছ। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৭।

২৬০. তদেব।

২৬১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৮-৩৮৯।

২৬২.পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৯।

২৬৩. তদেব।

২৬৪. তদেব।

২৬৫. তদেব।

২৬৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯০।

২৬৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯১।

২৬৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯২।

২৬৯. তদেব।

২৭০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৪।

২৭১. ক্ষেত্রগুপ্ত। রবীন্দ্রগল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯৯।

২৭২. সে। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৬।

২৭৩. তদেব।

২৭৪. তদেব।

২৭৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৮।

২৭৬. তদেব।

২৭৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০৫।

২৭৮. ক্ষেত্রগুপ্ত। রবীন্দ্রগল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ২০২।

২৭৯. সে। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪১০-৪১১।

২৮০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪১২।

২৮১. ক্ষেত্রগুপ্ত। রবীন্দ্রগল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ২০২।

২৮২. সে। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪১৩।

২৮৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪১৪।

২৮৪. তদেব।

২৮৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪১৬।

২৮৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪১৭।

২৮৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪১৮।

২৮৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩১।

২৮৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩১-৪৩২।

২৯০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩২।

২৯১. তদেব।

২৯২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩২-৪৩৩।

২৯৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৫৪-৪৫৫।

২৯৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৫৫।

২৯৫. ক্ষেত্রগুপ্ত। রবীন্দ্রগল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ২০৫।

২৯৬. ধ্বংস। গল্পসল্প। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫০৭।

২৯৭. তদেব।

২৯৮. ম্যানেজারবাবু। গল্পসল্প। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৯৭।

২৯৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৯৮।

৩০০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৯৯।

৩০১. বড়খবর। গল্পসল্প। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮১

৩০২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮২।

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্র-প্রবন্ধে পল্লীউন্নয়ন ভাবনা

রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টিকর্মের একটি বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্য। গদ্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ দেশ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিমতের বস্তুনিষ্ঠ অভিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। জীবনের প্রথম পর্যায় থেকে শুরু করে জীবনের উপান্ত-অবধি নানা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশের প্রাণকেন্দ্র পল্লীর উন্নতি ও গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সেই চিন্তাস্রোতকে নিম্নোক্ত কতকগুলি স্বতন্ত্র শিরোনামে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হল।

ক. আত্মশক্তি :

রবীন্দ্রনাথের পল্লী-উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি বড় দিক ছিল মানুষকে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠা দান। এই ধারণাটি তাঁর ‘প্রথম গদ্য প্রবন্ধ’ ‘ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী’ থেকেই স্পষ্ট হতে শুরু করে। জাতীয়তাবোধ বা স্বদেশ চেতনা বাইরে থেকে আরোপিত একটি ব্যাপারমাত্র নয়। তাকে আপন চেতনা ও শক্তির দ্বারা নিজের ভিতরেই জাগ্রত করতে হয়। পল্লীর মানুষের মধ্যেকার যে অভাব তাকে দূর করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কেন পল্লীর মানুষকে আত্মশক্তিরই উপর নির্ভর হবার উপর জোর দিয়েছিলেন,একটি ঘটনাসূত্রে তার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন—

“এক সময়ে আমি মফস্বলে কোনো জমিদারি তত্ত্বাবধান-কালে সংবাদ পাইলাম, পুলিসের কোনো উচ্চ কর্মচারী কেবল যে একদল জেলের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে, তদন্তের উপলক্ষ করিয়া তাহাদের গ্রামে গৃহস্থদের মধ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। আমি উৎপীড়িত জেলেদের ডাকিয়া বলিলাম, তোরা উৎপাতকারীর নামে দেওয়ানী ও ফৌজদারি যেমন ইচ্ছা নালিশ কর্ , আমি কলকাতা হইতে বড়ো কৌঁসুলি আনাইয়া মকদ্দমা চালাইব। তাহারা হাত জোড় করিয়া কহিল, কর্তা, মামলায় জিতিয়া লাভ কী। পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে আমরা ভিটায় টিকিতেই পারিব না।

আমি ভাবিয়া দেখিলাম, দুর্বল লোক জিতিয়াও হারে; চমৎকার অস্ত্রচিকিৎসা হয়, কিন্তু ক্ষীণ রোগী চিকিৎসার দায়েই মারা পড়ে। তাহার পর হইতে এই কথা আমাকে বারংবার ভাবিতে হইয়াছে—আর-কোনো দান দানই নহে, শক্তিদানই একমাত্র দান।”[১]

‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টিকে গাঢ় রঙে চিত্রিত করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। সেদিনের দেশহিতৈষীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই চেতনা-প্রসৃতিকে দেখতে পাওয়া যায়নি। দেশহিতৈষি মানসিকতা থাকলেও তাঁদের অবলম্বিত পথ ভ্রান্ত ছিল বলেই তাঁদের ডাকে দেশের মানুষ সেদিন সাড়া দেয়নি। গীতিকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তার পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ-প্রবন্ধে লিখেছেন—“ভারতমাতা,যবন,উঠ,জাগো,ভীষ্ম,দ্রোণ প্রভৃতি শুনিয়া শুনিয়া আমাদের হৃদয় এত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে যেও-সকল কথা আর আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। ক্রমে যতই বালকগণ ‘ভারত ভারত’ চীৎকার বাড়াইবেন ততই আমাদের হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইবে! এই নিমিত্ত যাঁহারা ভারতবাসীদের দেশহিতৈষিতায় উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত আর্যসংগীত লেখেন, তাঁহাদের ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিই, তাঁহাদের প্রয়াস দেশহিতৈষিতার প্রস্রবণ হইতে উঠিতেছে বটে কিন্তু তাঁহাদের সোপান হাস্যজনক। তাঁহারা বুঝেন না ঘুমন্ত মানুষের কর্ণে ক্রমাগত একই রূপ শব্দ প্রবেশ করিলে ক্রমে তাহা এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে তাহাতে আর তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। তাঁহারা বুঝেন না যেমন ক্রন্দন করিলে ক্রমে শোক নষ্ট হইয়া যায় তেমনি সকল বিষয়েই।”[২] অনুরূপ ভণ্ড দেশ হিতৈষিতার ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘সমাজ’ গ্রন্থের ‘চেঁচিয়ে বলা’ প্রবন্ধেও।

১৩০৮-এ রবীন্দ্রনাথ ‘বঙ্গদর্শনে’র পাতায় নেশন তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি সমাজপ্রধান সভ্যতার গুণগান রচনা করেছিলেন। কিন্তু এখন ইংরেজ স্বার্থপরতার সংঘাতে দেশীয় স্বার্থপরতা অর্থাৎ নেশন বা ‘পলিটিক্যাল স্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদায়’-এর উদ্ভব অনিবার্য জেনে দেশের মানুষকে সাবধান করতে চেয়েছেন।জানিয়েছেন—“ যাহা হউক আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে—কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্য পদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে—আমাদের চিত্তকে আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে; আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে।”[৩] রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার কারণ ব্যাখ্যা করে অশোক সেন জানিয়েছেন—

“ ‘নেশন’, ‘ন্যাশনাল’ নিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রলোকের তখন প্রবল উৎসাহ। আন্দোলনেও তাঁরাই তৎপর। দেশজোড়া বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় তারা নেহাত ছোটো

এক অংশ, নিজেদের অবস্থার সঙ্গে অনেকের বিরাট ব্যবধান। দাবিদাওয়ার পরিসরও নিজেদের স্বার্থে সীমাবদ্ধ। তাই 'নেশন' কথাটির সঙ্গে কোনো সর্বহিতের সম্ভাবনাকে, সার্বজনিক ধ্যানধারণার তাৎপর্যকে মেলাতে পারছেন না রবীন্দ্রনাথ। এমনও ভেবেছেন তিনি যে 'জাতীয়' শব্দটির প্রয়োজনে নানা ভাষা, নানা ধর্ম, আরো সব ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের বাস্তব মুছে ফেলবার আশঙ্কা আছে, তার সঙ্গে কোনো শক্তিশালী অংশে যদৃচ্ছ আধিপত্যের অভিলাষ জুড়তে পারে। ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভারতব্যাপী বিস্তার তৈরি করেছে এক সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তির ঐক্য। সেখানে অজস্র পার্থক্যের মধ্যে কোনো সজীব সামঞ্জস্যের পরিচয় নেই। সারা দেশে সে অভিজ্ঞতার ক্ষয়ক্ষতি কত বিপুল ও ব্যাপক তার জানাশোনাও সমানে বাড়ছে।

স্বদেশের এই মর্মান্তিক বাস্তবকে বাদ দিয়ে 'নেশন' শব্দটিতে সাড়া পান না রবীন্দ্রনাথ। জাতীয়তার নামে শিক্ষিত ভদ্রজনের সুযোগ-সুবিধার জন্য আন্দোলন বড়ো তুচ্ছ মনে। .... ”[৪]

রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—“ ইংরেজিতে যাহাকে স্টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে—ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।”[৫] আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করলেও বিদ্যাদান থেকে শুরু করে জলদান পর্যন্ত সকল কাজের দায়িত্ব ছিল ব্যক্তির উপর। ফলে এসকল কাজ এমনভাবে সমাজ সম্পন্ন করেছে যে নতুন নতুন শতাব্দীতে নতুন নতুন রাজার শাসন আমাদের দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেলেও আমাদের ধর্ম নষ্ট করে পশুতে পরিণত করতে পারেনি, সমাজ নষ্ট করে আমাদের লক্ষ্মীছাড়া করতে পারেনি। 'রাজায় রাজায় লড়াইয়ে অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্মরায়মান বেণুকুঞ্জে, আমাদের আম-কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।'[৬]

এই কারণে আমাদের দেশের সমাজ বা জনসাধারণ রাজার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়—যার বিপরীতটা পাশ্চাত্য দেশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এদেশে সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপর আশ্চর্যরূপে বিচিত্রভাগে ভাগ করে দেওয়া আছে। তাই পাশ্চাত্য দেশে রাজশক্তি বিপর্যস্ত হলে যেমন সমস্ত দেশের বিপর্যয় নেমে আসে আমাদের দেশে তেমনটা ঘটে না। ভারতবর্ষের রাজশক্তি তাই যুগে যুগে বহিঃশক্তির প্রভাবে বিপর্যস্ত

হলেও পল্লীগুলিতে সমাজ তার আপন গতিতে বহমান থেকেছে। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয় তবেই দেশের যথার্থ সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হয়। এদেশে তাই সমাজ সরকার-নিরপেক্ষ একটি স্বাধীন সত্তাকে বহন করে চলে। সে নিতান্ত নিষ্কর্মা হয়ে সকল দায়িত্ব স্টেটের হাতে তুলে দিয়ে বসে নেই।

রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' প্রকাশিত হবার পর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় কৃষ্ণকুমার মিত্র এর বিরূপ সমালোচনা করে এটিকে 'আকাশ কুসুম রচনা' বলে উল্লেখ করেন। 'নব্যভারত' পত্রিকায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর মধ্যে অধিক কাব্যিকতার প্রকাশ দেখে এটিকে 'একটি সামাজিক কবিতা' বলে ব্যঙ্গ করেন। বঙ্গবাসী পত্রিকায় বলাইচাঁদ গোস্বামীও প্রবন্ধটির সমালোচনা করে বেশকিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন—যার প্রত্যুত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ "'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট" রচনায়। এগুলি আসলে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ সমালোচনামাত্র। কিন্তু প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটিকে 'সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম খসড়া' হিসেবে নির্দেশ করেন। জানান—"আজকাল আমরা গ্রামসংস্কার বা পল্লীসংগঠনের কথা শুনি, তাহার সূত্রপাত যে এইখানেই, সেকথা অনেকেরই জানা নাই। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' সম্বন্ধে কর্মপদ্ধতি কিয়ৎপরিমাণে হিন্দু মেলার আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁহার শৈশবে হিন্দুমেলার যে আদর্শ গুণেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকেরা সে যুগে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই রবীন্দ্রনাথ প্রৌঢ়কালে দেশের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, নিজ জমিদারিতে পর্যন্ত ইহার পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের কাজ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত খসড়া তালিকা এই সময়ে মুদ্রিত হয়।"[৭]

পরাধীন দেশে সরকারের সাহায্য ছাড়াই স্বায়ত্বশাসিত গ্রাম-পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশ তথা পল্লীকে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানের অধিনায়কত্বে একটি কর্তৃসভা স্থাপনের কথা বলেছেন। এই কর্তৃসভা পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থা ও বেকারসমস্যা সমাধানের কাজে আত্মনিয়োগ করবে এবং সকলেরই বাধ্যতামূলক সহযোগিতা দাবি করতে পারবে। হিন্দু ও মুসলমানকে, শহরবাসী ও পল্লীবাসীকে এই কাজের ক্ষেত্রে এনে একত্রে সম্মিলিত করতে হবে। এই ব্যবস্থা রুশ শাসনাধীন জর্জিয়া,আর্মেনিয়া প্রভৃতি দেশেও প্রচলিত আছে। শাসকের উপেক্ষা ও নিষ্ঠুর উদাসীনতার বিকল্প হিসেবে স্বায়ত্তশাসিত গ্রামপরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

" জর্জীয়গণ, আর্মানিগণ প্রবল জাতি নহে—ইহারা যে-সকল কাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজে করিতেছে আমরা কি সেই-সকল কাজেরই জন্য দরবার করিতে দৌড়াই না? কৃষিতত্ত্বপারদর্শীদের লইয়া আমরা কি আমাদের দেশের কৃষির উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইতে

পারিতাম না? আমাদের ডাক্তার লইয়া আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধান-চেষ্টা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব? আমাদের পল্লীর শিক্ষাভার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না? যাহাতে মামলা –মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিষ্পত্তি দেশে চলে তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত? সমস্তই সম্ভব হয়, যদি আমাদের এই-সকল স্বদেশী চেষ্টাকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য একটা দল বাঁধিতে পারি।”[৮]

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে “ আত্মশক্তির সাধনা সমষ্টিগত কর্মকাণ্ড দাবি করে। তাই ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব পরিসর বা অটোনমির আদর্শ “স্বদেশী সমাজ” তত্ত্বে গুরুত্ব পায়নি। সেখানে যে ‘এক’ এর কথা বলা হয়েছে, তা ‘বহু’র সমন্বয়ে নির্মিত একক, ব্যক্তি-একক নয়। এই ‘এক’ চরিত্র সম্পন্ন (composite), অখণ্ড (monolithic), নয়। তার বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে বন্ধন যান্ত্রিক নয় নয়, আইন ও প্রশাসনের গিঁট তাদের বেঁধে রাখেনি। অ্যারিস্টটলের ‘পোলিস্’ (polis) এর মতো স্বদেশী সমাজ বিভিন্ন পেশা এবং নানা ধরণের ভূমিকার সমন্বয়ে গঠিত সমাজ। তার ‘খণ্ড’ গুলির মধ্যে আদান-প্রদান আছে, দ্বন্দ্ব নেই; বোঝাপড়া আছে, কাড়াকাড়ি নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ লক-হেগেল-মার্কস-গ্রামস্‌চি বর্ণিত ও বিশ্লেষিত সিভিল সোসাইটি নয়। এই সমাজ রাষ্ট্রের ভিত্তি নয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে এর কোন দ্বন্দ্বও নেই। “স্বদেশীসমাজ”কে রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় ‘সম্মতি’ (consent) বা বলপ্রয়োগের বৈধতা উৎপাদনের ক্ষেত্রও বলা যায় না। স্বদেশী সমাজ রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাদের অবস্থান সমান্তরাল—তা ঊর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত অবস্থান নয়।”[৯]

স্বদেশের কর্মভার যদি স্বদেশীয়রা গ্রহণ করে তাহলে গবর্মেণ্টের অফিস এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিঃশেষে গ্রাস করতে পারে না। আবেদনের দ্বারা সরকারের চাকরি অপেক্ষা পৌরুষের দ্বারা স্বদেশের কর্মক্ষেত্র বিস্তারের উপর রবীন্দ্রনাথ তাই অধিক জোর দিতে চেয়েছিলেন। এই কর্মক্ষেত্রে যে কর্মসংস্থান ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হয় তা দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে যেমন পরিপুষ্ট করে তেমনি দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধের ভিতকেও শক্ত ভিত্তি দান করে থাকে।সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে পল্লীগুলিতে কীভাবে একটি সুলভ সহজ বিচারব্যবস্থাও গড়ে তোলা যায় রুশীয় গবর্মেন্টের অধীনস্থ বহ্লীক প্রদেশের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তাঁর ‘অবস্থা ও ব্যবস্থা’ প্রবন্ধে।

আমাদের পল্লীর পঞ্চায়েতের দায়িত্বও যে স্বদেশীয়দের নিজেদের নেওয়া উচিত তার স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ নিজের যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। বলেছেন—“একসময়ে পঞ্চায়েত আমাদের দেশের জিনিস ছিল, এখন পঞ্চায়েত গবর্মেন্টের আফিসে-

গড়া জিনিস হইতে চলিল। যদি ফলবিচার করা যায় তবে এই দুই পঞ্চায়েতের প্রকৃতি একেবারে পরস্পরের বিপরীত বলিয়াই প্রতীত হইবে। যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃপ্রদত্ত নহে, যাহা গবর্মেন্টের দত্ত, তাহা বাহিরের হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একটা অশান্তির মতো চাপিয়া বসিবে—তাহা ঈর্ষার সৃষ্টি করিবে-এই পঞ্চায়েতপদ লাভ করিবার জন্য অযোগ্য লোকে এমন-সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে যাহাতে বিরোধ জন্মিতে থাকিবে—পঞ্চায়েত ম্যাজিস্ট্রেটবর্গকেই স্বপক্ষ এবং গ্রামকে অপর পক্ষ বলিয়া জানিবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বাহবা পাইবার জন্য গোপনে অথবা প্রকাশ্যে গ্রামের বিশ্বাসভঙ্গ করিবে—ইহারা গ্রামের লোক হইয়া গ্রামের চরের কাজ করিতে বাধ্য হইবে এবং যে পঞ্চায়েত এ দেশে গ্রামের বলস্বরূপ ছিল সেই পঞ্চায়েতই গ্রামের দুর্বলতার কারণ হইবে। ভারতবর্ষের যে-সকল গ্রামে এখনো গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রভাব বর্তমান আছে, যে পঞ্চায়েত কালক্রমে শিক্ষার বিস্তার ও অবস্থার পরিবর্তন-অনুসারে স্বভাবতই স্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে পারিত, যে-গ্রাম্যপঞ্চায়েতগণ একদিন স্বদেশের সাধারণ কার্যে পরস্পরের মধ্যে যোগ বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এমন আশা করা যাইত—সেই-সকল গ্রামের পঞ্চায়েতগণের মধ্যে একবার যদি গবর্মেন্টের বেনো জল প্রবেশ করে, তবে পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েতত্ব চিরিদিনের মতো ঘুচিল। দেশের জিনিস হইয়া তাহারা যে কাজ করিত গবর্মেন্টের জিনিস হইয়া তাহার সম্পূর্ণ উলটারকম কাজ করিবে।”[১০]

পল্লীউন্নয়ন কর্মে বা দেশোন্নয়নের ক্ষেত্রে তাই আর বিলম্ব না করে পল্লীর যাবতীয় দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই কাজে অগ্রসর হওয়ার বদলে সেদিন এদেশের মানুষ, বিশেষ করে দেশনেতারা, খুব বেশি করে বিদেশী শাসককেই অভিযুক্ত করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা আন্দোলনের পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহে ব্যস্ত ছিলেন। বিশেষ করে বয়কট আন্দোলনের উত্তেজনাকে রবীন্দ্রনাথ আদৌ সমর্থন করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ এর বিরোধিতা করে লিখেছিলেন—“স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই, তাহা ঈশ্বরদত্ত—স্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত। ......সে অধিকার গ্রহণ যদি না করি তবেই তাহা হারাই। নিজের সেই স্বাভাবিক অধিকার হারাইয়া যদি কর্তব্যশৈথিল্যের জন্য অপরের প্রতি দোষারোপ করি তবে তাহা লজ্জার উপরে লজ্জা। মঙ্গল করিবার স্বাভাবিক সম্বন্ধ যাহাদের নাই, যাহারা দয়া করিতে পারে মাত্র, তাহাদের নিকটই সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত স্বার্থসংকোচ প্রত্যাশা করিব, আর নিজেরা ত্যাগ করিব না, কাজ করিব না, এরূপ দীনতার ধিক্কার অনুভব করা কি এতই কঠিন।”[১১]

দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিও অনুরূপ আদর্শ অনুসরণের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর ‘দেশীয় রাজ্য’ প্রবন্ধে। “ এই প্রবন্ধে

'স্বদেশী' শাসনের পক্ষে যে যুক্তি উপস্থাপিত, তা অখণ্ডনীয় এবং তার নিশানা সেই সব রাজভক্ত (loyalist) নেতা যাঁরা মনে করতেন যে 'স্বশাসন' নয়, সুশাসনই ভারতের উন্নতির পথ এবং যা দিতে পারে একমাত্র বৃটিশ রাজ। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে:

"......Indians have not the capacities and qualities necessary for freedom and even if they succeed in developing the necessary fitness, they would do better for themselves and mankind by remaining as a province of the British Empire; any attempt to freedom will, they think, be a revolt against providence and can bring nothing but disaster on the country....." "[১২]

এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দেন যে সুশাসন কখনোই স্বশাসনের বিকল্প হতে পারে না। বৃটিশ শাসিত প্রদেশ গুলির তুলনায় দেশীয় রাজ্যগুলি পিছিয়ে পড়ছে কিনা সে প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর কাছে যে জিনিসটি প্রাধান্য পেয়েছে তা হল তাদের অগ্রগতি। কিন্তু সে অগ্রগতি স্বচেষ্টায় অর্জিত হবে, ব্রিটিশ রাজের কোলে পিঠে চড়ে নয়। ইংরেজকে অতিরিক্ত মাত্রায় ঈর্ষা-অবজ্ঞা বা মান্যতা দেবার পরিবর্তে তাই ভারতবাসীকে জাতীয় ঔৎকর্ষ সাধনের উপর জোর দেবার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। সমালোচক জানিয়েছেন—" রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, য়ুরোপীয় সভ্যতাকে নিকৃষ্ট বলে বর্জন করতে হবে একথা ঠিক না। আমাদের দেশের পক্ষে তা স্বাভাবিক বলেই আমাদের দেশীয় ব্যবস্থাপনার দিকে মনোযোগী হতে হবে। অথচ যেমন শিল্পে তেমনি সকল বিষয়েই আমরা বিদেশী প্রণালীকেই একমাত্র বলে বুঝছি। কেবল বাইরের সামগ্রীতে নয়, আমাদের মনে— এমন কি হৃদয়ে নকলের বিষবীজ প্রবেশ করছে। দেশের পক্ষে এ খুবই মারাত্মক।

এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভরসা দেশীয় রাজ্য। (ত্রিপুরায় গিয়ে এই ভাষণ দেবার যৌক্তিকতাও এইখানে) এইসব দেশীয় রাজ্যে দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্তি যেন নিজেকে মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রকাশ করতে পারে— এই প্রত্যাশা কবির।"[১৩] অপর একটি প্রবন্ধে তিনি তাই নিঃসঙ্কোচে জানিয়েছেন—"...আর দ্বিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে। সরকারি পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সর্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের

মাথায় না আসে—কারণ,এ স্থলে সাহায্য লইবার অর্থই দুর্বলের স্বাধীন অধিকারের মধ্যে প্রবলকে ডাকিয়া আনিয়া বসানো।”[১৪]

এভাবেই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন জাতিকে অন্তর্গত আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে। চিত্তের দাসত্ব ও সঙ্কীর্ণতাকে কাটিয়ে উঠে এক বলিষ্ঠ জাতি গড়ে তুলতে। বহু পূর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় ভাবনাকে নানা মন্তব্যসূত্রে প্রকাশ করেছেন। অনেক পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ‘পারিবারিক দাসত্ব’ প্রবন্ধে (১২৮৭, চৈত্র) আক্ষেপ করে বলেছিলেন—“ কিন্তু একথা আমরা কবে বুঝিব যে, যতদিনে না আমাদের হৃদয়ের অস্থিমজ্জাগত দাসত্বের ভাব দূর হইবে, ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার ভাব হৃদয়ের শোণিতস্বরূপে হৃদয়ে বহমান হইবে ততদিন আমরা দাসই থাকিব। আমরা যে প্রতি পরিবারে এক একটি করিয়া দাসের দল সৃষ্টি করিতেছি!”[১৫]

স্বদেশী যুগে দেশের উন্নয়নের জন্য যে ‘ন্যাশন্যাল ফণ্ড’ স্থাপিত হয়েছিল তাকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেননি। কারণ ফণ্ডের লক্ষ্য ছিল ‘political agitation’—যাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তির উপর। এই ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা যে আমাদের দেশ আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না তা রবীন্দ্রনাথ ভালো করে জানতেন। তিনি বলেছিলেন—“ইংরাজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভরতা পাইতে পারি না। আর, তাহাই যদি না পাই, তবে আসল জিনিসটাই পাইলাম না। কারণ ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরের ফল স্থায়ী। আমাদের সমস্ত জাতির যদি এই একমাত্র কাজ হয়, ইংরাজদের কাছে আবদার করা, ইংরাজদের কাছে ভিক্ষা করা, তাহা হইলে প্রত্যহ আমাদের জাতির জাতিত্ব নষ্ট হইতে থাকিবে, ক্রমশই আমাদের আত্মত্ব বিসর্জন দিতে হইবে।”[১৬] এই সচেতনতাটুকু প্রাথমিক ভাবে জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারের জন্য তিনি শিক্ষার সার্বিক প্রসারের উপর জোর দিয়েছিলেন।

সমকালে সাধারণ দেশবাসীর উপর ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে লেখেন ‘হাতে কলমে’ প্রবন্ধটি। স্বদেশ প্রেমের প্রকৃত যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীয়দের মনে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন সে কিন্তু নিছক উত্তেজনা নয়, নিছক মঞ্চ বেঁধে গলাবাজি নয় বা ‘Political agitation’ মাত্র নয়। হাতে কলমে যদি আমরা দেশের স্বদেশচেতনাকে গড়ে তোলার কাজে অংশগ্রহণ না করি, যদি আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি না করি, তাহলে বৃথাই রাজনীতির এজিটেশন। দেশের প্রাণকেন্দ্র পল্লীর উন্নয়নের এ এক জনহিতকর রূপ। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন পল্লীর অশিক্ষিত, দারিদ্র্যপীড়িত, ‘দেশ’-এর যথার্থ পরিভাষা অনুধাবনে অসমর্থ জনসাধারণের বাস্তবিকতার নিরিখে পল্লী বা দেশ উন্নয়নের এই-ই হল মহত্তম পন্থা। তাই রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে জানিয়েছেন—

"যদি স্বদেশ প্রেম শিক্ষা দিতে হয় তবে সে পিতামহদের নাম উল্লেখ করিয়া সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র বিকম্পিত করিয়া agitate করিয়া বাড়াইলে হইবে না! হাতে কলমে এক-একজন করিয়া স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতে হইবে। যে কৃষক, নাগরিক মহাশয়ের উদ্দীপক বক্তৃতা ও জাতীয় সংগীত শুনিয়া প্রথমে হাঁ করিয়াছিল, তাহার পর হাই তুলিয়াছিল, তাহার পর চোখ বুজিয়া ঢুলিয়াছিল ও অবশেষে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে সংবাদ দিয়াছিল যে কলিকাতার বাবু সত্যপীরের গান করিতে আসিয়াছেন; সেই যখন বিপদের সময়, অকূলপাথারে ডুবিবার সময় দেখিবে তাহার স্বদেশীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তখন তাহার যে শিক্ষা হইবে সে শিক্ষার কোনো কালে বিনাশ নাই। আমাদের সন্তানরা যখন দেখিবে চারিদিকে স্বদেশীয়েরা স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতেছে, তখন কি আর স্বদেশ প্রেম নামক কথাটা তাহাদিগকে ইংরাজের গ্রন্থ হইতে শিখিতে হইবে!"[১৭]

২৪ বছরের রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে যে কথাগুলি বলতে চেয়েছেন তার মূল্যমানতা অনস্বীকার্য। এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে রবীন্দ্রগবেষক নেপাল মজুমদার গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকের নির্দেশ দিয়েছেন—"অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য এজিটেশন আন্দোলনের বিরাট তাৎপর্যটি রবীন্দ্রনাথ যেন তখনো পর্যন্ত ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনাপর্বে আন্দোলন ঐ ধরণের এজিটেশনমূলক হইতে বাধ্য। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এইসব আন্দোলনের ক্রটিবিচ্যুতি ও নেতিমূলক যেসব বিষয়গুলির দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া জনসংযোগ জনজাগরণ ও শিক্ষা সমাজসংস্কার মূলক আন্দোলনের ডাক দিলেন, ঐতিহাসিক দিক হইতে উহার তাৎপর্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবু প্রায় এই সময় হইতেই রবীন্দ্রনাথের মডারেট রাজনীতির প্রতি বীতরাগ লক্ষ্য করা গেল।"[১৮]

যাইহোক, রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন, সচেতনতাবোধ বা পারস্পরিক সাহায্যের বাতাবরণ গড়ে উঠলেই ইউরোপে public- বলতে যাদের বোঝায় এদেশে তাদের গঠন সম্পূর্ণ হবে। নতুবা এদেশে যেহেতু public নেই তাই সভাসমিতির দ্বারা দেশোন্নয়ন সম্ভব নয় । ইউরোপে যাদের public বলে চিহ্নিত করা হয়, তারা কেবল নিজেদের দুরবস্থার জন্য অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করে না, নিজেদের দায়টুকু নিজেরাই গ্রহণ করার প্রয়াস নিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে সম্পূর্ণ এর বিপরীত অবস্থা। রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

"দেশের হিতের জন্য যেখানে যাহা পারি সমস্ত আদায় করিব। কেবল এইটুকু পণ করিব, সেই লওয়ার পরিবর্তে নিজেকে বিকিয়ে দিব না। যাহা বিশেষ ভাবে ইংরেজ গবর্মেন্টের কাছ হইতেই পাইবার তাহা ষোল-আনাই সেইখান হইতেই আদায় করিবার পুরা চেষ্টাই করিতে হইবে। না করিলে সে তো নিতান্তই ঠকা। নির্বুদ্ধিতাই বীরত্ব নহে।

কিন্তু আদায় করিবার কোন জোর থাকে না, আমরা যদি নিজের দায় নিজে স্বীকার না করি। দেশের যে-সকল কাজ আমরা নিজে করিতে পারি তাহা নিজেরা সাধ্যমত করিলে তবেই আদায় করাটা যথার্থ আদায় করা হয়, ভিক্ষা করা হয় না। এ নহিলে অন্যের কাছে দাবি করার আব্রুই থাকে না।”[১৯]

রাজনৈতিক স্বার্থে ইংরেজের সঙ্গে এদেশীয়দের আপোষকে রবীন্দ্রনাথ মন থেকে সমর্থন করেননি। তিনি অবশ্য ভেবেছেন—“ কর্তৃপক্ষ বুঝিয়াছেন যে,শুধু দমনের বিভীষিকায় অশান্তি দূর হয় না, দাক্ষিণ্যেরও দরকার। ...এই কথা যে ইংলণ্ডের মণীষী রাষ্ট্রনৈতিকেরা বুঝিতেছেন না তাহা আমি মনে করি না। বুঝিতেছেন বলিয়াই হোমরুলের কথাটা উঠিয়াছে।”[২০] আসলে “ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, ‘বড়ো ইংরেজ’ অর্থাৎ ইংলণ্ডের উদারচেতা শাসকসম্প্রদায় আমাদের জন্য সত্যি কিছু দিতে চান, কিন্তু মাঝখানে ‘ছোটো ইংরেজ’ অর্থাৎ ভারতের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আমলাতান্ত্রিক শাসকসম্প্রদায় এই সব শাসন-সংস্কারের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।”[২১] তবে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন একদিন নেটিভরা ইংরেজদের সঙ্গে মিলবে, পূর্ব পশ্চিমের সঙ্গে মিলবে। দেশের উন্নয়নের জন্য, চেতনার স্বাধীন বিস্তৃতির জন্য রবীন্দ্রনাথ পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়কে স্বীকার করেছেন। কিন্তু যেদিন এদেশীয়রা তাদের ‘ছোট’ স্বভাবকে, ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে কাটিয়ে বড় হতে পারবে, আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে সেদিনই সেই মিলন সম্ভব হবে বলে তাঁর অভিমত—

“ বর্তমানের চেহারা যেমনি হোক, তবু এই আশা এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিয়াছি যে, পশ্চিম পূর্বের সহিত মিলিবে। কিন্তু এইখানে আমাদেরো কর্তব্য আছে। আমরা যদি ছোট হইয়া ভয় পাই তবে ইংরেজও ছোট হইয়া ভয় দেখাইবে। ছোটো ইংরেজের সমস্ত জোর আমাদের ছোট শক্তির উপরে। পৃথিবীর সেই ভাবী যুগ আসিয়াছে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রকে দাঁড়াইতে হইবে। সেদিন, যে মারিতে পারিবে তার জিত হইবে না, যে মরিতে পারিবে তারই জয় হইবে। সেদিন দুঃখ দেয় যে-মানুষ তারই শেষ গৌরব। সেদিন মাংসপেশীর সহিত আত্মার শক্তির সংগ্রাম হইয়া মানুষ জানাইয়া দিবে যে সে পশু নয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম সে অতিক্রম করিয়াছে। এই মহত্ত্ব প্রমাণ করিবার ভার আমাদের উপর আছে।”[২২]

কিন্তু এই ছোটত্বের বোধ বা শূদ্রত্বের বোধ আমাদের মধ্যে এতটাই গভীর যে শূদ্রত্বকে ছাড়িয়ে ওঠার ক্ষেত্রে আজ আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশি বাধা দেয় ‘ছোট’রাই—“ আমরা বিশেষ শিক্ষা দীক্ষা ও ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের অধিকাংশ লোককেই খাটো করে রেখেছি। তারা যে খাটো এটা কোনো তর্ক বা বিচারের উপরে নির্ভর করে না, এটাকে বিধিমতে সংস্কারগত করে তুলেছি। এমনি হয়েছে যে, যাকে ছোটো করেছি সে

নিজে হাত জোড় করে বলছে আমি ছোটো। সমাজে তাদের অধিকারকে বড়োর সমতুল্য করতে চেষ্টা করতে তারাই সব চেয়ে বেশি আপত্তি করে।"[২৩]

কিন্তু 'বহুকাল পরাধীনতায় পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় মনুষ্যত্ব ও সাহস চূর্ণ হইয়া গেছে' বলেই যে এ-জাতীয় বিপত্তি ঘটে থাকে তা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন তাঁর 'রাজা প্রজা' গ্রন্থের 'সুবিচারের অধিকার' প্রবন্ধে। ইংরেজের কাছ থেকে সুবিচার প্রত্যাশার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এদেশের মানুষকে যথার্থ সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস অর্জনের কথা বলেছেন—"একবার নিজেদের মধ্যে অকপটচিত্তে সরলভাবে স্বীকার করিতে দোষ কী যে, এখনো আমাদের চরিত্রবল জন্মে নাই। আমরা দলাদলি ঈর্ষা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, আপনাদের মধ্যে কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলি বৃহৎ বুদ্‌বুদের মতো ফাটিয়া যায়; আরম্ভ ব্যাপারটা খুব তেজের সহিত উদ্‌ভিন্ন হইয়া উঠে, দুইদিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, পরে বিকৃত, পরে নির্জীব হইয়া যায়।"[২৪]

অতএব আত্মশুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজন। এই আত্মশুদ্ধির পথেই একদিন আত্মশক্তির অর্জন সম্ভব হবে বলে তাঁর বিশ্বাস। একারণেই রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের কাছ থেকে কতকগুলি অধিকার বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা আদায় অপেক্ষা দেশীয় লোকেদের চরিত্রসংশোধনের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কেবল ইংরেজদের কাছে ভিক্ষা করে আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ আসবে না। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ইংরেজদের কাছ থেকে কতকগুলি অধিকারের বিনিময়ে আমাদের অন্তরের লাঞ্ছনা দূরীভূত তো হবেই না, বরং অধিকার না পাবার ফলে মনের মধ্যে যে সান্ত্বনাটুকু ছিল, সেটুকুকেও বিসর্জন দিতে হবে। অতএব—"আমাদের অন্তরে শূন্যতা না পুরাইতে পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই। আমাদের স্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্য দূর হইবে এবং তখন আমরা তেজের সহিত, সম্মানের সহিত, রাজসাক্ষাতে যাতায়াত করিতে পারিব।"[২৫] ঘরের এবং সমাজের শিক্ষায় যখন আমরা যথার্থ চরিত্রবল বা মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারবো তখনি ইংরেজ আমাদের শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হবে এবং অপমানের সাহসটুকুও পাবে বলে রবীন্দ্রনাথের অভিমত। নতুবা ইংরেজ ও স্বদেশীয়দের মধ্যে রাজা-প্রজার যে ভেদ-জ্ঞান বা বিদ্বেষ তা পুরোপুরি মাত্রায় বজায় থাকবে।

'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্যপরিষৎ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানিয়েছেন,গ্রামে কোন উৎপাত ঘটিলে আমরা রাজ সরকারের কাছে দুজন পুলিশের লোক বেশি পেতে পারি। কিন্তু নিজেরাই যদি সমবেত হয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করি তবে রক্ষাও পাওয়া যায় , আর আত্মরক্ষার শক্তিকে হারাবার ভয়ও থাকে না। বিচারের সুযোগের জন্য দরখাস্ত করে আদালত বাড়িয়ে নিতে পারি, কিন্তু নিজেরা যদি পল্লীর সালিসি সভায়

মকদ্দমা মিটিয়ে নেবার বন্দোবস্ত করি তবে জটিলতা সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে মিটিয়ে ফেলা যায়। আমাদের পাড়ার, আমাদের গ্রামের, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অশন-বসন-সম্বন্ধীয় যাবতীয় সমস্ত শাসনব্যবস্থা আমরা যদি নিজেরা গড়ে তুলতে পারি তবেই যথার্থ খাঁটি জিনিসটি আমরা পেতে পারি। তার জন্য পরের অনুগ্রহ কিংবা রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তির কোন প্রয়োজনই হয় না। আমাদের নিজেদের ইচ্ছা, চেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকারের উপর এর প্রতিষ্ঠা অতি সহজেই হতে পারে। কিন্তু সেই কর্মোদ্যমকে স্বীকার করে নেবার সাহস সমকালে দেশবাসীর মধ্যে দেখতে পাননি প্রাবন্ধিক। রবীন্দ্রনাথ একারণেই সতর্ক করে বলেছেন—"আমাদের দেশ-জোড়া এই-সমস্ত কাজই আমাদের পথ চাহিয়া বসিয়া আছে; কিন্তু সে পথও আমরা মাড়াই না, পাছে সেই কর্তব্যের সঙ্গে চোখে চোখেও দেখা হয়। যাহাদের এমনি দুরবস্থা তাহারা পরের কাছ হইতে কোনো দুর্লভ জিনিস চাহিয়া লইয়া সেটাকে যথার্থ ভাবে রক্ষা করিতে পারিবে, এমন দুরাশা কেন তাহাদের মনে স্থান পায়?"[২৬]

খ. আনন্দের পথে সাংস্কৃতিক উজ্জীবন :

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন মডেলে শুধুমাত্র জীবিকার গুরুত্ব নয়, জীবনকেও অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মন্তব্য করেছেন—"বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কবির কাছে জীবিকার চাইতে জীবন ঢের বড় জিনিস। Living is a far greater thing than earning a living,এই কথা স্মরণ রেখে শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনাকে তিনি ব্যাপকতর রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। জীবিকার সমস্যাকে কোন কালেই উপেক্ষা করেননি। ......সেইসঙ্গেস্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে "সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দের-উৎসেরও সেই দশা।" শ্রীনিকেতনের মূল উদ্দেশ্য তাঁর ভাষাতে ব্যক্ত করতে গেলে , " এরূপ সৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশ্যে।" শ্রীনিকেতনকে বলেছেন—a lighted lamp, not a lamp of gold, 'প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার' সেই আমাদের মৃতপ্রায় পল্লীঅঞ্চলকে তিনি প্রাণময় এবং আনন্দময় করতে চেয়েছিলেন।"[২৭]

রবীন্দ্রনাথ তাই পল্লীর উন্নয়ন বা দেশোন্নয়নের পন্থা হিসেবে আনন্দের পথে সাংস্কৃতিক উজ্জীবন চেয়েছিলেন। কলকাতার আলোমুখরিত জনকোলাহলথেকে যখন পল্লীর মধ্যে পা রেখেছিলেন, তখন পল্লীর প্রাণহীন নিথর রূপকে নিজেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেখেছিলেন কর্মক্লান্ত দিনের শেষে বাংলার পল্লীগুলি কীভাবে আঁধারের দুর্ভেদ্য চাদরে মুখ ঢেকে নিথর হয়ে যায়, নিরানন্দ জীবনের অভিশাপ কীভাবে পল্লীগুলিতে শ্মশানের নিস্তব্ধতাকে বয়ে আনে। বুঝেছিলেন—" বিপুলসংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে

দেশ সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে রস অনেক কাল থেকে নিম্ন স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়ছে না, কেননা, বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েছি; গবাক্ষলণ্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিত সমাজের দিকে।"[২৮]

রবীন্দ্রনাথের চোখে এভাবেই প্রতিভাত হয়েছিল বাংলার উপেক্ষিতা পল্লীর বেদনাতুর রূপচ্ছবি। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, চাষিরা দিনের কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে এসেছে। একদিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর একদিকে বাঁশঝাড়ের মাঝে এক একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকার দ্বীপের মতো। সে দিক থেকে কেবল শোনা যায় খোলের শব্দ আর তারই সঙ্গে একটানা কীর্তনের কোনো একটা পদের হাজারবার তারস্বরে আবৃত্তি। এই দৃশ্য দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল— "এখানেও চিত্তজলাশয়ের জল তলায় এসে পড়েছে। তাপ বাড়ছে, কিন্তু ঠান্ডা করবার উপায় কতটুকুই বা! বছরের পর বছর যে অবস্থাদৈন্যের মধ্যে দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে যদি মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে, হাড়ভাঙা মজুরির উপরেও মন বলে মানুষের একটা-কিছু আছে যেখানে তার অপমানের উপশম, দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে হাঁফ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায়!"[২৯]

পল্লীর মানুষের মনের উপবাস ঘোচাবার জন্যে সেদিন কেউ তাদের কোন সাহায্য করে নি। তাদের কোনো আত্মীয় নেই। তারা নিজে নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনমতে একটুখানি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথ সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন—"আর-কিছুদিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে; সমস্ত দিনের দুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লি ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে; আর সেই সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।"[৩০] এইরূপ সমাজকে রবীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্ন খন্ডিত অভিশপ্ত সমাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন। জানিয়েছেন—"যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্যম্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান। দুই ভিন্ন জাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তের ভিন্নতা আরো বেশি প্রবল। একই নদীর এক পারের স্রোত ভিতরে ভিতরে অন্য পারের

স্রোতের বিরুদ্ধ দিকে চলছে; সেই উভয় বিরুদ্ধের পার্শ্ববর্তিতাই এদের দূরত্বকে আরো প্রবলভাবে প্রমাণিত করে।"[৩১]

এভাবেই গড়িয়ে চলে পল্লীর নিরানন্দ জীবন। এর বহুমাত্রিক প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জানিয়েছেন—"আমি যে পল্লীর কথা জানি সেখানে সর্বদা নিরানন্দের আবহাওয়া বইছে; সেখানে মন পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খোরাকের দ্বারা সতেজ হতে পারছে না। কাজেই নানা উত্তেজনা ও দুর্নীতিতে লোকের মন নিযুক্ত থাকে। মন যদি কথকতা পূজা-পার্বণ রামায়ণগানপ্রভৃতি নিয়ে সচেষ্ট থাকে তবে তাতে করে তার আনন্দরসের নিত্য জোগান হয় কিন্তু এখন সে-সকলের ব্যবস্থা নেই, তাই মন নিরন্তর উপবাসী থাকে এবং তার ক্লান্তি দূর করবার জন্য মানসিক মত্ততার দরকার হয়ে পড়ে। মনে করবেন না যে , জবরদস্তি করে, ধর্ম উপদেশ দিয়ে এই উভয়রূপ মদ বন্ধ করা যাবে। চিত্তের মূলদেশে আত্মা যেখানে ক্ষুধিত হয়ে মরতে বসেছে সেই গোড়াকার দুর্বলতার মধ্যেই যত গলদ রয়েছে, তাই বাইরেও নানা রোগ দেখা দিচ্ছে। পল্লীগ্রাম চিত্ত ও দেহের খাদ্য থেকে আজ বঞ্চিত হয়েছে, সেখানে এই উভয় খাদ্যের সরবরাহ করতে হবে।"[৩২]

সুতরাং নিছক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন পল্লীর আত্মিক উন্নয়নও। মনের আনন্দ বা স্ফূর্তি ছাড়া যে মানুষ কোন কাজেই সফলতা লাভ করতে পারে না একথা রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই জানতেন। তাই পল্লীর নিরানন্দ জীবনে আনন্দের সঞ্চারের দ্বারা তাদের চিত্তভূমিকে সরস ও সতেজ করে তুলতে চেয়েছিলেন। কেবল জীবিকার সমস্যা নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীতে আনন্দের মহার্ঘতাকে স্বীকার করে পল্লীর নিজস্ব সংস্কৃতির উজ্জীবন চেয়েছিলেন। সংস্কৃতি চর্চার দ্বারা নিরানন্দময় গ্রামীণ জীবনে আনন্দের বাতাবরণ আনতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজে এ বিষয়ে জানিয়েছেন—"পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরিপরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য পল্লীশিল্প পল্লীগান পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে, কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ-উৎসেরও সেই দশা। সেইজন্য যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরা যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহে প্রাণেও মরে। ......

আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্ক চিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব। নানাদিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এই রূপসৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে।"[৩৩] আসলে রবীন্দ্রমানস কেবল পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবনচর্যা নয়, তিনি চেয়েছিলেন এদেশীয় জীবনাদর্শের পথ

হেঁটে জীবনের মূলে আনন্দ ও বস্তুগত সুখের শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্যময় সহাবস্থান রচনা করতে।

রবীন্দ্রনাথ দেশের প্রাণকেন্দ্র নিরানন্দময় পল্লীগুলিতে চিত্তরস সঞ্চারের লক্ষ্যে মেলার আয়োজনের কথা বলেছেন। হিন্দুমেলার অভিজ্ঞতাই যে রবীন্দ্রনাথকে শিলাইদহ-শান্তিনিকেতন পর্বের একাধিক মেলার আয়োজনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ১৩১১-তে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—"আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ।যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।"[৩৪]

দেশের হৃদয়কে এক করার জন্য, গ্রাম-শহরের ব্যবধানকে মুছে ফেলার জন্য, দেশের যথার্থ কাছে পৌঁছোনোর জন্য সমকালীন প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স বা প্রাদেশিক সম্মেলনের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ মেলাকেই অধিকতর গুরুত্বে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু সমকালীন সময়ে আমাদের দেশে যে সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত ছিল তাদের অধিকাংশই ক্রমশ দূষিত হয়ে কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হয়ে উঠেছিল তাই নয়, কুশিক্ষারও আকর হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি যে মেলার আয়োজনের কথা বলেছেন তার চরিত্রপ্রকৃতি নির্দেশ করে নিজেই বলেছেন—" সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূর দূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক, কীর্তন-গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা যাইত।"[৩৫]

ভ্রাম্যমান মেলার কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। এই মেলার দ্বারা দেশের হৃদয়-সংযোগ বা সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাতে হবে। পাশাপাশি আনন্দের আয়োজনের দ্বারা দেশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জানিয়েছেন—"আমার বিশ্বাস, যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশের নানা স্থানে মেলা করিবার জন্য এক দল লোক প্রস্তুত হন—তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা, কীর্তন, কথকতা রচনা করিয়া সঙ্গে বায়োস্কোপ, ম্যাজিক-লণ্ঠন,

ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপর প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন—তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্‌বৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে—ইঁহারা সমস্ত দেশকে তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইঁহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।”[৩৬]

আনন্দের পথে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের এক বিশেষ প্রক্রিয়া হিসেবে পল্লী সাহিত্য চর্চা ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘মেয়েলি ব্রত’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ছড়া ও রূপকথা সংগ্রহের দৃষ্টান্ত দিয়ে জানিয়েছেন— “...যে-সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালোবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।”[৩৭]

১৩০৩-এ লেখা এ-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরো জানিয়েছিলেন—‘এই সকল সংগ্রহের দ্বারা ভবিষ্যতে যে কোনোপ্রকার গম্ভীর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, এমনো মনে করি না’। কারণ তখন রবীন্দ্রনাথ দেশের যে প্রাণকেন্দ্র পল্লী তার উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেছেন পুরোমাত্রায়। সেখানে পল্লীর মানুষের চেতনাজাগরণে ও তাদের নিরানন্দ জীবনে আনন্দের সঞ্চার ঘটানোর লক্ষ্যে পল্লীসাহিত্য সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাই জানিয়েছেন—“গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যে কল্পনার তান অধিক থাক্ বা না থাক্, সেই আনন্দের সুর আছে। ......সেইজন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্য হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়; তাহারাই ইহার ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রেমে ভরাট করিয়া তোলে। গ্রাম্য সাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির, গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে; সেইজন্যই বাঙালির কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে। বৈষ্ণবী যখন ‘জয় রাধে’ বলিয়া ভিক্ষা করিতে অন্তঃপুরের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায় তখন কুতূহলী গৃহকর্ত্রী এবং অবগুণ্ঠিত বধূগন তাহা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আসেন। প্রবীণা

পিতামহী, গল্পে গানে ছড়ায় যিনি আকণ্ঠ পরিপূর্ণ , কত শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় ও কৃষ্ণপক্ষের তারায় আলোকে তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়া গৃহের বালকবালিকা যুবকযুবতী একাগ্রমনে বহুশত বৎসর ধরিয়া যাহা শুনিয়া আসিতেছে বাঙালি পাঠকের নিকট তাহার রস গভীর এবং অক্ষয়।”[৩৮] এই রসের প্রবাহকে পল্লীর শুষ্ক চিত্তক্ষেত্রে প্রবাহিত করে পল্লীকে প্রাণচৈতন্যে পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

গ. উৎসবের আয়োজন :

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর নিরানন্দ স্তিমিত জীবনকে জাগিয়ে তোলার অভিপ্রায়ে নানা উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। তার প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি পূর্বের অধ্যায়সমূহে আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধসাহিত্যের আধারে অনুরূপ চিন্তাভাবনার পরিচয় নানাস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। ১২৯৯-এ লেখা একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন—“ আমাদের নীতিজ্ঞেরা আমোদ-আহ্লাদের উপর বড়োই নারাজ। কিন্তু আমি বলি যে, যদি অবৈধ অপবিত্র আমোদ হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে চাও তো তাহার পরিবর্তে বৈধ আমোদ-আহ্লাদটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সমাজে যদি বৈধ আমোদ-আহ্লাদের স্থান না রাখ তো লোকে স্বভাবত সমাজের বাহিরে অবৈধ আমোদ-আহ্লাদ অন্বেষণ করিবে, সহস্র নীতিজ্ঞানে আমোদ আহ্লাদের আকাঙ্খা পূরণ হইবে না।”[৩৯]

এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীর উন্নয়নমূলক প্রায় প্রতিটি মহৎ কার্যকে উৎসবের রূপ দিতে চেয়েছিলেন। অনুরূপ দুটি উৎসব হল হলকর্ষণ উৎসব এবং বৃক্ষরোপণ উৎসব। যে বৃক্ষের আশীর্বাদে এই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব ও ধারা বহমান, সেই আদিমাতা প্রকৃতিকে মানুষ একদা লোভরিপুর বশবর্তী হয়ে বিনাশে অগ্রসর হয়েছে। প্রকৃতির সুকোমল শান্তিময় অঞ্চলকে বিনাশ করে ইঁট-কাঠের বাসস্থান গড়ে তুলেছে, নগরের পত্তন ঘটিয়েছে। নাগরিক কলকারখানার দাবি মেটাতে চলেছে অকাতরে বৃক্ষকর্তন। এরই ফলে একদা যে উত্তর ভারত ছিল মুনি-ঋষিদের সুরম্য ছায়াসুশীতল বাসস্থান তা তরুবিরল হওয়ায় সেখানে গ্রীষ্মের দুর্বিষহ উৎপাত শুরু হয়েছে, কোথাও মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে, কোথাও বা মৃত্তিকাক্ষয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলার পল্লী থেকেই এর দৃষ্টান্ত চয়ন করে জানিয়েছেন—“ ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই-যে বোলপুরের ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে—একসময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য—সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের-হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহবান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে—আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তাঁর ফল, দিন তাঁর ছায়া।”[৪০]

রবীন্দ্রনাথ একারণেই অরণ্যদেবতার পূজায় পল্লীবাসীকে সম্মিলিত করতে চেয়েছিলেন। শ্রীনিকেতনে এই উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করা হতো। এই উৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—" আমাদের যা সামান্য শক্তি আছে তাই দিয়ে আমাদের প্রতিবেশে মানুষের কল্যাণকারী বনদেবতার বেদী নির্মাণ করব এই পণ আমরা নিয়েছি। আজকের উৎসবের তাই দুটি অঙ্গ। প্রথম, হলকর্ষণ—হলকর্ষণে আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্য, শস্যের জন্য; আমাদের নিজেদের প্রতি কর্তব্যের পালনের জন্য এই হলকর্ষণ। কিন্তু এর দ্বারা বসুন্ধরার যে অনিষ্ট হয় তা নিবারণ করবার জন্য আমরা কিছু ফিরিয়ে দিই যেন। ধরণীর প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য, তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য আমাদের বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন।"[৪১]

স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির পারস্পরিক বিভেদকে ভুলে একতাবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্যে, ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের কাজে আত্মনিয়োগের প্রয়োজনে বাঙালির জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজার বিজয়াসম্মিলনকে প্রতীকী উৎসব করে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কেননা বাঙালির দুর্গোৎসব ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত উৎসব। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ দূর করার লক্ষ্যে এই উৎসবকে একটি অসাম্প্রদায়িক চরিত্র দেবার পরামর্শ দেন তিনি। জানান—

"হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া-সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত করো। যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও, আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচি রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম্' গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক—একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো—

......বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।।"[৪২]

এ রচনায় হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক সম্মিলনের প্রয়াস-বিষয়ে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন—

" তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন জাতীয় আন্দোলন ক্রমশই হিন্দু প্রতীকগুলিকে অবলম্বন করছিল, যা বৃহত্তম মুসলমান সমাজকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। এখানে বিষয়টি তিনি সাধারণ ভাবে স্পর্শ করে গেছেন মাত্র কিন্তু ক্রমেই তিনি এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।"[৪৩]

ঘ. শিক্ষা :

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালে পল্লী-ভারতবর্ষের যে ছবি দেখেছিলেন তা অশিক্ষা-অজ্ঞানতার অন্ধকারে পরিপূর্ণ। শিক্ষাই যে ভারতীয়দের দুর্গতি মুক্তির একমাত্র সমাধান তাঁর চক্ষে সেদিন তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ১৩৩০-এ প্রবাসীতে প্রকাশিত 'সমাধান' প্রবন্ধে তিনি জানিয়ে ছিলেন—"অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন দুর্বল; অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন—শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ; অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারিনে বলেই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাহত; অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশ জোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটেই যখন আমাদের সমস্যা তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।"[৪৪]

রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই সার্বিক জনসংযোগের কথা বলেছিলেন। কতিপয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই দায়িত্ব নিতে হবে দেশের বৃহত্তর সংখ্যক অশিক্ষিত জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার। পল্লীর সাধারণ লোকসম্প্রদায়ের হিত করতে গেলে সর্বাগ্রে তাদের শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। তিনি জানিয়েছিলেন—" ...যতদিন তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না হইতেছে ততদিন তাহাদের প্রতি অন্যায় জমা হইয়া উঠিতেছে এবং সেই অন্যায়ের ফল আমরা প্রত্যেকে ভোগ করিতেছি এ কথা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বীকার না করিব ততক্ষণ দয়া করিয়া তাহাদের জন্য এক-আধটা নাইট স্কুল খুলিয়া কিছুই হইবে না। সকলের গোড়ায় দরকার লোকসাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা।"[৪৫]

জনসংযোগ বা শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্বের এই দিকটিকে স্বীকার করে নিয়েও কোন কোন সমালোচক বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিমত, প্রত্যক্ষ রাজনীতিকে বর্জন করে নিছক শিক্ষার উপর দেশোন্নয়নের ব্যাপারে নির্ভর করলে তাতে কখনোই সফলতা মিলতেই পারে না। অরবিন্দ পোদ্দার এ বিষয়ে জানিয়েছেন—"তাঁর এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করা যায়, বিশেষ করে জনজীবনের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপনের ঐকান্তিকতা সম্পর্কে। নিষ্ফল জিহ্বা আস্ফালন সম্পর্কে তাঁর বীতরাগ সময়োচিত; আর ইংরেজ ঘেঁসা রাজনৈতিক কোলাহলকে নিছক ভিক্ষাবৃত্তি

বলতেও তাঁর সঙ্গে কারো বিবাদের কোনো হেতু নেই। তবে তাঁর তৎকালীন চিন্তাধারায় একটা বিষয় যথার্থ গুরুত্ব লাভ করেনি, গণচেতনা উদ্বোধনের জন্য শিক্ষার প্রসার নিশ্চয়ই অপরিহার্য; কিন্তু প্রত্যক্ষ আন্দোলন বর্জন করে শুধু শিক্ষার উপর নির্ভরশীল হলে প্রার্থিত পরিবেশ সৃষ্টিতে যুগ-যুগান্তর কেটে যাবে। কারণ, শিক্ষায় আত্মসচেতনতা অর্জন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া দেশে রাজনৈতিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ সোচ্চার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অস্তিত্ব যদি না থাকে তা-হলে সাম্রাজ্যবাদ তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবেই এবং জাতীয় দাসত্বের শৃঙ্খলকে অধিকতর সুদৃঢ় করবে।”[৪৬]

সমালোচকের এ অভিযোগের সারবত্তাকে মেনে নেওয়া যেত, যদি একথা সত্য হত যে, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার প্রসারের জন্য কোথাও রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকটিকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। তিনি নিজেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। “ জাতীয় শিক্ষা প্রসারে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ও চিন্তাভাবনা ‘ডন’ সোসাইটির আর এক ছাত্র রাধাকুমুদ মুখার্জীর বক্তব্য থেকে থেকে স্পষ্টত লক্ষ করা যায়।...... অধ্যাপক হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় তাঁদের ‘ The Origins of the National Education Movement’ গ্রন্থে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন এভাবে, “ The leadership of the revolt was soon assumed by Rabindra Nath Tagore who fostered it and kept up its fire by his literary creation of national songs, a unique poetry of patriotism.””[৪৭]

আসলে প্রশ্নটি এখানে দুটি বিষয়ের মাত্রাগত প্রাধান্য দানকে ঘিরে। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, পল্লীর বা গ্রামের বৃহত্তর সংখ্যক মানুষকে বাইরে রেখে কীভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত করা সম্ভব। তার জন্যই তাদের শিক্ষার ব্যাপারে প্রাথমিক সার্বিক প্রয়াস নেওয়া প্রয়োজন। তাঁর এই বিশেষ মানসিকতার সমর্থন পাই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে। ‘সমাধান’ প্রবন্ধটি রচনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

“ কবির মতে সমস্যার সমাধান হইতেছে বুদ্ধির কর্ষণ; ‘ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের ক্ষেত্র কর্ষণ করে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ ভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুলতে পারলে তবেই সে সভ্যতা মনস্বী হয়।’ সর্বজনে স্বাধীন বুদ্ধি ও স্বাধীন শক্তি প্রকাশের সুযোগ পাইলে, জ্ঞান ও শক্তি সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বহুল পরিমাণে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইলে জাতি সর্বতোমুখী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। ‘ অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা চালিত হবার চিরভ্যাস নিয়ে মুক্তির বিপুল দায়িত্ব কোনো জাতি কখনো ভালো করে বুঝতেই পারবে না, বহন করা তো দূরের কথা।’ আমাদের ধর্ম ও সমাজ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লোকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অসম্ভবের আশায় বসিয়া থাকে; রাজনীতি ক্ষেত্রেও লোকে যাহাকে ‘ অলৈকিক শক্তিসম্পন্ন

ব'লে বিশ্বাস করে, তাঁর বাণীকে দৈববাণী ব'লে জেনে তারা ক্ষণকালের জন্যে একটা দুঃসাধ্য সাধনও করতে পারে।' কিন্তু তাহার দ্বারা স্থায়ী ফললাভ করা জাতির পক্ষে সম্ভব কিনা তাহাই বিচার্য। তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও মুক্তবুদ্ধির জোর বড় বেশি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া কবি মন্তব্য করিতেছেন। 'তারাও উচ্ছৃঙ্খলভাবে যা-তা মেনে নিতে প্রস্তুত, অন্ধ ভক্তিতে অদ্ভুতপথে অকস্মাৎ চালিত হতে তারা উন্মুখ হয়ে আছে; আধিভৌতিক ব্যাপারের আধিদৈবিক ব্যাখ্যা করতে তাদের কিছুমাত্র সংকোচ নেই;তারাও নিজের বুদ্ধি বিচারের দায়িত্ব পরের হাতে সমর্পণ করতে লজ্জা বোধ করে না, আরাম বোধ করে।'...... 'নিজের সতর্ক বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়।' ...... 'দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড়ো অথচ তার উপায়টা খুব ছোটো হবে, একথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকির 'পরে বিশ্বাস ; বাস্তবের 'পরে নয়, নিজের শক্তির 'পরে নয়।'"[৪৮]

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন আমাদের দেশের ইংরেজ প্রবর্তিত বেনিয়ান শিক্ষা ব্যবস্থা সেদিন কীভাবে গ্রাম শহরের মাঝে এক বিরাট বিচ্ছেদের ব্যবধান রচনা করে দিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন—"অন্য সকল দেশে আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে অল্পদিন হল। আমাদের দেশে যে জনশিক্ষা তাকে আবশ্যিক বলব না, তাকে বলব স্বৈচ্ছিক। সে অনেক কালের। তার পশ্চাতে কোনো আইন ছিল না, তাগিদ ছিল না; তার স্বতঃসঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে যেমন রক্তচলাচল হয় সর্বদেহে।

তার পরে সময়ের পরিবর্তন হল। ইতিমধ্যে শিক্ষিত সমাজ যখন রাজদ্বারের দিকে মুখ ফিরিয়ে মন্ত্রিসভায় প্রবেশাধিকারের আবেদন কখনো-বা করুণকণ্ঠে কখনো-বা কৃত্রিম আক্রোশে পেশ করছিলেন তখন তাঁদের পিছনের দিকে গ্রামে গ্রামে পিপাসার জল এল পাঁকের কাছে নেমে, এ দিকে শহরে শহরে দ্বারে দ্বারে ঝরতে লাগল কলের জল। আমরা বিস্মিত হয়ে বললেম, একেই বলে উন্নতি। দেশের যেটা বৃহৎ রূপ সেটা লুকোল আমাদের অগোচরে, যে প্রাণ যে আলো দেশের সর্বত্র বিকীর্ণ ছিল সেটা প্রতিসংহৃত হল ছোট ছোট কেন্দ্রে। ......

শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এন্‌লাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিত সমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হল সুজলা, সুফল্ টানাপাখা-শীতলা; সেইখানে মাথা তুললে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ।

দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এত বড় বিচ্ছেদের ছুরি আর-কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে। একে আধুনিকের লক্ষণ বলে নিন্দা করলে চলবে না। কেননা কোনো সভ্য দেশেরই অবস্থা এরকম নয়।"[৪৯]

আসলে ইংরেজ সরকার আমাদের দেশে যে শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল, তা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায়মাত্র ছিল। তা এদেশের প্রকৃতির পরিপূরক ছিল না কিছুতেই। এই শিক্ষা এদেশের শিক্ষার্থীর মানসগঠনকে যথাযথ নির্মাণ দিতে পারেনি বলেই শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মনে বহুকাল থেকে এক অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে। 'অসন্তোষের কারণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই জানিয়েছেন, এতকাল ইংরেজের স্কুলে পড়লেও আমাদের ছাত্রদশা কিছুতেই ঘোচেনি। বিদ্যা কেবল বাহির থেকে ভিতরে জমা হয়েছে, কিন্তু তাকে অবলম্বন করে নতুন কোন সৃষ্টি বা আবিষ্কারের যে কৃতিত্ব তা এদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে তেমন ভাবে দেখা যায়নি। পুঁথিগত যান্ত্রিক এ বিদ্যাকে কেবল আমরা বহন করেই চলেছি, কিন্তু তাকে বাহন করে তোলা যায়নি। তাই তিনি জানিয়েছেন—

"...বিদেশী শিক্ষাধিক্কারের হাত হইতে স্বজাতিকে মুক্তি দিতে হইলে শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লইতে হইবে এবং যাহাতে শিশুকাল হইতে ছেলেরা স্বদেশীয় ভাবে, স্বদেশী প্রণালীতে, স্বদেশের সহিত হৃদয়মনের যোগ রক্ষা করিয়া স্বদেশের বায়ু ও আলোক প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া শিক্ষা পাইতে পারে, তাহার জন্য আমাদিগকে একান্ত প্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের মনের যে প্রকৃতিকে গঠন করিয়াছে তাহাকে নিজের বা পরের ইচ্ছামত বিকৃত করিলে আমরা জগতে নিষ্ফল ও লজ্জিত হইব। সেই প্রকৃতিকেই পূর্ণ পরিণতি দিলে সে অনায়াসেই বিদেশের জিনিসকে আপনার করিয়া লইতে পারিবে এবং আপনার জিনিস বিদেশকে দান করিতে পারিবে।"[৫০]

রবীন্দ্রনাথ তাই ইংরেজ-প্রবর্তিত প্রতিকূল বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে দেশীয় ভাবে দেশীয় প্রণালীতে শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনি তাই একদা স্বদেশী ধাঁচের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন—"বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না। ঘুরিয়া ফিরিয়া নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না; তাই, নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে। নূতনের জন্য ইচ্ছা খুবই হইতেছে অথচ ভরসা কিছুই হইতেছে না। কেননা ঐটেই যে রোগ, এত দিনের শিক্ষা-বোঝার চাপে সেই ভরসাটাই যে সমূলে মরিয়াছে।"[৫১]

বস্তুত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ক্রমে বিরূপতা গড়ে ওঠার এটি ছিল প্রধান কারণ। সমালোচক তাই লিখেছেন—“ আন্দোলনের নেতারা যে-ভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইছিলেন তা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের— আদর্শে। এই অনুকরণেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল, কেননা এতে বিকল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারবে, কিন্তু বিকল্প আদর্শ স্থাপিত হবে না। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন খোল-নলচে দুই বদলাতে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের নীতি ছাড়া জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনে নতুন চিন্তার কোনো প্রতিফলন তিনি দেখতে পান নি। বরঞ্চ তার মনে হয়েছিল “ একটি ছাঁচে ঢালা সঙ্কীর্ণতা” জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেষ্টন করে রেখেছে। তা ছাড়া তাঁর মনে প্রাচীন ভারতের তপোবনের যে-আদর্শায়িত রূপ বিরাজ করছিল, এখানে তার বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ তিনি দেখেন নি, অন্যদের কাছেও হয়তো তা গ্রহণযোগ্য ছিল না।”[৫২]

রবীন্দ্রনাথ তাই শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাকে দেশীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা দান। প্রাচীন ভারতের তপোবন শিক্ষার আদর্শে আনন্দের পথে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক ও নৈতিক মানোন্নয়ন ঘটানো ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য।কেবল পুঁথিগত শিক্ষা নয়, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে শিক্ষার মধ্যে যে আদর্শের অনুসরণ করেছিলেন, প্রবন্ধের মধ্যেও তার যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—“দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে একতালে এক সুরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার। এই গেল বাহ্য প্রকৃতি, আর আছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে। ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল।”[৫৩]

এই লক্ষ্যেরই ফলশ্রুতি ছিল বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা। আসলে “ মানুষ শিক্ষকের ‘মাষ্টারি’র পাশাপাশি বিশ্বপ্রকৃতির ‘মাষ্টারি’কে তাই তিনি কিছুতেই অবজ্ঞা করতে পারেননি। মনকে গড়ে তোলার যে প্রবল শক্তি জলে স্থলে আকাশে ছড়িয়ে রেখেছে প্রকৃতি, তার কোন বিকল্প নেই, তাই সজীব প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও শক্তিকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করতে, মনকে বিশ্বমুখী করে তুলতে তাঁর বিপুল আকাঙ্খা। কিন্তু তাঁর এই সনিষ্ঠ অভিপ্রায়কে প্রাচীন ‘তপোবন শিক্ষা’র বাহ্যিক অনুকরণ ভাবলে ভুল হবে। কেননা

'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন—' তপোবনের বাহ্য অনুকরণ যাকে বলে যাকে বলা যেতে পারে তা অগ্রাহ্য, কেননা এখনকার দিনে তা অসংগত, তা মিথ্যে। তার ভিতরকার সত্যটিকে আধুনিক জীবনযাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।'"[৫৪] রবীন্দ্রনাথ আরো বিশদ করে জানিয়েছেন—" আমাদের দেশের তপোবনের আদর্শ আমি নিয়েছিলাম। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সে আদর্শের রূপের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার মূল সত্যটি ঠিক আছে—সেটি হচ্ছে, জীবিকার আদর্শকে স্বীকার করে তাকে সাধনার আদর্শের অনুগত করা।"[৫৫] রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের প্রথাগত শিক্ষা বা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যে প্রথাগত ট্রেন্ড, তার বাইরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথনির্মাণের প্রয়াস নিয়েছিলেন। 'The Centre of Indian Culture' প্রবন্ধে তাই রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন—"Our education should be in full touch with our complete life, economical,intellectual, aesthetic, social and spiritual and our educational institutions should be in the very heart of our society, connected with it by the living bonds of varied cooperation. For true education is to realize at every step how our training and knowledge have organic connection with our surroundings."[৫৬]

রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, পৃথিবীর প্রায় সব দেশে শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ যীবনযাত্রার যোগ থাকলেও আমাদের দেশে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসার সঙ্গেই আধুনিক শিক্ষার যোগ। কিন্তু—"যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা-স্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।"[৫৭]

কেবল নিজের দেশের সঙ্গে নয়,আধুনিক কালের বিশ্বের সীমা ভাঙার যুগে বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বচেতনার মিলনক্ষেত্র করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন,

বিদ্যাসমবায়ের উপর জোর দিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন—'জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে। সেই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে।'[৫৮] তাই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবে'-এই ছিল তাঁর আদর্শ।

এই পথেই কিন্তু ছিল বিশ্বসভ্যতার সঙ্কট মুক্তির সম্ভাবনা, সত্যকে জীবনে গ্রহণ করার সুযোগ। কিন্তু সে সত্যকে গ্রহণ না করায় পৃথিবীর দিকে দিকে হানাহানি, যুদ্ধের ভয়ঙ্কর বাতাবরণ গড়ে ওঠে। কুৎসিত বীভৎসতা, মিথ্যা, অমানবিকতায় বিশ্ব সভ্যতা ম্লান হয়ে ওঠে। সত্যের সাধনা থেকে মানুষ আজ দিকভ্রষ্ট। যে আদর্শ মানববিশ্ব গড়ে তোলার অভিপ্রায় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশোন্নয়নের কাজে নেমেছিলেন, তার চূড়ান্ত বিপর্যয় দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে এবং বিদেশে—"মানুষের আজ কী অসহ্য বেদনা। দাসত্বের ব্রতী হয়ে কত কলে সে ক্লিষ্ট হচ্ছে—মানুষের পূর্ণতা সর্বত্র পীড়িত। মনুষ্যত্বের এই-যে খর্বতা, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যন্ত্রদেবতার এই-যে পূজা, এই-যে আত্মহত্যা, পৃথিবীর কোথাও একে নিরস্ত করবার প্রয়াস কি থাকবে না।"[৫৯] এই প্রয়াসেরই ফসল ছিল বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা।সেকথা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—"কাটাকাটি মারামারি সন্দেহ হিংসা যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে তাতেই বুঝছি যে সত্যের সাধনা হচ্ছে না। যে সত্য আজ মানবসমাজদ্বারে অতিথি তাঁর অভ্যর্থনার সাধনা বিশ্বভারতী গ্রহণ করেছে।"[৬০]

আদর্শ দেশ তথা মানববিশ্ব গড়ে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাভাবনায় মানবচরিত্র গঠনের উপর তাই জোরদিতেচেয়েছিলেন। প্রাথমিক ভাবে ধর্মের পথকেই সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রধান পথ বলে মনে হয়েছিল। কারণ তিনি জেনেছিলেন—"মানুষকে অন্তরে বাহিরে কর্তব্যের পথে রাখিবার একটি সহজ উপায় ধর্ম।"[৬১] তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ জানতেন—"ধর্মের মধ্যে সেই অত্যন্ত বৃহতত্ত্ব আছে—যাহাতে সমস্ত জাতি একত্রে বাস করিয়াও তাহার বায়ু দূষিত করিতে পারে না। ধর্ম অনন্ত আকাশের ন্যায়; কোটি কোটি মনুষ্য পশুপক্ষী হইতে কীটপতঙ্গ পর্যন্ত অবিশ্রাম নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না। আর যাহাই আশ্রয় কর-না-কেন, কালক্রমে তাহা দূষিত ও বিষাক্ত হইবেই। কোনোটা বা অল্পদিনে হয়, কোনোটা বা বেশি দিনে হয়।"[৬২]

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের নীতিশিক্ষা দানের বিষয়টিকে নিয়ে বাড়াবাড়িকে রবীন্দ্রনাথমেনে নিতে পারেননি। তাঁর অভিমত—"নিঃসন্দেহে নীতিশিক্ষা দেবার ইচ্ছা ও চেষ্টা সর্বতোভাবেই প্রশংশসনীয়। শুধু আমার বক্তব্য এই যে, কতকগুলি বাঁধি বোল দ্বারা এ

কার্য সম্পন্ন হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। যাহাকে ইংরাজিতে 'কপি-বুক মোরালিটি' বলে, তাহার দ্বারা এ পর্যন্ত কাহারও চরিত্র সংশোধন হইতে দেখা যায় নাই।"[৬৩]

এ দেশের পল্লী কিংবা শহরে শিশুদের যে নীতিশিক্ষাটুকু শিক্ষালয়ে দেওয়া হয়ে থাকে নিজ পরিবারে তার চূড়ান্ত বৈপরীত্যময় নীতি-আচার তার নিরর্থকতাকে নিশ্চিত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন—"ছেলে স্কুলে শুষ্ক নীরস নীতিগ্রন্থ পড়িয়া আসিল যে, মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ; এবং বাড়ি আসিয়া দেখিল যে, তাহার বাপ, ভাই, জ্যাঠা, খুড়ো সকলেই মুসলমান বাবুর্চির রান্না দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি সর্বপ্রকার জীবের মাংস গোপনে বিশেষ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া বাহিরে এ প্রকার আচরণ করিতেছেন যেন কখনো নিষিদ্ধ দ্রব্য আহার করেন না, এবং প্রয়োজন হইলে এ বিষয়ে স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলিতেও বিন্দুমাত্র সংকুচিত হইতেছেন না। ......বালকটি নিতান্ত নির্বোধ হইলেও এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, উপরোক্ত নিয়মটির একমাত্র অর্থ সম্ভব—যাহা করিতে হয় লুকাইয়া করো; প্রয়োজন হইলে মিথ্যা কথা বলিয়ো, আমরা জানিয়া শুনিয়াও চোখ-কান বুজিয়া থাকিব, কিছুই বলিব না; কিন্তু সাবধান, সত্য কথা বলিয়ো না, তাহা হইলেই সর্বনাশ। এই প্রকাণ্ড জীবন্ত মিথ্যার মধ্যে বাস করিয়া কি এই বালকের কখনো সত্যের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা জন্মিতে পারে?"[৬৪]

রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই শিশুশিক্ষার্থীদের পাশাপাশি জনশিক্ষা বা mass education-এর উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের মত দেশের উন্নয়ন—কি শিক্ষায়,কি স্বাস্থ্যে, কি অর্থনৈতিক দিক থেকে—কখনোই সম্ভব হতে পারে না যদি-না সমাজের সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হয়। আমাদের দেশের অশিক্ষিত পিতা-মাতা কিংবা শিক্ষার্থীর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর একপ্রকার 'চোরের সম্পর্ক' গড়ে ওঠায় তাঁরা শিক্ষার্থীর হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেন না—পৌঁছোনোর চেষ্টাও করেন না। পবিত্রতা ও অপবিত্রতার বোধ শিশুকাল থেকে শিশুর মনে এই সকল অবিভাবক- অবিভাবিকার দল সঞ্চারে অক্ষম হন। কারণ "ইহা ঘরে ঘরে পদে পদে সহস্র ছোটখাট খুঁটিনাটির উপর দৃষ্টি রাখার কর্ম, ইহা বাল-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখ, কষ্ট আহ্লাদ সহানুভূতির সহিত বুঝিয়া চলার কর্ম"।[৬৫]

শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়—যা একদা পাঁচটি ছাত্রকে নিয়ে অতি ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হয়েছিল—দেশোন্নয়নের কালানুগ তাগিদে,শিক্ষার বৃহৎ পরিধিবিস্তারে তা একদিন বিশ্বভারতীর রূপ গ্রহণ করে। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় থেকে বিশ্বভারতীর এই উদ্ভব ইতিহাসের বিবরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন—

"এক সময় এল, যখন এর পরিধি বাড়বার দিকে গেল। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বললেন, দেশের যে টোল চতুষ্পাঠী আছে তা সংকীর্ণ, তা একালের উপযোগী নয়, তাকে বিস্তৃত করে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে দেশের শিক্ষাপ্রণালীকে কালোপযোগী করতে হবে। আমারও এই কথাটা মনে লেগেছিল। আমার তখনকার বিদ্যালয় শুধু বালকদের শিক্ষায়তন ছিল, এতবড় বৃহৎ অনুষ্ঠানের কথা মনে হয় নি । ......

ধীরে ধীরে এখানকার কাজ আরম্ভ হল। আমার মনে হল যে , দেশের শিক্ষাপ্রণালীর ব্যাপকতাসাধন করতে হবে। তখন এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না যেখানে সর্বদেশের বিদ্যাকে গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে। সব য়ুনিভার্সিটিতে শুধু পরীক্ষা পাসের জন্যই পাঠ্যবিধি হয়েছে, সেই শিক্ষাব্যবস্থা স্বার্থসাধনের দীনতায় পীড়িত, বিদ্যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণের কোন চেষ্টা নেই। তাই মনে হল, এখানে মুক্ত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের বাইরে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব যেখানে সর্ববিদ্যার মিলনক্ষেত্র হবে।"[৬৬]

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা ও তার কর্মপ্রণালী সেদিনের পল্লীর মানুষদের মধ্যে কি বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল, তাদের আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটেয়েছিল তার কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে এর স্পষ্ট স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন—"এবার কলকাতা থেকে আসার পর নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা আমায় নিয়ে গেল—তাদের মধ্যে গিয়ে বড় আনন্দ হল, মনে হল এই তো ফললাভ হয়েছে; এই জায়গায় শক্তি প্রসারিত হল, হৃদয়ে হৃদয়ে তা বিস্তৃত হল। পরীক্ষার ফল ছোটো কথা—এই তো ফললাভ, আমরা মানুষের মনকে জাগাতে পেরেছি। মানুষ বুঝেছে, আমরা তাদের আপন। গ্রামবাসীদের সরল হৃদয়ে এখানকার প্রভাব সঞ্চারিত হল, তাদের আত্মশক্তির উদ্‌বোধন হল।"[৬৭]

রবীন্দ্রনাথ তাই-ই চেয়েছিলেন। জনসাধারণকে বিশ্বভারতীর কর্মপ্রণালীর অন্তর্ভূক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং একাজে সফলও হয়েছিলেন। পল্লীর স্বল্প পরিসরে দেশ গঠনের ভাবী আদর্শকে পরিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, দেশের সমস্যার সমাধানের পথনির্দেশ নির্মাণের প্রয়াস নিয়েছিলেন —" রাজনৈতিক ঔদ্ধত্যে নয়, সহজভাবে দেশবাসীদের আত্মীয়রূপে বরণ করে তাদের নিয়ে এখানে কাজ করব। তাদের ভোটাধিকার নিয়ে বিশ্ববিজয়ী না হতে পারি, তাদের সঙ্গে চিত্তের আদানপ্রদান হবে, তাদের সেবায় নিযুক্ত হব। তারাও দেবে, আমাদের কাছ থেকে নেবে, এই সর্বভারতের কাজ এখানে হবে।"[৬৮] তাই দেশের বিদ্যালয়ের গতানুগতিক পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানচর্চার পরিধিকে স্বীকার করেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর জ্ঞানচর্চার বিষয় হিসেবে সকলরকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীতবাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্য যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন তার যাবতীয় আয়োজন রেখেছিলেন।

পল্লীজীবনে যাত্রা-কথকতার গুরুত্ব বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'প্রকৃতির মধ্যে কোন শিক্ষাকে বদ্ধমূল করিয়া দিবার পক্ষে এমন সুন্দর উপায় আর নাই'।[৬৯] রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীতে বয়স্ক শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম রূপে রূপকথা-উপকথাধর্মী আখ্যান বা উপন্যাস পাঠের উপরও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় লোকশিক্ষার উপরও রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট জোর দিয়েছিলেন—" আমাদের যাত্রা-কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, সে শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার উপরে নূতন করিয়া আরো-একটি কর্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে। দেবতা সাধু পিতা গুরু ভাই ভৃত্যের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য, তাঁহাদের জন্য কতদূর ত্যাগ করা যায়, তাহা শিখিব; সেইসঙ্গে সাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য তাহাও নূতন করিয়া আমাদিগকে গান করিতে হইবে—ইহাতে কি কোনো পক্ষের বিশেষ শঙ্কার কারণ কিছু আছে?"[৭০]

সহজ অকৃত্রিম লোকায়ত সাহিত্যধারার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লোকশিক্ষার পাশাপাশি পল্লীর মানুষের নিরানন্দ জীবনে আনন্দের সঞ্চার ঘটাতে চেয়েছিলেন। বাংলার লোকগান, ছড়া ইত্যাদির মধ্যেকার লোকশিক্ষার পাশাপাশি আনন্দের উপাদানটুকুকে লোকজীবনে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। কারণ—" ধর্মভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের অবসররঞ্জনের জন্য গান-রচনা বর্তমান বাংলায় কবিওয়ালারাই প্রথম প্রবর্তন করেন। এখনো সাহিত্যের উপর সেই সাধারণেরই আধিপত্য, কিন্তু ইতিমধ্যে সাধারণের প্রকৃতি-পরিবর্তন হইয়াছে। ...কিন্তু সাধারণের যতই রুচির উৎকর্ষ ও শিক্ষার বিস্তার হউক-না কেন, তাহাদের আনন্দ বিধানের জন্য স্থায়ী সাহিত্য, এবং আবশ্যকসাধন ও অবসররঞ্জনের জন্য ক্ষণিক সাহিত্যের প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে।"[৭১]

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, যে বিদ্যা বর্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করছে, বিশ্বরহস্যের নব নব দিগন্তকে উদ্ঘাটিত করছে, বাংলা সাহিত্যের পাড়ায় তার যাতায়াত নেই বললেই চলে। আমাদের চিন্তাশীল মন, বিবেচনাশীল মন, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগসাধনকারী মন পড়ে আছে পূর্ব-যুগান্তরে। আর ' যে মন রসসম্ভোগ করে সে যাতায়াত শুরু করেছে আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণশালার আঙিনায়। স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়েছেসেই দিকটাতে যে দিকে চলেছে মদের পরিবেশন, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েছে মাতাল।'[৭২]

আসলে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, আধুনিক শিক্ষা থেকে যে জিনিসটি স্খলিত হয়ে পড়েছে সে হচ্ছে সংস্কৃতি। চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দান করেছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে না, একথা তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন।

একারণেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীশিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা অপেক্ষা অকৃত্রিম লোকসাহিত্যকে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। লোকশিক্ষার ক্ষেত্রেও লোকসাহিত্যের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। আমাদের দেশে বহুকাল প্রচলিত ছড়াগুলিতে লোকশিক্ষার অনুরূপ উদাহরণ ছড়িয়ে আছে যা পল্লীর দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের জীবনে মহার্ঘ বলে পরিগণিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার হর-গৌরী বিষয়ক ছড়াগুলি সম্পর্কে জানিয়েছেন—"বাংলার কবিহৃদয় এই দারিদ্র্যকে মহত্ত্বে এবং দেবত্বে মহোচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। বৈরাগ্য এবং আত্মবিস্মৃতির দ্বারা দারিদ্র্যের হীনতা ঘুচাইয়া কবি তাহাকে ঐশ্বর্যের অপেক্ষা অনেক বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন। ভোলানাথ দারিদ্র্যকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছিলেন—দরিদ্রসমাজের পক্ষে এমন আনন্দময় আদর্শ আর কিছুই নাই।"[৭৩]

শুধু দারিদ্র্যজয়ী মানসিকতা নয়, লোকসাহিত্যের আধারে নিহিত থাকে লোকশিক্ষার আরো বহুতর উপাদান, যে গুলিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী- গণজীবনে সম্প্রচারের প্রয়োজনে লোকসাহিত্য চর্চা ও সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই এ বিষয়ে জানিয়েছেন—"স্বভাবতই ধনী শ্বশুর যখন দরিদ্র জামাতাকে অবজ্ঞা করে এবং ধনীকন্যা দরিদ্রপতি ও নিজের দূরদৃষ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে, তখন গৃহধর্ম কম্পান্বিত হইতে থাকে।

দাম্পত্যের এই দুর্গ্রহ কেমন করিয়া কাটিয়া যায় হরগৌরীর কাহিনীতে তাহা কীর্তিত হইয়াছে। সতী স্ত্রীর অটল শ্রদ্ধা তাহার একটা উপাদান; তাহার আর-একটা উপাদান দারিদ্র্যের হীনতামোচন,মহত্ত্বকীর্তন। উমাপতি দরিদ্র হইলেও হেয় নহেন, এবং শ্মশানচারীর স্ত্রী পতিগৌরবে ইন্দ্রের ইন্দ্রানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দাম্পত্য বন্ধনের আর-একটি মহৎ বিঘ্ন স্বামীর বার্ধক্য ও কুরূপতা। হরগৌরীর সম্বন্ধে তাহাও পরাভূত হইয়াছে। বিবাহসভায় বৃদ্ধ জামাতাকে দেখিয়া মেনকা যখন আক্ষেপ করিতেছেন তখন অলৌকিক প্রভাবে বৃদ্ধের রূপযৌবন বসনভূষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই অলৌকিক রূপযৌবন প্রত্যেক বৃদ্ধ স্বামীরই আছে, তাহা তাহার স্ত্রীর আন্তরিক ভক্তি-প্রীতির উপর নির্ভর করে। গ্রামের ভিক্ষুক কথক গায়ক হরগৌরীর কথায় বারে বারে দ্বারে দ্বারে সেই ভক্তি উদ্রেক করিয়া বেড়ায়।

গ্রামের কবিপ্রতিভা এখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। শিবকে গাঁজা ভাঙ প্রভৃতি নেশায় উন্মত্ত করিয়াছে। শুদ্ধ তাহাই নহে—অসভ্য কোঁচ-কামিনীদের প্রতি তাঁহার আসক্তি প্রচার করিতে ছাড়ে নাই। কালিদাসের অনুত্তরঙ্গ সমুদ্র ও নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখাবৎ যোগীশ্বর বাংলার পল্লীতে আসিয়া এমন দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

কিন্তু স্থূলকথা এই যে, হরগৌরীর কথা—ছোটোবড়ো সমস্ত বিঘ্নের উপরে দাম্পত্যের বিজয়কাহিনী। হরগৌরীপ্রসঙ্গে আমাদের একান্নপারিবারিক সমাজের মর্মরূপিণী রমণীর এক সজীব আদর্শ গঠিত হইয়াছে। স্বামী দীন দরিদ্র বৃদ্ধ বিরূপ যেমনই হউক, স্ত্রী রূপযৌবন-ভক্তিপ্রীতি-ক্ষমাধৈর্য-তেজগর্বে সমুজ্জ্বলা। স্ত্রীই দরিদ্রের ধন, ভিখারীর অন্নপূর্ণা, রিক্ত গৃহের সম্মানলক্ষ্মী।"[৭৪]

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, আমাদের দেশের প্রচলিত ছড়াগুলিতে যে রাম-সীতার দাম্পত্যের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা মানুষের পক্ষে শিক্ষার একটি মহৎ আধার। তিনি লিখেছেন—"রামসীতার দাম্পত্য আমাদের দেশপ্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ; তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধ কোমল। রামায়ণকথায় এক দিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য অপর দিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মনুষয়ের যতপ্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদ্‌বৃত্তিকে মহৎধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণকথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।"[৭৫] 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'রামায়ণ' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন সেখানে আমাদের পরিবার জীবনের কোন মহতাদর্শের প্রকাশ ঘটেছে।

আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে যে জ্ঞানের বৈষম্য বেশি করে অনুভূত হয় তা হল ইতিহাস জ্ঞান। এই জ্ঞানকে লোকসাধারণের মধ্যে সঞ্চার করে রবীন্দ্রনাথ পল্লী তথা দেশের মধ্যেকার জ্ঞানের বৈষম্য দূরীকরণের পক্ষে মত দিয়েছিলেন—"আমার প্রস্তাব এই যে, ইতিহাসকে কথা ও যাত্রার আকারে স্থান ও কালের উজ্জ্বল বর্ণনার দ্বারা সজীব সরস করিয়া দেশের সর্বত্র প্রচার করিবার উপায় অবলম্বন করা হউক। আমরা আজকাল কেবল মাসিক কাগজে ও ছাপানো গ্রন্থে সাহিত্যপ্রচারের চেষ্টা করিয়া থাকি—কিন্তু যদি কোনো কথা বা যাত্রার দল ইতিহাস ও সাহিত্য দেশের সর্বত্র প্রচার করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন, তবে প্রচুর সার্থকতা লাভ করিবেন। আজকালকার দিনে কেবলমাত্র পৌরাণিক যাত্রা ও কথা আমাদের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইতিহাস, এমন-কি, কাল্পনিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে লোকশিক্ষা বিধান করিতে হইবে।"[৭৬]

আমাদের স্বদেশকে, তার প্রতিটি অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ দিকে দিকে 'সাহিত্যপরিষদ' স্থাপনের উপর জোর দিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন দেশকে ভালোবাসার প্রথম লক্ষণ হল দেশকে জানা। আর দেশের ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি সকল দিক থেকে দেশকে জানার জন্য সাহিত্যপরিষদ সেদিন প্রবৃত্ত হয়েছিল। এই-জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে দেশের উন্নয়নের বার্তা প্রেরণ করে ১৩১৩-এর বহরমপুরস্থিত সাহিত্যপরিষদের অনুষ্ঠানে নিজের ভাষণে বলেছিলেন—"সাহিত্যপরিষদের মধ্যে আপনারা সকলে মিলিয়া স্বদেশকে সত্য করিয়া তুলুন। বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেক বাঙালি সাহিত্যপরিষদের মধ্যে নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টাকে একত্রে জাগ্রত করিয়া আজ যাহা অস্ফুট আছে তাহা স্পষ্ট করুন, যাহা ক্ষুদ্র আছে তাহাকে মহৎ করুন। কোন্‌খানে এই পরিষদের কী অসম্পূর্ণতা আছে তাহা লইয়া প্রশ্ন করিবেন না, ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়া প্রত্যেকে গৌরবলাভ করুন। দেবপ্রতিমা ঘরে আসিয়া পড়িলে গৃহস্থকে তাহার পূজা সারিতেই হয়; আজ বাঙালির ঘরে তিনটি দেবপ্রতিমা আসিয়াছে—সাহিত্যপরিষৎ, শিক্ষাপরিষৎ ও শিল্পবিদ্যালয়। ইহাদের ফিরাইয়া দিলে দেশে যে অমঙ্গল ঘটিবে তাহার ভার আমরা বহন করিতে পারিব না।"[৭৭]

সাহিত্য পরিষদের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশকে জানা ও বোঝার একটি অবকাশ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, স্বদেশ প্রেমের একটি মাধ্যম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দেশের ছাত্রসম্প্রদায়কে সেই শিক্ষাক্ষেত্রে সম্মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন—" সাহিত্য-পরিষদে আমরা দেশকে জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি—দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদ্রষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে পরিষৎ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন সেখানে বিদেশী লোকে কোনোদিন বিস্ময়দৃষ্টিপাত করে না, সেখান হইতে সংবাদপত্রবাহন খ্যাতি সমুদ্রপারে জয়ঘোষণা করিতে যায় না, সেখানে তোমাদের কোন প্রলোভন নাই—কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিস্‌মাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পার তবে মাতার নিভৃত-অন্তঃপুরচারী এই সকল মাতৃসেবকের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো।"[৭৮]

এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি ত্রুটির দিককে উল্লেখ করে তার নিরসনের একটি পথনির্দেশও দিয়েছেন—"সমকালের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ এই ভাষণে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন, ইংরেজি পাঠ্য পুস্তক বা তার অনুকরণে রচিত গ্রন্থ মুখস্থ করে দেশীয় ছাত্রেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ফলে নিজের দেশের সঙ্গেই তাদের পরিচয় হয় না। শিক্ষাও অসম্পূর্ণ থাকে।

পাঠ্য পুস্তকের বাইরে পড়ে রয়েছে যে বিরাট দেশ তাকে ভুললে চলবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করতে হবে। পৃথিবীর অন্য দেশে এই যোগ চেষ্টা করে স্থাপন করতে হয় না। কেননা সেখানে কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ। এ দেশে সম্পূর্ণ বিপরীত।"[৭৯]

রবীন্দ্রনাথ জানতেন 'মফস্বলের দরিদ্র স্কুলে কীরূপ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকে, এবং সেখানে বিজ্ঞান সহজে হৃদয়ংগম করাইবার কীরূপ উপকরণ পাওয়া যায়'।[৮০] তাই সহজ সরল মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার উপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন। অন্ততঃ এন্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই নিয়ম চালু করার পক্ষে ছিলেন যাতে করে পল্লীর সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান চেতনার উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারে, বিজাতীয় ভাষার পীড়া বোধ না করে। শুধু তাই নয়, দেশের সর্বস্তরের মানুষের শিক্ষার জন্য যথাসম্ভব অসাম্প্রদায়িক পাঠ্যপুস্তক রচনার উপরও জোর দিয়েছিলেন।

পল্লীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ এক শ্রেণীর কর্মী গড়ে তোলার কথা বলেছেন। তাদের জন্য শহরে নাইটস্কুল স্থাপন করে পল্লীউন্নয়ন সংক্রান্ত পন্থা-পদ্ধতির শিক্ষার ব্যবস্থা করার উপর জোর দিয়েছেন—"যাঁরা এ কাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্যে আপাতত কলকাতায় একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় আইন, জমি-জরিপ ও রাস্তাঘাট ড্রেনপুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিতমত চিকিৎসা ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে আজকাল যে-সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকল প্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা দরকার হবে। ......এই রকম একটা কাজ নিয়ে পল্লীর চিত্ত ক্রমে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা সহজেই ফললাভ করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস। অকস্মাৎ অকারণে পল্লীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশলাভ করা দুঃসাধ্য। ডাক্তার এবং শিক্ষকের পক্ষে গ্রামের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ। তারা যদি ব্যবসায়ের সঙ্গে লোকহিতকে মিলিত করতে পারেন, তবে পল্লী সম্বন্ধে যে সমস্ত সমস্যা আছে তার সহজ মীমাংসা হয়ে যাবে।"[৮১]

পল্লীর সার্বিক বিকাশের জন্য, দেশের উন্নয়ন প্রকল্পে রবীন্দ্রনাথ দেশের নানাস্থানে নিজস্ব উদ্যোগে শিল্পবিদ্যালয় ও বানিজ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতি ছিল শ্রীনিকেতন ও তাঁর অন্যতম বিভাগ শিল্পভবন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—" ফান্স জর্মানী ইটালি প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশ-সকল স্বরাজ্যের বাণিজ্য-উন্নতি সাধনের জন্য যে-সকল শিল্পবিদ্যালয় বাণিজ্যবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিতেছেন তাহা যদি সে-সকল দেশের পক্ষেও অত্যাবশ্যক হয়, তবে আমাদের

দেশে তাহার যে কিরূপ প্রয়োজন বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের এ অভাব কে পূরণ করিবে। রাজা যদি নাই করে তবে কি আমরা বসিয়া থাকিব এবং আবেদন করিব।”[৮২]

ঙ. সংবাদ পত্রের প্রকাশ :

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ চেতনা এবং তারই আনুষঙ্গিক নব নব বিশ্বচেতনাকে দেশবাসীর অন্তরে সঞ্চারের তাগিদে একাধিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্বদেশ চেতনার জাগরণে সমকালীন দেশীয় পত্রিকাগুলির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিরাশ হয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন—“আমাদের বাংলা সংবাদপত্র দেশের অবস্থা কিছুই জানে না। এমন-কি, দেশের নামগুলা উচ্চারণ পর্যন্ত করিতে পারে না, অথচ গবর্ণমেন্টকে বিজ্ঞভাবে উপদেশ দেয়; আইন জানে না, উভয়পক্ষ দেখে না অথচ বিচারককে বিচার করিতে শিখায়; অনেক অনুসন্ধান করিয়া, বিস্তর বিবেচনা করিয়া যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা যাহা অনেকদিনে স্থির হইয়াছে, তাহা অবহেলা করিয়া, অথচ নিজে কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়া বসে।”[৮৩]

সংবাদপত্রের এই দায়িত্বহীনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন বলেই পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর অনুকূলে সংবাদপত্রের স্বতন্ত্র ব্যবহার ঘটাতে চেয়েছিলেন। কৃষক জীবনে জ্ঞানের আলো সঞ্চারের জন্য, বিশ্বের কৃষিকেন্দ্রিক নানা প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা সম্বন্ধে কৃষককে বা এদেশের মানুষকে অবহিত করার জন্য তাই শান্তিনিকেতন থেকে ‘ভূমিলক্ষ্মী’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও সরলাদেবীর রাজনৈতিক সহকর্মী কেদারনাথ দাশগুপ্তের উৎসাহে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তবু রবীন্দ্রনাথই ছিলেন এর প্রাণপুরুষ। এই পত্রিকার লক্ষ্য বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— “...আমাদের দেশের চাষের ক্ষেত্রের উপরে সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানের আলো ফেলিবার দিন আসিয়াছে। আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়—সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, তাহার সংযোগ হওয়া চাই। এই কারণে বীরভূম জেলা হইতে এই যে ‘ভূমিলক্ষ্মী’ কাগজখানি বাহির হইয়াছে ইহাতে উৎসাহ অনুভব করিতেছি। বস্তুত লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীকে না মিলাইয়া দিলে আজকালকার দিনে ভূমিলক্ষ্মীর যথার্থ সাধনা হইতে পারিবে না। এইজন্য যাঁহারা এই পত্রিকার উদ্যোগী তাঁহাদিগকে আমার অভিনন্দন জানাইতেছি এবং এই কামনা করিতেছি তাঁহাদের এই শুভ দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ব্যাপ্ত হইয়া দেশের কৃষিক্ষেত্র এবং চিত্তক্ষেত্রকে এককালে সফল করিয়া তুলুক।”[৮৪]

সমকালে জনমত গঠনের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অশোক সেন সেই পত্রিকাটির ভূমিকা নির্দেশ করে জানিয়েছেন—"ভাণ্ডার পত্রিকার পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় জনমত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন রবীন্দ্রনাথ। ......সমকালীন কোনো সমস্যা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতেন বিশিষ্ট নেতা, রাজনৈতিক কর্মী এবং আরো নানা স্তরের সব লেখক পাঠক। স্বনামে বা ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ নিজেও উত্তরদাতা থাকতেন কোনো কোনো প্রশ্নে। স্বদেশ ভাবনার নানা দিক নিয়ে প্রশ্ন। দেশ-বিদেশের কথা, সমাজ, ইতিহাস ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে আলোচনা থাকত। বিজ্ঞানের খবর দিয়ে একটি নিয়মিত বিভাগ ছিল। কবিতা, গান, মাঝে মধ্যে ছাপা হত। আর ছিল চাষবাস, কারিগরি, হস্তশিল্প সংক্রান্ত নানা খবর ও পরামর্শ। দু-বছরের কিছু বেশি সময় সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কেদারনাথ পুলিশের কোপদৃষ্টিতে পড়ায় পত্রিকার ধারাবাহিকতা রুদ্ধ হয়। দলমত নির্বিশেষে বহু নেতা ও মনীষীর লেখায় সমৃদ্ধ ছিল ভান্ডার। স্বদেশী আন্দোলনের আদি পর্বে অনেক চিন্তাভাবনা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার হদিশ তাতে পাওয়া যায়। সেদিনের পাঠকের কাছে তার তাৎক্ষণিক মূল্যও তো অগাধ।"[৮৫]

চ. রাজনৈতিক স্বাধীনতা :

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের নামে নিছক উত্তেজনার প্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ পথ বলে মনে করেননি। 'সমাজ' গ্রন্থে 'জিহ্বা আস্ফালন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরূপ অভিমতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনও যে দেশের মানুষের কোনো কাজে আসবে না সেকথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানিয়েছেন। সমালোচকও জানিয়েছেন —" অনেকসময় বৈদেশিক পরাধীনতার চেয়ে স্বাদেশিক পরাধীনতাই তাঁর কাছে বেশী পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে-দেশ ভুয়ো শাস্ত্র বা প্রথা তৈরি করে নিজের মানুষকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ছোট করে রেখেছে, তার রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা পাবার নৈতিক অধিকার নেই। পাশ্চাত্ত্য দেশের বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এবং সবক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দুঃসাহসিক অভিযানকে তিনি নমস্কার জানিয়েছেন এবং স্বাদেশিক জড়ত্বের জন্য বেদনাবোধ করেছেন"।[৮৬] আর সে কারণেই তিনি 'হাতে কলমে' প্রবন্ধে স্পষ্টতই জানিয়েছেন— "...নিজের পদের উপরে দাঁড়ালেই আমরা ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হই। ভিক্ষালব্ধ সম্মানের তাজ না হয় মাথায় পরিলাম। কিন্তু কৌপিন তো ঘুচিল না; এইরূপ বেশ দেখিয়া কি প্রভুরা হাসে না! ঢেঁকিরা দরখাস্ত করিতেছেন স্বর্গস্থ হইবার দুরাশায়, কিন্তু ধানভানাই যদি কপালে থাকে তবে স্বর্গে গেলে তাঁহারা এমনিই কী ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন!"[৮৭] এই জাতীয় দেশোন্নতি রবীন্দ্রনাথের কখনোই কাম্য ছিল না। ড. লায়েক আলি খান জানিয়েছেন— ' প্রবন্ধটিতে অন্তঃসারশূন্য স্বদেশ হিতৈষিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার বর্ষণ করেছেন। সাধারণ

দেশবাসীর প্রতি ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচারের খবর ঐ সময়ে প্রায়শই শোনা যেত। উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার পরামর্শ দিলেন: ....।'[৮৮]

সুতরাং দেশের আত্মশক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক স্বাধীনতার মহৎ মূল্যকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানিয়েছেন—

" আমাদের মধ্যে কেহ বা বলি, আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্তশাসন চাহি; কেহ বা বলি, সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যই চাহি। অথচ এ-সমস্ত কেবল মুখের কথা এবং এতই দূরের কথা যে, ইহার সঙ্গে আমাদের উপস্থিত দায়িত্বের কোনো যোগ নাই।

দেবতা যখন কলোনিয়াল সেলফ-গবর্মেন্ট্ এবং অটনমি এই দুই বর দুই হাতে লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন এবং যখন তাঁহার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব সহিবে না তখন কোন্ বরটা তুলিয়া লইতে হইবে হাতে হাতে তাহার নিষ্পত্তি করিতে পরস্পর হাতাহাতি করাই যদি অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে তবে অগত্যা তাহা করিতে হইবে। কিন্তু যখন মাঠে চাষ দেওয়াও হয় নাই তখন কি ফসল ভাগের মামলা তুলিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"[৮৯]

দেশের অকর্ষিত ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছিল তার বিড়ম্বনা দেশবাসী দেখেছে দেশভাগের ভয়াবহতায়, সাম্প্রদায়িক মানসিকতা-প্রসূত এবং স্বার্থ-সঞ্জাত অমানবিক হিংস্র হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায়। স্বাধীনতার এত বছর পরেও মানুষের সত্যিকারের সেই স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ যাকে স্বদেশ প্রেমের নামান্তর জেনেছিলেন, অর্থাৎ একজনের বিপদে আরেকজন দেশীয় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, আজ আমাদের সমাজে তার বিলুপ্তি আসন্নপ্রায়। আজো সে চৈতন্য সজাগ নয় সাধারণের মধ্যে, সেদিনো তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তা ছিল না। রাজনৈতিক স্বাধীনতার তুলনায় রবীন্দ্রনাথ পল্লী-নগরের পারস্পরিক বিচ্ছেদ, দেশনেতাদের বৃহত্তর ভারতবর্ষের প্রতি অবহেলা, পল্লী জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা ও আভিজাত্যের গৌরবই রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে বেশি। তাই তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন—"গ্রামের এই দুর্দশার কথা কেউ ভালো করে ভাবছেন না, আর ভেবে দেখলেও স্পষ্ট আকারে ব্যক্ত করছেন না। কেবল বিদেশীর সঙ্গ ত্যাগ করার মধ্যে বাঁচনের রাস্তা নেই। বাঁচতে হলে পল্লীবাসীদের সহবাস করতে হবে। পল্লীগ্রামে যে কী ভীষণ দুর্গতি প্রশ্রয় পাচ্ছে তা খুব কম লোকেই জানেন। সেখানে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের কাছে প্রাচীন ধর্ম এমন বিকৃত বীভৎস আকার ধারণ করেছে যে সে-সব কথা খুলে বলা যায় না।"[৯০]

কিন্তু সে পথে না গিয়ে নিছক কতকগুলি ভিক্ষালব্ধ রাজনৈতিক অধিকার লাভ বা ক্ষমতাদখলের লড়াইয়ে সেদিন এদেশের কংগ্রেস নেমে পড়েছিল। তার পরিণাম হয়েছিল বেদনাবহ আত্মবিচ্ছেদ—নরমপন্থী, চরমপন্থী বা মধ্যপন্থীদের দলাদলি যার উপযুক্ত নিদর্শন। এই বিপর্যয়কেও এড়ানো সম্ভব হত যদি তাঁরা সেদিন রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত গ্রামোন্নয়নের পথকেই মান্যতা দিতেন। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানিয়েছেন—" মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কন্‌গ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্তভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকিতেন—দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইঁহারা নিজের শক্তিকে নানাপথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন, দেশহিতের সত্যকার সাধনা ও সত্যকার সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি পাইতেন এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন, তাহা হইলে কন্‌গ্রেস-সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না।"[৯১]

দেশের শক্তিকে বিক্ষিপ্ত হতে না দিয়ে, তাকে বিনাশের পথে ঠেলে না দিয়ে দেশের প্রাণকেন্দ্রে প্রবাহিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাই একজন যথার্থ দেশনায়ক নির্বাচনের উপর জোর দিয়েছিলেন। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছিলেন। সে সময় কংগ্রেসের প্রাচীনপন্থী সুরেন্দ্রনাথ ও নব্যপন্থী বা 'এক্সট্রিমিস্টস্' বিপিনচন্দ্রদের মধ্যেকার নেতৃত্বদানকে কেন্দ্র করে কোন্দল রবীন্দ্রনাথকে চিন্তিত করে তোলে—'দেশনায়ক' প্রবন্ধের সৃষ্টি যার মূল কারণ।দেশের কাজ যে নিছক হৃদয়াবেগের উন্মত্ততা দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না, তার দ্বারা যে কোন সুদূরবিস্তৃত মঙ্গলকে শান্তচিত্তে বিচার করা সম্ভব হয় না, চরমপন্থীদের কার্যাবলীর নিরিখে 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে তা স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসেও এ-জাতীয় মানসিকতার স্পষ্ট প্রতিফলন আছে। তাই উত্তেজনা নয়, দেশের নবজাগ্রত যুবশক্তির কাছে রবীন্দ্রনাথ আবেদন রেখেছেন—" ...যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনোদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; সেইসকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধসংস্কার হইতে রক্ষা করো। নূতন বা পুরাতন কোনো দলেই তোমার নাম না জানুক, যাহাদের হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক-পা এক-পা করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকো।

মিথ্যা আত্মপ্রকাশে আমরা যে শক্তি কেবলই নষ্ট করিতেছি, সত্য আত্মপ্রয়োগে তাহাকে খাটাইতে হইবে।"[৯২]

তবু রবীন্দ্রনাথ একসময় ইংরেজ গবর্মেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছিলেন। আমাদের দেশের অভাব অভিযোগ যে তাতে খুব বেশি মিটবে এমন আশা তিনি করেননি। তবে এর মধ্য দিয়ে আর যাই হোক ইংরেজদের কানে আমাদের দেশের, আমাদের পল্লীর অভাব-অভিযোগগুলিকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করেছিলেন। 'মন্ত্রী অভিষেক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ অভিপ্রায়ের কথা আছে।

কিন্তু স্বরাজের নামে মহত্মাজীর বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে ফেলা বা চরকা কাটার আহ্বানকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। তার মধ্যে সত্যের যথার্থ আহ্বান ছিল না। তিনি মনে করেছিলেন আমাদের দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মসচেতনহীন জনসাধারনের ব্যক্তিচিত্তের বিকাশ বা চিত্তের স্বাধীনতা না এলে কেবল মাত্র এক বাহ্য আচারের দ্বারা প্রকৃত স্বরাজ আসতে পারে না— "স্বরাজ তো কেবল নিজের কাপড় নিজে জোগানো নয়। স্বরাজ তো একমাত্র আমাদের বস্ত্রস্বচ্ছলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর, সেই মন তার বহুধাশক্তির দ্বারা এবং সেই আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা স্বরাজ সৃষ্টি করতে থাকে। এই স্বরাজসৃষ্টি কোনো দেশেই তো শেষ হয়নি—সকল দেশেই কোনো-না-কোনো অংশে লোভ বা মোহের প্ররোচনায় বন্ধনদশা থেকে গেছে। কিন্তু সেই বন্ধনদশার কারণ মানুষের চিত্তে। সে-সকল দেশে নিরন্তর এই চিত্তের উপর দাবি করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও সেই চিত্তের বিকাশের উপরেই স্বরাজ দাঁড়াতে পারবে। তার জন্যে কোনো বাহ্য ক্রিয়া বাহ্য ফল নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান চাই। দেশের চিত্তপ্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজকে অল্পকাল কয়েকদিন চরকা কেটে আমরা পাব, এর যুক্তি কোথায়।"[৯৩]

তাই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানিয়েছেন—"আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যেন সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা—এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহ্য প্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন—সে কি এই চরকা-চালনায়। চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এতকাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে কর্মকে আড়ষ্ট করে রাখি নি। আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় দুর্গতির কারণ কি তাই নয়। আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, বিদ্যা চাই নে, প্রীতি চাই নে, পৌরুষ চাই নে, অন্তরপ্রকৃতির মুক্তি চাই নে, সকলের চেয়ে বড়ো করে একমাত্র করে চাই চোখ বুজে মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে

যেমন চালানো হয়েছিল তারই অনুবর্তন ক'রে, স্বরাজ-সাধনযাত্রায় এই হল রাজপথ? এমন কথা বলে মানুষকে কি অপমান করা হয় না।"[৯৪]

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন চাষীর দেহমনের যে শিক্ষা ও অভ্যাস সেখান থেকে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তাকে সুখী বা ধনী করা সহজ নয়। তাই চাষীকে চাষের পথে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে সার্থক করে তোলার প্রয়াস পৃথিবীর কৃষিপ্রধান দেশসমূহে চলছে। সে সকল দেশে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটিয়ে চাষের ক্ষেত্রে মানুষ বিস্তর উন্নতি করেছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় সে সকল দেশ জমি থেকে দ্বিগুণ চারগুণ ফসল উৎপাদন করেছে। এই জ্ঞানালোকিত পথ সহজ পথ নয়, সত্য পথ। এই সত্যের আহ্বানকে অস্বীকার করে পল্লীর মধ্যে চাষীকে নিছক চরকা ধরার পরামর্শ দিতে তিনি অস্বীকার করেছেন। জানিয়েছেন—"চাষের উৎকর্ষ-উদ্ভাবনের দ্বারা চাষীর উদ্যমকে ষোল-আনা খাটাবার চেষ্টা না করে তাকে চরকা ঘোরাতে বলা শক্তিহীনতার পরিচয়। আমরা চাষীকে অলস বলে দোষ দিই, কিন্তু তার অবস্থার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে আমরা যখন তাকে চরকা ধরতে পরামর্শ দিই তখন সেটাতে আমাদেরই মানসিক আলস্যের প্রমাণ হয়।"[৯৫]

রবীন্দ্রনাথের মতে আত্মশক্তি বা আত্মকর্তৃত্বের চর্চাই হল স্বরাজ সাধনার প্রধান পথ। তাই তিনি জানিয়েছেন—"সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব—আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে, তখন দেশের জনসংঘের এই চিত্তদৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এদেশে স্বরাজ কায়েম হতে পারে , একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।"[৯৬] ১৯৪৭-এর মধ্যরাতে আমাদের দেশে অনুরূপ যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছিল তা আজো আমাদেরকে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ দিতে পারেনি। সমালোচক এ কারণেই মন্তব্য করেছেন— " 'বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ'—রবীন্দ্রনাথের এই সংশয় বছর আঠারো পরেই ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগষ্ট মধ্যরাতে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছিল। মধ্যরাতের সেই ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাকে যদি 'বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ'-লাভ বলে রবীন্দ্রভাষায় চিহ্নিত করা যায়, সত্যের অপলাপ হবে না।"[৯৭]

ছ. চেতনার স্বাধীনতা :

জীবনের প্রগতিশীলতা বা নিরন্তর গতির সঙ্গে চিত্তের স্বাধীন প্রসার তাই একান্তই কাম্য বলে মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। তাই তাঁর পল্লী উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে শিক্ষা ও

সংস্কৃতিবিকাশের উপর একান্ত জোর দিয়েছিলেন যাতে মানব চিত্তের স্বাধীন প্রসার ও বিকাশ ঘটে। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন—“ তা ছাড়া এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য,পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে সেইখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ, তুমিই কেবল একলা থামবে, আর-কেউ থামবে না। জগৎপ্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি না চলতে পার তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার উপর এসে আঘাত করবে, একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে, কিংবা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও—পৃথিবীর এইরকম নিয়ম।”[৯৮]

একারণেই নিছক আধ্যত্মিকতার অলস সমাধিক্ষেত্র থেকে দেশ ও জাতিকে বহমান বিশ্বজীবনধারার সঙ্গে সমান্বিত করতে চেয়েছিলেন। কেননা তিনি দেখেছিলেন—“ আমরা যখন একটি জাতির মতো জাতি ছিলুম তখন আমাদের যুদ্ধ বানিজ্য শিল্প, দেশে বিদেশে গতায়াত, বিজাতীয়দের সঙ্গে বিবিধ বিদ্যার আদানপ্রদান, দিগ্‌বিজয়ী বল এবং বিচিত্র ঐশ্বর্য ছিল। আজ বহু বৎসর এবং বহু প্রভেদের ব্যবধান থেকে কালের সীমান্ত-দেশে আমরা সেই ভারতসভ্যতাকে পৃথিবী হতে অতিদূরবর্তী একটি তপঃপূত হোমধূম রচিত অলৌকিক সমাধিরাজ্যের মতো দেখতে পাই এবং আমাদের এই বর্তমান স্নিগ্ধচ্ছায়া কর্মহীন নিদ্রালস নিস্তব্ধ পল্লিটির সঙ্গে তার কতকটা ঐক্য অনুভব করে থাকি, কিন্তু সেটা কখনোই প্রকৃত নয়।” [৯৯]

অনুরূপ পরিপ্রেক্ষিতে তাই রবীন্দ্রনাথের গৃহীত সিদ্ধান্ত, আমরা যদি “ ...সত্যকে ভালোবাসি, বিশ্বাস অনুসারে কাজ করি, ঘরের ছেলেদের রাশীকৃত মিথ্যার মধ্যে গোলগাল গলগ্রহের মতো না করে তুলে সত্যের শিক্ষায় সরল সবল দৃঢ় করে উন্নতমস্তকে দাঁড় করাতে পারি, যদি মনের মধ্যে এমন নিরভিমান উদারতার চর্চা করাতে পারি যে চতুর্দিক থেকে জ্ঞান এবং মহত্ত্বকে সানন্দে সবিনয়ে সাদর সম্ভাষণ করে আনতে পারি, যদি সংগীত শিল্প সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার আলোচনা করে –দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে—পৃথিবীতে সমস্ত তন্ন তন্ন নিরীক্ষণ করে এবং মনোযোগসহকারে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে আপনাকে চারি দিকে উন্মুক্ত বিকশিত করে তুলতে পারি, তা হলে আমি যাকে হিঁদুয়ানি বলে থাকি তা সম্পূর্ণ টিকবে কিনা বলতে পারি নে, কিন্তু প্রাচীনকালে যে সজীব সচেষ্ট তেজস্বী হিন্দুসভ্যতা ছিল তার সঙ্গে অনেকটা আপনাদের ঐক্য সাধন করতে পারব।”[১০০]

জ. কৃষি :

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশের দুরবস্থা কেবলমাত্র ইংরেজের সামান্য কেরানীগিরির মধ্যস্থতায় সম্ভব নয়। কৃষিকেন্দ্রিক ভারতবর্ষেকৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার অবসান চেয়েছিলেন। একারণেই পল্লীর উন্নয়নের জন্য কৃষিকেন্দ্রিক নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে সে সবের বহু উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে।

কৃষির উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথকে নির্ভর করতে হয়েছে অন্যের উপর। নগর কলকাতার বুকে বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কৃষি বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রাথমিক ভাবে রবীন্দ্রনাথকে বহু ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁর প্রচেষ্টা কিন্তু আদৌ থেমে থাকেনি। এ প্রসঙ্গে সরকারী কৃষি বিশেষজ্ঞের সহায়তায় শিলাইদহ পর্বে বহু ব্যয় করে আলু চাষে চূড়ান্ত ব্যর্থতারকথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে চামরু নামে এক-হাতকাটা এক রাজবংশী চাষী যে বিপুল লাভবান হয়েছিল সে কথা রবীন্দ্রনাথ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন। এ প্রবন্ধেই লরেন্স নামে রথীন্দ্রনাথের এক ইংরেজ গৃহশিক্ষক কীভাবে রেশম কীটের চাষ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিপুল সহায়তা ও উৎসাহ পেয়েছিলেন তার কথাও জানিয়েছেন। কিন্তু বাজারে কাটতি কম থাকায় সামগ্রিক উদ্যম কীভাবে মাঠে মারা পড়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকেই জানতে পারা যায়। এসকল অভিজ্ঞতাই রবীন্দ্রনাথকে পরবর্তী সময়ে অনেক বেশি বাস্তব সচেতন করে তোলে

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই রবীন্দ্রনাথ সমবায় প্রণালীতে চাষের উপর পরবর্তীকালে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। " বস্তুত গ্রামোন্নয়নের ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের মূল নীতিটি ছিল সেই সমবায়। তিনি আপন অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন যে, আমাদের মতো সম্পদশালী দেশের দারিদ্র্যের কারণ ঐশ্বর্যশূন্যতা নয়, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কহীনতা। কোন কিছুর পুঁজি তথা মূলধন যে কেবল অর্থ-সম্পদের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে তা নয়, তাঁর ধারণায় 'অনেক গরীব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাতে পারলেই সেই মিলনই মূলধন'; আর তাঁর মতে 'তখনই একটা থেকে আর একটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবে না।'"[১০১]

'সমূহ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, আমাদের দেশে জোতদার ও চাষা যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থেকে চাষবাস করবে ততদিন তাদের অস্বচ্ছল অবস্থা কিছুতেই দূর হবে না। সারা পৃথিবীতেই আজ মানুষ জোট বেঁধে প্রবল হয়ে উঠছে। এমতাবস্থায় যারা বিচ্ছিন্ন এবং একক থাকবে তাদেরকে চিরদিন অন্যের গোলামি ও মজুরি করে মরতে হবে।

সুতরাং জীবনের স্বার্থে বাঁচার তাগিদে আজকের দিনে সকল চাষীর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন আছে। সমবায় প্রণালীতে চাষের এই গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন— " য়ুরোপে আমেরিকায় কৃষির নানাপ্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির হইয়াছে—নিতান্ত দারিদ্র্যবশত সে-সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না—অল্প জমি ও অল্প শক্তি লইয়া সে-সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক-একটি মণ্ডলী অথবা এক-একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামি কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বৈ লোকসান হয় না। পাটের ক্ষেত সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে। গোয়ালারা একত্র হইয়া জোট করিলে গো-পালন ও মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভালোমতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বাঁধিয়া নিজের পল্লীতে যদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার খাটুনি দেয় তবে কাপড় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই সুবিধা ঘটে।"[১০২]

তিনি জানিয়েছেন, পল্লীর কৃষকেরা তাদের খণ্ড ক্ষুদ্র জমিগুলিকে স্বতন্ত্র ভাবে চাষ করার ফলে পরিশ্রম এবং খরচের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। কেবল জমিতে লাঙল দেওয়া নয়, ফসল কাটা ও সেই ফসল প্রত্যেক চাষার ঘরে তোলার জন্য স্বতন্ত্র গাড়ি ও মজুরির ব্যবস্থা করতে হয়। প্রত্যেক গৃহস্থকে গোলাঘর রাখতে হয়এবং আলাদাভাবে ফসল বিক্রির ব্যবস্থা করতে হয়। এতে খরচের পরিমাণ এতটাই বেড়ে যায় যে চাষের ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হয়ে ওঠে না। কিন্তু সমবায়ের দ্বারা কৃষকদের খণ্ড ক্ষুদ্র চাষের জমিগুলিকে একত্র করে চাষ করলে সে সুযোগ গ্রহণ করা যায় সহজেই। তাতে উৎপাদনের খরচ কম হওয়ায় লাভের পরিমাণও বেশি হত। সর্বোপরি এই ব্যবস্থায় চাষের ফলে পল্লীর মানুষদের মধ্যেকার জাত-পাত, অস্পৃশ্যতা, মানসিক ব্যবধানকে দূরে ঠেলে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারায় সম্বন্ধ সূত্র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হতে পারে। কুসংস্কারমুক্ত সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে থাকে। সঙ্কীর্ণ গ্রামীণ পরিমণ্ডলের বাইরে বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় তাদের চিত্তের মধ্যেকার সীমাবদ্ধতাটুকুও দূরীভূত হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাই সমবায় প্রণালীতে কৃষিকাজের উপরই অধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। এই প্রণালীতে কাজের সুবিধা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন— "ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যাহা একজনে না পারে তাহা পঞ্চাশজনে জোট বাঁধিলেই হইতে পারে। তোমরা যা পঞ্চাশ জনে চিরকাল পাশাপাশি পৃথক পৃথক চাষ করিয়া আসিতেছ , তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল-লাঙল গোলাঘর পরিশ্রম একত্র

করিতে পারিলেই গরিব হইয়াও বড়ো মূলধনের সুযোগ আপনিই পাইবে। তখন কল আনাইয়া লওয়া, কলে কাজ করা, কিছুই কঠিন হইবে না। কোনো চাষীর গোয়ালে যদি তার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক সের মাত্র দুধ বাড়তি থাকে, সে দুধ লইয়া সে ব্যবসা করিতে পারে না। কিন্তু এক-শো দেড়-শো চাষী আপন বাড়তি দুধ একত্র করিলে মাখন-তোলা কল আনাইয়া ঘিয়ের ব্যবসা চালাইতে পারে। য়ুরোপে এই প্রণালীর ব্যবসা অনেক জায়গায় চলিতেছে। ডেনমার্ক্ প্রভৃতি ছোটো- ছোটো দেশে সাধারণ লোকে এইরূপে জোট বাঁধিয়া মাখন পনীর ক্ষীর প্রভৃতির ব্যবসায় খুলিয়া দেশ হইতে দারিদ্র্য একেবারে দূর করিয়া দিয়াছে। এই-সকল ব্যবসায়ের যোগে সেখানকার সামান্য চাষী ও সামান্য গোয়ালা সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আপন বৃহৎ সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছে।”[১০৩]

রায়তদের উপর জমি হস্তান্তরের অধিকার দিতে চাননি রবীন্দ্রনাথ—যদিও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ চেয়েছিলেন। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কম সমালোচনা হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানিয়েছেন—“ আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশে মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। একসময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে। ...কিন্তু দেখতে দেখতে চাষীর জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে তাতে জমিদারের লোকসান আছে বলে আনন্দ করবার কোন হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশি কড়া—যদি তাও না মান এটা মানতে হবে, সেটা আর-একটা উপ্‌রি মুষ্টি।”[১০৪]

আসলে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন অন্যকিছু। গুণময় মান্না জানিয়েছেন—“ ...তিনি দেখিয়ে ছিলেন, জমি রায়তদের হাতে তুলে দেবার তাত্ত্বিক ও বাস্তব অসুবিধে কী ছিল। রবীন্দ্রনাথ জমিদারকে লোভী প্যারাসাইট বলেছেন বটে, কিন্তু একই রকম লোভী বলেছেন রায়তকেও—‘ওটা মানবস্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি......ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে।’ (রায়তের কথা) কথাটাকে প্রসারিত করে বলা যায়, জীবমাত্রই জীবকে খেয়ে বেঁচে থাকে। সুতরাং খাওয়াটাকে ভিত্তিভূমিরূপে স্বীকার করে নিয়ে তারপর যদি সেই খাওয়াটাকে এমনভাবে সম্বন্ধী করা যায়, যাতে প্যারাসাইট হয়ে যায়, ধরা যাক, এপিফাইট, তাহলেই বাঞ্ছিত ফল লাভ হতে পারে। আধুনিক কালের প্রার্থিত ইকলজিক্যাল ব্যালান্স-এর কথাও তাই।”[১০৫]

ঝ. ত্যাগস্বীকার :

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনার একটি বড় জায়গা জুড়ে আছে মানবিক ত্যাগস্বীকার। পল্লীর উন্নয়নের জন্য রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যদেশের ‘নেশন’- এর ধাঁচে ত্যাগ স্বীকারের উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। তাঁর মতে –

“ নেশনের প্রত্যেকে ন্যাশন্যাল স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া থাকে। ...সমাজের নীচ হইতে উপর পর্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাঁধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড়ো চেষ্টার বিষয়। এই ঐক্য সূত্রেই হিন্দু সম্প্রদায়ের একের সহিত অন্যের এবং বর্তমানের সহিত অতীতের ধর্মযোগ সাধন করিতে হইবে। আমাদের মনুষ্যত্বলাভের এই একমাত্র উপায়। রাষ্ট্রনীতিক চেষ্টায় যে কোন ফল নাই, তাহাই নহে; কিন্তু সে চেষ্টা আমাদের সামাজিক ঐক্যসাধনে কিয়দ্দূর সহায়তা করিতে পারে, এই তাহার প্রধান গৌরব।”[১০৬]

রবীন্দ্রনাথকে পল্লীর উন্নয়ন যজ্ঞে ব্যাপৃত হয়ে যে অসীম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যেও তার স্পষ্ট উচ্চারণ ধ্বনিত হয়েছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন—“তখন আমার বিক্রি করবার যোগ্য যা-কিছু ছিল প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে—অন্তঃপুরের সম্বল এবং বাইরের সম্বল। কয়েকটা আয়জনক বইয়ের বিক্রয় স্বত্ত্ব কয়েক বৎসরের মেয়াদে দিয়েছি পরের হাতে। হিসাবের দুর্বোধ জটিলতায় সে মেয়াদ অতিক্রম করতে অতি দীর্ঘকাল লেগেছে। সমুদ্রতীর বাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল। তার পরে যে সম্বল বাকি রইল তাকে বলে উচ্চ হারের সুদে দেনা করবার ক্রেডিট।”[১০৭]

এই ত্যাগের আদর্শ, পরার্থে হিতের উপলক্ষ যত বেশি গড়ে ওঠে ততই আমাদের দেশের পক্ষে মঙ্গল বলে রবীন্দ্রনাথের অভিমত। কারণ—“ প্রত্যেকের হিতের জন্যে সকলেই দায়ী এবং পরের হিতই নিজের সকলের চেয়ে বড়ো হিত, এই শিক্ষার উপলক্ষ আমাদের দেশে যত বেশি হয় ততই ভালো। একটি গ্রামের মধ্যে একটা রাস্তা গিয়েছে, দেখা গেল গোরুর গাড়ি চলায় তার একটা জায়গায় গর্ত হয়েছে—৪/৫ হাতের বেশি নয়—বর্ষার সময় তাতে এক-হাঁটুর উপর কাদা জমে আর সেই কাদার মধ্য দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ হাটবাজার করতে যায়। নিকটবর্তী গ্রামের লোক, যারা সবচেয়ে কষ্ট পায়, তারাও একথা বলে না ‘কোদাল দিয়ে খানিকটা মাটি ফেলে জায়গাটা সমান করে দিই’, তার কারণ তারা ঠকতে ভয় পায়। তারা ভাবে, ‘ আমরাই খাটব অথচ তার সুবিধে

আমরা ছাড়াও অন্য সবাই পাবে, এর চেয়ে নিজেরা দুঃখ ভোগ করি সেও ভালো।' আমি পূর্বেও আপনাদের কাছে বলেছি—একটা গ্রামে বৎসর-বৎসর আগুন লাগত, গ্রামে কুয়া ছিল না, আমি তাদের বললুম, 'তোমরা কুয়ো খোঁড়ো, আমি সে কুয়ো বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, 'বাবু, মাছের তেলে মাছ ভাজতে চাও! অর্থাৎ, অর্ধেক খাটুনি আমাদের, অথচ জলদানের পুণ্যটা সম্পূর্ণ তোমার! তার চেয়ে ইহলোকে আমরা জলাভাবে মরি সেও ভালো, কিন্তু পরলোকে তুমি যে সস্তায় সদ্‌গতি লাভ করবে সে সইতে পারব না।'[১০৮]

দেশকে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই ত্যাগের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। ত্যাগের আদর্শে সমুন্নত কর্মী-মানুষের নিতান্ত অভাব রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ কর্মযজ্ঞের যে একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা, একথা তিনি নিজেও ভালো করে বুঝেছিলেন। অনুরূপ ব্রতী মানুষের সন্ধানে তিনি নিরন্তর সচেষ্ট থেকেছেন, দেশবাসীর কাছে তার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তার কথাকে বহুমুখে ব্যক্তও করেছেন। ময়মনসিংহে জনসাধারণের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেছেন—

" আমার যে স্বল্পাবশিষ্ট আয়ু তাই আমি দিচ্ছি আমার প্রতি নিশ্বাসে। এর পরিবর্তে আমি চাই সত্যিকার কর্মী। পল্লীপ্রাণের বিচিত্র অভাব দূর করবার জন্যে যারা ব্রতী তাদের পাশে আমি আপনাদের আহ্বান করছি। তাদের আপনারা একলা ফেলে রাখবেন না, অসহায় করে রাখবেন না, তাদের আনুকূল্য করুন। কেবল বাক্য-রচনায় আপনাদের শক্তি নিঃশেষিত হলে, আমাকে যতই প্রশংশা করুন, বরমাল্য দিন, তাতে উপযুক্ত প্রত্যর্পণ হবে না। আমি দেশের জন্যে আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাই। শুধু মুখের কথায় আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। আমি চাই ত্যাগের ভিক্ষা, তা যদি না দিতে পারেন তবে জীবন ব্যর্থ হবে, দেশ সার্থকতা লাভ করতে পারবে না, আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যে, স্তুতি লাভের জন্যে কিছু বলছি না— দেশের জন্যে আমার ভিক্ষাপাত্র ভরে দিন ত্যাগ দিয়ে, কর্মশক্তি দিয়ে। এই ব'লে আজ আপনাদের কাছ থকে বিদায় গ্রহণ করি।"[১০৯] দেশের জন্য এই ত্যাগের আহ্বান রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ'-এর মতো অধিকাংশ প্রবন্ধেই উচ্চকিত।

পল্লীর উন্নতির জন্য সর্বাধিক বড় ভূমিকা পালন করতে পারেন জমিদার সম্প্রদায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালে দেখেছিলেন অন্য ছবি—" ...এ দেশে পূর্বকালে জমিদার-সম্প্রদায়ের যে গৌরব ছিল তাহা খেতাব-অবলম্বনে ছিল না—তাহা দান,অর্চনা, কীর্তিস্থাপন, আর্তগণের আর্তিচ্ছেদ, দেশের শিল্পসাহিত্যের পালন-পোষণের উপর নির্ভর করিত। সেই মহৎ গৌরব এখনকার জমিদাররা প্রতিদিন হারাইতেছেন। দেশ যখন চাহিতেছে রুটি তাহারা দিতেছেন প্রস্তর; বঙ্গভূমি তাহার জলকষ্ট, তাহার অন্নকষ্ট তাহার শিল্পনাশ, স্বদেশপ্রত্যাগত সাহেব-রাজকর্মচারীদের পাষাণ প্রতিমূর্তি গড়িয়া দিতেছেন।"[১১০]

রবীন্দ্রনাথের মতো জমিদার যেভাবে ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সেই দায়িত্ব যদি সেদিন দেশীয় জমিদারেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারতেন তাহলে পল্লীর উন্নয়নে একটি তাৎপর্যময় অধ্যায় রচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। একারণেই বাংলার জমিদার সম্প্রদায়কে ত্যাগের পথে যাত্রার পরামর্শ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

" ...দেশের জমিদারের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, বাংলার পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য তাঁহারা উদ্যোগী না হইলে এ কাজ কখনোই সুসম্পন্ন হইবে না। পল্লীসচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনুভব করিতে থাকিলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব হইবে বলিয়া আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু এক পক্ষকে দুর্বল করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলই বাধাহীন করিতে থাকা আর ডিনামাইট নিজের পকেটে লইয়া বেড়ানো একই কথা—একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে। রায়তদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে, ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মতো কেবল দীনভাবে আদায় করিবার পথগুলিই সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন। কিন্তু সেইসঙ্গে মহৎভাবে স্বার্থত্যাগ করিবার সম্বন্ধ যদি একান্ত যত্নে না রক্ষা করেন, উচিত ক্ষতি উদার ভাবে স্বীকার করিবার শক্তি যদি তাঁহার না থাকে, তবে তাঁহার আত্মসম্মান কেমন করিয়া থাকিবে। রাজহাটে উপাধি কিনিবার বেলায় তিনি তো লোকসানকে লোকসান জ্ঞান করেন না? কিন্তু যথার্থ রাজা হইবার একমাত্র স্বাভাবিক অধিকার আছে তাঁহার রায়তদের কাছে। তিনি যে বহুতর লোকের প্রভু বন্ধু ও রক্ষক, বহুলোকের মঙ্গলবিধানকর্তা। পৃথিবীতে এতবড়ো উচ্চ পদ লাভ করিয়া এ পদের দায়িত্ব রক্ষা করিবেন না?"[১১১]

বঙ্গভঙ্গের সমকালে এই ত্যাগের আদর্শকে সামনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীসহ আমাদের দেশের প্রাণকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস নেন। ইংরেজদের ক্ষতি বা দেশীয় ব্যবসায়ীদের লাভের জন্য নয়, বিদেশী পণ্য কেনা বন্ধ করে দেশীয় পণ্য ক্রয়ের মধ্য দিয়ে দেশের অন্তর একতাবদ্ধ হয়ে উঠবে—এই বিষয়টিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন—"এই উপলক্ষে আমাদের চিত্ত সর্বদা স্বদেশের অভিমুখ হইয়া থাকিবে আমরা ত্যাগের দ্বারা দুঃখস্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব। আমাদের আরাম বিলাস আত্মসুখতৃপ্তি আমাদিগকে প্রত্যহ স্বদেশ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল, প্রত্যহ আমাদিগকে পরবশ করিয়া লোকহিত ব্রতের জন্য অক্ষম করিতেছিল— আজ আমরা সকলে মিলিয়া যদি নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দেশের দিকে তাকাইয়া ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও আরামের অভ্যাস কিছু পরিমাণে পরিত্যাগ করিতে পারি, তবে সেই ত্যাগের ঐক্য দ্বারা আমরা পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া দেশকে বলিষ্ঠ করিতে পারিব। দেশী

জিনিস ব্যবহার করার ইহাই যথার্থ সার্থকতা—ইহা দেশের পূজা, ইহা একটি মহান সংকল্পের নিকটে আত্মনিবেদন।”[১১২]

দেশহিত বা পল্লীউন্নয়ন যজ্ঞে রবীন্দ্রনাথ তাই যথার্থ ত্যাগী ব্যক্তিকেই দেশের বিরাট কর্মক্ষেত্রে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন—“আজ দস্যুবৃত্তি,তস্করতা, অন্যায় পীড়ন, দেশহিতের নাম ধরিয়া চারি দিকে সঞ্চরণ করিতেছে, এ কি এক মুহূর্তের জন্য তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন যাঁহারা জানেন আত্মহিত দেশহিত লোকহিত যে কোনো হিত-সাধনই লক্ষ্য হউক-না কেন, কেবলমাত্র বীর ও ত্যাগী ও তপস্বী তাহার যথার্থ সাধক। জাতির চরিত্রকে নষ্ট করিয়া আমরা জাতিকে গড়িয়া তুলিব এমন ভয়ংকর ভুলকে তিনি কখনোই এক মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দিতে পারেন না যিনি ধর্মকেই শক্তি বলিয়া নিশ্চয় জানেন।”[১১৩]

ঞ. মানবকল্যাণের অনুকূলে যন্ত্রের ব্যবহার :

রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মন পল্লীর উন্নতির জন্য মানব কল্যানের অনুকূলে যন্ত্রের ব্যবহারের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। শিলাইদহ-পতিসর পর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীর উন্নয়নের জন্য নানা যন্ত্রপাতি সহযোগে রথীন্দ্রনাথের সহায়তায় কৃষিগবেষণার আয়োজন করেছিলেন। প্রবন্ধ সাহিত্যের আধারেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ মানসের পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

“ য়ুরোপ- আমেরিকায় সকল চাষিই এই পথেই হু হু করিয়া চলিয়াছে। তাহারা কলে আবাদ করে, কলে ফসল কাটে, কলে আঁটি বাঁধে, কলে গোলা বোঝাই করে। ইহার সুবিধা কী তাহা সামান্য একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায়। ভালো করিয়া চাষ দিবার জন্য অনেক সময় বৃষ্টির অপেক্ষা করিতে হয়। একদিন বৃষ্টি আসিল, সেদিন অনেক কষ্টে হাল-লাঙলে অল্প জমিতে অল্প একটু আঁচড় দেওয়া হইল। ইহার পরে দীর্ঘকাল যদি ভালো বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে সে বৎসর নাবী বুনানি হইয়া বর্ষার জলে হয়তো কাঁচা ফসল তলাইয়া যায়। তার পরে ফসল কাটিবার সময় দুর্গতি ঘটে। কাটিবার লোক কম, বাহির হইতে মজুরের আমদানি হয়। কাটিতে কাটিতে বৃষ্টি আসিলে কাটা ফসল মাঠে পড়িয়া নষ্ট হইতে থাকে। কলের লাঙল, কলের ফসল-কাট যন্ত্র থাকিলে সুজোগমাত্রকে অবিলম্বে ও পুরাপুরি আদায় করিয়া লওয়া যায়। দেখিতে দেখিতে চাষ সারা ও ফসল কাটা হইতে থাকে। ইহাতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে বাঁচে।”[১১৪]

যন্ত্রের এই যে কল্যাণকর দিক, একেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে গ্রহণের স্বপক্ষে সওয়াল করেছেন। যন্ত্রশক্তির এককেন্দ্রীকরণ নয়, তার সামাজিক সুষম বন্টনের উপরও একই সঙ্গে জোর দিয়েছেন। মানুষ যেমন একদিন লাঙলকে, চরকা তাঁতকে, তীর

ধনুককে, চলমান যানবাহনকে গ্রহণ করে নিজের জীবনযাত্রার অনুগত করেছিল, আধুনিক যন্ত্রকেও তিনি ঠিক সেভাবেই জীবনের অনুগত করে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। যন্ত্রে যারা পিছিয়ে আছে তারা যন্ত্রে অগ্রবর্তীদের সঙ্গে যে কোনোমতেই পেরে উঠবে না একথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এও জানিয়েছেন—" এ স্থলে আমাদের এই কথাই বলতে হবে—যন্ত্র এবং তার মূলীভূত বিদ্যায় যে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা ব্যক্তি বা দল-বিশেষ সংহত না হয়ে যেন সর্বসাধারণে ব্যাপ্ত হয়। শক্তি ব্যক্তিবিশেষে একান্ত হয়ে উঠে মানুষকে যেন বিচ্ছিন্ন না করে—শক্তি যেন সর্বদাই নিজের সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করতে পারে।"[১১৫]

যন্ত্রের এই শুভ শক্তিকে কাজে লাগিয়েই রবীন্দ্রনাথ মৃতপ্রায় পল্লীতে প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে চেয়েছিলেন। বিজ্ঞান মানুষকে যে মহাশক্তি দিয়েছে তাকে গ্রামে গ্রামে আহ্বান করে আনা যায়নি বলেই পল্লীগুলির দুরবস্থার শেষ নেই। সেখানে আজ জলাশয়ে জল নেই, মাঠে ফসল নেই, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দুঃখশোক পাপতাপ বিনাশমূর্তি ধরেছে, কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত। যন্ত্রশক্তি বা বিজ্ঞানশক্তিকে পল্লীর ভিতর ঠিক অনুরূপ তাৎপর্যে সত্য করে তোলার আকঙ্ক্ষা থেকেই শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রীনিকেতনের বাণী ছিল বস্তুত তাই-ই।

যন্ত্র ব্যবহারের বিপদের কথাও রবীন্দ্রনাথ জানতেন। কিন্তু নিছক সে কারণেই যন্ত্রের মানবকল্যাণকারী ভূমিকাকে অস্বীকার করতে চাননি। স্পষ্টতই বলেছেন, যন্ত্রের যা কিছু অপহ্নব সে মানুষের লোভরিপুরই ফলশ্রুতি মাত্র—"এ কথা মানি—যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্রমন্থনের মতো সে বিষও উদ্গার করে। পশ্চিম-মহাদেশের কল-তলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আসছে। তা ছাড়া, অসৌন্দর্য, অশান্তি, অসুখ, কারখানার অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যেরই শামিল হয়ে উঠল। কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তিসম্পদকে দোষ দেব না, দোষ দেব মানুষের রিপুকে। খেজুরগাছ, তালগাছ বিধাতার দান; তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না। যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে যন্ত্রকে সুদ্ধ টান মারে নি। উল্টো , যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম করে দিয়ে লোভের কারণটাকেই সে ঘুচিয়ে দিতে চায়।"[১১৬] অথচ আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ যন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ থেকে এদেশকে বঞ্চিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানিয়েছেন—"যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত।"[১১৭] এই বঞ্চনা থেকে পল্লীকে রক্ষার জন্য নানাপ্রকার যন্ত্র ব্যবহারের দ্বারা উন্নয়নের ধারাকে বহুমুখী করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

ট. গ্রাম সংগঠন :

রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্যতম বিশিষ্ট দিক ছিল গ্রামসংগঠন। কলকাতার নগরজীবন ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাংলার বুকে পা দিয়েই পল্লীকে নিতান্ত কাছ থেকে চিনেছিলেন। এই চেনাজানাই ছিল যথার্থ চেনাজানা। এ নিছক রোম্যান্টিক কবির চোখে গ্রামকে দেখা নয়। রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে পল্লীর যে ভয়াবহ বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত আর্থ-সামাজিক ছবি ফুটে উঠেছিল তার পরিচয় দিতে গিয়ে নিজে জানিয়েছেন—

" ...গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে ছিল, আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে; কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই; যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোনো শক্তি নাই; যে-সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে; যে-সকল ধনীগৃহে ক্রিয়াকর্মে যাত্রায় গানে সাহিত্যরস ও ধর্মের চর্চা হইত তাঁহারা সকলেই শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন; যাঁহারা দুর্বলের সহায়, শরণাগতের আশ্রয় ও দুষ্কৃতকারীর দণ্ডদাতা ছিলেন তাঁহাদের স্থান পুলিসের দারোগা আজ কিরূপভাবে পূরণ করিতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। লোকহিতের কোনো উচ্চ আদর্শ পরার্থে আত্মত্যাগের কোনো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামের মাঝখানে আর নাই; কোনো বিধিনিষেধের শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না, আইনে যে কৃত্রিম বাঁধ দিতে পারে তাহাই আছে মাত্র। পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মতো নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই। জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই; ডাকাত অথবা পুলিস চুরি অথবা চুরি-তদন্ত-জন্য ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাঁচাইবে এমন পরস্পর-ঐক্য-মূলক সাহস নাই। তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কী অবস্থা! ঘি দূষিত, দুধ দুর্মূল্য, মৎস দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত। যে কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহারা আমাদের যকৃৎ-প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে; তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলা অতিথির মতো আসে এবং কুটুম্বের মতো রহিয়া যায়। ডিপ্‌থিরিয়া রাজযক্ষ্মা টাইফয়েড সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি এক্সপ্লয়েটেশন নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই; আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি। ইহার কারণ কী। ইহার কারণ এই, সমস্ত দেশ যে শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে

সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে, যে মাটি হইতে বাঁচিবার খাদ্য পাইবে সেই মাটি পাথরের মতো কঠিন হইয়া গিয়াছে, যে গ্রামসমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয়স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন সে ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো নবীন কালের নির্দয় বন্যার মুখে ভাসিয়া যাইতেছে।”[১১৮]

বাংলার পল্লীগুলিকে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দিক থেকেই সংগঠিত করে তুলে সেগুলিতে স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এর জন্য তিনি নিজেই দু’-একটি গ্রামকে ভারতবর্ষের পল্লীসংগঠনের মডেল হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন নিজের স্বল্প সামর্থ্যে। রবীন্দ্রনাথ এভাবে সারা দেশের পল্লীসংগঠন কর্মের একটি খসড়া প্রস্তুত করে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে পাঠ করে দেশবাসী তথা দেশনেতাদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। এই খসড়ায় গুরুত্ব পেয়েছিল নানা সভাসমিতি স্থাপন। এ বিষয়ে তিনি নিজে জানিয়েছেন—

“দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব। উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদের কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিত-গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের ইহাই সার্থকতা।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধিসভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে। প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্বাংশের সকলপ্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে; কারণ, কর্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে, সর্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক-একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাবমোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে, সেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিশের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।” [১১৯] এভাবেই ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভর ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলে

ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হয়ে উঠবে এবং সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মহাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হবে। তখন সেই কেন্দ্রটিই ভারতবর্ষের সত্যকার কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

স্বায়ত্তশাসিত গ্রামপরিকল্পনার কথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরূপ ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন ১৩২৯ এর ফাল্গুন মাসে লেখা একটি প্রবন্ধে—" দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজন সাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কতকগুলি পল্লী নিয়ে এক একটি মণ্ডলী স্থাপন করা দরকার, সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের ও অভাবমোচনের ব্যবস্থা করে মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করে তুলতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হয়ে উঠবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কস্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি ক'রে দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব।"[১২০]

এর জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে মত পোষণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন রাষ্ট্র পূর্বে সমাজের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ছিল। তখন রাজাই সমাজপতির পদ গ্রহণ করতেন। এখন রাজা সমাজের বাইরে যাওয়ায় সমাজ শীর্ষহীন হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে দীর্ঘকাল তাই পল্লীসমাজই খন্ড খণ্ড ভাবে আপনার কাজ আপনি করেছে। তাই এখন আমাদের একজন সমাজপতির নিতান্ত আবশ্যক। এই সমাজপতি ও তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমাদের প্রত্যেকের নিকটে তাঁহারই মধ্যে সমাজের একতা সপ্রমাণ হইবে। আজ যদি কাহাকেও বলি সমাজের কাজ করো, তবে কেমন করিয়া করিব, কোথায় করিব, কাহার কাছে কী করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া যাইবে। অধিকাংশ লোকেরই আপনার কর্তব্য উদ্ভাবন করিয়া চলে না বলিয়াই রক্ষা। এমন স্থলে ব্যক্তিগত চেষ্টাগুলিকে নির্দিষ্ট পথে আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য একটি কেন্দ্র থাকা চাই।"[১২১]

সমাজপতিই সেই কেন্দ্র। কোন দলকে রবীন্দ্রনাথ সেই দায়িত্ব দিতে রাজি নন। কারণ দলেরপ্রত্যেক ব্যক্তি 'নিজের মধ্যে দলের ঐক্যটিকে দৃঢ়ভাবে অনুভব ও রক্ষা করিতে পারে না'। যাইহোক এই বিচারপতির অধীন দেশের ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নেতা বা নায়ক নিযুক্ত হবেন। সমাজের সকল প্রকার অভাবমোচন, মঙ্গলকর্মচালনা ও স্থিতাবস্থারক্ষা এঁরাই করবেন এবং তার জন্য সমাজপতির কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। সমাজপতি মন্দ কাজও করতে পারেন, ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে তবে সমাজে অমঙ্গলের কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই স্বদেশী সমাজ দেশবাসীর সামান্য দানের দ্বারা তাদের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতেও সক্ষম হবে ।

স্বদেশী সমাজ গঠনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ পল্লীর স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছিলেন ঠিকই, তার অর্থ এই নয় যে সরকারের সঙ্গে তার সকল রকম সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে হবে। তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন—" এ কথা কেহ যেন না বোঝেন, তবে আমি বুঝি গবর্মেন্টের সঙ্গে কোনো সংস্রবই রাখিতে চাই না। সে যে রাগারাগি, সে যে অভিমানের কথা হইল—সেরূপ অভিমান সমকক্ষতার স্থলেই মানায়, প্রণয়ের সংগীতেই শোভা পায়। আমি আরো উলটা কথাই বলিতেছি। আমি বলিতেছি, গবর্মেন্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সদুপায় করা উচিত। ভদ্রসম্বন্ধমাত্রেরই মাঝখানে একটা স্বাধীনতা আছে। যে সম্বন্ধ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো অপেক্ষাই রাখে না তাহা দাসত্বের সম্বন্ধ, তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইতে এবং একদিন ছিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।"[১২২]

রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ ভাবনার প্রকাশ আছে 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থের 'পল্লীর উন্নতি' প্রবন্ধে।রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনা অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ দেশীয় নেতাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন এক একটি গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য। কিন্তু এ কাজে রবীন্দ্রনাথ দু'-একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছাড়া তেমন কাউকে পাশে পাননি। যাঁদের নিয়ে তিনি পল্লীর উন্নয়নের প্রয়াস নিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই পল্লীর মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারেননি। ফলে পল্লীর মানুষেরা তাদের সন্দেহের চোখেই দেখেছে। এই অবিশ্বাসকে রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক বলেই মনে করেছেন। কারণ—"যারা উপরে থাকে তারা অকারণে উপকার করবার জন্যে নীচে নেমে আসে এমন ঘটনা তারা সর্বদা দেখে না—উল্‌টোটাই দেখতে পায়।"[১২৩]

কিন্তু গোড়াকার এই অবিশ্বাসকে স্বীকার করে নিয়ে যাঁরা বাধাকে অতিক্রম করে পল্লীর কাজ করতে সক্ষম তাঁরাই এ কাজের যথার্থ কর্মী হতে পারেন বলে রবীন্দ্রনাথের অভিমত। রবীন্দ্রনাথ এমন কর্মীকেই তাঁর পল্লীউন্নয়ন কার্যে সামিল করতে চেয়েছেন। তাঁদের কর্মপ্রণালীর নির্দেশ দিয়ে লিখেছেন—" তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক-একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহার-সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত করো; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার করো, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত করো। এ কর্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না; এমন-কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই; কেবল ধৈর্য এবং প্রেম, নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে, দেশের মধ্যে সকলের

চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।"[১২৪]

ঠ. বিচারব্যবস্থা :

রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থার মূলে পক্ষপাতের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। এই পক্ষপাতমূলক বিচার ব্যবস্থার জন্য ইংরেজ ও দেশীয় মানুষের জাতিগত পার্থক্যকে দায়ী করেছেন—"...এক পক্ষে বড়ো বড়ো বেতন, মোটা পেনশন এবং লম্বা চাল, অন্য পক্ষে নিতান্ত ক্লেশে আধ-পেটা আহারে সংসারযাত্রা নির্বাহ—অবস্থার এই অসংগতি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। শুধু অন্নবস্ত্রের হীনতা নহে, আমাদের তরফে সম্মানে লাঘব এত অত্যন্ত অধিক, পরস্পরের মূল্যের তারতম্য এত অতিমাত্র, যে, আইনের পক্ষেও পক্ষপাত বাঁচাইয়া চলা অসাধ্য।"[১২৫]

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যে ইংরেজের নীতিবোধ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। তাই স্বজাতি-বিজাতির মধ্যে কোন অভিযোগ উপস্থিত হলে বিচার করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ—"ইহা অসম্ভব নহে যে, যে ইংরাজ ফস্ করিয়া ঘুষা লাথি অথবা গুলি চালাইয়া ভারতবর্ষীয় জনসংখ্যা হ্রাস করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই স্বজাতি সমাজের সে শুভ্র মেষশাবক বিশেষ; অতএব একজন দেশী হত্যাকারীকে ইংরাজের যেরূপ খুনী বলিয়া মনে হয়, তাহাকে সেরূপ খুনী বলিয়াই মনে হয় না—সুতরাং এমন লোকটাকে ফাঁসি দেওয়া একটা আইন সংগত হত্যাকাণ্ড বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে।"[১২৬]

ড. ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস :

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন আমাদের দেশের প্রাচীন পল্লীগুলিতে ধনী-দরিদ্র একত্রে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার সঙ্গে বাস করেছে। তখন গ্রামগুলির সর্বত্র এক সর্বাঙ্গীন প্রাণশক্তি পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকতো। এমন কোন পল্লী তখন ছিল না যেখানে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা ছিল না। পল্লীর সম্পন্ন ব্যক্তিদের চণ্ডীমণ্ডপগুলিই ছিল এই সকল পাঠশালার অধিষ্ঠানস্থল। চার-পাঁচটি পল্লীর মধ্যে অন্তত একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন যাঁর ব্রত ছিল বিনা পারিশ্রমিকে বিদ্যাদান করা। সামাজিক বিশুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্ব নিঃস্বার্থভাবে গ্রহণ করতেন তিনি। সেকালে ঐশ্বর্যের ভোগ নিতান্ত সঙ্কীর্ণভাবে ব্যক্তিগত ছিল না। ফলে " এক-একটি মূল ঐশ্বর্যের ধারা থেকে সর্বসাধারণের নানা ব্যবহারের বহুশাখাবিভক্ত ইরিগেশন-ক্যানালগুলি নানাদিকে প্রসারিত হত।"[১২৭] তাই তখন জলের অভাব হয়নি, অন্নের অভাব হয়নি, মানুষের চিত্তকে উপবাসী থাকতে হয়নি।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসনে যখন ইউরোপীয় আদর্শে কিছুসংখ্যক মানুষের হাতে ধনের সঞ্চয় গড়ে উঠলো, অধিক সংখ্যক মানুষ বঞ্চিত হতে লাগলো তখন পল্লীর অবস্থা-বিপর্যয় দেখা দিল। পল্লীর যে সর্বজনস্বীকৃত সহজ ব্যবস্থার মধ্যে ধনী-দরিদ্র সকলের মধ্যে সামাজিক যোগ ছিল বাইরের আঘাতে সেই স্নায়ুজাল খণ্ড খণ্ড হওয়ায় পল্লীর মধ্যে প্রাণদৈন্য দেখা দিল। পূর্বে ধনীদের একটা দরজা ছিল নিজের দিকে খোলা, অন্যটি সমাজের দিকে। " তখন যে ছিল ধনী তার সৌভাগ্য চারিদিকের লোকের মধ্যে ছিল ছড়ানো। তখন যাকে বলত ক্রিয়াকর্ম তার মানেই ছিল রবাহূত অনাহূত সকলকেই নিজের ঘরের মধ্যে স্বীকার করার উপলক্ষ্য।"[১২৮]

কিন্তু ধনীরা আজ শহরে এসে ধনভোগ করছে। তারা আজ ধনের ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ সঞ্চয়ে বিশ্বাসী। তাই আজ পল্লীর লোকেরা আপন ভাগ্যের কার্পণ্য নিয়ে হাহাকার করছে। ধনের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার এই ত্রুটিই আজকের দিনে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানকে তীব্রতর করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ ধনের এই অসাম্য দূরীকরণের পথে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানকে দূর করতে চেয়েছিলেন—"এর একটিমাত্র উপায় বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি যদি স্বতঃই একত্রিত হতে পারে এবং সম্মিলিত ভাবে ধন উৎপাদন করে। তা হলে ধনের স্রোতটা সকলের মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে। ধনীকে মেরে এ কাজ সম্পন্ন হয় না, ধনকে সকলের মধ্যে মুক্তিদানের দ্বারাই হতে পারে, অর্থাৎ ঐক্যের সত্য অর্থনীতির মধ্যেও প্রচলিত হতে পারলে তবেই অসাম্যগত বিরোধ ও দুর্গতি থেকে মানুষ রক্ষা পেতে পারে।"[১২৯]

সমবায় প্রণালীতে ধন উপার্জনের উপর তাই রবীন্দ্রনাথ জোর দিতে চেয়েছিলেন। এই প্রণালীতে মানবনীতির একটি বড় জায়গা ছিল। অর্থাৎ ধনের বিন্যাস বা বন্টনের ক্ষেত্রে মানবিক শুভচেতনা বা হিতাকাঙ্খা কাজ করবে। রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতির মডেল তাই মানবসত্তার কিংবা বিশ্বসভ্যতার পরিপন্থী ছিল না। তিনি তাই দেখেছিলেন—"অর্থনীতিতে যে মানবনীতির স্থান ছিল না বলেইএত অশান্তি ছিল সেখানে সেই মানবসত্যের আবির্ভাব হচ্ছে। একদা দুর্বল জীব প্রবল জীবের রাজ্যে জয়ী হয়েছে, আজ দুর্বল হবে জয়ী—প্রবলকে মেরে নয়, নিজের শক্তিকে ঐক্যদ্বারা প্রবলরূপে সত্য ক'রে। সেই জয়ধ্বজা দূর হতে আমি দেখতে পাচ্ছি। সমবায়ের শক্তি দিয়ে আমাদের দেশের সেই জয়ের আগমনী সূচিত হচ্ছে।"[১৩০]

রবীন্দ্রনাথ একারণেই মনে করেছেন, আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরা প্রধান। বিরাট্‌কায় ধনের পায়ের চাপ থেকে সমাজকে, মানুষের সুখশান্তিকে বাঁচাবার ভার তাদের উপর নির্ভরশীল। অর্থোপার্জনের কঠিন বেড়া দেওয়া ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রবেশপথ নির্মাণ তাদেরই হাতে। নির্ধনের দুর্বলতা এতদিন মানুষের

সভ্যতাকে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ করে রেখেছিল, আজ নির্ধনকেই তার সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার প্রতিকার করতে হবে।

কিন্তু ধনী-দরিদ্র, জাত-পাত নির্বিশেষে ছোট-বড়কে এক ক্ষেত্রে মেলানোর ক্ষেত্রে বিরাট সামাজিক বাধা ছিল। সেদিনের লোকহিতকারীরা পল্লীর হিতসাধন কর্মে অগ্রসর হয়ে পল্লীর মানুষের কাছের হয়ে উঠতে পারেননি, ধর্মীয় বা জাতিগত বাধাকে ঠেলে ছোটোর কাছাকাছি পৌঁছতে পারেননি। বঙ্গভঙ্গের সময়ে যখন মুসলমানদের দলে টানার প্রয়াস নিয়েছিল এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা, সেদিন ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে—" আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর উপকার অতি সহজে করিতে পারে কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না, ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।"[১৩১]

তাই আত্মাভিমানের মদকে বিসর্জন দিয়ে ছোট-বড়কে একসঙ্গে মিলতে হবে। আমাদের দেশের অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত করার পথ হল তাদের সর্বপ্রথমে নিজেদের লোক বলে জানা। শিক্ষাই যে একমাত্র এই পথ প্রস্তুত করতে পারে রবীন্দ্রনাথ একথা জোরের সঙ্গে বলেছেন। কেননা শিক্ষাই তাদেরকে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

ঢ. গ্রাম-শহরের পার্থক্য দূরীকরণ :

রবীন্দ্রনাথ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় আস্থাশীল ছিলেন। এর মধ্যে অবশ্যই নিহিত থেকেছে সম্পদের সুষম বন্টন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তাঁর সমকালে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কীভাবে বেড়ে গেছে। পূর্বে পল্লীর যে সামাজিক প্রকৃতি তা শহরেও স্থান পেয়েছে। শহরের সঙ্গে পাড়াগাঁয়ের চেহারার মিল না থাকলেও চরিত্রের মিল ছিল। ধনী দরিদ্র সেখানে যেমন সহাবস্থানে সহযোগিতাপূর্ণ সহাবস্থান করেছে তেমনি শহর পল্লীর জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করেছে। কিন্তু—"দেখতে দেখতে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নগর একান্ত নগর হয়ে উঠল, তার খিড়কির দরজা দিয়েও গ্রামের আনাগোনার পথ রইল না। একেই বলে 'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ'; গ্রামগুলি শহরকে চারি দিকেই ঘিরে আছে, তবু শত যোজন দূরে।"[১৩২]

এই বিভেদ যে কখনোই কল্যাণকর হতে পারে না তা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই জানিয়েছেন। এই বিশেষ প্রবণতা কেবল ভারতবর্ষের নয়, সারা বিশ্বের এক কালগত সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল।পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি থেকেই এই মারণবীজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং মানুষের প্রাণের শান্তি ও স্বস্তিকে বিনষ্ট করেছিল। যতকিছু সুযোগ যতকিছু ভোগের আয়োজন যত কিছু ঐশ্বর্য আর আড়ম্বর সব নগরে পুঞ্জীভূত হয়। আর পল্লীগুলি কেবল অন্নযোগানোর প্রাণপন দায়িত্ব পালন করে দাসের মত কোনমতে জীবনধারণ করে মাত্র।

সেদিন বহু লোক দেশে বিলাসিতার সমৃদ্ধিকে ধন বৃদ্ধির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের মতই অনুরূপ মতকে অস্বীকার করে স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন—" কিন্তু একথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্বে যে-অর্থ সাধারণের কার্যে ব্যয়িত হইত, এখন তাহা ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয়িত হইতেছে। ইহাতে ফল হইতেছে দেশের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া, শহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। সমস্ত বাংলাদেশে পল্লীতে দেবমন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল স্নান-পানের অযোগ্য হিতেছে, গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে, এবং যে-দেশ বারো মাসে তেরো পার্বণে মুখরিত হইয়া থাকিত সে-দেশ নিরানন্দ নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। দেশের অধিকাংশ অর্থ শহরে আকৃষ্ট হইয়া, কোঠাবাড়ি গাড়িঘোড়া সাজসরঞ্জাম আহারবিহারেই উড়িয়া যাইতেছে। অথচ যাঁহারা এইরূপ ভোগবিলাসে ও আড়ম্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় কেহই সুখে স্বচ্ছন্দে নাই; তাঁহাদের অনেকেরই টানাটানি, অনেকেরই ঋণ, অনেকেরই পৈতৃক সম্পত্তিকে মহাজনের দায়মুক্ত করিবার জন্য চিরজীবন নষ্ট হইতেছে—কন্যার বিবাহ দেওয়া, পুত্রকে মানুষ করিয়া তোলা, পৈতৃক কীর্তি রক্ষা করিয়া চলা, অনেকেরই পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। যে-ধন সমস্ত দেশের বিচিত্র অভাব মোচনের জন্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে ঐশ্বর্যের মায়া সৃজন করিতেছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত সঞ্চার হয় , তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। দেশের ধর্মস্থানকে বন্ধুস্থানকে কৃশ করিয়া, কেবল ভোগস্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে, বাহির হইতে মনে হয় যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেইজন্য এই ছদ্মবেশী সর্বনাশই আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ।"[১৩৩]

এই প্রবণতা আজকের দিনেও সমানভাবে বহমান। এতে সমাজের একদিকে আলো পড়লেও আর একদিক চির অন্ধকারে ঢাকা থাকে, তা মানুষের সামগ্রিক ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তা মানুষের প্রবৃত্তিকে দেয় অনর্গল করে। সারা পৃথিবীতে আজ এরই মারণযজ্ঞ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে, যুদ্ধ ও রক্তপাত তথা সাম্রাজ্যবাদকে

প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ তাই মনে করেছেন মানবসমাজের সর্বত্র এই যে এক প্রাণশোষণকারী বিদীর্ণতা বা বিচ্ছিন্নতা এসেছে একদিন মানুষকে এর চরম মূল্য দিয়ে দেউলে হতে হবে। সেই দিন অতি নিকটে—"আজ পৃথিবীর আর্থিক সমস্যা এমনি দুরূহ হয়ে উঠেছে যে, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা তার যথার্থ কারণ এবং প্রতিকার খুঁজে পাচ্ছে না। টাকা জমছে অথচ তার মূল্য যাচ্ছে কমে, উপকরণ-উৎপাদনের ত্রুটি নেই অথচ তা ভোগে আসছে না। ধনের উৎপত্তি এবং ধনের ব্যাপ্তির মধ্যে যে ফাটল লুকিয়ে ছিল আজ সেটা উঠেছে মস্ত হয়ে। সভ্যতার ব্যবসায়ে মানুষ কোনো-এক জায়গায় আর দেনা শোধ করছিল না, আজ সেই দেনা আপন প্রকাণ্ড কবল বিস্তার করেছে। সেই দেনাকেও রক্ষা করব অথচ আপনাকেও বাঁচাব এ হতেই পারে না।"[১৩৪]

তাই গ্রাম ও নগরের এই পার্থক্যকে মুছে ফেলার একমাত্র উপায় হিসেবে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন আমাদের সকল কর্মশ্রমকে মিলিত করে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্য লাভ করা। ধনের কেন্দ্রিকরণের বিরুদ্ধে বা ধনের সুষম বন্টনের দ্বারাই কিন্তু এই প্রয়াস সফল হতে পারে। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কর্মসমবায় বা ধনের সমবায় রচনা। জানিয়েছেন—"আমাদের এই গ্রামপ্রতিষ্ঠিত কৃষিপ্রধান দেশে একদিন সমবায়নীতি অনেকটা পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখন মানুষের জীবনযাত্রা ছিল বিরলাঙ্গিক। প্রয়োজন অল্প থাকাতে পরস্পরের যোগ ছিল সহজ। তখনো স্বভাবতই ধনীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল; কিন্তু এখন ধনীরা আত্মসম্ভোগের দ্বারা যেমন বাধা রচনা করেছে তখন ধনীরা তেমনি আত্মত্যাগের দ্বারা যোগ রচনা করেছিল। ......এই পথ অনুসরণ করে আজ ভারতবর্ষের জীবিকা যদি সমবায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতসভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে।"[১৩৫]

পল্লীর স্বাস্থ্য ও সামাজিক সাম্যের প্রয়োজনে, মানবিক অপচয়রোধেও গ্রাম শহরের ভেদাভেদ মুছে পল্লীগুলিকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছেনরবীন্দ্রনাথ। জানিয়েছেন—" শহরে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন। বিশেষত আমাদের যে দেশের সমাজ গৃহের উপরে প্রতিষ্ঠিত সেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধর্মের প্রধান অবলম্বন জীর্ণ হইয়া পড়ে ও সমাজের মর্মস্থানে বিষসঞ্চার হইতে থাকে সে দেশে বড়ো বড়ো কারখানা যদি শহরের মধ্যে আবর্ত রচনা করিয়া চারি দিকের গ্রামপল্লী হইতে দরিদ্র গৃহস্থদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে তবে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত, বাসস্থান হইতে বিশ্লিষ্ট স্ত্রীপুরুষগণ নিরানন্দকর কলের কাজে ক্রমশই কিরূপ দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কলের দ্বারা কেবল জিনিসপত্রের উপচয় করিতে গিয়া মানুষের অপচয় করিয়া বসিলে সমাজের অধিকদিন তাহা সহিবে না। অতএব পল্লীবাসীরাই একত্রে

মিলিলে যে-সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্থানেই কর্মের উন্নতি করিতে পারিলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে।”[১৩৬]

গ্রাম ও শহরের এই যে বিচ্ছেদ আমাদের ঐক্যবদ্ধ দেশ গঠনের পক্ষেও প্রতিকূল ছিল। পল্লীর নিরক্ষর মানুষ বা চাষাদের প্রতি শহুরে বাবুদের উপেক্ষা অবজ্ঞাই এক সামাজিক বিচ্ছেদের দুরপনেয় ব্যবধান গড়ে দিয়েছিল। তাই দেশের সঙ্কটের দিনে ঐক্যবদ্ধ দেশগঠনের স্বার্থে শহুরে বাবুরা পল্লীর চাষাভূষো মানুষ গুলোকে ভাই বলে কাছে টানতে চাইলেও তারা সফল হননি। ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’ প্রবন্ধে তাই ‘ রবীন্দ্রনাথ পুনরায় জাতির দৃষ্টিকে গ্রাম-সমস্যার দিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলেন। রবীন্দ্রনাথ জানালেন এই দরিদ্র কৃষকদের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করবার মধ্যেই আমাদের স্বাদেশিক বা জাতীয় আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতাটি নিহিত রয়েছে।’[১৩৭] রবীন্দ্রনাথ দেশের প্রকৃত প্রাণকেন্দ্র পল্লীতে মানুষের উন্নতিকল্পে নিজেকে নিয়োজিত করার কাজে যারা এগিয়ে আসবেন তাদের কাছে গূঢ় সত্যকে তুলে ধরে তাই এ প্রবন্ধে জানিয়েছেন—

“ আজ আমাদের ইংরেজি-পড়া শহরের লোক যখন গ্রামের লোকের কাছে গিয়া বলে ‘আমরা উভয়ে ভাই’—তখন এই ভাই কথাটার মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যাহাদিগকে আমরা ‘চাষা বেটা’ বলিয়া জানি, যাহাদের সুখদুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে গবর্মেন্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকা পড়িতে হয়, সুদিনে দুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, আজ হঠাৎ ইংরেজের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিবার বেলায় তাহাদের নিকট ভাই-সম্পর্কের পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে চড়া দামে জিনিস কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহ্বান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা। সন্দেহ জন্মিয়াও ছিল। কোনো বিখ্যাত ‘স্বদেশী’ প্রচারকের নিকট শুনিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গে মুসলমান শ্রোতারা তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে, বাবুরা বোধ করি বিপদে ঠেকিয়াছে। ইহাতে তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু চাষা ঠিক বুঝিয়াছিল। বাবুদের স্নেহভাষণের মধ্যে ঠিক সুরটা যে লাগে না তাহা তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। উদ্দেশ্যসাধনের উপলক্ষ্যে প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে ক্ষুদ্রব্যক্তির কাছেও তাহা বিস্বাদ বোধ হয়—সে উদ্দেশ্য বড়ো হইতে পারে, হউক তাহার নাম ‘বয়কট’ বা ‘স্বরাজ’, দেশের উন্নতি বা আর কিছু। মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বদেশী বলিয়া স্নেহবশত আমরা যদি সহজেই দেশের জনসাধারণকে ভালোবাসিতাম, ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া মিলনকে যদি দৃঢ় করিতে পারিত, তাহাদের মাঝখানে থাকিয়া তাহাদের আপন হইয়া তাহাদের সর্বপ্রকার হিতসাধনে যদি আমাদের উপেক্ষা বা আলস্য না থাকিত তবে আজ বিপদ বা ক্ষতির মুখে তাহাদিগকে ডাক পাড়িলে সেটা অসংগত শুনিতে হইত না।”[১৩৮]

ণ. গোপালন :

গোরু যে উপকারী প্রাণী রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশব থেকেই শহর কলকাতায় নিজের বাড়িতেই দেখেছেন। শুধু ঠাকুর পরিবার নয়, উনিশ শতকের গ্রামীণ আবহের কলকাতায় প্রতিটি সম্পন্ন পরিবারেই গোরু পোষা হত ঘরে উৎপাদিত খাঁটি দুধ খাওয়ার জন্য। " আমরা জানি,সেই ১৮৩০ সালে রামমোহন রায় যখন ইংলণ্ড যান, তখন প্রতিদিন খাঁটি দুধ খাওয়ার জন্য, জাহাজে করে দুধ দেওয়া গাই ও পরিচর্যার লোক নিয়ে গিয়েছিলেন। বাড়িতে গোরু পুষে প্রতিদিন সেটির দুধ খেতেন রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ। তিনি মিষ্টি দুধ খেতে ভালোবাসতেন। কিন্তু গুড় বা মিষ্টি মিশিয়ে খেতেন না। তিনি নিয়মিত যে গাইয়ের দুধ খেতেন, সে-গাইকে রোজ প্রচুর পরিমাণে গুড় খাওয়ানো হত। ফলে সেই গোরুর দুধ সুস্বাদু ও মিষ্টি স্বাদের হত।"[১৩৯]

আমরা 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানতে পারি যে ঠাকুর পরিবারের বালকদেরও প্রচুর পরিমাণে দুধ খাওয়ানো হত। 'ভৃত্যরাজক তন্ত্র' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তাদের দেখভাল ও তদারকির দায়িত্বে থাকা ভৃত্য ঈশ্বর রোজ আফিম খেত। তাই সে বালকদের জন্য বরাদ্দ দুধ খেয়ে তার সঙ্গে জল মিশিয়ে বালকদের দিত—" আমাদের বরাদ্দ দুধ যখন আমাদের সামনে আনিয়া উপস্থিত করিত, তখন সেই দুধ সম্বন্ধে বিপ্রকর্ষণ অপেক্ষা আকর্ষণ শক্তিটাই তাহার মনে বেশি প্রবল হইয়া উঠিত। আমরা দুধ খাইতে স্বভাবতই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিলে, আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির দায়িত্বপালন উপলক্ষেও সে কোনোদিন দ্বিতীয়বার অনুরোধ বা জবরদস্তি করিত না।"[১৪০] 'জীবনস্মৃতি'র হিমালয়যাত্রা অধ্যায়েও লিখেছেন—" দুধ খাওয়া আমার আর এক তপস্যা ছিল। আমার পিতা প্রচুর পরিমাণে দুধ খাইতেন। আমি এই পৈতৃক দুগ্ধপান শক্তির অধিকারী হইতে পারিতাম কিনা নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু, পূর্বেই জানাইয়াছি , কী কারণে আমার পানাহারের অভ্যাস সম্পূর্ণ উল্টোদিকে চলিয়াছিল। তাহার সঙ্গে বরাবর আমাকে দুধ খাইতে হইত।"[১৪১]

পুষ্টিকর পানীয় হিসেবে দুধের বিকল্প নেই, একথা রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ-সাহজাদপুরের পল্লীবাস পর্ব থেকে যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি গোরুর প্রতি অযত্নও তাঁকে ভাবিত করে তুলেছিল। শিলাইদহ পর্বে লেখা 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৬ সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছিলেন—"আমার এই খোলা জানলার মধ্য দিয়ে নানা দৃশ্য দেখতে পাই। সব সুদ্ধ বেশ লাগে। কিন্তু এক-একটা দৃশ্য দেখে মন বিগড়ে যায়। গাড়ির উপর অসম্ভব ভার চাপিয়ে যখন গোরুকে কাঠির বাড়ি খোঁচা দিতে থাকে তখন আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়।"[১৪২] রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের শেষ দশকের অন্তিম চরণ থেকে তাই গোপালনকে বিশেষ গুরুত্বদানের ব্যাপারে ভাবতে শুরু করেন। তাঁর এই ভাবনার সাহিত্যিক প্রকাশ দেখি ১৯০৪ সালে প্রকাশিত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধে

রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক উদ্দামতার বাইরে পল্লীসংগঠনের জন্য যে কয়েক দফার সংবিধান বা নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন তার ৮ নং ধারায় উল্লেখ করেনযে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন করতে হবে ও সেখানে যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদের কৃষিকার্য বা গোরু-মহিষ পালন দ্বারা জীবিকা উপার্জনোপযোগী শিক্ষা দান করতে হবে ও কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গোসম্পদের কি বিরাট ভূমিকা রয়েছে তা বুঝেছিলেন। কিন্তু দেখেছিলেন যথাযথ উপায়ে গোপালনের ব্যাপারে পল্লীর মধ্যে তেমন কোন উদ্যোগ-আয়োজন ছিল না। তিনি জানিয়েছেন—"যখন দেশে পোড়ো জমির অভাব ছিল না, তখন চরিয়া খাইয়া গোরু সহজেই সুস্থ সবল থাকিত। আজ প্রায় সকল জমি চষিয়া ফেলা হইল; রাস্তার পাশে, আলের উপরে, যেটুকু ঘাস জন্মে সেইটুকু মাত্র গোরুর ভাগ্যে জোটে, অথচ তাহার আহারের বরাদ্দ পূর্বাপর প্রায় সমানই আছে। ইহাতে জমিও নিস্তেজ হইতেছে, গোরুও নিস্তেজ হইতেছে এবং গোরুর কাছ হইতে যে সার পাওয়া যায় তাহাও নিস্তেজ হইতেছে।"[১৪৩]

ত. স্বাস্থ্য :

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর যে ছবিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন জমিদারি কাজকর্মের সূত্রে সে ম্যালেরিয়া-প্লেগ-দুর্ভিক্ষে ম্লান ও বিপর্যস্ত। জীবনের প্রথম প্রভাতে দূর থেকে পল্লীজীবনকে দেখে তার যে রোম্যান্টিক ছবিকে কাব্যের আধারে গেঁথে তুলেছিলেন বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন তার স্বতন্ত্র ছবি। হয়তো কাব্যাঙ্গিকের আধারে তার রূপচিত্র আঁকতে গিয়ে নিজস্ব সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু স্বতন্ত্র রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। কিন্তু প্রবন্ধ সাহিত্যের আধারে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর স্বাস্থ্যব্যবস্থার সমস্যা এবং তার সমাধানের পথনির্দেশ দিয়েছেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই।

রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন আমাদের দেশের পল্লীগুলিতে যে ম্যালেরিয়া প্লেগ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব তার কারণ, আমরা এতদিন একটা ব্যবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করে আসছিলাম, কিন্তু আজ বাইরের সংঘাতে আমাদের অবস্থান্তর ঘটেছে। তিনি জানিয়েছেন—" ম্যালেরিয়ার কারণ দেশে নূতন হইয়াছে এমন নহে। চিরদিনই আমাদের দেশ জলা দেশ—বনজঙ্গল এখনকার চেয়ে বরং পূর্বেই বেশিই ছিল, এবং কোনোদিন এখানে মশার অভাব ছিল না। কিন্তু দেশ তখন স্বচ্ছল ছিল। যুদ্ধ করিতে গেলে রসদের দরকার হয়—সর্বপ্রকার গুপ্ত মারীশত্রুর সহিত লড়াইয়ে সেদিন আমাদের রসদের অভাব ছিল না। আমাদের পল্লীর অন্নপূর্ণা সেদিন নিজের সন্তানদিগকে অর্ধভুক্ত রাখিয়া টাকার লোভে পরের ছেলেকে স্তন্য দিতে যাইতেন না। শুধু তাই নয়, তখনকার সমাজব্যবস্থায় পল্লীর জলাশয়—খনন ও

সংস্কারের জন্য কাহারো অপেক্ষা করিতে হইত না—পল্লীর ধর্মবুদ্ধি পল্লীর অভাবমোচনে নিয়ত জাগ্রত ছিল। আজ বাংলার গ্রামে গ্রামে কেবল যে জলকষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, প্রাচীন জলাশয়গুলি দূষিত হইয়াছে। এইরূপে শরীর যখন অন্নাভাবে হীনবল এবং পানীয়জল যখন শোধনাভাবে রোগের নিকেতন, তখন বাঁচিবার উপায় কী। এইরূপে প্লেগও সহজেই আমাদের দেশ অধিকার করিয়াছে—কোথাও সে বাধা পাইতেছে না, কারণ পুষ্টি-অভাবে আমাদের শরীর অরক্ষিত।"[১৪৪]

এই পুষ্টির অভাবের কারণ 'নানা নূতন নূতন প্রণালী-যোগে অন্ন বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে—আমরা যাহা খাইয়া এতদিন মানুষ হইয়াছিলাম তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পাইতেছি না।'[১৪৫] পাড়াগাঁয়ে আজ দুধ দুর্লভ, ঘি দুর্মূল্য, কলকাতার থেকে আসা ভেজাল তেলের ছড়াছড়ি। গ্রামের পুকুরগুলিতে জলাভাবের কারণে মাছের প্রাচুর্য নেই। ফলে আমাদের দেশে যে প্লেগ ওলাওঠা দুর্ভিক্ষ আকস্মিক ছিল মাত্র আজা তারা পল্লীর মধ্যে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। বাৎসরিক মৃত্যুপরিসংখ্যান সে দিকের নির্দেশ দেয়। অথচ সেদিন আমাদের দেশে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার প্রবর্তন ঘটেছে। সরকারী অবহেলা এবং অ্যালোপ্যাথির প্রয়োগগত নানা ত্রুটির কারণে সেদিন রবীন্দ্রনাথকেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে পল্লীর মধ্যে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল—

" অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সেই 'হাঁটি হাঁটি পা পা' যুগে মানুষ দেখল জ্বর সারানোর ওষুধ অ্যাসপিরিনে হয়তো জ্বর সারলো কিন্তু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা গেল পেটে আলসারের ব্যথা। আধুনিক রোগনির্ণয় পদ্ধতি তখনো সুদূর ভবিষ্যৎ। সুতরাং তৎকালীন জনসমাজ অন্য রোগসৃষ্টিকারী চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে কিছুটা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথও সারাজীবন হোমিওপ্যাথিতে গভীর আস্থা রেখেছেন এবং নিজের ও নিকটজনের শুধু নয়—শান্তিনিকেতন, রামগড়, শিলাইদহ যখন যেখানেই থেকেছেন অজস্র সাধারণ গ্রামবাসীর চিকিৎসা করেছেন।"[১৪৬]

থ. ম্যালেরিয়া নিবারণ :

বাংলার পল্লী অঞ্চল একদা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এর বিবরণ দিয়ে বলেছেন—"সেদিন আমাদের একদল লোক চিত্রকলা অভ্যাস করতে গ্রামের চিত্রকলা দেখতে গিয়েছিল। তারা এসে বললে, 'আমাদের আর অন্নে রুচি হয় না; দেখলাম একেবারে উজাড় হয়েছে—একটা গ্রামে, বড়ো গ্রামে, বড়ো বড়ো বাড়ি পড়ে রয়েছে। চার ঘর কায়স্থ রয়েছে। এখনো বেঁচে আছে কী করে জিজ্ঞাসা করায় বলল, আমরা বৎসরের মধ্যে দুবার আসানসোল কি বর্ধমান গিয়ে সম্বৎসরের কাপড়-চোপড় নিয়ে আসি। যে-কয়দিন বেঁচে আছি এমনি ভাবে যাবে, যখন মৃত্যুর পরোয়ানা

আসবে যাব। এক জায়গায় দেখলাম-সমস্ত বড়ো বাড়ি। যারা ৫০/১০০ বৎসর পূর্বে বর্ধিষ্ণু লোক ছিল এখন সেখানে তাদের রথ পড়ে আছে, দেবতা অচল।'"[১৪৭]

এই ম্যালেরিয়া নিবারণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ সেদিনের পল্লীকে বাঁচানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে কাজ বাইরের কারো দ্বারা হওয়ার নয়। পল্লীবাসীকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়েই এ কাজ নিজেদেরকেই করতে হবে। নতুবা এই বিরাট সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান কয়েকজনের পক্ষে করা সম্ভব নয়। ম্যালেরিয়া আমাদের মধ্যেকার সমস্ত শক্তিকে নিস্তেজ করে দিয়ে সকল প্রকার উদ্যম ও প্রয়াসকে একেবারে মাটি করে দেয়। পল্লী অঞ্চলে না গেলে এই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা এক অর্থে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাই জানিয়েছেন—"গাঁয়ে না গেলে বুঝতে পারবেন না ম্যালেরিয়া কী ভীষণ প্রভাব বিস্তার করেছে। অনেকের যকৃৎ-পিলেতে পেট ভর্তি হয়ে আছে, সুতরাং ম্যালেরিয়া দূর করতে হবে—বেশি করে বুঝাবার দরকার নাই। আমরা অনেকে জানি ম্যালেরিয়া কিরকম গোপনে ধীরে ধীরে মানুষকে জীবন্মৃত করে রাখে। এদেশে অনেক জিনিস হয় না; অনেক আরম্ভ করি, শেষ হতে চায় না; অনেক কাজেই দুর্বলতা দেখতে পাই—পরীক্ষা করতে দেখা যায় ম্যালেরিয়া শরীরের মধ্য থেকে তেজ কেড়ে নিয়েছে। চেষ্টা করবার ইচ্ছাও হয় না।"[১৪৮]

ন. শিল্প :

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে নিজেই জানিয়েছেন একসময় জ্যোতিদাদা কলকাতার কোন এক গলির মধ্যে যে স্বাদেশিক সভা স্থাপন করেছিলেন, যার সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, সেই সভার সভ্য ছিলেন তিনি। এই সভা দেশীয় শিল্পের বিকাশের জন্য প্রাথমিক প্রয়াস নেয়—

"স্বদেশে দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন , আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরাকাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে-তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশালাই তৈরি হইল। ভারতসন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে—আমাদের এক বাক্সে যে-খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা-ধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল, একটি কোন অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কি না তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না—কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারও চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু, মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে।" বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য—তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।"[১৪৯]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর উন্নয়নের জন্য শিল্পস্থাপন ও শিল্প সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন—' ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজত্ব পাইয়া অবধি ইচ্ছাপূর্বক চেষ্টাপূর্বক ছলে বলে কৌশলে ভারতের শিল্পকে পঙ্গু করিয়া সমস্ত দেশকে কৃষিকার্যে দীক্ষিত করিয়াছে।'[১৫০] বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই আমাদের দেশে কাপড় ও সূতোর কারখানার প্রথম সূত্রপাত। কিন্তু দেশের মন বড়ো ব্যবসা বা যন্ত্রের ব্যবহারে সক্ষম হতে হবে—মনে রাখতে হবে যে আত্মীয় মণ্ডলীর মধ্যে নিঃস্ব কুটুম্বের মতো কৃপাপাত্র আর কেউ নেই।"[১৫১]

তাই সেগুলি নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে চলছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। বাংলাদেশে একদিন যে 'বঙ্গলক্ষ্মী' নাম নিয়ে কাপড়ের কল দেখা দিয়েছিল। ক্রমে দেখা দেয় 'মোহিনী' মিল। এগুলি সাংঘাতিক মার খেয়েও আজো বেঁচে আছে। একে একে বেশ কিছু কারখানা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেও। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—"এদের যেমন করে হোক রক্ষা করতে হবে—বাঙালির উপর এই দায় রয়েছে। চাষ করতে করতে যে কেবল ফসল ফলে তা নয়, চাষের জমিও তৈরি করে। কারখানাকে যদি বাঁচাই তবে কেবল যে উৎপন্ন দ্রব্য পাব তা নয়, দেশে কারখানার জমিও গড়ে উঠবে।"[১৫২] এই অভিপ্রায় ছিল বলেই আমরা দেখেছি—

"শ্রীনিকেতনে যে গ্রামীণ স্তরের সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছিল তার এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ ও শিল্পীদের প্রশিক্ষণ। একেও দারিদ্র্যমোচন প্রয়াসের বিশেষ অঙ্গ বলে ধরা যায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বাংলার কাপড়ের মিলকে বাঁচাবার প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন। চরকা সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হলেও এই বিষয়ে মতৈক্য হয়েছিল। যন্ত্র ব্যবহারের অদক্ষতার জন্যই যে বোম্বাই মিলের সঙ্গে বাংলার মিল প্রতিযোগিতা করতে পারছে না এও তাঁর সুচিন্তিত অভিমত । তিনি প্রস্তাব করেছিলেন বাংলার কাপড়ের মিলের প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ। বিদেশী সূতো ব্যবহারেও তাঁর কোনো

অনীহা ছিল না। স্বভাবতই স্বদেশী শিল্পপ্রসারে তাঁর গভীর ঔৎসুক্য ছিল। য়ুরোপীয় প্রযুক্তি গ্রহণে তাঁর আপত্তি না থাকায় বৃহদায়তন শিল্পে তাঁর আপত্তি থাকার কথা নয়। য়ুরোপও আমেরিকা ভ্রমণকালে তিনি নিশ্চয়ই প্রযুক্তিনির্ভর বৃহদায়তন শিল্পপ্রসারের প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন।"[১৫৩]

দেশীয় শিল্পকে বাঁচানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দেশীয় পণ্যের ব্যবহারের জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন। বলেছিলেন—"বাংলার মিল থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে, যথাসম্ভব একান্তভাবে সেই কাপড়ই বাঙালি ব্যবহার করবে ব'লে যেন পণ করে। একে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা। উপবাসক্লিষ্ট বাঙালির অন্নপ্রবাহ যদি অন্য প্রদেশের অভিমুখে অনায়াসে বইতে থাকে এবং সেই জন্য বাঙালির দুর্বলতা যদি বাড়তে থাকে, তবে মোটের উপর তাতে সমস্ত ভারতেরই ক্ষতি। আমরা সুস্থ সমর্থ হয়ে দেহ রক্ষা করতে যদি পারি তবেই আমাদের শক্তির সম্পূর্ণ চালনা সম্ভব হতে পারে। সেই শক্তি নিরশনক্ষীণতায় অবমর্দিত হলে তাতে শুধু ভারতকে কেন, পৃথিবীকেই বঞ্চিত করা হবে।"[১৫৪]

বাঙালির শিল্প সম্পর্কিত উদাসীনতাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তার জন্য আমাদের দেশের মিউনিসিপ্যালিটি গুলির কর্তব্য হবে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাংলার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা এবং বাঙালি যুবসম্প্রদায়ের মনে সেই উৎসাহ জাগানো যাতে তারা বাঙালির হাতের ও কলের জিনিস ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়। বিদেশী মিলে তৈরি কাপড় আমাদের কাছে যতই সুলভ হোক না কেন রবীন্দ্রনাথ বাঙালির কাছে দাবি রেখেছেন—"...কেবলই কি পণ্যের হিসাবটাই বড়ো হবে, শিল্পের দাম তার তুলনায় তুচ্ছ? সেটাকে আমরা মূঢ়ের মতো বধ করতে বসেছি। অথচ যে যন্ত্রের বাড়ি তাকে মারলুম সেটা কি আমাদের যন্ত্র। সেই যন্ত্রের চেয়ে বাংলাদেশের বহুযুগের শিক্ষাপ্রাপ্ত গরিবের হাত দুখানা কি অকিঞ্চিৎকর। আমি জোর করেই বলব, পুজোর বাজারে আমাকে যদি কিনতে হয় তবে আমি নিশ্চয়ই বোম্বাইয়ের বিলিতি যন্ত্রের কাপড় ছেড়ে ঢাকার দিশি তাঁতের কাপড় অসংকোচে এবং গৌরবের সঙ্গেই কিনব। সেই কাপড়ের সুতোয় বাংলাদেশের বহু যুগের প্রেম এবং আপন কৃতিত্ব গাঁথা হয়ে আছে।"[১৫৫]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এও বলেছেন, সুলভ মূল্যের কাপড় দরিদ্র মানুষ কিনবেই, তার জন্য প্রাদেশিক দাবিতে মন ভাবে কাজ করবে না। তাই তাঁর দাবি—"সস্তা দামের যদি গরজ থাকে তাহলে মিলের কাপড় কিনতে হবে, কিন্তু সেজন্য যেন বাংলাদেশের বাইরে না যাই। যাঁরা শৌখিন কাপড় বোম্বাই মিল থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে প্রস্তুত, তারা কেন যে তাঁতির হাতের নৈপুণ্যকে আড়ষ্ট করে দিয়েছিল। আজ আমাদের নিজের দেশের লোকে

তার চেয়ে বড়ো বজ্র হানলে।"[১৫৬] তিনি জানিয়েছেন, বাংলা তাঁতে স্বদেশী মিলের বা চরকার সুতো ব্যবহার করেও তাকে যদি বাজারে চলন-যোগ্য দামে বিক্রি করা সম্ভবপর হয় তবে তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু তা যদি সম্ভব নাও হয় তাহলেও আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে 'বাঙালি তাঁতিকেও বাংলার শিল্পকে বিলিতি লৌহযন্ত্রও বিদেশী কয়লার বেদীতে বলিদান করব না।"[১৫৭]

স্বদেশী পণ্যের উপযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একদা যে বয়কট আন্দোলন শুরু হয়েছিল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ তাকে একদা সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ক্রমে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন এ আসলে দেশবাসীর প্রতি এক প্রকারের অন্যায় বই কিছু নয়। ১৩১৫-তে লেখা 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই জানিয়েছিলেন—"দেশে বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে স্বদেশী পণ্যের প্রচার যত বড়ো কাজই হউক লেশমাত্র অন্যায়ের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে হইবে এ কথা আমি কোনো মতেই স্বীকার করিতে পারি না।"[১৫৮] তিনি এ প্রবন্ধে অকপটে জানিয়েছেন—"আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানি না এবং অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে, বয়কট-ব্যাপারটা অনেক স্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। আমি যেটাকে ভালোবুঝি, দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের দ্বারা অন্য-সকলকে তাহা বুঝাইবার বিলম্ব যদি না সহে, পরের ন্যায্য অধিকারে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে, তবে অসংযমকে কোন সীমার মধ্যে আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কর্তব্যের নামে যখন অকর্তব্য প্রবল হয় তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে।"[১৫৯]

প. জল সমস্যার সমাধান :

পল্লী অঞ্চলে জলের সমস্যা একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট ছিল। সেচের কিংবা নিত্য ব্যবহার্য জলের পাশাপাশি পানীয় জলের ক্ষেত্রে এই সঙ্কট প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সঙ্কটের বাস্তব পরিচয় দিয়ে বলেছেন—"যে জলকষ্ট সমস্ত দেশকে অভিভূত করেছে তার সবচেয়ে প্রবল দুঃখ মেয়েদের ভোগ করতে হয়। মাতৃভূমির মাতৃত্ব প্রধানত আছে তার জলে......জল মায়ের মতো আমাদের পবিত্র করুক। জলাভাবে দেশে যেন মাতৃত্বের ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি মেয়েদের দেয় বেদনা। পদ্মাতীরে পল্লীতে থাকবার সময় দেখেছি চার-পাঁচ মাইল তফাত থেকে মধ্যাহ্ন রৌদ্র মাথায় নিয়ে তপ্ত বালুর উপর দিয়ে মেয়েরা বারে বারে জল বহন করে নিয়ে চলেছে। তৃষিত পথিক এসে যখন এই জল চায় তখন সেই দান কী মহার্ঘ দান!"[১৬০]

রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর আদর্শ গ্রাম পরিকল্পনায় জলসঙ্কট সমাধানের যাবতীয় প্রয়াস নেন। তাঁর অভিমত আমাদের দেশে দেবতার আশীর্বাদ জলধারাকে যথাযথ রূপে ধরে রাখার বন্দোবস্ত নেই বলে বর্ষাকালে বন্যা এবং গ্রীষ্মকালে ক্ষরার আবির্ভাব ঘটে। শুধু তাই নয়, 'যে-সকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে জলদান স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে'[১৬১]। তাই বিশ্বভারতীর উদ্যোগে পার্শ্ববর্তী পল্লীগুলিতে পুরনো পুকুর সংস্কার, নতুন পুকুর খননেরও ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"আমাদের বিশ্বভারতীর সেবাব্রতীগণ নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুসারে নিকটবর্তী পল্লীগ্রামের অভাব দূর করবার চেষ্টা করছেন। এদের মধ্যে একজনের নাম করতে পারি, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি এই সম্মুখের বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করতে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, অনেকেই তা জানেন। বহুকাল পূর্বে রায়পুরের জমিদার ভুবনচন্দ্র সিংহ ভুবনডাঙার এই জলাশয় প্রতিষ্ঠা করে গ্রামবাসীদের জলদান করেছিলেন। তখনকার দিনে এই জলদানের প্রসার যে কিরকম ছিল তা অনুমান করতে পারি যখন জানি এই বাঁধ ছিল পঁচাশি বিঘে জমি নিয়ে।

......কিন্তু আমার বিশ্বাস, স্বয়ং গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জনশক্তি সমবায়ের দ্বারা এই-যে জলাশয়ের উদ্ধার ঘটেছে তার গৌরব আরো বেশি। এই রকম সমবেত চেষ্টাই আমরা সমস্ত দেশের হয়ে কামনা করি।"[১৬২]

ফ. জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ :

রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি বিশেষ দিক ছিল জাত-পাত ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। এই জাত পাত-অস্পৃশ্যতার বেড়াজাল দেশের তথা পল্লীর মানুষকে কতটা চেতনাহীন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নিমজ্জিত করতো তার পরিচয় আছে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যেও। সামাজিক সংস্কারের নামে আমাদের দেশের সুসংস্কারগুলিকে বিলোপ করতে চাননি রবীন্দ্রনাথ। তাই জ্ঞানদা নন্দিনী দেবীর 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার' প্রবন্ধটির সমর্থনেই তিনি মত পোষণ করেছেন 'সমাজ' গ্রন্থের 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার' প্রবন্ধে। আসলে—

" রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারতবর্ষে যা সত্য, সুন্দর, যা প্রেম ও সৌন্দর্য তাই চেয়েছেন। মানুষকে ভেদবুদ্ধি মুক্ত হয়ে বৃহত্তর মানবসংসারের দিকে ধাবিত হতে বলেছেন। তিনি ভারতবর্ষের যে সংজ্ঞা দিলেন তাতে অস্পৃশ্যতা নেই, জাতপাত নেই, আছে এক 'কল্যাণের প্রতিমা'। আছে এক মহাজাতিক সত্তার প্রকাশ। এই মহাজাতিতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র

ভারতবাসীর ঠাঁই। আছে, ঐ সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঔপনিষদিক ঔদার্য। এই ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথের গোরা, নিখিলেশ বার বার প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন। ভারতীয় ঐক্য বলতে রবীন্দ্রনাথ কোন যান্ত্রিক মিলনের কথা বলেননি। বলেছেন 'It is a function of our humanity'। তাঁর গ্রেটার ইণ্ডিয়ার ধারণায় কেউ ব্রাত্য নন, এমনকী পূর্ব ও পশ্চিম এখানে 'may live integrated"'[১৬৩]

আমাদের দেশের পল্লীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে বৃহত্তর মানবসমন্বয়ের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল এদেশের সমাজে প্রচলিত জাত-পাত অস্পৃশ্যতার বেড়াজাল। রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংগঠন কর্মে অগ্রসর হয়ে এবং নানা অভিজ্ঞতার সূত্রে জেনেছিলেন সেই বেড়াজাল কতটা বাধার প্রাচীর হয়ে উঠতে পারে। তিনি এর পরিচয় দিয়ে জানিয়েছেন—

" কয়েক বছর পূর্বে আমার ইংরেজ বন্ধু এন্ড্রুজকে নিয়ে মালাবার ভ্রমণ করছিলুম। ব্রাহ্মণপল্লীর সীমানায় পা বাড়াতেই টিয়া-সমাজ-ভুক্ত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে দৌড় দিলেন। এন্ড্রুজ বিস্মিত হয়ে তাঁকে গিয়ে ধরলেন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে জানলেন, এ পাড়ায় তাদের প্রবেশ নিষেধ। বলা বাহুল্য, হিন্দুসমাজবিধি অনুসারে এন্ড্রুজের আচার বিচার টিয়া-ভদ্রলোকের চেয়ে অনেক গুণে অশাস্ত্রীয়। শাসনকর্তার জাত বলে তাঁর জোর আছে, কিন্তু হিন্দু বলে হিন্দুর কাছে আত্মীয়তার জোর নেই। তার সম্বন্ধে হিন্দুর দেবতা পর্যন্ত জাত বাঁচিয়ে চলেন, স্বয়ং জগন্নাথ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ দর্শনীয় নন। বৈমাত্র সন্তানও মাতার কোলের অংশ দাবি করতে পারে—ভারতে বিশ্বমাতার কোলে এত ভাগ কেন। অনাত্মীয়তাকে অস্থিমজ্জায় আমরা সংস্কারগত করে রেখেছি, অথচ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাদের আত্মীয়তা না পেলে আমরা বিস্মিত হই।"[১৬৪]

আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী বেনে ইংরেজ জাতির মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের আত্মবিচ্ছেদের যে বিষমন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তার সুদূরপ্রসারী পরিণাম বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—" সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাবমাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্বশাসন-চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত শাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে কোনো-এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারতো না।"[১৬৫]

এই অনাত্মীয়তার অসংখ্য বেড়াজাল বহুযুগ ধরে প্রকাশ্যে আমাদের রাষ্ট্রভাগ্যকে ব্যর্থ করেছে এবং আজো ভিতরে ভিতরে আমাদের নানা দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের এই বিভেদকে আমাদের সমাজ এতটাই বেআব্রু করে রেখেছে, তার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন—" ...কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে মানুষ মানুষকে ঠেলিয়া রাখে, অপমানও করে— তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। ......কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে।"[১৬৬] হিন্দু-মুসলমানের এই সাম্প্রদায়িকতায় বর্ণহিন্দু ও নিম্নবর্ণের হিন্দুর মধ্যেকার ভেদ ও ঘৃণাও যে একটা বড় মাত্রা যোগ করেছে তার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই জানিয়েছেন—" শোনা গিয়েছে, এবার পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও হিন্দুর প্রতি উৎপাতে নমশূদ্ররা নির্দয়ভাবে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ভাবতে হবে নাকি, ওদের দরদ হল না কেন, আত্মীয়তার দায়িত্বে বাধা পড়লো কোথায়।"[১৬৭] এর স্পষ্ট কারণ নির্দেশ করে ড. লায়েক আলি খান লিখেছেন—

"আসলে এই ব্যাপারটি মধ্যযুগে বাংলা তথা ভারতে মুসলমান আগমনের সময় থেকেই ঘটেছে। নিম্নবর্গের হিন্দু ও বৌদ্ধরা যে তুর্কী আক্রমণকে স্বাগত জানিয়েছিল তার মূলে ছিল ভারতবর্ষের সুচিরকাল ধরে চলে আসা এদের প্রতি বর্ণশ্রেষ্ঠদের ঘৃণা ও অত্যাচার। 'শূন্যপুরাণে'র পাতায় এই ইতিহাস ধরা আছে। এই তথাকথিত ঘৃণ্যরাই নতুন ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যুগসঞ্চিত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেছে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথও সেই উৎসটির সন্ধানে বড় স্পষ্টবাক্ এখানে।"[১৬৮]

শুধু ধর্মীয় বিভেদ নয়, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের অলঙ্ঘ্য বেড়াজালকে অন্য ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন—"হিন্দুতে মুসলমানে কেবল যে এই ধর্মগত ভেদ তা নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির অসমকক্ষতা ঘটেছে। মুসলমানের ধর্মসমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে উঠেছে, আর হিন্দুর ধর্মসমাজের সনাতন অনুশাসনের প্রভাবেই তার আপনার মধ্যে একটা প্রবল অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এর ফল এই যে, কোনো বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেও মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোন বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয়, মুসলমানের গায়ে জোর আছে, হিন্দুর নেই; তার আসল কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। একদল আভ্যন্তরিক বলে বলী। আর-এক দল আভ্যন্তরিক দুর্বলতায় নির্জীব। এদের মধ্যে

সমকক্ষভাবে আপস ঘটবে কী করে। অত্যন্ত দুর্যোগের মুখে ক্ষণকালের জন্য তা সম্ভব, কিন্তু যেদিন অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারার সময় উপস্থিত হয় সেদিন সিংহের ভাগটা বিসদৃশরকম বড়ো হয়ে ওঠে, তার কারণটা তার থাবার মধ্যে।"[১৬৯]

তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীতে সর্বাগ্রে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ, জাত-পাতের বিরোধ প্রতিকারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কালিদাস নাগকে রবীন্দ্রনাথ এর সমাধানের পথ-নির্দেশ করে বলেছেন—"আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনোরকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে—ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে—তার পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে।"[১৭০]

হিন্দু-মুসলিম বিভেদের পাশাপাশি আমাদের জীবনে নানা অস্পৃশ্যতা, ক্ষুদ্র আচার বিচারের বেড়াজাল আমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল। তিনি স্পষ্টতই প্রশ্ন তুলেছিলেন—"ইহাকে স্পর্শ করিব না, তাহার ছায়া মাড়াইব না, অমুকের অন্ন খাইব না, অমুকের কন্যা গ্রহণ করিব না, এমন করিয়া উঠিব, অমন করিয়া বসিব, তেমন করিয়া চলিব, তিথি নক্ষত্র দিন ক্ষণ লগ্ন বিচার করিয়া হাত পা নাড়িব, এমন করিয়া কর্মহীন ক্ষুদ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাহনকে কড়াকড়িতে ভাঙিয়া স্তূপাকার করিয়া তুলিব, এই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।"[১৭১]

এতে আমাদের দেশে সমাজনীতি ক্রমে সুদৃঢ় হলেও ধর্মনীতি শিথিল হয়ে এসেছে, স্বাধীন মনের মৃত্যু ঘটেছে। সেই স্থানুত্বের আবরণকে ছিন্ন করে যে আমাদের হৃদয়কে অনেকখানি প্রসারিত করা নিতান্ত প্রয়োজন তার কথা বার বার বলেছেন। জানিয়েছেন—"...এখন আমরা যে সংসারের মধ্যে সহসা এসে পড়েছি এখানে প্রাণ এবং মান রক্ষা করতে হলে সর্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার বিচার নিয়ে খুঁত খুঁত করে বসনের অগ্রভাগটি তুলে ধ'রে, নাসিকার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত ক'রে, একান্ত সন্তর্পণে পৃথিবীতে চলে বেড়ালে চলবে না—যেন এই বিশাল বিশ্বসংসার একটা পঙ্ককুণ্ড, শ্রাবণ মাসের কাঁচা রাস্তা, পবিত্র ব্যক্তির কমলচরণতলের অযোগ্য। এখন যদি প্রতিষ্ঠা চাও তো চিত্তের উদার প্রসার, সর্বাঙ্গীণ নিরাময় সুস্থ-ভাব, শরীর ও বুদ্ধির বলিষ্ঠতা, জ্ঞানের বিস্তার এবং বিশ্রামহীন তৎপরতা চাই।"[১৭২]

রবীন্দ্রনাথ একারণেই দেশের সেই বৃহৎ কর্মক্ষেত্রের দিকে যুবসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের নিরন্তর প্রয়াস করে গেছেন। তারাই আমাদের দেশের সমাজকেজাত-পাত সংস্কারের সহস্র বেড়াজাল ডিঙিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অধিক সক্ষম হবে।

পল্লীর অশিক্ষা, কুসংস্কার, সংকীর্ণতাকে দূর করার লক্ষ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ছাত্র সম্ভাষণ'-এ তাই তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে আহ্বান-গান রচনা করে বলেছিলেন—

"দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,

ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,

দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে

মানবমর্যাদা বিসর্জন,

চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি

নিষ্ঠুর আঘাতে।

নিঃসংকোচে

মস্তক তুলিতে দাও

অনন্ত আকাশে

উদাত্ত আলোকে,

মুক্তির বাতাসে।"[১৭৩]

কিন্তু সে কাজে কেবল যৌবনশক্তির বেগ নয়, প্রবীণের সংযমের প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকার করেছেন—"চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও আবশ্যক।"[১৭৪] এই বিবেচনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন—" ভারতবর্ষে ধর্মের ক্ষেত্রে সকলের মিল হওয়া সম্ভব নয়; আর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকলেই মিলবে এমন চর্চা এখানে কোনোদিন ছিল না, সবে এর আরম্ভ হয়েছে—সাধারণের মনকে সত্য ভাবে অধিকার করতে অনেক দেরি হবে। এই জন্যেই জীবিকার ভিতের উপরে একটা বড়ো মিলের পত্তন করবার দিকেই আমাদের মন দিতে হবে। জীবিকার ক্ষেত্র সবচেয়ে প্রশস্ত, এখানে ছোটো-বড়ো জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেরই আহ্বান আছে—মরণেরই ডাকের মতো এ বিশ্বব্যাপী। এই ক্ষেত্র যদি রণক্ষেত্র না হয়—যদি প্রমাণ করতে পারি, এখানেও প্রতিযোগিতাই মানবশক্তির প্রধান সত্য নয়, সহযোগিতাই প্রধান সত্য—তাহলে রিপুর হাত থেকে, অশান্তির হাত থেকে মস্ত একটা রাজ্য আমরা অধিকার করে নিতে পারি। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষে গ্রামসমাজে এই ক্ষেত্রে মেলবার চর্চা আমরা

করেছি। সেই মিলনের সূত্র যদি-বা ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, তবু তাকে সহজে জোড়া দেওয়া চলে, কেননা আমাদের মনের স্বভাবটা অনেকটা তৈরি হয়ে আছে।"[১৭৫]

রবীন্দ্রনাথ এ-কারণেই কো-অপারেটিভ বা সমবায় পদ্ধতিতে কাজের ক্ষেত্রে এদেশের যথার্থ অভাব দূরীকরণের প্রয়াস নিয়েছিলেন। আয়ার্ল্যান্ডের হরেস প্ল্যাঙ্কেটের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাই পল্লীর উন্নয়নের দ্বারা সারা দেশের জন্য একটি আদর্শ মডেল গ্রাম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি তাই লিখেছেন—"সার হরেস প্ল্যাঙ্কেট যখন আয়র্লন্ডে সিদ্ধিলাভ করলেন তখন তিনি একই কালে ভারতবর্ষের জন্যেও সিদ্ধিকে আবাহন করে আনলেন। এমনি করেই কোনো সাধক ভারতবর্ষের একটি পল্লীতেও দৈন্য দূর করবার মূলগত উপায় যদি চালাতে পারেন, তা হলে তিনি তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীকেই চিরকালের সম্পদ দিয়ে যাবেন। আয়তন পরিমাপ করে যারা সত্যের যথার্থ্য বিচার করে তারা সত্যকে বাহ্যিকভাবে জড়ের সামিল করে দেখে; তারা জানে না যে, অতি ছোটো বীজের মধ্যেও যে প্রাণটুকু থাকে সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করবার পরোয়ানা সে নিয়ে আসে।"[১৭৬]

ব. নারীশক্তির উপযোগিতা তৈরি :

আমাদের দেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এই অসাম্য 'সর্বত্র সুন্দর নহে ইহাও নিশ্চয়; কারণ, যাহাতে কাহারো অবিমিশ্র স্থায়ী হীনতা প্রকাশ করে তাহা কখনোই সুন্দর হইতে পারে না।'[১৭৭] পল্লীর উন্নয়নে বা দেশোন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ যে নারীশক্তির উপযোগিতা রচনায় প্রয়াসী ছিলেন পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলিতে তা ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যেও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। দেশের উন্নয়নে যে নারীশক্তির এগিয়ে আসার নিতান্ত প্রয়োজন, দেশের জন্য তাঁদেরও যে অনেক ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন আছে একথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—"আমরা লড়াই করিতে যাইব না, আমরা ভিক্ষা করিতেও ফিরিব না, কিন্তু আমরা কি এ কথা বলিতে পারিব না যে, না, আর নয়—আমাদের এই অপমানিত উপবাসক্লিষ্ট মাতৃভূমির অন্নের গ্রাস বিদেশের পাতে তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে আমাদের বেশভূষার শখ মিটাইব না। আমরা ভালো হউক মন্দ হউক, দেশের কাপড় পরিব, দেশের জিনিস ব্যবহার করিব।"[১৭৮]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নারীশক্তিকে দেশগঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখতে চেয়েছেন। তাঁর কথাসাহিত্যে এর পরিচয় স্পষ্ট। নতুন যুগের সভ্যতায় পুরুষ ও নারীশক্তির একত্র সম্মিলনের দ্বারা আমাদের সমাজের স্বতন্ত্র প্রগতি চেয়েছিলেন—" একটিমাত্র বড়ো আশ্বাসের কথা এই যে, কল্লান্তের ভূমিকায় নূতন সভ্যতা গড়বার কাজে

মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে—প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই। তাদের মুখের উপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয়—যে ঘোমটার আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসছে। যে মানবসমাজে তারা জন্মেছে সেই সমাজ আজ সকল দিকেই সকল বিভাগেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তাদের দৃষ্টির সম্মুখে। এখন অন্ধ সংস্কারের কারখানায় গড়া পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করা আর তাদের সাজবে না। তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি, কেবল ঘরের লোককে নয়, সকল লোককে রক্ষার জন্যে কায়মনে প্রবৃত্ত হবে।"[১৭৯]

ভ. পানীয় জলের ব্যবস্থা :

পল্লীর জলসংকট যে কত গভীর ছিল তা প্রথম অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যেও তার ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি জানিয়েছেন—"আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলাদেশের গ্রামের নিকট সংস্রবে। গরমের সময়ে একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েছে নেমে, তীরের মাটি গিয়েছে ফেটে, বেরিয়ে পড়েছে পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর ধূধূ করছে তপ্ত বালু। মেয়েরা বহুদূর পথ থেকে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনছে, সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজল মিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না; ওলাউঠো দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।"[১৮০]

উৎস নির্দেশ :

১. সভাপতির অভিভাষণ। সমূহ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৭১০-১১।

২. ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী। সাহিত্য। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৭শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ১৩০।

৩. দেশের কথা। সমূহ, পরিশিষ্ট। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৭৯।

৪. অশোক সেন। রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী। ১৪২১। পৃ: ২১।

৫. স্বদেশী সমাজ। আত্মশক্তি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২০। পৃ: ৬২৭।

৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৬২৬।

৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪০৬। পৃ: ১৪৭।

৮. অবস্থা ও ব্যবস্থা। আত্মশক্তি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৭৯-৮০।

৯. দাশরথী সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ : স্বদেশী সমাজের রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও রাষ্ট্রভাবনা। সম্পাদনা : আশীষ কুমার বসু। এভেনেল প্রেস। ২০১৩। পৃ: ৫১।

১০.অবস্থা ও ব্যবস্থা। আত্মশক্তি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৮০।

১১. দেশনায়ক। সমূহ । রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৯৫ ।

১২. দাশরথী সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ : স্বদেশী সমাজের রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও রাষ্ট্রভাবনা। সম্পাদনা : আশীষ কুমার বসু। এভেনেল প্রেস। ২০১৩। পৃ: ৫৪।

১৩. লায়েক আলি খান। রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমীক্ষা। সৃজন। ২০১১। পৃ:৩৭৫।

১৪. অবস্থা ও ব্যবস্থা। আত্মশক্তি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৮১।

১৫. পারিবারিক দাসত্ব। সমাজ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৭শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭০।

১৬. ন্যাশন্যাল ফন্ড। সমাজ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০৪।

১৭. হাতে কলমে। সমাজ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪২৪।

১৮. নেপাল মজুমদার। ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ১ম খণ্ড। দে'জ। ১৯৯৫। পৃ: ৫৯।

১৯. সাহিত্য পরিষৎ। সাহিত্য। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৭২৪।

২০. ছোটো ও বড়ো। কালান্তর। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৫৫৯।

২১. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্ররচনাভিধান, ১৪শ খণ্ড। দীপ প্রকাশন। ১৪১৯। পৃ: ৪০০।

২২. ছোটো ও বড়ো। কালান্তর। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৬৮।

২৩. বাতায়নিকের পত্র। কালান্তর। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৮১।

২৪. ইংরাজ ও ভারতবাসী। রাজা প্রজা। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৩৫ ।

২৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৩৭।

২৬. সাহিত্য পরিষৎ। সাহিত্য। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খন্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৭২৪।

২৭. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লীসমাজ। অ-চেনা রবীন্দ্রনাথ। দে'জ। ১৪০৩। পৃ: ১৪৮।

২৮. শিক্ষার বিকিরণ। শিক্ষা, সংযোজন অংশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৬শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৩২৯।

২৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৩০।

৩০. তদেব।

৩১. শিক্ষার সাঙ্গীকরণ। শিক্ষা, সংযোজন অংশ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২৯।

৩২. অভিভাষণ, বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে পঠিত প্রবন্ধ। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৩৮৬।

৩৩. অভিভাষণ, শ্রীনিকেতনের শিল্পভাণ্ডার উদ্‌বোধন উপলক্ষে পঠিত প্রবন্ধ। পল্লীপ্রকৃতি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭৫।

৩৪. স্বদেশী সমাজ। আত্মশক্তি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২০। পৃ: ৬২৯-৩০।

৩৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৬২৯।

৩৬. পূর্বোক্ত। পৃ:৬৩০।

৩৭. মেয়েলী ব্রত। সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৭শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৭৮-২৭৯।

৩৮. গ্রাম্যসাহিত্য। লোকসাহিত্য। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৩য় খন্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ :৭৯৩-৭৯৪।

৩৯. ছাত্রদের নীতিশিক্ষা। শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৭শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪৪।

৪০. অরণ্যদেবতা। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭৩।

৪১. তদেব।

৪২. বিজয়া সম্মিলন। ভারতবর্ষ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৬২-৬৩।

৪৩. প্রশান্তকুমার পাল। রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড। আনন্দ। ১৪১৪। পৃ: ২৬৪।

৪৪. সমাধান। কালান্তর। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬০৯।

৪৫. লোকহিত। কালান্তর। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৫২।

৪৬. অরবিন্দ পোদ্দার। রবীন্দ্রনাথ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। উচ্চারণ। ১৯৮২। পৃ: ৪০-৪১।

৪৭. আনন্দ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা। সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকা, রবীন্দ্রসার্ধ-শতবার্ষিকী সংকলন। সম্পাদনা : সঞ্জীব কুমার বসু। কার্তিক-চৈত্র, ১৪১৬। পৃ: ১৮৭-১৮৮।

৪৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪০৬। পৃ: ১৬৭।

৪৯. শিক্ষার বিকিরণ। শিক্ষা, সংযোজন অংশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৬শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২৮-৩২৯।

৫০. ভারতবর্ষের ইতিহাস। ভারতবর্ষ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭০৯।

৫১. অসন্তোষের কারণ। শিক্ষা, সংযোজন অংশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৬শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৯৯।

৫২. আনিসুজ্জামান। জাতীয়শিক্ষা-আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ। সার্ধ-শতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ, বাংলাদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি। সম্পাদনা : আনিসুজ্জামান। বিশ্বভারতী। ১৪১৯। পৃ: ৫১৩-৫১৪।

৫৩. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৩২-২৩৩।

৫৪. সুশান্ত কুমার সামন্ত। বিকল্প শিক্ষা-আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ : আমাদের উত্তরাধিকার। সম্পাদনা : অনিতা সাহা ও সুশান্ত কুমার সামন্ত। আশাদীপ। ২০১২। পৃ: ৯৪।

৫৫. ১৬ সংখ্যক প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮৪।

৫৬. The Centre of Indian Culture, The English Writings of Rabindranath Tagore Voll-2. Edited by Sisir kumar Das. Sahitya Academy, 2008, p: 469.

৫৭. ১ সংখ্যক প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৪৩-৪৪।

৫৮. বিদ্যাসমবায়। শিক্ষা, সংযোজন অংশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৬শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩০২।

৫৯. ১১ সংখ্যক প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৬৯।

৬০. ৫ সংখ্যক প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৫৩।

৬১. ছাত্রদের নীতিশিক্ষা। শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৭শ খণ্ড।পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪২।

৬২. একটি পুরাতন কথা। সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৭শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৩০।

৬৩. ছাত্রদের নীতিশিক্ষা। শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৭শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪২।

৬৪. তদেব।

৬৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪৪।

৬৬. ১৫ সংখ্যক প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮১।

৬৭. তদেব।

৬৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮২।

৬৯. ইতিহাস কথা। শিক্ষা, পরিশিষ্ট অংশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭২২।

৭০. স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট। আত্মশক্তি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৪৫।

৭১. কবি-সংগীত। লোকসাহিত্য। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৩য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৯১।

৭২. শিক্ষার বিকিরণ। শিক্ষা, সংযোজন অংশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৬শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৩১।

৭৩. গ্রাম্যসাহিত্য। লোকসাহিত্য। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৩য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৯৫।

৭৪. তদেব।

৭৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৮০৮-৮০৯।

৭৬. ইতিহাস কথা। শিক্ষা, পরিশিষ্ট অংশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭২৩।

৭৭. সাহিত্য পরিষৎ। সাহিত্য। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭২৭।

৭৮. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ। আত্মশক্তি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৬৬।

৭৯. লায়েক আলি খান। রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমীক্ষা। সৃজন। ২০১১। পৃ: ৩৬৮।

৮০. ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৭শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪৮-৪৯।

৮১. পল্লীর উন্নতি। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৫৮।

৮২. প্রসঙ্গ-কথা। সমূহ, পরিশিষ্ট। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৪৮ ।

৮৩. চেঁচিয়ে বলা। সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৭শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৯।

৮৪. ভূমিলক্ষ্মী। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬০।

৮৫. অশোক সেন। রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৪।

৮৬. ক্ষুদিরাম দাস। সমাজ:প্রগতি:রবীন্দ্রনাথ। করুণা। ১৯৯০। পৃ: ১২

৮৭. হাতে কলমে। সমাজ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৭শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪২৫।

৮৮. লায়েক আলি খান। রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমীক্ষা। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৪২ ।

৮৯. সভাপতির অভিভাষণ। সমূহ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭০৫ ।

৯০. অভিভাষণ, বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে পঠিত প্রবন্ধ। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত।পৃ: ৩৮৬।

৯১. যজ্ঞভঙ্গ। সমূহ, পরিশিষ্ট। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৮৮ ।

৯২.ব্যাধি ও প্রতিকার। সমূহ, পরিশিষ্ট। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৮৪ ।

৯৩. সত্যের আহ্বান। কালান্তর। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৯৪।

৯৪. রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত। কালান্তর। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৬৪-৬৬৫।

৯৫. স্বরাজসাধন। কালান্তর। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৪৯।

৯৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৫০-৬৫১।

৯৭. জ্যোতির্ময় ঘোষ। 'ও আমার দেশের মাটি'। সৃজন, বিশেষ রবীন্দ্রসংখ্যা। সম্পাদনা : লক্ষ্মণ কর্মকার। পৃ: ৭।

৯৮. নূতন ও পুরাতন। স্বদেশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫০৩।

৯৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫০৭

১০০. পূর্বোক্ত। পৃ:৫০৭-৫০৮।

১০১. সনৎ কুমার নস্কর। জমিদার রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন (পূর্ববঙ্গ পর্ব)। ঐকতান গবেষণা পত্র, রবীন্দ্র জন্ম সার্ধশতবর্ষ সংখ্যা। সম্পাদনা : নীতিশ বিশ্বাস। পৃ: ৫৫-৫৬।

১০২. সভাপতির অভিভাষণ, পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে পঠিত। সমূহ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭০৮ ।

১০৩. সমবায় ১। সমবায় নীতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩১৫-৩১৬।

১০৪. রায়তের কথা। কালান্তর। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৫৬।

১০৫. গুণময় মান্না। রবীন্দ্রনাথ: জমিদারি আসমানদারি। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ২০১২। পৃ: ২৪।

১০৬. ভারতবর্ষীয় সমাজ। আত্মশক্তি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬২৫।

১০৭. ৩য় সংখ্যক প্রবন্ধ। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৩৮।

১০৮. সমবায়ে ম্যালেরিয়া নিবারণ। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৯।

১০৯. প্রতিভাষণ। পল্লীপ্রকৃতি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৭।

১১০. মুখুজ্জে বনাম বাড়ুজ্জে। সমূহ, পরিশিষ্ট। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৩.

১১১. সভাপতির অভিভাষণ, পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে পঠিত। সমূহ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭১০ ।

১১২. অবস্থা ও ব্যবস্থা। আত্মশক্তি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৭৬।

১১৩. দেশহিত। সমূহ,পরিশিষ্ট। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৯০ ।

১১৪. সমবায় ১। সমবায় নীতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩১৫।

১১৫. পল্লীপ্রকৃতি। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬৬।

১১৬. বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৮- ৯৯।

১১৭. সভ্যতার সংকট। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৭৪২।

১১৮. সভাপতির অভিভাষণ, পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে পঠিত। সমূহ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭০৯ ।

১১৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৭০৭।

১২০. সমবায় ২। সমবায় নীতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩১৯।

১২১. স্বদেশী সমাজ। আত্মশক্তি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৩৪।

১২২. সফলতার সদুপায়। আত্মশক্তি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৫৩-৬৫৪।

১২৩. পল্লীর উন্নতি। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৫৬।

১২৪. সভাপতির অভিভাষণ, পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে পঠিত। সমূহ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭১২ ।

১২৫. সমস্যা। রাজা প্রজা। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৮৫ ।

১২৬. প্রসঙ্গকথা। সমূহ,পরিশিষ্ট। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৩৯ ।

১২৭. ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা। সমবায়নীতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩১৯।

১২৮. সমবায়নীতি। সমবায় নীতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২৪।

১২৯. ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা। সমবায়নীতি। পূর্বোক্ত। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পৃ: ৩২২।

১৩০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২২-২৩

১৩১. লোকহিত। কালান্তর। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৪৮।

১৩২.সমবায়নীতি। সমবায় নীতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩২৪।

১৩৩. বিলাসের ফাঁস। সমাজ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫২৯-৫৩০।

১৩৪. উপেক্ষিতা পল্লী। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭১-৩৭২।

১৩৫. সমবায়নীতি। সমবায় নীতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৩০।

১৩৬. সভাপতির অভিভাষণ, পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে পঠিত। সমূহ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭০৮ ।

১৩৭. লায়েক আলি খান। রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমীক্ষা। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০৬ ।

১৩৮. ব্যাধি ও প্রতিকার। সমূহ, পরিশিষ্ট। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৮৩ ।

১৩৯. প্রবালকান্তি হাজরা। রবীন্দ্রনাথের গোপালন ভাবনার বাস্তবায়ন ও একালে এর প্রাসঙ্গিকতা। নিত্যকালের যাত্রী। রবীন্দ্র জন্মসার্ধশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ। সম্পাদনা : আজহারউদ্দিন খান। শব্দের মিছিল। ২০১২। পৃ: ৩৩৯-৩৪০।

১৪০. ভৃত্যরাজকতন্ত্র। জীবনস্মৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৪২০ ।

১৪১. হিমালয় যাত্রা। জীবনস্মৃতি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৪৫ ।

১৪২. ১৬ সংখ্যক চিঠি। ছিন্নপত্রাবলী। বিশ্বভারতী। ১৪১১। পৃ ৪০।

১৪৩. ভূমিলক্ষ্মী। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৫৯।

১৪৪. দেশনায়ক। সমূহ, পরিশিষ্ট। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৯৩ ।

১৪৫. তদেব।

১৪৬. শর্মিষ্ঠা দাস। চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ। রবির আলোয়। সম্পাদনা : জয়ন্তী সাহা (রায়)। শ্রীভারতী প্রেস। ১৪১৮। পৃ: ৪৩৫-৪৩৬।

১৪৭. ম্যালেরিয়া। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৪।

১৪৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯২।

১৪৯. স্বাদেশিকতা। জীবনস্মৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৬৫ ।

১৫০. অত্যুক্তি। ভারতবর্ষ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৪৯।

১৫১. বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৯।

১৫২. তদেব।

১৫৩. কানন কুমার মজুমদার। রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা। রাতের তারা দিনের রবি। সম্পাদনা : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। আনন্দ। পৃ: ২৪৮।

১৫৪. বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত। পল্লীপ্রকৃতি। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০০।

১৫৫. তদেব।

১৫৬. তদেব।

১৫৭. তদেব।

১৫৮. পথ ও পাথেয়। রাজা প্রজা। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৭৪ ।

১৫৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৭৫।

১৬০. জলোৎসর্গ। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪০১।

১৬১. স্বদেশী সমাজ। আত্মশক্তি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৩০।

১৬২. জলোৎসর্গ।পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ :৪০১।

১৬৩. হোসেনুর রহমান। দেশভাবনার সার্থক পরিচয় রবীন্দ্রনাথেই। আমাদের রবীন্দ্রনাথ। সম্পাদনা : গৌরীশঙ্কর সরকার। ঐক্য। পৃ: ১০২।

১৬৪. হিন্দু-মুসলমান। কালান্তর, সংযোজন অংশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৬৭।

১৬৫. সভ্যতার সংকট। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৪৩।

১৬৬. লোকহিত। কালান্তর। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৪৯।

১৬৭. হিন্দু-মুসলমান। কালান্তর। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৬৭।

১৬৮. হিন্দু-মুসলমান। কালান্তর, সংযোজন অংশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড। পৃ: ৬৬৭।

১৬৯. সত্যের আহ্বান। কালান্তর । রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬০৬-৬০৭।

১৭০. বৃহত্তর ভারত। কালান্তর । পূর্বোক্ত। পৃ: ৬২০।

১৭১. আচারের অত্যাচার। সমাজ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৫১৯-৫২০।

১৭২. নূতন ও পুরাতন। স্বদেশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫০৫।

১৭৩. ছাত্রসম্ভাষণ। শিক্ষা, সংযোজন অংশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৬শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৫৮।

১৭৪. বিবেচনা ও অবিবেচনা। কালান্তর । রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৪৭।

১৭৫. চরকা। কালান্তর,সংযোজন অংশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৪২।

১৭৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৪৪।

১৭৭. কবি-সংগীত। লোকসাহিত্য। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৩য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৯০।

১৭৮. ব্রতধারণ। আত্মশক্তি। রবীন্দ্ররচনাবলী ২য় খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৮৫।

১৭৯. নারী। কালান্তর। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬২৪।

১৮০. শিক্ষার বিকিরণ। শিক্ষা, সংযোজন অংশ। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৬শ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৩০।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাটক ও পল্লীজনকল্যাণ

রবীন্দ্রনাথের অপরাপর সাহিত্য-শাখার মতই তাঁর নাটকের মধ্যেও পল্লীউন্নয়ন ভাবনার প্রকাশ রয়েছে। কখনো তা প্রত্যক্ষ বিবরণে, কখনো বা পরোক্ষ নানা সূত্রে সেই ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। একথা আগেই বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ থেকেই পল্লীর মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এই সময় থেকেই পল্লীর বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তার উন্নয়নের জন্য নানা প্রকার গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শিলাইদহ-সাজাদপুর পর্বের পল্লীউন্নয়নের যে বিপুল কর্মপ্রয়াস সে পরিকল্পনারই বাস্তব রূপায়ণ বিশেষ। এই সময়ের রবীন্দ্রনাথের দেশোন্নয়ন ভাবনার নানা সূত্র তাঁর সাহিত্যের আধারে স্পষ্ট ছায়া ফেলতে শুরু করে যা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখিয়েছি। কিন্তু একথাও ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের পল্লীর মধ্যে যাতায়াত তারও বহু পূর্ব থেকে। সেই সময় থেকে পল্লীর অবস্থা সম্পর্কে বা দেশ সম্পর্কে একটি ধারণা রবীন্দ্রনাথের মনোলোকে স্পষ্ট রূপ নিতে থাকে। আসলে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচী বা আদর্শ পল্লীপরিকল্পনা তো তাঁর চিন্তা-চেতনা দর্শন ও জীবনভাবনার বাস্তব রূপায়ণ বললে খুব বেশি ভুল বলা হয় না। তাই ১৮৯০-এর পূর্বে রচিত তাঁর রচনাসমূহেও পল্লী বা দেশোন্নয়ন ভাবনার মূল সূত্রগুলির অভিপ্রকাশ আমাদের চোখে পড়ে। কাব্য-উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধের মতো নাটকের মধ্যেও তার প্রকাশ সুস্পষ্ট।

১. প্রকৃতির প্রতিশোধ :

'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'কালমৃগয়া'য় রবীন্দ্রনাথ পল্লীর বাস্তব চিত্রকে তেমন স্থান দেননি। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকেই সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে আমাদের চারপাশের প্রাত্যহিক সংসার তার আপন রূপ নিয়ে জেগে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন—" এই আত্মকেন্দ্রিক বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানা রূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে।"[১] ফলে এ নাটকে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনার মূল সূত্রগুলির বেশ কয়েকটির প্রকাশ বেশ স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনার অন্যতম বিশেষ দিক ছিল গ্রাম ও নগরের পার্থক্যকে যথাসম্ভব দূরীভূত করে সম্পদের যথাযথ বিন্যাস, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, যান্ত্রিকতার প্রাণহীন অসুস্থ ঘেরাটোপ থেকে জীবনকে মুক্তিদান। এ নাটকের সূচনাতেই পল্লীকে ছাড়িয়ে জীবনের সঙ্কীর্ণ যান্ত্রিকতাকে নিয়ে জেগে থাকা নগরের ছবিটি সন্ন্যাসীর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

" এই কি নগর! এই মহা রাজধানী!

চারিদিকে ছোটো ছোটো গৃহগুহাগুলি,

আনাগোনা করিতেছে নরপিপীলিকা।

চারিদিকে দেখা যায় দিনের আলোক,

চোখেতে ঠেকিছে যেন সৃষ্টির পঞ্জর।

আলোক তো কারাগার, নিষ্ঠুর কঠিন

বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখে দৃষ্টির প্রসর।

পদে পদে বাধা খেয়ে মন ফিরে আসে,

কোথায় দাঁড়াবে গিয়া ভাবিয়া না পায়।"[২]

রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর চেতনার বিস্তৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ পরিসরে আপন সুখ-দুঃখের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ মানুষের জীবনের সঙ্কীর্ণতার দিকটিকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন। চেতনার একটি দ্বান্দ্বিক বলয়কে গড়ে দিয়ে একালের মানুষের সঙ্কীর্ণতাকে, তার সীমাবদ্ধতাকে, তার হীনতাকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের ধ্যাননেত্রে যে প্রাচীন হিন্দুরাষ্ট্রের চিন্তাচেতনা কাজ করেছিল তার সঙ্গে একালের জীবনধারার বিচ্ছেদের ছবিটি এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

" এক কালে বিশ্ব যেন ছিল রে বৃহৎ,

তখন মানুষ ছিল মানুষের মতো,

আজ যেন এরা সব ছোটো হয়ে গেছে।

দেখি হেথা বসে বসে সংসারের খেলা।"[৩]

ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস করা ছিল রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর অন্যতম বিশেষ দিক। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথের সেই বিশেষ মানস-অভীপ্সাটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে বর্ণনার বিশেষ ভঙ্গীর মধ্যে। সন্ন্যাসী তার দৃষ্টির প্রসার দিয়ে প্রত্যক্ষ করে জগৎ-সংসার কীভাবে হীন স্বার্থপরতা আর অসাম্যের মাঝে আপন জীবন অতিবাহন করে চলেছে। সেই স্বার্থপরতার ছবি আছে এ নাটকের নিম্নোক্ত অংশে—

একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ

গান

"ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে।

দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘুরে, মুখ তুলে কেউ চাইলি নে।

লক্ষ্মী তোদের সদয় হোন, ধনের উপর বাড়ুক ধন—

আমিএকটি মুঠো অন্ন চাই গো, তাও কেন পাই নে।

ওই রে সূর্য উঠল মাথায়, যে যার ঘরে চলেছে—

পিপাসাতে ফাটছে ছাতি, চলতে আর যে পারিনে, চলতে আর যে পারিনে।

ওরে, তোদের অনেক আছে, আরো অনেক হবে—

একটি মুঠো দিবি শুধু, আর কিছু চাহি নে।"

একদল সৈনিক। (ধাক্কা মারিয়া) সরে যা, সরে যা, পথ ছেড়ে দে। বেটা, চোখ নেই! দেখছিস নে মন্ত্রীর পুত্র আসছেন!

[বাদ্য বাজাইয়া চতুর্দোলা চড়িয়া মন্ত্রিপুত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান] [৪]

নাটকের এই অংশে নাট্যকার যেমন ধনী-দরিদ্রের পার্থক্যটিকে অর্থনৈতিক ভিন্নতার মাপকাঠিতে বিচার করেছেন, তেমনি মানুষকে মানবমর্যাদা দানের মত গুরুত্বপূর্ণ মানবিক দিকটি মন্ত্রীর পুত্র তথা তথাকথিত ধনী বা তার আজ্ঞাবাহী মধ্যবর্তীদের দ্বারা কীভাবে উপেক্ষিত হয় তার ছবিটিকে তুলে ধরেছেন। ধনের এই বৈষম্যজনিত অপহ্নব এবং তার মাঝে আবর্তিত মানুষের জীবনের বিপর্যয়কে, মানবমর্যাদার অপহ্নবকে রবীন্দ্রনাথ

এড়াতে চেয়েছিলেন। এ কারণে পল্লীর মানুষকে যথাযথ সম্মান বা মর্যাদা দানের কথা বার বার বলেছেন, যা তার পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর এক বিশেষ অঙ্গ ছিল।

সামাজিক বর্ণবৈষম্য বা বিভেদ মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথে কতটা অন্তরায় ছিল তা রবীন্দ্রনাথ পল্লীজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছিলেন। এ নাটকেও আছে সেই জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা তাড়িত পল্লী জীবনের ছবি। এ নাটকের বালিকাটি অস্পৃশ্য বলে সাধারণের পথ দিয়ে চলতে গেলেই তাকে লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে অপরাহ্নে পথের যে ছবি এঁকেছেন নাট্যকার তার মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন—

প্রথম পথিক। পান্থগণ, সরে যাও। হেরো, আসিতেছে

ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর দুহিতা।

বালিকার প্রবেশ

প্রথম পথিক। ছুঁস নে ছুঁস নে মোরে—

দ্বিতীয় পথিক। সরে যা অশুচি।

তৃতীয় পথিক। হতভাগী জানিস নে রাজপথ দিয়ে

আনাগোনা করে যত নগরের লোক—

ম্লেচ্ছকন্যা, তুই কেন চলিস এ পথে!

বালিকার পথপার্শ্বে বৃক্ষতলে সরিয়া যাওন [৫]

পথে নামার অধিকার কেড়ে নেয় যে সমাজ, সে সমাজ যে ধর্মস্থানে প্রবেশ থেকেও তাকে বঞ্চিত করবে সেটাই তো স্বাভাবিক। এ নাটকের বালিকাটি তাই সমাজে অন্য কারো কাছে আশ্রয় না পেয়ে যখন তার আরাধ্যা দেবতার কাছে আশ্রয় চাইতে গেছে, তখন মন্দির রুক্ষকের আচরণটিকে নাট্যকার চিহ্নিত করেছেন শব্দ ও বাক্যের নির্মম তীক্ষ্ণতায়—

বালিকা।　　জগৎ-জননী মা গো, তুমিও কি মোরে

নেবে না ? তুমিও কি, মা ত্যেজিবে অনাথে?

ঘৃণায় সবাই যারে দেয় দূর করে

সে কি, মা, তোমার কোলে পায় না আশ্রয়?

মন্দির-রক্ষক।　দূর হ! দূর হ তুই অনার্যা অশুচি!

কী সাহসে এসেছিস মন্দিরে মাঝে![৬]

শাস্ত্রধর্মের নিরর্থকতাকে রবীন্দ্রনাথ এখানে যেমন চিহ্নিত করেছেন তেমনি বিবেকজাত মানবধর্মই যে বড় তার স্বপক্ষেও কলম ধরেছেন। সমাজের ধর্মনিরপেক্ষ উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব মানুষকে কতটা হীনমন্যতার বোধে আচ্ছন্ন করে, তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশে বাধা দেয়, এ নাটকের শিশুটির মনের মধ্যেকার দৃঢ়মূল বিশ্বাসই তার প্রমাণ দেয়। সন্ন্যাসী প্রাথমিক ভাবে অনার্য বালিকাকে বুকে টেনে নিয়ে উদার মানবধর্মেরই স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু বালিকার তার অভ্যাসগত দৃঢ়মূল ধারণায় বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি তার মত হীন ম্লেচ্ছ এক বালিকার পক্ষে এ সৌভাগ্যলাভ সম্ভব কিনা। তাই সে সন্ন্যাসীকে বলেছে—

" যখন সবাই এসে কহিবে তোমারে—

রঘুর দুহিতা, ওরে ছুঁইয়ো না, ছুঁইয়ো না,

অনার্য অশুচি ও যে ম্লেচ্ছ ধর্মহীন—

তখনো কি ত্যেজিবে না? রাখিবে কি কাছে?"[৭]

এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্রায়নে সময় বা সুযোগ কোনটাই পাননি। তবে চকিৎ উদ্ভাসে পল্লী-অর্থনীতির একটি আভাস রেখে গেছেন। পল্লীজীবনে গোপালন ছিল একটি উপকারী অর্থনৈতিক অনুষঙ্গ। তাছাড়া বয়নশিল্প যে পল্লীজীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল তখন, তার পরিচয় রয়েছে এ নাটকে। সন্ন্যাসী যখন নাটকের একাদশ দৃশ্যে সন্তানসহ একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞেস করেছেন, 'কী কাজে কাটাও দিন বলো মোরে বাছা' তখন তার উত্তরে স্ত্রী লোকটিকে বলতে শোনা গেছে—

" ঘরকন্না-কাজ আছে, ছেলেপিলে আছে,

গোয়ালে তিনটি গোরু তার করি সেবা,

বিকেলে চরকা কাটি মেয়েটিরে নিয়ে।"[৮]

২. রাজা ও রানী :

'রাজা ও রানী' নাটকটির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনার মূল সূত্রগুলির প্রকাশ সুস্পষ্ট। এ নাটকটি রচনার সমকালে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মধ্যে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছেন। জাত-পাত-অস্পৃশ্যতায় ভরা শাস্ত্রান্ধ পল্লীসমাজে উদার চেতনামুক্তির প্রয়োজনীয়তাকে তিনি উপলব্ধি করছেন। পাশাপাশি সমকালীন দেশীয় রাজনীতিতে শাসক চরিত্রের দায়িত্বহীনতার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটাধিকার প্রয়োগের দ্বারা মন্ত্রীসভার সদস্যদের নির্বাচনের বিরোধিতা করে ইংরেজ সরকার এককেন্দ্রিক শাসন কায়েম করতে চাইলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ এই পটভূমিকায় রচনা করেন তাঁর 'মন্ত্রি অভিষেক' প্রবন্ধটি। এ সবেরই নানা পরোক্ষ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে গেছে তাঁর সমকালীন রচনাসমূহে। 'রাজা ও রানী' তার ব্যতিক্রম নয়।

এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ জাতিগত বর্ণগত ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরে নবীন মানব ধর্মের স্বপক্ষে সওয়াল করেছেন। যে শাস্ত্রধর্মের প্রাণহীন আচারসর্বস্বতা ও ভেদজ্ঞান মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ সৃষ্টি করে, যে ধর্ম বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে না, তার বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের লেখনী উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীসংগঠনে সামাজিক সংস্কারে এই বিষয়ের উপর তাই অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 'রাজা ও রানী' নাটকে রাজা বিক্রমদেবের চোখে ধরা পড়েছে সেই ধর্মের জীবনবিরোধী স্বরূপটি—

" পুরোহিত, একেকটা ব্রহ্মদৈত্য যেন ।

একে তো আহার করে রাজস্কন্ধে চেপে

সুখে বারো মাস, তারপরে দিন রাত

অনুষ্ঠান, উপদ্রব, নিষেধ, বিধান,

অনুযোগ, অনুস্বর-বিসর্গের ঘটা—

দক্ষিণায়-পূর্ণ হস্তে শূন্য আশীর্বাদ।"[৯]

এই জাতীয় ধর্মকে রাজা বিক্রমদেব আদৌ গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাই তিনি শাস্ত্র-আচারের ধার ধারে না এমন ব্রাহ্মণ দেবদত্তকেই পুরোহিত পদে বরণ করে নিয়েছেন। কেননা সহজ জ্ঞান, বুদ্ধি, চিত্তের ঔদার্য আর মানবধর্মই রাজার কাছে বড় বলে মনে হয়েছে। রাজার সংসর্গে থেকে পুরোহিত দেবদত্ত তাই শাস্ত্রধর্মের প্রাণহীন আচারবিচারে আর আস্থা রাখতে পারেননি। নিজেই জানিয়েছেন—

" আমাকে বরিবে নাকি পুরোহিতপদে?

কী দোষ করেছি প্রভো? কবে শুনিয়াছ

ত্রিষ্টুভ্ অনুষ্টুভ্ এই পাপমুখে?

তোমার সংসর্গে পড়ে ভুলে বসে আছি

যত যাগযজ্ঞবিধি। আমি পুরোহিত?

শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে।

এক বই পিতা নয় তাঁরি নাম ভুলি,

দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে।

স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা

তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলস।"[১০]

শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের বাইরে থাকা এমন ব্রাহ্মণকে যে রাজপুরোহিত পদে বরণ করে নিলে তথাকথিত শাস্ত্রাভিমানী ধর্মধ্বজীর দল রাজার অমঙ্গল গীত গাইবে এ বিষয়ে দেবদত্ত নিজেই সচেতন ছিলেন। আসলে উদার ধর্মচেতনার সঙ্গে রক্ষণশীল জীবনবিরোধী ধর্মচেতনার বিরোধ বেধেছে চিরদিনই। এই বিরোধই আমাদের দেশের প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে এসেছে। আমাদের দেশের জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা পীড়িত সমাজে, হিন্দু-মুসলিমের দ্বন্দ্বসংকুল রাষ্ট্রিক প্রেক্ষিতে এই তথাকঠিত সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রধর্ম কি অপহ্নব সৃষ্টি করতে পারে সমকালে এবং পরবর্তী কালেও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেইসকল রক্ষণশীল ধর্মব্যবসায়ীদের কতকটা যেন ব্যঙ্গ করেই রবীন্দ্রনাথ দেবদত্তের মুখ দিয়ে নিম্নোক্ত কথাগুলি উচ্চারণ করিয়েছেন—

" আমি পুরোহিত! মহারাজ, এ সংবাদে

ঘন আন্দোলিত হবে কেশলেশহীন

যতেক চিক্কন মাথা; অমঙ্গল স্মরি

রাজ্যের টিকি যত হবে কণ্টকিত।”[১১]

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমের একটি সরলীকৃত রূপ অনেকেই দেখিয়েছেন—সে হল প্রেমকে ব্যক্তিগত ভোগের সঙ্কীর্ণ সীমা থেকে মুক্তিদান। সে মুক্তি কর্তব্যে, দায়িত্বে, কল্যাণের অসীমতায় প্রসার পায়। সংসারের জমিতে প্রেমের বৃহত্তর সার্থকতাটি তাই নিছক নরনারীর পারস্পরিক আসক্তির মধ্যে সীমায়িত হয়ে নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তারই স্মৃতিরক্ষা কল্পে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মাচর্যাশ্রমে মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত প্রেমকে কর্তব্যে, দায়িত্বে, কল্যাণের মাঝে প্রসারিত করে দিয়ে স্বতন্ত্র সুখের সন্ধান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের চিঠিতেই তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এ নাটকের মুখবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই ‘মায়ার খেলা’র অনুষঙ্গ টেনে বলেছেন—“...সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে। —

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম

প্রেম মেলে না।

শুধু সুখ চলে যায়

এমনি মায়ার ছলনা।”[১২]

প্রেমের সেই বৃহত্তর সাংসারিক রূপটিকেই তো সুমিত্রা দেখতে চেয়েছিলেন রাজার মধ্যে—যা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সংসার ও সমাজের মাঝে বৃহত্তর সার্থকতা পায়। ব্যক্তিপ্রেমকে এভাবেই রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমে রূপান্তরিত করার আহ্বান জানিয়েছেন, প্রেমের গৌরবকে সামাজিক মঙ্গলকর্মের মাঝে কল্যাণে আর হিতকর্মে বলিষ্ঠ করে অনুভবের কথা বলেছেন। প্রেম আর জনকল্যাণ একে অপরের মধ্যে মিশে আছে—যা আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সমাজেরও লক্ষ্য ছিল। রাজা বিক্রমদেবের প্রেমে সেই বলিষ্ঠ সঙ্কীর্ণ আসক্তিমুক্ত বৃহতের সুর মেশেনি বলেই, প্রেম আর জনকল্যাণ, প্রেম আর দায়িত্ব কর্তব্যের যুগল সম্মিলন গড়ে ওঠেনি বলেই রানী সুমিত্রা সে প্রেমকে স্বীকার করেননি। নাটকের নিম্নোক্ত সংলাপে ধরা পড়েছে তারই প্রতিচ্ছবি—

বিক্রমদেব। রাজা রানী! কে রাজা? কে রানী ?

নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে।

জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়

তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।

সুমিত্রা। শুনিয়া লজ্জায় মরি। ছি ছি মহারাজ,

এ কি ভালোবাসা ? এ যে মেঘের মতন

রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন-আকাশে

উজ্জ্বল প্রতাপ তব। শোনো প্রিয়তম,

আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজা,

তুমি স্বামি—আমি শুধু আনুগত ছায়া

তার বেশি নই। আমারে দিয়ো না লাজ,

আমারে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে।”[১৩]

‘রাজা ও রানী’ নাটকে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজের শোষণ পীড়নের ছবিটিকে তুলে ধরেছেন রূপকের মধ্যস্থতায়। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—“এই নাটকের মধ্যে আমাদের দেশের পলিটিক্যাল অবস্থার একটু ইঙ্গিতও যেন আছে। জলন্ধরের যতসব কর্মচারী বিদেশী, তাহারা সব রানীর আত্মীয় (যখন এই নাটক লেখা হয় তখন ইংলন্ডে কুইন ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল)–তাহারা প্রজাপীড়ক ও অর্থশোষক হইয়া কর্তব্য পালন করিতেছিল না। সেই অন্যায়ের প্রতিকার তখনই হইল, যখন স্বয়ং রানীর কর্ণে বিপন্ন প্রজাদের আর্তনাদ গিয়া পৌঁছিল। রানীর ন্যায়পরতা নিজের সুখ-সুবিধা সমস্ত বলি দিয়া অন্যায়ের প্রতিকারে উদ্যত হইল।”[১৪] এরই স্পষ্ট প্রতিভাস আছে রাজ্যের মন্ত্রীর নিম্নোক্ত উক্তিতে—

“ জান তো সকলি।

রানীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী

দেশ জুড়ে বসিয়াছে। রাজার প্রতাপ

ভাগ করে লইয়াছে খন্ড খণ্ড করি,

বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতীদেহ-সম।

বিদেশীর অত্যাচারে জর্জর কাতর

কাঁদে প্রজা। অরাজক রাজসভামাঝে

মিলায় ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত

বসে বসে হাসে।”[১৫]

রবীন্দ্রনাথ সেই হিসেবে অর্থনীতির নিবিড় পাঠ নিয়েছিলেন—এমন কোন নিদর্শন আমাদের কাছে নেই। কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতির বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা কম ছিল না। রাজার শোষণ, আমলাদের পীড়নে বিপর্যস্ত পল্লীসমাজের বহমান ধারায়, পল্লী অর্থনীতিতে যে একটা পরিবর্তন ঘটে সেকথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তাই মার্কসবাদীদের কথিত এদেশের কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ ‘নিশ্চল অর্থনীতি’র তত্ত্বকে তিনি মেনে নেননি। দেবদত্তের মুখ দিয়ে ১ম অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

“ধান্য তার বসুন্ধরা যার।

দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু

যজ্ঞভূমে কুক্কুরের মতো লোলজিহ্বা

এক পাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ্যক্রমে

কভু যষ্টি, উচ্ছিষ্ট কখনো। বেঁচে যায়

দয়া হয় যদি, নহে তো কাঁদিয়া ফেরে

পথপ্রান্তে মরিবার তরে।”[১৬]

এর মধ্যে পল্লীর প্রজাশোষণ ও তার ফলশ্রুতি হিসেবে প্রজাদের অপরিবর্তনীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার একটি ছবিকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, এই শোষণ-পীড়নের অনিবার্য প্রক্রিয়া হিসেবে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন না এলেও সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে একটা পরিবর্তন আসে—যার অনিবার্য পরিণাম হল প্রজাবিদ্রোহ। কুমার রায় এ নাটক সম্বন্ধে তাই জানিয়েছেন—

" দ্বিতীয় দৃশ্যেই আমরা পথে দেখতে পাব সাধারণ সামাজিক মানুষদের। গ্রামীণ মানুষ। গ্রামের প্রধান উপজীব্য কৃষি। কৃষির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষ—কামার, কুমোর, জেলে, তাঁতী, চাষী ও কলু। এর সঙ্গে যুক্ত গ্রামীণ অর্থনীতির ছক আমাদের জানা। পণ্ডিতেরা বলেছেন, সে অর্থনীতি হল 'নিশ্চল অর্থনীতি'—নিস্তরঙ্গ জীবনেরই স্বাক্ষর যেন। কেন নিস্তরঙ্গ ? উত্তর হল,—উৎপাদন পদ্ধতির কোনও পরিবর্তন আসে বৈ কি! দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, অরাজকতায় একরকম—আবার শান্তি, প্রকৃতির দানে সমৃদ্ধির কালে অন্য চেহারা। ......এইখানে তিনি ইতিহাসের দায় বহন করেছেন।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীর সমাজ-অর্থনীতির পরিবর্তনের জন্য পল্লীসমাজকে আত্মশক্তির উপরে দাঁড়াবার কথা বলেছিলেন। কেবল বিদেশী শোষক শক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের প্রকাশে যে দেশের সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব নয় তা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। কেননা বিক্ষোভ তো মানুষের একটা সাময়িক অভাব অভিযোগের প্রকাশ মাত্র, কিন্তু বিদ্রোহের পিছনে থাকে দীর্ঘ প্রস্তুতি। নিজেদের আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, ভেতর থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে না পারলে, নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে বিসর্জন না দিলে প্রতিরোধের শক্তি আসবে কোথা থেকে? এই বিশেষ মত ও পথটিকে রবীন্দ্রনাথ নাটকে জালন্ধর ও কাশ্মীরের প্রজাবিদ্রোহের ভিন্নতর রূপের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রাজার অমাত্যদের অত্যাচারে ও প্রজানুরঞ্জনের অপারগতার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ মানুষের ছবি এসেছে নাটকের ১ম অঙ্কের ২য় দৃশ্যে। এরা পল্লিসমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি—কামার কুঞ্জরলাল, কিনু নাপিত, কুমোর হরিদীন, জওহর তাঁতি, মনসুখ চাষা, মন্নুরাম কায়স্থ আর নন্দলাল ব্রাহ্মণ। এরাই সামগ্রিক ভাবে গোটা পল্লীসমাজের প্রতিনিধি। কিন্তু এদের উত্তেজনার মধ্যে এদের ভীরুতা, ছোটোছোটো স্বার্থপরতার প্রকাশ সুস্পষ্ট। শাস্তরের জায়গায় এরা অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে যতই অস্তরের কথা বলুক না কেন দেবদত্তের সামনে এরা নিষ্প্রভ হয়ে যায় অনেকটা। কেননা এদের মধ্যে বিক্ষোভ থাকলেও সে বিক্ষোভ দানা বাঁধেনি ভেতরকার শক্তির অভাবে। জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা-স্বার্থপরতার নানা সমাজ-অর্থনৈতিক বিভেদের দ্বারা তারা বিচ্ছিন্ন ছিল। এই উত্তেজনা-সর্বস্ব আবেগময় গণআন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সমর্থন করেননি। ভিক্ষার রাজনীতিকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সমর্থন করেননি। প্রজাদের প্রতি দেবদত্তের পরামর্শ—'কান্নাকাটি করে দেখ্, রাজা যদি মাপ করে'—কথাটির মধ্যেকার ব্যঙ্গের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ মানস-অভিমুখটিকে চিনিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু বিদেশী আক্রমণের মুখে কাশ্মীরের প্রজাদের যে গণ-আন্দোলন তা অনেক বেশি সংগঠিত। তারা আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েই রাজনৈতিক ও সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। মহাজনদের অবৈধ যে মজুতদারি ধনী-

নির্ধনের ব্যবধানকে প্রকট করে দেখায়, সামাজিক বৈষম্য গড়ে তোলে, তার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে তারা। নাটকের ৫ম অঙ্কের ২য় দৃশ্যে হাটের ছবিটি এর পরিচয়বাহী—

" প্রথম। কেমন হে খুড়ো, গোলা ভরে ভরে যে গম জমিয়ে রেখেছিলে, আজ বেচবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন?

দ্বিতীয়। না বেচলে কি আর রক্ষে আছে? এদিকে জালন্ধরের সৈন্য এল ব'লে। সমস্ত লুটে নেবে। আমাদের এই মহাজনদের বড়ো বড়ো গোলা আর মোটা মোটা পেট বেবাক ফাঁসিয়ে দেবে। গম আর রুটি দুইয়েরই জায়গা থাকবে না!

মহাজন। আচ্ছা ভাই, আমোদ করে নে। কিন্তু শিগ্‌গির তোদের ঐ দাঁতের পাটি ঢাকতে হবে। গুঁতো সকলেরই উপর পড়বে।"

প্রথম। সেই সুখেই তো হাসছি বাবা! এবারে তোমায় আমায় একসঙ্গে মরব। তুমি রাখতে গম জমিয়ে, আর আমি মরতুম পেটের জ্বালায়। সেইটে হবে না। এবার তোমাকেও জ্বালা ধরবে। সেই শুকনো মুখখানি দেখে যেন মরতে পারি।"[১৮]

শুধু শুকনো মুখ নয়, নাটকের পরবর্তী অংশে মহাজনের দ্রব্যসামগ্রী লুন্ঠনের ছবিও আছে। সে লুন্ঠন অসংঘটিত লুঠতরাজ নয়, এ যেন সামাজিক শোষণের এক চরম সামাজিক পরিণাম বলেই মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রজারা আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে আন্দোলনে নেমেছে। কাশ্মীরের যুবরাজের পাশে এসে তারা যেভাবে দাঁড়িয়েছে জালন্ধরের মহারাজের পাশে প্রজারা সেভাবে এসে দাঁড়ায়নি। আসলে এ হল প্রজাকল্যাণকামী ও প্রজাপীড়নকারী দুই স্বতন্ত্র শাসনের ফল। রাজা-প্রজার মধ্যে বিভেদহীন সহজ সম্পর্ক স্থাপন ভিন্ন সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই প্রজাকল্যাণই রাজা-প্রজার বিরোধ অবসানের একমাত্র পথ বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল। ২য় অঙ্কের ২য় দৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় নাগরিকের মুখ দিয়ে তাই বলিয়েছেন—

"রাজা প্রজা হবে জড়ো,

থাকবে না আর ছোটো বড়ো,

একই স্রোতের মুখে ভাসবে সুখে

বৈতরণীর নদী বেয়ে।

হরিবোল হরিবোল!"[১৯]

যুবরাজের মত ও পথ এ পথেই প্রসারিত ছিল বলে প্রজারা তার বিপদের দিনে সমস্ত শক্তি নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ প্রজারা তাই সাহসের সঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে যে 'আমাদের যুবরাজকে আমরা রক্ষা করব।' এখানেই জালন্ধরের প্রজাদের আন্দোলনের সঙ্গে কাশ্মীরের প্রয়াসাধারণ ও তাদের আন্দোলনের ভিন্নতা। এই বিশেষ দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কুমার সেন জানিয়েছেন—

" এদের ছিল শুধু বিক্ষোভ, —সেই বিক্ষোভ দানা বাঁধে না। লড়াই নয়—কান্নাতে ঘটেছিল অপরিকল্পিত বিক্ষোভের সমাধি। এ নাটকে আমরা জালন্ধরের সাধারণ মানুষদের দেখা পাই, সে অভিজ্ঞতা ভিন্ন। কাশ্মীরে -বিদেশী আক্রমণের মুখে তারা অনেক বেশি সংগঠিত। বিক্ষোভ মিছিল নয় প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল। দেশের অতাচারী শোষক ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশে ফেটে পড়ে। পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য হাট। সেই হাট থেকেই লড়াই শুরু করে দেওয়া যাক্ না। প্রথমে ওই মহাজনদের গমের বস্তাগুলো লুটে নেওয়া যাক। তারপরে ঘি আছে, চামড়া আছে, কাপড় আছে।' এই দৃশ্যেই গুপ্তচরের শাস্তির নমুনা পাওয়া যায়। নমুনা আছে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেবার এবং তারই মধ্যে সংগ্রামী মানুষের মনোবলের পরিচয়। শত্রুকে তারা ঠিক চিনেছে, শুধু বাইরের নয়, ভিতরের শত্রুও। ভারতের নানা অঞ্চলে ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে প্রথম দিকের নানা অত্যাচার এবং প্রতিরোধ সংবাদ জানা ছিল রবীন্দ্রনাথের ; এটাই স্বাভাবিক। অন্তত আমলাশাহীর চেহারা স্পষ্ট এই কাল্পনিক নাটকে।"[২০]

৩. বিসর্জন :

'বিসর্জন'-এর কাহিনী গৃহীত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' নাটক থেকে। কাহিনীগত সামান্য স্বাতন্ত্র্য থাকলেও এ নাটকের মূল ভাববস্তুর আধারে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন সংক্রান্ত ভাবনার প্রতিফলন 'রাজর্ষি' উপন্যাসের আলোচনাতেই বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রধর্ম কীভাবে মানুষের প্রগতিশীল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে রুদ্ধ করে দাঁড়ায়, জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার বিভেদ ও অহমিকা কীভাবে সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও আত্মবিরোধের জন্ম দেয় তার পরিচয় আছে এ নাটকে। মানুষ এর জন্য যে চরম মূল্য দিয়ে চলেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই ছিল রবীন্দ্রনাথের দেশোন্নয়ন ভাবনার অন্যতম মূল সূত্র।

এ নাটকে অপর্ণার 'স্নেহের পুত্তলি' ছাগশিশুকে মন্দিরে বলি দেওয়ায় অপর্ণার যে বেদনা তাতে রাজার মনেও প্রশ্ন জাগে 'এত ব্যথা কেন, এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে?'[২১] রাজা তাই তাঁর মানবিক মুক্ত চিন্তার জায়গা থেকে মন্দিরে বলিদানের মতো বীভৎস প্রথা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে শাস্ত্রমার্গী ধর্মব্যবসায়ী রঘুপতির সঙ্গে

সংঘাত শুরু হয়। ধর্মের মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন বলেই গোবিন্দমাণিক্যের পক্ষে যে ঘোষণা অত্যন্ত সঙ্গত বলে মনে হয়েছিল রঘুপতির মোহবিজড়িত স্বার্থান্ধ দৃষ্টিতেই তাই-ই অসঙ্গত বলে মনে হয়। ধর্মের মোহ রঘুপতিকেও অন্ধ করে দেয়। প্রাণপণে ধর্মের অঙ্কুশ নিজের হাতে রাখবেন বলে হত্যা,খুন, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মতো অসামাজিক কাজকর্মের মধ্যে তিনি জড়িয়ে পড়েন। প্রাথমিক ভাবে জয়সিংহকে দিয়ে গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হলে অবশেষে ধ্রুবহত্যার চক্রান্তে মেতে ওঠেন।

জীবনবিরোধী স্বার্থান্ধ এই অমানবিক ধর্মাচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছেন এক অর্থে। জয়সিংহের শ্লেষাত্মক উচ্চারণে রবীন্দ্রনাথ আচারসর্বস্ব মূর্তিপূজা ও তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াচারের নিরর্থকতার দিকটিকে তুলে ধরেছেন—

“ মায়াবিনী, পিশাচিনী,

মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস তুই

মা’র ছদ্মবেশ ধরে রক্তপানলোভে?

ক্ষুধিত বিহঙ্গশিশু অরক্ষিত নীড়ে

চেয়ে থাকে মা’র প্রত্যাশায়, কাছে আসে

লুব্ধ কাক, ব্যগ্রকণ্ঠে অন্ধ শাবকেরা

মা মনে করিয়া তারে করে ডাকাডাকি,

হারায় কোমল প্রাণ হিংস্র চঞ্চুঘাতে—

তেমনি কি তোর ব্যবসায় ? প্রেম মিথ্যা,

স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর-সব,

সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা ! তবে

কেন মেঘ হতে ঝরে আশীর্বাদসম

বৃষ্টিধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষ—’পরে—

গ’লে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী

স্রোতস্বিনী মরুমাঝে—কোটি কন্টকের

শিরোভাগে, কেন ফুল ওঠে বিকশিয়া ?

ছলনা করেছ মোরে প্রভু!”[২২]

এই নিরর্থক আচারের মোহজাল থেকে পল্লীর মানুষ যে মুক্ত নয়, তাদের মধ্যেকার অশিক্ষা, অজ্ঞতা, ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা কত প্রবল তার একটি ছবি ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসের ন্যায় এ নাটকেও বর্তমান। ১ম অঙ্কের ৫ম দৃশ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত জনতার ছবি থেকে নিম্নোক্ত অংশটুকু তুলে ধরা হল—

“ নেপাল। কোথায় হে, তোমাদের তিনশো পাঁঠা, একশো-এক মোষ! একটা টিকটিকির ছেঁড়া নেজটুকুও পর্যন্ত দেখবার জো নেই। বাজনাবাদ্যি গেল কোথায়, সব যে হাঁ-হাঁ করছে। খরচাপত্র করে পুজো দেখতে এলুম, আচ্ছা শাস্তি হয়েছে!

গণেশ। দেখ্ , মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে এমন করে বলিস নে। মা পাঁঠা পায় নি, এবার জেগে উঠে তোদের এক-একটাকে ধরে ধরে মুখে পুরবে।

হারু। কেন! গেল বছরে বাছারা সব ছিলে কোথায় ? আর, সেই ও বছর, যখন ব্রত সাঙ্গ করে রাণীমা পুজো দিয়েছিল, তখন কি তোদের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল ? তখন একবার দেখে যেতে পার নি? রক্তে যে গোমতী রাঙা হয়ে গিয়েছিল। আর অলুক্ষুণে বেটারা এসেছিস, আর মায়ের খোরাক পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল! তোদের এক-একটাকে ধরে মা’র কাছে নিবেদন করে দিলে মনের ক্ষেদ মেটে। ”[২৩]

ধর্ম সম্পর্কে পল্লীর মানুষের অন্ধ সংস্কার এতে স্পষ্ট। তারই সুযোগ নিয়ে ধর্মব্যবসায়ীর দল কীভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে চলে মন্দিরে প্রতিমার মুখ প্রজাদের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে রঘুপতির ম’আর চলে যাওয়ার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসে পরিলক্ষিত হয়। ধর্মাচার যে ভক্তির সংস্পর্শশূন্য কতকগুলি আমোদ-প্রমোদমূলক আচারের বাহ্যিক আড়ম্বরে পরিণত হয়েছে তা নেপালের কথা শুনেই বোঝা যায়। এই সকল অন্ধ অজ্ঞ মানুষেরা যুগ যুগ ধরে শিক্ষা ও চেতনার অভাবে পল্লীর মাঝে মৃতপ্রায় জীবন অতিবাহিত করে চলেছে। এদের পক্ষে ভিতর থেকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হয়নি। সেদিনের দেশসেবকদের মধ্যে সেরকম কোন কর্মপ্রয়াসও ছিল না। ফলে লড়াইয়ের মতো কোন শক্তি বা রসদ এদের মধ্যে জমে ওঠেনি। গোবিন্দমাণিক্যের সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে মন্দির রক্ষার প্রশ্নে এরা ভীরু কাপুরুষের ন্যায় সরে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহের মুখ

দিয়ে এই জড়প্রায় সমাজের বিরুদ্ধে শ্লেষের চাবুক হেনে তাদের চেতনা-জাগরণের প্রয়াস নিয়েছেন—

" যেতে দাও প্রভু—প্রাণভয়ে ভীত এরা

বুদ্ধিহীন, আগে হতে রয়েছে মরিয়া।

আমি আছি মায়ের সৈনিক। এক দেহে

সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্ পড়ে।

ভীরুদের যেতে দাও।"[২৪]

অন্ধ ধর্মাচারের পায়ে দেশের এইরকম কত তরুণ তাজা প্রাণের বলিদান ঘটে চলে তার কোন ইয়ত্তা নেই। দেশের যৌবনশক্তিকে এই মূঢ়াচারের পায়ে নিঃশেষিত না করে তাকে বৃহত্তর দেশের প্রাণকেন্দ্রে গঠনমূলক কাজে নিয়োযিত করিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রেমের বিশ্বমুখী প্রসার চেয়েছিলেন। নাটকের পরিণামে অপর্ণা ও রঘুপতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের সেই বিশ্বমুখীন উদ্‌বর্তন দেখিয়েছেন।

৪. মালিনী :

'মালিনী' নাটকেও রবীন্দ্রনাথ জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার ঊর্ধ্বে নবীন মানবধর্মকেই বড় করে দেখিয়েছেন। বিশ্বের আপামর মানুষের যে দুঃখ-দারিদ্র্য,নিজের শ্রেণী-অবস্থান থেকে নেমে এসে তাদের সাথে মিশে গিয়ে মালিনী তার ভাগ নিতে চেয়েছে। এভাবেই মালিনী সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রধর্মের ঊর্ধ্বে এসে পৌঁছেছে এক 'বিস্তীর্ণ সর্বজনলোকে'—

" আসিয়াছি আজ—

প্রথমে শিখাও মোরে কী করিব কাজ

তোমাদের। জিন্ম লভিয়াছি রাজকুলে,

রাজকন্যা আমি—কখনো গবাক্ষ খুলে

চাহি নি বাহিরে, দেখি নাই এ সংসার

বৃহৎ বিপুল—কোথায় কী ব্যথা তার

জানি না তো কিছু। শুনিয়াছি দুঃখময়

বসুন্ধরা, সে দুঃখের লব পরিচয়

তোমাদের সাথে।"[২৫]

এই দুঃখময় জীবনের সাথে জীবন যোগের দ্বারা মালিনী বস্তুতঃ মানবহিতৈষিতার বিশ্বব্যাপী পথকেই বেছে নিতে চেয়েছে। ধর্মের এই নবীন প্রগতিশীল পথ বেয়েই মালিনী তার ধর্মকে বুঝে পেয়েছে। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই এই নবীন ধর্মবোধ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাপক রূপ নিচ্ছিল। 'মালিনী' নাটকে সনাতন শাস্ত্রধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে এই নবোদ্ভূতপ্রায় মানবধর্মের বিরোধ দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও অহিংসার পথে এই ধর্মেরই প্রসার চেয়েছেন।

৫. কাহিনী :

'কাহিনী'র অন্তর্গত ক্ষুদ্র নাটিকা 'সতী'র মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ জাত-পাতের ঊর্ধ্বে এই উদার মানবধর্মের জয় দেখিয়েছেন। শাস্ত্রধর্মকে ক্ষুদ্র ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করে মানবধর্মকে নিত্যধর্ম বলে চিহ্নিত করেছেন। অমাবাই প্রার্থনা জানিয়েছেন ধর্মরাজের কাছে—"তব নিত্যধর্মে করো জয়ী / ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।" 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকায় প্রজাকল্যাণ বা মানবকল্যাণকেই বিশেষ গুরুত্বে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

৬. শারদোৎসব :

রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসব' নাটকটির রচনাকাল ১৯০৯। ১৯০৫-এর সময় থেকেই বাংলাদেশের একাধিক স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ জড়িত ছিলেন। তার ভাব-অভিঘাত কবির নাটকের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯০৭-এ সুরাট অধিবেশনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার বিরোধ বা বিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথের চিত্তভূমিতে ঝড় তুলেছিল। দেশকে সংঘটিত করে তোলার ক্ষেত্রে এদেশে জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার বেড়া, ধনী-নির্ধনের ব্যবধান বা বিচ্ছেদ যে কত বড় বাধা তা তিনি শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে থেকে নয়, শিলাইদহ-সাজাদপুরের পল্লীসংগঠনের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন। এই উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেশকে দেশকে কীভাবে এক বৃহৎ ক্ষেত্রে এক করে তোলা যায় এই ভাবনা কবির মনের মধ্যে কাজ করছিল। 'শারদোৎসব' নাটকে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ ভাবনারই প্রকাশ আছে।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—"কিছুকাল হইতে রবীন্দ্রনাথ দেশসেবা ও গ্রাম সংস্কারের যে সব কথা ভাবিতেছিলেন, তাহার মধ্যে প্রধান কথাটাই ছিল উচ্চনীচে, ছোটোয়-বড়োয় ভেদ ঘুচানো। দেশের মধ্যে মিলনের বাধা কোথায় এবং কেমন করিয়া সে বাধা দূর হইতে পারে ইহাই হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের প্রধান সমাজ-

জিজ্ঞাসা। সমসাময়িক একখানি পত্রে মনের কথাটি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন, "বোলপুর বিদ্যালয়ে ভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে অভদ্র এবং অ-ভদ্রলোকের ছেলেদেরর কিছুপরিমাণে ভদ্র করে উভয় শ্রেণির বিচ্ছেদ দূর করবার" পরিকল্পনা এখানে স্মরণীয়।' শারদোৎসবের রাজা বিজয়াদিত্য 'রাজতক্ত ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজে সকল লোকের মাঝখানে নেবে' এসেছিলেন।

আজ ধনী ও অভিজাতের সম্মুখে এই সমস্যাই তীব্রভাবে দেখা দিয়াছে, 'শ্রেণীবিচ্ছেদ' এখন আর কল্পনার বিষয় নহে; তবে সে সমস্যা সমাধানের উপায় সংগ্রাম নহে, তাহার উপায় রাজার সন্ন্যাসগ্রহণ, দারিদ্র্যবরণ। শারদোৎসবের রাজা বলিয়াছিলেন, 'রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই'। সর্বসাধারণের সঙ্গে মিলিত হইবার বাণীই ছিল সেদিনকার আকাশে বাতাসে স্বদেশী আন্দোলনের উচ্ছ্বাসে। রাজা সন্ন্যাসীবেশে সর্বসাধারণের সঙ্গে মিলিতেছেন; জ্ঞানবৃদ্ধ, বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ায় মত্ত ; সকলেই প্রকৃতির ও প্রাকৃতজনের মধ্যে আপনাকে পাইবার জন্য বাহির হইয়াছেন।"[২৬]

'শারদোৎসব' নাটকে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন সংক্রান্ত অনুরূপ ভাবনারই প্রকাশ ঘটেছে। আমাদের সমাজের এই জাত-পাতের বেড়াজাল মানুষকে কীভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে রবীন্দ্রনাথ উপনন্দ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপনন্দ জানিয়েছে—" ছোটো বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকালবেলায় আকাশভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এক কোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলেম। পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন; বললেন, এসো বাবা, আমার ঘরে এসো। সেই দিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেছেন ; লোকে তাকে কত কথা বলেছে, তিনি কান দেন নি।"[২৭]

আমাদের সমাজ নিম্নশ্রেণীর মানুষকে আশ্রয় তো দেয়-ই না, উপরন্তু কেউ যদি বা সেই মানবিক দায়িত্বটুকু পালন করে তাহলে তারা তার নিন্দা-মন্দ গাইতে থাকে। উপনন্দর গুরু সুরসেনের যে মানবিক দায়িত্বপালন সেই পথেই কিন্তু বৃহত্তর দেশের সঙ্গে মিলনের একটি পথ প্রস্তুত হতে পারে। তার মূল্যমানতাকে এ নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র সন্ন্যাসীঠাকুর বুঝেছিলেন বলেই তিনি বলেছেন—" সুরসেনের বীণা শুনতে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর-এক বীণা শুনে নিলুম, এর সুর কোনোদিন ভুলব না।"[২৮]

আসলে আমাদের দেশের মানুষের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, অনৈক্য দেশের দুর্বলতা ও অনুন্নয়নের অন্যতম কারণ। দেশকে যদি ভেতর থেকে শক্তিশালী করে তোলা না যায় তাহলে দেশের শ্রী বা সমৃদ্ধি কিছুই আসবে না। তার জন্য আমাদেরকে অন্তর্গত শক্তির উপর অর্থাৎ আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তার জন্য প্রথমেই যেটা দরকার তা হল ত্যাগের পথ। এই ত্যাগস্বীকার ভিন্ন দেশের বৃহত্তর সংখ্যক মানুষের কাছে যেমন পৌঁছানো যাবে না তেমনি দেশের প্রাণকেন্দ্র যে পল্লী তাকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। আত্মশক্তির উপর দেশের মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করলেই দেশের শ্রী বা সমৃদ্ধি তখন আপনি এসে উপস্থিত হবে বলে মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। লক্ষেশ্বর ও সন্ন্যাসীর কথোপকথনের নিম্নোক্ত অংশ তারই পরিচায়ক—

“ লক্ষেশ্বর। (সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া) বাবাঠাকুর, আর-একটু খোলসা করে বলো। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না। কী খুঁজবো বলো তো, আমি কাউকে বলব না।

সন্ন্যাসী। তবে শোনো। লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপর পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর। ও বাবা, সে তো কম কথা নয়! তা হলে যে একেবারে সকল ল্যাঠাই চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ তো তুমি আচ্ছা বুদ্ধি ঠাওরেছ ! কোনো গতিকে পদ্মটি যদি জোগাড় করে আন তা হলে লক্ষ্মীকে আর তোমার খুঁজতে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন! এ নইলে আমাদের চঞ্চলা ঠাকরুনটিকে তো জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দুখানিই বাঁধা থাকবে। তা, তুমি সন্ন্যাসীমানুষ, একলা পেরে উঠবে ? এতে তো খরচাপত্র আছে। এক কাজ করো-না বাবা, আমরা ভাগে ব্যবসা করি।

সন্ন্যাসী। তা হলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বহুকাল সোনা ছুঁতেই পাবে না।

লক্ষেশ্বর। সে যে শক্ত কথা।

সন্ন্যাসী। সব ব্যবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যাবসা চলবে।”[২৯]

সন্ন্যাসী স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন, তার সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ তো তাই। আমাদের মধ্যেকার নানা সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক স্বার্থের টানাটানি, অহং-চেতনার দ্বন্দ্ব বা আত্মাভিমানের মদ অখন্ড দেশ বা জাতি গঠনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেগুলির বিসর্জন

ভিন্ন ঐক্যবদ্ধ দেশ বা জাতি গঠন সম্ভব নয়। রাজার সঙ্গে সন্ন্যাসীর নিম্নোক্ত সংলাপে রবীন্দ্রনাথ গেঁথে দিয়েছেন সেই সারসত্যটি—

" রাজা। প্রণাম হই ঠাকুর !

সন্ন্যাসী। জয় হোক! কী বাসনা তোমার ?

রাজা। সে কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভু!

সন্ন্যাসী। তা হলে গোড়া থেকে শুরু করো। তোমার খণ্ড রাজ্যটি ছেড়ে দাও।

রাজা। পরিহাস নয় ঠাকুর ! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।

সন্ন্যাসী। রাজন্, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

রাজা। বল কী ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। এক বর্ণও মিথ্যা বলছি নে। তাকে বশ করবার জন্যেই আমি মন্ত্রসাধনা করছি।

রাজা। তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ?

সন্ন্যাসী। তাই বটে।

রাজা। মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হবে?

সন্ন্যাসী। অসম্ভব নয়।"[৩০]

সন্ন্যাসী মনে করেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে মনুষ্যত্বের এক নিবিড় যোগ। সামাজিক বা অর্থনৈতিক নানা শ্রেণীবিভেদ সেক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রাজা-প্রজার মিলনের ক্ষেত্রেও এই বাধাই অনেকক্ষেত্রে প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু এ বাধা তো নিতান্তই বাহ্যিক আরোপিত একটি বাধা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজা বিজয়াদিত্যের মধ্যেও এই বাহ্যিক বাধার খোলসের ভিতরের মানুষটি যে পরস্পরের সঙ্গে মিলনের জন্য উৎসুক তা সন্ন্যাসীর কথায় স্পষ্ট। সভ্যতার সঙ্কটমুক্তির জন্য এই খোলসমুক্তি নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু তা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নয়, রাজার সন্ন্যাসগ্রহণ বা দারিদ্র্যবরণের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব হতে পারে। নাটকে এ কারণেই রাজা ও সন্যাসীর নিম্নোক্ত সংলাপটিকে সচেতন ভাবেই জুড়ে দিয়েছেন—

" রাজা। মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ এমন হার আনন্দে হেরেছি, কোনো যুদ্ধে এমনটি ঘটতে পারতো না। আমি যে আপনার অধীন এই গৌরবই আমার সকল যুদ্ধজয়ের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। কী করলে আমি রাজত্ব করবার উপযুক্ত হব সেই উপদেশটি চাই।

সন্ন্যাসী। উপদেশটি কথায় ছোটো, কাজে অত্যন্ত বড়ো। রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।"[৩১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রক্তকরবী' নাটকেও রাজার মধ্যেকার সেই খোলস-মুক্তির কথা বলবেন—যা পরবর্তী অংশে বিশ্লেষিত হয়েছে। সেও এ-নাটকের রাজার মত প্রেমের বা ভালোবাসার পথ বেয়েই সম্ভব হয়ে উঠেছে। এ নাটকে বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ায় রাজার মেতে ওঠায় আর 'রক্তকরবী' নাটকে রাজার নন্দিনীর প্রেমে উদবুদ্ধ হয়ে খোলস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসায় সেই মুক্তির আভাস আছে। এ নাটকেও অনুরূপ প্রসঙ্গের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই রাজা ও সন্ন্যাসীর কথোপকথনে—

" রাজা। ......আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো বিজয়াদিত্যকে জান, সত্য করে বলো দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য ?

সন্ন্যাসী। আমার ইচ্ছে আছে আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেব। সে যে রাজার পোশাক প'রে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা-কিছু বলে মনে করে আমি তার সেই ভুলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেব।

রাজা। তাই দিয়ো ঠাকুর তাই দিয়ো।

সন্ন্যাসী। তার ভণ্ডামি আমার কাছে তো কিছু ঢাকা নেই। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টি হলে পর বীজ বোনবার আগে তার রাজ্যে একটা মহোৎসব হয়। সেদিন সব চাষি গৃহস্থেরা বনে গিয়ে সীতার পূজা ক'রে সকলে মিলে বনভোজন করে। সেই চাষাদের সঙ্গে একসঙ্গে পাত পেড়ে খাবার জন্যে বিজয়াদিত্যের প্রাণটা কাঁদে। রাজাই হোক আর যাই হোক, ভিতরে যে চাষাটা আছে সেটা যাবে কোথায়? সেবারে তো সে রাজবেশ ছেড়ে ওদের সঙ্গে বসে যাবার জন্যে খেপে উঠেছিল। কিন্তু ওর মন্ত্রী আর চাকর-বাকরদের মনে রাজাগিরির উচ্চ ভাব ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তারা হাতে পায়ে ধরে বললে, এ কখনোই হতে পারে না। অর্থাৎ, তাদের এই ভয়টা আছে যে, ঐ ছদ্মবেশটা খুলে ফেললেই আসল মানুষটা ধরা পড়ে যাবে। এই জন্যে বিজয়াদিত্যকে নিয়ে তারা বড়ো ভয়ে ভয়েই থাকে—কোন্‌দিন তার সমস্ত ফাঁস হয়ে যায় এই এক বিষম ভাবনা।

রাজা। ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে দাও। ও যে মিথ্যে রাজা, ভুয়ো রাজা, সে যেন আর চাপা না থাকে। ওর বড়ো অহংকার হয়েছে।

সন্ন্যাসী। আমি তো সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আমি সহজেই ছাড়ব না।"[৩২]

সুতরাং ত্যাগের পথে, দুঃখস্বীকারের পথে, আমাদের কর্তব্যকর্ম সাধনের পথেই দেশের মুক্তির সাধনায় আমাদের নিয়োজিত হতে হবে। সে সাধনার মূল্য হয়তো সকলের কাছে প্রতীয়মান হয়ে উঠবে না—যেমন করে অস্পৃশ্য বলে উপনন্দের মূল্য কেউ বোঝেনি। তবে বিজয়াদিত্যের মতো মহৎ ব্যক্তিরা যে তার মূল্য বুঝবে সে সম্পর্কে সন্ন্যাসী নিঃসন্দেহ। কেননা জগতে কেবলমাত্র নিজের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতাকারী মুনাফালোভী লক্ষেশ্বরেরাই একমাত্র জীবনসত্যের ধারক-বাহক নয়। তার বাইরেও আছে জীবনের আরো বড় মহত্তর সত্য—আত্মত্যাগের বা আত্মোৎসর্গের মূল্য।

একক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসকে এভাবেই এক বৃহৎ প্রয়াসের অন্তর্গত করে তুলতে হবে —রবীন্দ্রনাথ ঠিক যেমনটি তাঁর পল্লীপুনর্গঠন প্রয়াসের মধ্যে করতে চেয়েছিলেন। এর মাঝেই আছে জীবনের পরম আনন্দের প্রকাশ। সন্ন্যাসীর কথায় এ কারণেই উপনন্দ ঋণশোধের ব্যক্তিগত প্রয়াসের মধ্যে আলাদা বল বা শক্তি লাভ করেছিল। আর উপনন্দের সেই প্রয়াস বা কর্মোদ্যোগ দেখেই কিন্তু সন্ন্যাসী তার ভেঙে যাওয়া আনন্দ-খেলার দলটিকে পুনর্গঠনের সাহস ও ভরসা দেখাতে পেরেছেন:

" সন্ন্যাসী। বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব? তার চেয়ে বড়ো সম্ভাবনা কি আর-কিছুই নেই?

উপনন্দ। আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু আমি ততদিন পুঁথিগুলি নকল করে কিছু কিছু শোধ করতে থাকি; নইলে আমার মনে বড়ো গ্লানি হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ বাবা। বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারও প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ো না।

উপনন্দ। তা হলে চললেম ঠাকুর। তোমার কথা শুনে আমি মনে কত যে বল পেয়েছি সে আমি বলে উঠতে পারি নে।

সন্ন্যাসী। তোমাকে দেখে আমিও যে কত বললাভ করেছি সে কথা কেমন করে বুঝবে? এক কাজ করো বাবা, আমার খেলার দলটি ভেঙে গিয়েছে, আবার তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে এসো গে।

উপনন্দ। তা আনছি। কিন্তু ঠাকুর, তোমার দলটিকে আমার পুঁথি নকল করার কাজে লাগালে চলবে না। তারা আমার সব নষ্ট করে দেয়; এত খুশি হয়ে করে যে বারণ করতেও পারি নে।”[৩৩]

৭. প্রায়শ্চিত্ত :

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকটি লেখেন ‘বউঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে। কিন্তু এ নাটকের কাহিনীর মধ্যে অনেক অভিনবত্ব নিয়ে আসেন। সেই অভিনবত্বের বড় দিকটি হল কাহিনীর মধ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রের সংস্থাপন। চরিত্রটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আসলে সমকালীন তাঁর দেশোন্নয়ন ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর পল্লীসংগঠন পরিকল্পনার একটি বিশেষ নীতি ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সহিংস বৈপ্লবিক পন্থাকে স্বীকার করেননি। গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস বৈপ্লবিক আন্দোলনের পথকেই তিনি যথার্থ বলে মনে করেছিলেন। ‘স্বদেশী সমাজ’ রচনার সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ একজন আদর্শ দেশনেতা নির্বাচনের কথাও বলে আসছিলেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বোক্ত ভাবনাসমূহকে মূর্ত করে তুলেছেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

“ টলস্টয় জীবনের বহু অভিজ্ঞতার পর বুঝিয়াছিলেন যে, অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায়ের দ্বারা সম্ভবে না। ......টলস্টয় যাহা নীতিরূপে প্রচার করেন, গান্ধীজী তাহা জীবনে বাস্তবরূপে গ্রহণ করেন (১৯০৬)। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবনাকে সাহিত্যরূপ দিলেন—ধনঞ্জয় বৈরাগী তাঁহার অহিংসানীতির প্রতীক। কবি বহুদিন হইতেই বলিতেছিলেন যে ভারতের যিনি নায়ক হইবেন, তিনি হইবেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, ফকির। সেই আদর্শায়িত নেতার মূর্তি হইতেছেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। আর আধুনিক যুগে মহাত্মা গান্ধী সেই নীতিকে কেবল বাক্যে নহে, জীবনে বরণ করিয়া লইয়াছেন।”[৩৪]

কিন্তু ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আন্দোলনের যে রূপটিকে ব্যক্ত করেছেন তা তাঁর দেশোন্নয়ন ভাবনার প্রতিলিপি মাত্র। ধনঞ্জয় বৈরাগী চেয়েছে মাধবপুরের প্রজাদের আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে আত্মচেতনা, আত্মমর্যাদাবোধ। সেই বোধ বা চেতনা একবার জাগ্রত হলে বাহ্যিক পীড়ন বা অপমানতার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। ধনঞ্জয় বৈরাগী সেই ভিতরের আত্মসম্মানী মানুষটিকে মার দিয়ে জাগিয়ে তুলে বাহ্যিক মারের প্রতিকূলতাকে সহজে এড়াতে চেয়েছেন। নাটকের নিম্নোক্ত অংশে তারই পরিচয় স্পষ্ট—

“ ধনঞ্জয়। একেবারে সব মুখ চুন করে আছিস কেন ? মেরেছে বেশ করেছে। এতদিন আমার কাছে আছিস, বেটারা এখনো ভালো করে মার খেতে শিখলি নে? হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে নাকি রে ?

১। রাজার কাছারিতে ধরে মারলে সে বড়ো অপমান!

ধনঞ্জয়। আমার চেলা হয়েও তোদের মানসম্ভ্রম আছে? এখনো সবাই তোদের গায়ে ধুলো দেয় না রে ? তবে এখনো তোরা ধরা পড়িস নি। তবে এখনো আরো অনেক বাকি আছে।

২। বাকি আর রইল কী ঠাকুর! এ দিকে পেটের জ্বালায় মরছি, ও দিকে পিঠের জ্বালাও ধরিয়ে দিলে।

ধনঞ্জয়। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে—একবার খুব করে নেচে নে!

গান

আরো আরো প্রভু, আরো আরো!

এমনি করে আমায় মারো

লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,

ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই?

যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।

এবার যা করবার তা সারো সারো। ...”[৩৫]

এই মার আসলে আমাদের মধ্যেকার পশুত্বকে মেরে আত্মশক্তি অর্জনের এক অনিবার প্রক্রিয়াবিশেষ। কিন্তু এ নাটকে মারের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের ব্যাপারটাকে অনেকেই কবিকল্পনা বলে মনে করেছেন। আসলে তা নয়। এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ অন্তর্গূঢ় রেখেছেন কিছু ঐতিহাসিক সত্যকে, তাঁর দেশভাবনার কিছু মৌল অভিপ্রায়কে। প্রমথনাথ বিশী তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যের নরনারী’ গ্রন্থে জানিয়েছেন—

“ ধনঞ্জয় প্রজাদের অভয়মন্ত্রের সঙ্গে আনন্দমন্ত্রও দিয়াছে। সেই আনন্দের প্রকাশ গানে আর নৃত্যে। মাধবপুরের দলের শক্তি বাহুতে নয়, কণ্ঠে। মার যখন বেদম

পড়ে তখন তাহারা গান গায়—আর যে পায়ের সাহায্যে ভীরুরা পলায়ন করে সেই পা দুটাকে তাহারা নাচের কাজে লাগাইয়া দেয়।

সন্দিগ্ধ পাঠক ইহাকেও বোধ করি একটা কবিকল্পনা মনে করেন ? কিন্তু ইহারই বৃহত্তর রূপ বাস্তবতর রূপ আমাদেরই জীবনকালে ভারতবর্ষে ঘটিয়া যায় নাই ? এবারে আর মাধবপুর পরগনামাত্র নয়—সুবিশাল ভারতবর্ষ ভাবোদ্‌বেলতার ক্ষেত্র ! 'হম যব যাত্রা শুরু করেঙ্গে তামাম হিন্দুস্থান উথল যায়েঙ্গে': গান্ধিজির যষ্টির ইঙ্গিতে তালে তালে উৎকট মারের মুখে সমস্ত ভারতবর্ষ কি নাচে নাই ? জাদুকরের যষ্ঠির ইঙ্গিতে ত্রিশ কোটি নরনারী কি আশায় আনন্দে অভয়ে উদ্‌বেল হইয়া ওঠে নাই ? সকলে দেখিতে পাইল না, কারণ সকলেই যে নাচের দলভুক্ত ! যে দেখিবে সে দূরে থাকিয়া দেখিবে। ভবিষ্যতের ইতিহাস লেখকরা, কবিরা দূর হইতে গান্ধি-পরিচালিত ভারত নৃত্য দেখিয়া বিস্মিত হইবে, মুগ্ধ হইবে—যেমন আজকার আমরা হই চারশত বৎসর আগেকার বাংলাদেশ জোড়া আর একটি দিব্য নৃত্য স্মরণ করিয়া। শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব, গান্ধিজি বৈষ্ণব, আবার ধনঞ্জয়ও বৈষ্ণব—তিনজনেই বৈরাগী।"[৩৬]

আত্মশক্তির উজ্জীবন-প্রয়াসের পথেই ধনঞ্জয় মাধবপুরের প্রজাদের সংগঠিত করেছে। তারা রাজার খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে।শুধু তাই নয়, ধনঞ্জয় যখন রাজার দরবারে যেতে চেয়েছে তখন প্রজারাও সঙ্গে যেতে চেয়েছে। সঙ্গে নিতে চেয়েছে অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু ধনঞ্জয় বৈরাগী স্পষ্টতই এর বিরোধিতা করে বলেছে—

" তা হলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কী করে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয়। কী আমার উপকারটা করতেই যাচ্ছ! তোদের যদি এই রকম বুদ্ধি হয় তবে এইখানেই থাক্।"[৩৭]

শেষপর্যন্ত মাধবপুরের জনতা নিরস্ত্র প্রতিবাদের পথকেই বেছে নিয়েছে। ধনঞ্জয় দেশের প্রজাদের এই যে প্রতিবাদের পথে নিয়ে গেছে সেও প্রজাকল্যাণের স্বার্থে, রাজার কল্যাণের স্বার্থে। কেননা প্রজার আত্মশক্তির অভাবেই রাজা স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে। তাই সমৃদ্ধশালী দেশে রাজার দায়িত্ব ঠিক যতটুকু প্রজার দায়িত্বও ঠিক ততটাই। সে কারণেই ধনঞ্জয় মাধবপুরের প্রজাদের বলেছে—" সব রাজত্বটাই কি রাজার ? অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কী ?"

এই পথেই ধনঞ্জয় সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছে, আত্মশক্তির উজ্জীবন চেয়েছে দু'তরফেই। সাধনকুমার ভট্টাচার্য তাঁর ' রবীন্দ্র-নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থে তাই মন্তব্য করেছেন—

" ......মুক্তির দায়িত্বে পূর্ণ বলেই ধনঞ্জয় রাজা-প্রজার সম্পর্ককে বৈষম্যমুক্ত করে 'সমাজে মুক্তি' পেতে চায়। সব মুক্তিরই এক পথ –আত্মবোধ—আত্মশক্তি। আত্মবোধের অভাব থেকেই সমস্ত বিকৃতি বা পাপের জন্ম। রাজার আত্মবোধ আচ্ছন্ন হলেই অহংকার –স্ফীত রাজা রাজ্যকে নিজের সম্পত্তি বলে মনে করেন; প্রজার অধিকার অস্বীকার করেন—রাজাও যে মানুষ এই সত্যটি অস্বীকার করতে থাকেন। রাজার বিকৃতির জন্য প্রজার দায়িত্বও কম নয়। প্রজার আত্মবোধ সজাগ থাকলে রাজার পক্ষে বিকৃত হওয়া সম্ভব নয়। প্রজার আত্মবোধের তথা আত্মশক্তির অভাবের এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই রাজা স্বৈরাচারী হয়ে উঠেন। সুতরাং রাজা-প্রজার সম্পর্ক সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার একমাত্র উপায়—আত্মবোধ-আত্মশক্তি জাগিয়ে রাখা। আত্মবোধই আত্মশক্তি এবং প্রকৃত মুক্তি। জাগ্রতচৈতন্য ধনঞ্জয় এই আত্মবোধ বা আত্মশক্তিরই পরম বিগ্রহ। আত্মবোধ জাগ্রত, আত্মশক্তি উদবোধিত বলেই ধনঞ্জয় অমৃতমন্ত্রে ও অভয়মন্ত্রে সিদ্ধ।"[৩৮]

যশোরের রাজার কাছে ধনঞ্জয় যে দরবার করতে চলেছে তার জন্য সে মোটেই চিন্তিত নয়। প্রজারা তাকে রাজা কর্তৃক বন্দী করার ভয় দেখালে তাতে মোটেই বিচলিত হয় না সে। কারণ সে জানে তার এই বন্দীত্বকে মাধবপুরের প্রজারা মেনে নেবে না। আর তখনিই বাধবে রাজা-প্রজার সংঘাত। তবে সে সংঘাত হবে নিরস্ত্র শক্তির পরীক্ষা। তাই ধনঞ্জয়কে যখন প্রজারা জানায় যে তার গায়ে হাত পড়লে তারা সহ্য করবে না, তখন ধনঞ্জয় কিন্তু জানিয়ে দিয়েছে 'আমার এই গা যাঁর তিনি যদি সইতে পারেন বাবা, তবে তোমাদেরও সইবে'। আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ মানুষের শারীরিক পীড়ন অতিক্রমনের এ এক প্রক্রিয়াবিশেষ। যাইহোক, এই সংঘাত একই সঙ্গে প্রজাদের এবং রাজাকেও নিজেদের শক্তি ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। তার জন্য উভয়পক্ষকে কম মূল্য দিতে হবে না। সেই মূল্যপ্রদানের মূল্যে আসবে সামাজিক সাম্য, আত্মশক্তির উদ্বোধন। ধনঞ্জয় তাঁর গানে গানে জানিয়েছে—

"আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,

সে কি অমনি হবে!

আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,

সে কি অমনি হবে!

আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে,

সে কি অমনি হবে!

তার আগে তার পাষাণ হিয়া গলবে করুণ রসে,

সে কি অমনি হবে!

আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,

সে কি অমনি হবে!"[৩৯]

এইভাবে ধনঞ্জয় নাটকে মাধবপুরের প্রজাদের আত্মশক্তিতে সংগঠিত করতে চেয়েছেন। তাদের অন্তরে সঞ্চার করতে চেয়েছেন এক ধর্মনীতিকে। এই ধর্মনীতির পরিচয় পাই প্রজাদের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের নিম্নোক্ত সংলাপে—

" ৩। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বলব?

ধনঞ্জয়। বলব, আমরা খাজনা দেব না।

৩। যদি শুধায় কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়। বলব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তা হলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।"

৪। বাবা, এ কথা রাজা শুনবে না।

ধনঞ্জয়। তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না? ওরে, জোর করে শুনিয়ে আসব।"[৪০]

এই ধর্মকে অত্যাচারী শাসক প্রতাপাদিত্য চিহ্নিত করেছে 'ধর্মের ভেক' হিসেবে। ১ম অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্যে তিনি ধনঞ্জয় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"সেই বেটাই যত নষ্টের গোড়া। ধর্মের ভেক ধরে সেই তো যত প্রজাকে নাচিয়ে তোলে।"[৪১] কিন্তু ধনঞ্জয় যে ধর্মের কথা বলেছে সে তো শাশ্বত মানবধর্ম। একজন দায়িত্ববান রাজার উচিত এই মানবধর্মকে অস্বীকার না করে তাকে যথাযথ ভাবে পালন করে চলা। প্রজাপালন যদি যথার্থই রাজার ধর্ম হয়ে থাকে তাহলে প্রজাকল্যাণকে যথাযথ মান্যতা দেওয়া উচিত। কিন্তু আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা, ক্ষমতার দম্ভ রাজাকে সেই ধর্ম থেকে অধিকাংশ সময়েই বিচ্যুত করে। যথার্থ মানবধর্ম তখন তাদের কাছে 'ধর্মের ভেক' বলে মনে হয়। যেমনটা রবীন্দ্রনাথ

দেখেছিলেন বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মারণ হুঙ্কারে তেমনটাই এদেশের রাজা ইংরেজের প্রজাকল্যাণবিরোধী কাজকর্মের মধ্যে। ধর্মবিচ্যুত সেই অপশাসন সারা বিশ্বে মানব মহিমার কি চূড়ান্ত বিনাশ ঘটিয়ে চলেছে রবীন্দ্রনাথ তা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেদিন।

দেশনেতাকে, রাষ্ট্রনেতাকে, রাজাকে একারণেই রবীন্দ্রনাথ বৈরাগীর নিরাসক্ত ধর্মকে পালন করে চলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ধর্মাচরণের ব্যাপারটা অনেকেরই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু সমালোচক প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' গ্রন্থে বলেছেন—

" এই বৈরাগ্য ব্যাপারটাকে পাশ্চাত্য দেশ ভালো করিয়া বুঝিতে পারে না; বিশেষ, বৈরাগ্য যখন ধর্মাচরণের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া রাজনীতিতে প্রবেশ করে। গান্ধিজি সাধুপুরুষ , আবার রাজনীতিকও বটেন, ধনঞ্জয় বৈরাগী মানুষ, আবার রাজনীতিকও বটে। ইঊরোপের চোখে ইহা কী বিসদৃশ! কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহাতে বৈসাদৃশ্য কিছুই নাই। জীবনটাকে সমগ্রভাবে দেখিলে রাজনীতি অর্থনীতি ধর্মনীতি সমস্তই অঙ্গাঙ্গি হইয়া পড়ে। আর সমস্ত পৃথক পৃথক কোটায় ভাগ করিয়া দেখিলে সমস্তই স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। পূর্ণদৃষ্টিতে সমস্তই তো এক জীবনসত্তার অন্তর্গত| ইউরোপ এ কথাটা এখনো ভালো বুঝিতে পারে নাই, তাই তাহার রাজনীতিকের পক্ষে রাজনীতিক্ষেত্রে মিথ্যা বলিতে বাধে না, তাই ব্যক্তিগত আচরণে সাধু হইয়াও সমষ্টির কল্যাণসাধনক্ষেত্রে অসাধুতা করিতে তাহার দ্বিধাবোধ হয় না। যথার্থ ভারতীয় দৃষ্টির কাছে এমন খণ্ডদর্শন অবাস্তব। ভারতীয় দৃষ্টির সম্মুখে জীবনের বিভিন্ন বিভাগ এক অভিন্ন সত্তার অন্তর্গত। তাই গান্ধিজির কাছে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি—সমস্তই মূল ধর্মনীতির অঙ্গীভূত। অখণ্ড আয়ত্ত করিতে গেলে কোনো খণ্ডসত্তার সঙ্গে নিজেকে আসক্ত করিয়া ফেলা চলে না—সমস্তকে যে স্বীকার করিবে সমস্ত হইতে তাহাকে অনাসক্ত থাকিতে হইবে। ইহারই অপর নাম বৈরাগ্য। তাই ধনঞ্জয়ের 'বৈরাগী'-অভিধা সার্থক|"[৪২]

ধনঞ্জয়ের মতো বৈরাগীরা তাই কোনো একটি নির্দিষ্ট আসক্তির বাঁধনে জড়ায় না। তারা কেবল দেশের অগনন মানুষের সামনে মুক্তির পথ খনন করে চলে। ধনঞ্জয়কে রাজা বন্দী করেও শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারেননি| যে আত্মশক্তির জাগরণের দায়িত্ব সে কাঁধে তুলে নিয়েছিল তারই শক্তিধর আগুন এসে তার শিকলকে বিকল করে দিয়েছে। রাজাকে ধনঞ্জয় বলেছে—" আপনি তো আমাকে ছাড়তেই চান না, কিন্তু কোথা থেকে আগুন ছুটির পরোয়ানা নিয়ে হাজির।"[৪৩] রাজা ধনঞ্জয়কে মুক্তি দিয়েছে। ধনঞ্জয় পথে নেমেছে—যে পথ বৈরাগ্যের পথ, নিরাসক্তির পথ, আত্মশুদ্ধির পথ। মূল উপন্যাসে বিল্বন যে পথে অগ্রসর হয়েছে এ নাটকেও ধনঞ্জয় কতকটা সেই পথে নিষ্ক্রান্ত

হয়েছে। তার এই পথে চলার আনন্দকে প্রত্যক্ষ করে প্রতাপাদিত্য বলেছেন—" মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল! ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক— আমরা কোথায় লাগি!"[৪৪] রাজ্যশাসনের মধ্য দিয়ে, জনকল্যাণের মধ্য দিয়েও কিন্তু ধনঞ্জয়ের প্রদর্শিত পথকে প্রস্তুত করে তোলা যায়। রাজ্যশাসনটা তখন বোঝা হয়ে দাঁড়ায় না। ঠিক একারণেই তো মূল উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় অজ্ঞাতবাস ছেড়ে রাজ্যে ফিরে এসেছিলেন। ধনঞ্জয় সেই জনকল্যাণের আদর্শের কথাই রাজাকে বলতে চেয়েছে। সেই পথেই আছে মনের প্রকৃত আনন্দ ও মুক্তি।

৮. রাজা :

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' অধ্যাত্মরসের নাটক হিসেবেই সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ করেছে। গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্য পর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মরসের কাব্যধারার সঙ্গে 'রাজা' নাটকের অরূপ ভাবনার অনেক মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে। বিশেষ করে ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনা বা ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে এ নাটকের যোগ বেশ স্পষ্ট। কিন্তু একথাও বেশ স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মরসের কাব্য যেমন আধ্যাত্মিকতার সঙ্কীর্ণ বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, তাকে অতিক্রম করে গভীর মানব রসের বা মানবমুখীন ভাবনার প্রকাশ আছে, তেমনি এই পর্বের বিশেষ নাট্যসৃষ্টি 'রাজা'র ভাবনাও নিছক আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ফুরিয়ে যায় না। একারণেই কুমার রায় মন্তব্য করেছেন—"'রাজা' নাটক অধ্যাত্মবাদের নাটক—একথা আমরা বিশ্বাস করি না; 'রাজা' নাটকে স্বদেশ চিন্তা নেই, একথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। এখানে স্বদেশের মুক্তির কথা সোজাসুজি নেই। কিন্তু মুক্তির কথা আছে, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের কথা আছে।"[৪৫]

'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যাকে রাজা হিসেবে চিহ্নিত করেন তার সঙ্গে মিলনের পথ খুব সহজ নয়। তাকে পেতে গিয়ে রানী সুদর্শনা বিসর্জন দিয়েছে তার অহঙ্কার, অধিকারবোধ, আসক্তি, এমনকি অর্জিত কিছু বহির্লক্ষণ—যেমন রূপ-অরূপ বা সুন্দর-অসুন্দরের ধারণা। গভীর দুঃখের দ্বারা, আত্মগ্লানির দ্বারা মনের সঙ্কীর্ণতাকে ঝরিয়ে তবেই রাজার বৃহৎ সত্তাকে লাভ করা যায়। এ-ও তো সেই মানবের অন্তর্গত নিহিত মানব-শক্তিরই দান, যা মানুষ কত রূপ-রূপান্তর যুগ-যুগান্তরের সাধনায় অর্জন করেছে, যা তাকে শ্রেষ্ঠত্বের ক্রমোচ্চশীলতায় বহন করে নিয়ে চলেছে। একেই বলা যেতে পারে আত্ম-সংস্কারের পথে আত্ম-উজ্জীবন। এভাবেই তো মানুষ আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। 'গীতিমাল্যে'র একটি কবিতায় পাই হুবহু একই কথার অনুরণন—

"আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে

ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।

আমারে যে জাগতে হবে

কী জানি সে আসবে কবে

যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।”[৪৬]

যে বৃহতের সঙ্গে মিলনের জন্য রানী সুদর্শনা উন্মুখ হয়েছে তাকে পাবার জন্য নিজের অন্তরকেও ধুয়ে মুছে সঙ্কীর্ণতার মলিনতামুক্ত হয়েছে। এভাবে সে তার সব আত্মসংস্কারকে ছাড়িয়ে উঠেছে। আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংস্কারমুক্ত মানুষের চিত্তেই তো বৃহতের চেতনা-স্পর্শ এসে লাগে—কর্মের পথে, জ্ঞানের পথে কঠিন দুঃখসাধনার মধ্য দিয়ে। ঠাকুরদা এবং সুরঙ্গমা তো ঠিক এভাবেই রাজাকে পেয়েছে, কাঙ্খিত ফল লাভ করেছে, রাজার সঙ্গে মিলনের ‘স্বত্ব’ অর্জন করেছে।

কিন্তু বিদেশীরা রাজাকে দেখতে না পেয়ে প্রজাদের বারংবার প্রশ্ন করে বিব্রত করেছে। কিন্তু ঠাকুরদা তাদের বুঝিয়ে বলেছে—“আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে—তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকে রাজা করে দিয়েছে!”[৪৭] আসলে যখন কোন দেশ বা রাষ্ট্রে যখন অধিকার ও কর্তব্যের সামঞ্জস্যবোধে প্রত্যেকটি মানুষ আপন ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায় তখনিই সৃষ্টি হয় এমন অবস্থার। তখন আর কোন শাসনেরই প্রয়োজন হয় না। সেখানে তখন সবাই রাজা হয়ে যায়। সহযোগিতাই সে সমাজের মূল নিয়ন্ত্রণশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘স্বদেশীসমাজ’ প্রবন্ধে এভাবেই দেশের মানুষকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। আত্মসংস্কারই তার একমাত্র পথ।

সুতরাং এদিকের বিচারে রবীন্দ্রনাথের “রাজা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তি যা সংহত হয়ে এক আদর্শ সমাজ শক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির রূপ নেয়, যে সমাজ বা রাষ্ট্র মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্যবোধের একটা আদর্শ রূপ তৈরি করতে পারে। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমাজ চিন্তায় আমাদের দেশের মানুষকে যে অর্থদৈন্য এবং চিত্তদৈন্য দূর করতে বলেছেন এখানে তার মধ্যে বিশেষ করে চিত্তদৈন্যকেই রাজার সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশের পথে বাধা হিসেবে দেখানো হয়েছে। চিত্তদৈন্যের কাছে মানুষের বহিরঙ্গ সৌন্দর্য, আলো-অন্ধকারের চিরাচরিত পার্থক্যটাই বড়। সমৃদ্ধ মনের কাছে এসবের কোন দাম নেই। তাই সুদর্শনার মধ্যে যখন আত্মগ্লানি আসছে তখন সুবর্ণকে স্বয়ংবর সভায় দেখে সে বলেছে, ‘ঐ সুন্দরেও মন ভোলে! আমার এ পাপ চোখকে কী দিয়ে ধুলে এর গ্লানি চলে

যাবে!' সুরঙ্গমা উত্তর দিয়েছিল, ' সেই কালোয় ডুবিয়ে ধুতে হবে। সেই আমার রাজার সকল রূপ ভোলানো রূপের মধ্যে।' কাজেই সব রূপ ডুবিয়ে দেয় বলেই তা কালো। ভয়ঙ্কর হলেও তা আকর্ষণীয়। সমস্ত অহঙ্কার ডুবে না গেলে তাকে গভীর করে আপন করে পাওয়া যায় না। সুদর্শনের গানেও এই উপলব্ধি:

আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম,

ওহে অন্ধকারের স্বামী।

সকল ঝরে সকল ভরে আসুক সে চরম—

ওগো মরুক না এই আমি।।

এই আত্মনিবেদনকে সুদর্শনা আরেকভাবে বলেছে, 'সেই আঁধার ঘরের ইচ্ছা—দেখা নয়, শোনা নয়, চাওয়া নয়, কেবল গভীরের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া।' এই ব্যাপক ও গভীর অনুভূতির কাছে সমস্ত বিরোধও বৈচিত্র্যময় সামঞ্জস্যে মিলিয়ে যায়।"[৪৮] আর তখনিই গড়ে উঠতে পারে বৈষম্যহীন এক সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা—যেখানে বিরোধী-অপরাধী কাঞ্চীরাজও রাজার সিংহাসনের পাশে স্থান পেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের রাজা তাই আত্মশক্তি অর্জনের লক্ষ্যে অর্জিত কতকগুলি গুণবৈশিষ্ট্যের সমষ্টি বললে ভুল বলা হয় না। সেই সকল গুণাবলীর সমষ্টিই তো আদর্শ দেশ ও তার রাজার যথার্থ অভিজ্ঞান। আত্মকৃত চেষ্টায় কর্ম ও বোধির জাগরণের পথ বেয়েই তার যথার্থ বিকাশ আসে। তা আমাদেরকে হয়তো বস্তুগত সফলতা দেয় না কিন্তু আমাদেরকে ভিতরে ভিতরে রাজা করে দেয়। ঠাকুরদার সঙ্গে নাগরিকদলের কথোপকথনে এই সত্যটিকেই রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন—

"ঠাকুরদা। কার সঙ্গে ঝগড়া করবে বলো। তোমাদের রাজা তো কারও কানে ধরে বলছেন না 'আমি আছি'। তিনি তো বলেন , তোমরাই আছো। তাঁর সবই তো তোমাদেরই জন্যে।

প্রথম। এই তো, আমরা রাস্তা দিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছি—'রাজা নেই'। যদি রাজা থাকে সে কী করতে পারে করুক-না।

ঠাকুরদা। কিচ্ছু করবে না।

দ্বিতীয়। আমার পঁচিশ বছরের ছেলেটা সাত দিনের জ্বরে মারা গেল। দেশে যদি ধর্মের রাজা থাকবে তবে কি এমন অকালমৃত্যু ঘটে।

ঠাকুরদা। ওরে, তবু তো এখনো তোর দু ছেলে আছে—আমার যে একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল, একটি বাকি রইল না।

তৃতীয়। তবে ?

ঠাকুরদা। তবে কী রে। ছেলে তো গেলই, তাই বলে কি ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব। এমনি বোকা!

প্রথম। ঘরে যাদের অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের!

ঠাকুরদা। ঠিক বলেছিস ভাই। তা সেই অন্ন-রাজাকেই খুঁজে বের কর্ ! ঘরে বসে হাহাকার করলেই তো তিনি দর্শন দেবেন না।

দ্বিতীয়। আমাদের রাজার বিচারটা কিরকম দেখো না। ঐ আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বলতে সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, কিন্তু তার ঘরের এমন দশা যে চামচিকেগুলোরও থাকবার কষ্ট হয়।

ঠাকুরদা। আমার দশাটাই দেখ্-না। রাজার দরজায় সমস্ত দিনই তো খাটছি—আজ পর্যন্ত দুটো পয়সা পুরস্কার মিলল না।

তৃতীয়। তবে?

ঠাকুরদা। তবে কী রে। তাই নিয়েই তো আমার অহংকার। বন্ধুকে কি কেউ কোনোদিন পুরস্কার দেয়। ......”[৪৯]

এই আত্মিক সাধনার মধ্যে বস্তুগত সম্পদ লাভের ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা নেই। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় সমাজের বহুকালাগত ঐতিহ্যকে রূপায়িত করে তুলেছেন—বস্তুগত প্রয়োজন আর মানবিক সম্পদের সুষম বিকাশের সুযোগ এর মধ্যে আছে। একেই পাগল তার গানে ‘সোনার হরিণ’ বলে উল্লেখ করেছে—

“তোরা যে যা বলিস ভাই,

আমার সোনার হরিণ চাই।......

তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস,

রাখিস ঘরে ভরে।

যাহা যায় না পাওয়া তারি হাওয়া

লাগল কেন মোরে।

আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা

যা নেই তারি ঝোঁকে।

আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস বুঝি

মরি তাহার শোকে!

ওরে, আছি সুখে হাস্যমুখে,

দুঃখ আমার নাই।

আমি আপন-মনে মাঠে বনে

উধাও হয়ে ধাই।।"[৫০]

ঠাকুরদা একারণেই বলে " আমার রাজা যদি-বা দেখা দিত তোদের চোখেই পড়ত না। দেশের সঙ্গে তাকে আলাদা করে চেনাই যায় না—সে সকলের সঙ্গে মিশে যায় যে।"[৫১] আসলে সকলের মধ্যেই তো রয়েছে মানবিক গুণাবলীর অবস্থান, কেবল শ্রেষ্ঠ পরিচর্যায় তাকে জাগাতে হয় মাত্র। তখনিই কিন্তু দেশের মানুষ রাজার গুণগত মানকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে। তখন তার পশুত্বকে শাসনের জন্য কোন রাজার প্রয়োজন হয় না। তখন 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'।–

" এ তো গভীর গণতন্ত্রের আকাঙ্খা। 'এখানে সব রাস্তাই রাস্তা, যে দিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছবে। সামনে চলে যাও'। রাস্তাহীন দেশের লোকের কাছে এই আকঙ্খিত খোলা রাস্তার দেশ তো আজব ঠেকবেই। কোনও সত্যের সম্মুখীন হয়ে সাধারণ মানুষের যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সে তো আমাদের এই পরাধীন দেশের মানুষেরই প্রতিক্রিয়া, সংশয়, বিদ্রূপ। পারস্পরিক নিন্দাবাদ আবার দু-একজনের গভীর আনুগত্য—এই পরস্পরবিরোধী প্রতিক্রিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। এই প্রতিবিম্বিত রূপ দেশের মানুষকে জানিয়ে দেবার দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে / মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে—।' বাংলার বিপ্লববাদের চরমপন্থাকে তিনি বিচ্ছিন্ন প্রয়াস ভেবেছেন আর সেই বিচ্ছিন্ন প্রয়াসকেই ' বিফলতার বিষম আবর্ত' বলেছেন। ' পোলিটিক্যাল ভিক্ষাবৃত্তি'কে যেমন, তেমনি 'অতিশয় পন্থা'কে তিনি সদুপায় বলেন নি বা ভাবেন নি। এ ব্যাপারে তিনি মতপ্রকাশেও দ্বিধা করেন নি। 'পথ ও

পাথেয়' প্রবন্ধেই তিনি লিখলেন: 'বাংলাদেশে কিছুকাল হইতে যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহার সংগঠনে আমাদের কোন্ বাঙালির কতটা অংশ আছে তাহার সূক্ষ্মবিচার না করিয়া একথা নিশ্চয় বলা যায় যে, কায় বা বাক্যে ইহাকে আমরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও প্রকারে খাদ্য জোগাইয়াছি। ......ইহার দায় এবং দুঃখ বাঙালিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।'"[৫২]

এরই দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে রাজা নাটকে। নাটকের শেষের দিকে কাঞ্চীরাজ পরাজয় স্বীকার করে রাতের অন্ধকারে যখন রাজার মন্দির খুঁজে চলেছে তখন ঠাকুরদা ও তার ছেলের দলের সঙ্গে দেখা। সংলাপের এই অংশটুকু লক্ষ্যণীয়—

" কাঞ্চী। কিন্তু ঠাকুরদা, তোমার এ কী কাণ্ড! সেই উৎসবের ছেলেদের এখানেও জুটিয়ে এনেছ? কিন্তু সেখানে যারা তোমার পিছে পিছে ঘুরত তাদের দেখছি নে বড়ো।

ঠাকুরদা। আমার শম্ভু-সুধনের দল ? তারা এবার লড়াইয়ে মরেছে।

কাঞ্চী। মরেছে ?

ঠাকুরদা। হাঁ, তারা আমাকে বললে, ঠাকুরদা, পণ্ডিতরা যা বলে আমরা কিছুই বুঝতে পারি নে, তুমি যে গান গাও তার সঙ্গেও গলা মেলাতে পারি নে, কিন্তু একটা কাজ আমরা করতে পারি—আমরা মরতে পারি। আমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাও, জীবনটা সার্থক করে আসি। তা, যেমন কথা তেমন কাজ। সকলের আগে গিয়ে তারা দাঁড়াল, সকলের আগেই তারা প্রাণ দিয়ে বসে আছে।"[৫৩] এর মধ্যেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রূপকের আধারে গেঁথে দিয়েছেন তাঁর দেশ সম্পর্কিত চিন্তাভাবনাকে—

" দায় এবং দুঃখ স্বীকার করে নিয়েই রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা বলেছেন, ' আজ আমাদের বড়ো রাস্তার বড়ো দিন। আজ ওই ঘরের মানুষদের পথে বের করবার জন্যে দক্ষিণ হাওয়ার মতো দলবল নিয়ে বেরিয়েছি।' 'প্রশস্ত পথ'ই প্রকৃষ্ট পথ এটা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন—কেননা সংকীর্ণ পথে, ' একদিন দিক হারাইয়া শেষে পথও পাইব না, কাজও নষ্ট হইবে। ....তথাপি ইহাকে আমরা পরিহাস করিতে পারিব না।' আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোরকে রবীন্দ্রনাথ সম্মান জানিয়েছেন 'প্রায়শ্চিত্ত' থেকে 'মুক্তধারা'য় এবং সর্বশেষে 'পরিত্রাণ'-এ ধনঞ্জয় বৈরাগী এই কথাটি বলেছে মাধবপুরের প্রজা এবং শিবতরাই-এর প্রজাদের।"[৫৪]

৯. অচলায়তন :

'রাজা' নাটক রচনার পর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'অচলায়তন' নাটক। এনাটকের রচনাকাল **১৯১১** । 'রাজা'-তে যে সকল মানুষেরা ছিল খানিকটা অস্পষ্টতার

আড়ালে, এ নাটকে তাদের শ্রেণী-অবস্থানটুকু স্পষ্ট। নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথের দেশোন্নয়ন ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে প্রতিষ্ঠানবিরোধী প্রগতিচেতনায়, জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, শোষণমুক্ত সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতায়।

নাটকে অচলায়তনের যে ছবিটি নাট্যকার এঁকেছেন, তা বহুকালাগত কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল সমাজের রূপক—নামকরণের মধ্যে যার স্পষ্ট আভাস আছে। এই আয়তনের শিক্ষার্থীরা গতানুগতিক কতকগুলি প্রাণহীন নিয়মের মাঝে আবর্তিত হয়ে চলে। সামাজিক এই বিধান বা নিষেধাজ্ঞাগুলি অচলায়তনের শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ করে রাখে। তার বাইরে পড়ে থাকে যে বিরাট পৃথিবীটা সেদিকে তাদের তাকাতে মানা। এই প্রাণান্তকর আবদ্ধতা বা সঙ্কীর্ণতা রবীন্দ্রনাথ এদেশের পল্লীসমাজ শুধু নয়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্যেও দেখেছিলেন। তা আমাদের সমাজকে কতটা জীর্ণ করে তুলছে, স্থানূত্বের চরিত্রগরিমা দান করেছে পঞ্চকের গানে তার আভাস ধরা আছে—

“বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর
কেউ তো হানে না।
আকাশে কার ব্যাকুলতা,
বাতাসে বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা
কেউ তো আনে না।”[৫৫]

নিছক কতকগুলি অন্ধ বিধান বা সংস্কারের আবর্তন কখনো জীবনের দাবি বা খোরাক মেটাতে পারে না। তাই পঞ্চক বা সুভদ্রের মতো উচলায়তনবাসীরা নিয়মের বাইরে গিয়ে স্বাতন্ত্র্যের স্বাদ পেতে চায়। পঞ্চক নিয়মের বাইরে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে যায় অচলায়তনের নিয়মভঙ্গজনিত পাপ বা অভিশাপ তাকে স্পর্শ করে কিনা। সুভদ্রও অচলায়তনের প্রায় তিনশো বছরের বন্ধ করা আগল খুলে অনুসন্ধিৎসার চরিতার্থতা ঘটাতে চায়। কিন্তু এর জন্য আশ্চর্যজনকভাবে তারা কোনরকম ফলভোগ করে না। কেবল উপাধ্যায় বা মহাপঞ্চকের ন্যায় বিধানকারীর শাস্তির মুখোমুখি হতে হয় মাত্র। প্রমাণিত হয়

অচলায়তনের ভ্রান্ত নিয়মবিধির নিষ্ফলতার দিকটি। এই নিয়মানুবর্তনের নিষ্ফলতার দিকটি বুঝতে পেরে আচার্য অদীনপুণ্য তাই একসময় স্বীকার করতে বাধ্য হন যে—

“ প্রথম যখন এখানে সাধনা আরম্ভ করেছিলুম তখন নবীন বয়স, তখন আশা ছিল সাধনার শেষে একটা-কিছু পাওয়া যাবে। সেইজন্যে সাধনা যতই কঠিন হচ্ছিল উৎসাহ আরো বেড়ে উঠছিল। তার পরে সাধনার চক্রে ঘুরতে ঘুরতে একেবারেই ভুলে বসেছিলুম যে সিদ্ধি বলে কিছু-একটা আছে। আজ গুরু আসবেন শুনে হঠাৎ মনটা থমকে দাঁড়াল—আজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করলুম, ওরে পণ্ডিত, তোর সব শাস্ত্রই তো পড়া হল, সব ব্রতই তো পালন করলি, এখন বল্ মূর্খ, কী পেয়েছিস। কিছু না কিছু না, সূতসোম। আজ দেখছি—এই অতি দীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করেছে—কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছে।”[৫৬]

অচলায়তনের বাইরের যে বৃহৎ পৃথিবীটা তার জন্য কিন্তু পঞ্চকের প্রাণ নিত্য পলাতকা হতে চেয়েছে। তার প্রাণের কথাগুলি গানের কথা আর সুরে মূর্ত করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ—যার মধ্যে সুদূরের প্রতি ব্যাকুলতা তীব্র হয়ে উঠেছে—

“ দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশিটির সুরে সুরে।
যে পথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হয়ে যায় হারায়ে,
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরান
যেতে চায় কোন্ অচিন পুরে।”[৫৭]

এ ব্যাকুলতার হয়তো মর্ম বুঝেছিলেন আচার্য। তাই অচলায়তনের নিয়মবিরোধী কার্যকলাপ সত্ত্বেও অদীনপুণ্য ক্ষমা করে দেন পঞ্চককে। কিন্তু এ নিয়ে অবশেষে নাটকে দ্বন্দ্ব পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে—প্রাচীন রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে, ধর্মাচারের বিরুদ্ধে ঠাকুরদা ও শোণপাংশুর দল প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। ভেঙে গুঁড়িয়ে

দিয়েছে অচলায়তনের প্রাচীর। রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে কালের দাবিকে অস্বীকার করেননি। দেখিয়েছেন যে ধর্ম মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে না, মানুষকে মিলিত হতে দেয় না সেই ধর্ম অচল, সে ধর্ম যে সমাজকে ধারণ করে থাকে তাও অচলায়তনের দশা প্রাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ একারণেই তাঁর পল্লীসংগঠন কর্মে চেতনার স্বাধীনতা আনতে চেয়েছিলেন, সমাজ-প্রগতির স্বার্থে বিশ্বচেতনার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখতে চেয়েছিলেন।

জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা কীভাবে সামাজিক শ্রেণীবিভাজন তৈরি করে মানুষের মিলনকে বাধা দেয় তারও ছবি আছে এ নাটকে। অচলায়তন বাসীরা তাদের বাইরে থাকা শোণপাংশুদের ম্লেচ্ছ বলে মনে করে। তাদের তুলনায় নিজেদের আসন যে অনেক উঁচুতে এই ধারণা পোষণ করে। তাই চণ্ডক নামের শোণপাংশু পঞ্চকদের গুরুর কাছে মন্ত্রলাভের চেষ্টা করেও সফল হয় না। সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় বিধান কীভাবে সামাজিক ব্যবধানটুকুকে গড়ে দেয় তার ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। অথচ শোণপাংশুরাই যে সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদটুকুকে গড়ে দিচ্ছে, তাদের হাত ধরেই যে সমাজের প্রগতি রচিত হয়ে চলেছে তার কথা আদৌ স্বীকার করে না এই কুলীন সমাজ।

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই পঞ্চকের সঙ্গে শোণপাংশুদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শোণপাংশুদের সামাজিক গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক মানদণ্ডের নিয়ন্তা শক্তি হিসেবে দেখিয়েছেন এবং সামাজিক শ্রেণীবৈষম্যের বিপরীতে মত পোষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাটকে এই গণতান্ত্রিক চেতনার উদ্ভব সত্যিই নতুন—

“ প্রথম শোণপাংশু। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন ?

পঞ্চক। বলতে পারি নে—কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে তোরা যে সবাই সবরকম কাজই করিস—সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো ?

প্রথম শোণপাংশু। চাষ করি বৈকি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খুব ক’ষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।......

পঞ্চক। আচ্ছা, নাহয় তোরা চাষই করিস সেও কোনোমতে সহ্য হয়—কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস।

প্রথম শোণপাংশু। করি বৈকি।

পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি?

তৃতীয় শোণপাংশু। কেন করব না? এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেঁসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিই নে।

প্রথম শোণপাংশু। কেন?

পঞ্চক। কেন কী রে! ওটা যে নিষেধ।”[৫৮]

রবীন্দ্রনাটকে এই গণতান্ত্রিক চেতনার উদ্ভব সত্যিই নতুন। কৃষক-শ্রমজীবী মানুষেরাই যে সমাজের মূল শক্তি বা সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার তা তারা বুঝিয়ে দিয়েছে দাদাঠাকুরের সঙ্গে সংঘবদ্ধভাবে যেভাবে তারা অচলায়তনের প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেবার কাজে নেমেছে। এক পুরাতন জীর্ণ সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ার এই কাজে যে দাদাঠাকুর নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরাতনপন্থী মহাপঞ্চককেও পথে নিয়ে চলতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাটকগুলিতে কিন্তু সমাজ-পরিবর্তনের অন্যতর মাত্রা কাজ করেছে। কিন্তু এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ সমাজপরিবর্তনের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তার মধ্যে সমসাময়িক ইতিহাসের ছায়াপাত আছে। হীরেন ভট্টাচার্য “ ‘রবীন্দ্রনাটকে সাধারণ মানুষ’: রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ” গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—

“ অর্থনৈতিক উৎপাদনের (তথা সমাজের) প্রগতির পক্ষে অবক্ষয়গ্রস্ত ফিউডালতন্ত্র মধ্যযুগের অবসানে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অন্তরায়ের প্রাচীর ভাঙার তাগিদ বোধ করছিল সেদিনকার উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর দাদাঠাকুরের দল। এরা তখন বিপ্লবী। কার্লমার্কসও তাঁর কমিউনিস্ট ইশতেহারে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকার কথা বলেছেন। এদের বিপ্লবী বা প্রগতিশীল ব্লা হয়েছে ফিউডালতন্ত্রের সঙ্গে আপেক্ষিক বিচারে। ইতিহাসে পাই ফিউডালদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য মূলত বুর্জোয়াশ্রেণী নানা প্রতিশ্রুতিতে কৃষকশক্তিকে সৈনিক হিসাবে পেছনে সংগঠিত করেছিল। ইংল্যান্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বুর্জোয়া বিপ্লবের আঘাতে ফিউডাল, অচলায়তনের প্রাচীরের অনেকখানিই ভেঙে পড়েছিল কিন্তু দাদাঠাকুরেরা সে বিপ্লবের সম্পূর্ণতা দান করতে পারেন নি। অথবা বলা উচিত সম্পূর্ণতা দান করতে ভয় পেয়েছিলেন, কারণ যে উলুখড়েরা এতদিন শুধু মরতেই জানত, সেই উলুখড়েরা বুর্জোয়ার নেতৃত্বে সহসা মিলিটেন্ট শোণপাংশুতে পরিণত হয়ে অস্ত্র উদ্যত করেছিল ফিউডাল লর্ডদের বিরুদ্ধে। এতে ভয় পাবার কারণ হল এই যে, সেদিন যে অস্ত্র ফিঊডালদের বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছিল, পরবর্তীকালে ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও তা ঐ শ্রমজীবী মানুষ প্রয়োগ করতে পারে—এই আশঙ্কায় ইউরোপ খণ্ডে শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়াশ্রেণী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থ পথে রণে ভঙ্গ দিয়ে হাত মিলিয়ে ফেললেন তাদেরই মারে আধমরা ফিউডালতন্ত্রের সঙ্গে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা কায়েম হল। ধীরে ধীরে এই অর্থব্যবস্থার যতই বিকাশ ঘটতে লাগল, গ্রামের

ভূমিহীন চাষী আর কর্মহীন শিল্পী কারখানায় শ্রমিকে পরিণত হল। সেই সঙ্গে ক্রমেই বাড়তে লাগল শোষণের তীব্রতা। শ্রমিকশ্রেণীর দুর্গতি দুর্দশা উঠল চরমে। তখন পূর্বতন বিপ্লবী দাদাঠাকুরদের আর দেখা পাওয়া গেল না।”[৫৯]

১০. মুক্তধারা :

'মুক্তধারা' রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনার বহুমাত্রিক দিককেই ধারণ করে আছে। রবীন্দ্রনাথ দেশ তথা পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানবকল্যাণের অনুকূলে যন্ত্রের ব্যবহারের অথা বলেছিলেন। কিন্তু বিশশতকের দুই ও তিনের দশকে ইউরোপ ভ্রমণে তিনি দেখেছিলেন মানবকল্যাণের পরীপন্থী যন্ত্রসভ্যতার প্রভূত বিকাশকে। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথকে তা গভীরভাবে ভাবিত করেছিল। নাটকের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ সেই বিশ্বসৃষ্টির পরীপন্থী যন্ত্রসভ্যতার বিকৃতিকে এক নাগরিক ও পথিকের সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে স্পষ্ট করে তুলেছেন—

পথিক। যন্ত্রের কাজটা কী ?

নাগরিক। মুক্তধারা ঝরণাকে বেঁধেছে।

পথিক। বাবা রে! ওটাকে অসুরের মাথার মত দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

নাগরিক। আমাদের প্রাণপুরুষ মজবুত আছে, ভাবনা কোরো না।

পথিক। তা হতে পারে, কিন্তু ওটা অমনতরো সূর্যতারার সামনে রাখবার জিনিস নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভালো হত। দেখতে পাচ্ছ না যেন দিনরাত্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্ছে?

নাগরিক। আজ ভৈরবের আরতি দেখতে যাবে না?

পথিক। দেখব বলেই বেরিয়েছিলুম। প্রতিবৎসরই তো এমনি সময় আসি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনো এমনতরো বাধা দেখি নি। হঠাৎ ঐটের দিকে তাকিয়ে আজ আমার গা শিউরে উঠল—ও যে অমন করে মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে গেল এটা যেন স্পর্ধার মতো দেখাচ্ছে। দিয়ে আসি নৈবেদ্য, কিন্তু মন প্রসন্ন হচ্ছে না।”[৬০]

এই যান্ত্রিকতা কীভাবে সারা বিশ্বে মানবসভ্যতার পরীপন্থী উগ্রজাতীয়তাবাদের জন্ম দিচ্ছে মুক্তধারায় তার স্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। যন্ত্রশক্তির বলে বলীয়ান যন্ত্ররাজ বিভূতি

উত্তরকূটের মধ্য দিয়ে বয়ে আসা মুক্তধারার উপর বাঁধ দিয়ে শিবতারাইয়ের চাষের জলকে রুদ্ধ করেছে। এই উপায়ে সে শিবতরাইকে উত্তরকূটের বাধ্য করতে চেয়েছে। রাজা রণজিৎ স্পষ্টতই সেকথা স্বীকার করেছেন মন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে—"শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই তো বাধ্য করতে পারলে না। এতদিন পরে মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে বিভূতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে দিলে।"[৬১]

কিন্তু শক্তির দম্ভে একটি দেশের অন্ন বস্ত্রকে কেড়ে নিয়ে আধিপত্য বিস্তারের উগ্রজাতীয়তাবাদী এই মানসিকতা কখনোই সভ্যতা বিকাশের মাপকাঠি হতে পারে না। সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে তা কতটা অন্তরায় হতে পারে তার আভাস রবীন্দ্রনাথ দিতে ভোলেননি এ নাটকে। ১৯২২-এ দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ অহিংস পথে জাতীয়তাবাদ তথা আতর্জাতিকতাবাদের যে স্বতন্ত্র পথপ্রস্তুতির কথা ভেবেছিলেন তার ইঙ্গিত আছে নাটকে মন্ত্রীর সংলাপে। তাই বিভূতির কর্মকান্ডে তিনি তেমন উৎসাহ বোধ করেননি। রাজাকে তিনি বলেছেন—

"মন্ত্রী। ক্ষমা করবেন, মহারাজ। খন্তা-কোদাল হাতে মাটি-পাথরের সঙ্গে পালোয়ানি আমাদের কাজ নয়। রাষ্ট্রনীতি আমাদের অস্ত্র, মানুষের মন নিয়ে আমাদের কারবার। যুবরাজকে শিবতরাইয়ের শাসনভার দেবার মন্ত্রণা আমিই দিয়েছিলুম তাতে যে বাঁধ বাঁধা হতে পারত সে কম নয়।

রণজিৎ। তাতে ফল হল কী ? দু'বছর খাজনা বাকি। এমনতরো দুর্ভিক্ষ তো সেখানে বারে বারেই ঘটে, তাই বলে রাজার প্রাপ্য তো বন্ধ হয় না।

মন্ত্রী। খাজনার চেয়ে দুর্মূল্য জিনিস আদায় হচ্ছিল, এমন সময় তাকে ফিরে আসতে আদেশ করলেন। রাজকার্যে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখবেন, যখন অসহ্য হয় তখন দুঃখের জোরে ছোটোরা বড়োদের ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠে।"[৬২]

আলোচ্য সংলাপে স্পষ্টতই পরাধীন ভারতবর্ষের উপর যন্ত্রশক্তিতে বলীয়ান ইংরেজদের প্রভুত্বস্থাপনের বিষয়টিকে জানান দেওয়ার প্রয়াস আছে। দেশের প্রতিকূল অবস্থায় সেদিন বনিয়া সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তাদের পাওনা আদায় করতে ভোলেনি। সেই অমানবিকতার দিকটি রাজা রণজিতের সংলাপে পরিস্ফুট।অভিজিতের দূতের সঙ্গে বিভূতির যে সংলাপকে নাট্যকার নাটকে বিধৃত করেছেন তার মধ্যেও এর আভাস আছে—

"বিভূতি। চাষের খেতের কথা কী বলছ?

দূত। সেই খেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না ?

বিভূতি। বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষীর কোন্ ভুট্টার খেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।

দূত। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করছেন এখনো কি ভাববার সময় হয় নি ?

বিভূতি। না, আমি যন্ত্রশক্তির মহিমার কথা ভাবছি।

দূত। ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না ?

বিভূতি। না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না।

দূত। অভিশাপের ভয় নেই তোমার ?

বিভূতি। অভিশাপ! দেখো, উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে। দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই , মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে ?”[৬৩]

অম্বার আর্তি, বটুকের যন্ত্রণা, বটুকের নাতিদের মত বহু মানুষের অকাতরে প্রাণ বলিদান এরই ফলশ্রুতি। বিভূতি যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিতে চেয়েছে। শুধু তাই নয়, উগ্র সাম্রাজ্যবাদীরাষ্ট্রগুলি কীভাবে ধর্ম বা দেবতাকে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে ব্যবহার করে তারও ইঙ্গিত দিতে ভোলেননি রবীন্দ্রনাথ। তাই মহাদেবকে শত্রুতে পরিণত করার প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ-এর মন্তব্যে শোষণ বঞ্চনার পীড়নের বিরুদ্ধে মানুষ যে একদিন বিক্ষোভ-বিদ্রোহে সামিল হবে , সেদিন যে তাদের শক্তি ও অধিকার রাজার শক্তি ও অধিকারকে ছাড়িয়ে যাবে তার আভাস দিতে ভোলেননি রবীন্দ্রনাথ। মন্ত্রীর পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যে এরই আভাস আছে। বটুকের রক্ততিলক তারই পরিচয়বাহী।

রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিলেন না ঠিকই কিন্তু দেশোন্নয়ন তথা সভ্যতার সমৃদ্ধির স্বার্থে মানবকল্যাণের পরিপন্থী যন্ত্রসভ্যতার বিকাশের বিরুদ্ধে অবশ্যই সরব হয়েছিলেন। রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎ-এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাই জানিয়েছিলেন উত্তরকূটের ভৈরব রাজা রণজিৎ বা বিভূতির পূজা গ্রহণ করবেন না। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে কঠিন ও মধুরের সৃষ্টিপ্রবর্তনা রয়েছে। তার ধারা নিরন্তর বহমান। দুয়েরই মূল্য সমমানে তুলিত হতে পারে। নাটকে সঞ্জয়-অভিজিৎ-এর কথোপকথনে তারই আভাস আছে—

“সঞ্জয়। ...... যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।

অভিজিৎ। ভাই, তারই মূল্য দেবার জন্যেই কঠিনের সাধনা।.........সেইজন্যেই সইতে পারছিনে ঐ বীভৎসটাকে যা ধরণীর সংগীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করিনে।"[৬৪]

কিন্তু পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে সুন্দর ও মধুরের স্পর্শ বঞ্চিত যে যন্ত্রসভ্যতার বিকাশকে রবীন্দ্রনাথ এই সময় প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তারই আনুষঙ্গিক যে উগ্রজাতীয়তাবাদকে গা ছাড়াতে দেখেছিলেন, সেখানে কঠিনের চর্চা থাকলেও সুন্দর ও মধুরের কোন স্থান ছিল না। বস্তুর অতীত যে মানবিক ও আত্মিক উপাদানগুলি সভ্যতার তথা দেশের উৎকর্ষমুখী বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী উন্নয়ন যজ্ঞে যেগুলির বিকাশের আয়োজন রেখেছিলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার যান্ত্রিক বিকাশে তার নিতান্ত অভাব দেখে তিনি চিন্তিত হয়েছিলেন।

'মুক্তধারা'য় রবীন্দ্রনাথ তাই যন্ত্রসর্বস্ব সভ্যতার মানববিরোধী বিকাশের বিপরীতে সভ্যতার অগ্রগমনের স্বতন্ত্র পথের নির্দেশ দিয়েছেন। অভিজিৎ চরিত্রটি এক্ষেত্রে তাঁর অভীপ্সা রূপায়ণের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। শিবতরাই-এর লোকেদের নিত্য দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সে নন্দিসংকটের পথ খুলে দিয়েছে। রাজপ্রহরী উদ্ধব যদিও তাকে জানিয়েছে যে মহারাজ তাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু অভিজিৎ স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছে—" ডান- হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বাঁ-হাতের বদান্যতায় বাঁচানো যায় না। তাই ওদের অন্ন-চলাচলের পথ খুলে দিয়েছি। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা আমি দেখতে পারি নে।"[৬৫]

আসলে অভিজিৎ-এর এই কথা রবীন্দ্রনাথেরই কথা। রবীন্দ্রনাথও দেশের উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন এবং তাকে কার্যে রূপায়িত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন তার মূল কথা ছিল জনসাধারণকে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। ইংরেজ শক্তির দয়ার পথ ধরে যে আমাদের দেশের উন্নয়ন বা মুক্তি আসবে না তা তিনি অসঙ্কুচিত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। 'আত্মশক্তি', 'স্বদেশ' ও 'সমাজ'-এর মতো গ্রন্থে বহুদিন যাবৎ রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ পথেই পল্লীপ্রধান এ দেশের উন্নয়নের কথা বলে আসছিলেন।

এ নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী এ পথেই শিবতরাইয়ের জনতাকে শক্তিশালী করে তোলার প্রয়াস নিয়েছেন। তাঁর মধ্যে অনেকে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই অনুরূপ কোন সাদৃশ্যের কথাকে অস্বীকার করেছেন। অবশ্য অহিংস পথে গণ-আন্দোলনকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। নাটকে তার স্পষ্ট আভাস দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের সঙ্গে ধনঞ্জয় বৈরাগীর নিম্নোক্ত কথোপকথন অংশে—

" গণেশ। ঠাকুর, একবার হুকুম করো ঐ ষণ্ডামার্কা চন্ডপালের দন্ডটা খসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই।

ধনঞ্জয়। মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস নে ? জোর বেশি লাগে বুঝি ? ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির করে রাখলে ঢেউ জয় করা যায়।

৪। তা হলে কী করতে বল?

ধনঞ্জয়। মার জিনিসটাকেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাও।

৩। সেটা কী করে হবে প্রভু ?

ধনঞ্জয়। মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগছে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।

২। লাগছে না বলা যে শক্ত।

ধনঞ্জয়। আসল মানুষটি যে, তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে। হাঁ করে রইলি যে ? কথাটা বুঝলি নে ?"[৬৬]

কিন্তু কোন একজন ব্যক্তি বা জননেতার উপর নির্ভর করে যে দেশের মুক্তি আসতে পারে না রবীন্দ্রনাথের মত ধনঞ্জয় বৈরাগীরও তাই অভিমত। দেশের সার্বিক মুক্তি বা প্রকৃত উন্নতির চাবিকাঠি হল মানুষকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। ধনঞ্জয় বৈরাগীর সঙ্গে প্রজাদের কথোপকথন অংশে রবীন্দ্রনাথ তা বিস্তৃত করে জানিয়েছেন—

" ২। তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই বা বুঝলুম।

ধনঞ্জয়। তা হলেই সর্বনাশ হয়েছে।

গণেশ। কথা বুঝতে সময় লাগে, সে তর সয় না; তোমাকে বুঝে নিয়েছি, তাতেই সকাল-সকাল তরে যাব।

ধনঞ্জয়। তার পরে বিকেল যখন হবে? তখন দেখবি কূলের কাছে তরী এসে ডুবেছে। যে কথাটা পাকা, সেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে না যদি বুঝিস তো মজবি।"[৬৭]

আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত মানুষদের সমবায়ে গড়ে ওঠা দেশই সমৃদ্ধ দেশ, শক্তিশালী দেশ। সেরকম দেশের গঠনকার্য একবার সমাধা হলে দেশের প্রতিটি মানুষ নিজ অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তাদের সংরক্ষণ ও প্রতিপালনে সদা তৎপর থাকে। তখন রাজায় প্রজায় বিভেদের বাতাবরণটুকু খসে পড়ে। সে রাজত্বে তখন সবাই রাজা। রাজা-প্রজার অনুরূপ সম্পর্কের উপরই একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন নির্ভর

করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর এটিই তো আদর্শ পথ। কিন্তু রাজা বা শাসক যখন সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে কেবল প্রজা শোষণ বা প্রজাপীড়নকেই হাতিয়ার করে বসে তা আর রাজার রাজত্ব থাকে না।

অরাজকতাময় সেই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ এক-পা-খোঁড়া মানুষের পঙ্গুত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কালের নিয়মে প্রজাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যে একদিন রাজাকে তেড়ে এসে তাঁর অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটাবে, সিংহাসনের দখলদারি ছিনিয়ে নেবে তার স্পষ্ট আভাস দিতে দ্বিধা করেননি রবীন্দ্রনাথ। সমকালের ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যেকার শোষক-শোষিতের সম্পর্কের নিরিখে রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে আদর্শ গনতন্ত্র ও রাজদায়িত্বের একটি নির্দেশিকা তুলে ধরতে চেয়েছেন । তাকে অস্বীকার করলে আগামী দিনে শোষক ইংরেজকে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে তার একটি স্পষ্ট ঘোষণা রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যস্থতায়। ধনঞ্জয় বৈরাগীর সঙ্গে প্রজাদের কথোপকথনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরূপ ভাবনাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন—

“ ২। আচ্ছা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

৩। রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়। কী চাইবি রে ?

৩। চাইবার তো আছে ঢের, দেয় তবে তো ?

ধনঞ্জয়। রাজত্ব চাইবি নে ?

৩। ঠাট্টা করছ ঠাকুর ?

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা কেন করব ? এক পায়ে চলার মতো কি দুঃখ আছে ? রাজত্ব একলা যদি রাজারই হয়, প্রজার না হয়, তা হলে সেই খোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চমকে উঠতে পারিস কিন্তু দেবতার চোখে জল আসে। ওরে রাজার খাতিরেই রাজত্ব দাবি করতে হবে।

২। যখন তাড়া লাগাবে ?

ধনঞ্জয়। রাজদরবারের উপরতলার মানুষ যখন নালিশ মঞ্জুর করেন, তখন রাজার তাড়া রাজাকেই তেড়ে আসে।

গান

ভুলে যাই থেকে থেকে

তোমার আসন-’পরে বসাতে চাও

নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।

সত্যি কথা বলব বাবা ? যতক্ষণ তাঁরই আসন বলে না চিনবি ততক্ষণ সিংহাসনে দাবি খাটবে না, রাজারও নয়, প্রজারও না। ও তো বুক-ফুলিয়ে বসবার জায়গা নয়, হাত জোড় করে বসা চাই।.........”[৬৮]

বিশ্বসৃষ্টির সহজ প্রবাহধারাকে রোধ করে, মানবপ্রাণের অসীম মূল্যকে অস্বীকার করে ধনতান্ত্রিক বা যন্ত্রসভ্যতার যে বিকৃত দানবীয় বিকাশ তার প্রতিকূলেই রবীন্দ্রনাথ দাঁড় করিয়েছেন এ নাটকের অভিজিৎকে। তাই অভিজিৎ-এর মধ্যেকার যে যন্ত্রণা সে তো ধনতন্ত্রের নিজের ভিতরকার দ্বন্দ্বেরই এক রূপক মাত্র। এই দ্বন্দ্ব প্রাণের সঙ্গে যন্ত্র বা যন্ত্রসর্বস্ব সভ্যতার দ্বন্দ্ব। কালিদাস নাগকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্টতই জানিয়েছেন— “ তোমার চিঠিতে তুমি machine যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই machine এই নাটকের একটা অংশ । এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেননা যে-মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলছে, “ আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পৌঁছয় না—আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে না-মার দিয়ে ঠেকাব।” যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যে-মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্রাজেডি তারই—মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে।”[৬৯]

একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কীর্তি গড়ার তুলনায় কীর্তি ভাঙার আরো মহত্তর গৌরব লাভ। যন্ত্রসভ্যতার কৃত্রিমতা আর মানবতাবিরোধী শক্তির দম্ভকে অতিক্রম করে যন্ত্রোত্তর এক যুগে পদার্পণের মহত্তর প্রয়াস। এ-ও সমাজ-প্রগতির এক দ্বান্দ্বিক রূপ। এই পথেই মানব সভ্যতা শ্রেষ্ঠতর বিকাশের পথানুসন্ধান করেছে। উগ্রজাতীয়তাবাদকে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতাবাদে পৌঁছানোর এ এক মহত্তর প্রয়াস

বিশেষ। এই পথেই অভিজিৎ সব জাতি, সব রাষ্ট্রকে এক সূত্রে বেঁধে মানবমিলনের পথকে প্রস্তুত করতে চেয়েছে—যা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমৈত্রীভাবনার অনুপূরক। গৌরীশিখরের উপর দিয়ে সেই প্রসারিত পথকেই সে প্রত্যক্ষ করেছে। মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে কীর্তি ভাঙার মহত্তর গৌরব অর্জনের পথ প্রশস্ত করেছে। যন্ত্রের চেয়ে প্রাণের অসীম মহত্তর মূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সে পথে আগুয়ান যুব সম্প্রদায়কে কত ত্যাগ কত তিতিক্ষা মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে, পারিবারিক বন্ধন বা সুখকে অতিক্রম করে 'নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার' উদ্ঘাটনে যাত্রা করতে হবে তার বার্তাকেই রবীন্দ্রনাথ এ নাটকটির মধ্যস্থতায় প্রকাশ করেছেন।

১১. রক্তকরবী :

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকটিও উন্নয়ন ভাবনার এক বিশেষ দিককে ধারণ করে আছে। এ নাটকটির রচনাকাল **১৯২৬।** রবীন্দ্রনাথ সমকালে দেখেছিলেন পাশ্চাত্যের যন্ত্রসভ্যতা বা ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রভূত বিকাশ কীভাবে প্রাণের আনন্দকে, তার সহজ অভিব্যক্তিকে রুদ্ধ করে দাঁড়াচ্ছে। ক্যাপিট্যালিস্ট দুনিয়ার এই বস্তুসম্পদ লাভের দুর্ণিভার লোভরিপুর আড়ালে জীবনের নান্দনিক সৌন্দর্যচেতনা, প্রাণের আনন্দরসের যে অপমৃত্যু ঘটছিল মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ তাকে মেনে নিতে পারেননি। এ কেবল বাঁচার জন্য বাঁচা, বাঁচার মত করে বাঁচা নয়। এ বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ নাটকে এনেছেন রূপকের মধ্যস্থতায়। নাটকে যক্ষপুরীর তাল তাল বস্তুসম্পদ-সঞ্চয়ী রাজা নিজেও প্রাণহীন এইভাবে বাঁচার নির্থকতাকে উপলব্ধি করেছে। নাটকে যে ব্যাঙের প্রসঙ্গটিকে পাই তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এর স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন—

" নন্দিনী। ......মা গো তোমার হাতে ওটা কী ?

নেপথ্যে। একটা মরা ব্যাঙ।

নন্দিনী। কী করবে ওকে নিয়ে?

নেপথ্যে। এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারই আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিকে। এইভাবে কী করে টিকে থাকতে হয় তারই রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম; কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিকে-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ..."[৭০]

বাঁচার জন্য বেঁচে থাকার নিরন্তর বিড়ম্বনা থেকে জীবনকে মুক্তি দানের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে মানববিশ্বের পরিকল্পনা করেছিলেন তাতে বস্তুসম্পদ বা ক্যাপিট্যালিস্ট দুনিয়ার সেই টুকুই সমৃদ্ধিকে সমর্থন জানিয়েছেন যা মানবপ্রাণ বা মানবমূল্যের পরিপন্থী

হয়ে উঠবে না। তাকেই রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার যথার্থ যৌবন বলে স্বীকার করেছেন—যার মধ্যে শ্রী ও সৌন্দর্যের সমৃদ্ধময় প্রকাশ। কিন্তু রাজা বহু মানুষকে শোষণ ও পীড়ন করে এ নাটকে কেবল ব্যক্তিগত সম্পদ বা পুঁজির বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিল। এর ব্যতিক্রমী প্রয়াস আমাদের প্রাণকে খণ্ডিত করে কীভাবে যন্ত্রসর্বস্ব করে তুলছে এবং অপূর্ণতায় ভরে দিচ্ছে তার স্পষ্ট আভাস আছে নন্দিনীর প্রতি রাজার মন্তব্যে—

" আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না—শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই; রঞ্জনের মতো যৌবন থাকলে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধতে পারতুম। এমনি করে বাঁধনের রশিতে গিঁট দিতে দিতেই সময় গেল। হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে। কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।"[৭১]

ঠিক এই জায়গা থেকেই বড় বড় সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি নামে। সে ক্লান্তিকে ঢাকা দেওয়ার সামূহিক প্রয়াস থেকেই জন্ম নেয় জীবনের ক্লিন্ন যান্ত্রিকতা। তার বিষ কীভাবে আমাদের অন্তরকে, আমাদের সভ্যতাকে দগ্ধ করে চলে তার ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে—

" বিশু। এক দিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা জ্বালা ধরিয়েছে, বলছে, কাজ করো। অন্য দিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে, বলছে, ছুটি ছুটি।

চন্দ্রা। এইগুলোকে মদ বলে নাকি।

বিশু। প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিনরাত লেগে আছে। প্রমাণ দেখো। এ রাজ্যে এলুম, পাতালে সিঁধ কাটার কাজে লাগলুম, সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল। অন্তরাত্মা তাই তো হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করছে। সহজ নিশ্বাসে যখন বাধা পড়ে , তখনই মানুষ হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।

গান

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে,

তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে।

সে যে চিতার আগুন গলিয়ে ঢালা,

সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,

সব শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয় যে রঙিন করে।”[৭২]

রবীন্দ্রনাথ যে মরণরসের কথা বলেছেন তা হল 'মদ'—যা আমাদেরকে তীব্র আসক্তির পথে নিয়ে যায়। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বিষয়াসক্তি মানুষের অন্তরাত্মাকে কতটা অসুস্থ ও সঙ্কীর্ণ করে তুলছে তার আভাস দিয়েছেন বিশুর মুখ দিয়ে। চন্দ্রাকে সে বলেছে— " সর্দার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদি-বা দেশে যাও টিকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে।”[৭৩]

এ নাটকের সর্দার আসলে রাজার শোষণ যন্ত্র। সেই যন্ত্রটার উপর রাজার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এ নাটকের সর্দার তাই ' মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড়ো পরিপাটি করে কামড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও আলগা করতে পারে না'[৭৪] । রবীন্দ্রনাথ এই শোষণ যন্ত্রকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে। কোম্পানীর শাসনের উপরে স্বয়ং ইংলন্ডেশ্বরীরও নিয়ন্ত্রণ ছিল না । বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তিগুলি সেদিন পৃথিবীর দিকে দিকে যে শোষণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিল তাদের স্বভাবপ্রকৃতিও ছিল অনুরূপ। এই শোষণ ও শাসনের দ্বারা সেদিনের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতাকে মুছে দিয়ে তাদের একটি শ্রেণী বা ক্লাসে পরিণত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন এ নাটকে।

প্রাণের আনন্দ বর্জিত বস্তুসম্পদের বিকাশ ঘটানো তাই রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি এদেশের মানুষের আত্মিক উন্নয়নের জন্য তিনি যে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তা পূর্বোক্ত অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এ নাটকেও দেখা যায় নন্দিনী যক্ষপুরীর মধ্যেকার মানুষের নিহিত অপূর্ণতার দিকটিকে উদ্ঘাটিত করেছে। সেই অপূর্ণতা তাদের মধ্যেকার আত্মিক অপূর্ণতা মাত্র। আসলে এই রূপক কাহিনীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার নিছক বস্তুতান্ত্রিক বিকাশের ত্রুটিটুকুকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন।

এ নাটকের রাজাও বস্তুসম্পদের আড়ালে নিজ সত্তার তিলে তিলে অপমৃত্যু ঘটাচ্ছিল। নন্দিনী এসে রাজার সেই মানসিক মৃত্যুর ক্লান্তিকে আরো তীব্র করে দেয়। রাজা তাই তার চারদিকে গড়ে তোলা দুর্ভেদ্যতার জালকে ছিঁড়ে ফেলে এক সময় বাইরে বেরিয়ে

আসে। কীর্তি গড়ার গৌরবকে রবীন্দ্রনাথ খাটো করেননি। রাজার অসীম শক্তি ও অধ্যাবসায়ের প্রতি নন্দিনীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণে তার পরিচয় আছে। কিন্তু সেই কীর্তিকে ভাঙার আরো যে মহত্তর গৌরব সে পথকেই সর্বোত্তম পথ বলে মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রাজাকে সে পথেই নিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ যেভাবে 'মুক্তধারা'র অভিজিৎকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু 'মুক্তধারা'য় অভিজিৎ নিজে বাঁধ নির্মাণ করেনি। বিভূতির গড়ে তোলা বাঁধকেই উত্তরকূটের একজন হিসেবে সে ভেঙেছে মাত্র। কিন্তু 'রক্তকরবী' নাটকে রাজার দুঃখ বা যন্ত্রণা আরো গভীর, আরো ব্যাপক। কারণ এতদিন ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা নিজের জগৎটাকেই পুরোপুরি ভাবে ভেঙে ফেলেছিল সে। এ পথেই মহত্তর কীর্তি গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে রাজা। নিছক বস্তুসম্পদের নীরস বিকাশের পরিবর্তে প্রেমে আনন্দে ঐশ্বর্যে জীবনের যে সামঞ্জস্যময় সুষম বিকাশ তাকেই প্রকৃত সমৃদ্ধির মাপকাঠি হিসেবে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক মডেল তাই হয়ে উঠেছে উন্নয়নের মানবিক মুখ।

রাজার গড়ে তোলা ব্যবস্থা এ নাটকে অবশেষে রাজার প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মৌল প্রতিরূপকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে| কেননা ধনতান্ত্রিক সমাজের নিজের ভিতরেই থাকে তার বিনাশের বীজ। কিন্তু সে-ও সমাজ-প্রগতির এক বিশেষ রূপ। সে পথেই রাজা আরো মহত্তর কীর্তি গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনার একটি বিশেষ দিক ছিল ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা কখনো চেতনার স্বাধীনতা কখনো বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পথ ধরে অর্জন করা যেতে পারে। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন ধতান্ত্রিক বা বস্তুসম্পদসঞ্চয়ী সভ্যতা কীভাবে মানুষের সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মুছে দিয়ে তাদের একটি শ্রেণী বা ক্লাস হিসেবে গণ্য করে। মানুষ সেখানে সব স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একটি সংখ্যায় রূপান্তরিত—

"বিশু। ......তাল তাল সোনা তুলে আনছি, এক তালের পর দু তাল, দু তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগুভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা।

ফাগুলাল। পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ফ।

বিশু। আমি ৬৯৬। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক্। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।"[৭৫]

রবীন্দ্রনাথ তার দেশোন্নয়ন ভাবনায় তাই চেতনার স্বাধীনতা, ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এ নাটকের কায়েমী শক্তি এই তিন স্বাধীনতাকে মুছে দিতে চেয়েছে ক্ষমতার প্রয়োগে, মদ আর ধর্মের আফিম খাইয়ে। রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে তারই বিরুদ্ধে শ্রমিক উত্থান ঘটিয়ে তাঁর মানসিকতার অভিমুখটিকে চিনিয়ে দিয়েছেন।

১২. কালের যাত্রা :

'কালের যাত্রা' নাটকেও রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নভাবনার প্রতিভাস রয়েছে। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ জনৈক নাগরিকের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

" সেদিন নেই রে

যেদিন পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ।

ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন।"[৭৬]

সভ্যতা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের দেশে পুরোহিত সম্প্রদায় প্রধান ভূমিকা নিলেও ক্রমে তাদের আচারসর্বস্বতা দেশের প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্ধ কুসংস্কারের জাঁতাকলে মানুষকে বেঁধে ফেলতে চায়। এই সকল ধর্ম- ব্যবসায়ীরাই আমাদের দেশে প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ধর্মধ্বজীর ভূমিকায় সমাজের মাথায় বসে থেকে তারা সমাজের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। সমাজের প্রগতিকে দিয়েছে থামিয়ে নিজেদের স্বার্থেই। এই বিশেষ দিকের প্রতি নির্দেশ দিতে গিয়ে এ নাটকে নাগরিকের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

তৃতীয় নাগরিক

তবু আজ ভোরবেলা দেখি ঠাকুর লেগেছেন টান দিতে—

কিন্তু একেবারেই উলটো দিকে, পিছনের পথে।"

প্রথম নাগরিক

সেটাই তো ঠিক পথ, পবিত্র পথ, আদি পথ।

সেই পথ থেকে দূরে এসেই তো কালের মাথার ঠিক থাকছে না।"[৭৭]

কিন্তু মহাকালের বিশ্ববিধান এই শ্রেণীবৈষম্যকে, এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে, এই অনিয়মকে মেনে নেয় না। তখন সব অনিয়মকেই ভেঙে ফেলার জন্য চলে সামাজিক প্রস্তুতি। পৃথিবীতে ঠিক এভাবেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে একদিন মেহনতি মানুষ শ্রমিকরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। তারই আভাস দিয়ে নাট্যকার এ নাটকে সন্যাসীর মুখ দিয়ে জানিয়েছেন—

" সর্বনাশ এল।

গুরু শব্দ মাটির নীচে।

ভূমিকম্পের জন্ম হচ্ছে।

গুহার মধ্য থেকে আগুন লক্‌লক্ মেলছে রসনা।

পূর্বে পশ্চিমে আকাশ হয়েছে রক্তবর্ণ।

প্রলয়দীপ্তির আংটি পরেছে দিক্‌চক্রবাল।"[৭৮]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী-উন্নয়নের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার সমাজ-পরিকল্পনায় এই বিচ্ছিন্নতাকে দূর করার জন্যই ধনী-নির্ধনের ব্যবধান হ্রাস করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার ভেদাভেদকে দূর করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বা বিভেদ কিংবা সভ্যতার সংকট দূর করার দায়িত্ব মানুষকেই কাঁধে তুলে নিতে হবে, কোন দেবাত্মা বা পুণ্যাত্মা যে আমাদের সেই মুক্তি বয়ে আনবে না সেকথা বার বার বলেছেন। একারণেই রবীন্দ্রনাথ বার বার এদেশের সমাজ বিচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয় আধ্যাত্মিকতার বিরোধিতা করেছিলেন। এ নাটকেও জানিয়েছেন—

প্রথম নাগরিক

দেশে পুণ্যাত্মা কেউ নেউ কি আজ।

ধরুক-না এসে দড়িটা।

দ্বিতীয় নাগরিক

এক-একটি পুণ্যাত্মাকে খুঁজে বের করতেই

এক-এক যুগ যায় বয়ে—

ততক্ষণ পাপাত্মাদের হবে কী দশা।

তৃতীয় নাগরিক

পাপাত্মাদের কী হবে তা নিয়ে ভগবানের মাথাব্যথা নেই।

দ্বিতীয় নাগরিক

সে কী কথা। সংসার তো পাপাত্মাদের নিয়েই।

তারা না থাকলে তো লোকনাথের রাজত্ব উজাড়।

পুণ্যাত্মা কালেভদ্রে দৈবাৎ আসে,

আমাদের ঠেলায় দৌড় মারে বনে জঙ্গলে গুহায়।"[৭৯]

এ নাটকে সভ্যতার সংকট পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে সামাজিক অসাম্য, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান, জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার ব্যবধানের কারণে। এই সংকটকে নিষ্ক্রিয় ধর্মউপাসনা দ্বারা অতিক্রম করা যাবে না। নাটকে মেয়েদের সঙ্গে সন্ন্যাসীর কথোপকথনে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে—

প্রথমা

দড়ি ঠাকুরের পুজো এনেছি ঠাকুর!

কিন্তু পুরুত যে নড়েন না, মন্তর পড়বে কে।

সন্ন্যাসী

কী হবে মন্তরে।

কালের পথ হয়েছে দুর্গম।

কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত।

করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।

তৃতীয়া

বাবা, সাতজন্মে শুনি নি এমন কথা।

চিরদিনই তো উঁচুর মান রেখেছে নিচু মাথা হেঁট ক'রে।

উঁচু-নিচুর সাঁকোর উপর দিয়েই তো রথ চলে।

সন্ন্যাসী

দিনে দিনে গর্তগুলোর হাঁ উঠেছে বেড়ে।

হয়েছে বাড়াবাড়ি, সাঁকো আর টিকছে না।

ভেঙে পড়লো ব'লে।"[২৮০]

এখানে যে সাঁকোর কথা রবীন্দ্রনাথ বলছেন সে আসলে সমাজের উঁচু-নীচু নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের বাঁধন, পারস্পরিক আদান-প্রদান জনিত কারণে সৌহার্দ্যের বন্ধন। সে ব্যবধান আলগা হওয়ার পিছনে রয়েছে একশ্রেণীর মানুষের সামাজিক প্রভুত্বপরায়ণতা, জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার ব্যবধান সৃষ্টির মানসিকতা। রবীন্দ্রনাথ সেই বিশেষ দিকটিকে নাটকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন অত্যন্ত সচেতন ভাবে—

দ্বিতীয় সৈনিক

মাথা দিল হেঁট করে।

স্বয়ং রাজা লাগালেন হাত, আমরাও ছিলুম পিছনে।

একটুও ক্যাঁচ্‌কোঁচও করলে না চাকাটা।

তৃতীয় সৈনিক

ও যে আমাদের কাজ নয়, তাই।

ক্ষত্রিয় আমরা, শূদ্র নই, নই গোরু।

চিরদিন আমরা চড়েই এসেছি রথে।

চিরদিন রথ টানে ঐ ওরা—যাদের নাম করতে নেই।"[৮১]

কিন্তু কালের যাত্রায় যারা ছিল এতদিন অবহেলিত, নির্জিত তারা আজ নিজেদের অধিকার দাবি করছে। নিজেদের ঐকান্তিক প্রয়াসে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মোন্নতি ঘটাচ্ছে তারা। সমাজ-সভ্যতায় তারা এনেছে যুগান্তর। শূদ্ররা আজ তাই শাস্ত্র পড়ছে। হাত থেকে শাস্ত্র কেড়ে নিতে গেলে তারা বলে 'আমরা কি মানুষ নই'। এই চেতনা-জাগরণই চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই চেতনা-জাগরণ ভিন্ন, মনুষ্যত্বের মহনীয় মর্যাদার বোধ ভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাফল্য আসা সম্ভব নয়।

পুঁজিবাদ আজকের সমাজে সর্বৈবভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত বা পুঁজি-শাসিত সেই জীবনের পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে। নাটকে দ্বিতীয় নাগরিক জানিয়েছে, কোন একজন বুদ্ধিমান নাকি রাজাকে বলেছে—'কলিযুগে না চলে শাস্ত্র, না চলে শস্ত্র, / চলে কেবল স্বর্ণচক্র।' সৈনিকদের কথোপকথনেও এর প্রতিধ্বনি স্পষ্ট—

দ্বিতীয় সৈনিক

......সময় হয়েছে বাঁকা।

এ যুগে পুষ্পধনুর ছিলেটাও

বেনের টানেই দেয় মিঠে সুরে টংকার।

তার তোরগুলোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আনলে

ঠিক জায়গায় বাজে না বুকে।

তৃতীয় সৈনিক

তা সত্যি। এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে,

পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।"[৮২]

পুঁজির এই প্রবল প্রতাপে আজকের দিনের রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রেও রাজনৈতিক দলগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে। এই পুঁজিপতিদের সঙ্গে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কোন সংস্রব থাকে না। তারা থকেন স্বরচিত ঘেরাটোপে নিষ্ক্রিয় আলস্যপরতায়। নাগরিক কোলাহলের থেকে দূরে মনোরম সব পরিবেশে গজিয়ে ওঠে তাদের সুরম্য বাংলোবাড়ি, প্রাসাদোপম আবাস। এ নাটকের নর্মদাতীরের বাবাজি তারই রূপক। তার কাছে চর পৌঁছলে তার ধ্যান ভাঙাতে বাজাতে হয় তূরী ভেরী দামামা জগঝম্প । কেননা নিজের উদ্দেশ্যের প্রতি এতটাই নিবিষ্ট যে অন্য কোন সামাজিক সংকট তাকে প্রভাবিত করে না। আর 'তার পা দুখানা আড়ষ্ট। কেননা 'পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে একবারও নাম করে নি চলাফেরার'। তাই দশজনে মিলে তাকে রথতলায় এনে উপস্থিত করাতে হয়। এরা সভ্যতার গতিকে বিপন্ন করে তুলছে বলেই বাবা রথের দড়িতে টান দেওয়ায় রথের চাকা মাটিতে বসে যায়।

সরকার বা প্রশাসন এই পুঁজিপতিদের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হচ্ছে। নাটকে প্রথম নাগরিক তাই প্রথম সৈনিককে বলেছে—

তোমাদের তলোয়ারগুলোর কোনোটা খায় ওদের নিমক,

কোনোটা খেয়ে বসেছে ওদের ঘুষ।[৮৩]

এরই ফলশ্রুতিতে ক্ষতিগ্রস্ত আহত হচ্ছে দেশের বৃহৎ সংখ্যক সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। পুঁজিনিয়ন্ত্রিত সমাজ শ্রমজীবী নিম্নশ্রেণীর মানুষকে অবহেলা করে, তাদের শোষণ করে সভ্যতার গতিকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। তাদের পুঁজির বুনিয়াদও কিন্তু এই শ্রমজীবী তথাকথিত অস্পৃশ্যের দল। সমাজের এক অংশকে পিছনে রেখে বাকি অংশের প্রগতি কখনো আসতে পারে না। সভ্যতার রথের রশি এদের হাতে নেই বলেই শেঠজির টানেও এ নাটকের রথ চলেনি। একদিকে সমাজে এঁদের শোষণ, অন্যদিকে কৌলিন্যের গর্বে অন্ধ ক্ষত্রিয়রা শূদ্রদের দূরে ঠেলে দেওয়ায় সাধারণ মানুষের সাথে প্রশাসনের বিচ্ছিন্নতা, সামজিক বিচ্ছিন্নতা, ধনী-দরিদ্র্যের ব্যবধান সমাজে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। আজকের দিনে গণতন্ত্রে সংকটকে ঘনীভূত করে তুলছে এরাই । সভ্যতার রথের রশি যাদের হাতে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রথ চলে না কেন—প্রথম সৈনিকের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সন্ন্যাসী জানিয়েছে :

"তোমরা দড়িটাকে করেছ জর্জর।

যেখানে যত তীর ছুঁড়েছ, বিঁধেছে ওর গায়ে।

ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলগা হয়েছে বাঁধনের জোর।

তোমরা কেবল ওর ক্ষত বাড়িয়েই চলবে,

বলের মাতলামিতে দুর্বল করবে কালকে।

সরে যাও, সরে যাও ওর পথ থেকে।”[৮৪]

দেশের এই বাস্তব সমস্যার দিকে সরকার বা প্রশাসন নজর দেয় না, সমস্যার ভিতরে গিয়ে তার নিরসনের জন্য কোন উপায় পরিকল্পনা করে না । রাজনৈতিক ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে, নিজেদের প্রভূত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে চলে। ধনপতি সৈনিককে লক্ষ্য করে তাই বলে—

“ঐ সোজা কাজটাই জান তোমরা।

মাথা খাটাতে পার না, কাটতেই পার মাথা।”[৮৫]

শুধু ক্ষমতার অপব্যবহার করে যে ক্ষমতাকে বেশিদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় শূদ্রদের জাগরণ তারই নির্দেশ দেয়। শূদ্র পাড়া থেকে যখন দলে দলে লোক ছুটে আসছে তখন তাদের সম্পর্কে চর বলেছে—‘ঠেকাবে কে তাদের। মারতে মারতে তলোয়ার যাবে ক্ষয়ে’। মন্ত্রীও বলেছেন—‘তলোয়ারের বেড়া তুলে বন্যা ঠেকানো যায় না’। তাই নদী,মাঠ, পাহাড় ডিঙিয়ে শূদ্রদের পাড়ায় পাড়ায় জাগরণের বার্তা পৌঁছে যায়। দলপতির নেতৃত্বে তারা বেরিয়ে আসে পাড়া ছেড়ে। কিন্তু কোন রক্তাত্ব সংগ্রামের ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ দেন না। সামাজিক প্রগতিই তার লক্ষ্য। তাঁর ‘স্বদেশী সমাজে’র লক্ষ্যও ছিল তাই। শূদ্ররা দলে দলে বেরিয়ে এসেছে রক্ত দেবার জন্যে কিনা—এ প্রশ্নের উত্তরে শূদ্র দলপতি জানান—‘না, টান দেবার জন্য’।

এই তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রমজীবী মানুষদের উপর ভর করেই কালের যাত্রা, সভ্যতার ভিত্তি গড়ে উঠেছে। শূদ্র দলপতি তাই স্পষ্টতই মন্ত্রীকে জানিয়েছেন—

আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ—

আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।[৮৬]

কালের নিয়ম মেনে মন্ত্রী শূদ্রদের দাবিকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছেন। সভ্যতার রশি যাদের হাতে এল সেই শূদ্রদের সামাজিক নেতৃত্ব দানে অভিজ্ঞতার অভাব—এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। পথটিও তাদের কাছে অচেনা। এ প্রশ্ন তুলেছেন নাটকে মন্ত্রী স্বয়ং। তিনি যদিও জানিয়েছেন—‘বরাবর যে রাস্তা ধরে রথ চলেছে যেয়ো সেই রাস্তা ধরে’। কিন্তু শূদ্র দলপতি স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন—

"কখনো বড় রাস্তায় চলতে পাই নি, তাই রাস্তা চিনি নে।

রথে আছেন যিনি তিনিই সামলাবেন।

আয় ভাই, দেখছিস রথচূড়ার কেতনটা উঠছে দুলে।

বাবার ইশারা। ভয় নেই আর, ভয় নেই। ঐ চেয়ে দেখ্ রে ভাই,

মরা নদীতে যেমন বান আসে

দড়ির মধ্যে তেমনি প্রাণ এসে পৌঁচেছে।"[৮৭]

শূদ্র সম্প্রদায়ের উত্থানের মধ্য দিয়ে সভ্যতার যে নতুন অগ্রগমন তা ভেঙে দেবে পুঁজিপতিদের গড়ে তোলা ধনী-নির্ধনের ব্যবধানকে, সাম্রাজ্যবাদী শাসকের সাম্রাজ্যবাদকে। সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার শুভ পরিসর গড়ে উঠবে এর মধ্য দিয়ে। তাই শূদ্রদের রথ ধনপতিদের ভাণ্ডারের দিকে, ক্ষত্রিয়দের অস্ত্রাগারের দিকে এগিয়ে গেলে ধনপতিরা আর্তনাদ করে ওঠে। মন্ত্রী সৈনিকদের পরামর্শ দেন—

" ওদের সঙ্গে মিলে ধরো সে রশি।

বাঁচবার দিকে ফিরিয়ে আনো রথটাকে—

দো-মনা করবার সময় নেই।"[৮৮]

পুরোহিত অবশ্য প্রশ্ন তুলেছে 'ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে'। কবি তার প্রত্যুত্তরে জানিয়েছেন—

" পারবে না হয়তো।

একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।

দেখো, কাল থকেই শুরু করবে চেঁচাতে—

জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।

তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—

হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।"[৮৯]

এভাবেই কালের নিয়ম মেনে সামাজিক সাম্য ফিরে আসে, সামাজিক বিভেদের অবসান রচিত হয়। কিন্তু সেই স্থিতাবস্থা যে চিরকালের হবে তাও নয়। সামাজিক বিভেদ বা বৈষম্য বেড়ে গেলে পুনরায় এই দ্বন্দ্বের পটভূমি সমাজে গড়ে উঠতে পারে। তখন আবার শুরু হয় দ্বন্দ্ব-নিরিসনের পালা। তাই নিরাসক্ত নির্মোহ দৃষ্টিতে সমাজের সাম্য বজায় রেখে সম্পর্কের পারস্পরিক বন্ধনকে দৃঢ় করা উচিত। কবি তাই জানিয়েছেন—

" তার পরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন

আসবে উল্টোরথের পালা।

তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপোড়া।

এইবেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—

রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না;

রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।"[৯০]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়ন কর্মযজ্ঞে দেশের নারীশক্তির সম্মিলন চেয়েছিলেন। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি থেকে আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারি নারীদের শক্তিকে গৃহের অন্দরমহলে নিছক আরাধ্য ঠাকুরের মূর্তিকে খাওয়ানো পরানো ঘুম-পাড়ানোর মধ্যে নিঃশেষিত হতে দিতে তিনি নারাজ। কাদম্বিনী দেবীকে লেখা একটি পত্রেও রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

"ঠাকুরের বিবাহ দেওয়া, তাঁকে খাওয়ানো পরানো, ঔষধ খাওয়ানো ইত্যাদি নিরতিশয় খেলা। ঠাকুরকে খাওয়াতে পরাতে হয় বটে কিন্তু সে হচ্ছে যেখানে তিনি খান পরেন—সে কেবল মানুষের মধ্যে, জীবের মধ্যে। তাঁর সেবা তিনি সেইখান থেকেই সত্যভাবে গ্রহণ করেন—অন্য কোনো রকম করে দিতে গেলে তাঁকে ফাঁকি দেওয়া হয়।"[৯১]

এ নাটকে সংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েদের ডাক দিয়ে কবি বলেছে এতদিনের পুজোর পদ্ধতি ভুল। দেশের বৃহত্তর মঙ্গলক্ষেত্রে মানবসেবার মধ্য দিয়ে নারীশক্তির স্বতন্ত্র সার্থকতাকে কামনা করেনি পুরুষ নিজেদের স্বার্থে। এ নাটকে সেই বিশেষ দিকের প্রতি ব্যঙ্গ আছে সংলাপের ভাষায়। নাটকের শুরুতে প্রথম নাগরিকের সংলাপের তীর্যক শ্লেষের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই বিশেষ দিকের প্রতি দিকনির্দেশ করেছেন—

" মেয়েমানুষ, তোমরা এখানে কী করতে।

কালের রথযাত্রায় কোনো হাত নেই তোমাদের।

কুটনো কোটো গে ঘরে।"[৯২]

নারীকে এভাবেই বহুকাল ধরে প্রকাশহীন অন্তরালে রেখে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-প্রতিভূ করিয়েছে ঘরের কাজ। তাদের চিত্তশক্তির বিকাশের কোনো বন্দোবস্ত করেনি তারা। মূঢ় আচারের নিগড়ে তাদেরকে বেঁধে ফেলে শক্তির অপব্যয় করেছে মাত্র। নাটকে তাঁদের দড়ি পুজোর রীতি-আচারেও কেন রথ চললো না তার উত্তরে কবি জানিয়েছেন—

পুজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছে মাটি।

রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।

সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা, দেহে দেহে প্রাণে।

সেখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।"[৯৩]

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনায় আনন্দের পথে সাংস্কৃতিক উজ্জীবন একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ পল্লীর নিছক অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাননি, পল্লীর মানুষের আত্মিক বিকাশও চেয়েছিলেন। জীবনকে যান্ত্রিকতার ঘেরাটোপে বেঁধে ফেলতে চাননি বলেই পল্লীর মানুষের জীবনে আনন্দের আয়োজনের বন্দোবস্ত করে বস্তুগত প্রয়োজন আর নান্দনিক উপকরণের মধ্যে সাম্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। নইলে সভ্যতা তার সৌন্দর্য ও শ্রী হারিয়ে প্রয়োজনের বৃত্তে বাঁধা পড়তো। জীবনের মর্মমূলে সেই রস বা চেতনাকে সঞ্চারিত কাজটি করে থাকেন কবির মত প্রাণবান মানুষেরা। তাই দেশের উন্নয়ন কর্মে তাদেরও আহ্বান আছে। প্রমথনাথ বিশী জানিয়েছেন—

" ছন্দভ্রষ্ট মানব-সমাজের মধ্যে ছন্দের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে কবির ডাক পড়ে। মানুষে মানুষে বিদ্বেষ , সমাজে সমাজে অবহেলা, দেশে দেশে হিংসা—সেই তো ছন্দপতন। সমগ্রকে না হইলে ছন্দরক্ষা হয় না। কিন্তু আজ সমগ্রের যথাযথ সমাবেশ কোথায়? কে কাহার আগে যাইবে, কে কাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহারই তো প্রতিযোগিতা! ইহা আর কিছুই নয়, মানব-সমাজের ছন্দ-ভ্রংশের লক্ষণ। তাই কবির ডাক পড়িয়াছে ছন্দ রক্ষার উদ্দেশ্যে।"[৯৪]

রথ চালানোয় তাদের ভূমিকা কী হবে— পুরোহিতের এই প্রশ্নের উত্তরে কবিসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে কবি পুরোহিত ও সৈনিককে তাই জানিয়েছেন—

" গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।

আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।

মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে

চাল-চলন যার এক পাশে বাঁকা;

কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান,

যার ভোজন কুৎসিত,

যার ওজন অপরিমিত।

আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে—

অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।

বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস্

অন্তরের তালমানের উপর নয়।”[৯৫]

কিন্তু এ জাতীয় দীক্ষায় ‘না আছে অর্থের আশা, / না আছে পরমার্থের’, তাই সর্বনাশ। কিন্তু কবির ভাষায় —‘সর্বনাশ, ঐটের থেকেই সর্বলাভ’। আসলে ত্যাগের পথই প্রকৃত লাভের পথ। ত্যাগ বলতে নিজেরধন সম্পদের বিসর্জন নয়, কবি ত্যাগের মর্ম ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন—

“ ত্যাগের রূপ দেখো ঐ ঝর্ণায়,

নিয়ত গ্রহণ করে তাই নিয়তি করে দান।

নিজেকে যে শুকিয়েছে যদি সেই হল ত্যাগী,

তবে সব-আগে শিব ত্যাগ করুণ অন্নপূর্ণাকে।”[৯৬]

কবির মতে মহাদেব ভিক্ষা নেন পাবেন বলে নয়, তিনি আমাদের দানকে করতে চান সার্থক। মানুষ মানুষ বলেই তার কাছেই লোকনাথের অসীম প্রত্যাশা। মানুষের মধ্যেকার শক্তিকে অসীম সম্ভাবনাকে এভাবেই তিনি বিকশিত করে তুলতে চান। কারণ—

“ কিছু তিনি চান নি কুকুর-বেড়ালের কাছে।

‘অন্ন চাই’ বলে ডাক দিলেন মানুষের দ্বারে।

বেরল মানুষ লাঙল কাঁধে—

যে মাটি ফাঁকা ছিল, প্রকাশ পেল তাতে অন্ন।

বললেন 'চাই কাপড়'।

হাত পেতেই রইলেন—

বেরল ফলের থেকে তুলো,

তুলোর থেকে সুতো,

সুতোর থেকে কাপড়।

ভাগ্যে তার ভিক্ষা ঝুলি অসীম

তাই মানুষ সন্ধান পায় অসীম সম্পদের।

নইলে দিন কাটত কুকুর-বেড়ালের মতো।"[৯৭]

মানুষের কাছে এ পৃথিবীর তাই বহু প্রত্যাশা। সে প্রত্যাশা পূরণের আকাঙ্খা ও দায় মানুষের মধ্যে। তার জন্য যত সে দান করে সংগ্রহের বিপ্রতীপ স্রোত তাকে আরো বেশি ধনী করে তোলে। এর মধ্যেই সভ্যতার ত্যাগের মহিমা নিহিত। এর মধ্যেই নিহিত আত্মশক্তিতে মানুষের উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার মন্ত্র। নিছক দানের দ্বারা তা সম্ভব নয়, তাকে অর্জন করতে হয়। তাই ভিখারী শিব সম্পর্কে কবি বলেন—

তাঁর ভিক্ষের ঝুলির টানে মানুষ হয় ধনী—

যদি দান করতেন ঘটত সর্বনাশ।"[৯৮]

দানের মাধ্যমে দেশের মানুষের বিপুল দারিদ্র্যকে দূর করা সম্ভব নয়, যদি না মানুষ আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হবার মন্ত্রে দীক্ষিত না হয়, ত্যাগের আদর্শকে অনুসরণ করে। শিব-অন্নপূর্ণার কাহিনীর রূপকে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটিকে প্রকাশ করেছেন এ নাটকে। সেদিকের বিচারে ইউরোপ খণ্ডকে 'শিবের চেলা' বলা চলে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে কবি কিন্তু নিঃসঙ্কোচে জানিয়েছেন—

" বলতে হয় বৈকি!

নইলে এত উন্নতি কেন।

মেনেছে ওরা মহাভিক্ষুর দাবি।

তাই বের করে আনছে নব নব সম্পদ—

ধনে প্রাণে জ্ঞানে মানে।"[৯৯]

এত উন্নতি সত্ত্বেও পশ্চিমের দেশগুলিতে অশান্তিও কিন্তু কম নয়। তার জন্য রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের দেশগুলির লোভ ও সঞ্চয় প্রবণতাকে দায়ী করেছেন। আর আমাদের দেশের মানুষের সার্বিক আলস্যপরতা, ত্যাগের আদর্শহীনতাই তাদের দুঃখ ও দারিদ্র্যের কারণ। কবি তাই জানান—

" যখন শিবের ভোগ ভেঙে নিজের দিকে চুরি করে

উৎপাত বাধে তখন অশিবের।

ত্যাগের ধনে মানুষ ধনী, চুরির ধনে নয়।

আমরা কুঁড়ে, ভিক্ষুক দেবতাকে দিই নে কিছু।

তাই মরছি সব দিকেই—

খেতে ফসল যায় মরে,

পুকুরে জল যায় শুকিয়ে,

দেহে ধরে রোগ, মনে ধরে অবসাদ,

বিদেশী রাজা দেয় দুই কান মলে।

শিবের ঝুলি ভরব যেদিন, সেদিন আমাদের সব ভরবে।"[১০০]

তার জন্য ত্যাগের দুঃখের পথকে বেছে নিতে হবে। এই ত্যাগের মধ্য দিয়েই আনন্দের স্রোত উচ্ছ্রিত হয়ে উঠবে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন—

" এই 'ত্যাগবিদ্ধ ভোগ'ই প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রা ও সমাজের আদর্শ ছিল। তাঁহার অনেক গদ্য রচনায় এবং 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় কবি এই তপোবন-আদর্শের মধ্যেই—ভোগ ও ত্যাগের এই সমন্বয়ের মধ্যেই যে ভারতের বৈশিষ্ট্য, একথা ব্যক্ত করেছেন। আধুনিক ভারত ভোগের আদর্শ, ঐশ্বর্য সঞ্চয়ের আদর্শ ত্যাগ করিয়া রিক্ত, নিঃস্ব হইয়াছে এবং বর্তমান ইউরোপে ত্যাগের আদর্শ, দানের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অপরিমিত ঐশ্বর্য সঞ্চয়ের দ্বারা ভোগবিলাসে মগ্ন হইয়াছে। উভয় আদর্শের মিলন প্রয়োজন, তবেই উভয়ে সার্থক হইবে। এই পূর্ব পশ্চিমের মিলনের কথা তিনি অনেক প্রবন্ধে বলিয়াছেন।"[১০১]

লোকনাথ যে শ্মশানে মশানে যে ঘুরে বেড়ান সে তো কেবল মৃত্যুকে জয় করার জন্য। মৃত্যুতে তাঁর কোন বিলাস নেই। গভীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই তিনি মৃত্যু

অতিক্রমী হয়ে ওঠেন। চিত্তের তামসিকতাকে এভাবেই তিনি অতিক্রম করে যান। আমাদেরকেও ত্যাগের পথে, বাধা-প্রতিবন্ধকতার পথে লড়াই করে সক্রিয় লড়াই করে আত্মশক্তি অর্জনের পথে অগ্রসর হতে হবে। সে পথেই আমাদের এবং দেশের যথার্থ কল্যাণ আসবে। নতুবা কবির সাবধানবাণী—

" নির্ঝরিণীর স্রোত যখন হয় অলস

তখন তার দানে পঙ্ক হয় প্রধান।

দুর্বল আত্মার তামসিক দানে

দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন জ্বলে ওঠে।"[১০২]

১৩. **চণ্ডালিকা :**

'চণ্ডালিকা' নাটিকাটির স্বল্প পরিসরেও রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনার ভাব-অভিক্ষেপ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার ভেদাভেদ মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। সেই অস্পৃশ্যতাবিরোধী মানসিকতার প্রকাশ আছে এ নাটকে। নাটকটি রচনার প্রেরণাসূত্র নির্দেশ করে রবীন্দ্রসান্নিধ্য-ধন্য শান্তিদেব ঘোষ জানিয়েছেন—" 'চণ্ডালিকা'র সময় ভারতবর্ষে মহাত্মাজির হরিজন-আন্দোলন খুব জোরে চলেছে—এই আন্দোলনের সমর্থনেই গুরুদেব 'চণ্ডালিকা' নাটক লিখেছিলেন।"[১০৩] কৃষ্ণকৃপালিনীও জানিয়েছেন—" The imminence of the Mahatma's death in the cause of India's despised untouchables and the spectacle of his frail, fasting figure lying on a bed in Yearavda Jail, must have moved the poet deeply. The public tributes he paid in messages and speeches to Gandhi's great humanity and his indomitable spirit did not exhaust the impact made on the poet's mind. The impression must have sunk deeper, for in a few months the subconscious found a creative outlet in a drama which, though short and with two characters only, is one of the most moving he wrote. It was called Chandalika (The Untouchable Girl). The theme was suggested by an old Buddhist legend which in its original version is as follows."[১০৪]

'চণ্ডালিকা' নাটকের কাহিনী অংশ যদিও গড়ে উঠেছে তিনটি চরিত্রকে নিয়ে— প্রকৃতি, মা ও আনন্দ। প্রকৃতি ও তার মা সমাজে অন্ত্যজ চণ্ডাল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সকলের কাছে তারা অস্পৃশ্য। সমাজের নিম্নস্তরে তাদের স্থান। জাতিবিভেদ ও অস্পৃশ্যতার দ্বারা তারা সমাজ বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতাই আমাদের দেশের মুক্তির পক্ষে, আমাদের আত্মিক তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। তাই জাতপাতের ঊর্ধ্বে যে অমলিন মানবধর্ম তাকেই রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ধর্ম বলে জেনেছিলেন। এ নাটকে রাজবাড়ি থেকে দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে ফেরার পথে বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দ চণ্ডাল কন্যা প্রকৃতির কাছে জল প্রার্থনা করেন। প্রকৃতি নিজের চণ্ডাল পরিচয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে নিরস্ত করতে চাইলেও তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। সামাজিক অবরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আনন্দের চিন্তা বা যুক্তি প্রকৃতির অন্তরস্থিত নারীত্বের উদ্বোধন ঘটায় ও আনন্দ- কথিত ধর্মের মর্ম উপলব্ধি করে—

" প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জল দাও'।

মা। পোড়া কপাল! তোকে বলেছে 'জল দাও'! কে শুনি। তোর আপন জাতের কেউ ?

প্রকৃতি। তাই তো বললেন, তিনি আমার আপন জাতেরই।

মা। জাত লুকোস নি ? বলেছিলি যে তুই চণ্ডালিনী ?

প্রকৃতি। বলেছিলাম। তিনি বললেন মিথ্যে কথা। তিনি বললেন, শ্রাবণের কালো মেঘকে চণ্ডাল নাম দিলেই বা কী, তাতে তার জাত বদলায় না, তার জলের ঘোচে না গুণ। তিনি বললেন, নিন্দে কোরো না নিজেকে। আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়ে বেশি।"[১০৫]

বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দ যে ধর্মের কথা বলতে চেয়েছেন সে আসলে মানুষের মনুষ্যত্ব ধর্ম। সে গুণ জাত-পাত-নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই সমান। শুধুমাত্র জাতিগত কারণে সেই গুণের অবনমন ঘটতে পারে না। চণ্ডালের মেয়ে হিসেবে নিজের পরিচয় দেওয়ার পরও আনন্দ তাই প্রকৃতির প্রদত্ত জল গ্রহণের ব্যাপারে জানিয়েছে—" যে-মানুষ আমি তুমিও সেই মানুষ; সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে।"[১০৬] আনন্দের ধর্মবোধই কিন্তু গড়ে তুলতে পারে এক বিশ্বমানবমৈত্রী। মানুষের প্রতি করুণা, ভালোবাসাই তো সব বিভেদের বাঁধ ভেঙে দিয়ে গড়ে তোলে মানববন্ধনের সুদীর্ঘ শৃঙ্খল। জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা আর ভেদাভেদে শতচ্ছিন্ন ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে আনন্দের ধর্মীয় মার্গ তাই সর্বোৎকৃষ্ট। প্রকৃতিও তাই জানায়—" কেবল একটি গণ্ডূষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হল সেই জল। সাত সমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।"[১০৭]

কিন্তু আমাদের দেশের রক্ষণশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ নিজেতের তৈরি অর্থহীন নিয়মের জাঁতাকলে আবদ্ধ করে রাখে—একথা রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনাতেই ঘুরে ফিরে এসেছে। 'অচলায়তন' তার বড় দৃষ্টান্ত। এ নাটকে সেই সামাজিক বিধিনিষেধের ভীষণতার প্রতি ইঙ্গিত নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই। প্রকৃতির মা জানায়—" ওরে অবোধ মেয়ে, হঠাৎ এত বড়ো হল তোর বুকের পাটা! এ পাগলামির প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। জানিস নে কোন কুলে তোর জন্ম?"[১০৮] সমাজের এক বিশেষ সম্প্রদায় অন্ত্যজ এই মানুষগুলির উপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করে, তার কি অসীম মূল্য চোকাতে হয় তা কেবলমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানে। আনন্দের কথা বা মহতাদর্শ সেই প্রবল শক্তিশালী সমাজের কাছে মূল্য পায় না। সেই আদর্শকে কার্যে রূপান্তরিত করা কি কঠিন তা প্রকৃতির মায়ের সংলাপের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন—

" মনে রাখিস, প্রকৃতি, ওদের কথা কানেই শোনবার, কাজে খাটাবার নয়। অদৃষ্টদোষে যে-কুলে জন্মেছিস তার কাদার বেড়া ভাঙতে পারে এমন লোহার খোন্‌তাও নেই কোনোখানে। অশুচি তুই, তোর অশুচি হাওয়া ছড়িয়ে বেড়াস নে বাইরে, যেখানে আছিস সেইখানটুকুতেই থাক্ সাবধানে। এই জায়গাটুকুর বাইরে সর্বত্রই তোর অপরাধ।"[১০৯]

কিন্তু নিজেকে নিন্দে করতে না বলে আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে যে আত্মমর্যাদাবোধকে জাগ্রত করেন তার দ্বারাই তার নারীত্বের জাগরণ ঘটে, অধিকার সচেতনতা গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের নারীদের এই স্বাধিকার বোধ, আত্মমর্যাদাবোধে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মে। কেননা পুরুষের উদ্যমের সঙ্গে নারীশক্তির সমন্বয় ভিন্ন এদেশের প্রগতি যে আসবে না সে কথা তিনি বার বার বলেছেন। কিন্তু শিক্ষা বা প্রগতি চেতনার অভাব এদেশের নারীদের মুক্তির পথে প্রধান অন্তরায়। আর প্রধান অন্তরায় সমাজ। সে সমাজ প্রকৃতির মায়ের মতো সামাজিক বশ্যতা স্বীকারকারিনী নারীদের মতো ভাবতে শেখায়—" তুই মেয়েমানুষ, সেবাতেই তোর পুজো, সেবাতেই তোর রাজত্ব।"[১১০] বোঝা যায় দাসীজন্মের ললাটলিপি অনতিক্রম্য।

কিন্তু প্রকৃতির নবোদ্বুদ্ধ নারীত্ব তাকে কিছুতেই স্বীকার করে না। জন্মগত বা জাতিগত অস্পৃশ্যতার তুলনায় মানুষের গুণগত অস্পৃশ্যতাই তার কাছে প্রকৃত অস্পৃশ্যতার নামান্তর বলে বিবেচিত হয়। এই আধুনিক চেতনা-উদ্গমের জায়গা থেকেই প্রকৃতি তার মাকে জানিয়েছে—" ছি ছি, মা, আবার তোকে বলছি, ভুলিস নে, মিথ্যে নিন্দে রটাস নে নিজের—পাপ সে পাপ! রাজার বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি দাসী নই। ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে দেশে, আমি নই চণ্ডাল।"[১১১] নারীর এই সবলা রূপটিকেই রবীন্দ্রনাথ এদেশের নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। নারী যদি তার

মধ্যেকার সব গুণগত চণ্ডালত্বকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে তবে জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার ঊর্ধ্বে তার মধ্যেই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটতে পারে। নারীত্বের সেই জাগরণই আমাদের দেশকে আত্মশক্তিতে সমুন্নত করে তোলার অন্যতম উপায়। সুতরাং 'চণ্ডালিকা'র কাহিনী নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে নেওয়া হলেও এদেশের সমাজ-প্রেক্ষিতেই তার নবীন নির্মাণ ঘটিয়েছেন। সমালোচক সাধনকুমার ভট্টাচার্য তাঁর 'রবীন্দ্র-নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থে জানিয়েছেন—

" 'চণ্ডালিকা' নাটিকার কাহিনী রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্গত শার্দূলকর্ণাবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। শুধু যে গল্পটি বলার জন্যেই কবি গল্পটিকে নিয়েছেন বা যে উদ্দেশ্যে সেখানে বলা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই বলেছেন, তা নয়, গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক সমাজ জীবনের সমালোচনায় পরিণত করেছেন অর্থাৎ নতুন আদর্শে আদর্শায়িত করেছেন। হিন্দু সমাজের জাতি-ভেদ বা বর্ণভেদ, বিশেষ করে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভেদজ্ঞানকে চিরদিনই রবীন্দ্রনাথ নিন্দা করেছেন। এই কারণেই অস্পৃশ্যতা বর্জনের আন্দোলনকে তিনি সর্বান্তঃকরণ দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। 'চণ্ডালিকা'ইয় রবীন্দ্রনাথেই ভাবসত্যই প্রচার করতে চেয়েছেন: —'যে ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যে' ......আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়ে বেশী, ... যে মনে ভাবে সে দাসী সেই দাসী, যে মনে ভাবে সে চণ্ডাল সেই চণ্ডাল। বিধাতার সংসারে সকলেরই সেবার অধিকার আছে, নিজের অধিকার জানাতেই মুক্তি—অধিকার চেতনাকে সর্বক্ষণ জাগিয়ে রাখতে হবে— 'তাঁকেই মানি যিনি আমাকে মানেন।' মুক্তি সর্বাত্মক ব্যাপার। একটি আত্মা বদ্ধ থাকা পর্যন্ত কোনো আত্মার পক্ষেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। (চণ্ডালিকার ঘোষণা—আমি যদি মুক্তি না পাই তিনি মুক্তি পাবেন কী করে?)"[১১২] এই ভাবনাগুলিই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেশোন্নয়ন ও সমাজ পরিকল্পনায়, নয়া ধর্ম-পরিকল্পনায় বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল।

<u>উৎস নির্দেশ:</u>

১. সূচনা। প্রকৃতির প্রতিশোধ। রবীন্দ্ররচনাবলী ১ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২০। পৃ: ৩৫৯।

২. প্রকৃতির প্রতিশোধ। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬৩।

৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬৪।

৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬৭।

৫. তদেব।

৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬৮।

৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬৯।

৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৫।

৯. রাজা ও রানী। রবীন্দ্ররচনাবলী ১ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৪৭।

১০. তদেব।

১১. রাজা ও রানী। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৪৮।

১২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৪৩।

১৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৫৫-৪৫৬।

১৪. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিরশ্মি, ১ম খণ্ড। দে বুক স্টোর। ১৪১০। পৃ: ২২৭।

১৫. রাজা ও রানী। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৫০।

১৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৫৮।

১৭. কুমার রায়। রবীন্দ্রনাটকে ইতিহাস চেতনার প্রতিফলন। রবীন্দ্রনাটক-আলোকিত উদ্ভাবন। মিত্র ও ঘোষ। ২০০০। পৃ: ৭০।

১৮. রাজা ও রানী। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫০১।

১৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫০৩।

২০. কুমার রায়। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৪।

২১. বিসর্জন। রবীন্দ্ররচনাবলী ১ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৩৯।

২২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৬০-৫৬১।

২৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৫১।

২৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৫৪।

২৫. মালিনী। রবীন্দ্ররচনাবলী ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২০। পৃ: ৩২৫।

২৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী। ১৪০৬। পৃ: ২৩৬।

২৭. শারদোৎসব। রবীন্দ্ররচনাবলী ৪র্থ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১ । পৃ: ৩৮১-৩৮২।

২৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮২।

২৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৪।

৩০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৫।

৩১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৯৫।

৩২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৫-৩৮৬।

৩৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৮৭।

৩৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৭৩।

৩৫. প্রায়শ্চিত্ত। রবীন্দ্ররচনাবলী ৫ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১ । পৃ: ২২৪।

৩৬. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্ররচনাভিধান, ১০ম খণ্ড। দীপ প্রকাশন। ২০১০। পৃ: ৪৬।

৩৭. প্রায়শ্চিত্ত। পূর্বোক্ত। পৃ: ২২৫।

৩৮. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮-২৯।

৩৯. প্রায়শ্চিত্ত। পূর্বোক্ত। পৃ: ২২৭।

৪০. পূর্বোক্ত। পৃ: ২২৮।

৪১. পূর্বোক্ত। পৃ: ২২১।

৪২. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৬-৪৭।

৪৩. প্রায়শ্চিত্ত। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৫৪।

৪৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৫৫।

৪৫. কুমার রায়। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৭।

৪৬. ৮৬ সংখ্যক কবিতা। গীতিমাল্য। রবীন্দ্ররচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭ । পৃ: ১৫৫।

৪৭. রাজা। রবীন্দ্ররচনাবলী ৫ম খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৭৮।

৪৮. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। রাজার রাজা। সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে। আনন্দ। ১৪০০। পৃ: ৬৯-৭০।

৪৯. রাজা। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮৮।

৫০. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮৩।

৫১. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮২।

৫২. কুমার রায়। রবীন্দ্রনাটকে ইতিহাস চেতনার প্রতিফলন। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৮।

৫৩. রাজা। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩১৪।

৫৪. কুমার রায়। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭৮-৭৯।

৫৫. অচলায়তন। রবীন্দ্ররচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩০৬।

৫৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩১৪।

৫৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩১০।

৫৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩১৯-৩২০।

৫৯. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৮৯-১৯০।

৬০. মুক্তধারা। রবীন্দ্ররচনাবলী ৭ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১ । পৃ: ৩৩৫-৩৩৬।

৬১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৩৮।

৬২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৩৯।

৬৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৩৭।

৬৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪৫।

৬৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪৬।

৬৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৪৯।

৬৭. তদেব।

৬৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৫০-৩৫১।

৬৯. কালিদাস নাগকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। গ্রন্থপরিচয়। মুক্তধারা। রবীন্দ্ররচনাবলী ৭ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১ । পৃ: ৭৪৩।

৭০. রক্তকরবী। রবীন্দ্ররচনাবলী ৮ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭ । পৃ: ৩৭৩।

৭১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬২।

৭২. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬৫।

৭৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬৬।

৭৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬৭।

৭৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬৬।

৭৬. কালের যাত্রা। রবীন্দ্ররচনাবলী ১১শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭ । পৃ: ২৫৭।

৭৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৫৭-২৫৮।

৭৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৫৮।

৭৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৫৮-২৫৯।

৮০. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৬০-২৬১।

৮১. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৬১।

৮২. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৬২।

৮৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৬৪।

৮৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৬৩।

৮৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৬৬।

৮৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৭১।

৮৭. তদেব।

৮৮. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৭৪।

৮৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৭৫।

৯০. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৭৬।

৯১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিঠিপত্র, ৭ম খণ্ড, ২৬ সংখ্যক চিঠি। ১৩৯৯। পৃ: ৫১।

৯২. কালের যাত্রা। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৫৯।

৯৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৭৭।

৯৪. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্ররচনাভিধান, ১১ খণ্ড। দীপ প্রকাশন। ২০১০। পৃ: ৩৬০-৩৬১।

৯৫. কালের যাত্রা। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৭৬।

৯৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮২-২৮৩।

৯৭. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮৩।

৯৮. তদেব।

৯৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮৪।

১০০. তদেব।

১০১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র-নাট্য পরিক্রমা। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ১৪১৯। পৃ: ৩৪৪।

১০২. কালের যাত্রা। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮৫।

১০৩. শান্তিদেব ঘোষ। শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা। রবীন্দ্রসংগীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ১৪১৫। পৃ: ১৬১।

১০৪. Krishna Kripalani, Rabindranath Tagore—A Biography, UBS Publishers' Distributors Pvt. Ltd., 2012, p: 364.

১০৫. চণ্ডালিকা। রবীন্দ্ররচনাবলী ১২শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭ । পৃ: ২১৫।

১০৬. পূর্বোক্ত। পৃ: ২১৬।

১০৭. তদেব।

১০৮. তদেব।

১০৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ২১৭।

১১০. তদেব।

১১১. পূর্বোক্ত। পৃ: ২১৮।

১১২. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্ররচনাভিধান, ১১ খণ্ড। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৬০-৩৬১।

সপ্তম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক ভাবনা : সাফল্য-ব্যর্থতা-প্রাসঙ্গিকতা

বিশ্বের অপরাপর অর্থনীতিবিদগণ যেমন অর্থনীতি সম্পর্কিত স্বকীয় ভাবনাকে একটি তাত্ত্বিক রূপ প্রদান করেছেন রবীন্দ্রনাথ সেভাবে তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনাকে কোন তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেননি। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচীর রূপরেখা থেকে উন্নয়ন সম্পর্কিত ভাবনার সামগ্রিক যে প্রতিকৃতিটুকু ফুটে ওঠে তার সঙ্গে বিশ্বের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের চিন্তাভাবনার অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এ-ও ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত উন্নয়নের মডেল তাঁর স্বকীয় চিন্তাভাবনার ফসল। বিশ্বের বিশিষ্ট কয়েকজন অর্থনীতিবিদের উন্নয়ন সম্পর্কিত ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক মডেলটির মিল-অমিলের নিরিখে তাঁর মৌলিকতা ও বিশিষ্টতার দিকটিকে উদ্ঘাটন করা অত্যন্ত জরুরী। কেননা যে পরিকল্পনাকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় কাজ শুরু করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর সেই উদ্যোগ স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই ব্যর্থতার নিহিত কারণ রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা বা ভাবনার অপূর্ণতা নাকি অন্যকিছু তারও বিচার প্রয়োজন। এর নিরিখেই রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনার বর্তমান কালোপযোগী প্রাসঙ্গিকতার দিকটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ :

দেশের উন্নয়ন ও প্রগতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী দুজনেই অনেক ভেবেছেন। ভারতবর্ষের এই দুই মহান ব্যক্তিত্ব পরস্পরের প্রতি আজীবন শ্রদ্ধাশীল থেকেছেন, দুজনের চিন্তাধারার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। আবার অমিলের দিকটিও কম নয়। এই মিল অমিলের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের দেশোন্নয়ন ভাবনার মৌলিকতার দিকটিকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

সাদৃশ্য:

ক. গান্ধীর মতো রবীন্দ্রনাথও অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন—অহিংস নীতির প্রয়োগ নিয়ে যাই মতবিরোধ থাকুক না কেন। দেশের রাজনৈতিক সহিংস কার্যকলাপকে গান্ধীর

মতো রবীন্দ্রনাথও সমর্থন করেননি। একাধিক প্রবন্ধে, নাটকে, গল্পে, গানে, কবিতায়, চিঠিপত্রে তার স্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছেন তিনি।

খ. রবীন্দ্রনাথের মতো গান্ধীও মনে করেছেন আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নয়ন করতে হলে বৃহত্তর পল্লীবাংলার উন্নয়ন ছাড়া গতি নেই। শিক্ষা স্বাস্থ্য অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সংগঠনের ব্যাপারে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সক্রিয় হয়েছিলেন এবং স্বকীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। উভয়েই সমবায় প্রণালীতে গ্রামসংগঠনের ব্যাপারে অধিক জোর দিয়েছেন।

গ. রবীন্দ্রনাথের মতো গান্ধীও একটা সময় বুঝেছেন যে দেশের মানুষকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা ভিন্ন দেশের প্রকৃত উন্নতি আসবে না। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন—

" গান্ধী বিশ্বাস করতেন, দেশের-দশের মুক্তি বা মঙ্গল কখনোই ঘটতে পারে না, যদি-না ব্যক্তি নিজের চিত্তকে আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান করে। ১৯১০ সালে মগনলালকে তিনি লিখেছিলেন 'অনুগ্রহ করে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার বোঝা অনাবশ্যকভাবে নিজের মাথায় বহন কোরো না। নিজেকেই মুক্ত করা সেটাই কিন্তু একটা মস্ত বোঝা। সবকিছু নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর। তুমি নিজেই যে ভারতবর্ষ সেটা উপলব্ধি করার মধ্যেই নিহিত থাকে চিত্তের মহত্ত্ব। তোমার নিজের মুক্তির মধ্যেই রয়েছে ভারতবর্ষের মুক্তি।'"[১]

গান্ধী প্রাথমিক ভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপারে তৎপর ছিলেন ঠিকই। কিন্তু ক্রমে বুঝেছেন স্বনির্ভরতা বা আত্মসচেতনতার মতো বিষয়গুলি মানুষের ভিতরের সামগ্রী হয়ে না উঠলে নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতা কখনো দেশের প্রকৃত কল্যাণ আনবে না। তাই মানুষকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবশেষে রবীন্দ্রনাথের পথেই প্রত্যাবর্তন করেন। দুই ব্যক্তিত্ব ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেছেন।

ঘ. রবীন্দ্রনাথের মতো গান্ধীও আমাদের দেশের নারীশক্তির জাগরণ চেয়েছেন। কুইট ইন্ডিয়ায় এ বিষয়ে গান্ধীর লেখা একাধিক প্রবন্ধে নারীর স্বাধিকার ও নারীশক্তির সামাজিক উপযোগিতা বিশ্লেষণের বহু দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

ঙ. রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শুরু হতেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ঊর্ধ্বে মানবধর্মকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন এবং তার জন্য সওয়াল করেছেন। জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে হরিজনদের হয়ে লড়াই করেছেন। এদেশীয় সমাজ থেকে এই বিষবৃক্ষের মূলটুকুকে উৎপাটিত করার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন আজীবন। গান্ধী রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা হিসেবে কখনো ধর্ম ও বর্ণকে প্রাধান্য দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু একটা সময়ের পরে জাত-

পাত-অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। গুজরাটে হরিজন সম্প্রদায়ের হয়ে নিজেই লড়াইয়ের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন।

বৈসাদৃশ্য :

ক. ১৯০১ থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে গান্ধীর যোগাযোগ রচিত হলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেননি গান্ধী। ১৯১৫ তে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফেরার পর শান্তিনিকেতনে অবস্থানরত ফিনিক্স স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করার জন্য শান্তিনিকেতন আসেন গান্ধী। সেইসময় পিয়ার্সন ও অন্যান্য কয়েকজন গান্ধীকে আশ্রমের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখাবেন বলে এগিয়ে আসেন। কিন্তু গান্ধী গোড়াতেই দেখতে চাইলেন স্নানাগার, শৌচালয়, আহার-বিহারের ব্যবস্থাপত্র। সব জায়গা দেখার পরে যখন রান্নাশালায় এলেন তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। পাচকেরা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখে রবীন্দ্রনাথের কোন অনুমতি না নিয়েই তাদেরকে বরখাস্ত করেন। গান্ধীর পরামর্শ অনুসারে ছাত্ররা নিজেদের কাজ নিজেরা করতে শুরু করে। ল্যাট্রিন পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে রানাবান্নার সব কাজের দায়িত্ব এসে পড়ে নিজের উপর। এইসব পরীক্ষায় ও কাজের চাপে ছাত্রদের অবস্থা সঙিন হয়ে ওঠে। ছাত্রদের অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে উদ্যোগী হন। শান্তিনিকেতনের তৎকালীন ছাত্র ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবশর্মা লিখেছেন—

“কোনো ছাত্র বোধ হয় তার মাকে লিখেছিল—আজকাল আমরা শান্তিনিকেতনে রান্না শিক্ষা করছি। উত্তরে মা নাকি লিখেছিলেন পড়া ছেড়ে যদি রান্নাই শিখতে হয়, বাড়িতে চলে এসো, আমার কাছে আরো ভালো রান্না শিখতে পারবে।”[২]

শিক্ষা নিয়ে নিয়মের এইসব বাড়াবাড়ি রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। আনন্দের সঙ্গে শিক্ষাকে গ্রহণ ক্রতে না পারলে তা যে শিক্ষার্থীদের কাছে বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠবে এ কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মূল কথা এটাই। নৈতিকতা নিয়ে গান্ধীর এই অতিরিক্ত বাড়াবাড়িও রবীন্দ্রনাথ মেনে নেননি। এ বিষয়ে গান্ধীর মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি দেখে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে ‘নৈতিক অত্যাচারী’ (Moral Tyrant) আখ্যা দিয়েছিলেন।

খ. রবীন্দ্রনাথ দেশোন্নয়নের অন্যতম শর্ত হিসেবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপক্ষে সওয়াল করেছেন। তার জন্য গান্ধীজীর মতো অহিংস পথে আন্দোলন পরিচালনার কথা বলেছেন। কিন্তু আচরণীয় এই অহিংসার স্বরূপ দুজনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। কেউ কেউ অবশ্য

রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে মহাত্মা গান্ধীর ছায়াকে অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে গেছেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯০৯-তে। তখনো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীর যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। তারও বহু পূর্বে ১৮৮৩-তে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। সেখানে বসন্ত রায়ের চরিত্রটি অনুরূপ আদর্শে রচিত। তখন গান্ধীর বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। পরবর্তী 'রাজর্ষি' উপন্যাসেও গোবিন্দমাণিক্য চরিত্রে অনুরূপ আদর্শ অনুসৃত—যখন গান্ধী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন মাত্র। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে সামনে রেখে অনুরূপ চরিত্র পরিকল্পনা করেছেন এমনটা মানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই মিলের বিষয়ে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আসলে যে পথকে গান্ধী অহিংসার পথ বলে মনে করেছেন তাকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। অশিক্ষিত অসচেতন আত্মমর্যাদাহীন জনতাকে আন্দোলনে সামিল করবো অথচ ভরসা রাখবো সত্যের নৈতিকতায়—এ কখনো বাস্তব বোধের পরিচায়ক হতে পারে না। সেক্ষেত্রে আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদার অভাবে অশিক্ষিত জনতা এতদিনের শোষক ও অত্যাচারী শাসকের প্রতি প্রতশোধপরায়ণতায় সহিংস হয়ে উঠতে পারে। দিশাহীন লক্ষ্যহীন উত্তেজনা-নির্ভর এ জাতীয় রাজনীতি ধনঞ্জয় বৈরাগী বা রবীন্দ্রনাথ কেউই সমর্থন করেননি। মহাত্মার অবলম্বিত অহিংসার আদর্শ তাই নামান্তরে হিংসারই রকমফের বলে অনেকে অভিমত জানিয়েছেন। রোম্যাঁ রোলাঁর সঙ্গে ১৯৩৫-এর ২২শে অক্টোবর কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে জওহরলাল দেখা করতে যান। এই সময় জওহরলালও গান্ধী সম্পর্কে অনুরূপ মত প্রকাশ করেন বলে রোলাঁর ডায়েরী থেকেই জানা যায়—

" তিনি বলেন গভীর চিন্তার পর তিনি বুঝেছেন যে গান্ধী পরিকল্পিত অহিংসার মূল উপাদানগুলি হিংসারই একধরণের রকমফের.........।"[৩]

গ. দেশের মানুষকে ধর্মের আফিম খাইয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করা বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থতার ব্যাপারটিকে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর মতো উপজীব্য বলে মনে করেননি। খিলাফৎ আন্দোলনকে এদেশের অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে গান্ধী যেভাবে জুড়ে দেন তাতে দেশের মধ্যে যে বিষবৃক্ষের বীজকে বপন করা হয় তা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতি ছিল দেশবিভাগ ও অলঙ্ঘ্য হিন্দু-মুসলিম সঙ্কট। রোম্যাঁ রোলাঁকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

" খিলাফতের ব্যাপারে ভারতবর্ষের মুসলমানদের সমর্থন করতে গিয়ে গান্ধী যা করেছেন, তাতে যা তিনি চেয়েছিলেন—সেই ভারতবর্ষের ঐক্যের পক্ষে কাজ করেননি, কাজ করেছেন ইসলামের ঔদ্ধত্য এবং শক্তির পক্ষে, এবং সেটাই হিন্দু-মুসলমানের প্রচণ্ড অশান্তির মধ্য দিয়ে নিজে নিজে স্পষ্ট হয়েছে; এ ব্যাপারে শেষোক্তরা ইংরেজ সরকারের গোপন সমর্থনপুষ্ট প্ররোচক।"[৪]

ঘ. রবীন্দ্রনাথ একটা সময়ের পরে অসহযোগের নামে বয়কট বা ইংরেজ বর্জনের বাড়াবাড়িকে মেনে নিতে পারেননি। স্বনির্ভরশীল না হয়ে ইংরেজ বর্জনের নীতি রবীন্দ্রনাথের কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়েছে। এই জাতীয় সঙ্কীর্ণ জাতিবিদ্বেষই একদা বিশ্বে নাৎসীবাদের ভয়াবহতাকে জন্ম দিয়েছিল। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর রোম্যাঁ রোলাঁকে লেখা একটি চিঠিতে স্পষ্ট করে লিখেছেন—

" অতি অদ্ভুত মনে হলেও, আমার চোখে গান্ধীবাদের সঙ্গে হিটলার-এর নাৎসীবাদের তফাৎ খুবই কম, সৌসাদৃশ্য প্রকট। ....হিটলার বই পুড়িয়েছেন, গান্ধী পুড়িয়েছেন বিদেশী বস্ত্র। ......বাইরে অহিংসা নিয়ে যতই আতিশয্য দেখানো হোক্ না কেন, ভিতরে ভিতরে গান্ধীবাদ বিশুদ্ধ হিংসা ছাড়া আর কিছু নয়। গান্ধীর মতো হিটলারও জাতি ও বর্ণে বিশ্বাসী।"[৫]

ঙ. রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেশীয় নেতাদের বার বার সঙ্কীর্ণতা বা পক্ষপাত শূন্য হয়ে কাজ করার কথা বলেছেন। নতুবা বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা যে সম্ভব নয় তা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন। গান্ধী কিন্তু কংগ্রেসের প্রাত্যহিক কোলাহল সম্পর্কে প্রায় নিস্পৃহ থেকেছেন। তিনি নিজেই পক্ষপাতমূলক আচরণকে প্রশ্রয় দিয়ে জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী হয়ে উঠেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে গান্ধীর মনোনীত পট্টভি সীতারামাইয়ার পরাজয়কে নিজের পরাজয় বলে মন্তব্য করে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছেন। নির্বাচিত সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসুর ক্ষমতাকে সীমায়িত করে তাকে নিষ্ক্রিয় করার উদ্যোগে তিনি উঠে পড়ে লাগেন। রবীন্দ্রনাথ এতে বেদনাবিদ্ধ হন। তিনি বার বার আবেদন জানান সুভাষচন্দ্রের মতো নবীনদের কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু গান্ধী রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় অনুরোধকে এড়িয়ে যান। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের মাধ্যমে গান্ধীর এই পর্বের উদ্যোগ সম্পূর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথ তাই ব্যথিত চিত্তে লিখেছেন—

" আজকের দিনে কোন জননায়ক পলিটিক্স্‌কে কোন্ পথে নিয়ে যাবেন তা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। ......এ কথা জানি, যাঁরা শক্তিশালী তাঁরা নতুন পথে অসাধ্য সাধন করে থাকেন। মহাত্মাজী তারই প্রমাণ। তবু তাঁর স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়। অন্য কোনো কর্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রেরণা যদি জাগে তাহলে দোহাই পাড়লেও সে বীর হাত গুটিয়ে ব'সে থাকবেন না। সেজন্য হয়তো অভ্যস্ত পথে যূথভ্রষ্ট হয়ে অনভ্যস্ত পথে তাঁকে দল বাঁধতে হবে, সে দলের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতেও তাকে আয়ত্ত করতে সময় লাগবে। কংগ্রেসের অভিমুখে যদি কোনো কৃতী নূতন পথ খুলতে বেরোন, আমি অনভিজ্ঞ, তাঁর সিদ্ধি কামনা করব, দেখব তাঁর কামনার অভিব্যক্তি— কিন্তু দূরের থেকে।"[৬]

চ. গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মতপার্থক্যের বড় জায়গা হল চরকার ব্যবহার। পল্লীর মানুষের স্বনির্ভর ও বিকল্প কর্মসংস্থান গড়ে তোলার জন্য গান্ধী যে চরকা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রনাথ তাকে মেনে নেননি। রবীন্দ্রনাথও পল্লীর বিকল্প কর্মসংস্থান বা স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে গান্ধীর বহু পূর্ব থেকেই কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন। স্বরাজ লাভকে রবীন্দ্রনাথ এরকম কোন 'বাহ্য ফললাভ' বলে মানতে চাননি। আধুনিক প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে দেশ মান্ধাতার আমলের চরকা আন্দোলনে মাতবে—যতই তা প্রতীকী আন্দোলন হোক না কেন—রবীন্দ্রনাথ তাকে মেনে নিতে পারেননি। বিশ্বের চলমানতাকে পাশ কাটিয়ে, আধুনিক প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে পল্লীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার যে প্রয়াস মহাত্মা নিয়েছিলেন তাকে রবীন্দ্রনাথ পল্লীর আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে মনে করেছেন। পল্লীর সর্বাঙ্গীণ গঠন পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ কিন্তু চরকার যথাযোগ্য ব্যবহারকে স্বাগত জানান। কিন্তু চরকাকে স্বরাজ সাধনার যথাসর্বস্ব ভাবতেই তাঁর আপত্তি। এ জাতীয় পশ্চাদপদতাকে স্বরাজ লাভের নামান্তর বলে তিনি মানতে চাননি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন—

" এই রকম অন্ধ সাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছুদিনের মতো আমাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্য তাঁর আদর্শ পালন করাকেই অনেকে ফললাভ বলে গণ্য করে। আমি মনে করি, এ রকম মতি স্বরাজ লাভের অনুকূল নয়।"[৭]

ছ. দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের একটি প্রধান অন্তরায় ছিল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। এ বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহুদিন ধরে ভেবেছেন। আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। নিজের জমিদারিতে তার প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি সর্বাধিক সক্রিয় থেকেছেন। বিশ্ব জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের নেত্রী ম্যাডাম স্যাঙ্গারকে তিনি নিজের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এর প্রায় দশ বছর পরে ১৯৩৬-এ স্যাঙ্গার ওয়ার্ধায় গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এদেশে আধুনিক পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি কার্যকরী করে তোলার জন্য তাঁর সমর্থন চান। কিন্তু গান্ধী নারী-পুরুষের সন্তানকামনাহীন যৌন সংসর্গকে অনৈতিক বলে মনে করেছেন। স্বাভাবিক মানবিক প্রবৃত্তি হিসেবে প্রজনন ক্রিয়া রোধের জন্য তিনি আস্থা রাখতে চেয়েছেন ব্রহ্মচর্য পালনের উপর। কিন্তু স্বাভাবিক মানবিক প্রবৃত্তিকে যে ঐ উপায়ে সাধারণের পক্ষে ঘুম পাড়িয়ে রাখা অসম্ভব—এই সাধারণ বাস্তব সত্যটি গান্ধী স্বীকার করেননি।

জ. গান্ধীজীর মতো রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিজ্ঞান বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না। গান্ধীজী যে 'হিন্দ স্বরাজ'-এর কথা বলেন সে আসলে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকল্প ব্যবস্থা মাত্র। তাতে আধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে যন্ত্র, ইঞ্জিন, কলকারখানা, স্কুলের কোন স্থান ছিল না। গান্ধীজীর আদর্শভাবনা তাই 'মডার্ণ'কে বর্জন করে চলতে চেয়েছে। সেক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও

বিজ্ঞান কিংবা যন্ত্র—যা মানবকল্যাণের অনুকূলে ব্যবহৃত হয়—তাকে মানবকল্যাণের অনুকূলে ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যে চেতনার স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন, ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে বিশ্বচেতনার যে সমন্বয় চেয়েছিলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাকে গুরুত্ব দেননি মহাত্মা গান্ধী।

ঝ. স্বদেশী যুগে গান্ধী যেমন চেয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা স্কুল কলেজ ত্যাগ করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিক। তিনি ভেবেছেন, 'শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু স্বরাজ নয়।' রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই রাজনৈতিক দর্শনকে মেনে নেননি। রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপেক্ষা দেশের মানুষের চিত্তশুদ্ধি তথা আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন বরাবরের জন্য। সে কারণে শিক্ষার মর্যাদাকে অনেক উপরে স্থান দিয়েছেন।

ঞ. রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনায় ধনী-নির্ধনের ব্যবধান যথাসম্ভব কমিয়ে এনে ধনবৈষম্য দূর করার পক্ষপাতী। কেননা ধনবৈষম্য গণতন্ত্রের প্রধান অন্তরায়। কিন্তু গান্ধী ধনকে অছি (trust) হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। জমিদার বা পুঁজিপতিদের সাধারণ মানুষের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দেখতে চেয়েছেন।

মার্কস্ ও রবীন্দ্রনাথ :

কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বাইশ-তেইশ বছর। এই সময় রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসংগীত' 'প্রভাতসংগীত'-এর মতো উন্মেষ পর্বের কাব্যগুলি রচিত হচ্ছে। 'বউঠাকুরানীর হাট' 'রাজর্ষি'র মতো উপন্যাস, বেশ কিছু প্রবন্ধ ও গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করছেন। মার্কস্-এর সাথে রবীন্দ্রনাথের তখন পরিচয় ঘটার সম্ভাবনা কম। এই সময়ের কোন রচনায় মার্কসীয় প্রভাবের তেমন কোন ছাপকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মার্কস্-এর 'Communist Manifesto' (১৮৪৮) যখন প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের জন্মের তেরো বছর পূর্বে। মার্কস্ ১৮৫২ তে লেখেন 'The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparto'। এর পর প্রকাশিত হয় 'ডাস্ ক্যাপিট্যাল্', প্রকাশিত হয় তিনখণ্ডে—১৮৬৭, ১৮৮৫, এবং ১৮৯৪-এ। রবীন্দ্রনাথের বাইশ-তেইশ বছর বয়সে মার্কস্ পড়ার কোন তথ্যগত প্রমাণও আমাদের কাছে নেই। পরবর্তী সময়ে মার্কসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। দুই স্বতন্ত্র কালপর্বে আবির্ভূত হলেও এই দুই চিন্তানায়কের অর্থনৈতিক ভাবনার অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই মিলের দিকগুলিকে নিম্নোক্ত সূত্রাকার বিন্যাস দেওয়া যেতে পারে—

ক. মার্কস্ অর্থনীতিকে বুনিয়াদ হিসেবে ধরে তারই নিরিখে গড়ে ওঠা সুপার-স্ট্রাকচারকে সাংস্কৃতিক আধিসৌধ বলেছেন। উৎপাদিকা শক্তিগুলির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই আধিসৌধ অর্থাৎ ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি রাজনীতিরও পরিবর্তন বা প্রগতি আসতে পারে।

রবীন্দ্রনাথও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বাইরে সামাজিক উৎপাদিকা শক্তিগুলির মানোন্নয়ন দ্বারা সামাজিক আধিসৌধের মানোন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপারে তাই তাঁর মধ্যে অত বেশি ব্যগ্রতাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

খ. মার্কস্ তাঁর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে যে 'thesis' 'anti-thesis' –এর দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের মধ্য দিয়ে 'synthesis' –এর উদ্ভবের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ উপায়ে নবীন-প্রাচীনের সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল সমাজ গঠনের স্বপক্ষে সওয়াল করেছেন। দৃষ্টান্ত 'বলাকা' কাব্যের 'সবুজের অভিযান' কবিতা।

গ. মার্কস্ ধনতন্ত্রের প্রাথমিক সাফল্য বিষয়ে প্রশংসায় মুখর ছিলেন। ধনতন্ত্র যে বিপুল উৎপাদিকা শক্তির স্বাক্ষর রেখেছে তা পূর্ববর্তী যুগগুলির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপুল শক্তি ও সমৃদ্ধির ব্যাপারে তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। 'রক্তকরবী'র নন্দিনী ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিভূ রাজার পেশিতে এই শক্তিরই প্রকাশ দেখে মোহিত হয়েছে।

ঘ. ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি বড় ত্রুটির যে দিকটিকে মার্কস চিহ্নিত করেছেন, তা হল ক্ষমতা বিভাজনের গভীর অসাম্যের দিক। এই ক্ষমতা মালিকপক্ষ বা শিল্পপতিদের হাতেই যে সীমাবদ্ধ থাকবে ক্যাপিট্যাল গ্রন্থে সেদিকেরই নির্দেশ দিয়েছেন। একটি উপমা দিয়ে মার্কস বুঝিয়েছেন, ধনতন্ত্রে পুঁজিপতি সদম্ভে সামনে হাঁটেন, এবং শ্রমিক—যার কাছে শ্রমক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নেই—সে বিনীতভাবে প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এরই অনিবার্য ফলশ্রুতি হল মালিকের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও শ্রমিক-শোষণ, অন্যদিকে নিরন্ন নিপীড়িত শ্রমিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। আয়বণ্টনের এই অসাম্যে সমাজে ধনী-নির্ধনের প্রভেদ তাই উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। রবীন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন ধনী-নির্ধনের ব্যবধান হ্রাস করে সম্পদের সুষম বন্টন। তাই সমবায় প্রণালীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

ঙ. মার্কস জানিয়েছেন পুঁজিপতিদের ক্ষমতা শুধু সংস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ধীরে ধীরে তা সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'তে তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন—

" আধুনিক রাষ্ট্রের যাঁরা কর্মকর্তা (executive) তাঁরাও সচরাচর সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থেই কাজ করে থাকেন—আসলে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাধারণ কাজগুলিকে (common affairs) সুপরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই এই কর্মকর্তারা একটি সমিতি মাত্র। মার্কসের মতে এর চেয়েও বেশি ভয়াবহ ও দুঃখজনক ঘটনা হল যে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই ক্ষমতা শেষে অর্থনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, যাঁরা ধনতন্ত্রের বর্ণনা দেন এবং এর ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে, এবং তাঁদের স্বাধীন চিন্তা করার

ক্ষমতাকে খর্ব করে। ফলে যা ঘটে তা হল মার্কসের ভাষায়, "The rulling ideas of each age have ever been the ideas of its rulling class."—অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের চালু ধারণাগুলি সব সময়েই শাসক শ্রেণীর ধারণার প্রতিফলন। এইভাবেই অর্থনীতিবিদ, এবং তাঁর অর্থনীতিক শাস্ত্র, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের আজ্ঞাবাহী হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হন।"[৮]

এর থেকেই জন্ম নেয় উগ্রজাতীয়তাবাদ। রবীন্দ্রনাথ তাই ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের অনুরূপ প্রবণতার বিরোধিতা করেছিলেন। 'মুক্তধারা' নাটকে এর স্পষ্ট বিরোধিতা আছে। তাই চেতনার স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপক্ষে সওয়াল করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

চ. মার্কস জানিয়েছেনশ্রমিক-শোষণ ও মালিকের অন্যায়ের প্রতিকারের উপায় শ্রমিকদের হাতেই রয়েছে। এই মতবাদ শ্রমিক আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রসাহিত্যেও ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে প্রজা তথা শ্রমিকদের অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে লড়াই-এর ছবি আছে—তার পথ ও পন্থার স্বাতন্ত্র্য যাই থাক না কেন।

ছ. মার্কস চেয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের ভাবনাও ছিল তাই। যে কোন দরিদ্র দেশের উন্নয়ন তো শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন মাত্র নয়, সামাজিক উন্নয়নও বটে। মার্কস এই ভাববাদ বা ideology- র উপরও অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের আত্মিক বা সামাজিক উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষকে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সওয়াল করেছেন।

জ. ভারতবর্ষীয় বা এশীয় গ্রাম-সমাজের অনড়তার কথা বলতে গিয়ে মার্কস এদেশের যে অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাগের কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়ও তার ছবিটি স্পষ্ট—'সমাজের কাজ প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা আছে'।

বৈসাদৃশ্য :

ক. মার্কস-এর মত রবীন্দ্রনাথ শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেননি। রবীন্দ্রনাথ শ্রমিক আন্দোলন বা গণ আন্দোলনকে স্বীকার করলেও শ্রেণীসংঘাত নয়, শ্রেণী-সমন্বয়ের পথেই হেঁটেছেন। তাঁর আন্দোলনের পন্থাটিও রক্তক্ষয়ী নয়, অহিংসপথে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠা অর্জনই তাঁর কাছে লক্ষ্য বলে পরিগণিত হয়েছে।

খ. রবীন্দ্রনাথ সাম্যবাদী সমাজের কথা বললেও ধনী-নির্ধনের ব্যবধান সম্পূর্ণ রূপে মুছে দেওয়া সম্ভব—এমনটা বলেননি। তিনি ধনী-নির্ধনের ব্যবধান যতটা সম্ভব কমিয়ে এনে সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা বা সম্পদের সুষম বন্টন চেয়েছিলেন ।

গ. মার্কস জানিয়েছেন, আমাদের দেশের কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামগুলিতে যে উদ্বৃত্ত তৈরি হত তা রাষ্ট্র আদায় করে নিয়ে চলে যেত। ফলে গ্রামসমাজের কোন অর্থনৈতিক প্রগতি বা পরিবর্তন ঘটেনি। এই উদ্বৃত্ত গ্রামসমাজে থেকে গেলে নূতন করে উৎপাদন ও উন্নয়নের ভিত গড়ে উঠতো। তাতে এশীয় বা ভারতীয় শ্রমবিভাগের প্রাচীন ব্যবস্থা ভেঙে যেত। কিন্তু তা না হওয়ায় গ্রামসমাজ যুগের পর যুগ একইরকম ভাবে থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ভারতবর্ষীয় গ্রামসমাজের এই অপরিবর্তনীয় ধারণায় আস্থাশীল ছিলেন না। সামাজিক মঙ্গলসাধনের মধ্য দিয়ে এই সমাজের প্রগতি যে সাধিত হয়েছে সে ব্যাপারে তাঁর ধারণা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

ঘ. মার্কস কিন্তু ভারতীয় বা এশীয় সমাজের যে অনড়তার কথা বলেছেন তার মূলে অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাগকে দায়ী করেছিলেন—যে অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাগের ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথের ভাবনার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। কিন্তু দুজনের এই চিন্তার মধ্যে তফাৎ অনেক। মার্কস এই অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাগের মধ্যে দেখেছিলেন পশ্চাদপদতা ও সীমাবদ্ধতা। তাঁর মনে হয়েছিল ভারতবর্ষীয় গ্রামসমাজকে ভেঙে দিয়ে সচেতনভাবে হলেও আর্থ-সামাজিক প্রগতি আনছে এদেশের ঔপনিবেশিক শাসক বা ইংরেজরা।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এমনটা ভাবেননি। তিনি মনে করেছেন আমাদের দেশে সমাজের মধ্যে এমন একটা জীবনীশক্তির জোর আছে যে তা রাজাকে বা রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে নিজেই চলতে পারে। এই জীবনীশক্তির জোরেই গ্রাম-সমাজ নিজেই রাজা বা রাষ্ট্রের সাহায্য-ব্যতিরেকে পল্লী তথা দেশ উন্নয়নের স্বাধীন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। রাজা বা রাষ্ট্রের উন্নয়ন-উদ্যোগ যেখানে কতিপয় মাত্র মানুষকে নিয়োজিত করতে পারে সেক্ষেত্রে এদেশীয় গ্রাম-সমাজ সকল মানুষকেই উন্নয়ন কর্মসূচীতে সামিল করতে পারে। মার্কস এদেশীয় গ্রাম-সমাজের যে অনড়তা বা অনুন্নতির কথা বলেন রবীন্দ্রনাথ তা মানেন না। তিনি বলেন এদেশে উন্নয়ন একভাবে হতই। নইলে গ্রাম-সমাজ দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকতে পারতো না। তাঁর মতে সে উন্নয়নের বহির্প্রকাশ ঘটতো 'সামাজিক মঙ্গলবিধানে'—যার সুফল ভোগ করতো সমাজের সকল মানুষ।

ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কিন্তু উন্নয়নের এই সাম্যবাদী মডেল মানা হয়নি। সেখানে পুঁজিনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে আদর্শকে খাড়া করা হয়েছে তাতে একচেটিয়া সুবিধাভোগের রাজনৈতিক অভিসন্ধি কাজ করেছে। তবু এদেশের গ্রামগুলি যে

আজ জীর্ণ দশায় এসে উপস্থিত হয়েছে তার মূলে ইংরেজই দায়ী। মার্কসের মতো তিনি ইংরেজকে আর্থ-সামাজিক প্রগতির বাহন হিসেবে চিহ্নিত করেননি। বরং বলেছেন পাশ্চাত্যের ‘স্টেট’ বা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কায়েম হবার পর সেখানকার নিয়ম মেনে সামাজিক কল্যাণকর্মের ভার রাষ্ট্র রাজা নিতে চাওয়ায় সামাজিক মঙ্গলবিধানের উদ্যোগটাই স্তিমিত হয়ে গেছে। ফলে গ্রামপ্রধান এদেশের আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও কেইন্‌স্ :

বিশ শতকের তিনের দশকে যে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারাকে পাল্টে দিয়ে নবীন পথের হদিশ দেয় তিনি হলেন জন মেইনারড্ কেইন্‌স (১৮৮৩-১৯৪৬)। তাঁর ‘ The General Theory of Employment, Interest and Money’ বইটি অর্থনীতির ইতিহাসে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। বিশ শতকের তিনের দশকে সারা বিশ্ব জুড়ে যে আর্থিক মহামন্দা দেখা দিয়েছিল কীভাবে তার মোকাবিলা করা সম্ভব এই নিয়ে কেইন্‌স্ দীর্ঘদিন ধরে ভেবে আসছিলেন। ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্র আর্থিক মন্দা দূরীকরণে কেন সফল হচ্ছে না, এর তাত্ত্বিক ভিত্তি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে তৎকালীন অবস্থায় কেন কার্যকরী হচ্ছে না, এই নিয়ে নিজের ভাবনার অভিপ্রকাশ ঘটান।

আশ্চর্যভাবে হলেও এই ভাব ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উন্নয়ন ভাবনার অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর পল্লী উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেন উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে। কেইন্‌সের তখন শৈশবাবস্থা। সেদিকের বিচারে কেইন্‌সের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর থাকার কথা নয়। জীবনের শেষ চার-পাঁচ বছরে কেইন্‌সের অর্থনৈতিক ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যদি ঘটেও থাকে তাতে রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা পূর্বোক্ত গতিপথের পরিবর্তন ঘটায়নি। আসলে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা কোন তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেনি। নিজের প্রগতিচেতনায় স্বকীয় একটি বিন্যাস দেওয়ার প্রয়াস নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যা ভেবেছিলেন তাঁর ভাবনার সঙ্গে কেইন্‌সের ভাবনার কিছু অমিল থাকলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে অনেক মিল রয়েছে। এই মিল-অমিলের জায়গাগুলিকে নিম্নোক্ত বিন্যাস দেওয়া যেতে পারে—

সাদৃশ্য :

ক. কেইন্‌সীয় অর্থনীতির একটি বিশেষ দিক হল অর্থের যোগান বৃদ্ধি করে পূর্ণনিয়োগে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করা। এই প্রক্রিয়াটি কার্যকর করা যায় সুদের মাধ্যমে। যে কোন

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ নির্ভর করে সুদের হারের উপর। এই সুদের হার নির্ভর করে অর্থের যোগান ও অর্থের চাহিদার টানাপোড়েনের উপর। চাহিদার অনুপাতে অর্থের যোগান যদি বাড়ে তাহলে সুদের হার কমে যায়। আর সুদের হার কমলেই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। তাই সরকার যদি অর্থের যোগান বৃদ্ধি করার সুচিন্তিত নীতি গ্রহণ করেন তাহলে সুদের হারের উপর যে নিম্নমুখী চাপের সৃষ্টি হয় তাতে সুদের হার অনেকটা কমে আসে। ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই পদ্ধতির কিছু ত্রুটি থাকলেও আর্থিক মন্দা বা অবনিয়োগ রোধে সরকারের পক্ষে এই কৌশলটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

কেইন্‌সের এই অভিমতের সঙ্গে তাত্ত্বিক দিক থেকে না হলেও প্রকৃতিগত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক ভাবনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের পল্লীতে পা দিয়েই দেখেছিলেন সেখানকার প্রজারা কীভাবে অর্থের অভাবে মহাজনের ঋণের জালে জড়িয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। মহাজনের চড়া হারের সুদ মেটাতে প্রজার বংশপরম্পরা কেটে যেত। তাই রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫-এ কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে প্রজাদের ঋণদানের ব্যবস্থা করেন যাতে পল্লীর টাকা ঘুরপথে মহাজনের হাতে চলে না যায়। পরবর্তী সময়ে কো-অপারেটিভ লোন সোসাইটি স্থাপন করেন অনুরূপ কারণেই। এই দুই উপায়ে কৃষক বা প্রজার অর্থের যোগান বৃদ্ধির ফলে মহাজনেরাও তাদের ঋণের পরিমাণ কমাতে বাধ্য হন। একটা সময়ে তারা লাভের আশা ছেড়ে সেই অঞ্চল ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। অর্থের যোগান বৃদ্ধির ফলেই এক্ষেত্রে সুদের হার কমে এসেছে এবং প্রজারা তাদের উদবৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করতে পেরেছে। সেই অর্থ তারা কৃষিব্যাঙ্কে সঞ্চিত রাখায় বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। শুধু কেইন্‌স্‌ যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসেবে সেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কেননা রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের দেশের গ্রামসমাজ রাষ্ট্র বা রাজার অপেক্ষা না করেই নিজ নিজ কল্যাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে এসেছে আবহমান কাল ধরে। রবীন্দ্রনাথের এই মানসিকতা অনেকটাই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বা direct democracy-র ধারণাকে সমর্থন করে।

খ. উপরোক্ত পদ্ধতিটি ছাড়া কেইন্‌সের মতে আর্থিক মানোন্নয়নের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির অপর কৌশল হল আয় বন্টনে সমতার নীতিকে অনুসরণ করা। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ যে কম তার কারণ হল আমাদের অর্থনীতিতে কার্যকরী চাহিদার অভাব অত্যন্ত প্রকট। এই চাহিদা কম হওয়ার কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত আছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে সম্পদের বিষম বন্টনের ফলে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান বেশ প্রকট। সমাজে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনবান থাকলেও অধিকাংশ লোকই থাকেন বিত্তহীন। তারা বাজারে জিনিস বা পণ্য কিনতে আগ্রহী থাকলেও যেহেতু

তাদের হাতে অর্থের পরিমাণ কম থাকে বা অর্থের অভাবে ভোগে তাই তারা তাদের কাঙ্খিত দ্রব্য ক্রয় করতে পারে না। অন্যদিকে সমাজের বিত্তবানদের হাতে প্রচুর অর্থ থাকলেও সেই অনুপাতে ব্যয় করার সাধ তাদের মধ্যে নেই । অর্থাৎ কেইন্‌সীয় তাত্ত্বিক ভাষারীতি অনুসারে বিত্তহীনদের আয়-অপেক্ষ ভোগ (propensity to consume) ধনীদের প্রান্তিক আয়-অপেক্ষ ভোগের (marginal propensity to consume) তুলনায় অনেক অধিক। আয় অপেক্ষ ভোগ বলতে কেইন্‌স বোঝাতে চেয়েছেন প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের সঙ্গে তার ভোগের একটি সম্পর্ক রয়েছে। ভোগের পরিমাণ নির্ভর করে তার আয়ের উপর। তাঁর মতে আয় যত বৃদ্ধি পায় সেই অনুপাতে ভোগের পরিমাণ কমতে থাকে। সেই হিসেবে ধনীর আয়-অপেক্ষ ভোগের পরিমাণ গরীবের আয়-অপেক্ষ ভোগের তুলনায় অনেক কম। কেইন্‌স তাই মনে করেছেন কর বসিয়ে এই বিত্তবান বা ধনীদের আয়ের একটা বড় অংশ যদি সরকার গ্রহণ করেন এবং সেই সংগৃহীত অর্থ যদি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে দেন তাহলে সমাজে সামগ্রিকভাবে কার্যকরী চাহিদার বৃদ্ধি ঘটবে। তাতে ধনীরাও ঘুরপথে উপকৃত হবে। এই Redistributive taxation পদ্ধতির প্রয়োগে সামাজিক অবনিয়োগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। ধনতন্ত্রে পূর্ণ নিয়োগ এই উপায়েই সম্ভব হতে পারে। এই উপায়ে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানকে কমিয়ে আনাও সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধনী-নির্ধনের ক্রমবর্ধমান অসাম্য বিষয়ে সোচ্চার হয়েছেন। যে কোন উন্নতিশীল দেশে ধনী-নির্ধনের এই ব্যবধানকে গোড়া থেকে কোপ বসিয়ে কমিয়ে আনার সচেতন প্রয়াস থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেছেন। 'রাশিয়ার চিঠি'তে রাশিয়ার সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ উক্তি ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। একজন কবি ও কর্মী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যা ভেবেছেন কেইন্‌সীয় অর্থনীতি তাকেই তাত্ত্বিক ভিত্তি দান করেছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় যে সমবায় প্রথার নিদর্শন দেখেছিলেন, যৌথচাষের যে অভাবনীয় উন্নতি দেখেছিলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দখা যায় না। তার প্রধান কারণ, আর-আর সব জায়গায় ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সব চেয়ে বড় করে চোখে পড়ে—সেখানে দারিদ্র্য যবনিকার আড়ালে নেপথ্যে; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর, দুঃখে দুর্দশায় দুষ্কর্মে নিবিড় অন্ধকার। কিন্তু বাইরে থেকে গিয়ে আমরা যেখানে বাসা পাই সেখানকার জানলা দিয়ে যা-কিছু দেখতে পাই সমস্তই সুভদ্র, শোভন, সুপরিপুষ্ট। এই সমৃদ্ধি যদি সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেত তা হলে তখনই ধরা পড়ত, দেশের ধন এত কিছু বেশী নয় যাতে সকলের ভাত কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে জোটে। এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে; দৈন্যেরও কুশ্রীতা

নেই, আছে অকিঞ্চনতা। দেশ-জোড়া এই অধন আর কোথাও দেখি নি বলেই প্রথমেই এটা আমাদের খুব চোখে পড়ে। অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে তারাই একমাত্র।” [৯]

ধনী-নির্ধনের এই ব্যবধানের সামাজিক বিকৃতির কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরো জানিয়েছেন—

“......আধুনিক কালে ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয় ধনীকে যে প্রবল শক্তির অধিকার দিচ্ছে তাতে সর্বজনের সম্মান ও আনন্দ থাকতে পারে না। তাতে একপক্ষে অসীম লোভ, অপর পক্ষে গভীর ঈর্ষা, মাঝখানে দুস্তর পার্থক্য। সমাজে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বড়ো হয়ে উঠলো। এই প্রতিযোগিতা নিজের দেশের এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর, এবং বাহিরে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের। তাই চারদিকে সংশয়হিংস্র অস্ত্র শাণিত হয়ে উঠেছে, কোনো উপায়েই তার পরিমাণ কেউ খর্ব করতে পারছে না। আর, পরদেশী যারা এই দূরস্থিত ভোগরাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃশতা যুগের পরে যুগে বেড়েই চলেছে। এই বহুবিস্তৃত কৃশতার মধ্যে পৃথিবীর অশান্তি বাসা বাঁধতে পারে না, এ কথা যারা বলদর্পে কল্পনা করে তারা নিজের গোয়ার্তুমির অন্ধতার দ্বারা বিড়ম্বিত। যারা নিরন্তর দুঃখ পেয়ে চলেছে সেই হতভাগারাই দুঃখবিধাতার প্রেরিত দূতদের প্রধান সহায়; তাদের উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হচ্ছে।”[১০]

সামাজিক আয়োজনের মধ্যে যে ত্যাগের কথা রবীন্দ্রনাথ বলছেন তাকেই কেইন্‌সের আয়বন্টনের জনগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভিন্ন রূপ বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ‘রাশিয়ার চিঠি’তে লিখেছেন—

“অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্‌বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতার প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।

......একথা বলা চলে না যে, মানুষের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না; কিন্তু বলা চলে যে স্বার্থপরতা থাকবে না। অর্থাৎ নিজের জন্যে কিছু নিজত্ব না হলে নয়, কিন্তু বাকি সমস্তই পরের জন্যে হওয়া চাই। আত্ম এবং পর উভয়কেই স্বীকার করে তবেই তার সমাধান সম্ভব।”[১১]

গ. কেইন্‌স্ বিনিয়োগকে সুষ্টভাবে পরিচালিত করার জন্য ধনতন্ত্রেকে কিছুটা সামাজিক কর্তৃত্বাধীনে আনার উপর জোর দিয়েছেন। এছাড়া যে ধনতন্ত্রের বাঁচার কোন উপায় নেই সেকথা কেইন্‌স বার বার উল্লেখ করেছেন। একারণেই বিনিয়োগের

সামাজিকীকরণকে (socialization of investment) একটি অন্যতম পন্থা হিসেবে নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিনিয়োগ সমাজ-পরিচালিত হলে তার কল্যাণকর দিকটি প্রাধান্য পাবে। নতুন যন্ত্র আবিষ্কারক, যন্ত্রশিল্পী, শিল্প-প্রবর্তকেরা সমাজে যাতে তাদের সৃজনশীলতা ও কর্মদক্ষতার বজায় রাখতে পারেন তার দিকে নজর দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথও ঠিক অনুরূপভাবে এদেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রাম-সমাজ পরিচালিত সামাজিক কল্যাণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ধনতন্ত্রকে সমাজের কর্তৃত্বাধীনে রেখে রবীন্দ্রনাথও কিন্তু ধনতন্ত্রের অপহ্নবকে এড়াতে চেয়েছেন।

ঘ. কেইন্‌স্ কিংবা রবীন্দ্রনাথ কোন বিপ্লবাত্মক পন্থায় ধনতন্ত্রের শোষণ ও অসাম্য থেকে মুক্তি আসবে বলে মনে করেননি। অর্থনৈতিক অসাম্য থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে যদি সমাজের বিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক শক্তিগুলিকে একত্র করা যায়। উভয়েই অর্থনীতিতে মানবনীতিকে স্থান দিতে চেয়েছেন। ঐক্যের সত্যকে অর্থনীতিতে স্থান দিতে চেয়েছেন।

ঙ. আমেরিকা ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যেখানে মূলধন ও মজুরীর মধ্যে খুব বেশি প্রভেদ বেড়ে গেছে সেখানে ডেমোক্র্যাসির প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কেইন্‌স্‌ও কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য শ্রমিকদের মজুরী কমিয়ে দেওয়ার স্বপক্ষে ছিলেন না। মূলধন ও মজুরীর এই বিস্তর প্রভেদ যে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা আনবে, ধনী-নির্ধনের ব্যবধানকে বর্ধিত করবে তা কেইন্‌সেরও অভিমত।

বৈসাদৃশ্য :

ক. রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ভাবনার জায়গা থেকে পরাধীন ভারতবর্ষে সরকারের কোনরূপ সাহায্য ছাড়াই পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু কেইন্‌সীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগই বিশেষ গুরুত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। একজনের ভাবনা যেখানে সরকার-সাপেক্ষ সেখানে আর একজনের ভাবনা সরকার-নিরপেক্ষ। আসলে এই দুই মহান ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র সামাজিক পরিবেশে, রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই দুজনের ভাবনার মধ্যে এয় স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছে।

খ. কেইন্‌স তাঁর ভাবনাকে যেভাবে একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনাকে সেইরকম কোন তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেননি।

রবীন্দ্রনাথ ও অমর্ত্য সেন :

সাম্প্রতিক কালের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অমর্ত্যসেনের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। এই বাঙালি অর্থনীতিবিদ বিশ্ব-অর্থনীতিতে বিশেষ অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে লালিত তাঁর মন ও মনন। তাই

তাঁর অর্থনীতি ভাবনায় মানবিক প্রগতির দিকটি অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। সেকারণে তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক ভাবনার বেশকিছু সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনাকে কোন তাত্ত্বিক মডেল দান করেননি সেহেতু একটি সুনিবদ্ধ অর্থনৈতিক মডেলের উপর দাঁড়িয়ে থাকা অমর্ত্য সেনের ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার কিছু অমিলও দেখা যায়। এই মিল অমিলের জায়গাগুলোকে নিম্নোক্ত সূত্রাকার বিন্যাস দেওয়া যেতে পারে।

সাদৃশ্য :

ক. রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন ভাবনার অন্যতম বিশেষ দিক ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল না হওয়ার কথা বললেও দেশোন্নয়নের ক্ষত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনকে স্বীকার করেছেন এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে তিনি নিজেকে সবসময় সরিয়েও রাখতে পারেননি। মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে তিনি হয়তো কখনো কখনো রাজনীতির থেকে নিজের দূরত্ব বজায় রেখেছেন, কিন্তু দেশের প্রয়োজনে রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ব্রাত্য করে রাখেননি। অমর্ত্য সেনও দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে পাঁচ প্রকার স্বাধীনতার কথা বলেছেন। এদের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপক্ষে মত দিয়ে জানিয়েছেন–

“ ব্যাপকভাবে চিহ্নিত রাজনৈতিক স্বাধীনতাসমূহ (যার মধ্যে নাগরিক অধিকারগুলিও নিহিত) মানুষকে বিচার করার সুযোগ দেয় কে তাদের শাসন করবে, কী নীতিদ্বারা চালিত হবে, শাসকগোষ্ঠীর কার্যকলাপের বিচার ও সমালোচনার অধিকার, রাজনৈতিক মত নির্ভয়ে প্রকাশ করবার এবং প্রচারমাধ্যমকে সেন্সর দ্বারা বেঁধে না রাখার অবস্থা, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নিজেদের পছন্দমতো নির্বাচন করবার এবং অনুরূপ আরও স্বাধীনতা। ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অধিকারগুলি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট–এর আওতায় আসে রাজনৈতিক বিতর্কে যোগদান, বিরুদ্ধ মত প্রকাশ ও পর্যালোচনা, ভোটদানের অধিকার এবং বিধায়ক ও প্রশাসকদের নির্বাচন করার প্রণালীতে যোগদান করার ক্ষমতা।”[১২]

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এর মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও চেতনার স্বাধীনতার কথাও বলা হয়েছে–যা রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মযজ্ঞের অভীষ্ট ছিল।

খ. অমর্ত্য সেন দ্বিতীয় যে সামাজিক স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক প্রগতির পরিপূরক ভেবেছেন তা হল অর্থনৈতিক কার্যসিদ্ধির সহায়তা দান করে—এমন স্বাধীনতা। তাঁর মতে—

" অর্থনৈতিক কার্যসিদ্ধির সহায়তার গণ্ডীতে পড়ে সেই সব সুযোগসুবিধা যা ব্যক্তিমাত্রেই নিজের ব্যবহার বা উৎপাদন বা আদান-প্রদানের জন্য অর্থনৈতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পায়। ......কোনও দেশের আয় এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেলে তা দেশবাসীর অর্থনৈতিক অধিকারের বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়।......... অর্থসম্পদের প্রাপ্যতা এবং সহজলভ্যতা অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে কারক স্বত্বলাভে সাহায্য করে তা কাজের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। বৃহৎ সংস্থা (যেখানে সহস্র সহস্র লোক কর্মনিরত) থেকে যে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান মুষ্টিমেয় ঋণ নিয়ে ব্যবসা চালায়, দুজনের ক্ষেত্রেই এই সত্য প্রযোজ্য। ঋণ যখন হ্রাস করা হয় তখন যে সব অর্থনৈতিক স্বত্ব ঐ ঋণের উপর নির্ভরশীল তারা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথও এই অর্থনৈতিক কার্যসিদ্ধির সহায়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। তিনিও কৃষক-প্রজাদের কৃষিব্যাঙ্ক থেকে লোনের ব্যবস্থা করার জন্য কৃষিব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কো-অপারিটিভ ব্যবস্থার মাধ্যমে যেমন কৃষকদের আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির প্রয়াস নিয়েছেন তেমনি কো-অপারেটিভ লোন সোসাইটি স্থাপন করে কৃষকদের অর্থনৈতিক কার্যসিদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। এর দ্বারা সামাজিক বিনিয়োগ সৃষ্টির সুষম পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিয়েছেন।

গ. অমর্ত্য সেন অর্থনৈতিক প্রগতির পরিপূরক হিসেবে তৃতীয় যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন তা হল সামাজিক সুযোগ-সুবিধা লাভের স্বাধীনতা। সেনের মতে—

" সামাজিক সুযোগ সুবিধার অধীনে আসে সামাজিক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ইত্যাদি পরিষেবার জন্য যে প্রস্তুতি এবং যার দ্বারা ব্যক্তি উন্নততর জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে। এই সুযোগসুবিধাগুলি শুধু স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, রোগগ্রস্ততা বা অকালমৃত্যুর গ্রাস থেকে রক্ষা পাবার মতো ব্যক্তিগত জীবনকে আরও সুস্থ করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নিতে সাহায্য করে।"[১৪]

অমর্ত্য সেনের উদ্ধৃত মন্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা সর্বাংশে স্বীকৃত। দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে যেখানে 'গুণমানসম্মত কঠোর শাসনাধীন উৎপাদনের' প্রয়োজন হয় সেখানে শ্রমিকের নিরক্ষরতা বা সামাজিক প্রশিক্ষণের অভাব প্রতিবন্ধকতা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক পরিসরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে তাই সামাজিক প্রশিক্ষণ বা শিক্ষার নিতান্ত আবশ্যকতা দেখা দেয়। রোগগ্রস্ত শরীরও উৎপাদনের অন্তরায়। একইভাবে সংবাদপত্র পড়তে না পারা বা লেখার সাহায্যে যোগাযোগ করতে না

পারলে বিশ্বের কিংবা জাতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মপরিপরিকল্পনার দুই পর্বে তাই উন্নয়নের অঙ্গ হিসেবে দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন। সামাজিক উন্নয়নের শর্ত হিসেবে পল্লীর মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নয়নে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সংবাদপত্র প্রকাশের দ্বারা দেশের মানুষের তথা কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা আনয়নের প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। ব্রতী বালকদল গড়ে তুলে স্বাস্থ্যপরিষেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন। ‘ভাণ্ডার’ ‘ভূমিলক্ষ্মী’ বা ‘শান্তিনিকেতন’ পত্রিকাগুলি এরই পরিচয় বহন করে। শ্রীনিকেতনে সামাজিক প্রশিক্ষণের দ্বারাও কৃতি শিল্পীদের গড়ে তোলার যাবতীয় সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

ঘ. অমর্ত্য সেন চতুর্থ যে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন তা হল স্বচ্ছতার আশ্বাস সৃষ্টির অনুকূল স্বাধীনতা। তাঁর মতে—

“ ......সমাজ কতকগুলি মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তির উপর নির্ভর করে কাজ করে। এই স্বচ্ছতা একজন আর একজনের কাছে ন্যায্যত প্রত্যাশা করতে পারে—যথার্থ প্রকাশ এবং সুস্পষ্টতার ভিত্তিতে একের সঙ্গে অন্যের আদান-প্রদানের স্বাধীনতা। সেই বিশ্বাস যখন বিঘ্নিত হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের জীবন এই স্বচ্ছতার অভাবে প্রতিকূলভাবে বিপন্ন হয়। করণকারক স্বাধীনতার তালিকায় স্বচ্ছতার আশ্বাসের স্থান তাৎপর্যপূর্ণ। এই স্বচ্ছতা ভ্রষ্টাচার, আর্থিক দায়িত্বহীনতা এবং গোপন কার্যকলাপ ব্যাহত করায় একটি মহৎ প্রক্রিয়ার ভূমিকা নেয়।”[১৫]

রবীন্দ্রনাথ একারণেই চেয়েছিলেন পল্লীর তথা নগরের মানুষের নৈতিক পুনর্গঠন, আত্মিক উদ্বোধন। তাঁর শিক্ষাভাবনায় তাই চরিত্র গঠনের দিকটি অধিক মাহাত্ম্য পেয়েছে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাকে তারই অনুকূলে তিনি গড়ে তুলেছিলেন। পল্লীর মানুষের শিক্ষার বন্দোবস্ত করে তাদের চেতনার সংস্কার আনতে চেয়েছিলেন যাতে দেশের বৃহত্তর আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাকে কাটিয়ে একটি বৃহৎ ক্ষেত্রে মিলতে পারে। পল্লীর মানুষের স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রে একারণেই তিনি নীতিকথা বা উপকথা বা রূপকথাধর্মী পুস্তকসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন—যেগুলির মধ্যে নৈতিকতা বা বৃহৎ মূল্যবোধের স্বতন্ত্র পরিসর ছিল ।

ঙ. অমর্ত্য সেন পঞ্চম যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন তা হল সংরক্ষণকারী নিরাপত্তার স্বাধীনতা। এর ব্যাখ্যা দিয়ে সেন জানিয়েছেন—

" সংরক্ষণকারী নিরাপত্তা......দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে চরম দুর্দশার এমনকী বুভুক্ষা ও মৃত্যু থেকে বাঁচবার উপযুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। এরই আওতায় আসে বেকারভাতা এবং দরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে পরিপূরক আয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহ এবং সময় সময় দুর্ভিক্ষে ত্রাণ বা জরুরি অবস্থায় কর্মনিয়োগ দ্বারা অভাবগ্রস্তদের সহায়তা।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনায় অনুরূপ ভাবনা অত্যন্ত সচেতন ভাবে স্থান পেয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন ব্রিটিশ সরকার দেশীয় লোকেদের কর্মসংস্থানে উদাসীন। এ কারণে শ্রীনিকেতন পর্বে শিল্পভবনের প্রতিষ্ঠার দ্বারা শুধু সামাজিক প্রশিক্ষণ নয়, কর্মী নিয়োগেরও বন্দোবস্ত করেন। পল্লীর পুরুষ শুধু নয়, নারীরাও যাতে উপার্জন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে বা আত্মসংরক্ষণের সুবিধা পেতে পারে তার যাবতীয় ব্যবস্থা ছিল শ্রীনিকেতনে। ধর্মগোলা স্থাপন করে জরুরি সময়ের মোকাবিলারও উদ্যোগ নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজ সরকারের দায়িত্বহীনতা বা সংরক্ষণকারী স্বাধীনতার হরণেই কিন্তু এদেশে দু-দুটি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের পদচারণ দেখা গেছিল।

চ. অমর্ত্য সেন বিপণন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাজার-প্রক্রিয়ার এক নিবিড় যোগকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর মতে—

"বাজার প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সম্পর্কের বিষয়টি সম্বন্ধে দুটি প্রশ্ন ওঠে এবং তাদের স্বতন্ত্রভাবে বুঝতে হবে। প্রথমটি, বিতরণের স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণের ফলে অবাধ আদান-প্রদানের যে ব্যাঘাত ঘটে, সেটিই মূলত স্বাধীনতাহীনতার উৎস হতে পারে। কোনও কিছু করার বাধ্যবাধকতা না থাকায় মানুষ তখন নিজের অধিকারে যা করতে পারে তা সম্পাদন করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই বিষয়টি বাজার-প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে না অথবা বাজার ক্রিয়াবিধির অস্তিত্ব থাকা উচিত কি অনুচিত সেই বিশ্লেষণের উপরেও নয়। আদান-প্রদানের অবাধ সুযোগ ও কোনওরূপ বাধা ছাড়া ক্রিয়াকর্মের গুরুত্বের উপরেই তা নির্ভর করে।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভাবনায় অনুরূপ চিন্তার অনুসৃতি চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বাজারকরণের জন্য পল্লীর মধ্যে নিজ আর্থিক দায়িত্বে বাজার নির্মাণের প্রয়াস নিয়েছেন। একাধিক পল্লীতে তিনি অনুরূপ প্রয়াস নিয়েছিলেন। চালাঘর তৈরি করে দোকানগুলিকে মজবুত ভিত্তি দিতে চেয়েছিলেন যাতে কৃষক উৎপাদিত পণ্যকে সহজে বাজারে আনতে পারে এবং ক্রেতার মাধ্যমে বিপণনের বন্দোবস্ত করতে পারে। কিন্তু পল্লীর স্বার্থান্বেষী অপরাপর জমিদার ও সুবিধাভোগী ব্যক্তির স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় গোপনে অগ্নিসংযোগ করে চালাঘরগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। যোগাযোগ

ব্যবস্থাকে উন্নত করে, মহাজনের নিয়ন্ত্রণ থেকে কৃষককে মুক্ত করে উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাকে অবাধ করে তুলতে চেয়েছিলেন।

ছ. অমর্ত্য সেন দারিদ্র্যমোচন বা অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই কেবল উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে বিচার করেননি। কোন ব্যক্তির আয় কতকগুলি সামাজিক উপাদানের উপর নির্ভর করে। যেমন ব্যক্তির বয়স, অক্ষমতা, রোগ, লিঙ্গ এবং সামাজিক স্থান, অবস্থান ক্ষেত্র কিংবা পরিবেশ। সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে বয়স্ক ও নবীনদের প্রয়োজন ভিন্ন। মাতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বা সমাজে নারীর স্থান বা আচার নির্ধারিত পারিবারিক দায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। খরা বা বন্যাকবলিত অঞ্চল মানুষের দারিদ্র্য মুক্তির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। স্বাস্থ্যকর কিংবা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্ধারক হয়ে দাঁড়ায়।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনায় এ কারণেই এ-জাতীয় সামাজিক সংস্কারের আয়োজন ছিল। পল্লীর ব্রতী বালকদল বা যুবসম্প্রদায়কে এই কাজে বেশি করে নিয়োজিত করতে চেয়েছেন। লিঙ্গবৈষম্যকে দূরে সরিয়ে নারীর স্বাধিকারের জন্য লড়াই করেছেন এবং তাদের স্বনির্ভরতার জন্য নানা পরিকল্পনা গড়ে তুলেছেন। বন্যার কবল থেকে পল্লীকে রক্ষার জন্য যেমন একাধিক বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন তেমনি ক্ষরা বা মৃত্তিকা ক্ষয় সমস্যার সমাধানের জন্য বৃক্ষরোপণ উৎসব, অরণ্য উৎসব ইত্যাদির আয়োজন করেন। আগাছা, জঞ্জাল মশায় পরিপূর্ণ পল্লীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। সেচ ও স্যানিটারি ব্যবস্থাকে নবীন নির্মাণ দিতে চেয়েছেন।

জ. অমর্ত্য সেন ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতো ধনী-দরিদ্রের বিরাট অসাম্যকে নিরসন করার কথা বলেছেন। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদেরা যেভাবে ভেবেছেন অমর্ত্যসেন সেভাবে ভাবেননি। তাঁর মতে—

" আয়ের দারিদ্র্যের উপর জোর দেওয়ার ফলে বিকৃত হয়ে অন্যান্য বঞ্চনাগুলিকে অবজ্ঞা করে যথা বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহানি, শিক্ষার অভাব এবং সামাজিক বর্জন। দুঃখের বিষয় অর্থনৈতিক অসমতার সঙ্গে আয়ের অসমতার অভেদত্ব প্রতিপাদন বিস্তীর্ণভাবে অর্থনীতিশাস্ত্রে প্রচলিত এবং দুটিকে প্রায় সমর্থকরূপে গণ্য করা হয়। ......কার্যতভাবে আয়ের অসমতা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে অসমতার সম্পর্ক কিছু অসংলগ্ন এবং শর্তসাপেক্ষ হতে পারে কারণ আয় ব্যতীত যে সব প্রভাব ব্যক্তিগত সুবিধাবিধি এবং প্রকৃত ক্ষমতাকে স্পর্শ করে তাদের কারণে।"[১৮]

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর পল্লীউন্নয়ন ভাবনায় অমর্ত্য সেন কথিত সামাজিক বঞ্চনা বা অসাম্যগুলোর উপর অধিক জোর দিয়েছিলেন এবং সামাজিক সেই ব্যাধিগুলির দূরীকরণের দ্বারা দরিদ্র মানুষের আর্থিক মানোন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য,

কর্মবিনিয়োগের পাশাপাশি জাতপাত-পাত-অস্পৃশ্যতার মত সামাজিক ক্ষেত্রে যে চূড়ান্ত প্রতিকূলতা তার নিরসনের সার্বিক প্রয়াস নিয়েছিলেন। এইভাবে পল্লীর মানুষকে, দরিদ্র জনসাধারণকে অসাম্য ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত করে প্রগতির পূর্ণতর পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছেন তিনি

ঝ. অমর্ত্য সেন লিঙ্গ বৈষম্যের বিরোধিতা করেছেন এবং পারিবারিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে এই বৈষম্য দূরীকরণে নারীর স্বাধিকারের স্বপক্ষে মত পোষণ করেছেন। বিষয়টি অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের জন্য কতটা জরুরী তার পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছেন—

“ যদিও মহিলারা গৃহে প্রতিদিন অনেক কাজ করে, যেহেতু এর জন্য কোনও পারিশ্রমিক ধার্য হয় না পরিবারের মিলিত স্বত্বে স্ত্রী এবং পুরুষের পৃথক অবদানের হিসাবে, স্ত্রীর অবদান অবহেলিত হয়। কিন্তু সেই কাজ যখন গৃহের বাইরে হয় এবং মহিলাটি তার জন্য পারিশ্রমিক লাভ করে, পরিবারের মধ্যে তার অবদান স্পষ্ট চোখে পড়ে। অন্যদের উপর নির্ভরতা কমার ফলে তার মতামতেরও মূল্যবৃদ্ধি হয়। নারীর এই বর্ধিত মর্যাদার ফলে স্ত্রীশিশুর অধিকার সম্বন্ধেও মত পরিবর্তন হতে থাকে। অতএব বহির্জগতে উপার্জনের পথ অন্বেষণ করে তাকে আয়ত্তে রাখলে স্ত্রীজাতির আপেক্ষিক—এবং একান্ত—বঞ্চনার হ্রাস হয় ”[১৯]

রবীন্দ্রনাথও আজীবন নারীর স্বাধিকারের স্বপক্ষে সওয়াল করে গেছেন। শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন পর্বের পল্লীউন্নয়ন উদ্যোগে শিল্পভবনের একটি বড় ভূমিকা ছিল। শ্রীনিকেতনের এই শিক্ষা বিভাগটির সহায়তায় পল্লীর নারীরা যাতে কর্মলাভ করতে পারেন, যাতে তাঁরা আর্থিক দিক থেকে স্ব-ক্ষমতা লাভ করতে পারেন তার জন্য স্বতন্ত্র কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। কেননা উন্নয়নের অন্তরায় হল দেশের মৃত্যুহার বৃদ্ধি। আর অমর্ত্য সেন জানিয়েছেন—“যে সব দেশে বাস্তবক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য বিদ্যমান—ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চিন, ইরান, পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি এবং উত্তর আফ্রিকার—ইউরোপ, আমেরিকা বা সাহারার অধস্তন দেশগুলির তুলনায় অধিকমাত্রায় স্ত্রীজাতির মৃত্যুহার সেখানে লক্ষ্যনীয়।”[২০]

ঞ. রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের আর্থিক অবক্ষয়ের মাঝে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে ভাবিত হয়েছিলেন এবং ম্যাডাম স্যাঙ্গারের সঙ্গে একমত হয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অমর্ত্য সেনও দেশের উন্নয়ন ও স্বক্ষমতা অর্জনের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের উপর জোর দিয়েছেন।

ট. বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর মতো সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না। তিনি মানবকল্যাণের অনুকূলে প্রযুক্তি ব্যবহারের স্বপক্ষে

ছিলেন। কেননা বিশ্বায়নের স্রোতকে যে কোনরকম প্রাচীর তুলে আটকানো যাবে না, তা যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির অন্তরায়, তা তিনি বুঝেছিলেন এবং একাধিক রচনায় সে বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। সে ক্ষেত্রে স্বদেশের সংস্কৃতির উপর আক্রমণের আশঙ্কা কিন্তু থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ সে ক্ষেত্রে কিন্তু দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগুলির উজ্জীবন এবং যথাসম্ভব সংরক্ষণের স্বপক্ষে ছিলেন। এ বিষয়ে অমর্ত্য সেনও জানিয়েছেন—

" আজকের জগতের উপরে পশ্চিমের প্রভুত্ব অবিসংবাদিত। সাম্রাজ্যের রাজদণ্ডের বিলুপ্তি সত্ত্বেও পশ্চিমের প্রভাব অনড় রয়েছে—বিশেষত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অধিকতর জোরের সঙ্গে। কোকাকোলা আর এম. টিভি-র সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত হয় না।

বিশ্বায়নের যুগে স্বদেশের সংস্কৃতির উপর আক্রমণের আশঙ্কা এড়ানো যায় না। বাণিজ্য আর অর্থনীতির দ্বার বন্ধ করা কোনও সমাধানই নয় কারণ অর্থনৈতিক বিনিময়ের শক্তি এবং শ্রমের বিভাজন আজকের বিশালভাবে প্রযুক্তিচালিত প্রতিযোগিতার জগতে অপ্রতিরোধ্য।

এটি অবশ্যই একটি সমস্যা কিন্তু একইসঙ্গে শুধুমাত্র সমস্যা নয়। আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য এডাম স্মিথের দূরদৃষ্টির পথ ধরে প্রতি রাজ্যের জন্য বহুগুণ বর্ধিত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিরও বাহন হতে পারে। যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে সেখানে যথার্থ প্রত্যুত্তর হবে বিশ্বায়নের ধারাকে এমনভাবে চালিত করা যে, কর্মসংস্থান আর জীবিকা অর্জনের চিরাচরিত পন্থাগুলিকে যথাসাধ্য রক্ষা করে ধীরগতিতে পরিবর্তনের পথে হাঁটা। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সহজ করতে প্রয়োজন হবে পুনর্বার প্রশিক্ষণের এবং যাদের কর্মচ্যুতি হবে তাদের নতুন শিল্পের জন্য শিক্ষাদান। এ ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনী দ্বারা যাদের স্বল্পমেয়াদী দৃষ্টিতে বিশ্বায়নের দ্বারা স্বার্থহানি হবে তাদের রক্ষা করার প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

এই প্রকার প্রতিক্রিয়া সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। কম্পিউটারের ব্যবহার এবং ইন্টারনেট দ্বারা তথ্য সংগ্রহ বহু অর্থনৈতিক সুযোগের দ্বার উদ্‌ঘাটন করবে কিন্তু এইসকল প্রযুক্তির সংঘাতে জীবনধারারও পরিবর্তন হবে। এতে দুঃখের কিছু নেই।"[২১]

নতুন প্রযুক্তিকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শিলাদহ ও শ্রীনিকেতনে কৃষিগবেষণাগার স্থাপন করেছিলেন। সেখানে রথীন্দ্রনাথ ও এলম্‌হার্স্টের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণের কাজ চলতো। প্রশিক্ষকরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাধারণ কৃষকদের কাছে সেই প্রযুক্তিকে পৌঁছে দিতেন। শিল্পভবনেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ প্রয়াস সমান ভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। এই প্রযুক্তির অপ্রতিরোধ্যতা বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই তিনি

গান্ধীর চরকা আন্দোলনকে মেনে নিতে পারেননি—মতান্তরের পথে হেঁটেছেন। ১৮৮৯ থেকে পল্লীর মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরুর পর থেকে তাঁর গ্রামোন্নয়ন উদ্যোগের দুই পর্বেই নানাবিধ প্রযুক্তির ব্যবহার করেছেন। এই আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যেই সমবায় কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন। আধুনিক প্রযুক্তিকে যুক্তি বা মনন দিয়ে গ্রহণের স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথও মত প্রকাশ করেছেন।

বৈসাদৃশ্য :

ক. রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বললেও তার জন্য ব্যতিব্যস্ত না হয়ে পল্লীকে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার উপর জোর দিয়েছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক পটভূমি রবীন্দ্রনাথকে অনুরূপ ভাবনায় প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু অমর্ত্য সেন রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের বিশেষ সহায়ক হিসেবেই নির্দেশ করেছেন—

“ অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা আর রাজনৈতিক স্বাধীনতার সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য এটি কি যুক্তিপূর্ণ পন্থা যে, মূলগত পরস্পর বিপরীত বিভাজনের নিরিখে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রাসঙ্গিকতা বিঘ্নিত হবে? আমি যুক্তি দেখাব যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার বাধ্যতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার যথার্থতা উপলব্ধি করার জন্য এই বিষয়টি একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথ। যে সব প্রকৃত বিষয়ের উপর আমাদের নজর দিতে হবে সেগুলি রয়েছে অন্যত্র। তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ও পরিপূরকতার মধ্যে ব্যাপক পারস্পরিক সম্পর্কের বিচার করে। এই সম্পর্কগুলি শুধুমাত্র করণকারক নয় (তীব্র অর্থনৈতিক অভাবের সমাধানে উৎসাহ ও তথ্যপ্রদানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি প্রধান ভূমিকা থাকে) গঠনমূলকও। আর্থিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারা গুরুত্বপূর্ণভাবে নির্ভর করে প্রকাশ্য তর্ক ও আলোচনার উপর আর সেই প্রক্রিয়ার নিশ্চয়তার জন্য আবশ্যক মৌলিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকার অক্ষুন্ন রাখা।”[২২]

খ. রবীন্দ্রনাথ জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বৈজ্ঞানিক জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রণালীর কথা বলেন। কিন্তু অমর্ত্য সেন জন্মনিয়ন্ত্রণে বলপ্রয়োগ নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন নারীকে স্বাধিকার প্রদানের মধ্যস্থতায়। তাঁর অভিমত—

“ নারীকে নিজের অধিকার উচিৎমাত্রায় দিলে যে প্রজননের হারও কমে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই কারণ তরুণীদের জীবন পুনঃপুন গর্ভধারণে এবং শিশুর লালনপালনে জর্জরিত। তাই তাদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা যার দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের স্বার্থের প্রতি মনোযোগ আকর্ষিত হয় তা উপলব্ধি করলে বারংবার গর্ভধারণের

সম্ভাবনা কমে। ভারতে তিনশত জনপদের তুলনামূলক চর্চায় প্রকাশ পায় যে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী-কর্মসংস্থান প্রজননের হার হ্রাস করার জন্য সবচেয়ে প্রভাবশালী দুটি পন্থা। নারীর ক্রান্তির সহায়তায় নারীর সাক্ষরতা এবং কর্মসংস্থান যার দ্বারা প্রভাবিত হয় প্রজননের হারে তার অবদান প্রভূত।”[২৩]

গ. রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বাইরে ভারতবর্ষের আবহমান গ্রামসমাজকে স্বশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই ব্যবস্থা আমাদের দেশের পল্লীগুলিকে তার পূর্বের শ্রী ফিরিয়ে দেবে বলে মনে করেছেন। কিন্তু পুরাতন সেই ব্যবস্থাকে মানুষ কতটা গ্রহণ করবে তার জন্য অমর্ত্য সেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনমত যাচাই-এর উপর জোর দিয়েছেন। পুরাতন ব্যবস্থা বা মূল্যবোধের প্রতি যদি বৃহত্তর সংখ্যক মানুষের সমর্থন থাকে তাহলে তারা কোন একটি সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে পারে। অমর্ত্য সেন জানিয়েছেন—

“ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিন্তু বিলীয়মান আচারের অভাব করুণভাবে বোধ করা হয়। পুরাতন জীবনধারার বিলুপ্তিতে প্রকটভাবে দুঃখ ও ক্ষতির বোধের উদ্রেক হয়। কোনও প্রাণীর প্রজন্মের বিলুপ্তির সমতুল্য এই পরিস্থিতি। যারা নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে আরও উত্তমরূপে নিজেদের মানাতে সক্ষম এবং নিজেদের বৃদ্ধিসাধন করতে পারে তাদের দ্বারা পুরাতন প্রজন্মের অপসারণ খুবই দুঃখের বিষয় এবং ডারউইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা যে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম তা যথেষ্ট সান্ত্বনার বিষয় নাও হতে পারে।

এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সমাজকে স্থির করতে হবে কী পুরাতন জীবনধারা তারা রক্ষা করতে চায়, এমনকী উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক মূল্য দিয়েও পুরাতন জীবনধারাকে আঁকড়ে থাকা যায় যদি সমাজের ইচ্ছা তাই-ই হয়। ভারসাম্যের প্রশ্ন উঠে, যখন সমাজ কোনও বিষয় বা জীবনধারাকে কী মূল্যে রক্ষা করতে চায়। এর ব্যয়-লাভের বিশ্লেষণের কোনও বাঁধাধরা পদ্ধতি নেই। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল এরূপ মূল্যায়নে জনসাধারণের সবার প্রকাশ্য আলোচনায় মতদানের সুযোগ লাভ। আমরা আবার সেই সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ফিরে আসছি যে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার থাকবে (শুধু ভাগ্যবানদের নয়) এই বিষয় নির্ণয়ের। কোনও পুরাতন জীবনধারাকে বহু মূল্যেও বাঁচিয়ে রাখার কোন বাধ্যতা নেই কিন্তু সামাজিক ন্যায়ের অনুসারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে যাদের জীবনে পরিবর্তন আসবে তাদের মতপ্রকাশের সুযোগ পাওয়া আবশ্যক। তাই পুনরায় মৌলিক সামর্থ্যগুলি বর্ণনা করার প্রয়োজন—প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা সহজ পাঠ ও লেখার ক্ষমতায়, তথ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং অবাধ প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং নির্বাচন ও সাধারণ নাগরিক অধিকারের সাহায্যে মতদানের সুযোগ। এ-ক্ষেত্রেও ব্যাপক অর্থে মানবাধিকারের প্রশ্ন আসে।” [২৪]

রবীন্দ্রনাথ ও মুহাম্মদ ইউনূস :

ভারতবর্ষে নিছক কৃষকদের জন্য আলাদা করে গ্রামীণ কৃষি ব্যাঙ্কের ভাবনা চিন্তা প্রথম শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। একারণে ১৯০৫ সালে পতিসরে প্রথম কৃষিব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষকদের স্বল্প সুদের হারে ঋণ দিয়ে, কখনো বা ঋণ মুকুব করে কৃষকদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের প্রয়াস নেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থের পরিবর্তে ফসলের বিনিময়েও কিন্তু এই ঋণ পরিশোধ করা যেত। রবীন্দ্রনাথের এই প্রয়াসের ফলেই স্থানীয় মহাজনের দল কীভাবে অন্যত্র যেতে বাধ্য হয় তার কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

অনুরূপ এক প্রয়াস চোখে পড়ে বর্তমান বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের মধ্যে। ১৯৮৩ সালের ২রা অক্টোবর ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আত্মপ্রকাশ করে—যদিও প্রকল্প হিসেবে এটির সূত্রপাত তারও বহু পূর্ব থেকে। এই ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র গ্রামের ভূমিহীন মানুষদেরকেই ঋণ প্রদান করে থাকে। যদিও রবীন্দ্রনাথের কৃষিব্যাঙ্ক এবং ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে, তবু উভয়ের লক্ষ্য ও প্রয়াসের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেই মিল-অমিলের দিকগুলিকে নিম্নোক্ত সূত্রাকার বিন্যাস দেওয়া যেতে পারে।

সাদৃশ্য :

ক. মুহাম্মদ ইউনূস এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গড়ে তুলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলেন।

খ. গ্রামের ভূমিহীন কৃষক বা বিত্তহীনদের সুলভ ঋণ প্রদানের দ্বারা ইউনূস এবং রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের বা বিত্তহীন লোকেদের স্থানীয় ভূস্বামী বা মহাজনদের চড়া হারের সুদের জালে বাঁধা পড়ার বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। এর দ্বারা গ্রামীণ অর্থনৈতিক ভিতটিকে উভয়েই শক্ত করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে ইউনূস এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

“ ভূমির মালিকদের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার কারণেই ভূমিহীনরা তাদের প্রভাব বলয়ে আবদ্ধ। ভূ-স্বামীদের কেন্দ্র করে ভূমিহীনদের অর্থনৈতিক জীবন আবহমান কাল ধরে আবর্তিত হচ্ছে। সেই অর্থনৈতিক আবর্তনের পরিমাপে তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা নির্ধারিত হয়ে পড়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ঋণের সহযোগিতায় নিজ নিজ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছেন। নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব-নির্ধারিত নির্ভরশীলতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ

পাচ্ছেন তাঁরা। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার বৃত্ত থেকে সরে আসতে পারলেই অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রভাবও স্তিমিত হয়ে যাবে।”[২৫]

গ. রবীন্দ্রনাথ এবং ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা কেবল দরিদ্র মানুষদের ঋণ প্রদানের দায়িত্ব নিয়েছে, সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য নয়। মুহাম্মদ ইউনূস সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

“গরিব মানুষ তাঁর দক্ষতা এবং পরিশ্রম দিয়ে যে শুধু নিজেই বেঁচে আছে তাই নয়, বরং তাঁর দক্ষতা এবং পরিশ্রমের ফসলে অন্যের গোলাও ভর্তি হচ্ছে। সমগ্র জাতীয় আয়ের একটা বিরাট অংশ সৃষ্টি হয় গরিবের শ্রম ও দক্ষতা দিয়ে। কিন্তু অর্থনীতির পাতায় সেটা সেভাবে স্বীকৃত হয় না। গরিব মানুষ তার উৎপাদন থেকে ন্যায্য অংশ তার নিজের জন্য রাখতে পারেন না। এর বৃহৎ অংশ অন্যের নামে লেখা হয়ে যায়। গরিব মানুষকে জীবন ধারণের জন্য এমন এক নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে হয় যে উপার্জনের ভাগ নিয়ে শক্তিধরদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করার অবকাশ থাকে না। যা পান তা নিয়ে চলার চেষ্টা করেন। তাছাড়া শক্তিধরেরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো চারদিকে এমনভাবে খাড়া করে রেখেছেন, এর মধ্যে প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ গরিবের জন্য নেই। গরিব মানুষ তার চারদিকে যেমন দেখে এসেছেন সেটাকেই জগতের নিয়ম বলে মেনে নিয়েছেন। নিজের অসহায় অবস্থায় তিনি কোন উচ্চবাচ্য না করাই বুদ্ধিমানের পন্থা হিসেবে ধরে নিয়েছেন। গরিব মানুষের কাজ করার সুযোগ নেই। যে ক’দিন গৃহস্থ তাঁকে কাজে খাটাচ্ছেন, শুধু সে ক’দিন তিনি কাজ করতে পারেন। যতটা শ্রম-ঘন্টা তার কাজে মজুত আছে তার একটা ক্ষুদ্র অংশ তিনি প্রকৃত কাজে ব্যয় করতে পারেন। বাকিটা নষ্ট হয়ে যায়। ....কারণ তাঁর কাছে কোনো পুঁজির ভিত নেই।”[২৬]

রবীন্দ্রনাথও ঠিক অনুরূপ কারণেই শিলাইদহ-পতিসর পর্বে এবং শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গড়ে তুলে দরিদ্র প্রজাদের ঋণদানের মাধ্যমে তাদের শ্রমদক্ষতার পূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটাবার প্রয়াস নিয়েছিলেন।

ঘ. কৃষিব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যই হল স্ব-নিযুক্তির দ্বারা দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করা। দেশের ক্রমবর্ধমান জনতাকে সরকারী চাকরি প্রদানের মাধ্যমে যে পুরোপুরি বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না তা বাস্তব সত্য। সেকারণে কর্মসংস্থানের ব্যক্তিগত সুযোগসৃষ্টির দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান আশু জরুরী। এ কথা ইউনূস ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই ভেবেছেন।

ঙ. ঋণ আদায়ের ব্যাপারেও উভয় প্রকার ব্যাঙ্কের একটি অলিক্ষিত হলেও সুনিশ্চিত রীতি-রেওয়াজ ছিল। তবে সেই রীতি আমাদের প্রচলিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

প্রচলিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় বিনা জামানতে ঋণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া ঋণ পরিশোধের কী আর্থিক সক্ষমতা আছে গ্রহীতার সেদিকের উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা ইউনূস তাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় এই পদ্ধতির অনুকরণ করেননি। কৃষিব্যাঙ্কে যে কৃষক বা প্রজাকে ঋণ দেওয়া হত তাকে জমিদারের অধীনেই বসবাস করতে হত। উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ বকেয়া ঋণ হিসেবে পরিশোধ করে বাকি ফসল কৃষক ঘরে নিয়ে যেতে পারতো। কোন কৃষকের ঋণ অনুমোদনের ব্যাপারে কৃষকদের প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত নির্দিষ্ট সমিতিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাঙ্কেও ঋণ দানের ক্ষেত্রে ৯ জন সদস্যের তৈরি কমিটির মধ্যে ৭ জন সদস্য গৃহীত হতেন সাধারণ কৃষক-শ্রমিকদের পক্ষ থেকে। তাঁরা তাদের পরিচিত জনকেই ঋণ অনুমোদন করতেন। সপ্তাহান্তে তাঁরা একত্রে মিলিত হয়ে ঋণের কিস্তি প্রদান করতেন। ফলে জামানত ছাড়া ঋণ দিলেও তার আদায়ে তেমন অসুবিধা দেখা দিত না। ইউনূস এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

" অপার বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছি যে, বিশাল ধসসম্পত্তি নিরাপত্তা হিসেবে গণ্য করে যে ঋণ দেওয়া হয়, তার তুলনায় কোনও জামানত ছাড়া যে ঋণ দেওয়া হয় তার পরিশোধ অনেক বেশি সন্তোষজনক। আমাদের ৯৮ শতাংশ ঋণ যে আমরা ফেরত পাচ্ছি তার একটাই কারণ। গরিব মানুষ জানে এ ছাড়া দারিদ্র্য থেকে রেহাই বা মুক্তি পাবার আর কোনও পথ তাদের সামনে খোলা নেই। তাদের আর কোনও ভরসা নেই। 'একমাত্র সম্বল' ঋণের সঙ্গে ঠকবাজি করলে তারা বাঁচবে কীভাবে ?

অন্যদিকে ধনী জানে আইনের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আছে। আইন তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবে সে ভয় তার নেই। নিম্নস্তরের অবহেলিত জনগণ সর্বদাই সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। তারা ভালো থাকতে চায়, কোনও জটিলতায় জড়াতে চায় না। এ ছাড়া তাদের উপায় নেই।"[২৭]

চ. ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গড়ে তুলে ইউনূস ও রবীন্দ্রনাথ কৃষকের পুঁজিকে বাড়িয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই পুঁজি বা ক্যাপিট্যাল তাদের শ্রমের অপচয়কে রোধ করে আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করেছে। এই লক্ষ্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের স্রষ্টা এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

" পুঁজির ভিত ছাড়া যে দক্ষতা সেটা পুঁজিওয়ালাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল। দক্ষতাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ বা কাজে লাগানোর মতো ভিত যদি গরিবের আয়ত্তে আনা যেত তবে সে তার দক্ষতা পূর্ণ ব্যবহারের দিকে এগুতে পারতো । সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের জন্যে ক্রমাগত সম্পদ ও আয় বৃদ্ধির একটা প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারতো । সম্পদ বৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির ভিত প্রশস্ততর এবং গভীরতর হতো, ফলে দক্ষতার বিনিময়ে উপার্জন আরো বাড়তো।”[২৮]

ছ. উভপ্রকার ব্যাঙ্কই দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে নিয়োজিত হয়ে সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সক্রিয় করে তুলতে চেয়েছে এবং তার সম্পদে তাকেই অধিকার দান করতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এবং ইউনূস উভয়েই তাই মানুষের স্বাধীনতার স্বপক্ষে এবং ব্যক্তির সার্বিক সক্রিয়তার স্বপক্ষে মত দিয়েছেন।

জ. রবীন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপূরক হিসেবে দেখেছেন সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে। ইউনূস ও তার গ্রামীণ ব্যাঙ্কও নিছক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নয়, গৃহনির্মাণের মতো একাধিক ক্ষেত্রে ঋণ দিয়ে কৃষকের সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন করেছেন—যা পরোক্ষত অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামান্তর। ইউনূস সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

“ পাটখড়ি শণ, খড়, গোলপাতা, তালপাতা বা কলাপাতায় ঘের দেয়া একটা আয়োজনের মধ্যে গরিব মানুষকে থাকতে হয়। সে ঘরটি শুধু তার রাত কাটানোর জায়গা নয়, সেটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার কর্মস্থল। বিশেষ করে মহিলাদের কর্মস্থল তো ঘরই। যাঁরা শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করেন তাঁদের তাঁদের জন্যেও ঘর হচ্ছে তাঁদের ‘কারখানা’। ঘরটি মজবুত হলে কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। ঘরটির ভেতরে যদি বৃষ্টির দিনে কাদা হয়ে না থাকে, শান্তিতে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে যদি রাত্রে ঘুমাতে পারে, দিনে কাজ করতে আর গায়ে কষ্ট লাগে না। শীত আর বৃষ্টি থেকে শরীরটা বাঁচিয়ে স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে বৈ কি! আমার দৃষ্টিতে গরিবের জন্য একটা ঘর বিশেষভাবে তার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক হয়।”[২৯]

ঝ. রবীন্দ্রনাথ ও ইউনূস উভয়েই সমাজের সীমাবদ্ধ এলাকায় উন্নয়নের খতিয়ানকে দেশোন্নয়ন বলে মানতে চাননি। বৃহত্তর পল্লীর অধিকাংশ যে সকল মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে তাদের সামগ্রিক উন্নয়নকেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন বলে মনে করেছেন। ইউনূসের মতামত বিষয়ে বহ্নিশিখা দাশ পুরকায়স্থ জানিয়েছেন—

“ উন্নয়ন বলতে সাধারণত যা বোঝানো হয় তা হলো আধুনিক রাস্তাঘাট, বড় বড় অট্টালিকা, সুশোভিত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির আমদানি ইত্যাদি। কিন্তু ড.ইউনূস এগুলোকে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে মানেন না। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের সর্বনিম্ন অবস্থানে যারা জীবনযাপন করে তাদের অবস্থার উন্নতি না হলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে বলা যায় না। ......সুতরাং উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা নিলে নিতে হবে সমাজের সবচেয়ে নিম্ন অর্থনৈতিক স্তরে অবস্থানকারী জনগণের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।”[৩০]

ঞ. রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মযজ্ঞে নারীদের স্বাধিকার ও স্বক্ষমতা দানের জন্য বিবিধ পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলিতে সেগুলি আলোচিত হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কও কিন্তু মহিলাদেরকেই অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছে। ইউনূস জানিয়েছেন—

" পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, সবাইকে আমরা ঋণের সুযোগ দিই। তবে মহিলারাই গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মসূচিতে বেশি উৎসাহী। তাছাড়া মহিলাদের ঋণ দেয়ার ব্যাপারে একটা ভালো দিক হচ্ছে, মহিলারা সংসারের প্রতি যত্নবান বেশি। যে টাকাটা ঋণ নেয় তার থেকে সংসারের উন্নয়নে মহিলারা আয়ের কথাই বেশি করে ভাবেন। মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়ার পেছনে আরেকটি কারণ হচ্ছে তাতে শিশুরা উপকৃত হয়। তাছাড়া পুরুষরা কঠিন কাজে অংশ নিতে পারে। মহিলারা পারে না। আমাদের স্বল্প ঋণ নিয়ে মহিলারা ছোট-খাটো ব্যবসা করে আয় বাড়াতে পারে।"[৩১]

বৈসাদৃশ্য :

ক. পতিসরে রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের স্বার্থে যে ব্যাঙ্ক গড়ে তোলেন তা ছিল তার নিতান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগ। আর্থিক শক্তিতে এই ব্যাঙ্ক অতটা দড় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাই পরবর্তী সময়ে নোবেল পুরস্কার হিসেবে পাওয়া অর্থ এই ব্যাঙ্কে রেখে সেই অভাব কতকটা পূরণ করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। সে কারণে এই ব্যাঙ্কের কার্যকারিতাকে ততটা ছড়িয়ে দেওয়া যায়নি। কিন্তু মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আর্থিক দায়-দায়িত্বের সিংহভাগই সরকার পরিবহন করেছে। প্রাথমিকভাবে ৪০ শতাংশ—এমনকি ৬০ শতাংশ পর্যন্ত আর্থিক দায়দায়িত্ব এমনকি মালিকানা থেকেছে সরকারের হাতে। আর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সর্বশেষ অধ্যাদেশের কথা জানিয়ে ইউনূস লিখেছেন—

" ১৯৮৬ সালে জুলাইতে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশে এক সংশোধনীর ফলে ব্যাংকের মালিকানা বিন্যাসে মৌলিক পরিবর্তন এলো। এই সংশোধনীর ফলে ব্যাংকের ৭৫ শতাংশ মালিকানা এলো ভূমিহীনদের হাতে, বাকি ২৫ শতাংশ মালিকানা থাকবে সরকারের হাতে।"[৩২]

খ. ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক শুধু কৃষির ক্ষেত্রে নয়, পল্লীর অপরাপর ক্ষেত্রেও ঋণ প্রদান করে থাকে। বলা যায় গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে সহায়ক যে কোন ক্ষুদ্র প্রকল্পেই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৃষিব্যাঙ্ক মুখ্যতঃ কৃষিক্ষেত্রে ঋণদানের উপর জোর দিতে চেয়েছে।

গ. কৃষিব্যাঙ্কের পরিধি ছিল দেশীয় ক্ষেত্রেই সীমায়িত। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রসার ও বিস্তার আজকের দিনে সারা বিশ্বজুড়ে প্রায়। ইউনূস জানিয়েছেন—" ...ইতিমধ্যে বিশ্বের

বিভিন্ন দেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মডেলে কাজ শুরু করেছে। যে সমস্ত দেশে এ মডেলে কাজ চলছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, এশিয়ার ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি। আফ্রিকাতে কেনিয়া, নাইজেরিয়া, সাউথ আফ্রিকা, গিনি, টোগো, মালি, তানজানিয়া প্রভৃতি। ল্যাটিন আমেরিকায় কলম্বিয়া, বলিভিয়া, চিলি, মেক্সিকো, পেরু, হন্ডুরাস প্রভৃতি। উত্তর আমেরিকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা এবং ইউরোপে ফ্রান্স। ইউরোপের পোল্যান্ডেও প্রস্তুতি চলছে।"[৩৩] বর্তমানে ভারতবর্ষেও এই ব্যাঙ্কের শাখাবিস্তার ঘটছে। পশ্চিমবঙ্গে বন্ধন ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক শাখা প্রতিষ্ঠা এরই দৃষ্টান্ত বহন করে।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন উদ্যোগ : সাফল্য ও ব্যর্থতার নানা দিক

রবীন্দ্রনাথ আজীবন দেশের সামনে আদর্শ গ্রামপরিকল্পনা বা দেশোন্নয়নের এক আদর্শ খাড়া করতে চেয়েছিলেন । তাঁর চিন্তাভাবনার বাস্তব বৈজ্ঞানিক দিকটির ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় বিশ্বের তাবৎ বিশিষ্ট ও মহান অর্থনীতিবিদদের চিন্তার সঙ্গে তাঁর ভাবনার সাযুজ্য থেকে। সে যে কেবল 'কবির আইডিয়া' হয়ে থাকেনি, সে কাজে অগ্রসর হয়ে তিনি যে সফলতাও লাভ করেছিলেন, তা পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলিতেই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নির্মল গ্রাম-পরিকল্পনা, আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তির ব্যবহার, নিত্য নতুন কৃষি-গবেষণার ব্যবস্থাকরণ, আধুনিক মানের ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা, সমবায় ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর প্রদান, কৃষিব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন, গ্রামীণ কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবন প্রয়াস, গ্রামগুলির নবীন বিন্যাস রচনা, মণ্ডলী প্রথার প্রবর্তন, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংস্কার, সাংকৃতিক উজ্জীবনের দ্বারা সামাজিক ও নৈতিক মানোন্নয়নের প্রয়াস পল্লীজীবনের বাস্তব প্রতিবেশের নিরিখেই গড়ে তোলা বিবিধ কর্মোদ্যোগ। পল্লীর অধিকাংশ দরিদ্র মানুষের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতা গড়ে উঠেছিল ব্যাপকভাবে।

তাঁর গৃহীত কর্মপরিকল্পনার অনেকগুলিই স্বাধীন ভারতবর্ষের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহীত হয়েছে। অথচ আজকের দিনেও দেখা যায় একদল তথাকথিত সমালোচকের দল রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যর্থতার দিকটিকেই অধিকতর চড়া রঙে রূপ দিতে চান। আসলে রবীন্দ্রনাথের গৃহীত পরিকল্পনাগুলির স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। তাঁর উন্নয়ন উদ্যোগ হয়তো সেইভাবে স্থায়ী রূপ নিতে পারেনি। এর পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল তখনকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার নানা প্রতিকূলতা, পরাধীন ভারতবর্ষ এবং স্বাধীনতা-উত্তর আমাদের দেশের নয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। শিলাইদহ-পতিসর এবং

শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন উদ্যোগ রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় সাফল্যের বড়ো মুখ দেখেছিল। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই কেন তা ব্যর্থতার গহ্বরে তলিয়ে গেল সে বিষয়েও বিরোধী সমালোচকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত জরুরী। সে কি কেবল রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা বা ভাবনার ত্রুটি নাকি আমাদের সমাজ ও তার বিশেষ মানসিকতারই ফলপরিণাম—তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। যে কোন পরিকল্পনারই কিছু সাফল্য ও ব্যর্থতার দিক থাকে। রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণে তার ব্যর্থতার নিহিত কারণগুলির অনুসন্ধান সর্বাগ্রে জরুরী।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন উদ্যোগ : ব্যর্থতার কারণ

১. যে কোন একটি পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে যে জিনিসটির প্রয়োজন তা হল দক্ষ কর্মীর সহজলভ্যতা। রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র নিবেদিত প্রাণ কর্মী সম্মিলিত হয়েছিলেন। সন্তোষচন্দ্র, রথীন্দ্রনাথ, এল্মহার্স্ট, অতুলচন্দ্র সেন, কালীচরণ ঘোষের মত নিবেদিত-প্রাণ কর্মীর সংখ্যা ছিল সীমিত। ফলে তাঁর দুই পর্বের পল্লীউন্নয়ন কর্মযজ্ঞের বিপুল কর্মোদ্যোগকে ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে নানা ত্রুটি ঘটে গেছে। এই ত্রুটিগুলিই ক্রমেই পুরো ব্যবস্থাটিকে মন্থর করে দেয়।

২. পরাধীন ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠন উদ্যোগ ছিল তাঁর দেশাত্মবোধেরই পরোক্ষ এক অভিব্যক্তি। স্বাদেশিকতার বন্যায় রবীন্দ্রনাথও ভেসেছেন। স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবনে তিনি নানা উদ্যোগ নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই গঠনমূলক উদ্যোগকে তৎকালীন বিদেশী সরকার, পুলিশ-প্রশাসন সন্দেহের চোখে দেখেছে। অতুলচন্দ্রের মতো একাধিক কর্মীকে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্তরীন করে রাখার ফলে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মযজ্ঞ অনেকক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যায়।

৩. রবীন্দ্রনাথ পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী থেকেই দেশের প্রাণকেন্দ্র পল্লীকে জাগিয়ে তোলার জন্য দেশনেতাদের পাশাপাশি দেশের জমিদার সম্প্রদায়কে উদ্যোগী হতে বলে এসেছেন। কিন্তু তাতে সাড়া তো দূরের কথা প্রতিবেশী জমিদারদের বিরোধিতা এবং চক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নলডাঙার রাজার কীর্তিকলাপ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

জমিদারী ব্যবস্থার মধ্যেকার বেশকিছু সুবিধাভোগী ব্যক্তি এবং কর্মচারীর বিরোধিতাও রবীন্দ্রনাথের কর্মপরিকল্পনার রূপায়ণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা গোপনে মহাজন এবং পার্শ্ববর্তী জমিদারদের সঙ্গে যোগসাজশে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ ও তার পরিকল্পনাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল তার একটি বিবরণ দিয়ে ‘রবীন্দ্রনাথের পল্লীভাবনার প্রাসঙ্গিকতা’

গ্রন্থে গীতিকণ্ঠ মজুমদার জানিয়েছেন, পতিসর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সুখ্যাতি ঘটলেও বেশ কয়েক বছর সুন্দর ভাবে চলার পর ব্যাঙ্কের অবনতি ঘটতে থাকে। মানুষের মধ্যে দায়িত্ব বোধ কমে যাওয়ায় ব্যাঙ্কের টাকা আদায় কমতে থাকে। সে সময় যে সমস্ত কর্মী ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের অসহযোগিতার জন্য ব্যাঙ্কের কাজে নানা অসঙ্গতি দেখা দেয়। বিশেষ করে কর্মীদের সঙ্গে মহাজনদের গোপনে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তারা রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে বিসর্জন দেয়। অন্যদিকে আমানতকারীরা টাকার জন্য রবীন্দ্রনাথের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এমনকি তারা রবীন্দ্রনাথকে কোর্টে পর্যন্ত তোলে। এরই প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের ব্যাঙ্ক পরিষেবা ব্যাহত হয় । এরপর সরকার Rural Indebtness আইন প্রবর্তন করায় ব্যাঙ্ক তুলে দিতে হয়। এতে ঋণীরা রবীন্দ্রনাথের বহু টাকা আত্মসাৎ করে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ নানা কাজে অনেক সময়েই জমিদারী এলাকায় থাকতে পারেননি। অনেকসময় তার সুযোগ নিয়ে বিরোধী কাজকর্ম চালিয়ে গেছে প্রতিপক্ষের লোকেরা।

৪. রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ শিলাইদহ-পতিসরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও পরবর্তীকালে ঠাকুরবাড়ির জমিদারী এলাকার মালিকানা নিয়ে শরিকী সমস্যা দেখা দেয়। সুরেন্দ্রনাথ শিলাইদহের জমিদারি এলাকা দাবি করে বসায় রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিলাইদহ হাতছাড়া হয়ে যায়। তাঁর সকল কর্মোদ্যোগও স্তিমিত হয়ে পড়ে। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে নতুন কর্মোদ্যোগ নিতে হয়। বোলপুরের সিংহ পরিবারের থেকে জমি কিনে নতুনভাবে উদ্যোগ গ্রহণে অনেক সময় ও অর্থের অপচয় ঘটে।

৫. স্বাধীনতার পর শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করে। এই অধিগ্রহণকালে দুই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনগত সংবিধানে যে যে সকল পরিবর্তন আনা হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক হল শ্রীনিকেতনকে রাষ্ট্রীয়-প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে এনে গ্রামোন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ। গ্রামের সকল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সমাজকে বিশিষ্ট করে গড়ে তোলার যে উদ্যোগ রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন, রাজনৈতিক বা সামাজিক জীবনের নবীন নির্মাণের দ্বারা নৈতিকতা ও সামাজিকতার মূল্যবোধকে একটি বিশেষ খাতে পরিবাহিত করার যে প্রয়াস নিয়েছিলেন তা ব্যর্থ হয়। এই লক্ষ্যচ্যুতি শ্রীনিকেতনকেও তার লক্ষ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়—যা তার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

৬. স্বাধীনতার পর শ্রীনিকেতনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের ফলে মানুষ ও সমাজ গৌন হয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠানই প্রাধান্য পেতে থাকে। ফলে সাঁওতাল বা হরিজন সম্প্রদায়ের মত প্রান্তিক মানুষদের উন্নয়নের উদ্যোগ হারিয়ে যায়। প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ প্রাধান্য লাভের ফলে আমলাতান্ত্রিকতা প্রাধান্য পায়। এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের স্বার্থেই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতে থাকে। সমাজে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে,

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বা অসামঞ্জস্যও প্রকট হয়। এই সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের মধ্যেকার ত্রুটিগুলির নিরিখে সমস্যা-অতিক্রমী পথ অনুসন্ধানের ঐতিহ্য থেকে শ্রীনিকেতন সরে আসে। ফলে রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন উদ্যোগের প্রধান এই স্তম্ভটি পতনের দিকে এগিয়ে যায়।

৭. রবীন্দ্রনাথ ও এল্‌মহার্স্ট চেয়েছিলেন শিলাইদহ কিংবা শ্রীনিকেতনের কৃষি-গবেষণাগার গ্রামোন্নয়ন সমস্যাগুলির সমাধান ও নতুন নতুন প্রয়োগমূলক পরীক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবে। কিন্তু শিলাইদহ ছাড়ার পর শিলাইদহের ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগারের হালও শোচনীয় হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের দায়িত্বে আসায় শিলাইদহের কাজে ব্যাঘাত ঘটে। শ্রীনিকেতনও গবেষণা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জায়গা ছেড়ে প্রশিক্ষণ দানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ফলে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গ্রামোন্নয়নের উদ্যোগ ব্যর্থতার অভিমুখে পথ হাঁটে। এরই পরিচয় দিতে গিয়ে দীক্ষিত সিংহ জানিয়েছেন—

“ তিনটি ভিন্ন ধরণের শিক্ষাক্রম এখানে শুরু করা হয়—ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত সমষ্টি উন্নয়নের কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় গ্রামকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানে তিন বছরের ডিপ্লোমা ও দু-বছরের কৃষি বিষয়ে শিক্ষাক্রমের পঠনপাঠন। তা ছাড়া ভারত সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রামকর্মী, গ্রামসেবক ও গ্রামসেবিকাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে সমাজবিজ্ঞান (Institute of Social Science) বিভাগ রূপান্তরিত হয় সমাজকর্ম (Social Work) বিভাগে ও কৃষিবিষয়ক পাঠক্রম পুরোপুরি কৃষিবিজ্ঞান বিভাগ বা পল্লিশিক্ষা সদনে পরিণত হয়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে পল্লিচর্চা-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ......ভাবা হয়েছিল, এটি প্রধানত পল্লি সম্প্রসারণ কেন্দ্রের (পল্লিসেবা বিভাগের পরিবর্তিত নাম) জন্য গ্রামসমীক্ষা, বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের সমস্যা, গ্রামের আর্থ-সামাজিক সমস্যা, ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের সম্বন্ধে গবেষণা করবে। অর্থাৎ পল্লিচর্চাকে ভাবা হয়েছিল পল্লি সম্প্রসারণে কেন্দ্রের গ্রামের কাজের পরিপূরক হিসেবে। কিন্তু যে ধারা শ্রীনিকেতনে শুরু করা হয়েছিল তার সঙ্গে সংগতি রাখতে পল্লিচর্চাকে প্রথমে সমাজবিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণা বিভাগে পরে তা-ও বাতিল করে পুরোপুরি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয় যেখানে পল্লিউন্নয়নে ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে উপাধি দেওয়ার ব্যবস্থা শুরু হয়।”[৩৪]

৮. স্বাধীনতার পর যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তাতে কমিউনিটি ডেভ্‌লপমেন্টের ক্ষেত্রে গ্রামগুলিকে পরিকল্পনা রচনা ও তার প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হবে বলা হলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে সে অধিকার প্রদত্ত হয়নি। ফলে সমষ্টি উন্নয়ন এভাবে সমাজ-কাঠামোর উপর থেকে পরিচালিত একটি বাহ্যিক কর্মপরিকল্পনা হয়ে দাঁড়ায়। কেন্দ্রীয় অধিগ্রহণের ফলে শ্রীনিকেতনও এই পরিকল্পনার আওতাভুক্ত হয়ে পড়ায় তা

সমাজ ও পল্লীর উন্নয়নকে ভেতর থেকে সমগ্রভাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য থেকে সরে যায়। নিছক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তা ধীরে ধীরে বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে।

৯. রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনকে মূলতঃ পল্লীউন্নয়নের লক্ষ্যে সহায়ককারী একটি শিক্ষাবিভাগ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ায় পল্লীউন্নয়নের বৃহত্তর লক্ষ্য থেকে সরে আসে। ফলে কেবল পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করার পূর্বে পল্লীউন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তার কাজের এলাকা স্বতন্ত্র করা ছিল। কিন্তু ১৯৫১ তে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের পর এর সংবিধানে শ্রীনিকেতনকে স্বতন্ত্র কোন বিভাগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি এবং তার কাজের ক্ষেত্রটিকেও নির্দিষ্ট করা হয়নি। এর ফলে পল্লীউন্নয়নের কর্মসূচী বা উদ্যোগটাই সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হয়। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন উদ্যোগ যে সমাজে স্থায়ী ছাপ রাখতে পারেনি এটিও তার একটি বড় কারণ।

১০. ১৯২৩-এর পর শ্রীনিকেতনের প্রাণপুরুষ লিওনার্দ নাইট এলম্‌হার্স্ট রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্বভ্রমণে যান। ফলে শ্রীনিকেতনের পরিচালনব্যবস্থায় নেতৃত্বের সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া শ্রীনিকেতনের কাজের অভিমুখ নিয়েও একটি দ্বন্দ্ব প্রথমাবধি থেকে গেছিল। পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনার পাশাপাশি ব্যবসায়িক দিক থেকে যাতে এই বিভাগটি সফল হতে পারে তার প্রয়াস জারি ছিল। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৩৭-এ শিল্পভবনকে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এতে শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কাজের যে সামঞ্জস্য ছিল তাও নষ্ট হয়ে যায়। পল্লীসেবা না পল্লীসংগঠন—এই নামটিকেই তুলে দেওয়া হয়। তাছাড়া অধিগ্রহণ পর্বে এতে বেশ কয়েকটি নতুন বিভাগ গড়ে তোলা হয়। বিভাগগুলি হল বিদ্যাভবন, কলাভবন, সংগীতভবন, পাঠভবন, রবীন্দ্রভবন, শিক্ষাভবন ও বিনয়ভবন। এই বিভাগগুলির মধ্যে অনৈক্য রবীন্দ্রনাথের উন্নয়নের পরিকল্পনাকে স্তিমিত করে দেয়।

১১. শ্রীনিকেতনে পল্লীউন্নয়নে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বাদেশিকতাবোধ কাজ করেছিল। দেশকে এবং সমাজকে সমস্ত প্রকার দুর্বলতা ও প্রতিবন্ধকতা থেকে রক্ষা করার জন্য পল্লীকে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠা দিতে হবে—এই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে মতবিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে । স্বাধীনতার পর এই স্বাদেশিকতাবোধই উধাও হয়ে যায়। যে স্বাদেশিকতাবোধ কর্মীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, দুঃখবরণ ও সমাজকল্যাণে প্ররোচিত করতো তার নিতান্ত অভাবে রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর সামাজিক প্রগতির রথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। হেমন্তকুমার সরকার তাই জানিয়েছেন—“ village work এর ভাবনা ও দায়িত্ব আজ আর শ্রীনিকেতনের সকল কর্মীর নয়, তাহা এখন ৩/4 জন কর্মীর উপর ন্যস্ত।”[৩৫]

১২. স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শ্রীনিকেতনের কাজের ক্ষেত্র অনেক প্রসার লাভ করে। কিন্তু সেই অনুপাতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোবৃদ্ধির কোনো প্রয়াস নেওয়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন একটি বা দুটি আদর্শ গ্রাম-সংগঠনের দ্বারা সারা দেশের সামনে একটি আদর্শ প্রস্তুত করতে। কিন্তু সেই আদর্শ থেকে সরে গিয়ে প্রায় ১৮০ টি গ্রামে শ্রীনিকেতনের কার্যধারা প্রসারিত হয়। এই বিপুল কর্মব্যাপ্তির অনুকূল পরিকাঠামো গড়ে তুলতে না পারায় রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

১৩. ব্রতী বালকদল রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মযজ্ঞে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু অধিগ্রহণের পর ব্রতীদলের কর্মধারায় অনেক পরিবর্তন ঘটানো হয়। একদা গ্রামসংগঠনে ও গ্রামের মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সংস্কারে যে ব্রতী বালকদলের একটি বড় ভূমিকা ছিল তাদের কার্যধারাকে সীমায়িত করে দেওয়া হয়। কেবল ব্যক্তিচরিত্রের মানোন্নয়নে তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ায় রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন উদ্যোগ স্তিমিত হয়ে পড়ে।

১৪. শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা-বিষয়ক যে চারটি উপ-বিভাগ গড়ে তোলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শিক্ষাসত্র বিভাগ। গ্রামের দীন-দরিদ্র শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করতো। শিক্ষার্থীদের পল্লীসংগঠনের শিক্ষায় দক্ষ করে তুলে পল্লীর নানা গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করা হত। তাদের জন্য স্বতন্ত্র বৃত্তিরও বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণের পর শিক্ষাসত্রকেও এই আদর্শ থেকে সরে যেতে হয়। গ্রামের দীন-দরিদ্র শিক্ষার্থীদের তুলনায় গ্রামের ক্ষমতাবান বিত্তবান বা শহুরে বিত্তবান শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানে স্থান পেতে শুরু করে। ১৯৫৩ থেকে এটি পাকাপাকিভাবে সরকারী অনুদান গ্রহণকারী কারিগরী শিক্ষাদানে সক্ষম উচ্চ গ্রামীণ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ফলে রবীন্দ্রনাথের পল্লী পুনর্গঠন উদ্যোগ পাকাপাকিভাবে স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

১৫. রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন উদ্যোগ ছিল পরাধীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ-ব্যতিরেকে সামান্য কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী-সহযোগে গড়ে ওঠা এক ব্যক্তিগত প্রয়াস। সরকারী সাহায্যের অভাব, কোনো ক্ষেত্রে বিরোধিতা পরিকল্পনাটির রূপায়ণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার বিকাশে ও সফলতার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বভারতীকে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অর্থের সন্ধানে মাসের পড় মাস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়। তার এই অনুপস্থিতি যেমন পল্লীপুনর্গঠন উদ্যোগকে শিথিল করে দেয় তেমনি বিশ্বভারতীকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে পল্লীউন্নয়ন উদ্যোগও স্তিমিত হয়ে পড়ে।

১৬. রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন-উদ্যোগ নিছক অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়নি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে এক আদর্শ গ্রাম-সমাজ গড়ে তোলাই রবীন্দ্রনাথের কাছে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ-শাসিত পরাধীন এই দেশের ক্ষয়িষ্ণু আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেই মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সাম্যের সংরক্ষণ বা পুনরুজ্জীবন ছিল অত্যন্ত কঠিন এক কাজ। বিশেষ করে ভারতবর্ষীয় গ্রাম-সমাজ শোষণ-পীড়নে বঞ্চনায়-দারিদ্র্যে যে অব্যবস্থিত পরিস্থিতির মধ্যে ছিল তাতে মূল্যবোধের কিংবা নৈতিকতার সংরক্ষণ, সাম্যের আদর্শপ্রতিষ্ঠার মতো সামাজিক উদ্যোগ ছিল অত্যন্ত কঠিন এক চ্যালেঞ্জও বটে। কেননা উন্ন্যনের সঙ্গে এই আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তার জন্য যে সময় শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন ছিল সেই তুলনায় আয়োজন ছিল যৎসামান্য। তাছাড়া জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা ও আচারসর্বস্ব ধর্মের অন্ধ নিগড়ে বাঁধা এদেশের পল্লীর মানুষকে সংঘবদ্ধ করা এবং তাদের দিয়ে স্বায়ত্ত্বশাসিত গ্রামপরিকল্পনা যে কত কঠিন এক সামাজিক উদ্যোগ ছিল তা আজকের দিনেও এক পরীক্ষিত সত্য। স্বল্প কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মীসহযোগে রবীন্দ্রনাথের একক প্রয়াস তাই সমাজজীবনে স্থায়ী দাগ কাটতে অসমর্থ হয়।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনা : বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন বা দেশোন্নয়ন উদ্যোগ যে নানা কারণে স্থায়ী সাফল্য পায়নি পূর্বোক্ত আলোচনায় তা দেখানো হয়েছে। কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু বিস্মিত হতে হয় যখন বরিষ্ঠ কোন সমালোচক এমনতর মন্তব্য করেন—

“ আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়াসে তাঁর চিন্তাভাবনা বিশেষ ছাপ রাখেনি। ‘কম্যুনিটি প্রজেক্ট’ রূপায়ণে রবীন্দ্রচিন্তার কিছু ছাপ হয়তো মিলতে পারে। কিন্তু তিনি যে কয়েকটি গ্রামকে মুক্তি দিয়ে সমগ্র ভারতের ছোটো আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তা অনুসৃত হয়নি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন প্রতিটি গ্রাম যদি এইভাবে মুক্তি পায় তাহলে সামগ্রিক অর্থনীতির এক বিরাট রূপান্তর ঘটবে। এটিও হয়তো এক ধরণের Utopian চিন্তাধারার নিদর্শন। তিনি শ্রীনিকেতনে যা করেছিলেন সারা দেশ জুড়ে তা হয়নি। সমবায় নীতির প্রসার ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। সমবায়ভিত্তিক

উৎপাদনকে তিনি পূর্ণ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ বলে মনে করেননি। আমাদের শিল্পায়নের মূলেও তাঁর চিন্তার প্রভাব ক্ষীণ, ...অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পিত ব্যবস্থার বৃহৎ সম্ভাবনা তিনি উপলব্ধি করেননি যদিও রাশিয়া ভ্রমণের সময়ে রাষ্ট্র-প্রয়াসের বিপুল বিস্তার তিনি দেখেছিলেন।"[৩৬]

পরিকল্পনা রূপায়ণে পরিকাঠামোর অভাব আর রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে যা স্থায়ী রূপ পেতে পারেনি তাকে ব্যর্থ বলে ঘোষণা করা ঠিক নয়। স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়াসে তাঁর ভাবনা কতটা ছাপ রেখেছে পূর্বোক্ত আলোচনা তার সাক্ষ্য দেবে। আর রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে স্বাধীন ভারত কেন অনুসরণ করেনি তার দায়ও রবীন্দ্রনাথের নয়। স্বাধীন ভারত রবীন্দ্রনাথের বাইরে গিয়ে যে উন্নয়ন করতে চেয়েছে তাতে উন্নয়ন ঠিক কতটুকু হয়েছে, দারিদ্র্যমুক্তি কতটুকু ঘটেছে তার পরিসংখ্যান নিলেই স্পষ্ট হবে বিষয়টি—

" ....উৎসা পট্টনায়ক একটা হিসাব কষেছেন। গ্রাম-ভারতে ১৯৭৩-৭৪ সালে ৫৬.৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করতেন। ১৯৮৩ সালে অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত (৫৬ শতাংশ) ১৯৯৩ সালে অবস্থা খারাপ—৫৮.৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে। ২০০৪ সালে অবস্থা আরও খারাপ—৫৯.৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য কবলিত। ২০০৯-১০ সালে অবস্থা শোচনীয়—৭৬ শতাংশ মানুষ দৈনিক ২২০০ ক্যালরিযুক্ত খাদ্যসংস্থান করতে অপারগ। অর্থাৎ দারিদ্র্য বাড়ছে।

শহর-ভারতের অবস্থাটা কীরকম? ১৯৭৩-৭৪ সালে ৬০ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে। ১৯৮৩ সালে ৫৮.৫ শতাংশ, ১৯৯৩-৯৪ সালে ৫৭ শতাংশ, ২০০৪-০৫ সালে ভারতের শহুরে দারিদ্র্য অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ৭৩ শতাংশে পৌঁছেছে। আমরা অর্থনৈতিক বাধামুক্তির দশক বলছি, সেইসময় ভারতের গ্রাম ও শহরে দারিদ্র্য বেড়েছে সবচেয়ে বেশি হারে। অর্থনৈতিক প্রগতি ও দারিদ্র্যের বৃদ্ধি একসঙ্গে, হাতে হাত ধরে চলেছে।"[৩৭]

রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠনের অন্যতম হাতিয়ার স্বদেশী-সমাজ বা গ্রাম-সমাজ কতটা আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক আর কতটা Utopian তা পরে আলোচিত হয়েছে। সমবায় ব্যবস্থা পরিকাঠামো বা সরকারী সদিচ্ছার অভাবেই যে বেহাল অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে তাও পরে আলোচনায় দেখানো হয়েছে। শ্রীনিকেতনের উন্নয়নের মডেল অনুসরণ করেই যে আমাদের দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখাকে অনেকাংশে গড়ে তোলা হয়েছে তা পূর্বোক্ত আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে রবীন্দ্র-মূল্যায়ণে যে

সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয় তাই-ই যে এ জাতীয় মন্তব্যের উৎসমূল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রবীন্দ্রনাথের উন্নয়ন পরিকল্পনার যে একটি অলিখিত বৈজ্ঞানিক বা তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল তা পূর্বে বিশ্বের তাবৎ অর্থনীতিবিদদের উন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে সাদৃশ্যসূত্রে দেখানো হয়েছে। বিশ্বের একাধিক অর্থনৈতিক চিন্তাবিদের নামোল্লেখ করা যায় যাঁরা তাদের অর্থনৈতিক ভাবনাচিন্তার কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকলেও তাঁদের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা প্রয়োগগত সার্থকতা লাভ করেনি। টলস্টয়ই তার বড় দৃষ্টান্ত। আধুনিক বিশ্বে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই প্রকৃত উন্নয়নের পরিভাষা প্রদান করা হয় না। পুঁজিবাদী উদার অর্থনীতি আজকের দিনে যে উন্নয়নকে উন্নয়ন হিসেবে বিবেচনা করছে তা ব্যাপক অর্থে সামাজিক উন্নয়ন আনতে পারছে না। সমাজ-জীবনের স্বার্থে, মানুষের সুখ ও শান্তির লক্ষ্যে মূল্যবোধ তথা নৈতিকতার সংরক্ষণের উপযোগী কোন অর্থনৈতিক ভাবনার অনুসন্ধানে তাই আমাদের মুখ ফেরাতেই হয় রবীন্দ্রনাথের দিকে। রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন অবশ্যম্ভাবী ভাবেই। এই প্রাসঙ্গিকতার দিকগুলিকে নিম্নোক্ত বিন্যাস দেওয়া চলে—

১. রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-বৃত্তের বাইরে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ গঠনের এক আন্তরিক প্রয়াস ছিল। ‘স্বদেশী সমাজ’ পরিকল্পনা তারই পরিচয়বাহী। আজকের ধনতন্ত্র-শাসিত সমাজে রাষ্ট্রক্ষমতার দুর্বৃত্তায়নের শেষ নেই। ক্ষমতার এই দুর্বৃত্তায়ন থেকে দেশকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ একদা রাষ্ট্রের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে জানিয়েছিলেন। “তাঁর বিবেচনায় যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য নিয়েই টানা থাকবে রাষ্ট্রক্ষমতার চৌহদ্দি। তাই হল সার্বভৌমত্বের প্রধান অবলম্বন। ভারত ইতিহাসের পরম্পরায় তেমন নজিরকে গুরুত্ব দেন রবীন্দ্রনাথ। তার অতিরিক্ত যত বাড়বে প্রশাসনের প্রতিপত্তি ততই ঘনিয়ে উঠবে সামাজিক অকর্মণ্যতা। ক্ষমতাক্লিষ্ট লালন পীড়নের ঘষামাজায় দেশের মানুষ হবে থোবড়ানো ক্রীড়নকের মতো নিরুপায়।”[৩৮]

আজকের দিনে কেবল আমাদের দেশে নয় সারা পৃথিবীর জুড়ে গণতন্ত্রেও চলেছে ক্ষমতার একচ্ছত্রীকরণ। রাষ্ট্র, প্রশাসন, সরকারী বিভাগ, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দলের ক্ষমতার বহুমুখী চাপে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিলুপ্তপ্রায়। স্বাধীন নাগরিক তো আমাদের দেশে আজকের দিনে গণতান্ত্রিক প্রয়োগের স্বার্থে ভোট দিতে বাড়ি থেকে বেরোতেই ভয় করে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আর ক্ষমতার দুর্বৃত্তায়ন আজকের দিনে মানুষের মৌলিক অধিকাগুলিকেও ছিনিয়ে নিচ্ছে। বৃহত্তর সমাজ হচ্ছে উপেক্ষিত। অথচ মানুষের বিবিধ স্বাধীনতা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে কতটা উপযোগী তা মার্কস থেকে একালের অমর্ত্য সেন বা মুহাম্মদ ইউনূসের মতো অর্থনীতিবিদরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

আবার মার্কসীয় চিন্তাসূত্রকে অবলম্বন করে যদি এর বিপরীতে বিরোধী জনসংঘ বা গোষ্ঠীকে গড়ে তোলার কথা ভাবা যায় তাও যে ক্ষমতার প্রতাপকে অতিক্রম করে গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আজ যা সংঘ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হবে শক্তিসঞ্চয়ে তাই-ই আবার ক্ষমতার বলয়ে পরিণত হবে। 'কালের যাত্রা'র মত নাটকে একারণেই তিনি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সভ্যতার নবীন রথযাত্রার ছবি আঁকলেও কোন একদিন যে 'উল্টোরথের পালা' আসবে না এমন সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেননি। 'রক্তকরবী' রাজার বিরুদ্ধে সংগঠিত বৈপ্লবিক শ্রেণী-অভ্যুত্থানকে রবীন্দ্রনাথ যে সংঘাত-অতিক্রমী একটি সমন্বয়ের পথে নিয়ে যান তার পিছনেও লুকিয়ে থাকে এই গূঢ় সামাজিক সংকেত-সূত্রটি। মার্কসের ভাবনার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের উন্নয়নের মডেলটি তাই অনেকাংশে মানবিক এবং যক্তিনির্ভরও বটে। তাই বরিষ্ঠ সমালোচক জানান—

" রাষ্ট্রের বাইরের যে সমাজ সেটার গুরুত্ব কমালে আসে এক অন্য ধরনের উন্নয়ন মডেল, উন্নয়ন যেখানে রাষ্ট্রনির্ভর। এই ধরনের মডেলের প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। এককথায় বললে, উন্নয়নের নামে বিকল্প মডেলে রাষ্ট্র প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে, গণউদ্যোগ স্তিমিত হয়, উন্নয়নের গণমুখী চরিত্র হারিয়ে যেতে থাকে এবং অবশেষে উন্নয়নই স্তব্ধ হয়ে পড়ে। সোভিয়েত মডেলের ব্যর্থতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রের বিপরীতে নাগরিকদের নিজস্ব উদ্যোগের গুরুত্ব তাই অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-সমাজ ভিত্তিক উদ্যোগ, যে উদ্যোগে রাষ্ট্রের ভূমিকা গৌণ—তার প্রাসঙ্গিকতা তাই আজও গুরুত্বপূর্ণ।"[৩৯]

২. আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি বড় ত্রুটি হল পুঁজিশাসিত জীবনের বহুমাত্রিক অপহ্নব। এই পুঁজিশাসিত জীবন আমাদের প্রাত্যহিকতাকে একটি সুনির্দিষ্ট ছাঁচে বেঁধে ফেলছে। জীবনের গতানুগতিকতা জন্ম দিচ্ছে নানা মরবিড্ চেতনার। তার অলিতে গলিতে হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা, কল্পনা আর অনুভূতির সূক্ষ্ম তন্তুগুলি, মানবিকতাবোধের মতো মহার্ঘ জিনিষগুলি। মানুষ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তার পূর্বতন জীবনের শ্রী-স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে। সংখ্যাগরিষ্ঠের জনমতের ভিত্তিতে এমন জীবনকে বহুমূল্যে টিকিয়ে রাখার অধিকারের স্বপক্ষে সওয়াল করেছেন অমর্ত্য সেনও । ক্ষমতার দুর্বৃত্তায়ন ও সম্পদের বিষম বন্টন গড়ে তুলছে ধনী-দরিদ্র, ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাহীনের লক্ষযোজন ফাঁক। সমাজ, জাতি সেদিনের মতো আজও তাই আত্মবিচ্ছিন্নতার অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়।

রবীন্দ্রনাথ একারণেই প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম প্রথায় ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ সার্বজনীন কল্যাণের আদর্শে পরিচালিত সমাজকেই আদর্শ সমাজ হিসেবে মানতেন। ধর্ম বলতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত প্রতীতিতে মানুষের ধর্মকেই বুঝিয়েছেন। নৈতিক প্রেরণাই সেখানে সামাজিক ঐক্যের নিয়ন্ত্রক ছিল। এর বিপরীতে ব্যক্তির স্বতন্ত্র-স্বার্থবিলাসী

প্রতিযোগী যে ক্ষমতাতন্ত্র তাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রেরণায় গড়ে ওঠা ব্যবস্থাভার বলে চিহ্নিত করেছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এমন এক সমাজব্যবস্থা যেখানে গণতান্ত্রিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করে পুঁজির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। এই কারণে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক শিল্পপ্রদর্শনীর জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত মুনাফা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বোঝা যায়—" উৎপাদন এবং সম্পদ বৃদ্ধিতে সকলের কল্যাণ না হলে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি। অর্থনীতির কেতাবি ভাষায় বলেন নি রবীন্দ্রনাথ। তবে বোঝা যায় যে আর্থিক উদ্বৃত্তের (economic surplus) নিয়োজনে সার্বজনিক স্বার্থের বিবেচনাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিতে চান। সেখানেই তাঁর কাছে ধরা পড়ে উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকানার বড়ো দোষ।"[৪০]

প্রশাসনিকতা বা প্রাতিষ্ঠানিকতাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে গড়ে তোলা সামাজিক ব্যবস্থার মাধ্যমেও যে সমাজের উন্নয়ন আসতে পারে না সেকথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। পল্লীপ্রধান পরাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি-শিল্প ইত্যাদি বিষয়ের সুষম বিকাশ বা উন্নয়নের জন্য সমবায়ের অপরিহার্যতার উপর জোর দিয়েছেন এ-কারণেই। আর সমবায় ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতো প্রশাসনিক ভিত্তি না থাকলেও তা যে এক বিশেষ প্রশাসনিক কাঠামোকে ধারণ করে থাকে তার কথা ঠারেঠোরে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিয়েছেন। সমবায়নীতির গঠনপদ্ধতি বিষয়ে নির্দেশ দিতে গিয়ে প্রতিষ্ঠান সংগঠন ও তার নানা শাখাপ্রশাখার উল্লেখ করেছেন—" চার পয়সা খরচ করে কোনো মানুষ একলা নিজের শক্তিতে একখানা সামান্য চিঠি চাটগাঁ থেকে কন্যাকুমারীতে কখনোই পাঠাতে পারত না; পোস্ট-অফিস জিনিসটি বহু মানুষের সংযোগ-সাধনের ফল; সেই ফল এতোই বড় যে তাতে চিঠি পাঠানো সম্বন্ধে দরিদ্রকেও লক্ষপতির দুর্লভ সুবিধা দিয়েছে।"[৪২] মানুষের সঙ্গে মানুষের এই সংযোগ-সমন্বয়ই মানবিক সম্পর্ককে দৃঢ়ীকরণে এবং নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সক্ষম। একালের তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর ক্ষমতায়নের বহুমাত্রিক অপহ্নবের বিপরীতে এই সমবায় সভ্যতার স্বতন্ত্র মুক্তির পথনির্দেশ করতে পারে—

" কথা উঠতে পারে একালের গণতন্ত্রে জনকল্যাণের দিকটা তো ফেলনা নয়। তাকে অগ্রাহ্য করে নিছক ধনতান্ত্রিক আধিপত্যের নিন্দা খুব একপেশে ব্যাপার। সমস্যাটি কিন্তু সুবিধার সুযোগ নিয়ে অসুবিধা না সইবার ব্যাপার নয়। সুবিধা অসুবিধা বাছবিচারের জায়গাই নেই বলা চলে। তাদের মিশ্রণেই তো কিম্ভূত পরিস্থিতি। সেটাই ক্ষমতার কৌশল। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত দেশে দেশে একই সমস্যার আকার-প্রকারে তফাত হতে পারে। যেমন লিঙ্গবৈষম্য, যৌনস্বাধীনতা, মানব অধিকার, নাবালকের সুরক্ষা। প্রতিবাদ পরিবর্তনের উদ্যমে ফিরে ফিরে আসে কিন্তু আগ্রাসন থেকে বিরতির কথা, সহিষ্ণুতার প্রয়োজন,

বন্ধুত্বের আকুলতা, আতিথেয়তার আবেদন, স্নেহের অগাধ বিস্তার। সমবায়নীতির প্রকরণে অনুকূল চিত্তবৃত্তির মস্ত জরুরত। তার সঙ্গে হাতেনাতে সমবায়িক উদ্যোগ গড়ে তোলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই লেখার চেয়ে কতগুণ কঠিন সে-কাজ তা লিখে বোঝানো দুষ্কর। প্রতিজনের লাভক্ষতির হিসেব থেকে সরকারের কাজকর্মে জনমানুষের বাস্তবিক যোগদান পর্যন্ত অজস্র দিকে দরকার সজাগ সচেতন তৎপরতা। সামাজিক জীবনের কতরকম পরিসরে পুঁজি-মানসের বিকল্প নৈতিকতা লালনপালনের দায় এসে পড়বে তার সীমা-পরিসীমা নেই। সে-সব নিয়েই ক্ষমতার জায়গায় সমবায়ের প্রাধান্য নির্মাণের কাজ।”[৪২] এভাবেই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এদেশের গ্রামগুলিকে ‘ব্যূহবদ্ধ’ করে তুলতে।

৩. প্রাচীন গ্রামসমাজকে কেন্দ্র করে সমবায়ভিত্তিক পল্লীপুনর্গঠনের কথা বললেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পাশ্চাত্যের উন্নততর প্রযুক্তি বা চিন্তাচেতনার অধিগ্রহণকে গান্ধীর মতো অচ্ছুৎ বলে মনে করেননি। কিন্তু সে প্রযুক্তিকে হতে হবে মানবিক প্রগতির অনুকূল। গান্ধীর চরকা আন্দোলনের বিরোধিতার নিহিত কারণ এটাই। আজকের দিনে প্রযুক্তির ভোগমুখি বিচিত্র বিকাশ অনেকক্ষেত্রে মানবকল্যাণের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। ফলে জীবনের গভীরে পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে অলঙ্ঘ্য জটিলতা। সেই জটিলতার ব্যাপ্তি নষ্ট করছে সামাজিক প্রশান্তি ও স্থিরতা, মূল্যবোধ আর নৈতিকতা। এর সমাপ্তি কোন মহাগহ্বরে তা কেউ জানে না। ‘মুক্তধারা’র মতো রবীন্দ্রনাটক তাই আজও আমাদের কাছে সমানভাবে আধুনিক। যন্ত্র বা প্রযুক্তির তাই মানবকল্যাণমুখী ব্যবহার আজকের দিনে খুব জরুরী। কোন আইন প্রণয়ন করে যে এই বিশেষ প্রবণতা থেকে মানুষকে নিরত করা যাবে তাও নয়। মানুষের মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা সেদিকেরই নির্দেশ দেয়। সে ক্ষেত্রে মানুষের চরিত্রের সংশোধন বা মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনই প্রযুক্তির গণমুখী চরিত্রকে নির্দিষ্ট করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের মডেলই সেক্ষেত্রে যোগ্যতম উন্নয়ন মডেল—যেখানে অর্থনৈতিক দিকের পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধের সংরক্ষণের দিকটিও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে।

৪. আজকের দিনে গ্রাম ও নগরের বিপুল ব্যবধান রচিত হয়ে চলেছে পুঁজির অমোঘ প্রভাবে। নগরগুলিতে সম্পদের কেন্দ্রীকরণ এই ব্যবধানকে আরো স্পষ্টতর করে তুলছে। আজকের বিশ্বায়নের যুগে যেখানে গ্রামের নগরায়ণ ঘটছে সেখানে ধনবৈষম্যের ছবি অত্যন্ত প্রকট। সেই নগরগুলিতেও দেখা যায় ঝাঁ চকচকে শপিংমলের ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের পাশে ছোট ছোট বস্তির ছড়াছড়ি। এটাই রবীন্দ্রকথিত সেই ‘বিচ্ছেদ’ যার উপর ভিত্তি করে কোনো সভ্যতাই টিকতে পারে না। এদেশের গ্রামগুলির স্বয়ম্ভরতা স্বাধীনতার প্রায় ৬০ বছর পরেও অর্জিত হল না। আজো দেশের অধিকাংশ গ্রামে বিদ্যুতের আলো তো দূরের কথা রাতে জ্বালার মতো কেরোসিন জোটে না। পথ-ঘাট-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

পশ্চিমবঙ্গের আমলাশোলের মতো লক্ষ গ্রাম সারা দেশে ছড়িয়ে আছে যেখানে না আছে কোন কর্মসংস্থান না আছে দুবেলা দুমুঠো ভাতের যোগান। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেমন দেখেছিলেন বাংলার গ্রামগুলিতে শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে আসে তেমন গ্রামের সংখ্যাও প্রচুর। বেঁচে থাকার তাগিদে রুজি-রোজগারের ধান্দায় তাই বিশালকায় ট্রেনের উদরে সেঁধিয়ে বিপুলসংখ্যক মানুষের কিলবিল ভীড় নগরজীবনে এসে পড়ে, নগরজীবন তাদেরই কাজে ও সেবায় নিজেকে সমৃদ্ধ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলে। গ্রাম এভাবেই নগরের দ্বারা শোষিত হয়ে চলেছে আজো। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর মতো নিছক পল্লীতন্ত্রের উজ্জীবন চাননি, তিনি চেয়েছিলেন গ্রাম-নগরের সুষম সমন্বয় দ্বারা জাতির আত্মবিচ্ছিন্নতাকে দূর করতে। জানিয়েছিলেন—

" শহরে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমিকদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন। বিশেষত আমাদের যে দেশের সমাজ গৃহের উপরে প্রতিষ্ঠিত সেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধর্মের প্রধান অবলম্বন জীর্ণ হইয়া পড়ে ও সমাজের মর্মস্থানে বিষসঞ্চার হইতে থাকে সে দেশে বড়ো বড়ো কারখানা যদি শহরের মধ্যে আবর্ত রচনা করিয়া চারি দিকের গ্রামপল্লী হইতে দরিদ্র গৃহস্থদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে তবে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত, বাসস্থান হইতে বিশ্লিষ্ট স্ত্রীপুরুষগণ নিরানন্দকর কলের কাজে ক্রমশই কিরূপ দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কলের দ্বারা কেবল জিনিসপত্রের উপচয় করিতে গিয়া মানষের অপচয় করিয়া বসিলে সমাজের অধিকদিন তাহা সহিবে না। অতএব পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে-সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্থানেই কর্মের উন্নতি করিতে পারিলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে।"[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজে' পল্লীকে আত্মশক্তিতে স্বয়ম্ভর করে গড়ে তোলার যে আহ্বান জানিয়েছেন সে আহ্বান তৎকালীন দেশীয় নেতারা যেমন রাজনৈতিক স্বার্থে এড়িয়ে গেছেন আজকের দিনেও সেই উপেক্ষা সমানভাবে ক্রিয়াশীল। গ্রাম-শহরের এই বিভেদ সমাজ ও অর্থনীতির সুষম বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথের উন্নয়ন ভাবনা এদিকের বিচারে আজকের দিনেও স্বতন্ত্র গুরুত্ব পেয়ে যায়।

৫. রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর একটি বড় দিক ছিল জমির মৃত্তিকাক্ষয় রোধ করে তাকে উর্বর করে তোলা । এলম্‌হার্স্টকে সঙ্গে নিয়ে বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং একাধিক বক্তৃতার আয়োজনের দ্বারা এ বিষয়টিকে সকলের গোচরে আনার ব্যবস্থা করেন। শিলাইদহেও পর্যায়ক্রমিক ফসল চাষের দ্বারা জমির উর্বরতা রক্ষার দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আজকের দিনেও ভারতবর্ষের মতো দেশে অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে থেকে গেছে মৃত্তিকাক্ষয় সমস্যা, কৃষিজমির উর্বরতা

হ্রাসজনিত সমস্যা। গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে না পারায় পল্লীর মানুষ আজও শহরমুখী। কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকায় পল্লীর শিক্ষিত বা ধনী আজ গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস করে। তার নামাঙ্কিত জমি চাষ করে ঠিকাদার বা অর্থের বিনিময়ে জমি বন্ধক নিয়েছে এমন ব্যক্তি। এই সকল ব্যক্তির উদ্দেশ্য থাকে নিদিষ্ট সময়ে জমি থেকে কত বেশি মুনাফা বা লাভ অর্জন করা যায়। ফলে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রচুর রাসায়ণিক সারের ব্যবহারের দ্বারা তারা মাটির উর্বরতাশক্তির সর্বনাশ করে ছাড়ে। শহর বা মুনাফাখোরের দল মাটি থেকে যা নেয় তার যৎসামান্য ফেরৎ দিয়েও মাটির উর্বরতাশক্তি রক্ষার কোনপ্রকার ব্যবস্থা নেয় না। তারা জানেই না এটা কোন একটি সভ্যতার পতনের বিরাট কারণ হতে পারে। এলম্‌হার্স্ট একদা এদিকের প্রতিই অঙ্গুলিসঙ্গেত করে বলেছিলেন—

“ But any of you who are student of history will be able to point to many parallels in the past. The breakdown of rural community life in England and in Rome, with the growth of the big city, was naturally followed by tenant farming and absentee landlordism. Such tenant farming is always disastrous for the soil. The tenant has no permanent interest in its fertility and only carries on those activities which will give him a living without bringing on a rise in his rent. The city takes all and returns little or nothing of real value to the soil.” [88]

এই অপহ্নব নিরসনের জন্য যে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকাজ পরিচালনার প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন শিক্ষা এদেশের বৃহত্তর সংখ্যক কৃষকের মধ্যে নেই। অনুরূপ শিক্ষা সম্প্রসারণের কোন সরকারি উদ্যোগও গৃহীত হয়নি। পরিসংখ্যানগত কৃষি-প্রগতির সূচক যে কৃষি-প্রগতির প্রকৃত নির্দেশক নয়, একথা আমরা আজ ভুলে আছি। কেননা ‘Agricultural advance alone is not necessarily beneficial. Improvement of method may mean no more than improved exploitation of soil or neighbour for selfish benefit. Elementary education of a kind which the people will welcome and which they can afford, must go hand in hand with community organization for buing and selling, for manufacturing and irrigation, for cultivation and sanitation.”[৪৫] আগামী দিনের বৃহত্তর এক সমস্যার দিকে এগিয়ে চলেছে জাতি। সেদিন এবং আজকের দিনে তাই রবীন্দ্রনাথই কৃষি-প্রগতি বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারেন।

৬. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা তাই আজকের দিনে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু আছে

তা বিদেশী ইংরেজের স্বদেশের শিক্ষা-কাঠামোকে ধারণ করে আছে। আমাদের দেশের প্রয়োজনে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে—

"যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা-স্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।"[৪৬]

স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কৃষি-শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভাবা হয় একারণেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা ঠিক যে আমাদের দেশ প্রথাগত বিদ্যালয় শিক্ষার বাইরে শিক্ষাকে দেশের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে যেতে পারেনি। ব্যবহারিক শিক্ষার অপ্রতুলতা আজকের দিনেও প্রকট। এর পিছনে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় উদাসীনতা অনেকখানি দায়ী। কেননা আজো আমাদের দেশ কৃষিতত্ত্বের মতো বিষয়গুলিতে কর্মসংস্থানের বিপুল ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। এ বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দানের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে যোগ্য কর্মী গড়ে তোলার আয়োজন খুবই সীমিত। ফলে দেশের শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের একটি বৃহত্তর অংশ এই জাতীয় শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না। আগ্রহ থাকলেও তাই সুশিক্ষিত কর্মীর অভাবে সুনির্দিষ্ট প্রণালীর যথাযথ প্রয়োগ না করে পল্লীর যথাযথ উন্নয়ন ঘটানো যাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ একারণেই শ্রীনিকেতনে গড়ে তুলেছিলেন শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ। শ্রীনিকেতনে গ্রামসংগঠনের অনুকূল শিক্ষা বা ট্রেনিং দিয়ে তাদের পল্লীর উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল করা হতো। এলম্‌হার্স্টের কৃষি-গবেষণা কেন্দ্রে আধুনিক কৃষিপদ্ধতি সম্পর্কে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা ছিল। ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মী বা শিক্ষার্থীরা পল্লীর কৃষকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকাজের সেই পদ্ধতিকে প্রচার করতো। এ বিষয়ে ব্রতী বালকদলের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ত্যাগ ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, পল্লীর প্রাণকেন্দ্রে নিজেকে পৌঁছে দিতে সমর্থ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আদর্শ গ্রাম-কর্মী গড়ে তোলার সেই মহৎ উদ্দেশ্য আজ সরকারী কর্মসূচীতে কোথায়? রবীন্দ্রনাথের ভাবনার একালীন প্রাসঙ্গিকতা সেখানেই। এলম্‌হার্স্ট একারণেই অত্যন্ত স্পষ্টতার সঙ্গে জানিয়েছিলেন—

" If only the right spirit is there , or if the right spirit can be infused, there need be little difficulty. And for the young man of today there is no higher calling than that of a trained village worker. But we should remember, there is no calling which demands such rigorous training, or so much self-discipline. First of all, the village should be able to be of all round service to the people. The day has gone when people imagined that boys fresh from school or college could revolutionise village life without any attempt to study the villager's point of view, to sympathise with his sufferings, to bind up his wounds and to enter into his most intimate life. Progress must be from the bottom up, and such a worker must be willing and able, as Mahatma Gandhi has pointed out, not merely to do the sweeper's job himself, but to show the sweeper how to do it better. And above all it is for him to hold up before the villagers the standard of a pure and selfless life."[৪৭]

৭. শুধু ব্যবহারিক শিক্ষা নয়, রবীন্দ্রনাথ নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপরও সর্বাধিক জোর দিয়েছিলেন—যা বর্তমানে আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ mass education- এর ব্যাপারেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। আর শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দূরশিক্ষার ব্যবস্থাপনাও গড়ে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় শিক্ষাচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার রূপরেখা অনেকাংশে নির্মিত হয়েছে। আসলে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা-অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা পল্লীর মানুষের জীবনে উন্নয়ন আনতে হলে শিক্ষার আলোকদিশাই প্রধান অবলম্বন। নইলে উন্নয়নের কার্যাবলীকে তারা শুধু যে সন্দেহের চোখে দেখে তাই নয়, সেগুলির রূপায়ণে হাজার বছরের প্রথা-সংস্কারের শিকড় প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারই ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অচলায়তন'এর মতো নাটকে। এই ভারতবর্ষীয় গ্রামসমাজের অচলায়তনে শিক্ষার সার্বিক প্রসার ভিন্ন প্রগতি যে সম্ভব নয়—আজকের দিনেও তা সমানভাবে সত্য। পঞ্চকদের মত তরুণদের জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা আর সুভদ্রদের মতো যুবসম্প্রদায়ের বলিষ্ঠ সাহসিকতা ও প্রগতিচেতনা আজকের দিনের ভারতবর্ষীয় সমাজের প্রগতির ক্ষেত্রে নিতান্ত প্রয়োজন।

৮. রবীন্দ্রনাথ পল্লী উন্নয়নের যে পরিকল্পনা করেছিলেন তাতে 'পল্লীর উন্নতি' বিষয়ে জানিয়েছিলেন—"উপকার করবো না, উপকার ঘটাব, এইটেই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই। যার অভাব আছে তার অভাব মোচন করে শেষ করতে পারব না, বরঞ্চ বাড়িয়ে

তুলব, কিন্তু তার অভাব মোচনের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।” একারণে পল্লীর মানুষকে জাগরূক করে তোলার উপর জোর দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের বিপুল দারিদ্র্যকে যে কেবল দানের অর্থে দূর করা অসম্ভব, ২ টাকা কেজি দরে চাল বিতরণ করে যে দারিদ্র্যের স্থায়ী বিনাশ সম্ভব নয়, একথা বৈজ্ঞানিক সত্য। তাই মানবসম্পদের উপর নির্ভরশীলতার দিকটিকে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। মানুষকেই আলস্য ত্যাগ করে সর্বাধিক সক্রিয়তায় নিজের আত্মোন্নতি ঘটাবে। এভাবেই ভিতর থেকে শক্তিশালী করে গ্রামকে 'আত্মশক্তি'তে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একেই বলা যেতে পারে আত্মকর্তৃত্বের চর্চা। এই আত্মকর্তৃত্বের চর্চাই কিন্তু মনুষ্যত্বের চর্চার নামান্তর। আজকের দিনেও দেশের প্রগতি আনতে গেলে যে মানবিক সক্রিয়তাই সব থেকে বেশি জরুরী তার কথা বলেন অমর্ত্য সেনের মতো অর্থনীতিবিদও। সে কারণেই নাগরিক সক্রিয়তাকে তিনি কতকগুলি স্বাধীনতার পরিপূরক হিসেবে ভেবেছেন। তাঁর ভাবনার অনুপূরক ছিল রবীন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তি'তে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম-পরিকল্পনা। প্রগতির নবীন অভিজ্ঞান হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্বায়ত্বশাসিত গ্রামপরিকল্পনা তাই আজকের দিনেও স্বতন্ত্র প্রাসঙ্গিকতা পেয়ে যায়। আত্মসংস্কার ও আত্মোন্নতির পথেই আসবে সেই উন্নয়ন—যা একইসঙ্গে মানবিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকও বটে।

৯. গবেষণা , সমীক্ষার দ্বারা ক্ষেত্রসম্প্রসারণ আধুনিক অর্থনীতিতে মান্যতা পেয়ে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল মন সেদিন অনুরূপ কথাই চিন্তা করেছে। শুধু শিলাইদহে নয়, শ্রীনিকেতনেও লাবেরেটরি বা কৃষিগবেষণাগার স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। এলম্‌হার্স্টের কৃষিসংক্রান্ত নতুন নতুন গবেষণা, রথীন্দ্রনাথের নানা বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা এ বিষয়ে স্মরণযোগ্য। সমীক্ষার কাজও চলে পাশাপাশি। ১৯২৬ সালে কালীমোহন ঘোষ শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী বল্লভপুরের সমীক্ষাপত্র প্রস্তুত করেন। ১৯৩১-এ সুধীর চন্দ্র সেন কৃষি ও অর্থনীতির উপর তিনখানি সমীক্ষাপত্র প্রকাশ করেন—

ক. economics of Paddy Cultivation

খ. Irrigation problem In west Bengal

গ. Rural Marketing In Bolpur Bazar

১৯৩২-এ শ্রীনিকেতন পল্লীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পত্রের একাধিক সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪-এ ড. হাসিম আলির সমীক্ষাপত্র ' Three village economics studies on rice' প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ ও ১৯৩৫-এ যথাক্রমে গ্রামীণ ঋণ ও বোলপুরের চালের বাজারজাতকরণের উপর দুখানি সমীক্ষাপত্র প্রকাশিত হয়।

এই সমীক্ষা পত্রের উপর নির্ভর করেই পরবর্তী পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হত। এই প্রণালীই উন্নয়ন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী বা প্রথা। বর্তমানে ভারতবর্ষে পল্লীর উন্নয়ন সংক্রান্ত যে সকল পরিকল্পনা গুলি প্রচলিত আছে সেগুলি কিন্তু অনুরূপ ক্ষেত্রসমীক্ষার অভাবেই গুরুত্ব হারাচ্ছে। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ তাঁদের ক্ষেত্রসমীক্ষায় এ কথাকেই বার বার উল্লেখ করেছেন। এর অভাবে সরকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাগুলির মোকাবিলায় ব্যর্থ হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের উন্নয়ন পরিকল্পনা তাই দেশের কাছে আজো আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

১০. রবীন্দ্রনাথের কৃষিসমবায়ের প্রাসঙ্গিকতা আজকের দিনেও সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ যে সমবায়ের কথা বলেছিলেন স্বাধীন ভারত সেই সমবায়ের আদর্শকেই কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমবায় কৃষিব্যাঙ্কের আদলেই কৃষকদের স্বল্পহারের সুদে বর্তমান সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ প্রদান করে থাকে। কেইন্‌স্‌ যে পূর্ণ নিয়োগের ভারসাম্যের কথা বলেছিলেন তা এর মধ্য দিয়েই সম্ভব হতে পারে। কেননা সমবায়ের দ্বারা কৃষকদের ঋণদানের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটানো সমবায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমানে সমবায় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমবায় বা PACS (Primary Agricultural Credit Societies)। বর্তমানে আমাদের রাজ্যে ৫৯৫০টি PACS রয়েছে। এগুলি গ্রামীণ ক্ষুদ্র অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । বর্তমানে এ রাজ্যে কৃষি-উন্নয়ন সমবায়ের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ কৃষককে কয়েক কোটি টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে কৃষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। এই সমবায় বা PACS-এর কথা বলতে গিয়ে পৃথা ঘোষ জানিয়েছেন—

“ PACS অনেক সাধারণ থেকে সাধারণতর মানুষের একটি সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা প্রচেষ্টা। সেইসব মানুষ যারা অনেকেই সরকার স্বীকৃত বিপিএল তালিকাভুক্ত, অনেকেই ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষী, অনেকেই আর্থিকভাবে একেবারেই ক্ষুদ্র সামর্থ্য সম্পন্ন। কেউ আবার বিপিএল তালিকা ছেড়ে কোনক্রমে এপিএল তালিকায় উঠে এসেছে। কিন্তু বাস্তবিকই তারা দারিদ্র্যসীমার নীচে। এরকম কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার মানুষ নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে একত্রিত হয়ে তৈরি করেছে সমবায়। নাম রেখেছে সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি। লক্ষ্য নিজেদের কৃষিকাজ থেকে শুরু করে সময়ে অসময়ে বিপদে আপদে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো। সরকার থেকে সাহায্য নয় নয় করেও কিছু পাওয়া যায়। এইসব ভাবনা-চিন্তা নিয়ে তৈরি হল PACS। বিন্দু বিন্দু জল নিয়ে যেমন সিন্ধু তৈরি হয় তেমনি বিশালসংখ্যক মানুষের ক্ষুদ্র পুঁজি জড়ো করে তৈরি হল বড় পুঁজি। সেই পুঁজি ব্যাঙ্কে রেখে শুরু হল ঋণদান প্রক্রিয়া। গণতান্ত্রিকভাবে সমবায়ের সদস্যদের মধ্য থেকে গঠিত হল

পরিচালন সমিতি। সমবায়ের জন্য নির্দিষ্ট আইনের শাসনে বাঁধা থেকে পরিচালন সমিতি সদস্যদের হয়ে শুরু করলো আর্থিক ও কৃষি উন্নয়নের কাজগুলি।”[৪৮]

১১. রবীন্দ্রনাথ শুধু সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে ক্ষান্ত থাকেননি। যদি গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি-পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো না যায় তাহলে কৃষকদের ঋণ প্রদান করেও যে তাদের আর্থিক মানোন্নয়ন সম্ভব নয় একথা তিনি বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। তাই বিভিন্ন সমবায় সমিতির পাশাপাশি উন্নততর কৃষিপ্রযুক্তি গড়ে তোলার ব্যাপারেও তৎপর হয়েছিলেন। কৃষিবিপনন ব্যবস্থাকেও যথাযথ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন বা সংস্কার, উন্নত বীজ ও সারের ব্যবস্থা, স্থায়ী বাজার নির্মাণ, ধর্মগোলা স্থাপনের দ্বারা কৃষিপরিকাঠামোকে যথাযথ করে গড়ে তুলেছিলেন। এই পরিকাঠামোর উন্নতি ভিন্ন কৃষককে ঋণদান আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণের দ্বারা পৃথা ঘোষ বিষয়টি বিশদ করেছেন—

“ একজন চাষীর জমির পরিমাণ ও ফসলের উপর নির্ভর করে তিনি কতটা ঋণ পেতে পারেন।এই মাত্রাটি জেলাগতভাবে ঠিক হয়। একে বলা হয় Scale of Finance । এই Scale of Finance অনুযায়ী প্রায় তিন বিঘা জমি চাষের জন্য ঋণ দেওয়া হয় ১৪,৭০০ টাকা। এর ভাগগুলি হল নিম্নরূপ। এর মধ্যে চাষের জল, সার, বীজ, মজুরি এইসব ভাগগুলি রয়েছে। প্রত্যেকটি ভাগের মূল্য বাস্তবিক আলাদা আলাদা করে যোগ করলে দেখা যায় একজন চাষীর একবার জমি চাষ করতে প্রয়োজন হয় প্রায় ২৪,০০০ টাকার মতন। এই ১০,০০০ টাকার ঘাটতির জন্য তাকে যেতে হয় আবার মহাজনের দরজায়। কিন্তু দেখা যায় চাষীকে পরিকাঠামোগত সুযোগটুকু যদি দেওয়া যেত অর্থাৎ জলের পরিষেবা, ন্যায্য মূল্যে সার, বীজ, কীটনাশক, বা শ্রমটাও যদি চাষীর নিজের পরিবার থেকে আসে তাহলে উৎপাদনের জন্য হাজার দশেক টাকাই যথেষ্ট। ......অসংগঠিত ক্ষেত্রে ঋণের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের বোঝা চেপে যায় চাষীর উপর। সুদের হারও খুব বেশী যা প্রায় ২০-২২%। উৎপাদনের সময়ে সমস্যা পেরিয়ে ......যেটুকু উপার্জন হল তাতে চাষী সারাবছর খাবে কী আর ঋণ শোধ করবে কী। এইভাবে একসময়ে ব্যাঙ্কগুলির ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রটিও বন্ধ্যা হয়ে যায়। ....ছোট চাষী তার সীমিত উৎপাদনটুকু নিয়ে বেশি বড় করে ভাবতেও পারে না। উৎপাদন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকে। এই উৎপাদনকে জমা করার দায়িত্বটা নিতে হয় কাউকে। গ্রামে আড়তদাররা এই কাজটি করে। আড়তদারের কাছেই ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন উৎপাদন এসে জমা হয়। আবার এই আড়ৎদার নিজেও একজন বড় চাষী। সে আবার মহাজনও বটে। এবং গ্রামীণ রাজনীতিতে প্রভাবশালী। সে মহাজনী ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে চাল-ডাল তেল-নুন-রেশন এর ব্যবসাও করে। সার কীটনাশক বিক্রীও তার কাছে। তারই পাওয়ার টিলার, ট্র্যাক্টর, পাম্প ভাড়া খাটে ছোট চাষীদের ঘরে। ফলে সেই বড় চাষী

যে কিনা আবার আড়ৎদার বা মহাজনও বটে তার চৌকাঠ এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কোন ছোট চাষীর থাকে না। দেখা গেছে গ্রামীণ অর্থনীতিতে তাই বিভাজন বা তারতম্য খুবই বেশী।

সুতরাং গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষির পরিকাঠামো যতক্ষণ না উন্নত হবে ততক্ষণ এই অর্থনীতির উন্নতিসাধন সম্ভব নয়। চাষী ঋণের চক্রব্যূহ বা ডেট্ ট্র্যাপের মধ্যে থেকেই যাবে। অনাহার, অর্ধাহার, অপুষ্টি, শিশুমৃত্যু, শিক্ষার অভাব এই সমস্যাগুলি মূল অর্থনৈতিক সমস্যার ফল হিসেবে বিদ্যমান থেকেই যাবে। গোড়া থেকে নির্মূল হবে না। গ্রামের প্রতিটি গলিতেও যদি ব্যাঙ্কের শাখা খুলে দেওয়া যায় তাহলেও সমস্যার সমাধান হবে না কারণ ঋণ নেবে কে। ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রটিও তো তৈরি করার প্রয়োজন থেকে যায়।”[৪৯]

সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে সমবায় কৃষি-পরিকাঠামো গড়ে তোলার দ্বারা। নীচ থেকেই এর কাজ শুরু করতে হবে। উপর থেকে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে সে দায়িত্ব দিলে সাম্য বিঘ্নিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সমবায়ের প্রাসঙ্গিকতা এখানেই। আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা আর বিচ্ছিন্নভাবে তৈরি হওয়া উৎপাদনক্ষেত্রগুলির মধ্যে সমবায়ের মাধ্যমেই সমন্বয় সাধন সম্ভব হবে। তার জন্য যোগ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু সেক্ষেত্রেও দেশের রাজনীতির জোলো হাওয়া প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। দেশের পঞ্চায়েতগুলোতে গ্রামীণ রাজনীতির প্রথমসারির নেতারা থাকলেও সমবায় সমিতিগুলিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদেরই প্রাধান্য থাকে। তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও প্রত্যাশা ওই ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যেই চরিতার্থ হয়ে যায় বলে রাজনীতিগতভাবেও সমবায় সমিতিগুলি নিজের জায়গা করে নিতে পারে না।

তাছাড়া বর্তমানে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিগুলিকে অধিগ্রহণ করে নেবে। এতে সমবায় সমিতির সদস্যদের সক্রিয়তাও হ্রাস পায়। অথচ রবীন্দ্রনাথের সমবায়ের উদ্দেশ্য ছিল ‘ধনকে উৎপন্ন করার শক্তি সকলের মধ্যে জাগরূক করা’। সরকার সেক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা নেবে মাত্র। আমাদের দেশের কর্তাব্যক্তিগণ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই সত্যটি আজ বিস্মৃত হয়েছেন। তাই অর্থনীতিতে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের পরিবর্তে তাদের ভূমিকাকে নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে। তাই ধনের অসাম্য, পুঁজির অপহ্নব আমাদের সমাজে বেড়ে চলেছে। সামাজিক এই সমস্যার যথার্থ সমাধান কিন্তু নিহিত রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়—সমবায়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্যে। অথচ আমাদের দেশে সমবায়ের এত বড় আবশ্যকতা সত্ত্বেও তা নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী হয়ে থেকেছে, পরিকাঠামো গড়ে তোলা তো দূরের কথা।

১২. আজকের দিনে জনসংখ্যার সীমাহীন বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার কারণে বাঁধনহীন উৎপাদন বৃদ্ধি পরিবেশের উপর শাসন ও শোষণ চালাচ্ছে। নগরায়ণ আর শিল্পের অনিয়ন্ত্রিত বিকাশ অরণ্যের বিনাশ ঘটাচ্ছে। জীবনের বিলাসিতা আর বস্তুগত প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে ব্যাপক হারে বৃক্ষচ্ছেদন আজকের দিনে পরিচিত ঘটনা। ব্যাপক হারে বৃক্ষচ্ছেদন চলেছে ফলে জৈব প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় ও সর্বব্যাপী দূষণ আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে পড়েছে। জল, মাটি, বাতাসের দূষণ আমাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। রাসায়ণিক বিষ আজ বাস্তুতন্ত্রকে যেমন বিষিয়ে দিচ্ছে তেমনি জীবদেহের মধ্যে নানা ক্যান্সারের জন্ম দিচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধি ঘটায় বাতাসে বাড়ছে গ্রীণহাউস গ্যাস— যা বিশ্ব-উষ্ণায়ণের জন্য দায়ী। দুই মেরুর বরফ গলতে শুরু করেছে, যা একদিন পৃথিবীর স্থলভাগকে জলের তলায় ডুবিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। পালটে যাচ্ছে জলবায়ুর ধরণ, বিলুপ্ত হচ্ছে কত প্রজাতির। সমালোচক জানিয়েছেন—

“ প্রকৃতি পরিবেশের উপর মানুষের চাহিদার বাড়াবাড়ি ধরণীর ধারণক্ষমতা বা জৈবসক্ষমতা ছাড়িয়ে ইকোলজিক্যাল ওভারসুট তৈরি করেছে সেই ১৯৮০-র দশকেই। আজ বাস্তুতান্ত্রিক বাড়াবাড়ি প্রায় ৪০-৫০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। সারা বিশ্ব আজ তাই বাস্তুগত ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছে। এক বছরে প্রকৃতির যে আত্মপ্রজনন ক্ষমতা ও আত্তীকরণ ক্ষমতা আমরা তার প্রায় ৪০-৫০ শতাংশ বেশি ভোগ করছি ও বর্জ্যের ভার বাড়াচ্ছি। এইভাবে চললে ২০৫০ সাল নাগাদ রিজ ও ওয়াকারনাগেল হিসাব বলছে, প্রকৃতির উপর মানুষের চাহিদা ও ভোগ মেটাতে, ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট সামলাতে, দুটি পৃথিবীর প্রয়োজন। আমরা বিশ্বের সবাই যদি আমেরিকাবাসী বা কানাডাবাসীর মত জীবনযাপন, ভোগবিলাস করতে থাকি তাহলে যথাক্রমে প্রায় ৯টি বা ৫টি পৃথিবীর প্রয়োজন। ইকোলজিক্যাল ডিমান্ড ও সাপ্লাই-এর ফারাক তৈরি করে বস্তুগত ঘাটতির বাণিজ্যর মাধ্যমে স্থানিক কেনা-বেচা গেলেও পৃথিবীর ঘাটতি কোন গ্রহের সঙ্গে বাণিজ্যে মেটানো যায় ? যায় না, তাই ন্যাচারাল ক্যাপিটাল ভাঙিয়ে চাহিদা সামলানো হয়। যে কোন ব্যবসায়ীই জানে জমানো মূলধন নষ্ট করতে থাকলে দেউলিয়া হওয়া সময়ের অপেক্ষমাত্র।”[৫০]

রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক ভাবনার স্বতন্ত্র প্রাসঙ্গিকতা তাই আজ বিশেষ করে ফুটে উঠতে দেখা যায় সবুজ অর্থনীতির ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক ভাবনার একটি বিশেষ দিক ছিল পরিবেশকে ধ্বংস করে মানবিক প্রগতির অন্তরায় হয়ে ওঠে এমন প্রগতির পথে না হাঁটা। নির্মল প্রযুক্তি ব্যবহারই রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক ভাবনার আদর্শ বলে পরিগণিত হয়েছিল। পরিবেশ ও প্রগতির ভারসাম্যেই সভ্যতার মানবিক মুখ অনুসন্ধান তাঁর অর্থনৈতিক ভবানার অন্যতম দিক ছিল। বৃক্ষরোপণ, অরণ্য উৎসব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরিবেশ বান্ধবের গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন। আধুনিক সবুজ অর্থনীতি

ভাবনায়ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সামগ্রিক ও সুস্থিত উন্নয়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ জাতীয় পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি সহনশীল উন্নয়নের পথ অবলম্বন করে, পুঁজিশাসিত অর্থনীতির মতো পরিবেশকে তছনছ করে দিয়ে তা দানবের মতো প্রবল গতিতে ছুটে চলে না।

সহনশীল সবুজ অর্থনীতিতে তাই ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠে না, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়—যা রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক ভাবনারও মূল উপজীব্য ছিল। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তার থকে সুবিধা ও পরিষেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এমনভাবে পরিচালিত করা হয় যাতে পরিবেশের উপর কোন প্রভাব না পড়ে। এ জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যক্তি,সমাজ ও পরিবেশের সুসংহত সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন সম্ভব হয়। পরিবেশবান্ধব জীবন-যাপনের জন্য ভোগের নিয়ন্ত্রণ গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভাবনায় তাই ত্যাগস্বীকারের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ ও সমাজের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে মহিলারাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বলে এ জাতীয় অর্থনীতি নারীদের সক্ষম ও দক্ষ করে গড়ে তোলে, লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ বান্ধব অর্থনীতি পরিকল্পনার আধুনিক গ্রহণযোগ্যতা আজকের দিনে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা রক্ষার স্বার্থে বা ধনতান্ত্রিক পুঁজিশাসিত জীবনের জাঁতাকলে জড়িয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথের উন্নয়নের মডেলকে কেউ কেউ 'কবির আইডিয়া' বলে উপেক্ষা করতে পারেন| কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধ যেদিন নির্মম হয়ে উঠবে সেদিন ফিরে আসতেই হবে রবীন্দ্রনাথের কাছে, অন্যভাবে কান পাততে হবে তাঁরই 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'। ২০০৮ সালে ইউনাইটেড নেশান্স এনভায়রনমেন্টের প্রোগ্রামের হাতে সবুজ অর্থনীতির শুভ সূচনা সেদিকেরই নির্দেশ বয়ে আনে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা তো আজকের দিনেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক—

" প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তার পরে আসে বিনাশের পালা.........প্রকৃতির নিয়মসীমায় যে স্বাস্থ্য ও আরোগ্যতত্ত্ব আছে তাকে উপেক্ষা করে কী করে মানুষ স্বরচিত প্রকাণ্ড জটিলতার মধ্যে কৃত্রিম প্রণালীতে জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য করতে পারে এই হয়েছে আধুনিক সভ্যতার দুরূহ সমস্যা।"[৫১]

১৩. পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে যে পল্লীউন্নয়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে সেগুলি অতটা সফল হতে পারেনি। তার অন্যতম কারণ হল সেই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর অভাব। অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য কর্মী থাকলেও তাদের কর্মসংস্থানের অভাব দেখা যায়। কেননা তাদের অনেকেই আধুনিক

প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ নয় বা অপারগ। এটি একটি পরিকাঠামোগত ত্রুটিও বটে। দারিদ্র্যও সেক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ পথপ্রদর্শক হতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন পল্লীর যথাযথ উন্নয়ন ঘটাতে হলে এই পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী কর্মীদের যথাযথ ভাবে প্রশিক্ষণ দান। তাছাড়া এ-ও বুঝেছিলেন কেবল সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থেকে দেশের দারিদ্র্য বা বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন স্বনিযুক্তি প্রকল্প—যেমনটা ভেবেছেন অমর্ত্য সেন কিংবা মুহাম্মদ ইউসুফের মত প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিবিদরাও। শিল্পসদনে গ্রামীণ শিল্পীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের দ্বারা তাদের দক্ষ ও স্বনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার প্রয়াস নেন রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে এলম্‌হার্স্ট জানিয়েছেন—

“ We soon discovered that many of the traditional craftsmen we met were near starvation. Could they be brought in for special courses in new techniques; could they get credit and would they co-operate to obtain it? Who would help over marketing and the trying out of new designs? Nandalal Bose and his young artists from Kalavabana early on lent us a hand in this field. The muchis, the lack workers, the weaver, the carpenters all came to serve either to train or to work. Slowly workshops for training were set up and later for production.”[৫২]

১৪. রবীন্দ্রনাথ সে যুগে দাঁড়িয়েও বুঝেছিলেন আমাদের দেশে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে গেলে শুধুমাত্র কৃষিজ ফলনের উপর ভিত্তি করলে হবে না, গ্রামীণ শিল্পের উপরও জোর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর বা ভারী শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর অধিক জোর দিতে চেয়েছেন। কেননা এ জাতীয় শিল্পের প্রসার অনেক বেশি এবং তাতে পল্লীর অধিক সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে। এও দেখা গেছে দেশের ক্ষুদ্র শিল্প রপ্তানি বাণিজ্যে যতখানি অগ্রণী বৃহৎ শিল্পগুলি ততটা নয়।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র বা কুটীরশিল্পের উজ্জীবন প্রয়াস আজকের দিনের উদারনৈতিক অর্থনীতিতে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। অর্থনীতির উদারীকরণের ফলে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলি বা কোম্পানীগুলি আমাদের দেশের বাজারগুলির উপর পুঁজির দাপটে একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করায় ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি—বিশেষ করে কুটীরশিল্প খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে বা মুখ থুবড়ে পড়েছে। দেশের শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত পুঁজির সিংহ ভাগ হাতে গোনা কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অধীন হয়ে পড়েছে। ফলে বহু মানুষ তাদের কাজ হারাচ্ছে, বেকার সমস্যা তীব্রতর হয়ে উঠছে। যে দু-একটি

কুটীরশিল্প কোনমতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে সেখানে স্বল্পহারের মজুরী শ্রমিকদের দারিদ্র্যকে প্রকট করে তুলছে। ফলে দারিদ্র্যের পুঞ্জীভূত ভার এদেশে ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কৃষির পাশাপাশি আজকে আমাদের দেশে মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার অর্থনীতি ও বেকার সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত জরুরী। কেননা—

" দেশীয় ছোট ছোট শিল্পদ্যোগীদের উৎসাহিত করলেই না সত্যিকারের দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে যেখানে শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের জীবনমানের উন্নতি একদিকে বাজারের বিকাশ ঘটায় আর অন্যদিকে নানাভাবে তাদের সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ঘটে। বিজ্ঞানের সূত্রগুলি তো আর এক এক দেশে এক এক রকম নয়। তাই সেগুলি আত্মস্থ করে দেশের মানুষ উৎপাদনের জন্য উন্নত প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে পারবে এমন ভাবনা করতে পারে একমাত্র ঔপনিবেশিক মতাদর্শে নিমজ্জিত দেশীয় শাসকেরা।"[৫৩]

পল্লীর যথার্থ উন্নয়নের জন্য তাই শুধুমাত্র কৃষি নয় শিল্পের বিকাশও অত্যন্ত জরুরী। কেননা—" বিপুল কৃষক জমির উপর অধিকার পেয়ে উদবৃত্ত ফসল বাজারে বিক্রি করতে পারলেই না শিল্প পণ্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা তৈরি হয় এবং শেষতঃ বড় আকারে শিল্প গড়ে তোলবার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি ও পণ্যের চাহিদা দুটোই হাজির থাকতে পারে।"[৫৪] শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে এই কুটীরশিল্পে অভাবনীয় উন্নতি পার্শ্ববর্তী কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামগুলির সমৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে জাতীয় কিংবা রাজ্যস্তরের রাজনীতিতে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির অন্ত নেই রাজনৈতিক দলগুলির। কৃষকের ইচ্ছার বিপরীতে গিয়ে জমি অধিগ্রহণকে অগণতান্ত্রিক মনে হতে পারে। এমনটাও বলা হয়ে থাকে কৃষকের বহুফসলী জমিকে কেড়ে নেওয়াটা অত্যন্ত অন্যায়। একথা ঠিক যে বহুফসলী জমির তুলনায় অনাবাদী জমির অধিগ্রহণই নৈতিক দিক থেকে সমর্থনীয়। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলি কৃষকের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার অজুহাতে যে রাজনৈতিক প্রচার-উদ্যোগ নিয়ে থাকেন সেই প্রয়াসের সামান্য যদি কৃষকের যথার্থ হিতে ব্যায়িত হত তাতে কৃষকের প্রকৃত অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন সম্ভব হত।

আজকের দিনে উদারনৈতিক অর্থনীতির কৃপায় যে কৃষিবিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা নিংড়ে নিচ্ছে কৃষকদের। জমির বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হাতে জমি হারাচ্ছে কৃষকরা। কৃষিকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ থেকে সরকার প্রায় হাত গুটিয়ে নিয়েছে। আমদানি-রফতানি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতির বিলোপের ফলে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে কৃষকদের ক্ষুদ্র উদ্যোগ। উপরন্তু উন্নততর বীজ, সার, জল, কীটনাশক ইত্যাদির উপর থেকে ভর্তুকী তুলে দেওয়ায় এ সকল জিনিষের দাম অগ্নিমূল্য প্রায়। কৃষিশিক্ষার অভাবে বা কৃষিবিষয়ে দক্ষ

কর্মীনিয়োগের অভাবে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকাজ পরিচালিত হওয়ায় জমির উর্বরতাশক্তি নিম্নগামী। এমতাবস্থায় কৃষকের জমিতে উৎপাদন খরচ তার বিক্রয়মূল্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় বহুসংখ্যক কৃষকের আত্মহত্যা অনিবার্য জীবন-পরিণাম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সমালোচক তাই জানাচ্ছেন—

"দেশে গত এক দশক বা তারও বেশি সময়কাল ধরে ঘটে চলা কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা সত্যিই উদ্বেগজনক। বিভিন্ন গ্রাম-সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে দেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ কৃষিজমিতে উৎপাদন খরচ (পারিবারিক শ্রমমূল্য না ধরেও) কৃষি আয় অপেক্ষা বেশি অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে কৃষি থেকে প্রাপ্ত পারিবারিক আয় ঋণাত্মক। এই তথ্য আসলে ভয়াবহ কৃষক আত্মহত্যার আশংকা বহন করছে।"[৫৫]

যদি কৃষকের স্বার্থরক্ষাই রাজনৈতিক দলগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে কৃষির পরিকাঠামোগত ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজনৈতিক শক্তি ও আন্দোলনকে নিয়োজিত করাটা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। জমির প্রতি কৃষকের একটি মোহ বরাবরের জন্য কাজ করে থাকে। উদারনৈতিক অর্থনীতি তাতেও থাবা বসাচ্ছে ধীরে ধীরে। না খেয়ে মরার থেকে স্থায়ী পুঁজি আর পরিবারের সদস্যের চাকুরীর বিনিময়ে জমি হস্তান্তর অনেক কৃষকের কাছেই যথার্থ বলে মনে হয়। বিশেষ করে আমাদের দেশের এখনো অনেক পল্লীর মধ্যে বিদ্যুতের বন্দোবস্ত নেই। স্যালো ব্যবস্থায় জলসেচের সুবিধাটুকুও নেওয়া যায় না। ফলে কৃষিজমিগুলি বর্ষা আর শীতের মরসুমটুকু ছাড়া সারা বছরই পতিত পড়ে থাকে। অনুরূপ ক্ষেত্রে কৃষকের কাছে কৃষিকাজ খুব একটা লাভজনক ব্যাপার নয়। আর কৃষির উন্নয়ন ভিন্ন শিল্পের উন্নয়ন বা বিকাশ সম্ভব নয়।কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, উদ্বৃত্ত ফসল বাজারে বিক্রি করতে পারলেই শিল্পজাত পণ্যের আভ্যন্তরীন চাহিদা গড়ে ওঠে ও ভারী শিল্পের প্রয়োজনীয় পুঁজির রসদ নির্মিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেখানেই ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েন। কেননা তিনি কৃষি ও গ্রামীণ কুটিরশিল্পের পারস্পরিক পরিপূরকতা নির্মাণের সচেতন প্রয়াস নিয়েছিলেন। এদের বিরোধ গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে কতটা ক্ষতিকর বুঝেছিলেন বলেই কৃষকের জন্য শুধু সার, কীটনাশক, সেচের বন্দোবস্ত করেননি, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, বিপণন ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিকাঠামোটির যথাযথ উন্নয়নের জন্যই তিনি নিরন্তর প্রয়াস করে গেছেন, কৃষি আর শিল্পের পরিপূরকতা নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন।

১৫. রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ কুটীরশিল্পের পুনরুজ্জীবনকল্পে গো-পালন পরিকল্পনাকে গুরুত্ব সহকারে রূপায়ণের বন্দোবস্ত করেছিলেন। দুগ্ধ বা ডেয়ারী শিল্পকে ভালোভাবে গড়ে তুলে পল্লীর মানুষের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সুরক্ষার আশু প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। এই কারণে সন্তোষচন্দ্রের সহায়তায় শ্রীনিকেতনে যে ডেয়ারী ফার্ম গড়ে তোলার পরিকল্পনা

গৃহীত হয় পরবর্তী সময়ে সেই পরিকল্পনা স্বাধীন ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও গৃহীত হয়। রাজ্যস্তরেও বেশকিছু উদ্যোগ গৃহীত হয়—

" দেশের স্বাধীনতা লাভের পর, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে এবং পুষ্টিকর দুধ ন্যায্যমূল্যে পৌঁছে দিতে ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের উপার্জনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ডা: বিধানচন্দ্র রায় ১৯৫০ সালে হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্পের সূচনা করেন। এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল দৈনিক ৫০ হাজার লিটার। ১৯৬২ সালে তৈরি হয় বেলগাছিয়া সেন্ট্রাল ডেয়ারি। এই প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল দিনে ২ লক্ষ লিটার। ১৯৭২ সালে তৈরি হয় দুর্গাপুর দুগ্ধ প্রকল্প—এর উৎপাদন ছিল দিনে ৫০ হাজার লিটার। ১৯৮২ সালে তৈরি হয় বর্ধমান দুগ্ধ প্রকল্প—এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল দিনে ১০ হাজার লিটার। ১৯৮৩ সালে 'অপারেশন ফ্লাড' অনুযায়ী দুগ্ধ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে মিল্ক ফেডারেশনের প্রবেশ ঘটে। এই ফেডারেশন কৃষকদের কো-অপারেটিভ ভিত্তিতে বেশি দুধ উৎপাদনের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ ও উন্নত জাতের গোরু দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এজন্য রাজ্যব্যাপী ১৬ টা ইউনিয়ন তৈরি করে তাদের দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু পুরো ব্যাপারটায় কায়েমি স্বার্থের আধিপত্য ঘটায়, দুগ্ধ প্রকল্পগুলি মুখ থুবড়ে পড়ে। ফলে বর্তমানে সব মিলিয়ে সরকারী দুগ্ধ প্রকল্প গুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ দিনে মাত্র ৪০ হাজার লিটার।

এই রকম অবস্থায় নানা বেসরকারী উদ্যোগ কৃত্রিম দুধ জোগানোর কাজে তৎপর হয়েছে। গত আট-দশ বছরে, নানা কোম্পানীর ছাপ দেওয়া ভেজাল দুধে বাজার ছেয়ে গেছে। দূরদর্শন, সংবাদ পত্রে বিভিন্ন সময়ে দেখানো হয়েছে, কীভাবে এসব দুধ তৈরি হয়। ছানার জলে ডিটারজেন্ট সহ নানা ক্ষতিকর পদার্থ মিশিয়ে এইসব দুধ পুষ্টিকর পানীয় হসাবে শিশু, বৃদ্ধ মানুষ, অসুস্থ রোগীরা খেয়ে আরও অসুস্থ হচ্ছে। গত ১৯. ১. ২০১২ তারিখে জনপ্রিয় দৈনিক সংবাদপত্রের প্রথম সংবাদ—'রাজ্যের দুধ ভেজালে ভরা, সতর্কবার্তা পাঠাল দিল্লি'। সংবাদসূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, — এ রাজ্যের ডেয়ারির দুধে ভেজাল এবং শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর নানা ধরণের বস্তুর সন্ধান মিলেছে। ভেজাল হিসাবে জল ছাড়াও নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি পরিমাণে বিভিন্ন ধরণের রাসায়ণিকের অস্তিত্ব মিলেছে। পাওয়া গিয়েছে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া। গত মাসে নমুনা পরীক্ষায় এ রাজ্যের বিভিন্ন ডেয়ারির সরবরাহ করা দুধ সম্পর্কে এই উদ্বেগজনক সত্য জানা সম্ভব হয়েছে। খাদ্য বস্তুর গুণমান রক্ষার কাজে যুক্ত ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া (F.S.S.A.I.) গোটা দেশেই এই নমুনা পরীক্ষা চালায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংগৃহীত নমুনার ১০০ শতাংশই তাদের পরীক্ষায় বাতিল বলে গণ্য হয়।"[৫৬]

জীবন ধারণের জন্য আমরা যে প্যাকেটের দুধের উপর নির্ভরশীল সেগুলি যদি বিষে ভরা হয় তাহলে এর পরিণতি ভেবে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। শতবর্ষেরও পূর্বে রবীন্দ্রনাথ

তাই আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গো-পালনে উদ্যোগী হতে বলেছিলেন। স্বাধীনতার প্রায় সত্তর বছর পরেও রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণী ও উদ্যোগ কতটা প্রাসঙ্গিক তা ভাবলে অবাক হতে হয়। হাঁস ও মুরগীপালন গ্রামীন অর্থনীতির একটি নির্ভরযোগ্য ধারা হয়ে আজও বহমান—যার বড় দৃষ্টান্ত পোল্ট্রি ফার্ম। বৈজ্ঞানিক প্রথায় ছাগল চাষ গ্রামীণ অর্থনীতির একটি বড় আশ্রয়। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাব ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতি সরকারী উদাসীনতায় এই শিল্পগুলিও আজ ধুঁকছে। অথচ এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলির দ্বারা পল্লীর তথা দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলা যেত—যেমনটা বাংলাদেশে মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ ও ইউনূস তাই একালেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। আর জাতীয় স্বার্থে সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ দেশীয় শিল্প ও প্রযুক্তির যে প্রসারের কথা জানিয়েছিলেন আজকের বিশ্বায়ন আর উদার অর্থনীতির যুগে তা ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

১৬. সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথ পল্লী সংস্কৃতির উজ্জীবন ও পল্লীসাহিত্য সংরক্ষণের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তারই ফলশ্রুতি বিভিন্ন জেলায় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা—যার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

১৭. রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে সেই উনিশ শতকের নয়ের দশক থেকেই ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিলেন। পল্লীজীবনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং অশিক্ষাই যে তাদের যাবতীয় রোগশোকের কারণ তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সে কারণে প্রতিটি পল্লীকে স্বাস্থ্যকর করে গড়ে তোলার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, জঞ্জাল ও আগাছা পরিষ্কার, পুরনো পুকুর সংস্কার ও নতুন পুকুর নির্মাণের পাশাপাশি পাণীয় জলের ব্যবস্থায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্যানেটারি সিস্টেম গড়ে তোলার পাশাপাশি পরিবার পিছু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত রিপোর্ট কার্ডও চালু করেছিলেন। গ্রামের মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা দান করার লক্ষ্যে তিনি নির্দেশিকা সম্বলিত লিফ্‌লেট বিতরণেরও ব্যবস্থা করেন— আজকের দিনের নির্মল গ্রাম পরিকল্পনা মধ্যে এ-জাতীয় প্রয়াসেরই স্পষ্ট প্রতিধ্বনি রয়েছে। যক্ষা ও কলেরার মতো সংক্রামক বা মহামারী জাতীয় রোগের মোকাবিলার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশেষ স্বাস্থ্য সমবায় সমিতিও গড়ে তুলেছিলেন—বর্তমান ভারতবর্ষে যার প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু মৃত্যু নিবারণ, প্রসূতি মৃত্যুর হার কমানো, বৈজ্ঞানিক জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যে প্রচলন রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় তারই অনুবর্তন চোখে পড়ে। স্বাধীনতা-উত্তর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এইসকল সংক্রামক রোগগুলির নিরাময় পরিকল্পনাই প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইন্‌ডোর ও আউট্‌ডোর চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথই বুঝেছিলেন বৃহত্তর গ্রামীণ ভারতবর্ষের উজ্জীবন ভিন্ন দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশকে তথা পল্লীকে আত্মশক্তিতে দাঁড় করাতে গেলে তার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেই সবার পূর্বে যথাযথ করে গড়ে তোলা আশু আবশ্যক। কেননা অসুস্থ ও রুগ্ন শরীর নিয়ে কোন গঠনমূলক কাজ করা যায় না। সেবার মানসিকতা ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগই রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সফলতার কারণ হয়েছিল। তাঁর সেই প্রগতিচেতনাকে স্বাধীন ভারতই বা কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে ! আজ আমরা দেশের উন্নয়নের ধুয়ো তুললেও রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথানুসরণকে রাজনৈতিক দলগুলি বা সরকার নিজেদের স্বার্থেই এড়িয়ে গেছে।

স্বাধীনতা লাভের পর সংক্রামক রোগের মোকাবিলার জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তারও গভীরে নিহিত থেকেছে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। মহামারী জাতীয় রোগের খাতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ালেও সরকার সাধারণ স্বাস্থ্যের বরাদ্দে কাটছাঁট করে। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় সংক্রামক রোগ নিরাময়ে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায়নি। ভোরে কমিটির সুপারিশ মেনে ১৯৫২ থেকে এদেশে প্রথম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Primary Health Centre) স্থাপিত হয়। কিন্তু সেগুলির নিম্নতম গুণমান ও নিতান্ত অপ্রতুলতার কারণে মহামারী জাতীয় রোগ প্রতিরোধ বা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে ব্যর্থ হয়। ১৯৫৯-এ যে মুদালিয়ার কমিটি স্বাস্থ্যব্যবস্থার পর্যালোচনা করতে গিয়ে জানায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য-পরিষেবা ভারতের অর্ধেক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেনি। এরপর গঠিত হয় শ্রীবাস্তব কমিটি, ১৯৮৩-তে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি (National Health Policy NHP), 2000 সালে 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' পরিকল্পনা। ২০০২ সালে যে নতুন জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি (National Health Policy NHP) গৃহীত হয় তাতে বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ানোর উপর জোর দেওয়ার ফলে বড় বড় কর্পোরেট হাসপাতাল গড়ে উঠতে থাকে যেখানে ধনীরা স্বাস্থ্যের সুযোগ লাভ করতে থাকে। ফলে দেশের সাধারণ মানুষেরা প্রাথমিক চিকিৎসার সামান্য সুযোগ না পেয়ে মৃতপ্রায় জীবনযাপন করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে ভারতসরকার National Rural Health Mission (NHRM) চালু করে।

ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য পরিষেবার এই দীর্ঘ ইতিহাসে কিন্তু কখনোই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অর্থবরাদ্দ থেকেছে যৎকিঞ্চিৎ। ভোরে কমিটি ভারতবর্ষের মতো রোগ-মহামারী অধ্যুষিত দেশে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জাতীয় ব্যয়বরাদ্দের অন্তত ১৫ শতাংশ ব্যয় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে করার জন্য সেখানে বর্তমানে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বরাদ্দ কমে এসেছে ১—২ শতাংশ । তাই কলকাতা ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর ডা: নির্মলেন্দু সরকার জানান—

" স্বাস্থ্যের জন্য অর্থ-বরাদ্দে ভারত সরকারের এই কুন্ঠা ও কার্পণ্যের জন্যই জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন এক বাগাড়ম্বর ভিন্ন কিছুই হয়নি। আসলে যেটা প্রধান সমস্যা আজ সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য সেটা হচ্ছে দুই বিপরীতমুখী স্বার্থের সংঘাত। যে স্বাস্থ্য নীতি বেসরকারী স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকে (যার মুনাফাই প্রধান উদ্দেশ্য) সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চাইতে বড় করে দেখতে চায়, যেখানে রোগ নিবারণের চাইতে অতি-বিশেষজ্ঞ দ্বারা রোগ নিরাময়ই প্রধান উদ্দেশ্য, যেখানে মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থা, একজন চিকিৎসককে বিশেষজ্ঞ বা অতি-বিশেষজ্ঞ করে গড়ে তুলতে চায় যাতে সে দেশের বড়ো বড়ো বেসরকারি হাসপাতালে বা বিদেশে গিয়ে কাজ করতে পারে, যেখানে প্রযুক্তিনির্ভর শহরকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই কাম্য হয়ে যায়, সেখানে সাধারণ দরিদ্র ভারতবাসীর স্বার্থ কখনোই সুরক্ষিত থাকতে পারে না। ভারতের বিগত দুশো বছরের ইতিহাসে স্বাস্থ্য পরিষেবার এই ট্র্যাজিক পরিণতিই আজকে সবার কাছে সবচেয়ে বেদনাময় এবং পরিতাপের বিষয়।......

.........সরকারি ধারাবাহিক অবহেলা, সময়োচিত আধুনিকীকরণের অভাব , অসম্ভব জনসংখ্যার চাপ, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অন্যায় আবদার ও জুলুম এবং এক শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সীমাহীন দুর্ণীতি ও ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার জন্য ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থা জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হতে শুরু করল। যে কোন সরকারি হাসপাতাল তা সে জেলা, মহকুমা স্তরেই হোক বা মেডিকেল কলেজগুলির স্তরে, সাধারণ মানুষের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সব সময়ই আতঙ্কিত হবার মতো। সবসময় প্রচুর লোকজনের ভিড় ও লম্বা লাইন, চারিদিকে আবর্জনা ও পূতিদুর্গন্ধময় পরিবেশ, যত্র তত্র স্বেচ্ছাসেবীর মুখোশে দালাল শ্রেণির অবাধ বিচরণ, এক শ্রেণির হাসপাতাল কর্মীর হৃদয়হীন ব্যবহার এবং জরুরি বিভাগগুলিতে প্রায়ই সিট নেই এই আশঙ্কা, আর বহির্বিভাগগুলিতে কোথায় গেলে সঠিক 'ডাক্তারবাবুকে' দেখানো যাবে সেই ব্যাপারে এক বিশৃঙ্খল দৃশ্য—এইসব মিলিয়ে বিগত কয়েক দশক ধরে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা এত বিষম যে একজন মানুষ সরকারি হাসপাতালে যেতে সত্যি সত্যি ভয় পায়।"[৫৭]

আজকের দিনে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সেবার মানসিকতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছার নিতান্ত প্রয়োজন। যদি দেশকে সংগঠিত ও উন্নত করে গড়ে তুলতে হয়, আত্মশক্তিতে স্বনির্ভর করে তুলতে হয়, তাহলে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যপরিষেবাকে সবার আগে উন্নত করে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। তবেই রবীন্দ্রনাথ কথিত আত্মশক্তিতে নির্ভর সংগঠিত দেশ গড়ে তোলা যাবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনা বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা সেখানেই।

১৮. রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনার অপর উল্লেখযোগ্য দিক ছিল নারীর স্বাধিকার রক্ষা ও নারীশক্তির উজ্জীবন। আজকের দিনেও অমর্ত্য সেন থেকে শুরু করে মুহাম্মদ

ইউনূস পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে নারী স্বাধিকারের স্বপক্ষে সওয়াল করেছেন। দেশের বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে নারীশক্তিকে সম্মিলিত করতে না পারলে সেই দেশ আজকের বিশ্বায়নের বাজারে অনেকটাই পিছিয়ে পড়বে। তবু আজো রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত পথটিকে অবলম্বন করার সদিচ্ছা দেখাতে পারেনি ভারতবর্ষীয় সমাজ। আজো ভারত তথা দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের অন্যতম প্রধান লিঙ্গবৈষম্য প্রদর্শনকারী অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। মাতৃগর্ভে কন্যাভ্রুণ সৃজন থেকে শুরু করে কন্যার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাকে নানা লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হতে হয়। শিক্ষা, রাজনীতি, চাকুরী, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই এর প্রতিফলন আজো স্পষ্ট। আমাদের সমাজে আজ পুরুষদের হাতে নারীরা ধর্ষিত হয়ে চলেছে এবং তার হার বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। ন্যাশন্যাল ক্রাইম্ ব্যুরোর রিপোর্ট অনুসারে শুধু পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯২-তে ৬০৫ জন, ১৯৯৭-তে ৮১২ জন, ২০০২-তে ৮২৩ জন ২০০৭-এ ২০৩৩ জন , ২০১১-তে ২২৪০ জন নারী ধর্ষিত হয়েছে (সংখ্যাগুলি ৩ বছরের গড়, মাঝের বছরে কেন্দ্রীকৃত)। শুধু ধর্ষণের খতিয়ান বাদ দিলেও স্বামী গৃহে নারীরা আজো অত্যাচারিত হয়ে চলেছে নিরন্তর এবং তার মাত্রা বেড়ে চলেছে ক্রমান্বয়ে। ন্যাশন্যাল ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্ট অনুসারে শুধু পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯২-তে ১৯৭২ জন, ১৯৯৭-এ ৩৬২৩ জন, ২০০২-এ ৪২৯২ জন, ২০০৭-এ ১০২২৬ জন, ২০১১ তে ১৯১২৮ জন নারী স্বামীগৃহে অত্যাচারিত হয়েছে (সংখ্যাগুলি ৩ বছরের গড়, মাঝের বছরে কেন্দ্রীকৃত)। পূর্বোক্ত পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় আমাদের দেশ নারীদের উপর সামগ্রিক অপরাধের দিক থেকে কী ভয়ানক অবস্থায় রয়েছে। এই পরিসংখ্যান সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে একই। একাধিক আইন প্রণয়ন করেও কিন্তু নারীদের উপর এই অত্যাচারে কোন লাগাম টানা যায়নি।

নারীদের তাই স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতামতও তাই। কারণ নারীরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠলে, অধিকার সচেতন হয়ে উঠলে এই সামাজিক অপরাধপ্রবণতা কমবে। উপরন্তু দেশের শক্তিতে দ্বিগুন বল সঞ্চারিত হবে। অথচ পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশে শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের হার অত্যন্ত কম। প্রতি একহাজার জন পুরুষের মধ্যে আমাদের দেশে ৫৩৮ জন পুরুষ যেখানে শ্রমশক্তিতে রয়েছে তার মধ্যে ৪৯৫ জন কাজ করছে, সেখানে এক হাজার নারীর মধ্যে মাত্র ১৬৩ জন শ্রমের জন্য কাজের বাজারে হাজির হচ্ছেন এবং কেবলমাত্র ১৪০ জনের ভাগ্যে কাজ জুটছে। এই পরিসংখ্যান জানান দেয় আমাদের সামাজিক মানসিকতা এখনো পর্যন্ত নারীর স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের ব্যাপারে তেমন ইতিবাচক আগ্রহ দেখায়নি। যেহেতু কাজের জন্য নারীদের অংশগ্রহণের তেমন কোন আকাঙ্খা সামাজিক কারণেই তৈরি হতে দেওয়া হচ্ছে না তাই দেশের বিপুল পরিমাণ শ্রমশক্তি অনিয়োজিত অবস্থায় থেকে যাচ্ছে—যা দেশের প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। সমাজ মানসিকতার পরিবর্তন না হলে হালের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের মতো প্রকল্পও একদা

মাঠে মারা পড়বে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে এক্ষেত্রেও তাই সমানভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। তাঁকে উঁচু আসনে বসিয়ে বাঙালি পুজো করলেও তাঁকে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি নিজের জীবন ও কর্মের মাঝে স্থাপন করেনি পূর্বোক্ত পরিসংখ্যানগুলি সেদিকেরই জানান দেয়। রবীন্দ্রনাথের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা তাই আজকের দিনেও সমানভাবে কার্যকরী।

১৯. রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা তথা দেশোন্নয়ন ভাবনা আজকের দিনে আমাদের জীবনে স্বতন্ত্র প্রাসঙ্গিকতা পেয়ে যায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনাকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথ দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের বিপক্ষে ছিলেন না। তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মযজ্ঞের অন্যতম লক্ষ্যই ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রকে অস্বীকার না করলেও অত বেশি গুরুত্ব দিতে রাজী ছিলেন না, যে কারণে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বতন্ত্র গ্রাম-সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুদৃঢ়ীকরণ চেয়েছিলেন। এর মধ্যে কেউ কেউ ইউটোপিয়ান চিন্তাধারার নিদর্শন খুঁজে পান। সে আসলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ইতিহাস চেতনার অপরিপক্কতার ফসল। সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিকতার বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আর আজকের দিনে গণতন্ত্রের সঙ্কটকে স্মরণ করলে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

" পৃথিবীর সামাজিক ইতিহাসে গণতন্ত্র কিন্তু খুবই প্রাচীন। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বা Direct Democracy প্রাচীন গ্রীসে, রোমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর টিউটন উপজাতিদের মধ্যে, সুইটজারল্যান্ডের প্রাচীন ক্যান্টনগুলিতে প্রচলিত ছিল। এগুলি ছিল দলহীন গণতন্ত্র। সংখ্যাগুরুর ইচ্ছাই সাধারণের ইচ্ছা বলে গৃহীত হোত।

ভারতে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত যে রিপাবলিক বা সাধারণতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি 'গণ' বা 'সংঘ' নামে পরিচিত ছিল। এদের আসলে বলা যায় ক্ষত্রিয় কূলের স্বয়ংশাসিত অভিজাত সাধারণতন্ত্র। ক্ষত্রিয় জাতির সভ্যরাই ছিল এর প্রভু। ভারতের প্রাচীন 'গণ'গুলি ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের নিদর্শন। এদের কিছু ছিল একক সংঘ, কিছু ছিল মিলিত সংঘ। গৌতম বুদ্ধের সময়ে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম ও পঞ্চম শতাব্দীতে বৈশালীর লিচ্ছবিরা এবং কুশীনগরে মল্লরা ছিল সর্বাগ্রগণ্য। মৌর্যরা ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গণ। লিচ্ছবি ও মল্লরাজের আদর্শ বৌদ্ধসংঘের সংগঠনকে প্রভাবিত করেছিল। তাই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ভাবনা ভারতে অপরিচিত নয়।"[৫৮]

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Representative Democracy) বা অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধারণা গড়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। এতে গণ কেবল ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারে কিন্তু আইন প্রণয়ণ বা শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলন্ডে এ জাতীয় গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। স্বৈরতান্ত্রিক রাজশক্তিগুলির বিরুদ্ধে

সমাজের বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই আধুনিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এরপর বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী সমাজের সমালোচনার মধ্য দিয়ে মার্কস গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতাকে প্রকট করে তোলেন। ফলে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যস্থতায় শ্রেণীবৈষম্যের অবসান অবসান ঘটিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই গণতন্ত্রের লক্ষ্য হয়। আধুনিক কালে গণতন্ত্র যে একটি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ধারণা সে বিষয়ে মার্কসীয় বা অমার্কসীয় রাষ্ট্রতাত্ত্বিকেরা একমত। আমাদের দেশে ১৯৪৯-এ সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের সূচনা। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানটি গড়ে ওঠে Government Of India Act 1935 অনুসারে—যেটি আসলে বৃটিশদের রচনা। সেই হিসেবে আমাদের দেশের সংবিধান ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার ফসল।

আমাদের দেশের সামাজিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউরোপের গণতান্ত্রিক চেতনার জন্ম হয় বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন, শিল্পবিপ্লব, নগরায়ণ ও একাধিক রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। গণতন্ত্র বিকাশের এই প্রাথমিক শর্তগুলি আমাদের দেশে অনুপস্থিত। গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থার উপরিকাঠামো হয়ে থাকেনি। ব্রিটেন ও ইউরোপের কিছু দেশে তাই রাজতন্ত্র বজায় থাকলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন বিঘ্ন ঘটেনি। রাজতন্ত্র সেখানে গণতন্ত্রের অধীন। কিন্তু আমাদের দেশে রাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই সিংহাসনের অধিকারকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাদখলের লড়াই বা পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বহমান থেকেছে, রাজশক্তির পরিবর্তন ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দী অবধি এই ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাস। সমাজের উপরতলার এই বিরোধের জটিল বিশৃঙ্খল প্রকাশ কিন্তু ভারতের বৃহৎ গ্রামীণ কৃষিনির্ভর সমাজের মধ্যে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। ফলে এদেশের সাধারণ নিরক্ষর মানুষ গণতন্ত্র সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার কোন অবকাশ পায়নি। উনিশ শতকে এদেশে বাংলায় রেনেসাঁর সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে রেনেসাঁ-প্রসূত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধ, মানবিকতাবোধ সেখানকার দেশগুলির শিল্প সংস্কৃতি, সাহিত্য দর্শনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যেমন চেতনাসংস্কারের কাজ করেছিল এদেশের ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি। বাংলার নগরকেন্দ্রিক রেনেসাঁ এদেশের পল্লী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। ফলে ভারতের গণতন্ত্র ইউরোপের গণতন্ত্রের মতো নিজস্ব চেষ্টায় কোন হয়ে- ওঠা ব্যাপার নয়—বাইরে থেকে আরোপিত।

তাছাড়া দলতন্ত্র আমাদের দেশের মতো ইউরোপীয় গণতন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেখানকার দলগুলি একই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠায় তাদের মধ্যেকার যে দ্বন্দ্ব তাকে বলা চলে 'Non-Antagonistic'। কোন গুণগত পরিবর্তনের কথা তারা ভাবতে পারে না। সেখানে দলপ্রথা

পদে পদে শ্রেণীবৈষম্য, জাতপাতের বৈষম্য, ভাষা তথা সাংস্কৃতিক বৈষম্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, গণতন্ত্রে সঙ্কটকে ঘনিয়ে তোলে না। কিন্তু ভারতে এর বিপরীত ছবিটি দেখা যায়। তার সঙ্গে রয়েছে আঞ্চলিক স্বার্থের প্রশ্ন, অঙ্গরাজ্যগুলোর নিজস্ব স্বার্থের প্রশ্ন, শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন। এই বৈষম্য ও বিরোধ এদেশের গণতন্ত্রকে, তার রাষ্ট্রিক কাঠামোকে ভঙ্গুর করে তুলছে। আসলে এই বিরোধ আর বৈষম্যকে ভিত্তি করেই এদেশের রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে চরম সঙ্কট বয়ে আনে—

“ ভারতের দলপ্রথার চরিত্রলক্ষণই ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত যেখানে নিয়ন্ত্রক শক্তি সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠই সত্য—এটা মেনে নিতে হয়। যে দেশে অশিক্ষার হার বিপুল, সে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার কখনই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, বণিক সমিতি ইত্যাদি সংস্থার নেতাদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। জীবনের সকল বিভাগের সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের জন্য, নিজেদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে জনসাধারণের সম্মতি অর্জনের জন্য এরা যে পন্থা অবলম্বন করে তা হল অযৌক্তিক প্রচারকার্য—যা স্বার্থবাহী, আদর্শবাহী নয়। তাই এদেশে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত।

যাঁরা গণতন্ত্রকে একটি ভাবাদর্শ বা জীবনপন্থা বলে ভাবেন, তাঁদের কাছে গণতন্ত্র একটি সর্বব্যাপী জীবনদর্শন। জীবনের রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সবকিছুই এর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার কয়েকটি পূর্বশর্ত আমাদের মানতে হবে। শিক্ষিত সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন সামাজিক মানুষ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, সেই সাথে পরমতসহিষ্ণুতা হল পূর্বশর্তগুলির অন্যতম।”[৫৯]

রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপেক্ষা এইসকল পূর্বশর্তগুলির পূরণের ব্যাপারেই অধিক জোর দিয়েছিলেন। কেননা তা না হলে গণতন্ত্রের সাফল্য অধরা থেকে যায়, সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে ওঠে। বৃটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের ত্রুটি বা সংকট রবীন্দ্রনাথের কাছে যে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা তাঁর রচনাগুলিই স্বাক্ষর দেয়। বিটিশ শাসনতন্ত্রের কাঠামোটি যে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে বেমানান তা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন। সে কারণে বিকল্প এক গণতন্ত্রের খোঁজ তাকে করতে হয়েছে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ গণতন্ত্রের স্বপক্ষে ছিলেন না এমন কথাও কোন কোন সমালোচক বলে থাকেন।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ বৃটিশ-ভারতের সংবিধান প্রসূত প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বা রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন

না। আজকের দিনে সারা বিশ্ব জুড়ে গণতন্ত্রের যে বিপুল সঙ্কট, তার যে ব্যর্থতা রবীন্দ্রনাথের এই না-সমর্থনেরই ফলপরিণাম। ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের এই বিপুল সঙ্কটের কথা বলতে গিয়ে সমালোচক জানান—

" যদি বিচার করা হয় ভারতে এই মুহূর্তে গণতন্ত্র রয়েছে কাদের ? প্রশ্নটা আর একটু সহজ করে নেওয়া যাক। কোন কোন শ্রেণিগুলি নিজ নিজ স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় তাদের কার্যকলাপ চালাতে পারে ? এই যেমন অধিক মুনাফার লক্ষ্যে গাড়ি কারখানার জন্য টাটার দরকার ছিল সিঙ্গুরের জমি ও সহকারী সহায়তা। আর কৃষক চেয়েছিল তাদের বহুফসলী জমির অধিকার বজায় রাখতে। অনেকে হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে সিঙ্গুরে জমির চরিত্র বদল হয়ে কারখানা গড়ে ওঠাটা অর্থনীতির পক্ষেও ক্ষতিকর। কিন্তু রাষ্ট্র কাকে সাহায্য করেছিল? একইভাবে বলা যায় যে ভারতে বড় বাঁধ যে পরিমাণে গড়ে উঠেছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বন্যা প্লাবিত অঞ্চলের পরিমাণ। কিন্তু তাতে কী নর্মদার উপর বাঁধ আটকানো গেছে? একইভাবে উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় সহ গোটা মধ্য ভারতেই প্রাকৃতিক সম্পদ লুন্ঠনে কর্পোরেট পুঁজিকে সহায়তা দিতে রাষ্ট্র জনগণের কোন অধিকারকেই মান্যতা দিতে প্রস্তুত নয়। এই সমস্ত ঘটনাবলীর উপর নজর রেখে বিশেষ কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়াই বলা যায় ভারতে গণতন্ত্র রয়েছে সেইসব বিদেশী কর্পোরেট সংস্থার যারা নিয়মিত শোষণের পাশাপাশি দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকেউচ্ছেদ করে জল-জঙ্গল-জমির উপর দখল নিতে চাইছে, ২০ কোটি মানুষের জীবিকা বিপন্ন করে খুচরো ব্যবসার দখল নিতে চাইছে, গণতন্ত্র রয়েছে সেসব দেশীয় বৃহৎ পুঁজিপতিদের যারা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সেবা করার মাধ্যমেই নিজেদের পুষ্ট করে।"[৬০]

এ কারণে রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের চাইতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন—যা প্রাচীন গ্রীস বা ভারতে পূর্বে বর্তমান ছিল। চেয়েছিলেন এদেশের বৃটিশ প্রশাসনিক খোল-নলচেটাকেই আমূল পালটে দেশীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা দানের জন্য। তাঁর গ্রাম-সমাজ বা 'স্বদেশী সমাজ' পরিকল্পনা সে দিকেরই ইঙ্গিত দেয়। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে সকল মানুষের বিচিত্র অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সে গণতন্ত্রের স্বতুন্ত্র এক রূপ। স্বায়ত্তশাসিত গ্রামপরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ যে সকল কথা বলেন তার মধ্যে এর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আছে। সেখানে সকল গণই সমান মর্যাদা পায়, সকলেই প্রশাসন বা নীতি নির্ধারণে অংশ গ্রহণ করতে পারে। নিজেদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থার উজ্জীবন ঘটিয়ে স্বাবলম্বী ও গণতন্ত্র সচেতন হয়ে উঠতে পারে। সেই গ্রাম-সমাজ রাষ্ট্রের বিরোধী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে না আবার রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও হয় না। রাষ্ট্রের সমান্তরালে গণতান্ত্রিকতার দ্বার উন্মুক্ত রাখে। পুঁজিশাসিত বিশ্বায়নের স্রোত সেখানে উন্নয়নের মানবিক মুখকে বিসর্জন দিতে পারে না।

এজাতীয় গ্রাম-সমাজ পরিকল্পনাকে কেউ কেউ তাই বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতির দ্বার রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকা এক 'সর্বনাশা কল্পনা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ একে Utopian বলে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু আজকের দিনের সংস্কারের অর্থনীতিতেও শুনি রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় অর্থনৈতিক চিন্তার স্বতন্ত্র প্রাসঙ্গিকতাকে—

" এর অর্থ এই নয় যে বাজারের বিপরীতে পরিকল্পিত অর্থনীতি গড়া 'সর্বনাশা কল্পনা' হ'তেই বাধ্য। ....কাজটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়; 'সর্বনাশা কল্পনা' নয় এটি। আস্থা রাখতে হবে মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতার ওপর। যে উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে মানুষ এমন একটা সমাজ গড়তে পারবে না যেখানে বাণিজ্য চক্রের মার নেই, নিয়োগহীনতার সমস্যা নেই এবং সামাজিক উৎপাদনের বন্টনে সাম্য নেই—এটা হ'তে পারে না। —মান্থলি রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এই ধরণের কথা বলেছিলেন আইনস্টাইন যাঁর মেধার মান নিয়ে আজও কোনো প্রশ্ন নেই। কথাটা সঙ্গত কথা। উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে মানুষ এরকম একটা সমাজ গড়বে এই প্রত্যাশা ইদানীং ক্রমবর্ধমান, কেননা বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে ব্যক্তিমানুষের বিপন্নতা। প্রত্যাশা যত বাড়বে , এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার তাগিদও তত বাড়বে। সমাজ এরকমই, এরকম সমাজ নিয়েই তুষ্ট থাকতে হবে। ' spontaneous developed order'-এর কাছে নতজানু হয়ে বাজার মৌলবাদীদের হাতে ভাগ্য সঁপে দিতে হবে—দেশে দেশে ক্রমশঃ বাড়ছে এই চিন্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। একবিংশ শতকের সমাজতন্ত্র এখন রীতিমত চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে সর্বত্র। সোভিয়েতের পতনের সাথে সাথে মতবাদ হিসেবে সমাজতন্ত্রকে কবরে পাঠানো যায়নি। এটাকে গুরুত্ব দেবার কোনো দরকার নেই—বাজার মৌলবাদীরা এরকম ভাবলেও বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতির ন্যায্যতা রক্ষার সমস্যা যে বাড়ছে লিবারেল মতবাদের বাজারপন্থীরা এটা বিলক্ষণ বুঝেছেন। সেইজন্যই তাঁরা রলস্-এর 'সামাজিক ন্যায়'-এর তত্ত্ব আর বাজার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কেইনসীয় তত্ত্ব ফিরিয়ে এনে বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতিতে একটা মানবিক মুখ প্রোথিত করার চেষ্টা করছেন এতটা গুরুত্ব দিয়ে।"[৬১] আর সেখানেই রবীন্দ্রনাথ দিনে দিনে বড্ড বেশি রকমের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন।

২০. রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত 'মণ্ডলী প্রথা'ই বর্তমান কালের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আদি রূপ। 'মণ্ডলী প্রথা' সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন—যা পূর্বোক্ত অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই প্রথা অনুসারে পাঁচটি প্রদেশের প্রধানরা মিলিত হয়েই গড়ে তুলতো এক একটি মণ্ডলী। একালের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায়ও পাঁচটি গ্রাম নিয়েই এক একটি পঞ্চায়েত গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মণ্ডলী প্রথা শিলাইদহ-পতিসর পর্বে বিরাট সাফল্য লাভ করেছিল। ঐক্য ও সমন্বয় ছিল এই প্রথার সফলতার একটি বড় দিক। কিন্তু

বর্তমানে আমাদের দেশে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পল্লীর উন্নয়নের যে সকল গাইডলাইন আছে তা এতটাই অস্পষ্ট যে এর মাধ্যমে কাজ করতে গিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। যে পঞ্চায়েত পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে পল্লীর সর্বাধিক উন্নতি হতে পারতো তা আজকের দিনে একটি অবহেলিত সম্ভাবনা হয়ে আজো থেকে গেছে। রাজনৈতিক দলাদলি, ব্যক্তিস্বার্থ, রাজনৈতিক স্বার্থ, সুবিধাভোগী এক শ্রেণীর অযোগ্য কর্মীর উপস্থিতি, সদিচ্ছার অভাবে পল্লীর উন্নতি আজ অবহেলিত। পঞ্চায়েতের কাজে আজ না আছে ঐক্য না আছে সমন্বয়। অথচ এই প্রতিষ্ঠানটিকেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীর একান্ত নিজের সামগ্রী বলে নির্দেশ করেছিলেন। কেন্দ্র-রাজ্য আইনের জটিলতা ও সমন্বয়ের অভাবে আজ তা অবহেলিত এক সম্ভাবনা হয়েই থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথ তাই আজকের দিনেও পল্লীর উন্নতির প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে যদি এর প্রতিবন্ধকতাগুলিকে রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে গড়ে তোলা যায়।

২১. রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন যজ্ঞের একটি বড় প্রাসঙ্গিকতা জাত-পাত-অস্পৃশ্যতার সঙ্কীর্ণ প্রাচীর ডিঙিয়ে পল্লীকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার প্রয়াস। এ বিষয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পীতির বিষয়ে রবীন্দ্রভাবনার প্রাসঙ্গিকতা উত্তরোত্তর জাতীয় রাজনীতিতে বেড়ে চলেছে। শুধু রবীন্দ্রনাথের সমকালে নয়, আজকের দিনেও আমাদের দেশের ঐক্যের পথে প্রধান অন্তরায় জাত-পাতের ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতার সমস্যা। এই বিভেদ-সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে ভারতবর্ষের যে মুক্তি আসতে পারে না একথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোরা' 'চতুরঙ্গ' 'ঘরে-বাইরে'র মত উপন্যাস ও একাধিক রচনার মধ্যে জানিয়েছেন। মানুষের নিবিড় ঐক্য ও সহযোগিতা ভিন্ন বৃহত্তর ভারতবর্ষ বা পল্লী-ভারতবর্ষের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

আজকের দিনে আমাদের দেশের বৃহত্তর সম্প্রীতির পথে প্রধান বাধা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন আমাদের দেশে এই দুই সম্প্রদায়কে একমাত্র কাজের ক্ষেত্রেই মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব। তার জন্য সমবায়কেই তিনি প্রধান হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে কিংবা পরে সংখ্যালঘু তোষণ ঐক্য অপেক্ষা বিভেদের বিষ বাষ্পকে পুঞ্জীভূত করে তুলেছে। যার ফলে একাধিক হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের রক্তক্ষয়ী পরিসর রচিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। যে সমবায়ের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিমের মিলনের একটা বড় ক্ষেত্র ছিল এদেশে সেই সমবায়ই আজ একটি অবহেলিত রুগ্ন ব্যবস্থা হয়ে থকে গেছে। সর্বোপরি শিক্ষার আলোক ছাড়া এদেশের মানুষের মনের অন্ধকার সরিয়ে, এই সকল প্রতিবন্ধকতাকে সরিয়ে যে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় সেকথা রবীন্দ্রনাথ বার বার জানিয়েছেন। কিন্তু আজো অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে আছে দেশের একটি বৃহত্তর সংখ্যক মানুষ। উপযুক্ত পরিকাঠামো ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে একাধিক পরিকল্পনা সত্ত্বেও শিক্ষাকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়নি। যতটুকু গেছে

তাতে নীতিশিক্ষা বা চরিত্রগঠনকেন্দ্রিক শিক্ষার নিতান্ত অভাব চোখে পড়ে। সম্প্রীতিচেতনার লালন ও আশ্রয় আছে এমন শিক্ষার আয়োজন জাতীয় জীবনে নগণ্য। সাম্প্রদায়িকতার বিষ আমাদের দেশকে একদিন দ্বিখণ্ডিত করেছিল, আমাদের হৃদয়কেও। রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথে হাঁটতে না পারলে আমাদের জন্য অদূর ভবিষ্যতে যে আরো বড় কোন সমস্যা অপেক্ষা করে থাকবে ইতিহাস সে কথা জানান দেয়।

২২. রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মযজ্ঞের অন্যতম লক্ষ্য ছিল মানবকল্যাণের অনুকূলে যন্ত্রের ব্যবহার—যা যুদ্ধবিরোধী মানসিকতা ও বিশ্বমৈত্রীর পরিপোষকতা করে। আজকের দিনে এর প্রাসঙ্গিকতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আজকের দিনে আরব, ইরাক, ইরান, ইজরায়েলের মতো দেশগুলির উপর আমেরিকার সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে যে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ, যুদ্ধের যে বিপুল ক্ষতি বিশ্বে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব অনুভূত হচ্ছে অত্যন্ত প্রবলভাবে। বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি আজকের দিনে যেভাবে সমরাস্ত্র বাড়িয়ে চলেছে, পারমাণবিক অস্ত্রখাতে প্রচুর অর্থ নিয়োজিত করর চলেছে। এর ভবিষ্যৎ পরিণাম ভেবে আজকে আমরা শিউরে উঠি। উন্নয়ন বা মানবিক প্রগতি অপেক্ষা আজকের দিনে শক্তির এই মদমত্ততা যেন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে। তাই রবীন্দ্রনাথের সমালোচককে একথাও স্বীকার করতে হয় যে—

" বুদ্ধের মৈত্রী ও খ্রীস্টের করুণা যাঁকে উদ্দীপিত করেছিল তিনি যে শান্তির সুললিত বাণী শোনাবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই শান্তির বাণী তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার অঙ্গ নয় কিন্তু তা যদি নিরস্ত্রীকরণের মধ্যে মূর্ত হয় তবে তার অর্থনৈতিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। বর্তমানে যে বিপুল সম্পদ সমরোপকরণ সংগ্রহের প্রতিযোগিতামূলক প্রয়াস নিযুক্ত হচ্ছে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের খাতে প্রবাহিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ কোনোদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে কিনা জানি না। যদি হয় তা হবে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যমোচনের পথে এক মহৎ পদক্ষেপ।"[৬২]

<u>উৎস নির্দেশ:</u>

১. কেশব চৌধুরী। ব্যক্তিস্বাধীনতার তত্ত্বনির্মাতা গান্ধী : একটি বিশ্লেষণ প্রয়াস। সমাজ জিজ্ঞাসা পত্রিকা। ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা একত্রে। বিদ্যাসাগর সেন্টার ফর সোস্যাল সায়েন্সেস। ২০১০। পৃ: ৩৩।

২. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। অমিত দাশ। গান্ধীপথ ও রবীন্দ্রনাথ। কোরক সাহিত্য পত্রিকা। কোরক । ১৪১৪ শারদ সংখ্যা। পৃ: ১৩৬।

৩. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। অমিত দাশ। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—গান্ধীভাবনার তিন পর্ব। রবীন্দ্রনাথ গান্ধী ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুস্তকবিপনী। ২০০৭। পৃ:২৭।

৪. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। অমিত দাশ। গান্ধীপথ ও রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৩৯।

৫. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। অমিত দাশ। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—গান্ধীভাবনার তিন পর্ব। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৬।

৬. উদ্ধৃতিসংগ্রহ। অমিত দাশ। গান্ধীপথ ও রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৪৩।

৭. স্বরাজসাধন। কালান্তর, সংযোজন অংশ। রবীন্দ্ররচনাবলী ১২শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৬৫০।

৮. হীরেন্দ্রনাথ রায়। কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)-এর ধনতন্ত্র সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা। ধনতন্ত্র বিশ্লেষণ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ২০০০। পৃ: ১১।

৯. রাশিয়ার চিঠি। রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৫৪৭।

১০. পূর্বোক্ত। পৃ: ৬০২।

১১. পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৬৮।

১২. অমর্ত্য সেন। উন্নয়নের লক্ষ্য ও পন্থা। উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা। আনন্দ। ২০১১। পৃ: ৪৭।

১৩. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৭-৪৮।

১৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ৪৮।

১৫. তদেব।

১৬. তদেব।

১৭. অমর্ত্য সেন। স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিত। উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৫।

১৮. অমর্ত্য সেন। দারিদ্র্য : বঞ্চনাভোগের কারণ। উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা। পূর্বোক্ত। পৃ: ১১১।

১৯. অমর্ত্য সেন। নারীদের ক্রিয়াকর্ম ও সামাজিক বিবর্তন। উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯১।

২০. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯২।

২১. অমর্ত্য সেন। সংস্কৃতি এবং মানবাধিকার। উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৩২-২৩৩।

২২. অমর্ত্য সেন। গণতন্ত্রের গুরুত্ব। উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৪৯।

২৩. অমর্ত্য সেন। নারীদের ক্রিয়াকর্ম ও সামাজিক বিবর্তন। উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৯১।

২৪. অমর্ত্য সেন। সংস্কৃতি এবং মানবাধিকার। উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৩৩-২৩৪।

২৫. গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : বহ্নিশিখা দাশ পুরকায়স্থ। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রধান শর্ত হচ্ছে উপযুক্ত রাজনীতি ও সংগঠন। গ্রামীণ ব্যাংক ও মুহাম্মদ ইউনূস। ঢাকা মাওলা ব্রাদার্স। ২০০৭। পৃ: ১২।

২৬. গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: বহ্নিশিখা দাশ পুরকায়স্থ । ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অসাধারণ কৃতিত্ব। গ্রামীণ ব্যাংক ও মুহাম্মদ ইউনূস। পূর্বোক্ত । পৃ: ১৮- ১৯।

২৭. মুহাম্মদ ইউনূস। ব্যাংকিং : জামানতের লোহার গরাদে ভাঙন, ১৯৭৬। গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন। ঢাকা মাওলা ব্রাদার্স। ২০১০। পৃ: ৭৫।

২৮. গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: বহ্নিশিখা দাশ পুরকায়স্থ। প্রয়োজন একটি সর্বজনীন অর্থনৈতিক নীতিমালা। গ্রামীণ ব্যাংক ও মুহাম্মদ ইউনূস। পূর্বোক্ত। পৃ: ৩১।

২৯. গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : বহ্নিশিখা দাশ পুরকায়স্থ। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রধান শর্ত হচ্ছে উপযুক্ত রাজনীতি ও সংগঠন। গ্রামীণ ব্যাংক ও মুহাম্মদ ইউনূস। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৩।

৩০. গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : বহ্নিশিখা দাশ পুরকায়স্থ। ব্যাংককে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখলেই প্রচলিত ব্যাংকগুলিকে লাভজনক করা যায়। গ্রামীণ ব্যাংক ও মুহাম্মদ ইউনূস। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৪-২৫।

৩১. গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : বহ্নিশিখা দাশ পুরকায়স্থ। দারিদ্র্য মোচনে চাই স্ব-কর্মসংস্থান। গ্রামীণ ব্যাংক ও মুহাম্মদ ইউনূস। পূর্বোক্ত। পৃ: ২২।

৩২. গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : বহ্নিশিখা দাশ পুরকায়স্থ। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অসাধারণ কৃতিত্ব। গ্রামীণ ব্যাংক ও মুহাম্মদ ইউনূস। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৮।

৩৩. গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : বহ্নিশিখা দাশ পুরকায়স্থ। ব্যাংককে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখলেই প্রচলিত ব্যাংকগুলিকে লাভজনক করা যায়। গ্রামীণ ব্যাংক ও মুহাম্মদ ইউনূস। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৪।

৩৪. দীক্ষিত সিংহ। রবীন্দ্রোত্তর পর্বে শ্রীনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীপুনর্গঠন প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ২০১১। পৃ: ৩৮৫।

৩৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ৩৭২।

৩৬. কাননকুমার মজুমদার। রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা। সম্পাদনা : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। রাতের তারা দিনের রবি। আনন্দ। ১৪০৬। পৃ: ২৫২।

৩৭. প্রভাত পট্টনায়ক। ভারতীয় অর্থনীতি : উন্নয়ন ও দারিদ্র্য। দশদিশি পত্রিকা, Vol-2, Issue-1। এপ্রিল ২০১৩- সেপ্টেম্বর ২০১৩। পৃ: ৬৬।

৩৮. অশোক সেন। রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী। ১৪২১। পৃ: ১৫৫।

৩৯. রতন খাসনবিশ। রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন ভাবনা । নীললোহিত, পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা জুলাই-ডিসেম্বর এবং ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা একত্রে। ২০১০। পৃ: ৫৩০-৫৩১।

৪০. অশোক সেন। রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোক্ত। পৃ: ১২৬।

৪১. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৬০।

৪২. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৬৮।

৪৩. সভাপতির অভিভাষণ, পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে পঠিত। সমূহ। রবীন্দ্ররচনাবলী ৫ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪২১। পৃ: ৭০৮।

৪৪. Leonard K. Elmhirst, THE ROBBERY OF THE SOIL, visva-bharati, 2008, p: 31.

৪৫. Ibid, p: 33.

৪৬. ১ সংখ্যক প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ২৪৩-২৪৪।

৪৭. Leonard K. Elmhirst, THE ROBBERY OF THE SOIL, Ibid, p: 33-34.

৪৮. পৃথা ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গ সমবায়—গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি অবহেলিত সম্ভাবনা। দশদিশি পত্রিকা, Vol-2, Issue-1। পূর্বোক্ত। পৃ: ২১২।

৪৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ২১৩-২১৫।

৫০. জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস। অর্থনীতি ও পরিবেশের সম্পর্ক: দ্বন্দ্ব থেকে ঐক্যে উত্তরণের প্রয়াস। দশদিশি পত্রিকা, Vol-2, Issue-1। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৩৬।

৫১. উপেক্ষিতা পল্লী। পল্লীপ্রকৃতি। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪শ খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। ১৪১৭। পৃ: ৩৭০-৩৭১।

৫২. Leonard Elmhirst, Rabindranath Tagore and Sriniketan, Eleven Foreign Thinkers on Tagore, edited by Samir Sengupta, karigar, 2013, p: 82.

৫৩. গুরুপ্রসাদ কর। সাম্রাজ্যবাদী নয়া আর্থিক নীতি, উন্নয়ন ও গণতন্ত্র। রবিশস্য পত্রিকা। ২০১৪। পৃ: ১১৫-১১৬।

৫৪. পূর্বোক্ত। পৃ: ১১৫।

৫৫. প্রভাত পট্টনায়ক। ভারতীয় অর্থনীতি : উন্নয়ন ও দারিদ্র্য। পূর্বোক্ত। পৃ: ৭০।

৫৬. প্রবালকান্তি হাজরা। রবীন্দ্রনাথের গো-পালন ভাবনার বাস্তবায়ন ও একালে এর প্রাসঙ্গিকতা। নিত্যকালের যাত্রী, রবীন্দ্র জন্মসার্ধশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি, পশ্চিম মেদিনীপুর। ২০১২। পৃ: ৩৫০-৩৫১।

৫৭. নির্মলেন্দু সরকার। সংস্কারের অর্থনীতি, রোগ-চিকিৎসা ও সমাজকল্যাণ। দশদিশি পত্রিকা, Vol-2, Issue-1। পূর্বোক্ত। পৃ: ১৫৮-১৫৯।

৫৮. জয়ন্ত সেনগুপ্ত। ভারতে গণতন্ত্রের সংকট। দশদিশি পত্রিকা, Vol-2, Issue-1। পূর্বোক্ত। পৃ: ৬০।

৫৯. পূর্বোক্ত। পৃ: ৬৪-৬৫।

৬০. গুরুপ্রসাদ কর। সাম্রাজ্যবাদী নয়া আর্থিক নীতি, উন্নয়ন ও গণতন্ত্র। পূর্বোক্ত। পৃ: ১১৪-১১৫।

৬১. রতন খাসনবিশ। বাজার অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্র। দশদিশি পত্রিকা, Vol-2, Issue-1। পূর্বোক্ত। পৃ: ৯২-৯৪।

৬২. কাননকুমার মজুমদার। রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৫৩।

উপসংহার

'রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি: একটি সমীক্ষা' বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের সঙ্গে আমার পরিচয় গভীর হয়। তাঁর জীবনের বিপুল কর্মধারার একটি বড় অংশ নিয়োজিত থেকেছে পল্লীউন্নয়ন কর্মে। অপরাপর গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সেই কাজের দিকগুলির অংশবিশেষে আলোকপাত আছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' কিংবা প্রশান্ত পালের 'রবিজীবনী'তে 'বিচিত্রের দূত' রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী পরিচয় পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে এসেছে। আমি আমার গবেষণার অংশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নকেন্দ্রিক কর্মোদ্যোগকে সম্পূর্ণ সংহত রূপরেখায় বিন্যস্ত করার প্রয়াস নিয়েছি।

গবেষণাকর্মে নিয়োজিত হবার পর রবীন্দ্ররচনাবলীর সঙ্গে আমার পরিচয় আরো নিবিড় হয়। দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের বিপুল সাহিত্য সৃষ্টির অবতলে পল্লীউন্নয়নের বা দেশোন্নয়নের ধারণাগুলি কীভাবে প্রেরণাশক্তি হয়ে থেকেছে। তাই সাহিত্যজীবন আর কর্মজীবনকে মিলিয়ে দেখার প্রয়াস নিয়েছি আমার গবেষণায়। এর থেকে রবীন্দ্ররচনার যেমন নবীন মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছে তেমনি তা রবীন্দ্রজীবনের অনালোকিত দিকের উপরও আলোকপাত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ একজন পুরোদস্তর অর্থনীতিবিদ না হলেও তাঁর উন্নয়ন সংক্রান্ত ভাবনাগুলি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদদের ভাবনার সঙ্গে কীভাবে অনেকাংশে মিলে যায় আমার গবেষণায় তা দেখিয়েছি। পরাধীন ভারতবর্ষে সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপূরক সামাজিক বা আত্মিক উন্নয়নের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নের মডেল তাই কীভাবে উন্নয়নের এক স্বতন্ত্র মানবিক মুখ হয়ে ওঠে ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবনের সমবায়ে তা দেখানোর প্রয়াস নিয়েছি।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি দেশোন্নয়ন বা গ্রামোন্নয়নের যে উদ্যোগ নিয়েছে তা বিশ্বে সার্বিক প্রগতি আনতে পারেনি। বরং ধনের অসাম্য ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষমতার অপব্যবহার আজকের দিনে গণতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী সংকটকে ঘনীভূত করে তুলেছে। মানুষের একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতা, বিষণ্ণতা ক্রমবর্ধমান। পরিবেশ সঙ্কট বিপজ্জনক। এমতাবস্থায় বিকল্প সমাজ-অর্থনীতির খোঁজে বেড়িয়ে পড়েছেন বিশ্বের তাবৎ চিন্তাশীল মানুষ। রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভাবনার মধ্যে কোথায় কীভাবে তার নিরসনের দিকনির্দেশ আছে, আমার গবেষণায় তাকে ধরার প্রয়াস নিয়েছি। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ, অর্থনীতিবিদ রবীন্দ্রনাথ, সমাজতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ সেখানে প্রসারিত দেশ-কালে আজো ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন।

: উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা :

১. অনুত্তম ভট্টাচার্য। রবীন্দ্ররচনাভিধান ২য় খণ্ড। দীপ প্রকাশন। কলকাতা। ১৯৯৯।

২. অমর্ত্য সেন। উন্নয়নের লক্ষ্য ও পন্থা। উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা। আনন্দ। কলকাতা। ২০১১।

৩. অমিত দাশ। রবীন্দ্রনাথ গান্ধী ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুস্তকবিপণী। কলকাতা। ২০০৭।

৪. অমিতাভ চৌধুরী । জমিদার রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী। কলকাতা। ১৪০২।

৫. অরবিন্দ পোদ্দার। রবীন্দ্রনাথ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। উচ্চারণ। কলকাতা। ১৯৮২।

৬. অশোক সেন। রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী। কলকাতা। ১৪২১।

৭. আনিসুজ্জামান (সম্পা:)। সার্ধ-শতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ, বাংলাদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি। বিশ্বভারতী। কলকাতা। ১৪১৯।

৮. আশীষ কুমার বসু (সম্পা:) রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও রাষ্ট্রভাবনা। এভেনেল প্রেস। বর্ধমান। ২০১৩।

৯. ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী। পারিবারিক স্মৃতি। রবীন্দ্রস্মৃতি। বিশ্বভারতী। কলকাতা। পৃ: ৬২।

১০. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। রবীন্দ্রনাথ : সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে। আনন্দ। কলকাতা। ১৪০০।

১১. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা:)। রাতের তারা দিনের রবি। আনন্দ। কলকাতা। ১৪০৬।

১২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র-নাট্য পরিক্রমা। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। কলকাতা। ১৪১৯।

১৩. জ্যোতির্ময় ঘোষ। কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ : তাঁর গল্প। দেজ পাবলিশিং। কলকাতা। ২০০৯।

১৪. দীক্ষিত সিংহ । রবীন্দ্রনাথের পল্লিপুনর্গঠন প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ২০১১।

১৫. নেপাল মজুমদার। ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ। দে'জ ।
কলকাতা। ১৯৯৫।

১৬. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র-নাট্য পরিক্রমা। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। কলকাতা।
১৪১৯। পৃ: ৩৪৪।

১৭. কুমার রায়। রবীন্দ্রনাটক-আলোকিত উদ্ভাবন। মিত্র ও ঘোষ।কলকাতা। ২০০০।

১৮. গুণময় মান্না। রবীন্দ্রনাথ : জমিদারি আসমানদারি। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট।
কলকাতা। ২০১২। পৃ: ২৪।

১৯. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী। বিশ্বভারতী। কলকাতা। ১৪০১।

১৯. বহ্নিশিখা দাশ পুরকায়স্থ (গ্রন্থনা ও সম্পাদনা)। গ্রামীণ ব্যাংক ও মুহাম্মদ ইউনূস।
ঢাকা মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা। ২০০৭।

২০. বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।কলকাতা। ১৯৯১।

২১. মীরা দেবী। স্মৃতিকথা । বিশ্বভারতী। কলকাতা। ১৯১৮।

২২. মুহাম্মদ ইউনূস। গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন। ঢাকা মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা। ২০১০।

২৩. মৈত্রেয়ী দেবী। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। দে'জ।কলকাতা। ২০১৩।

২৪. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতৃস্মৃতি। জিজ্ঞাসা। কলকাতা। ১৩৮৭।

২৫. প্রশান্তকুমার পাল। রবিজীবনী। আনন্দ। কলকাতা। ২০০৯।

২৬রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিঠিপত্র । বিশ্বভারতী। কলকাতা। ১৪১৯।

২৭. রবীন্দ্ররচনাবলী। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। কলকাতা। ১৪১৭ ও ১৪২১।

২৮. রমা চক্রবর্তী। ভরা থাক স্মৃতিসুধায়। বিশ্বভারতী। কলকাতা।২০০৮।

২৯. লায়েক আলি খান। রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমীক্ষা। সৃজন। মেদিনীপুর। ২০১১।

৩০. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ। জিজ্ঞাসা। কলকাতা। ১৯৭৬।

৩১. সজনীকান্ত দাস। রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। শতাব্দী গ্রন্থভবন। কলকাতা।

১৩৬৭।

৩২. সুশীল মণ্ডল। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন। সম্পাদনা : তপন কুমার সোম। দীপ প্রকাশন। কলকাতা। ২০১০।

৩৩. শঙ্খ ঘোষ। শঙ্খ ঘোষের গদ্য সংগ্রহ। দেজ। কলকাতা। ২০০২।

৩৪. শান্তিদেব ঘোষ। শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা। রবীন্দ্রসংগীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা। ১৪১৫।

৩৫. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে। জিজ্ঞাসা। কলকাতা। ১৯৭৪।

৩৬. শিশির কুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীনিকেতন ও অন্যান্য প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী। কলকাতা। ২০০৮।

৩৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধায়। রবীন্দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষা। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা। ১৪০৩।

৩৮. সুকুমার মল্লিক। রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা। জিজ্ঞাসা। কলকাতা। ১৯৯৮।

৩৯. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। অ-চেনা রবীন্দ্রনাথ। দে'জ। কলকাতা। ১৪০৩।

৪০. হীরেন্দ্রনাথ রায়। ধনতন্ত্র বিশ্লেষণ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। কলকাতা। ২০০০।

৪১. ক্ষেত্র গুপ্ত। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস। গ্রন্থনিলয়। কলকাতা। ২০০৮।

৪২. ক্ষেত্রগুপ্ত। রবীন্দ্রগল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ। গ্রন্থনিলয়। কলকাতা। ২০০২।

৪৩. ক্ষুদিরাম দাস। সমাজ : প্রগতি : রবীন্দ্রনাথ। করুণা। কলকাতা। ১৯৯০।

৪৪. Krishna Kripalini, Rabindranath Tagore—A Biography, UBS Publishers Distributors Ltd. Kolkata. 2012.

৪৫. Leonard K. Elmhirst, Poet and Plowman, Visva-Bharati, Kolkata, 2008.

৪৬. Manjula Bose (Edited), L. K. ELMHIRST 1893-1993, CENTENARY VOLUME, TAGORE RESEARCH INSTITUTE. kolkata. 1994.

৪৭. Samir Sengupta (Edited), Eleven Foreign Thinkers on Tagore,

karigar, Kolkata. 2013.

৪৮. Sasadhar Sinha, Social Thinking of Rabindranath Tagore, Visva-Bharati, Kolkata, 1997.

৪৯. Sudhir Sen, Rabindranath Tagore On Rural Reconstruction, Visva-Bharati, Kolkata, 1999.

৫০. Sugata Dasgupta, A Poet and a Plan, Visva-Bharati, Kolkata, 1998.

৫১. Suranjan Das & others (Edited), On the Seashore of Humanity, University of Calcutta, Kolkata, 2012.

৫২. Tapati Mukhopadhyay & Amrit Sen (Edited) Rathindranath Tagore : The Unsung Hero, Visva-Bharati, Kolkata, June 2013.

পত্র-পত্রিকা :

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকা, রবীন্দ্রসার্ধ-শতবার্ষিকী সংকলন। সম্পাদক : সঞ্জীব কুমার বসু। কলকাতা।

৩. ঐকতান গবেষণা পত্র, রবীন্দ্র জন্ম সার্ধশতবর্ষ সংখ্যা। সম্পাদক : নীতিশ বিশ্বাস। বিরাটি।

৪. সমাজ জিজ্ঞাসা পত্রিকা। সম্পাদক: অনিল কুমার জানা। ষষ্ঠ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা একত্রে। মেদিনীপুর।

৫. কোরক সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদক: তাপস ভৌমিক। শারদ সংখ্যা। কলকাতা।

৬. দশদিশি পত্রিকা, Vol-2, Issue-1। সম্পাদক : অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়। কলকাতা।